

CJK-H01818-14-P030206

গল্প প্রতিযোগিতা

“বঙ্গলক্ষ্মী” পত্রিকা মহিলাদের জন্য তিনটি গল্পের পুরস্কার
প্রদান করিতেছেন। যে কোন মহিলা ইহাতে যোগদান
করিতে পারেন। চৈত্র মাসের মধ্যে গল্প পাঠাইতে হইবে।
পৃষ্ঠা অপেক্ষা বড় হইবে না। নির্বাচিত গল্পগুলি
“বঙ্গলক্ষ্মী”তে প্রকাশিত হইবে।

প্রথম পুরস্কার—১৫/-

দ্বিতীয় ” —১০/-

তৃতীয় ” —৫/-

প্রবন্ধ ও গল্প পাঠাইবার ঠিকানা:—

২৩১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড,

কলিকাতা।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

“বঙ্গলক্ষ্মী” পত্রিকা মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও ধর্ম বিষয়ে
ছাত্রীদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দুইটি পুরস্কার ঘোষণা করিতেছেন।
ছাত্রীরা তাঁহাদের স্কুল কলেজের অধ্যক্ষের সাহায্যে রচনাগুলি
“বঙ্গলক্ষ্মী” কাৰ্যালয়ে চৈত্রের মধ্যে পাঠাইলে রচনাগুলির
বিচার করা হইবে। প্রবন্ধ “বঙ্গলক্ষ্মী”র বা “প্রবাসী”র
৪৫ পৃষ্ঠার চেয়ে বড় হইবে না। ছাত্রীরা গান্ধীজীর জীবন-
চরিত পড়িয়া লিখিবেন।

প্রথম পুরস্কার—২০/-

দ্বিতীয় ” —১০/-

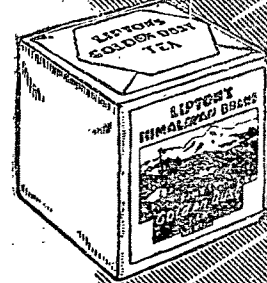
সর্বদা
লিপটনের

হিমালয়ান

ব্র্যান্ড

গোল্ডেন ডাস্ট চা খাবেন

শৌখিন রুচির লোকেদের জন্য



LTK 125

বঙ্গলক্ষ্মী—পৌষ, ১৩৫৪

এই সংখ্যায় লিখেছেন

- ১। আমার ধ্যানের ভারত
 - ২। মাহাত্মা গান্ধী শ্রীশাস্তা দেবী
 - ৩। ৩রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র
 - ৪। বাসুকি দিতেছে নাড়া শ্রীহেমলতা ঠাকুর
 - ৫। শেষ রাগিণী শ্রীদীপ্তি দেবী
 - ৬। পার্টনার খোদাবক্স লাইব্রেরীতে
কয়েক ঘণ্টা—শ্রীশাস্তি শ্রীনাগ
 - ৭। আকাশের ব্যথা কবিশেখর কালিদাস রায়
 - ৮। আল্লনার কল্পনা শ্রীঅসিত কুমার হালদার
 - ৯। শিশু মন শ্রীসুজাতা রায়
 - ১০। ভবিষ্যতের বাঙ্গলা শ্রীসুনীতি বাল্য গুপ্তা
 - ১১। মীরা বাঈ শ্রীমতী গীতা ঘোষ
- আমাদের আসর—পরিচালিকা শ্রীবেলা দে
- ১৩। শক্তি চর্চার প্রয়োজনীয়তা শ্রীবেলা দে
 - ১৪। রূপচর্চার টুকিটাকি
 - ১৫। মুখশ্রী শ্রীগীতা বসু বি-এ
 - ১৬। মহিলা সমাচার শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ
 - ১৭। পুস্তক পরিচয়
 - ১৮। সাময়িকী

“বঙ্গলক্ষ্মী”

সূচী— ফাল্গুন, ১৩৫৪

এই সংখ্যায় লিখেছেন

মহাত্মা গান্ধী	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য	৯৭
মহামানবের মহাপ্রয়াণে	ডক্টর রমা চৌধুরী	৯৯
পুনর্জন্ম	শ্রীজীবনময় রায় কর্তৃক অনুদিত	১০১
মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	শ্রীসতী ঘোষ	১০২
গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণে	শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা	১০৩
গান্ধী সঙ্গীতি	শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক	১০৪
গান্ধীজী	শ্রীকল্যাণী দেবী	১০৭
দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মাজী	শ্রীকালিদাস নাগ	১০৮
তর্পণ	শ্রীসুশীতি বাল্য গুপ্ত	১১০
স্মরণে	শ্রীহেমলতা ঠাকুর	১১৩
ভুলিয়া না যাই	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	১১৫
গৃহী মোহন দাস	শ্রীশান্তা দেবী	১১৬
মহাত্মার আহ্বান	শ্রীপদ্মিনী সেনগুপ্ত রচনার মর্মানুবাদ	১১৯
সত্যগ্রহের মূল কথা	শ্রীসুজাতা রায়	১২১
মহাত্মাজীর স্মৃতি	শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ	১২৩
হ'হাত দিয়ে তুলব ধরে তোমার জয় শঙ্খ	শ্রীবেলা দে	১২৪
সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি		১২৫

গল্প প্রতিযোগিতা

“বঙ্গলক্ষ্মী” পত্রিকা মহিলাদের জন্য তিনটি গল্পের পুরস্কার ঘোষণা করিতেছেন। যে কোন মহিলা ইহাতে যোগদান করিতে পারেন। বৈশাখ মাসের মধ্যে গল্প পাঠাইতে হইবে। ৪৫ পৃষ্ঠা অপেক্ষা বড় হইবে না। নির্বাচিত গল্পগুলি “বঙ্গলক্ষ্মী”তে প্রকাশিত হইবে।

প্রথম পুরস্কার—১৫০

দ্বিতীয় „ — ১০০

তৃতীয় „ — ৫০

গল্প পাঠাইবার ঠিকানা

২৩১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড,

কলিকাতা।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

“বঙ্গলক্ষ্মী” পত্রিকা মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও বিষয়ে ছাত্রীদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দুইটি পুরস্কার ঘোষণা করিতেছেন। ছাত্রীরা তাঁহাদের কলেজের অধ্যক্ষের সাহায্যে রচনাগুলি “বঙ্গলক্ষ্মী” কার্যালয়ে বৈশাখের মধ্যে পাঠাইলে রচনাগুলি বিচার করা হইবে। প্রবন্ধ “বঙ্গলক্ষ্মী” “প্রবাসী”র ৪৫ পৃষ্ঠার চেয়ে বড় হইবে না। ছাত্রীরা গান্ধীজীর জীবন-চরিত পড়িয়া লিখিবেন।

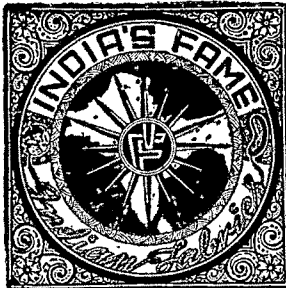
প্রথম পুরস্কার—২০০

দ্বিতীয় „ — ১০০

প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা

২৩১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড,

কলিকাতা।



Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
• BHOWANIPUR :: CALCUTTA •

ইণ্ডিয়ান ফেব্রিক্স (মিত্র মুখার্জী জুয়েলারের উপর তলায়) ৩২নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা। ফোন সাউথ ১২৭৮

বঙ্গবলক্ষী

সূচী—চৈত্র, ১৩৫৪

এই সংখ্যায় লিখেছেন

লৌহ ছুভিক্ষা অপনোদনের উপায়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত	১২৭
সময় আগত	শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা	১৩০
আগ্রায় যখন গিয়েছিলুম	শ্রীঅন্নপূর্ণাগোস্বামী	১৩১
আধুনিক জীবন যাত্রা	শ্রীশান্তা দেবী	১৩৫
১৬ই মাঘ	শ্রীবীণা দেবী	১৩৬
লীলা দেবীর কাব্য		১৩৮
মেয়ে আর পুরুষে ভেদ ও অভেদ	শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪১
শিক্ষার নববিধান বিষয়ে ছ'চার কথা	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার	১৪৩
শেষ রাগিণী	শ্রীদীপ্তি দেবী	১৪৫
বর্ষ বিদ্যায়	শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার	১৫১
কাঁচা লেখার আসর—পরিচালিকা—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা		
স্বপ্ন	মানসী দেবী	১৫২
আমাদের আসর—পরিচালিকা—শ্রীবেলা দে		
মহাভারতের নারী গান্ধারী	শ্রীবেলা দে	১৫৩
ঘরের কথা—রান্নাঘর	শকুন্তলা	১৫৪
জর্জ ওয়াশিংটনের ১৩৬তম বৃৎসরের সংগ্রহ হইতে—	শ্রীহিমাংশুবালা ভাট্টা	১৫৫
ঘরের কথা—রান্নাঘর—লোবুর আচার—	শৈল মিত্র	১৫৫
মহিলা সমাচার	শ্রীরমা ঘোষ	১৫৬
সাময়িকী		১৫৮

*THE ESSENCE of
Feminine CHARM!*



*Beauty
Products*

Linoza
PRODUCTS (INDIA)

Calcutta Office

20, MAHARSHI DEBENDRA RD
— CALCUTTA —

গল্প প্রতিযোগিতা

“বঙ্গলক্ষ্মী” পত্রিকা মহিলাদের জন্য তি.
গল্পের পুরস্কার ঘোষণা করিতেছেন। যে কে
মহিলা ইহাতে যোগদান করিতে পারেন। জৈ.
মাসের মধ্যে গল্প পাঠাইতে হইবে। ৪৫ পৃ.
অপেক্ষা বড় হইবে না। নির্বাচিত গল্পগুলি
“বঙ্গলক্ষ্মী”তে প্রকাশিত হইবে।

প্রথম পুরস্কার—১৫/-

দ্বিতীয় „ — ১০/-

তৃতীয় „ — ৫/-

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

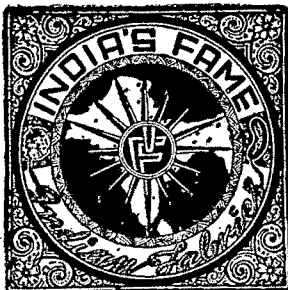
“বঙ্গলক্ষ্মী” পত্রিকা মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও ধ.
বিষয়ে ছাত্রীদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য দুইটি পুরস্কা
ঘোষণা করিতেছেন। ছাত্রীরা তাঁহাদের স্কু.
কলেজের অধ্যক্ষের সাহায্যে রচনাগুলি “বঙ্গলক্ষ্মী”
কার্যালয়ে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে পাঠাইলে রচনাগুলি
বিচার করা হইবে। প্রবন্ধ “বঙ্গলক্ষ্মী”র
“প্রবাসী”র ৪১২ পৃষ্ঠার চেয়ে বড় হইবে না
ছাত্রীরা গান্ধীজীর জীবন-চরিত পড়িয়া লিখিবেন।

প্রথম পুরস্কার—২০/-

দ্বিতীয় „ — ১০/-

প্রবন্ধ ও গল্প পাঠাইবার ঠিকানা

২০১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড,
কলিকাতা।



Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
• BHOWANIPUR :: CALCUTTA •

বঙ্গলক্ষ্মী) ১৫৮৩

০০২/২৮

২৩শ বর্ষ

অগ্রহায়ণ-১৩৫৪

১ম সংখ্যা

জাগরণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নব-জাগরণ লগনে গগনে বাজে কল্যাণ শব্দ—

এসো তুমি উষা, ওগো অকলুষা, আনো দিন নিঃশঙ্ক।

ছালোক ভালানো আলোক সুধার

অভিষেক তুমি করো বসুধায়,

নবীন দৃষ্টি নয়নে তাহার এনে দাও অকলঙ্ক ॥

সমুদ্র পানে নব যুগ আজি মেলুক উদার চিত্র।

অমৃতলোকের দার খুলে দিক্ চিরজীবনের মিত্র।

বিশ্বের পথে আসিয়াছে ডাক্,

বাজীরা হবে যাক্ খেয়ে যাক্,

দেহ মন হ'তে হোক্ অপগত অবসাদ অপবিত্র ॥

মৌন যে ছিল বন্ধে তাহার বাজুক্ বাণীর ভঙ্গ।

নব বিশ্বাসে আঁখাসহীন শুদ্ধক্ বিজয় মঙ্গ।

এসো আনন্দ, হৃৎক হরণ,

দুঃখেঁরে দাও করিতে বরণ,

মরণ ভোরণ পার হয়ে পাই অমর প্রাণের পথ ॥

কল্যাণী, তব অননে আজি হবে মঙ্গল কন্দ,

শুভ সংগ্রামে যে যাবে তাহারে পরাও বীরের বন্দ ॥

বলো হবে ডাকি, "ছাড়ো সংশয়,"

বলো বাজীরে, "হয়েছে সময়,"

বলো, "নাহি ভয়," বলো "জয়, জয়—জয়ী যেন হয় ধর্ম ॥"

পশ্চাৎ পানে ফিরায়ে ডেকোনা মনে জাগায়োনা দ্বন্দ।

দুর্জয় শোকে অশ্রু সলিলে নয়ন করোনা অন্ধ।

সঙ্কট মাঝে ছুটিবার কালে

বাঁধিয়া রেখোনা আবেশের জালে ॥

যে চরণ বাধা লজ্জাবে, তাতে জাগায়োনা সেই বন্ধ ॥ *

* ১৩৩৪ সালে 'বঙ্গলক্ষ্মী'র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

P30206!

সাহিত্যের অমৃত

শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী

আশ্চর্য্য এই পৃথিবী—প্রত্যহ কত লোক জন্ম নেয়, হাসে, খেলে, খায় দায়, ছবি আঁকে, গল্প লেখে, পাহাড় কেটে রাস্তা বানায়, ঘর্ষের শব্দে আকাশ ভেদ করে উড়ে চলে, আরো কত কী করে, তার পরে একদিন মরে যায়। তার হাসি কান্না সুখ দুঃখ বেদনার চিহ্নমাত্র থাকে না। চিরকাল ধরে চলে জীবনের এই অনিত্য স্রোত। তবু তো মানুষ নিত্যতার উপর বিশ্বাস হারায় না। চারিদিকের সমস্ত ঝরে ঝরে পড়ে, ম'রে ম'রে যায় তবু বিশ্বের প্রাণ নটিনীর স্রোতে কোথাও এতটুকু টান পড়ে না। এই তো অমর প্রাণ বা শত শত মৃত্যুকে পার হয়ে অব্যাহত ভাবে চলে। এই প্রাণ চলতে চলতে মানুষের মধ্যে এসে মন হয়ে ওঠে। আর এই অদ্বিত মন আপন ঘরের জানালা গুলে বাইরের জগতের আলো ছায়া ও ছবি নিয়ে যে আশ্চর্য্য মনোজগৎ সৃষ্টি করে তোলে তার তুলনা নেই। তার মধ্যে এই জগতের অল্পরূপ কত আলোছায়া, কত ভাঙাগড়া, কত অব্যক্ত ভাবনার বাষ্প, কত উড়ো চিত্তার মেঘ, কত কুলের মত রঙীন সুখ, ঘনায়মান কাজল মেঘের বিপন্ন মেঘুরতা, কত কীটের মত কুটিল মনের গতি, কত অন্ধকূপের মত আচ্ছন্ন আলোকহীন গহ্বর, কত শ্রামল নবীন ভাবের লীলা, কত দখিনা হাওয়ার চঞ্চল মুখরতা কে তার ইচ্ছা করবে? যেমন প্রাণ হতে প্রাণে চলে বয়ে প্রাণের স্রোত, তেমনি মন হতে মনে চলছে ভাবের স্রোত বয়ে। সমস্ত প্রাণীজগতের মর্মকেল্লো বংশরক্ষার যে প্রবল চেষ্টা স্পন্দিত হচ্ছে, সেই একই চেষ্টায় মানুষের ভাষাও নিরন্তর কম্পিত। মানবইতিহাসের সেই প্রথম যুগে যখন মানুষের অক্ষুট মন তার নিজেকে ও বাইরের জগৎকে খুব অল্পই চিনতে পেরেছিল, তখনো তার অর্দ্ধজাগ্রত মন আপনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। হাজার হাজার বছর পেরিয়ে তার সেই অক্ষুট শিরপ্রচেষ্টা গুহাবাসী আদিমানবের অর্দ্ধচেতন মনের অস্পষ্ট মনোভাবটা আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরে। সেদিন সে তার পাখরের গায়ে আঁচড় কেটে কী যে বোঝাতে চেয়েছিল তা ভাল করে বোঝা না গেলেও তার চেষ্টাটিকে ভুল বোঝবার কারণ নেই। তার পর থেকে নিরন্তর তার এই চেষ্টার আর বিয়ান নেই।

মানুষ জানে তার এই প্রিয় দেহটা একদিন ধূলায় যাবে মিশে। সেই সঙ্গে সেই দেহকে আশ্রয় করে যে সুখ দুঃখ আকান্মা তাকে এতকাল গভীর ভাবে দোলায়িত করত তাও যাবৎ মিলিয়ে একথা ভাবতে তার অন্তর ফুক হয়। তাই সে রেখে যেতে চায় তার ভাবনার এমন একটা ছবি যা অল্প মানুষের মনে অল্পরূপ ছবি ফুটিয়ে তুলে সেই ভাবের রসে তাকে আশ্রয় করবে। এই যে হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়ের স্থান গ্রহণের চেষ্টা, এই যে অন্তের ভাবের সঙ্গে নিজের চিত্তভাবের যোগস্থাপনা, এরই আকাঙ্ক্ষা সাহিত্য ও শিল্পের বিবিধ কলার মধ্যে দিয়ে মানুষের আত্মপ্রকাশকে সার্থক করে তুলছে। বস্তুত সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেই এই ভাব নিহিত আছে। 'সহিত' শব্দ থেকে উৎপত্তি। সাহিত্য শুধু যে মানুষের একাকীত্বের বন্ধন ঘুটিয়ে তাকে বন্ধুর মত সাহচর্য্য দেয় তাই নয়—সে, দুটি মানুষের চিত্তকে (লেখক এবং পাঠক) এমন এক মিলনক্ষেত্রে নিয়ে আসে যেখানে দেশ কালের গণ্ডী তুচ্ছ হয়ে মিলিয়ে যায়। তাই প্রথম প্রণয়াবেগে শঙ্কিত নীপশিখাটির মত ভীক শকুন্তলার কম্পিত বক্ষের প্রতিধ্বনি আমাদের বুকের কাছে অনুরণিত হয়ে ওঠে আর সন্তসাগর পার হয়ে মিলটনের বজ্রকণ্ঠ আমাদের মর্মের কাছে পাপের পরাজয় সগৌরবে ঘোষণা করে চলে। সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত আছে এই মর্ত্যজীবনের অমৃত। সেইখানেই নবজন্ম লাভ করে এক মানুষের চিত্ত অল্প মানুষের হৃদয়ে। যে চিত্তভাবটা আজ জন্ম নিয়ে কাল শেষ হয়ে গেল—সাহিত্যের সঞ্চিত ভাণ্ডারে জমা রইল তার ছবি পরবর্তী কালের জন্য। আমাদের বিশেষ জীবনের মনের চেউগুলি নিয়ে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমরা মিলিয়ে যাই সত্য—কিন্তু বিশ্বমানবের চিরন্তন মানস সরোবর গভীর অতল জলে, আজো সমান টল টল করছে। কত রাজস্ব উঠল পড়ল, কত কবি এল গেল, কত কুরুপাণ্ডব মিলিয়ে গেল, তবু আজো মানুষ তেমনি করেই দুঃখে কাদে সুখে হাসে, তেমনি করেই হিংস্রাঘেঘে পাগল হয়ে পরস্পরে হানাহানি করে মরে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তার ভাবজগতের আলোড়ন আপনাকে প্রকাশ করতে চায়। তাই মানুষ কাদে হাসে। মানুষ

চায় তার অল্পভূতিকে সকলের সামনে মেলে ধরতে। পশুর
এ ক্ষমতা নেই। কিন্তু সকলেই আপন অল্পভূতিকে যথার্থ
ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে না। তাকে রূপ দিতে
গিয়ে বাড়িয়ে ফেনিয়ে বিকৃত করে তোলে। তাই অনেক
সময় শোকের চেয়ে শোকের চীৎকারটাই বেশী করে
কাণে লাগে, পূজার চেয়ে পূজার হট্টগোল বড় হয়ে ওঠে।
কিন্তু পারুক বা না পারুক মানুষের মনের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট
ভাবগুলি কেবলি তার বিশেষ মনোকেত্র থেকে বিশ্বমানবের
মানসকেন্দ্রে মুক্তিনাভের অস্ত্র ছট্‌ফট করতে থাকে—

“না পারে বুঝতে,

আপনি না বুঝে

মানুষ কিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে”

প্রকাশের এই ব্যাকুলতা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয় কবি।

কবিও মানুষ। বিশ্বমানবমানসের অন্তর্গত। কিন্তু তার
এমন ক্ষমতা আছে যে সে পারে সরোবরের অন্তর্নিহিত
সৌন্দর্যকে উদ্ধার করে আনন্দ শতদল ফুটিয়ে তুলতে।

তখন সেই পদ্মের রূপে সৌরভে সমগ্র সরোবরটী বলমল
করতে থাকে। প্রতি স্নলকণা আপনার মধ্যে তার
প্রতিবিম্ব ধরে রাখে। যে ফুটিয়ে তুলেছিল সেই পদ্ম,

সে কোথায় যায় মিলিয়ে, তার নিজস্ব বিশেষ অল্পভূতি ও
প্রেরণা-নিষে, কোন বিশ্বরণের তলায় তলিয়ে যায় তার
জীবনের ইতিহাস—শুধু সোনার তরী বোঝাই করে তার
চিত্তভাবের ফসল অনাদি কালস্রোতের উপর দিয়ে
ভেসে যায়। সকল মানুষ করে তার ফলভোগ। কালিদাসও
নেই, উজ্জয়িনীও তার ভবনশিখরের পারাবত, তার
বিলাসিনীদের হুপু শিজিত, তার সমস্ত বিলাসবৈভব নিয়ে
বহুকাল অন্তর্ধান করেছে, তবু সমগ্র মেঘদূত ভরে বিরহের
দীর্ঘশ্বাস নিত্যকালের মানব-হৃদয়কে ভাবে উবেল করে
তোলে।

সাহিত্যের দুটো প্রধান দিক আছে। একটা হচ্ছে
জ্ঞানের দিক আর একটা হচ্ছে জীবনের দিক। একদিক
করে জ্ঞানের প্রচার, যুগে যুগে মানুষের জ্ঞানার সীমা যায়
বাড়িয়ে। সাহিত্যের আর একদিক করে জীবনকে
প্রকাশ। মানবমনের নিভৃত ঘরে যে ভাব ও
অল্পভূতির লীলা চিত্রে ও চরিত্রে মানুষকে পরিপূর্ণ করে

তোলে, তারই প্রকাশ সাহিত্যের মধ্যে মানবহৃদয়কে
মুক্তি দেয়। সকলের মনেই ভাব ও অল্পভূতির লীলা
চলে—কিন্তু সকলের অল্পভূতি সমান তীব্র নয়। কার
বেদনা মোটা আবরণে ঢাকা থাকে, কার বেদনা সূক্ষ্ম
কাঁটার মত রক্তক্ষরণ করে, কার ভাব মনের গাছে জন্ম
নিয়ে মুকুলেই ঝরে যায়, কার ভাব মুকুল থেকে ফুলে, ফুল
থেকে ফলে, রসে পরিপূর্ণ গন্ধে সুবাসিত হয়ে মনোবৃক্ষের বন্ধন
থেকে মুক্তিনাভ করে। তারাই কবি, তারাই শিল্পী যারা
আপন অল্পভূতিকে মুক্তি-দিতে পারে এমন সুরে, যাতে অল্প
মানুষের চিত্তবীণার তারগুলিও বাজত হয়ে ওঠে।

বিশ্বস্থিতিতে সৃষ্টিকর্তার যে আনন্দ সাহিত্যের স্থিতিতে
কবির সেই আনন্দ। আপনাকে সত্য করে উপলব্ধি
করার, আপন অল্পভূতিকে যথার্থ করে জানার এ আনন্দ।
বিধাতা এই বিশ্বের মধ্যে আপনাকে অজস্র বিচিত্রভাবে
প্রকাশ করে, নানারূপে বার বার আপনাকে নতুন করে
উপলব্ধি করলেন। সেই উপলব্ধির আনন্দ শতধারে তাঁর
সহস্র সৃষ্টির মধ্যে অহোরাত্র উৎসারিত হয়। উপনিষদ্
বলেছেন—

আনন্দাচ্ছোব খন্দিমানি ভূতানি জায়ন্তে,

আনন্দেন জাতানি জায়ন্তে

আনন্দম প্রত্যতিসংবিশন্তি তৎবিজিহাসন্ত, তৎব্রহ্ম।

সাহিত্যেও সেই একই নিয়ম। আনন্দ থেকেই সাহিত্যের
জন্ম। কবিচিন্তের আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বিচিত্র
ভঙ্গীধারায় যখন আপনাকে প্রকাশ করে, তখনই সাহিত্যের
সৃষ্টি হয়। আনন্দের মধ্যেই সাহিত্যের জীবন। চিরকাল সে
রসপরিবেশন করে চলে, এবং অনবরত সাহিত্যচর্চার ফলে
মানুষের মনের সূক্ষ্মভাবগুলি যখন জাগ্রত হয়ে ওঠে, তখন
তার গতি। আনন্দ অর্থে এখানে সুখ নয়। সুখ দুঃখ-
হুই থেকেই মুক্তির এ আনন্দ। তাই প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা
সাহিত্যের আশ্বাসকে ব্রহ্মাশ্বাদের সঙ্গে তুলনা
করেছেন। যদিও সুখ দুঃখের কথাই সাহিত্যে লেখা
থাকে তবু তা সুখও নয়, দুঃখও নয়; তা সুখ দুঃখের
এমন এক স্মৃতিকাহিনী বা আমাদের মনকে আসক্তির
পাকে বন্ধ না করে বরং তা থেকে মুক্তি দেয়।
মেঘদূত পড়ে রসিক বিরহী যে আনন্দ পাবে, সত্যকার

বিরহাবস্থায় সে কখনো তা পাবে না। আমাদেরনিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হুঃখকে আমরা একান্ত আসক্তির অন্ধতার মধ্যে দিয়ে দেখি। স্বার্থ হুঃখের সত্যকার রূপ তাতে ব্যহত হয়। সাহিত্য সেই অন্ধতা থেকে তাদের মুক্তি দিয়ে নিত্য কালের মানবাত্মত্বের প্রচ্ছন্ন আনন্দস্বরূপটী ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে। সেই অন্ধেই সাহিত্যকে লোকোত্তরাহ্লাদদায়িনী বলা হয়। লৌকিক বিষয়গুলির অলৌকিক নিত্যস্বরূপকে উদ্ঘাটিত করে সাহিত্য। বান্দীকির স্বপ্ন বধন ক্রৌঞ্চ মিথুনের বিরোধ ব্যথায় করুণায় গলে গিয়ে প্রথম শ্লোকটী বিশ্ববান্দীর চিত্তপ্রান্তে উৎসারিত করে তখন সে হৃদয়ের ভাব কি সাথীর মৃত্যুতে শোকাক্রান্ত ক্রৌঞ্চপতির হৃদয় ভাবের অল্পরূপ ছিল? কবিও মানুষ, কবির মনও স্বার্থ হুঃখ বেদনার দোলায় অল্প মানুষের মতই এমন কি অনেক সময় তাঁর চাইতে আরো গভীর ভাবেই দোলে, আরো বেশী তীব্র ভাবেই ব্যথা বাজে তাঁর বুকে। কিন্তু এটা ঠিক যে বেদনায় মন যতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ততক্ষণ কোন সত্যকার সৃষ্টি সম্ভব নয়। যতক্ষণ মানুষ সমুদ্রের মধ্যে হাবডুবু খায়, ততক্ষণ সমুদ্রের সঙ্গে তার যতই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হোক, ডুবিয়ে মারা ছাড়াও সমুদ্রের যে বিশাল উদার পরিপূর্ণ রূপ আছে সেইটী তার নজরে পড়ে না। সমুদ্রের পারে এসে তবেই সে সমুদ্রকে সত্য করে দেখতে পায়। হুঃখের জালে যখন শ্বাস রোধ হবার উপক্রম তখন করুণ সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস বার্থ হয়, এমন বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে। অল্পভূতিকে দৃষ্টিগোচর দূরখে

রাখার অস্ত্রে কবির মনের মধ্যে একটা নিরাসক্তির বিকৃতি থাকে। প্রয়োজন—তা নইলে সৃষ্টি স্রবের হয়ে ওঠে না। সকল সৃষ্টিরই মূলে সেই একই নিয়ম, কোথাও বেশী, কোথাও কম। হুঃখ উত্তীর্ণ হয়ে তবেই হুঃখের সেই হুঃখহীন করুণাধন নিত্যস্বরূপকে ভাল করে বোঝা যায়, এবং যার ক্ষমতা আছে সে তাকে বিশ্ব মানবের অল্পভূতির মধ্যে ধরে রেখে দিয়ে যায়। সেই অন্ধেই সত্যকার সাহিত্য আমাদের চিত্তকে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে, এক রস ঘন আনন্দের স্বর্গলোকে ডেকে নিয়ে যায়। সেই স্বর্গলোক থেকে দৃষ্টিপাত করলেই সংসারের এই জীর্ণ খোলসটা সরে গিয়ে তার নিত্যকার আনন্দময় রূপটী ফুটে ওঠে। তখন স্বর্ঘ্যোদয় থেকে স্বর্ঘ্যাস্ত পর্যন্ত প্রত্যাহের প্রত্যেকটি কর্ম রমণীয় হয়ে উঠে। যে সব অল্পভূতের ধার নিত্য ব্যবহারের হাওরায় মরচে পড়ে ভৌতা হয়ে গিয়েছিল তারা আবার স্মৃতিস্বরূপ হয়ে ওঠে। কবির উদ্দেশ্য সফল হয়। কবির আশা বেশী নয়, কাব্যের তুলিন্স্পর্শে আমাদের দৃষ্টিকে আর একটু সজাগ করে আমাদের অল্পভূতিকে আরো একটু তীব্র করে, আনন্দকে আমাদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

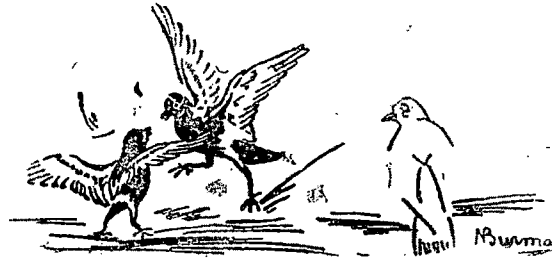
তাইতো কবি বলেছেন :—

সংসার মাঝে হুঃ একটা স্রব

রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর

হয়েকটা কাটা করি দিব দূর

তার পরে ছুটি নিব।



প্রত্যাহাত

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাড়াডী

মোগলসরাই রেল বিভাগের লেডী ডাক্তার সুরমা রায় আজ ভীষণ ব্যস্ত। একটি বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্ত ওকে শীঘ্রই যেতে হবে কলিকাতা। ওর সহকারী চপলা জিনিষ পত্র সমস্ত গোছগাছ করে রেখেছে, এখন বদলী এসে পৌছলেই ও যেতে পারে। রেলের ব্যাপার ত? সবই চিমে তালে চলে। পাশের জন্ত দরখাস্ত করে সে হেড অফিসে পাঠিয়েছে, কিন্তু এখনও পাশ এসে পৌছাল না। মোগল সরাইর মাটি যেন চিরদিন ওকে কিনে রেখেছে। অসম্ভব কাজ। এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। সুরমা এইমাত্র হাস্পিটাল থেকে ফিরেছে। এখনও তার গায়ের জ্যাকেট খোলা হয়নি। পরিশ্রমে মুখখানি হয়েছে লাল। ঠিক এই সময়, চপলা এসে খবর দিল “আর্জেন্ট কেস, এখনি যেতে হবে।” এস, ডি, ও, সাহেবের স্ত্রীর অবস্থা সঙ্কটজনক। অধৈর্য হওয়া ডাক্তারদের ধর্ম নয়। তার উপর সুরমা আবার সত্যিকারই ব্রতচারিণী। কাজেই, সমস্ত বিরক্তি মনের মধ্যে চেপে রেখে সে বললে, “এস, ডি, ও, রংবালো ত, এখান থেকে মাইল ছয়েক রাস্তা; গাড়ী পাঠিয়েছে?”

চপলা বিনীত কণ্ঠে বললে, “হ্যাঁ, সুরমাদি; গাড়ী পাঠিয়েছে। আপনি একটু বিশ্রাম করুন; আমি ততক্ষণে আপনার যত্নপাতি গুলিয়ে দিচ্ছি। ডেলিভারী কেস, তার উপর আবার সিরিয়স”—

সুরমার জীবন বিজ্ঞানের জন্ত নয়; তার জীবন স্মৃতির জন্ত নয়। সুরমা বিশ্রাম চায় না। সে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, “চপলা, তুমি তাড়াতাড়ি কর, আমি এক্ষণি মুখ ধুয়ে আসছি।”

হেমন্তের বেলা শেষ। রাত্রির অস্পষ্ট পদধ্বনি আসন্নপ্রায়। রেল কলোনির প্রায় প্রতি ঘরেই শাঁখ বেজে উঠল। প্রতি ঘরে যখন গৃহস্থ বধূরা, তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করছে, সেই সময় আর একটি গৃহস্থ

কন্যা, অনুচা যুবতী, ডাক্তার সুরমা, তার ডাক্তারী ব্যাগ হাতে নিয়ে চলল রুগী দেখতে। জনবিরল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে এস, ডি, ও, সাহেবের গাড়ী ছুটে চলেছে পঞ্চাশ মাইল স্পীডে। বাহিরে শুধু অন্ধকার। ভিতরে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ডাক্তার সুরমা।

যথাসময় নির্দিষ্ট গৃহে পৌছে রুগীর কক্ষে প্রবেশ করে সুরমা স্তব্ধ হয়ে গেল। কেননা প্রসূতি তখন মারল গেছে। সদ্যভূমিষ্ট একটি শিশুকে নিয়ে একদল নার্স বাহিনীর কক্ষতৎপরতার আর বিরাম নেই, কিন্তু ঘরে অল্প একটী ডাক্তার পর্যন্ত নেই। অথচ এরা ধনী, সমাজে শীর্ষস্থানীয় সম্মানীয় ব্যক্তি। শিশুটির দিকে অগ্রসর হয়ে বললে, “আমায় আর একটু আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল—তাড়াতাড়ি আরও গরম জল নিয়ে আসুন”—একটি বুঝে বললেন, “এত তাড়াতাড়ি যে এমন হবে আমরা বুঝে পারিনি। এখনওত পুরো দশ মাস হয়নি; বুঝবোই বা কি করে বলুন?”

ডাক্তার সুরমার মনে হল উত্তর দেয়, “তা বুঝতে পারবেন কেন? এক মাস গর্ভ সঞ্চার হলে আপনারা জানতে পারেন আর প্রসব হবার সময় আপনারা বুঝতে পারেন না? এসে আপনারা ইচ্ছাকৃত অবহেলা। নার্সের প্রতি অবজ্ঞা। যখন সময়ে চিকিৎসক এলে, নিশ্চয়ই তিনি ফরসেপ্সের সাহায্যে সন্তান বাহির করে, প্রসূতির জীবন রক্ষা করতে পারতেন সে কিন্তু মুখে কোনও উত্তর দিল না। তার চিকিৎসার ফলে শিশুটি তখন কোঁদে উঠেছে ট্যা . ট্যা শব্দে। শুধু গৃহে যেন সঞ্চার হোল নতুন প্রাণের। কোন ঘর থেকে কোন মাতা, গাখ ধ্বনিতে তার বন্দনা পাড়ার লোকজ্ঞানিয়ে দিলেন। এদিকে ঘরের মধ্যে পড়ে রইল একটি মৃত ভ্রূণ; বঞ্চিতা মাতা।

নবজাত শিশুটিকে তার পিসিমার তত্বাবধানে দিই সুরমা ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে এক

পুরুষ মুক্তি, তার সামনে এসে দাঁড়াল। দীর্ঘ প্রসারিত হাতে তার পাঁচখানি দশ টাকার নোট। সুরমা বলতে গেল, টাকা সে নেবে না। কেননা রুগী সে বাঁচাতে পারেনি। কিন্তু পুরুষটির মুখের দিকে চেয়েই ও বিস্মিত হয়ে গেল। সমস্ত দেহ থর থর করে কঁপে উঠল। পুরুষটির অবস্থাও তুচ্ছ। চকু দুটো তার ঘোর রক্তবর্ণ। খুব সম্ভব অত্যধিক বোদনের ফলে হয়েছে। সে ভয়ঙ্কর বললে, “সুরমা তুমি?”

ওঃ বহু দিন, বহু দিন, প্রায় অর্দ্ধ যুগ পরে প্রিয় কণ্ঠে নিজ নাম শুনে, ডাক্তার সুরমার আশ্রয় বিজ্ঞ হওয়া এমন কিছুই বিস্ময়কর নয়। সে বললে, “মোহিত দা?”

এমন সময় ভিতর থেকে উচ্চ ক্রন্দন রোল ভেসে আসতে সুরমা সচকিত হয়ে, নিজেকে সামলে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। এস, ডি, ও, সাহেব নোট কয়খানি সুরমার হাতে গুঁজে গিয়ে বললেন, “সুরমা, কাল দয়া করে এসে আমার মাতৃহীন শিশুটিকে একবার দেখে যেও।”

ড্রাইভার তখন গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। সুরমা নিরন্তরে গাড়ীর মধ্যে বসে রইল। এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তার শরীর তখন ভীষণ ভাবে ষামছিল। হাতের মুঠোর মধ্যে নোট কথানা ভিজে উঠেছিল। অবসরের মত সুরমা গাড়ীর গদীতে দেহ এলিয়ে দিল। নিজের কোয়ার্টার্সে পৌঁছে সামনে চপলাকে দেখে, তার হাতে নোটগুলো গুঁজে দিয়ে সে বললে, “চপলা, বড়দিনে এই টাকা কটা দিয়ে তুই একটা মনোরমা শাড়ী কিনে পরিস।”

চপলা জানতো সে গরীবের মেয়ে বলে, সুরমা তাকে অত্যন্ত স্নেহ করে। তাই সে টাকাগুলো নিয়ে আঁচলে বেঁধে হাসতে হাসতে বললে, “তোমার বদলী এসে গেছে সুরমাদি; তাকে আজ হাসপিটালে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমি অফিসে নিজে গিয়ে তোমার পাশও এনে রেখেছি। এখন আমার কি খাওয়াবে বল?”

হাসতে সুরমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। তবুও সে অনেক কষ্টে একটু হেসে বললে, “এই জন্মইত তোকে এত ভালবাসি চপলা। খাওয়ার জন্ম ভাবনা কি? যা খাবি মনে করে রাখ; আমি ততক্ষণে আন করে আসি।” চপলা খুশী হয়ে রান্নাঘরে চলে গেল, তার খাবার ঠিক আছে কিনা দেখতে।

থেতে বসে সুরমা কিছুই খেল না। চপলার গীড়াপীড়িতে সে বললে, “সত্যি চপলা, আমার চোখের সামনে কেবল সেই মরা মেয়েটার মুখ ভেসে বেড়াচ্ছে—খাবার কিছুতে আমার গলা দিয়ে নাওছে না।” ওর মুখের দিকে চেয়ে চপলা আর কিছু বললে না। সুরমা খানিকটা জল খেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু আশ্চর্য! অন্ধকার ঘরে লেপের নীচে শুয়ে, সুরমার চোখে কিছুতে ঘুম আসে না। ঘুরে ফিরে তার কেবলই মনে পড়ে বহু কষ্টে ভুলে যাওয়া তার প্রিয় মোহিতের মুখ। নিষ্ঠুর মোহিতের মুখ। লোভী মোহিতের মুখ। তার ভালোবাসা; তার আশ্রয়-বিস্ময়তা; তার হিংস্র নীচতা। সে সব কাহিনী অবিস্মরণীয়। সে আজ কতদিন আগের কথা। সুরমা তখন স্কুলে পড়ে। মোহিতরা-ছিল ওদের প্রতিবেশী। সেই সূত্রেই ওদের আলাপও ছিল যথেষ্ট। প্রায়ই মোহিত ওদের বাড়ী আসতো, এবং সুরমাও যেতো ওদের বাড়ী। সুরমা খুব ভালো গান গাইতে পারতো। মোহিতও প্রায়ই সন্ধ্যা বেলা ওদের ছাদে এসে সুরমার গান শুনতো। পশ্চিম আকাশে যখন সূর্য্য অস্ত যেতো; স্নান হয়ে আসতো পৃথিবীর রং; সুরমা তখন আকাশের দিকে চেয়ে গাইতো,

আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বলে, দিবস গেলে

করবো নিবেদন”

“আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।”

মোহিতও বাধা দিয়ে বলতো, “ও গান কেন রমা? অল্প গান গাও।”

সুরমা তখন মোহিতের চোখে চোখ রেখে গাইতো,

“বধু কি আর কহিবো আমি।

জনমে জনমে, জীবনে মরণে প্রাণনাথ হোমো তুমি”—

খুশী হয়ে তখন মোহিত বলেছে, “রমা, তুমি আমি এক।

কেউ আমাদের ভিন্ন করতে পারবে না।

আমরা দুজনে ভাসিমা এসেছি যুগল প্রেমের শ্রোতে;

অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।”

সুরমা লাজুক কণ্ঠে তার উত্তর দিয়েছে—

‘তোমারই আমি ভালো বাসিয়াছি শতরূপে শতবার—

জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার”—

সন্ধ্যার অন্ধকারে আশ্রয়স্থিত মোহিত, সুরমার পেলব ওঠে এঁকে দিয়েছে, তার অতৃপ্ত প্রেমের একটা চিহ্ন। সে

স্পর্শে কুমারী তরুণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তবে ভীত হয়নি। সে জানত, এই পুরুষই তার জীবনে একমাত্র পুরুষ। এ ছাড়া অন্য কেউই তার জীবনে প্রবেশ করতে পারবেনা। এমনি ভাবে দিন কাটছিল। সকলেরই মনে মনে আশা ছিল, সুরমা এবং মোহিতের শীঘ্রই বিবাহ হবে। এমন সময় একদিন সুরমার পিতা সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করলেন। এবং স্ত্রীর অল্পরোধে মোহিতের পিতার কাছে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন। মোহিতের পিতা ধনী ও ব্যবসায়ী লোক। সুরমার পিতার প্রস্তাব শুনে হেসে বললেন, “আমার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চানু ভালো কথা। কিন্তু কত বর পণ যৌতুকাদি দিতে পারবেন?”

কন্যার পিতা সবিনয়ে বললেন, “জানেন ত স্যর গরীব কেরানী আমি, তবে সাধ্য মত সবই দোব। তবে আপনার মোহিত আমার সুরমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, সেই আশাতেই এসেছি। নচেৎ আপনার মত ধনী ব্যক্তির সঙ্গে কুটুম্বিতা করা কি আমার সাধ্য?” পাত্রের পিতা উপেক্ষাভরে বললেন, “তবুও কত দিতে পারবেন শুনি?” কন্যার পিতা মনে মনে হিসাব কষে বললেন, “তা মেয়ের গয়না, ছেলের যৌতুক, বরপণ ইত্যাদি নিয়ে, হাজার পাঁচেকের বেশী দিতে পারবোনা স্যর।” হাজার পাঁচেক? পাত্রের পিতা আকাশ থেকে পড়লেন। “তবে মশাই সেই রকম ঘরেই মেয়ের সম্বন্ধ করুন না গিয়ে। এখানে কষ্ট করে কেন এসেছেন?” অপমানে সুরমার পিতার মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি কোনও রকমে সেটা চেপে নিয়ে বললেন, “আপনি কি রকম চান?”

পাত্রপক্ষ বললেন—“সবশুদ্ধ হাজার পোনেরোর কম কিছুতে হবে না। আমার ত একটা Social status আছে। ছেলেও কিছু আমার কলম পেবা কেরানী নয়। আর কি বললেন, আমার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের ভাব আছে? তবে আবার ওসব মেয়ের বিয়ের ভাবনা কি মশাই?” সুরমার পিতা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করে উঠলেন; “সাবধান! আমি আপনার বাড়ী এসেছি, আমার যত খুশী অপমান করুন। কিন্তু অল্প মেয়েকে অপমান করার আপনার কোনও অধিকার নেই।” আর একটুও সেখানে না দাঁড়িয়ে তিনি তখনি বাড়ী ফিরে এসেছিলেন। তারপর সেই যে তিনি শয্যা নিলেন; সেই হলো তাঁর মৃত্যু শয্যা। মায়ের কাছ

থেকে সুরমা সব কথাই শুনেছিল পরে; কিন্তু মোহিত তখন শিবপুরে। সুরমা তখনই বুঝতে পারল, এই জগৎই মোহিত শিবপুরে গিয়ে আর তাকে চিঠি লেখে না। একালের সকল যুবকই রামচন্দ্রের মত পিতৃভক্ত কিনা? পিতার মৃত্যুর পর সুরমা তার ছোট ছোট ভাই বোন সহ মাকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে ডাক্তারী পড়ার জন্য ক্যালাকাটা মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হোল। পিতার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে মা তাকে সাহায্য করতে লাগলেন। তারপর সুরমা সসম্মানে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরী নিয়ে চলে এল, এই যুক্ত প্রদেশে। আশ্চর্য কলকাতায় চার বৎসর থাকা কালীন, মোহিতের সঙ্গে একবার দেখাও হয়নি। কোনও বান্ধবীর কাছে সে শুনেছিল, মোহিতের বিবাহ হয়েছে কোন এক ক্রোড়পতির কন্যার সঙ্গে। সুরমা তখন নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল। সুরমার আশা ছিল, হয়ত মোহিত একদিন, ওর কাছে আসবে, কিন্তু মোহিত এলনা। সেই মোহিত, সেই মোহিত, আজ এতদিন পরে ওর ভুলে যাওয়া স্মৃতির দ্বারা আচমকা আঘাত করল। কিন্তু না, সুরমা ওকে ক্ষমা করবেনা। ধীরে ধীরে সুরমা ঘুমিয়ে পড়ল। তার পরিশ্রান্ত মনে প্রেম, এবং প্রতিহিংসার ছবি পাশাপাশি স্বপ্ন হয়ে জেগে রইল সমস্ত রাত্রি।

পরের দিন বিকেল বেলা, সুরমা কলকাতা যাওয়া করল Child welfare, and maternity বিষয়ে ট্রেনিং নেওয়ার উদ্দেশ্যে। দেবী হয়ে গেলে পাঞ্জাব মেল ধরা হবে না। কাজেই সে ব্যস্ত হয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। গাড়ী যেই গেটের বাইরে বেরিয়েছে, একজন লোক ছুটে এসে গাড়ী থামিয়ে বললে, “একি কোথায় চললে রমা?” সুরমা তাকে চিনতে পারল, সে মোহিত; এখানকার এস, ডি, ও, সাহেব। সে গভীর মুখে বললে “কোলকাতায়”।

গাড়ীর মধ্যে ঝুঁকে পড়ে মোহিত বললে, “তোমাকে যে একবার যেতে বলেছিলুম, গেলেনা কেন রমা? আমাদের বাড়ীর-মেয়েদের দেখেছত তুমি? ওরা কি পারবে ওই মাহারা, ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখতে?” সুরমা কঠিন কণ্ঠে বললে, “কেন শিশুর ত বাবা জীবিত আছেন?” মোহিত বললে, “কেন রাগ করছ রমা? ভেবে দেখ তুমি, মায়ের কাজ কি বাবা কোনওদিন করতে পারে?”

স্বরমা বললে, “আমায় নতুন করে অপমান করার আপনার শুভ বুদ্ধিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটা মনে রাখবেন দয়া করে, আমি শিশুর মা নই”। বেদনা বিহবল মোহিত, হাত বাড়িয়ে স্বরমার হাত দুটি চেপে ধরে বললে, “আমায় ক্ষমা কর রমা, আমায় ক্ষমা কর। তোমার স্থানে তুমি ফিরে এস। তুমিই ওর মা। তুমিই ওকে বাঁচিয়েছ” ? বছরদিন পরে প্রিয়প্লশে ডাক্তার স্বরমার স্তপ্ত নারীষ সচকিত হয়ে উঠল। ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল, একটা নিভৃত গৃহপ্রান্ত, শিশুর কলহান্ত, বহু আকর্ষিত প্রিয় সঙ্গ। দূরে গেল হাসপাতাল, রুগী ও ওষুধ, স্তম্ভা। না স্বরমা আর পারে না, এ ভারবাহী জীবন ধাপন করতে। সে ক্লান্ত, সে পরিশ্রান্ত। তখনও মোহিতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে ধরা ওর হাত। এমন সময় ছাইভার তাগাদা দিল, “আর দেবী করলে পাঞ্জাব মেল ধরা

যাবেনা”। স্বরমা চমকে উঠল। ওর চোখের সামনে আবার জেগে উঠল, ওর বর্তমান। ও কোলকাতা যাচ্ছে আরও পড়তে। আরও বেশী টাকা উপায় করবে ও। বিধবা মাকে সাহায্য করবে, বোনের বিয়ে দেবে, ভাইকে লেখা পড়া শিখাবে; গৃহ বিলাস ওর জন্ত নয়। ওর জন্তই অসময়ে ওর পিতার মৃত্যু ঘটেছে। শানিত তরোয়ালের মত, স্বরমার কণ্ঠ ঝলকে উঠল, “আমার বাবার টাকা ছিলনা বলে তাঁকে আপনারা একদিন অকথ্য অপমান করেছেন। আজ আমার টাকা আছে, তাই আমিও আজ আপনাকে—বাকী কথাটা স্বরমা মুখে বলতে পারলনা। তার চোখের দৃষ্টিতে গভীর ঘৃণা ফুটে উঠল। স্বরমার গাড়ী চলে গেল। মোহিত সেখানে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

নীরব

রেণুকা আইচ, বি,এ

মৌন আমার সভাস্থল

থেকে গেছে গান কণ্ঠ নীরব।

বীণাখানি ঐ পড়ে আছে দূরে

স্বরহীন বীণা

করেছে মৌন আমার

অঙ্গন দ্বার।

যে সুরে ভরিত আমার সভাস্থল

যে সুরে খুলিত আমার অঙ্গন দ্বার

নীরব হয়েছে আমার সব কিছু যে রে

রুদ্ধ হয়েছে ভবন আমার।

স্বরহীন বীণাখানি আজ হয়েছে মলিন

জমেছে ধূলা প্রতিটি তারে

বাজে না বীণা

বাজে না সে সুর আর।

নীরব তাই সব কিছু মোর

অন্ধকারে আছে লীন

দীন হীন দেহটিতে

এরা সব বাইরে এলো।

শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়

ঘর আর বাহির—এই নিয়ে তোমার আমার জগৎ।
ঘরে আছে মাথা গৌজবার কুঠুরী, পা ছড়াবার দাওয়া, গল্প
করবার পুকুর ঘাট, চলাফেরা করবার প্রাঙ্গণ। ঘরে আছে
স্বামী-পুত্রের স্বস্তর ভাস্কর, আত্মীয়-পরিজন। ঘরে আছে
রাতের শয্যা, দিনের রান্না-ভাণ্ডার, ছপুয়ের স্বস্তি। ঘরে
আছে পতির সেবা, সন্তানের শুশ্রূষা, সামাজিক পূজা-পার্বণ।

আর বাইরে?—বাইরে আছে ছুটে বেড়াবার পথ-বিপথ,
নানান কাজকর্মের হৈ-হুল্লোড়, বিস্তীর্ণ ময়দান। বাইরে
আছে বন্ধু-বান্ধব, আলাপী প্রলাপী, সহায়-শত্রু। বাইরে আছে
রাতের বিরাম, দিনের রথযাত্রা, ছপুয়ের ক্লান্তি-ক্লেশ।

এই ঘর আর বাহির নিয়েই জগৎ। যারা ঘরে রইলোনা
বা থাকতে পেলো না বা থাকতে পারলো না—তারাই এলো
বাইরে। একটু খানি ছেড়ে অনেক খানির মধ্যে। কয়েক
জনকে ছেড়ে অনেক জনের মধ্যে। চিরচরিতকে ছেড়ে
অনাচরিতকে নিয়ে ঘর করবার চেষ্টা করতে।

ঘরে ছিলো যে সব মেয়ে তাদের জগৎ ছিলো স্বল্প-পরিমিত।
অবশ্য সেই স্বল্প পরিসরে গভীরতাও পেয়েছে কেউ
কেউ। সেখানে মেয়েরা বাপ-মা, স্বস্তর, ভাস্কর,
সন্তান-সন্ততি প্রভৃতির সেবায় শুশ্রূষায় একটু
জগৎকে পেলো। সেখানে তা'রা তালবাসলে, হয়তো
ভালোবাসা পেতো-বা। সেখানে তা'রা দুঃখ পেলে,
সুখও পেতো বা। সেখানে তা'রা যা হ'য়ে ছেলেমেয়ে
পালন ক'রে নিজ নিজ হৃদয়বৃত্তির স্ফুরণের সুযোগ পেতো।
সেখানে তা'রা বর্জ্যেরও কোনো কোনো সুবিধা পেতো।

যারা ঘরের মেয়ে তা'রা স্বস্তিতে থাকে। অবশ্য যারা
অভ্যাচারীর ঘরে গিয়ে পড়ে তাদের কথা ধরছি না। একদা
সারা দেশের মেয়েরা সকলেই প্রায় ঘরের মেয়েই ছিলো।
আজ দেখছি মেয়েরা বাইরেতেও এলো। আজ সহরের
পথে অনবগুণ্টিতা পথচারিণীকে দেখি, যানবাহনে
ত্রীড়াবিরহিতা মেয়েদের দেখি, সভাসমিতিতে চিকের
অস্তরাল আর প্রয়োজন হয়না তাদের।

আজ যাদের বাইরে দেখি সে সব মেয়ে প্রথম যখন বাইরে
এলো তখন হৈ হৈ পড়ে গেলো, ছি-ছি রটে গেলো।
বজ্রপতনমূর্ছিত রক্ষণশীল তখন বড় কষ্টই পেয়েছেন। আজ
পথচারিণী পাশের মেয়েটি অনেকখানি গা-সওয়া হলো, যান-
বাহনের পাশবর্তিনীকে সহজ চোখে চেয়ে দেখতে পারি,
সভাসমিতিতে তাদের না দেখলে একটা ফাকা ফাকা
লাগেও বা।

ওরা বাইরে এলো শ্রোতের বশে। এলো নিজের বা
আশ্রিতের জন্ত রোজগার করতে। জীবিকার প্রয়োজনে
হ'লো মাষ্টারনী, হাঁসপাতালের সেবিকা, উমেদার। চলচ্চিত্রে
অভিনয় দেখিয়ে বাইরের জগতের পুরুষলোকে খুসী
করলো, ঘরের মেয়েদের আমোদ যোগালো।

কথা হচ্ছে এরা কেন বাইরে এলো? ঘরের আঙিনা,
ঘরের দাওয়া, ঘরের-ভাণ্ডার ছেড়ে এরা বাইরে এল কেন?
এখানে হাটের ভিড়ে বহু মানুষের বৈশাঘ্যে সিতে ওদের
শুচিতা, ওদের শোভা ওরা বজায় রাখতে পারবে কি?
ঘরের ছোট পরিসরে আত্মীয়-পরিজনদের আদরে-মোহাগে
যে-মুষ্টিটিকে ওরা বিকশিত ক'রে ধ'রেছিলো তাকে কি আর
নগরের কোলাহলে সদর রাস্তার কলরবে খুঁজে পাবো?

না, পাবো না। ওরা এখানে শত কোলাহলে তুলসীমূলে
প্রদীপ দেবে না, স্বামীপুত্রের জন্ত সেবায় ব্যস্ত রাখবে না হাত
দুখানি, দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে সখীর সঙ্গে গল্প করতে করতে
প্রদীপের সলতে পাকাবে না।

পারবে কি করে? আর, পারবেই বা কেন? এরা
বাইরে এসেছে, এসে প'ড়েছে। একটিমাত্র ছেলেকে
রেখে যার স্বামী পরলোকে গেলো তাকে খাইয়ে পরিয়ে
লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে যে তাকে। ছেলেটিকে
মানুষ করবার হয়তো এর নেই কেউ, নয়তো যারা আছে
তা'রা খুসী মনে তা' করতে চায় না, নতুবা এই নারীই আর
পরের গলগ্রহ হ'তে পারছেন। স্বভাববশেই। তাই এই
বিধবা বাইরে এলো। যে-বিধবা নিঃসন্তান সে বাইরে

এলো আপন গরজে, আপন প্রয়োজনে। গলগ্রহ হ'তে চারনা সে, নয়তো গলগ্রহ হওয়ার মতো কেউ নেই তার, কিছা গলগ্রহ করতে নারাজ ওর আত্মীয়। তাছাড়া সারা জীবনটা তার মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে; একটা অবলম্বন যে চাই। তাই সে বাইরে এলো।

ঐ যে মেয়েটি শাড়ি পরে সিঁড়র পরে—সে-ও যে বাইরে এলো দেখছি। সে কেন এলো? স্বামী বুঝি পাগল? স্বামী বুঝি অত্যাচারী? অথবা স্বামীর সঙ্গে গরমিল বেয়েছিলো বুঝি? হয়তো সেই রকম একটা-কিছুই বা হবে। তখনকার কালের মতো মুখটি বুজে স্বামীর পদসেবা মাত্র সম্বল ক'রে চলবে না তার। তাই অন্তরাঙ্গার প্রয়োজনেই সে এলো বাইরে।

কিন্তু ঐ যে মেয়েটি কুমারী, ও কেন বাইরে এলো? ও কেন ঘর বাঁধুক না? বাঁধবে কি ক'রে? বাপ গরীব, গাছ কিনতে অক্ষম। নচেৎ নিজেকে বিক্রী করবে না এমন ভালো ছেলে পাওয়া গেলেও সে-সব ছেলে হয়তো বিয়ের ঝগাটে পা গলাতে নারাজ। হয় সে-ছেলে রোজগার করে কম, নয়তো স্বদেশীতে মেতে আছে। এমনো তো হতে পারে, বাইরে থাকতে থাকতে একদা শুভলগ্নে ও-মেয়ে স্বয়ংবরা হবে। তখন সে হয়তো চলে যাবে ঘর বাঁধতে। বাইরেতে তখন আর তার ভালো লাগবে না।

এমনিভাবে নানা পীড়নে প্রয়োজনে এরা সব বাইরে এলো। বাইরে এসে দেখলো ঘরের আঙিনা যতই মিষ্টি হোক, দুনিয়াটা ঘর ছাড়া আরো অনেকখানি জুড়ে। বাইরের মধ্যেও জগৎ আছে। এখানেও বৈচিত্র্য আছে, আকর্ষণ আছে। আপনার অজ্ঞাতেই এরা বুঝতে পারে যে ক্ষুদ্র পরিবারে না থাকলেও বৃহত্তর সমাজে তাদেরও স্থান আছে।

এরা সকলেই বৃহত্তর সমাজের মস্তবড়ো সদর রাস্তাটাকে চিনতে পারে না। এরা মাষ্টারনী হয়, সেবিকা হয়, চাকরী করে, কিন্তু ওদের ঘন প'ড়ে থাকে সোভাগ্যবতী অল্লনাদের জীবনের দিকে। সেই সোচাকের মধুনীড়টিকে না পেয়ে

তাদের অন্তর শুষ্ক হ'তে থাকে আর খানিকক্ষণের মতো তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চাকার চাকার ঘুরতে থাকে।

কিন্তু এদের মধ্যে বাঁরা ধরে ফেলতে পারে যে, দেশের প্রাণধারার একটি বৃহত্তর ক্ষেত্র এই বহির্জগৎ, তারাই সার্থক হয়। তারা বুঝে নেয় নারী জীবনের সার্থকতা যেমন সাবিত্রীতচারিণী কুলবধুরূপে, তেমনি সার্থকতা দেশের কর্মে নারীকর-প্রসারণে। তারা বুঝতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র বা বিভাসাগরের জীবন যতোখানি স্বস্তিরই হোক না কেন, শ্রীমতী য়ানী বেশান্ত অথবা গুরী নিবেদিতার জীবন তদগেফা চের বেশী সার্থক।

ঘর কৈরু বাহির, বাহির কৈরু ঘর—এই কথাটা বুঝবে এদের মধ্যে যারা, তারাই বাইরে আসার দাম পাবে, তাদেরই বাইরের আসা সার্থক হবে, তাদেরই জীবন ক্ষোভের না হ'য়ে সৌন্দর্যের হ'য়ে উঠবে।

এরা সব বাইরে এলো ঝড়ের ঝাপ্টায়। তারপর ঝড় বধন থেমে গেলো, গাছপালা স্থির হ'লো, নদী জল শান্ত হ'লো—তখন এরা চারদিকটা তাকিয়ে দেখুক। দেখুক বাইরে জগৎটা। দেখুক বহির্জগতের গভীরতর কর্মধারা। তাই দেখে দেখে মস্ত বড়ো জায়গার মস্ত বড়ো স্থান করে নিকু তারা।

এরা যারা বাইরে এলো তাদের জন্ম দেশের বৃহত্তর প্রাঙ্গণ খোলা রয়েছে। স্থান ক'রে নেওয়া নিজের নিজের চেষ্টার কথা, সাধনার কথা। "To be born woman is to know that we must labour to be beautiful." নারীত্বের সহজ অধিকার নিয়েই তৃপ্ত যারা, তারা দেহে নারী। কিন্তু দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নারীত্বের হ্রলভ অধিকার দখল ক'রে নিলো যারা, তা'রা অন্তরে নারী। নারীর আসন যেমন ঘরের আঙিনার পাশে আছে, তেমনি পাশে আছে নারীর আসন আঁতুর সংস্কৃতির মহত্তর প্রাঙ্গণে। নারীকে সেই স্থানটী খুঁজে নিতে হবে। She must labour to be beautiful.

ভালবাসা

শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমাতে আমি যেমন ভালবাসি
তুমি কি মোরে তেমনি ভালবাস ?
নয়নে মোর নিয়ত জলরাশি
তুমি ত বেশ মন্দ মুহূ হাঁস ।
আমার মত বাসিতে যদি ভাল
নিভিত কবে আঁখিতে তব আলো ।

ভাল যে বাসে সে জানে তার কথা
অন্তে ভাবে—এ-ও কি কভু হয় ?
প্রেমের প্রতীলাভ যে চির ব্যাধা
এ কথা কেবা করিবে প্রত্যয় ?
কমল চাও, কাঁটাটি লাগিবে না
বাসিবে ভাল, দুঃখ মানিবে না ।

যাহারা ভাবে, প্রেমোত্তে বড় স্ব্থ,
বাসিয়া ভাল হইতে সুখী, চায়—
মুখ তারি, বুদ্ধি কতটুক ?
শিশুর স্ব্থ শোলায় খেলনায় ।
দেখেনি আলো, তাই সে আলোয়ার
আলোক ভাবি তাহারি পানে ধায় ।

বাসিলে ভাল, চাহে না সেত কিরে,
পেলান কতখানি যে প্রতিদান,
বিচার সেথা চলে না চুল চিরে,
ওজন ক'রে প্রাণের পরিমাণ ।
দুঃখে চির চোখের জলে ভাসা ।
এই যে ব্যাধা, এই ত ভালবাসা ।

ভাল যে বাসে দুঃখ তার সাধী,
সিংহাসনে বসায়, সেই থেকে
কণ্টকেতে রাজমুহূট গাঁধি
নয়নজলে নিত্য অভিষেক ।
যাহার বাড়া বেদনা নাই ভবে
তারেই ভালবাসা যে কহে সবে ।

ভাল যে বাসে পতঙ্গ সে, জেন,
মহোন্মাদে আশ্রমে ঝাঁপ দেয়
মরণে মানে নবজীবন যেন,
পর্যাপ দিরা পরম-আয়ু নেয় ।
প্রিয়ের লাগি সকলি ডালি দিলে
প্রিয়েরে তবে হিরার পরে মিলে ।

“যে নদী মরুপথে হারাল ধারা”

শ্রীআরতি দত্ত

কতগুলি পুরনো দিনের স্মৃতি আছে, যা কখনই ভোলা যায় না। যতই সেগুলিকে ভোলবার চেষ্টা করা যায়, ততই যেন জুঃস্বপ্নের মত তারা মনকে অঙ্গুসরণ করে ফেরে।

যে কথা আজ বলতে যাচ্ছি, তা-বহুদিনের পুরনো ঘটনা; তবু সে কথা এত স্পষ্টভাবে কেমন করে আমার স্মরণে রয়ে গেছে—এইটাই আশ্চর্য্য। এ ঘটনার পর বহুদিন অতীত হয়ে গেছে, কত বিচিত্র অল্পভূতির মধ্য দিয়ে আমার জীবন কেটেছে; কখনও আনন্দ, কখনও বা দুঃখ ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে জীবনপথে কতবার; তবু এমন একটি দিনও যায়নি, যেদিন ক্রোসেটের মুখ আমার একবার অন্তত মনে পড়েনি। আজও আমার মনশ্চক্ষে তার কল্পনামুখখানি ভেসে ওঠে স্পষ্টভাবে, যদিও তাকে আমি দেখেছিলাম অনেক, অনেক দিন আগে, তখন আমার বয়স দশ বারো বছরের বেশী নয়।

ক্রোসেটের উপজীবিকা ছিল সেলাই করা। প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার সে আমাদের বাড়ী আসতো, কাপড় সেলাই করতে। আমরা থাকতাম এক মফঃস্বল-সহরে চিত্র-বিচিত্র, উঁচু ছাত্তাওয়া পুরনো আমলের একটা বাড়ীতে। সে সহরটিকে বড় ধরণের গ্রামই বলা চলে, তবে সহরের অল্পকরণে কয়েকটি প্রমোদশালা ও দোকান প্রভৃতি ছিল। আর ছিল গ্রামের মাঝখানে একটি বড় গীর্জা।

প্রতি বৃহস্পতিবার, ক্রোসেট আমাদের বাড়ী আসতো সকালবেলা সাড়ে ছটা, সাতটার সময় এবং একটি নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে সে তার কাজ শুরু করতো। সে দেখতে ছিল রোগা লম্বা আর তার গায়ে খুব লোম ছিল, বিশেষ করে তার মুখে। মুখের সর্ব্বত্রই তার লোম ছিল এবং তার ভুরুহুটি এত মোটা ও লোমবহুল ছিল যে দেখলে মনে হতো কে যেন ভুল করে তার কপালে একজোড়া গৌরবসিঁয়ে দিয়েছে।

সে একটু খুঁড়িয়ে চলতো কিন্তু তার চলন ঠিক খোঁড়া

মানুষের মত ছিল না; তাকে দেখলে আধডোবা জাহাজের কথা মনে হতো। যখন সে তার ভাল গায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতো, তখন তাকে বেশ সোজা দেখাতো; তারপর চলতে আরম্ভ করলেই তার সমস্ত শরীরটা হঠাৎ একদিকে ভুয়ে পড়তো অনেকখানি। তখন তাকে বাড়ির দিনে সমুদ্রের মধ্যে জাহাজের মত দেখাতো। মাথায় সে একটি সাদা টুপি পরতো, তার রিবনটি চলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দক্ষিণে জ্বলতে থাকতো।

আমার ক্রোসেটকে খুব ভাল লাগতো। ঘুম থেকে উঠেই আমি সেই নির্দিষ্ট ঘরখানিতে গিয়ে দেখতাম ক্রোসেট কাজ করছে। শীতকালে ঘরটি ঠাণ্ডা হয়ে থাকতো, আমি গেলেই সে আদর করে আমাকে তার কাছে বসাতো। তার দীর্ঘ, শীর্ণ আঙ্গুল দিয়ে সে সেলাই করতো, আর আমাকে গল্প বলতো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিশক্তি কমে এসেছিল, তাই চোখে তার মোটা বড় বড় কাঁচওয়া চশমা থাকতো, আর তার ভেতর দিয়ে ক্রোসেটের চোখ দুটো খুব বড় মনে হতো আমার কাছে।

অনেকদিন হয়ে গেছে, তার সব কথা আমার মনে পড়ে না; তবু আমার কিশোর মনেও একটা ধারণা হয়েছিল তাকে দেখে, আর তার কথা শুনে যে ক্রোসেট গরীব হলেও তার মনটা উদার। সে আমাকে গল্প বলতো কেমন করে গ্রামের গোয়াল থেকে একটা গরু পালিয়ে গিয়েছিল। তার পরের দিন অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল যে দুরের কারখানার সামনে দাঁড়িয়ে গরুটা চিমনি থেকে ধোঁয়া বার হওয়া দেখছে। আর একবার গ্রামের গীর্জার সিঁড়ির উপর একটা মুরগীর ডিম পড়ে ছিল। কে জানে ডিমটা কি ভাবে এসেছিল সেখানে, কেউ কিন্তু প্রথমে ভেবে পাচ্ছিল না যে কিসের ডিম সেটা। আর একবার কি ভাবে গ্রামের ডাক্তারের কুকুর প্রায় দেড় মাইল দূর থেকে তার প্রহর চুরি বাওয়া কোটটা খুঁজে এনেছিল।

রোদ্ধুরে যখন শুকছিল তখন কে যেন সেটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। এই অতি সাধারণ গ্রাম্য ঘটনার টুকরো-গুলি সে এত সুন্দর করে বলতো যে, আমার মনে হতো যেন সেগুলি এক একটি ছোট নাটিকার দৃশ্য, নয়তো সেগুলি যেন কোন অপূর্ব, রহস্যময় কবিতার অসমাপ্ত অংশ। যখন সন্ধ্যাবেলা আমাকে আমার মা কোন প্রসিদ্ধ শিশু সাহিত্যিকের রচিত গল্প বলতেন, তখন এই গ্রাম্য রমণীর গল্পের কাছে সেগুলি প্রাণহীন ও বর্ণবর্জিত বলে মনে হতো আমার।

সেদিনও ছিল বৃহস্পতিবার,—সেদিনের ছোট ছোট ঘটনাগুলি আজও স্পষ্ট আমার মনে আছে। সারা সকাল আমি ক্রোসেটের কাছে গল্প শুনেছিলাম। খাবার পরে সবাই তখন বিশ্রাম করতে গেছে, চারিদিক নিরুন্ম হয়ে এসেছে। আমি বাড়ীর পেছনের জঙ্গলে বাদাম কুড়োচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, যাই ক্রোসেটের সঙ্গে একটু গল্প করে আসি। এই ভেবে বাদাম কুড়নো স্থগিত রেখে, আমি দৌড়ে ওপরে গেলাম, সেইখানে একটা ঘরে ক্রোসেট বসে সেলাই করতো।

ঘরের দরজা খুলে দেখলাম মেজের উপর তার চেয়ারের পাশে ক্রোসেট পড়ে রয়েছে। তার মুখ মাটির দিকে উণ্ডু করা আর হাত দুটো সামনের দিকে ছড়ানো; একহাতে তার তখনো ছুঁচটা ধরা রয়েছে আর অস্ত্র হাতে রয়েছে আমারি গায়ের একটা সাট। তার স্বস্থ পাটি চেয়ারের নীচে রয়েছে আর চশমা জোড়া দেওয়ালের ধারে পড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে আমি চীৎকার করে বেরিয়ে এলাম। চারিদিক থেকে সবাই ছুটে এলো এবং খানিক পরে শুনতে পেলাম যে সে মারা গেছে।

সেদিন আমার কিশোর মনে যে কি নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলাম তা আজ আমি বর্ণনা করতে পারি না। আমি আশ্তে আশ্তে নীচে বসবার ঘরে নেমে এলাম ও ঘরের এক কোণে গিয়ে একটা কেদারায় বসে ক্রীদতে লাগলাম, এইটুকুই কেবল মনে আছে। সেখানে আমি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ছিলাম, কারণ ক্রমে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। তারপর কে যেন আলো হাতে ঘর ঢুকলো, কিন্তু আমাকে দেখতে পেলোনা; আমি শুনতে পেলাম পাশের ঘরে আমার বাবা আর মা আমাদের গৃহচিকিৎসকের সঙ্গে কথা বোলছেন।

তার গলা চিনতাম।

ডাক্তার এই দৃষ্টান্তের কারণ বাবা মাকে বলছিলেন, কিন্তু আমি তার কিছুই বুঝলাম না। তারপর নানা কথার পর তিনি যা বললেন তা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে এবং যুত্যান্নিন পর্যন্ত তা মনে থাকবে। এত স্পষ্ট মনে আছে বলেই, তাঁর প্রতিটি কথা আমি আজ বলতে পারছি।

তিনি বললেন, “আহা! বেচারী ক্রোসেট, আমি যেদিন প্রথম এ সহরে আসি, সেইদিনই ওর পা’টি যথম হয়। আমি তখন সবমাত্র এসে পৌঁছেছি, হাত মুখ ধোবারও সময় হলোনা, তখনি বেরতে হলো রোগী দেখতে, কারণ ওর অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল।”

“ক্রোসেটের বয়স তখন সতেরো। ও দেখতে খুব সুন্দর ছিল। ওকে যারা আজকাল শেষ বয়সে দেখেছে, তারা বিশ্বাস করতে পারবে না যে ও কোনকালে দেখতে এত ভাল ছিল। আমি এ ঘটনা কোনদিন কাউকে বলিনি, বস্তুত এ ঘটনা আমি ছাড়া জানে কেবল আর একটি লোক, সে বহুদিন এ সহর ছেড়ে বিদেশে চলে গেছে। এতদিন কাউকে বলিনি; কিন্তু আজ ক্রোসেট বেঁচে নেই তাই এ কাহিনী বলতে কোন বাধা দেখছি না। একটি অল্প বয়সী যুবক তখন স্থানীয় স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হয়ে এসেছিল। সে খুব সুপুরুষ দেখতে ছিল, তাই গ্রামের কমবয়সী মেয়েরা সবাই তার রূপমুগ্ধ ছিল। সে কিন্তু কোন মেয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দিত না, তাদের প্রতি তার একটা অবহেলার ভাব ছিল। এর একটা কারণ অবশ্য ছিল। স্কুলের হেড মাষ্টার মশাই ছিলেন খুব রামভারি লোক; সে তাঁকে অত্যন্ত ভয় করতো; তাই পাছে তার জ্ঞানমের ক্ষতি হয় ওপরওলার কাছে—এই ভয়ে সে খুব সাবধানে চলতো।

হেড মাষ্টার মশাই এর বাড়ীতেও তখন ক্রোসেট সেলাই-এর কাজ করতো। এই সুদর্শন যুবক মাষ্টারটি ক্রোসেটের প্রেমে পড়লো এবং যে লোক অস্ত্র বহু মেয়েব প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে এমন লোকের ভালবাসা পেয়ে ক্রোসেটও খুব গর্ব অনুভব করলো। ক্রমে ক্রোসেটও তাকে ভালবাসলো। শেষে একদিন সেই যুবকটি সন্ধ্যাবেলা ক্রোসেট যখন কাজ শেষ করে বাড়ী ফেরে সেই সময়

স্থলবাড়ীর দোতালার পেছনে হুজনে দেখা করবে বলে ক্লোসেটকে রাজি করালো।

সেই কথাঅনুসারে ক্লোসেট সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী না গিয়ে গোপনে বাড়ীর পেছনে যে ঘরে খড় থাকতো, সেইখানে অন্ধকারে তার প্রেমিকের জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলো। খানিক পরে সেই যুবকটি এল এবং সবেমাত্র সে ক্লোসেটের কাছে নানা মনোমুগ্ধকর প্রেমের কথা বলতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় বেশি হয় কথার আওয়াজ পেয়ে হেডমাষ্টার মশাই ঘরের দরজা আঁধাখানা খুলে সেই মাষ্টারটির নাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, “একী, তুমি এই অন্ধকারে কি করছো?” ধরা পড়েছে বুঝতে পেয়ে যুবকটি তার উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেললো ও খতমত খেয়ে বললো “আমি এখানে এসেছি এই খড়ের উপর শুয়ে একটু বিশ্রাম করতে।”

ঘরটি ছিল মস্ত বড়, খড়ে প্রায় ভরা, তাই ঘুটঘুটে অন্ধকার। যুবকটি ভীত মেয়েটিকে ক্রমেই কোণের দিকে ঠেলে বলতে লাগলো, “যাও শিগিরি কোথাও লুকোও। তা না হলে আমি ধরা পড়ে যাব ও আমার তাহ’লে ভয়ানক ক্ষতি হবে। তাই যে করে পারো, যেখানে হোক লুকোও।”

হেডমাষ্টার মশাই তার সেই ফিস্‌ফিসানি শুনে বললেন, “ও বুঝেছি তুমি তাহ’লে একা নও।”

“না আমি এখানে একা আছি।”

“কখনও নয়, কারণ তুমি কথা বলছে।”

“না, আমি শপথ করে বলছি, এখানে আর কেউ নেই।”

“আচ্ছা, আমি দেখছি তুমি কেমন একা রয়েছো” বলে হেডমাষ্টার ভাল করে তাল্লা বন্ধ করে আলো আনতে গেলেন।

যুবকটি ছিল অত্যন্ত কাপুরুষ, সে ভবিষ্যতের চিন্তায় ও দুর্গামের ভয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠলো। সে হঠাৎ রেগে গিয়ে বলতে লাগলো, “যে করে পারো তুমি লুকোও, যাতে তোমাকে না দেখতে পায়। তা না হ’লে আমার চাকরী যাবে, আর কোনদিন আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে

পারবোনা। তোমার জন্তে আমার সব ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে তোমাকে তাই লুকোতেই হবে।”

তালার মধ্যে চারি ঘোরাবার শব্দ তারা শুনতে পেলো। তখন ক্লোসেট দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে নিম্ন অঞ্চল দৃঢ় কর্তে কেবল বললো, “তুমি বেরিয়ে আমাকে এসে নিয়ে যোয়ো।” এই বলে সে সেই উচ্চ জানালার উপর থেকে অন্ধকারের ভেতর লাফিয়ে পড়লো।

হেডমাষ্টার মশাই ঘরে অল্প কাউকে দেখতে না পেয়ে খুব আশ্চর্য হলেন। এরও প্রায় পরতাম্রিশ মিনিট পর যুবকটি এসে আমাকে এই ঘটনাটি বলে। মেয়েটি একই ভাবে দেয়ালের ধারে পড়েছিলো, কারণ দোতালার উপর থেকে পড়ে সে আর উঠতে পারেনি। তখন অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল; তার মধ্যে সেই দুর্ভাগিনী মেয়েটিকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসি। তার ডান পা খানি তিন জায়গায় পুঁব খারাপভাবে ভেঙেছিলো! জায়গায় জায়গায় মাংসের ভেতর দিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছিল। সেই নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে সে একবারও আর্দ্রবাদ করেনি; কান্নার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগের কথা বলেনি। কেবল একবার আশ্চর্য রকম সংযমের সঙ্গে সে বলেছিল “আমার উপযুক্ত শাস্তি আমি পেয়েছি।” আমি তার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলাম ও ক্লোসেটের বন্ধ বান্ধবদের জানালাম যে আমার বাড়ীর সামনে একটা গাড়ী অন্ধকারে ক্লোসেটকে ধাক্কা দেয়। ফলে তার একটি পা জখম হয়ে জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে গেছে। সবাই আমার কথা বিশ্বাস করেছিল এবং তারপর প্রায় একমাস ধরে পুলিশের লোকেরা বুথাই সেই কল্লনাগ্রন্থত গাড়ীর চালককে ধরবার চেষ্টা করেছিল।

আমার কাহিনীর সমাপ্তি এইখানেই। আমার কেবল মনে হয় যে ক্লোসেট সত্যিকারের বীর নারী ছিল। ইতিহাসের পাতায় যাদের কীর্তিকাহিনী লেখা হয়, তাদেরই মনের দৃঢ়তা ও শক্তি নিয়ে এই মেয়েটি জন্মেছিল। সেই তার জীবনের

একমাত্র প্রেম, সে-স্বত্বাধীন পর্যন্ত অবিবাহিতা ছিল। সমস্ত
জীবনই তার একটানা নীরব ত্যাগের কাহিনী।

আমি তাকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করতাম, তাই আপনাদের
কাছে এই ঘটনা বললাম। সে বেঁচে থাকতে কোনদিন
কাউকে একথা বলিনি, কেন তা তো বুঝতেই পারেন।”

এই বলে ডাক্তার চুপ করলেন, না কঁদতে লাগলেন,

আর বাবা কি যেন বললেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। তারপর
তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি তেমনিভাবে
অন্ধকারে বসে রইলাম। খানিক পরে অনেক লোকের
শব্দ শোনা গেল, সিঁড়ি দিয়ে কি যেন নামানো হচ্ছে।

তারা ক্লোসেটের মৃতদেহ নামিয়ে আনছিল।

ডাক

(কবিতা)

শ্রীমতী বাণী রায়

আমারে সে কবে দিবে ডাক ?

বাধাহত তার সেই ডাক

এক নিমেষেতে জানি, হ'বে সুপ্রকাশ।

আমারে সে কবে দিবে ডাক ?

হৃদয়ে বৈশাখ

বরষার সজল ধারার

মোহন শীতল স্পর্শ পাবে অকস্মাৎ।

অলস মস্তিষ্কমাকে তস্ত্রাহায়া সম

নামিবে গধুর শান্তি কবে দিনে মম ?

কবে সে প্রতীক্ষা অন্তে উদিবে প্রভাত ?

আমারে ডাকিয়া নেবে চিরচাওয়া ডাক ?

এলোমেলো জটে বাঁধা দিনযাত্রা হায়,

ধুলায় ঝরিয়া ফুল ধূলাতে মেশায় ;

জীবন বহিয়া যায়—যায় আজও যায়,

বৈরাগ্য-বিশীর্ণ রূপ ব্যথা বেদনায়।

প্রহরের শূন্য-দীর্ঘ কক্ষরেখা 'পরে

শূন্য এ মনের গান বাজে নিরাশায়—

ডাক দাও, দাও প্রিয়, দিন বহে যায়।

মহিলা কবি

লীলা দেবীর কাব্য আলোচনা

বাংলাদেশের মহিলা কবিদের কথা আলোচনা করিতে হইলে যে ইতিহাসের ধারা অবলম্বন করিতে হয়, সে ইতিহাসে সকলের আগে নাম করিতে হয় রামী ধোপানীর। কবি চণ্ডীদাসের সহিত রামীর নাম এমন ভাবে জড়াইয়া আছে যে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যে কেহ আলোচনা করিবেন তাঁহাকেই রজক কত্যা রামীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে হইবে। চণ্ডীদাসের বিরচিত রাগাঙ্গিকা পদগুলি প্রায় রামীকে লইয়াই লেখা। ‘শুন রজকিনী রামী, ও দুটি চরণ নীতল জানিয়া শরণ লইছ আমি।’ ‘রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়।’ ‘তুমি রজকিনী আমার রমণী তুমি হও পিতৃমাতৃ। ত্রিসন্ধ্যা যখন তোমারি ভজন তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।’ এই ভাবে কবি চণ্ডীদাস যে মহিলাকে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালের বৈষ্ণব কবিগণ চণ্ডীদাসের নামের সহিত সেই রামীর নামও উল্লেখ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

রামী ছিলেন প্রকৃত প্রেমিকা। রামী বলিয়াছেন—
“যে ব্যক্তি রাজপাটে বসিয়াও প্রেমের আশ্বাদ পায় নাই, তাহার জীবন নিরর্থক। রামীর পদাবলীর মধ্য দিয়া যে করুণ সুর সুরমন্দাকিনীর মত বহিয়া চলিয়াছে—তাহা বিরহ-বেদনার সুর—

“কোণাথ যাও হে, প্রাণবধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর রস বুক ধৈর্য ধরিতে নারি।।

পরবর্তীকালের মহিলা কবি

এই সুরই যুগে যুগে বঙ্গের মহিলা কবিদের কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে। সেই চতুর্দশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী, গঙ্গাদেবী প্রভৃতি বহু মহিলা কবি কবিতা পুষ্প দ্বারা সাহিত্যের মালঞ্চখানি সাজাইয়াছেন। তাহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবি, প্রসন্নময়ী,

গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায়, মানকুমারী, স্বর্ণকুমারী প্রভৃতির নাম সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহাদের আদর্শে ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং বিশেষতঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের যে সকল মহিলা কবি বঙ্গলক্ষ্মীকে করিয়াছেন ঐশ্বর্যশালিনী, তাঁহাদের মধ্যে মহিলা কবি লীলাদেবীর নাম আমরা সগৌরবে উল্লেখ করিতে পারি। পঁচিশ বৎসর পূর্বে তিনি ছিলেন, বয়সে সর্বকনিষ্ঠা হইলেও প্রতিভাশালী কবি।

লীলাদেবী

লীলাদেবীর কাব্যগ্রন্থ কিশলয় পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। একজন সমালোচক এই কাব্যগ্রন্থ খানা সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন :—
“আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে মহিলা কবিগণের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী ও কামিনী রায়ের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা বাংলা সাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপ। এ যুগের কাব্য সাহিত্যে তাঁহাদের নাম স্মরণীয়। শ্রীমতী লীলাদেবীর প্রতিভা যে কালে ইহাদিগের দ্বারা উচ্চস্থান অধিকার করিবে, বর্তমান কবিতাগুলিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।” এই অভিমত যে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে প্রমাণিত হইয়াছে আমরা কবির কাব্যালোচনার দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

কবি ও কাব্যের নিজস্ব সুর

প্রত্যেক কবিরই একটা নিজস্ব সুর থাকে। এবং প্রত্যেক কবিরই প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় তাহার কাব্যে। লীলাদেবীকেও আমরা তাঁহার লিখিত কাব্যের মধ্য দিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রতিভা কাব্য প্রকাশের মূল উৎস। এমার্সন বলিয়াছেন :—“The poet is the seer and the sayer. কবি হইতেছেন সৌন্দর্যের, ভাবের এবং

ভবিষ্যতের প্রধান দ্রষ্টা। সে দিক দিয়া বিচার
করিতে গেলে কবিকে বলা চলে জনগণের মানসলোকের
ভাবব্যাক্যাতা প্রতিনিধি। সাধারণ মানুষের মন যে ভাব
ও রূপের সম্মুখে উন্মুখ-চিত্তে দাঁড়াইয়া থাকে, রূপ, রস
ও মাধুর্য্যকে উপলব্ধি করিতে পারে না, কবি তাহার মধ্য
দিয়াই তাঁহার মানসবলে নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন
মাধুর্য্যকে অল্পভব করেন। পৃথিবী যেন তাহার অপূর্ণ রূপ
ও প্রকৃতি লইয়া কবির জন্তই অপেক্ষা করে। কবির
চিন্তাগগনে রামধনুর সপ্তরশ্মির ছায়া তখনই তাহাতে
প্রতিফলিত হয় নানা বর্ণ, নানা গন্ধ, নানা রূপ, সৌরভ ও
মাধুর্য্য। তখন কবির কণ্ঠে শুনিতে পাই :

যে গান বাজে ফুলের বাসে
যে গান কাঁপে পাতার গায়,
যে গান ভাসে চোখের পাশে
যে গান ফেরে মেঘের ছায় !

যে গান দোলে হাওয়ার তলে
তারায় তারায় যে গান চায়।
যে গান কাঁদে নদীর জলে
সে গান অরূপ বন্ধু গায়।

প্রেম ও প্রকৃতি

তখন দেখিতে পাই প্রকৃতি তার রূপমাধুর্য্য পরিপূর্ণ
ভাবে কবির সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তখনই কবির
মানসনেত্র হয় উদ্ঘাটিত, তখন কবি মুক্তকণ্ঠে বলেন :

এলিয়ে দিল ঘরের আগল
ঝিলিক্ মারা পাগল বাদল
তাই চোখে নয় সবার প্রাণে
দৃষ্টি এবার পাওয়া।
চোখের ভিতর যে চোখ আছে
সবার ভালে সবার কাছে,
সেইখানেতে দৃষ্টি রেখে
জীবন আমার চাওয়া।

গীতি ধর্ম্মী কবির কাছে তখন আপনা হইতে ধরা দেয় বিশ্ব
প্রকৃতি :—তখন কবি অল্পভব করেন

মিষ্ট শ্রামল অশোক বকুল
কৃষ্ণ শ্রামল তরু ;
মেঘের পাটল লোহিত শীতল
অমল ধবল কালো,
এই যে আকাশ এই যে বাতাস
এই যে কনক আলো।

গীতি ধর্ম্মী কবি

মধুর ধন দখিণপবন
কুমুম বিকচ শোভা

তপ্ত দারুণ ভীষণ জ্বলন

থর রবি প্রভা,

হাচাকার ভরা মরীচিকাময়

ওই সাহারার মরু !

সকলই শুধু অল্পভূত হইয়াছে কবির প্রাণ দিয়া। তখনই
কবির কাছে প্রতিভাত হইয়াছে এক নবীন রসসাগরের বিপুল
কল্লোল।

প্রাণের প্রকৃত রূপ, প্রকৃত জ্যোতিঃবিভাষিত অখণ্ড যোগসূত্র
যাহা সমস্ত নিখিল জগতের সহিত গ্রথিত রহিয়াছে সেই মহান
অজ্ঞেয় সৃষ্টি রহস্য ও শক্তি, তাহা কি শুধু বাহিরের প্রেরণা ?
তাহাও নয়, তাহা যে

নয় শুধু নিঃস্বাস, আলো তার জ্যোতিঃ

নয় তেজোময় শুধু কাল ও নিয়তি,

নয় শুধু সুবিরাট অসীম অক্ষয়

অজর অমর চির অখণ্ড অব্যয়

নয় শুধু চিং, সৎ, আনন্দ অপার।

প্রাণ শুধু এই নয় আছে রূপ তার

আছে রঙ আছে আঁধি অধর শ্রবণ !

সে কিরূপ ?

আছে আছে সুবিলাস লীলার কমল,

ললিত নাচের লয় রূপবধু মল

বাজে বাঁশী পড়ে তাল খেলে ক ঢেউ,

শুনেও না শোনে কেহ শোনে কেউ কেউ

প্রাণময় সে তবু আছে অন্তর

মানব ও প্রকৃতি

এই অন্তরের গুহ পরিচয় হইতেছে প্রকৃতির সহিত। রবীন্দ্রনাথ

যেমন প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাবের মধ্যে তাঁহার
সৌন্দর্যের আরাধ্য। দেবীকে আহ্বান করিয়া সর্বত্র দেখিতে
পাইয়াছেন, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তে কতই না
আয়োজন, কখনও বৈশাখের খর-রোদ্র, কখনও বর্ষার সঘন
সজল মায়া, কখনও সেকালী মাগো চারিদিক সুরভিত, হেমন্ত
ও শীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন আকাশ, নানাদিকে নানাভাবে
সর্বত্র সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি, তেমনি কবি লীলামবীও
প্রকৃতির বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে গীতের সুরে সুরে
করিয়াছেন রূপের পূজা। কখনো বলিয়াছেন :

চাঁদের আলো ! বনের কুসুম ! দখিণবায়া !

তোমরা আমার কে হও আজি বলবে তারা ?

সুধার ধারে মাতাল করো কুসুমনাথ !

মলয় অনিল ! সুবাস গানে ভরাও রাত !

আষাঢ়ের সেই সজল কাজল মেঘের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ কবি
বলিতেছেন :

আষাঢ় দিনের সজল কাজল বাদল মেঘ !

ঝিলিক্ ঝলস্ ! দেয়ার গুরু ! ঝড়ের বেগ !

কদম কেয়া কুটজ ! বানির আবার পাত !

সিক্ত মাটির গন্ধ ! ওগো ! আঁবণ রাত !

[আঁবণের ভরা বরষার কবির গান চিত্তমনোহারী !

সেইতো আঁবণ !

সেই তো মেঘের কোলে, আবার বিজলী দোলে,

অভিনব ঘনাগম

গুরু গরজন !

সজল জলদ হের, মেলিয়া কলাপ মরি !

ষড়্জ কেকার সাথে

শিখরি নর্তন !

থেকে থেকে ডাকে দেয়া, সুবাস ছড়ায় কেয়া

কেতকীর বেণু মাখি

মহুর পবন !

সেইতো আঁবণ !

* * *

বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের—

“বার বার জলধর-ধার।

ঝঞ্জা-পবন বিধার ॥

ঝলকত দামিনী মালা।

ঝঙ্কারি বৈ গেল বালা ॥

* * *

ঝন ঝন বজর নিশান

ঝাঁজি রহত দুহু কান

মনে স্মরণ করাইয়া দেয় নাকি ? লীলা দেবীর ‘ঝড়’ কবিতা
উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির সঙ্গে কবির অন্তরের যে নিগূঢ়
সম্বন্ধ প্রত্যেকটি কবিতার ভাবের অভিব্যক্তিতে তাহাই
সুপ্রকাশিত। মানস জগৎ অতিক্রম করিয়া অসীমের প্রসারে
মুক্ত বিচরণ—সেকি মুক্ত উদার ভাবের প্রকাশ !

মাহুঘের জীবনের মধ্যে যে লীলা বৈচিত্র্য চলিতেছে, সুখ
দুঃখ হাসি কান্না, তাহা প্রত্যেকের জীবনেই ঝড়ের মত আসিয়া
আবির্ভূত হয়। তখন কি মনে হয় না এই যে জীবন নানা বন্ধন
নানা সংকীর্ণতা, নানা দ্বিকার ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া
চলিয়াছে তাহাকে অপসারিত করিয়া বলি

“যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে

সে পথ-প্রান্তের

এক পার্শ্বে রাখ মোরে নিরখিব বিরাট স্বরূপ

যুগযুগান্তর !” (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ গুপ্ত

শেষ রাগিনী

ত্রিদীপ্তি দেবী

(১)

একখানি বড় ঘর। সাজ সজ্জা দেখে মনে হয় ঘরখানি কোন বড়লোকের গ্রন্থাগার। ঘরের একপাশে জানালার কাছে ছিল একটি লেখবার টেবিল। তারই সামনের চেয়ারখানি অধিকার করে বসেছিলেন ঘরের মালিক। বয়স হ'বে চল্লিশের কাছাকাছি, স্তম্ভ দেহ, চেহারাও স্তম্ভী, কিন্তু মুখের উপর কিসের একটা ছায়া পড়েছিল, সে ছায়া বোধ হয় কোন দিনও সরবার নয়।

এক মাসও হয়নি সনৎ মুখার্জি তার স্ত্রীকে বিসর্জন দিয়ে এসেছে। সবই শেষ হয়ে গিয়েছে, কেবল তার স্মৃতিটুকু জাগিয়ে রাখবার জন্ত রয়ে গিয়েছে তার দশ বছরের মেয়ে ললিতা। মায়ের সমস্ত সৌন্দর্যটুকু অপহরণ করে নিয়েছিল এই ছোট্ট মেয়েটি। সেই চোখ, সেই হাসি, সেই রং, সেই রেশমের গুচ্ছের মত কাল চুল, কোনটিই বার পড়েনি। সনৎ মেয়ের দিকে চায় আর ভাবে তার স্ত্রীর এই যে শ্রেষ্ঠ দান, একে মাছব করবে সে কেমন করে? একা এই ভাবা মন নিয়ে সে কেমন করে একে তার মার উপযুক্ত করে তুলবে?

ললিতার শিক্ষা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তাঁরা দুজন আলোচনা করতেন। ললিতার মা বলতেন—পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যা ভাল আছে তা ললিতাকে শেখাব, কিন্তু তা বলে আমাদের নিজের দেশের শিক্ষাগুলি সব বাদ দেব না। ললিতার বাবা হেসে বলতেন—“হৃদিকের চাপে ও বেচারী যে মারা পড়বে।” ললিতার মা কিন্তু তা স্বীকার করতেন না। তাই একদিকে মেম রেখে ইংরাজি কথাবার্তা কায়দাকায়দ শেখাতেন, আবার অন্যদিকে মাটির রেখে বাংলা সংস্কৃতও শেখাতেন। নিজে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে অল্প অল্প ঘর সংসারের কাজ কর্মও করাতেন। চাকর দাসদাসী থাকা সম্বন্ধে যেমন তিনি সংসারের সব কাজ নিজ হাতে করতেন ইচ্ছা ছিল মেয়েও যেন বড় হয়ে সেইরকমই করে। তাঁর এই শিক্ষা পদ্ধতির ফলটি তিনি দেখে যেতে পারলেন না। বড় সাধ ছিল ললিতার শিক্ষা দীক্ষার দরুণ স্বামীর কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন করবেন, কিন্তু তাঁর কাজ অসমাপ্তই রয়ে

গেল। এখন এই অসমাপ্ত কাজটিকে সমাপ্ত করবার গুরুভার এসে পড়ল সনতের মাথার উপর। ললিতার মার কোন ব্যবস্থাই তিনি বদলালেন না; কেবল অন্তঃপুরের শিক্ষার ভার তিনি দিলেন তাঁর বিধবা বোন ও আশ্রিতা হরিমতির উপর। প্রথমে মনে হয়েছিল সব বুঝি অচল হয়ে যাবে; কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে দেখলেন সবই একরকম গুছিয়ে এসেছে, কেবল পূর্ণ হয়ে আসেনি তার জীবনের শূন্যতা। দিন চলে যায়। তার গতিরোধ করতে পারে না কেউ। কার জীবন শূন্য হ'ল কার জীবন পূর্ণ হ'ল সে সবেয় ধার সে ধারে না। দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর ঘুরে গেল। ললিতা তার মৃত মার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শৈশব ছেড়ে কৈশোরে পা দিল। এই সময়ে তার বাপের জীবনেও বদল ঘটল।

সনতের অগাধ সম্পত্তি, কিন্তু ভোগ করবার মধ্যে ই একটা মেয়ে। মেয়ে পরের জিনিষ। আজ বাদে কাল বিয়ে হয়ে সে-চলে যাবে, বাপের নামও সে রাখতে পারবে না, পিতৃপিতৃ সে-দিতে পারবে না, মার থেকে এতগুলো টাকা সে পৌছে দেবে খন্ডের বংশে। তার চেয়ে সনতের আর একবার বিয়ে করা উচিত। কিই বা বয়স হয়েছে? আজকাল এই বয়সে প্রথম বারই সবাই বিয়ে করে। বেশ একটি বড় সড় দেখে মেয়ে বিয়ে করে আনলে লিতাকে দেখতে স্তনতে পারবে আর সনতের সঙ্গীও হবে, আর ভগবান যদি মুখ তুলে চান তবে মুখ্যো বংশের নামও সে রাখতে পারবে। এই সব সাত পাঁচ ভেবে সনতের হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে তাকে ধরে পড়ল। প্রথম সনৎ ভাবতেই পারল না সে কেমন করে লিতার মার জায়গায় আর একজনকে এনে বসাবে। যে অধিকার কেবলমাত্র লিতার মারই ছিল সে অধিকার কেমন করে সে আর একজনকে ছেড়ে দেবে। মনে পড়ে তার অনেক পুরণ কতকগুলি স্মৃতি। বয়স তখন তার চব্বিশ। ব্যারিষ্টার হবার জন্ত সে যাচ্ছিল বিলেত। যাবার পথে বোম্বাই সহরে সে কিছুদিন ছিল তার পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু নরেন চাটুয্যের ওখানে। সেখানেই সে প্রথম দেখে লিতার

মাকে। কেমন করে সে প্রথম দর্শনেই বুঝেছিল এই ১৮ বছরের মেয়েই তার জীবনসঙ্গিনী হবে তা সে এখনও বুঝে উঠতে পারে না। লিতার মাও বলেছিলেন যে তাঁকে দেখে তাঁরও মনে ঠিক সেই ভাবই আসে। অবশ্য তাই তাই বোধ হয় ইংরাজীতে বলে—“বিবাহের বন্ধন স্বর্গ হ’তেই সৃষ্টি হয়।” তারপর মনে পড়ে যাবার সময় তিনি লিতার মাকে বলে গিয়েছিলেন পাঁচ বছর কাল তিনি যেন তাঁর স্ত্রু অপেক্ষা করে থাকেন, বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি তাঁকে পুরোপুরি তাঁর নিজের করে নিয়ে যাবেন। তারপর পাঁচ বৎসর কেটে গেল, ফের সেই বোম্বাই সহর আর লিতার মা। সমস্ত জীবনটা তার ভরে উঠল একটা গোলাপী আভায়। তারপর তাকে যখন সে তার এই প্রকাণ্ড শূণ্যবাড়ীতে এনে তুলল তখন কেমন করে গোটা বাড়ীতে তার কাশুণের সাড়া পড়ে গেল সে আজও বুঝতে পারে না। মনে হল যুমন্ত পুরী যেন আজ রাজকন্ডার শুভ পরশে জেগে উঠল। তারপর কটা বছর কী স্নেহেই না ক্রাটল। একদিন বেজে উঠল আগমনীর শাঁখ। ছেলে না হয়ে মেয়ে হ’ল বলে আত্মীষেরা মনঃক্ষুব্ধ হ’লেন বটে কিন্তু মেয়ের পিতামাতা এই ছোট্ট মোমের পুতুলটি পেয়ে কৃতার্থ হ’লেন। কিন্তু যাক, সে ত আজ অনেক দিনের কথা। সে যুমন্ত পুরী একবার জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে গেছে। কোথাও আনন্দের সাড়া নেই। মনের ভিতর যেমন শ্মশান হয়ে গিয়েছে বাইরেটাও সেই রকম। তাই বন্ধ বান্ধবের কথা শুনে মাঝে মাঝে মনে হয় মনের বাগানের শুকন ফুলগুলি কি আবার তাজা হয়ে উঠবে? কল্যাণী নারীর পরশ পেলে ভান্সা জিনিষে কি আবার জোড়া লাগবে? ছোট ছেলে মেয়ের হাসি কান্নার স্রোতে তার নিরানন্দ মনে আবার কি আনন্দের ঢেউ উঠবে? এমনি যখন সনতের মনের অবস্থা ঠিক সেই সময় আবির্ভাব হল বিভার। বিভা হল সনতের বন্ধু সুরেন মজুমদারের ভগ্নী। বয়স ঠিক বলা যায় না, তবে দেখতে বেশ বড়পড়, সনতের পাশে মানায়। চেহারা চলন সুই। লিতার মার মত স্থান্যী যেখানে সেখানে বা যখন তখন পাওয়া যায় না, তাই তার সঙ্গে তুলনা করা বুধা। গুণের পরিচয় ঘর করলেই পাওয়া যায়, তার আগে যা শোনা তার মূল্য বেশী নয়, তাই সে সম্বন্ধে আলোচনা করা সময়ের

অপব্যবহার। শোনা যায় লেখাপড়া বাড়ীতে অনেক দুই করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পড়েনি এই যা। যা হক বন্ধ বান্ধবের চেষ্টায় সনৎ আবার নতুন করে সংসারে প্রবেশ করলেন। লিতার মার সঙ্গে তাঁর বিয়েটা স্বর্গেই ঠিক হয়েছিল। বিভার সঙ্গে তাঁর বিয়েটা কোথায় ঠিক হয়েছিল তার পরিচয় পেতে হলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

(২)

স্থললিতা এখন ১৪ বছরের মেয়ে। সব কথা তার কাছে লুকান যায় না। বিবাহের অন্তঃস্থানগুলি যতই সংক্ষিপ্ত করা যাক না কেন ১৪ বছরের মেয়ের কাছে তা ঢাকা থাকে না। লিতা দূরে দূরেই রইল। লোকের মধ্যে সে শুনল যে তার বাপ তার স্ত্রু একটি নতুন মা আনতে যাচ্ছেন। মা ত একটাই হয়, তার ত মা আছে। তার ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী মিস্ ব্রমফিল্ড বলেছেন মা তার স্বর্গে তার জন্তে অপেক্ষা করে আছেন, যখনই তার সময় হবে তখনই সে গিয়ে তার কাছে পৌঁছে যাবে। তবে বাবা আবার কোন্ মাকে আনতে গেলেন?

কনের সাজে তার বাবার পাশে বিভাকে দেখে স্থললিতার মনটা বিগড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে তার বাবা মার আগের ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মাকে কনের সাজে কি সুন্দর মানিয়েছিল। নতুন মাকে ত মোটেই সে রকম দেখাচ্ছে না। বাড়ীতে তখন জলুতুল পড়ে গিয়েছে, লতা যে বারান্ডার বেলায় ধরে ম্লান চোখে এ সব ব্যাপার দেখছে তা কান্ন নজরেই পড়ল না। বন্ধা মিস্ ব্রমফিল্ড তাকে দেখতে পেয়ে বল্লেন—“চল ললিতা, আমাদের নিজের ঘরে যাই—তোমাকে সেই নতুন সেলাইটা দেখিয়ে দিতে হ’বে।”

এরপর থেকে লিতা আরও যেন গুটিয়ে গেল। এমনিতেই তার অন্তঃপুরের সঙ্গে বেশী সম্পর্ক ছিল না। শনি রবি এই দুদিন সে পিসিমার সঙ্গে বসে তরকারী কুটত বা অল্প স্বল্প রান্নাবান্না করত; বাকি দিন তার কাটত বারবাড়ীতে তার বিশেষ করে নির্দিষ্ট ঘরগুলিতে। একখানা বসবার ঘর, একখানা খাবার ঘর আর একখানা শোবার ঘর তার ও আর একখানা শোবার ঘর ছিল মিস্ ব্রমফিল্ডের, এইটাই তার রাজ্য। বাড়ীর আর কেউ বড় এদিক মাড়াত না। তার বাবাও এদিকে বিশেষ আসতেন না। লিতাকে দেখলে লিতার মার কথা বেশী করে মনে পড়ে যেত বোধ হয়। বিভার

আগমনে লিতার খুমস্তপুরী আরও নিস্তব্ধ নিঃশব্দ হয়ে গেল। তার পিতার রাজ্যে কাণ্ডের চঞ্চলতা দেখা না দিক, শরতের নিষ্ঠা ছায়াপাতও হ'ল কিনা তা সে এক সনৎই বলতে পারে।

পুরাতন ব্যবস্থার কিছু অঙ্গল বদল না হ'লে একটি নূতন মাহুয যে এ সংসারে পদার্পণ করল তা বুঝবে কেমন করে অজ্ঞ লোকে? তাই বিভা পরিবর্তনের দিকে মন দিল। একথানা চেয়ার ডান দিক থেকে সরিয়ে বাঁ দিকে রাখায়, বা একথানা আলমারী পূর্ব দিকের দেয়াল না ঘেঁসিয়ে পশ্চিমদিকের দেয়াল ঘেঁসিয়ে রাখলে কারু কিছু বিশেষ আসে যায় না। তাই বিভা মনের সাথে ঘর গোছাতে শুরু করল। কিন্তু এ খেলা আর কতদিন চলে? এর দরুণ বাড়ীর চাকর বাকর ও আশ্রিতাবৃন্দ যে তাকে এ বাড়ীর কর্তা বলে মনে করবে তা নয়, তাই তার অন্তিম বোঝাতে গেলে আরও অজ্ঞ পরিবর্তন ঘটতে হবে। প্রথম বিভা যুদ্ধ ঘোষণা করলে চাকর বাকরের বিরুদ্ধে। অল্পদিনের জ্ঞা বারা ভর্তি হয়েছিল তারা ত' বিদায় হ'লই; উপরন্তু ১০।২০ বছরের চাকরী যাদের ছিল তাদেরও অবস্থা টলমল হয়ে এল—কিন্তু এ পর্য্যন্তই। সনৎ এতদিন চুপ করেছিল। কিন্তু যেদিন তার ২০ বছরের পুরাতন বেয়ারা রামদীনকে বিভা যা নয় তাই বলে গালাগালি দিল, সেদিন সনৎ বিভাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে, তার চাকরবাকর তাড়াবার অধিকার নেই। বিভা বুদ্ধিমতী। এই নিয়ে সে কোন কথা বলল না, মান/অভিমানের পালা শুরু করল না। সে বুঝেছিল স্বামী তার মুঠোর মধ্যে না আসা পর্য্যন্ত বজ্র আটন সহ্যে না। স্বামীর মন যে সে পায়নি, তা' বুঝতে তার বাঁকী ছিল না। লিতার মার ছবির সামনে দাঁড়াতেই সে বুঝেছিল শুধু রূপ দিয়ে সে তার স্বামীকে কোন দিনও ভোলাতে পারবে না। বাড়ীর দাসদাসী থেকে আরম্ভ করে যত আশ্রিত আশ্রিতা এ বাড়ীতে ছিল সকলের মুখে লিতার মার স্মৃতিশক্তি শুনে শুনে তার কান বালাপালা হয়ে গিয়েছিল। পর যদি তার গুণে এত মুগ্ধ তবে তার স্বামীর কাছে তার সে গুণের কত আদর ছিল সেটা কল্পনা করা বিভার কাছে খুব বেশী শক্ত হয়নি। রূপ গুণ দুইই লিতার মার যথেষ্ট ছিল; অতএব সেদিক দিয়ে সে তার স্বামীকে নূতন কিছু দিতে পারবে না; তবে একটা দ্বিনিষ

ছিল যা লিতার মা তার স্বামীকে দিতে পারেন নি। আর যদি ভগবান মুখ তুলে চান তবে সে সেই জিনিষটি দিতে পারবে তার স্বামীকে—একটি পুত্র সন্তান—এ বংশের অন্ততঃ একটি কুল প্রদীপ! ততদিন ধৈর্য্য ধরে চুপ করে থাকাই শ্রেষ্ঠ পন্থা মনে করে বিভা কিছুদিনের জ্ঞা ভাঙ্গা গড়ার পালা স্থগিত রাখল।

নিজের মধ্যে যেদিন নূতন প্রাণের সাড়া পেল বিভা, সেদিন থেকে হেন দেবতা নাই বার মোরে সে না মানিত করলে একটি পুত্রের জন্মে। দেবতার বিভার রূপার তাব, রূপার সিংহাসনের লোভেই হ'ক বা মুখ্যে বংশের নাগটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্মেই হ'ক বিভার কোলে একটি শিশু পুত্র পাঠিয়ে দিলেন। এই ক্ষুদ্র শিশুটিই যে লিতা ও লিতার মার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে একদিন, তা' বিভা বেশ ভাল করেই বুঝেছিল। এই শিশুর জোরে সে তার স্বামীর উপর জোর ফলাতে পারবে। এই শিশুই হ'বে তার অস্ত্র।

ধীরে ধীরে আশ্রিতের দল বুঝে গেল এখানকার পাঁতাড়ি গোটাতে হবে তাদের, সনতের কাছে নালিস আর টিক্বে না। মন থেকে সনৎ—যতই তাদের স্বব্যবস্থা করতে চাক না কেন, কন্বাব ক্ষমতা যে তার ছিল না তা' বুঝতে তাদের দেবী হ'ল না। বিভার মতের বিরুদ্ধে কোন একটি কাজ করতে গেলে বিভা রাগ করবে, এর জন্মে সনৎ ভয় পেত না। কিন্তু রাগ করে বিভা ছেলেকে যে ক্ষি করে বস্বে তার ঠিক ছিল না। সেদিন কি একটা সামান্য বিষয় নিয়ে বিভা সেই যে ঘরে দোর দিয়েছিল তাকে দোর খোলায় কার সাধ্য। এদিকে ছেলেটা না খেতে পেয়ে কঁদে কঁদে নীল হয়ে যাবার যোগাড়। শেষে জোর করে দরজা ভেঙ্গে সনৎ ঘরে গিয়ে বহু কষ্টে বিভার রাগ থামিয়ে তবে ছেলেকে বাঁচায়। এই ব্যাপার জু'চার বার ঘটবার পর বিভাকে রাগাতে আর তার বড় সাহস হয় না। এদিকে এই সুযোগে বিভা মনের সাথে যা খুসী তাই করে। বাধা পায় না সনতের কাছে। খন্ডর বাড়ীর আশ্রিতের জায়গার এল বিভার বাপের বাড়ীর দল। লিতার মার আমলের দাসদাসীর স্থানে ভর্তি হ'ল বিভার বাপের বাড়ীর লোক। সনৎ এদিকে সব সন্ধ্য করে যায়, কেবল ক্ষুদ্র শিশু সন্তোষকুমারের মুখ চেয়ে।

বিভা এবার অনেকটা খুসী হ'ল বটে, তবে একটা জিনিষ

তখনও তার বৃক্কের মধ্যে খচখচ করত, বিধৃত কাঁটার মত। সেটি হ'ল সুললিতা। সে যে বাড়ীতে আছে কেউ তা' টেরই পেত না। দিনের পর দিন বিভার সঙ্গে তার সাক্ষাৎই হ'ত না, তবু বিভা তাকে ভুলতে পারেনি। বাড়ীর মালিক হ'তে আরম্ভ করে কাক পক্ষীটা পর্য্যন্ত বুঝে গিয়েছিল সে'ই এ বাড়ীর সর্বময়ী কৰ্ম্মী, বোঝেনি কেবল সত্যনের মেয়ে সুললিতা। তার যা কিছু প্রয়োজন সে পায় তার পিতার কাছ থেকে, নতুন মার কাছে সে আসেই না। এইটাই হয়ত তার মস্ত দোষ। এই জহই হয়ত বিভা তাকে বিদায় করবার জন্ত লেগে পড়ল।

সুললিতার বিয়ে না দিলে আর লোক সমাজে তার মাথা ভুলে দাঁড়াতে পারবে না, একথা বিভা জানালে তার স্বামীকে বলবার করে। মেয়ে ত' যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে, আর মেম'রেখে ফিরিস্তি করবার কি প্রয়োজন? অতগুলো করে টাকা মেমের পিছনে খরচ না করে খোকার জন্তে একটা ভাল মাটির দেখলে কাজ দেয়। পাত্রের অভাব কি? ভাত ছড়ালেই কাক আসবে। হাজার হ'ক মুখ্যো বংশের ত' মেয়ে, একেবারে শুধু হাতে তাকে কিছু খন্ডর ঘর করতে পাঠান যায় না? আর যখন এত দিতে থুতে হ'বেই তখন টাকাগুলো সব যায় কেন বাইরে? এই ত' বিভার ভাইপোই রয়েছে। মাত্র একটি ছেলে রেখে তার স্ত্রী এই বছর খানেক হ'ল মারা গিয়েছে, তার সঙ্গে সুললিতার বিয়ে সে এখুনি ঠিক করে দিতে পারে। দোজবরে বলে আপত্তি করবার কিছু নেই, মেয়ে কিছু কচিখুকী নয়। ১৮১৯ বছর বয়স হ'তে চল্লি, গড়নও বাড়ন্ত এখন কিন্তু ২৩২৪ বছরের ছেলের সঙ্গে তাকে মানাবে না! দোজবরে না'ই, নরেনের বয়স ৩২৩৩ এর বেশী নয়, দেখতেও ছেলেমানুষ, ভজনকে বেশ মানাবে। সনৎ যতদিন পারল এবিষয়টা এড়িয়েই চল। কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝল যে বিভা বা একবার ঠিক করে তার নড়চড় হবার জো নেই; তাই বিভার ভাইপো নরেনের হাত থেকে সুললিতাকে বাঁচাবার জন্তে সে নিজেই একটি পাত্র ঠিক করে ফেল।

বিয়ে করবার সুললিতার তখন কোন ইচ্ছাই ছিল না। বিশেষ এইভাবে সম্বন্ধ করে বিবাহ করাটাকে সে ঘণাই করত। কিন্তু সে ভেবে দেখল যে বিয়ে না করেও তার অজ্ঞ কোন উদ্যম নেই। নতুন মার আদেশে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার পিসিমা যেদিন দেশের ভাণ্ডা ভিটে মাটি আগলাতে চলে যান তাদের বাড়ী ছেড়ে চিরদিনের মত, সেদিন সে দেখলে বাবার কাছে নালিস করেও এর কোন প্রতিকারই হ'ল না। তখনই সে বুঝেছিল তার আদারও পিতার কাছে আর বেশী দিন টিকবে না। মিস্ ব্রফিল্ডকে যেতেই হবে। 'জান' যদি চলে যায় তবে সে একা এ বাড়ীতে থাকবেই বা কেমন করে? তার চেয়ে বিয়ে করে চলে যাওয়াই ভাল। যা হ'ক সেটা ত' তার নিজের বাড়ী হ'বে। এ বাড়ীকে আর যে সে কিছুতেই নিজের বলে মনে করতে পারছে না। সবাই যেন অপরিচিত। চাকরবাকর থেকে আরম্ভ করে মা ভাই ইত্যাদি বাপণ্ড। তবে এ বাড়ীর ইট কাঠ কামড়ে পড়ে থেকেই বা তার কি লাভ? তাই যখন পাকা দেখা হয়ে গেল তখনও সে কিছু বলে না। বরকে কেমন দেখতে, কি করে না করে সে বিষয় সে কোন আগ্রহই প্রকাশ কবলে না। পিতা তার জন্ত বা ব্যবস্থা করবেন তাই সে মেনে নিতে প্রস্তুত হ'ল। আশীর্বাদে পরই কিন্তু অমুখে পড়ল সুললিতা। টাইফয়েড জ্বরে অনেকদিন ভুগে সে মখন বেঁচে উঠল তখন ডাক্তারের পরামর্শে তাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হ'ল সনৎকে। মিস্ ব্রফিল্ড এইবার কাজ ছেড়ে যাচ্ছিলেন ফিরে তাঁর নিজের দেশে। সনৎ তাঁরই সঙ্গে সুললিতাকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তার বলেছেন সমুদ্রযাত্রা তার জন্তে খুব ভাল। সংসার ফেলে তিনি ত' আর মেয়েকে নিয়ে কোথাও গিয়ে দীর্ঘকালের জন্তে থাকতে পারতেন না। তার চেয়ে মিস্ ব্রফিল্ডের জিম্মায় সুললিতাকে কিছুদিন রেখে সারিয়ে আনলেই চলবে। বিয়ের ত' ঠিকই রইল কেবল ৩৪ মাস পিছিয়ে বিয়ের দিনটা। (ক্রমশঃ)

কাঁচা লেখার আসর

পরিচালিকা—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

[নবীনাদের উৎসাহ-দানার্থে প্রতি সংখ্যায় এই আসরে লেখা প্রকাশ করা হইবে। কোন মহিলা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত লেখাই অগ্রে বিবেচিত হইবে]

সীতা ও বর্তমান নারী সমাজ

শ্রীঅননুয়া দাশ

স্বামিজী সীতা চরিত্রকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন “হিন্দুদের বেদ বেদান্ত প্রভৃতি যতপ্রকার ধর্মগ্রন্থ আছে তাহার সব কিছুই যদি ধর্ম হইয়া যায়, একমাত্র সীতার আদর্শই যদি বর্তমান থাকে, তাহা হইলেও হিন্দু ধর্মের সকল কিছুই বর্তমান থাকিবে। “সীতা” এই একটি নামই সমস্ত হিন্দু ধর্মকে ধারণ করিয়া আছে”।

সীতা চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখি আজীবনব্যাপী একটা দুঃখ-যজ্ঞ। সর্বসহা ধরিত্রীর কন্যা ছিলেন জননীর মতই সর্বসহা। অযোধ্যার রাজবধূরূপে বৃত হওয়ার অন্তর্দিন পরেই শুরু হয় তাঁহার সহনশীলতার পরীক্ষা। যখন রাজবধূরূপে তিনি অযোধ্যার রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। জীবনে সুখী হইতে গেলে বাহ্য কিছু প্রয়োজন সবই তাঁহার ছিল—কিন্তু তাঁহার রাজবধূর জীবন শেষ হইল। পিতৃসত্য রক্ষায় জ্ঞাত রামচন্দ্র বনগমন করিলেন। সীতাও পতির সহিত বনবাসগমন ত্রুত গ্রহণ করিলেন। স্বামীর সহিত বনগমনে তিনি কোন ক্লেশ-বোধ করেন নাই। পরম আনন্দেই জীবন যাপন করিতে ছিলেন। এই আনন্দও দীর্ঘস্থায়ী হইল না। লঙ্কার রাজা তাঁহাকে স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লঙ্কার অশোকবনে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রকৃত দুঃখের জীবন আরম্ভ হইল। সুদীর্ঘকাল এই যজ্ঞাভোগের পর যেদিন শ্রীরাম লঙ্কা জয় করিলেন সেদিন সীতাদেবী ভাবিলেন যে দুঃখরজনী অবসামপ্রায়। এই আশাও নিমেষে হতাশায় পরিণত হইল যখন তিনি দেখিলেন যে রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন না। দুঃসহ ব্যথায় অগ্নি প্রবেশ করিয়াও তিনি পরিভ্রাণ পাইলেন না। আরও বহু দুঃখ সঞ্চিত ছিল তাঁহার জ্ঞাত। তাই অগ্নিদেব তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না! শুদ্ধা অপাপবিদ্ধা সীতাকে ফিরাইয়া দিলেন।

ইহার পর পুনরায় কিছুদিনের জ্ঞাত সীতা দেবীকে

অযোধ্যার রাজসিংহাসনে দেখি, কিন্তু ঠিক তাহার পরেই দেখি প্রজারঞ্জক ধর্মগ্রাণ রামচন্দ্র আপন স্তন্যমরক্ষায় বিশেষ ব্যস্ত;—বাহার ফলে সীতাদেবীর দ্বিতীয়বার বনগমন। অবশেষে যেদিন রাজসভায় সকলের সম্মুখে সীতাকে নিজ চরিত্রের নিষ্কলুষতা প্রমাণ করার প্রস্তাব আসিল সেদিন ধরিত্রীর কন্যার সহনশীলতা চরমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বের সম্মুখে বারে বারে এইরূপ অপমানিতা হইয়া তিনি বাঁচিতে চাহিলেন না। তাই এই পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জননীর নিকট নিজ জীবনের অবসান প্রার্থনা করিলেন। জন্মদুঃখিনী কন্যাকে মাতা ধরিত্রী আপন অভয়বক্ষে স্থান দিলেন।

সীতার জীবনে আমরা মোটামুটি উপরোক্ত ঘটনাই দেখিতে পাই। তাঁহার চরিত্রে অস্ফুট সকল গুণের মধ্যে পবিত্রতা ও সহনশীলতা খুব বেশী করিয়া চোখে পড়ে। সকল দুঃখকে তিনি নীরবে মৌনমুখে বরণ করিয়া লইয়াছেন। স্বামী তাঁহার প্রতি অস্ফুট আচরণ করিলেও তিনি কখনও তাঁহাকে দোষী করেন নাই। সমভাবেই সর্বদা স্বামীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সীতা চরিত্রের তুলনা মেলেনা। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সীতাকে ভারতের নারীজাতির আদর্শরূপা বলিয়াছেন।

ভারতীয় নারীজাতি যদি জীবনকে আদর্শ স্বরূপ করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে সীতা হইতে হইবে। ইহার অর্থ এই নহে যে এক একজন রামচন্দ্র আসিয়া হাজির হইবেন এবং মহিলাগণকে সীতার ত্রায় বনবাসাদি স্বীকার করিতে হইবে। সীতা চরিত্রের মূল নীতিগুলি ভারতীয় নারীগণকে জীবনে কার্যকরী করিতে হইবে। সীতার সহনশীলতা, সীতার পাতিব্রাতা, সীতার সেবা, সীতার ত্যাগ, চরিত্র, স্নেহ, ভূট প্রভৃতিকে জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে।

সীতা-চরিত্র আমাদের ভারতীয় নারীগণের চরিত্রের মানদণ্ড স্বরূপ। কিন্তু এই সাতশত বর্ষব্যাপী বৈদেশিক শাসনাধীনে আমাদের নারীগণের মধ্যে সীতাচরিত্রের কতটুকু বর্তমান আছে তাহা দেখা দরকার। মুসলমানযুগে ধর্ম কস্ম প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বহুকষ্টে হিন্দুশাস্ত্রকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করেন। মুসলমানগণ বাহুবলে হিন্দুর ধর্মকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। হিন্দু প্রাণ দিয়াও ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। ইংরাজ আমলে বলপূর্বক ধর্মনাশের চেষ্টা না থাকিলেও ছলে ও কৌশলে হিন্দুকে তাহার ধর্মের প্রতি বিরূপ করার চেষ্টার অন্ত নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষা শৈশব হইতেই শিক্ষা দিতেছে তোমাদের ধর্ম কুসংস্কারপূর্ণ। তাই এখনকার মেয়েরা বলে, রামায়ণ মহাভারত মিথ্যা, সীতা চরিত্রের গল্প আড়ম্বর কল্পনা। সীতা চরিত্রের নবতম ব্যাখ্যা এই যে সীতা বড় বোকা ছিলেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্ত যখন বনে গেলেন তখন সীতার তাঁহার সহিত যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি রাজপুরীতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন সুখের সহিত। তিনি যদি হুঁচু করিয়া ছুঁথ বরণ করিয়া লন, তাহা হইলে কে কি করিতে পারে? পতিব্রতা কথাটি এখন একটি অর্থহীন প্রলাপ। বেশ, বনে গেলেন, ভালই করিলেন, বন ভ্রমণ হইল। বেশ, প্রকবটীর বনে কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। কিন্তু রাবণ যখন ছদ্ম বেশে ভিক্ষা করিতে আসিল তখন সীতার বোকা উচিত ছিল। এমন কি যখন রাবণ ভয় দেখাইল যে গম্ভীর বাহিরে আসিয়া ভিক্ষা না দিলে সে চলিয়া যাইবে, তখন সীতার বোকামীর চূড়ান্ত হইয়াছে গম্ভীর বাহিরে আসা। রাবণ ভিক্ষা না লইয়া চলিয়া গেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত নাকি? আর সীতার বোকা উচিত ছিল যে যেহেতু লক্ষ্মণ গম্ভী কাটিয়া দিয়া গিয়াছেন সেইহেতু নিশ্চয় কোন বিপদের আশঙ্কা আছে।

সুতরাং সীতা নারীসমাজে বিশেষ করিয়া শিক্ষিতা নারী-সমাজে আসন পান না। অল্পশিক্ষিতা এই আধুনিকগণের কি তাহা হইলে কোনই আদর্শ নাই অনুকরণ করার? অবশ্যই আছে। অমুক অভিনেত্রী

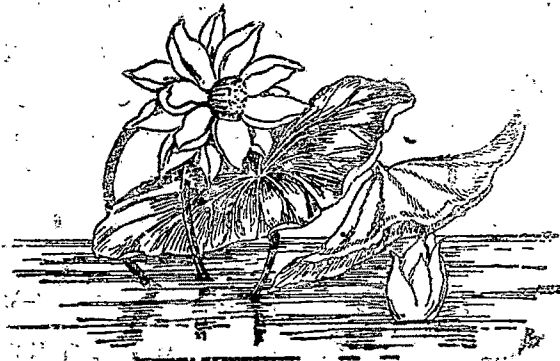
যেদ্রুপভাবে চলে, বলে, হাসে, বেশ লাগে। সুতরাং আমাকেও উহার অনুকরণ করিতে হইবে। আমাকেও ঐরূপ ভঙ্গিতে চলিতে, বসিতে ও হাসিতে হইবে। অমুক অভিনেত্রী যেদ্রুপ এ্যালবার্ট করেন আমাকেও ঐরূপ করিতে হইবে—ইত্যাদি। সুতরাং বর্তমানে এই সিনেমাভক্তদের যে কোন আদর্শ নাই তাহা নহে। তবে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আসন অধিকার করিয়াছেন বর্তমান 'তারকা'গণ।

ইহাত গেল আদর্শের দিক দিয়া। এখনকার ফ্যাসনেবুল মেয়েদের চিন্তাশক্তি কোনদিকে ব্যয়িত হইতে দেখি? অল্পশিক্ষিতা মেয়েদের আলোচনার মধ্যে সিনেমার বিষয়বস্তু ও তারকাগণ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার পর আছে সাড়ী, গহনা, সাজপোষাক। কোন সাড়ীটির সহিত কোন জামাটী বেশী শোভন হইবে, এই সকল আপাতরম্য সামান্য ভোগ্য বিষয় লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত। অবশ্য তাঁহারা রাজনীতির আলোচনাও করিয়া থাকেন, যেহেতু বর্তমান যুগে রাজনীতি আলোচনা করিবার জন্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সকলেই নির্বিচারে আলোচনায যোগদান করিতে পারেন, এবং এই রাজনীতি আলোচনার ফল সংক্ষেপে বলিতে গেলে 'কমিউনিজমের বদহজম'। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিতা মহিলাগণ অনেকে ভারতীয় রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে কেহ কেহ আপাত রমণীয় পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করিয়া যান। ভারতের মূল্যবান মণিরত্নকে অবহেলা করিয়া তাঁহারা মিথ্যা কাঁচখণ্ড পাইয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

গ্রাম্য নারীসমাজের নিকট এখনও সীতা কিছু কিছু পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। গ্রামের মধ্যে এখনও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি নিত্যপাঠ হইয়া থাকে। গ্রামের নারীসমাজ সীতার ত্যাগ-সেবা-সহ-শীলতা প্রভৃতির উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "এ সীতা সাবিত্রীর দেশ। পুণ্যক্ষেত্র ভারতের মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাতাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না।"

কিন্তু আমার মনে হয় সীতা সাবিত্রী প্রভৃতির চরিত্রগুলি
বীরে বীরে বিলুপ্ত হইতেছে। পূর্বের ছায় ব্যাপকভাবে
ইহাদের পঠন-পাঠন হয় না। এরূপ অনেক আছেন যাহারা
সীতা যে কে ছিলেন তাহা আজও জানেন না। শিক্ষিত
সমাজে সীতা সম্পূর্ণরূপে পরিভ্রান্ত। পল্লী-সমাজেও
সীতার প্রভাব পূর্বের ছায় নাই। পল্লীর অজ্ঞ নারীসমাজ
আপন বুদ্ধিমত্তা সীতা চরিত্রের একরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাহাই
নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু
তাহাদের জীবনে সহরের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার লাভ
করিতেছে। দেশবাসী ক্রমশঃ আত্মসমীক্ষা হইয়া উঠিতেছে।

প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষার বিস্তার অভাবেই এইরূপ অবস্থা
হইতেছে। আমাদের বালিকাগণকে ভোগসম্বন্ধে জড়বাদ
না শিখাইয়া, ভারতের নিজস্ব ভ্যাগ, পবিত্রতাগুলক শিক্ষা
দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মাতৃশিক্ষণ
দেশের কল্যাণ যদি সুশিক্ষা না পান তাহা হইলে সমগ্র
জাতির উন্নতির কোন আশা নাই। তাই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন
শিশুকাল হইতে এই সকল গুণময়ী দেবী চরিত্র তাহাদের
সম্মুখে ধরা, যাহাতে তাহারা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া
প্রাচীন ভারতের আদর্শ রমণীগণের ছায় মহামময়ী হইয়া
উঠিতে পারেন।



আমাদের আসর

পরিচালিকা—ত্ৰীবেলা দে

পরিচ্ছন্নতা জাতীয় জীবনের কর্তব্য

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আজকের যুগে সভ্যতার অঙ্গতম লক্ষণ। শুধু তাই নয়, ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের আরম্ভ থেকে বৃহত্তর সার্বজনীন বাজেও এই পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি।

ষষ্ঠীর ব্রতকথায় পড়েছি সেই যে পল্লীগ্রামের বধূটি তার কুঁড়ে ঘরখানিকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, প্রদীপের মালা দিয়ে সাজিয়ে সারারাত জেগে লক্ষ্মীর আগমন প্রার্থনা করেছিল। সত্যি যদি লক্ষ্মীদেবী তার ঘরে এসে থাকেন তবে তার একান্ত প্রার্থনাতো না আসুন, অন্ততঃ তার পরিচ্ছন্নতায় মুগ্ধ হয়ে যে এসেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—সত্যিই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে যথার্থ লক্ষ্মীত্ৰী বিরাজ করে বৈ কি! আমার মা তাই বলতেন, পরিচ্ছন্নতার নামই লক্ষ্মী।

পারিবারিক জীবনে গৃহের পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে গৃহিণীকে এবং মেয়েদের বেশী করে। আমি অনেক মেয়েকে দেখেছি এই পরিচ্ছন্নতার নামে তারা কী গীভৎস কাণ্ডই করেন! যেমন মনে করুন, শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়েরা—দিনরাত কেবল জল ঢালছে যেখানে সেখানে। তাহলেই হলো পরিষ্কার করা। আবার ধরুন, রান্নাঘরকে আঁতাকুড় করে রাখা। রান্নাঘরে ধোঁয়াতে ঝুল পড়বেই, তাই বলে কী সেগুলো মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা যায়—না? সেও একটি আবর্জনা হয়ে রান্নাঘরে জমছে। তারপর রান্নাকরী তরকারী ইত্যাদি মেঝের উপর আটকা অবস্থায় পড়ে থাকে, কত যে মাছি পোকা ছুঁয়ে গেল সেদিকে দৃষ্টি নেই। একে তো আমরা খাওয়ার ব্যাপারে সিন্ধু হস্ত বিশেষ করে বাংলাদেশের মেয়েরা। রান্না তো নয় সে এক বিরাট পর্বের সামিল। যদিও জানি এ আলোচনাটি

একেবারেই অপ্রিয়, তবুও সত্যি কথা বলেই উল্লেখ না করে পারলাম না।

যে সব মেয়েরা নিজেরা রান্না করেন, তাঁদের এভাবে উদয় অন্ত রান্না ঘরে বন্দী থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর—তাই রান্নার ব্যাপারে একটু সংক্ষেপ করে নেওয়া উচিত। খুব বেশী খাইয়েদেব, নিত্য নতুন ধরণের রান্না রসনার তৃপ্তি দিতে পারে কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে তা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। শুধু বাঁচবার জন্য যে খাত্তের প্রয়োজন তার বেশী খাওয়া মানে স্বাস্থ্য নষ্ট করা। এরই জন্য মেয়েদের এত সময় দিতে হয় যে পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর থাকে না। কিন্তু ভেবে রাখা দরকার যেখানে সমস্ত দিনরাত রান্নাঘরের কাজেই লেগে থাকতে হয়, সেখানে—রান্নাঘরকে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার করে না রাখলে দৃষ্টি কটু হয় না কি? তা ছাড়া শুধু রান্না ঘর কেন, সমস্ত বাড়ীখানিই যতদূর সম্ভব পরিষ্কার রাখা উচিত। শুধু বাড়ীতে যেদিন কোন অতিথি আসবেন বলেই যে ঐদিন বাড়ীখানি পরিষ্কার রাখতে হবে তাঁর কোন মানে নেই। সন্ধ্যা বেলায় আমাদের দেশে যে ধূপ ধূনো দেবার রীতি আছে সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষেও বিশেষ মঙ্গলজনক। যদিও আজকাল গৃহস্থের বাড়ীতে এ প্রথাটি প্রায় চোখে পড়ে না; তবুও এসবের প্রয়োজন আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

একবার কলকাতা মেডিকেল কলেজের কোন একজন ইউরোপীয়ান ডাক্তার ছাত্রদের পড়াবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন—‘ভারতবর্ষের লোকেরা কোন ব্যাধিতে সবচেয়ে বেশী মারা যায়?’ ছাত্ররা নানারকম অস্থব্ধের নাম করেছিল। ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন—না তোমাদের ঠিক হয়নি, এরা সবচেয়ে বেশী মারা যায় অপরিচ্ছন্নতার ব্যাধিতে। কথাটি

খুবই সত্য তা না হলে একজনের যে অস্থখ করলো বাড়ীতে সকলেই সেই একই রোগে আক্রান্ত হয় কেমন করে?

পারিবারিক পরিচ্ছন্নতা থেকে আসছে জাতীয় জীবনের কথা—সমান্বিত মানুষ সকলের সহায়তার অপেক্ষা করছে। এখানে উঠছে মানবতার কথা। বাড়ীর সমস্ত আবর্জনা কেন অস্ত্র বাড়ীর সামনে ফেলে দেব? আমারও যে ক্ষতি তারও তো সেই ক্ষতি হবে। তারপর যখন তখন এটা ওটা রাস্তায় ফেলা হচ্ছে যেন রাস্তাটা একটা আবর্জনা ফেলার বিশেষ জায়গা! কেন, বাড়ীর মধ্যে কোন একটা বিশেষ পাত্রের ব্যবস্থা কলেই তো ভাল হয়। আবার অস্থখ বিষয়ের বিজ্ঞান পত্র না পুড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয়। ডোমেরা নিয়ে তুলোর দোকানে বিক্রী করে এলো—পরিষ্কার তুলো দেখে আমরাই আবার দোকান থেকে সেই তুলো কিনে আনলাম। এখানে শুধু একজনের ক্ষতি হল না, জাতিগত জীবনে এমনিধারা কত লোকের যে ক্ষতি করা হলো তার ইয়ত্তা নেই।

অনেক সময় দেখছি একই বাড়ীতে একজনের ফ্লাট অংশটুকু কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আবার অস্ত্রের অংশটুকু তেমনি অপরিষ্কার হয়ে আছে। সেখানে দেখছি ফ্লাটবাড়ীর সিঁড়িটা সকলেই ব্যবহার করেন বলে তাকে অপরিষ্কার করে রাখা হয়েছে যেন পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কারুরই নেই। আসল কথা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা স্বত্বকে আমাদের কোন বোধ নেই। এই থেকেই ওঠে সভ্যতার কথা। দেখেছি ট্রেনের পাশাপাশি ছ'খানি উচ্চ শ্রেণীর কামরার হয় তো একখানিতে যুরোপীয়ান অজ্ঞাতিতে আমাদের স্বদেশীরা চলেছেন—এই দুই কামরার লোকেরা যখন নেমে যাবেন তখন আপনি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন কোনটিতে আমাদের দেশীয় ভদ্রলোক চলেছিলেন। সমস্ত কামরাটি লেবুর খোসা, কলার খোলা, নানাজাতীয় কাগজের টুকরো, জলশ্রোত ইত্যাদি সব কিছু অপরিচ্ছন্নতার পরিচয় পাবেন। বিদেশীরা আমাদের সেই অবস্থায় দেখে অসভ্য বলে অপবাদ দিয়ে গেল। যদিও আমরা আমাদের সভ্যতার অনেক স্তরের উদাহরণ দেখাতে পারি, তবুও এই যে অপরিচ্ছন্নতার ভাব, এটা আমাদের জাতীয় কলঙ্ক হয়ে থাকবে কেন? যাদের কিছুমাত্র পরিচ্ছন্নতা বোধশক্তি আছে, তাদের কাছে অপরিচ্ছন্ন সরকারী রাস্তা কিংবা সরকারী ট্রেনের

কামরা সব কিছুই দৃষ্টিকটু মনে হয়। তার কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে যে শ্রী যে সৌন্দর্য্য বিরাজ করছে সেই সৌন্দর্য্য বোধ যে কোন অবস্থায়, যে কোন স্থানে তাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। তাই প্রয়োজন, বোধ শক্তির। তত্পরি প্রত্যেক বাড়ীর মা বোনের মনে রাখতে হবে এ শুধু ব্যক্তিগত কতব্য নয়, এ আমাদের জাতীয় কতব্য।

—বেলা দে

রান্নাঘর

শ্রীশৈল মিত্র।

শাঁখালুর হালুয়া:—আপনারা সকলেই জানেন শীতকালে এই শাঁখালু ফলটির আমদানী বাজারে খুব বেশী। তাই শাঁখালুর হালুয়া তৈরীর প্রণালীটা আজ বলে দিচ্ছি। কতকগুলো পরিষ্কার শাঁখালুর খোসা ছাড়িয়ে, খুব মিহি করে শীলে বেটে নিতে হবে। তারপর কড়াইতে অল্প ঘি, কিসমিস, তেজপাতা দিয়ে ঐ বাটা শাঁখালু ঘিয়ে ছেড়ে দিন; খুব করে নাড়তে হবে এবং মাঝে মাঝে অল্প ঘি দিতে হবে। যখন দেখবেন বেশ ভাজা ভাজা হয়েছে তখন চিনি ও অল্প জল দিয়ে নেড়ে নিয়ে নামিয়ে একটি খালয় ঘি মাখিয়ে তার উপর ঢেলে দিন। উপরে একটু চিনি ছড়িয়ে দেবেন এবং বাদাম পেষ্টা কুঁচো ছড়িয়ে দেবেন, ইচ্ছে করলে অল্প গোলাপ জলও উপরে দিতে পারেন। এই শাঁখালুর হালুয়া বেশ উপাদেয় খাবার সন্দেহ নেই।

ছানার বরফি:—উপকরণ—ছানা বাটা ১/২ সের, ছোট এলাচ গুঁড়ো ১০ আনা, পেষ্টা ও বাদাম হ' তোলা।

প্রণালী:—প্রথমে ছানা বাটা ও চিনির রস জ্বালে চড়িয়ে খুব নাড়তে হবে। নাড়তে নাড়তে ঘন হয়ে এলে উহাতে পেষ্টা, বাদামের কুঁচি দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। যখন রীতিমত ঘন ও জমাট হয়ে আসবে, তখন নামিয়ে নিয়ে নাড়তে থাকুন। বেশ ঘন হয়েছে মনে হলে একটি পাত্রে রাখবেন। ঠাণ্ডা হলে বরফির আকারে কেটে নেবেন তাহলেই ছানার বরফি তৈরী হলো।

ঘরের কথা

শকুন্তলা

তাপিন তেল কাঠিতে করে ঐ সমস্ত জায়গায় মাখিয়ে দিলে
উই ধরবে না।

গৃহস্থানী—

১। কোন জিনিষ কিনাইল বা কর্পূর সংযুক্ত করে রাখলে

আর পিণ্ডে ধরতে পারে না।

২। সোহাগী ১ ভাগ, গুড় হ' ভাগ একসঙ্গে মিশিয়ে
কাগজে মাখিয়ে ঘরের কোণে ফেলে রাখিলে সব আরতলা
মরে যাবে।

৩। হিং অথবা কর্পূর বিছানায় রাখলে ছারপোকায়
উপদ্রব দূর হবে।

৪। কোন জায়গায় উই লাগলে হিং জ্বলে গেই জল
ঐ জায়গায় লাগিয়ে দিলে উই ধরবে না—আর যদি কোন
কাঠের ফ্রেমে অথবা দেয়াল আলমারীতে উই ধরে তাহলে

সংগ্রহ

শকুন্তলা

১। মনের অলসতা চরিত্র নষ্ট করিবার কারণ।

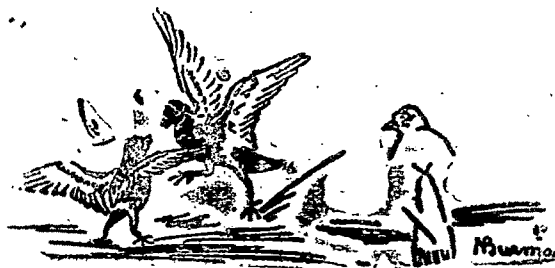
২। জগতে অসংখ্য প্রলোভন তাই নিয়তই প্রলোভনের
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়।

৩। সত্যকার বন্ধুত্ব একটা পবিত্র স্নেহের সম্বন্ধ।

৪। বেনী কথা না বলিয়া সামান্য কাজটুকু করিলেও
তার জন্ত লোকে প্রশংসা করে।

৫। অকর্মণ্য ব্যক্তিরাই অতীতের পানে চাহিয়া থাকে।

৬। যাহারা বড়াই করিয়া বেড়ায় তাহাদের কেহ সম্মান
করে না।



মহিলা সমাচার

(শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ)

প্যারীসগরীতে ইন্দিরা সরকার

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা সরকার এম. এ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিতেছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফরাসী ভাষায় এম-এ পাশ করিয়া ফরাসী দেশে উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন।

তিনি সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট বাংলাভাষার ঐশ্বর্য বিতরণ - করিতেছেন। সেখানে বাংলাভাষার পুস্তকের একটি সংগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি সচেষ্ট হইয়াছেন ও ভারতের বাদলা লেখকদের পুস্তক পাঠাইবার ভ্রম অল্পরোধ জানাইয়াছেন। লেখকগণ তাঁহার এই অল্পরোধ রক্ষা করিলে বাংলাভাষার মর্যাদা ও প্রচার বৃদ্ধি পাইবে।

বিশ্বভারতীর মহিলা আচার্য্য

বিশ্বভারতী একটি আন্তর্দেশিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার পর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার বার্দ্ধক্য ও ভগ্নশরীর এই গুরুভার বহন করিবার সুযোগ তাঁহাকে আর দিল না। তিনি অবসর গ্রহণ করায় শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু বিশ্ব-

ভারতীর আচার্য্য নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু বাদলী ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের অভিযানে তাঁর দান অনেক। তাঁহার অবদানে বিশ্বভারতী পুষ্ট ও গৌরবান্বিত হইবে।

দক্ষিণ কলিকাতা মহিলা ভবন

পল্লীগ্রামের উপার্জনশীল মহিলা কর্মচারী, শিক্ষয়িত্রী ও উচ্চ শিক্ষার্থীণীদের কলিকাতায় অবস্থান করিয়া কাজকর্ম করা অভ্যস্ত ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। তাহার উপর বাসস্থান হুস্প্রাপ্য। অল্প আয়ে মহিলাদের স্বাধীনভাবে থাকা অসম্ভব। তাঁহাদের পক্ষে যৌথভাবে বা থাকিলে দিন যাপন করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। সেইজন্য সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত মহিলা ভবন প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন।

১৫/১৭ পদ্মপুকুর রোডে শ্রীমতী স্বর্ণলতা মিত্র “দক্ষিণ কলিকাতা মহিলা ভবন” নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণকে লইয়া একটি পরিচালন সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে ভদ্র পরিবারের মেয়েরা নির্ভাবনায় অবস্থান করিয়া স্ব স্ব কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্প হইবে।

গল্প-পরিচয়

কলেজের মেয়ে

শূন্যের অন্ধ—শ্রীমতী বাণী রায়। ছোট গল্পের বই। গল্পগুলি যেভাবে লেখা তাতে সব ক'টি রচনাকেই গল্প নাম দেওয়া চলে না। কতকগুলিকে চিত্র বলা উচিত। যে ছোট গল্প আরম্ভ ও শেষের একটি বিশেষ সীমার মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যিক লক্ষ্যে পৌঁছায় তাকেই পুরাকালে ছোট গল্প বলত; আজকাল কথা-সাহিত্যে অনেকেই সে সাহিত্যিক লক্ষ্যের নিয়ম মানেন না। আমার মনে হয় এ নিয়মটা মানলে ভাল হত। তাতে কথা-সাহিত্যের মধ্যে নানা শ্রেণী যে আছে সেটা বোঝা যায়।

লেখিকার রচনার ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যে বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্য আছে। তাঁর বধু, জননী, নার্ডস্ প্রভৃতি গল্পগুলির গুণি সাবলীল ও সমাপ্তি সরস। বাংলা সাহিত্যে শক্তিমতী মহিলা লেখিকার অভাব নেই। তাঁদের অনেকের লেখাতে নারীর অন্তরের ছবি তার শ্রী ও হ্রী নিয়ে দেখা দিয়েছে, বালিকার খেলা, ছাত্রী জীবন, কুমারীর স্বপ্ন, বধুর বেদনা, মাতার বাৎসল্য, জীবন সীমান্তবর্তিনীর রিক্ততা সবই নারীর হৃদয় দিয়ে দেখে বহুদিন মেয়েরা কৃতিত্বের সঙ্গে অল্প বিস্তার প্রকাশ করেছেন। তবে যুদ্ধোত্তর যুগের চাকুরে মেয়েদের ছবি শ্রীমতী বাণী রায় প্রভৃতির পূর্বে বেশী কেউ লিখেছেন কিনা জানি না। বাণী রায়ের নাগিকারা অধিকাংশই বি-এ, এম-এ, পাশ স্থলে কলেজে আগিলে চাকরী বাকরী করেন এবং অধিকাংশই অবিবাহিতা। আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্ক কুমারী মেয়েদের সঙ্কে আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেরই সবচেয়ে বড় চিন্তা বিবাহ এটা সত্য। কিন্তু যে কুমারীরা লেখাপড়া শেখে, চাকরী বাকরী করে, তারা নিজেরাত আর পাঁচ লক্ষ্য কাজ এবং চিন্তাও করে। সুতরাং গল্পগুলির মধ্যে সেই সব কাজ ও চিন্তার ছাপ আর একটু বেশী পড়লে গল্প স্বাভাবিক

হত এবং একটু বৈচিত্র্যও বাড়ত। শিক্ষিতা মেয়েরা সকলেই “আমাদের কেন বিয়ে হচ্ছে না?” বলে পরস্পরকে প্রশ্ন করেছে মর্নে করলে কি রকম যেন হাস্তকর লাগে। অথচ এই স্মরণটা অনেক গল্পেই আছে। কেউ সশব্দে জিজ্ঞাসা করছেন কেউ নিঃশব্দে। নারীর জীবনে বিবাহ হবে কি না হবে এই চিন্তা কয়েকটা বৎসর মাত্র। তাও কৈশোর ও যৌবন সন্ধিকালের সেই কয়েক বৎসরে সচ্ছল অবস্থার মেয়েদের জীবনে প্রাণের এত প্রাচুর্য্য থাকে যে তাদের আঁকিতে গল্পের মাল মশলার অভাব হয় না। স্থল কলেজ, বই খাতা, গহনা কাপড়, মাটির ছাত্রী, বন্ধু বান্ধব, ভাই বোন, পাড়া প্রতিবেশী, খি চাকর, সকল মানুষ ও সকল বস্তুর মধ্য দিয়েই তারা জীবনকে পায় সে সময়। কাজেই লেখিকার যদি কেবল কুমারী মেয়েদের বিষয়ই লিখতে ইচ্ছা করে তাতেও লেখার আর একটু বৈচিত্র্য আনা অসম্ভব নয়। মেয়েদের জীবনের আদিত্তে ও অন্তে অধিকাংশের ভাগ্য আর যে বাকি সময়টা পড়ে থাকে, তাকেও যদি সাহিত্যে স্থান দি, তবে ত বলবার কথা আরও বাড়ে। এই জন্য যে গল্পগুলিতে লেখিকা নারীজীবনের নানা সময়ের কথা এঁকেছেন সেই গল্পগুলিই আমার ভাল লেগেছে। বধু, জননী, শুদ্ধি, নার্ডস ও শাড়ী গল্পগুলি বেশ লাগে। শুদ্ধি বেশী মনে লাগে নোয়াখালির কাঁচা বায়ের কথা স্মরণ করায় বলে। নার্ডস্ আধুনিক কণ্ঠকান্ত চাকুরে মেয়ের স্বাভাবিক ছবি। বিলাতী মেম শাড়ী পরা নচ, অথচ বাইরের জীবনের সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক আছে।

লেখিকার রচনা শক্তি আছে, তিনি সাধারণ মেয়েদের জীবনের নানাদিকের কথা আরও লিখলে তাঁর রচনার বৈচিত্র্য বাড়বে।

সাময়িকী

সমাজ ব্যবস্থা ও নারী

নারী ও পুরুষ এই উভয়কে লইয়াই গঠিত হইয়াছে মানব সমাজ। তাই সমাজের মঙ্গল নির্ভর করে নারী ও পুরুষের উভয়েরই কল্যাণের উপর। নারী কি পুরুষ এই দুইয়ের কেহ যদি পক্ষ হইয়া থাকে তাহা হইলে সমাজকেও পক্ষ হইতে হয় এবং পক্ষ সমাজ কল্যাণকর হইতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে রাশিয়ার কথা, সে দেশ সভ্যতায় সংস্কৃতিতে বর্তমানে জগতে অতি উচ্চ স্থল অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ২১১২ বৎসর পূর্বের রাশিয়ার ইতিহাস ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। সামান্য কয়েক বৎসরের ভিতরে যে যে কারণে রাশিয়ায় এই অভূতপূর্ব যুগান্তর আসিয়াছে, স্ত্রী স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া নেওয়া এবং পুরুষের সমান অধিকার নারীকে দেওয়া তাহার অন্যতম কারণ। বিগত নাৎসী অভিযানে রাশিয়ার নারী যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিবে। নিজেদের দেশ সশস্ত্রে এবং দায়িত্ব সশস্ত্রে সচেতন ছিল বলিয়াই তাহারা তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কি সামাজিক ব্যাপারে পুরুষের ছায় নারীও সমান অধিকার ও দায়িত্ব বহন করে বলিয়াই দেশ ও সমাজ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে। খৈরাচাঁরী জারতন্ত্রের আমলে তথাকার নারী থাকিত পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায়, স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার দেওয়া দূরের কথা, ভোগের সামগ্রী হিসাবেই নারীকে গণ্য করা হইত। শুভ মুহূর্তে খৈরাচাঁরী জারতন্ত্রের অবসান হয়, নারী পরিচিত হয় মুক্ত পৃথিবীর সহিত। যে নারী সমাজে পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় অসহায় জীবনযাপন করিত, সেই

সমাজেরই লক্ষ লক্ষ নারী সমাজ গঠনে ও রাষ্ট্র গঠনে চতুর্দিকে অগ্রসর হইয়াছে। অত্যন্ত সভ্য দেশের সমাজ ব্যবস্থাও একইরূপ। আমাদের দেশের নারীকেও যদি অধিকার ও সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারাও যে অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে, তাহার প্রমাণ বহুবার পাওয়া গিয়াছে।

নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে এবং স্বাধীনতার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অধিকারকে পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করিতে হইবে। “পথি নারী বিবজ্জিতা” ইত্যাদি ধরণের কথা শুনাইয়া আমাদের দেশের নারী সমাজকে আত্ম-সম্মান জ্ঞান শূন্য করিয়া রাখা হইয়াছে—তাহাদের শক্তিকে খর্ব করিয়া রাখা হইয়াছে; ইহাতে রাজনৈতিক কি সামাজিক অবস্থা দিনের পর দিন জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে এবং সমগ্র সমাজ বিশৃঙ্খলার আবের্ডে পতিত হইতেছে। এই আবের্ড হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলেও নারী সমাজের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ফলকথা রাষ্ট্রের কি সমাজের উন্নতি করিতে হইলে পুরুষদের সহিত নারীকেও সমপর্যায়ে উন্নিত করিতে হইবে। অবরোধ প্রথা, বিধবা নির্ধ্যাতন ইত্যাদির দ্বারা সমাজের ক্ষতিই সাধন হইয়াছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের বিধবারা নির্ধ্যাতিত অবস্থায় নীরব অশ্রু বিসর্জন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে। বিধবা বিবাহ আইনভঃ মানিয়া লইলেও বাস্তবে তাহা এক প্রহসন হইয়া আছে। সমাজের বন্দিনী অবস্থা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া আনিয়া দেশের গঠনমূলক কার্যে নিয়োগ করিলে রাষ্ট্রেরও মঙ্গল এবং তাহাদের জীবনের মোচন হয়।



Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
• BHOWANIPUR :: CALCUTTA •

ইণ্ডিয়ান ফ্যাব্রিকস্ (মিত্র মুখার্জী জুয়েলারের উপর-তলায়) ৩৭নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা। ফোন সাউথ ১২৭৮

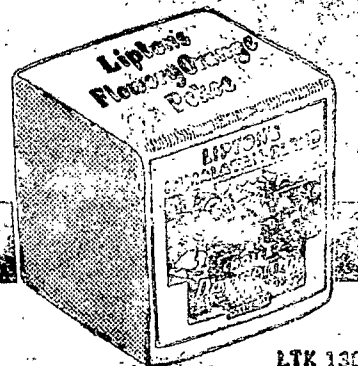


"লিপটনের
হিমালয়ান ব্লেণ্ড চা
দিয়ে শুরু করার পর
থেকে সবাই চা খেতে যেন
ছুটে আসে"

ক্যানটিনের ম্যানেজার

কারখানার কর্মীরা চায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। আমি এখানে
আসবার পর প্রথম তিন মাস তো কাটকেই খুশি করতে পারিনি—দামী
দামী হরেক রকম চা দিয়ে দেখেছি কোনোটাই এদের পছন্দ হয় না।
শেষটায় একদিন দেখি আমাদের চৌকিদার নিজে চা তৈরি করে
খাচ্ছে—চা-টা লিপটনের হিমালয়ান ব্লেণ্ড। ওর তৈরি চা একটু
খেয়ে দেখেই আমার ভুল বুঝতে পারলাম। সেই থেকে আজ প্রায়
দু-বছর হল ক্যানটিনে এই চা-ই ব্যবহার করছি। এখন আর আমাকে
কারুর নালিশ শুনতে হয় না। অল্প পরিমাণ চায়ের পাতায় অনেকটা
চা হয় বলে এতে খরচও কম।

লিপটনের
হিমালয়ান ব্লেণ্ড
সেরা দার্জিলিং চা



LTN 130

বঙ্গ লক্ষ্মী

২৩শ বর্ষ

পৌষ—১৩৫৪

২য় সংখ্যা



আবির্ভাব

২রা অক্টোবর, ১৮৬৯

তিরোধান

৩০শে জাফরারী, ১২৪৮

আমার ধ্যানের ভারত

আমি সেই ভারতবর্ষকে গঠন করিবার জন্য কাজ করিয়া যাইব, যে ভারতবর্ষে দীনতম ব্যক্তিও মনে করিবে যে, দেশ তাহারই দেশ। এই দেশ গড়িয়া তুলিতে তাহাদেরও অভিমত কার্য্যকরী হইবে। সেই ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণী বা নীচ শ্রেণীরূপে মানুষের কোন সমাজ থাকিবে না। সেই ভারতবর্ষে সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত শ্রেষ্ঠ ক্রীতির সম্পর্ক রাখিয়া বাস করিবে। সেই ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতারূপ-অভিশাপের কোন স্থান থাকিতে পারে না, উত্তেজক পানীয় অথবা অগ্নি কোন মাদক সেবারও কোন প্রশ্রয় থাকিবে না। নারী সমাজ পুরুষ সমাজেরই মত সমান অধিকার ভোগ করিবে। ইহাই আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ।

—মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী

জীশাস্তা দেবী

ক্লেশবিহীন বৌদ্ধ মত মানবপ্রেমিক মহাত্মা গান্ধী মানুষের হাতেই প্রাণ দিলেন। অহিংসাই ধীর জীবনের বানী তিনি হিংসার অনলের আহুতি হলেন। জাতির যুগসন্ধিক্ষণে তিনি যখন যে পথ অবলম্বন করেছেন নিজের অধ্যাত্মদৃষ্টির উপর নির্ভর করে ও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেই করেছেন। দেশের নানাপন্থী নেতারা সব সময় হস্ত তাঁর মতে সার দিতে পারেননি। কিন্তু মহত্বই হোক বা ক্ষুদ্রই হোক মানুষ মানুষ মাত্র। মানুষের জ্ঞানের ভবিষ্যৎদৃষ্টির ও বিচার বুদ্ধির সীমা আছে। প্রতি মানুষ প্রতি সমস্তার সমাধান করার মত ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না নিশ্চয়ই, কোন মহত্তম মানুষও সকল সমস্তার সমাধান সকলের হিতকরভাবে সব সময়ে করতে পারেন না। তবু আমরা মহত্তম পুরুষ বলি তাঁহাকেই ধীর আদর্শ সকলের উচ্চ, ধীর অধ্যাত্মদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি সকলের চেয়ে ব্যাপক, ধীরত্যাগ বিস্ময়কর এবং ধীর জ্ঞান ও বিচারশক্তিতে জ্ঞানির পরিমাণ সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক কম। সেই হিসাবে মহাত্মা গান্ধীই ছিলেন আজ এই ভারতের বা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর এই আকস্মিক তিরোধানে দেশ অনাথের মত অসহায় হয়ে পড়ল। তাঁর স্থান গ্রহণ করবার মত মানুষ দেশে আর একজনও নেই। আজ আমাদের দেশের যে স্বতন্ত্রত্ব অবস্থা পরাধীন ভারতে তাঁর চেয়ে ভাল ছিল। ভারত আকাশ তখন উজ্জল জ্যোতিষ্কমালায় আলোকে উদ্ভাসিত ছিল। মহাত্মার তিরোধানে শেষ এবং অনেকেরই মতে উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক খসে পড়লেন। কার সুখের দিকে চেয়ে ভারত আজ হিংসোন্মত্ত পৃথিবীর পথে চলার ভয়সা পাবে? সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষ আপনার মিত্র গোষ্ঠির হিত চায়, সেই হিতাকাঙ্ক্ষায় সে বর্তমানকে মাত্র দেখে। কিন্তু মহাপুরুষ ধারা তাঁরা শত্রু মিত্র সকলের হিত দেখেন। তাই তাঁদের দৃষ্টি বর্তমানকে ছাড়িয়ে হৃদয় ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দেখতে পায়। মানুষের চরম মঙ্গল তিনিই

সাধন করতে পারেন, যিনি মানুষের সকল শত্রুকে জয় করতে পারেন। মহাত্মা ভারতবাসীর সেই কল্যাণই চেয়েছিলেন যথারা সে একদিন অজাতশত্রু হতে পারে। ইয়ত সেই পরম কল্যাণ তাঁর এই ক্ষুদ্র জীবনে সাধিত হত না, তবু সেই সাধনার অগ্নি তিনি জেলে দিয়ে গেলেন এবং তাকে আরও দীর্ঘকাল যত্নে আলিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন যাতে ভারতের চরম ও পরম মঙ্গল এই ঘোর দুর্দিনের অন্ধকার ভেদ করে শীঘ্র দেখা দেয়। তিনি বলেছিলেন, “আমার এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যতদিন প্রয়োজন ততদিন ভগবানই আমায় বাঁচিয়ে রাখবেন। যখন আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে তখন আমাকে শত চেষ্টাতেও কেউ রাখতে পারবে না।” কি জানি? জীবন-ব্যাপী সাধনায় তিনি ভারতের যে অকল্যাণ দূর করতে পারলেন না, যে ভ্রাতৃহত্যার উন্মত্ত প্রাবনের গতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই প্রাবনের রক্তস্রোতে বিধাতা কি এই মহাপুরুষকেই আহুতি দিয়া দেশের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিবেন?

আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছে। এতে তাঁর লজ্জার সীমা ছিল না। তিনি বলেছিলেন “পৃথিবীর লোক জিজ্ঞাসা করছে—আজ কোথায় তোমার অহিংসা—যে অহিংসা দিয়ে তুমি তোমার স্বাধীনতা অর্জন করেছ?” ভারতবর্ষের এই কলঙ্ক তিনি মোচন করতে চেয়েছিলেন, তাই নোয়াখালির নির্ধ্যাতিত হিন্দুর ঘরে ঘরে নগ্ন পায়ে এই আটাত্তর বৎসর বয়সে তিনি রাম নামের অভয় মন্ত্র হেঁটে হেঁটে দিয়ে বেড়িয়েছেন, আবার দিল্লীতে নির্ধ্যাতিত মুসলমানকে রক্ষা করার জন্যই তিনি প্রাণ উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের পাণের বোঝা আরও ভারী করার জন্য ভারতের এক হিন্দুই তাঁর সেই পবিত্র প্রাণশিখা সেখানে হরণ করল। ভারতের এই কলঙ্ক কি চল্লিশ কোটি মানুষের অশ্রু জলেও যৌত হবে?

বাধীনতার মূর্ত প্রতীক, দরিদ্র কৃষকের বন্ধু, নির্ধ্যাতিতা রমণীর সহায়, অস্পৃশ্যের সমবায়ী, সর্বভাষী শান্তির দূত, মহাত্মা গান্ধীর প্রেমোদ্ভূত দৃষ্টি ও প্রসন্ন হাসির আলো আমাদের হৃদয়গা দেশের উপর আর পড়বে না ভাবলে প্রাণ শোকে মুহূমান হয়। বিধাতা এ দেশকে পাপমুক্ত করুন এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

মহাত্মা গান্ধীর আশ্রয় কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করবার অধিকারী আমরা নই। তিনিই চিরজীবন আমাদের আশ্রয় মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা ও সাধনা করে গিয়েছেন। তাই তাঁর কাছে আমরা কি পোষণে সে কথাই আজ স্মরণ করছি। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার দেশ ও ধর্মের মুক্তির জন্য ও আমি কখন সত্য ও অহিংসাকে বলিদান করতে পারি না।’ সত্য ও অহিংসাই তাঁর প্রথম কথা।

মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে মতভেদ আছে। কিন্তু মতভেদকে শত্রুতার পরিণত করা ভুল। গান্ধীজী বলেছেন, ‘মতভেদের অর্থ যদি শত্রুতা হত, তবে আমি ও আমার জাতি পরস্পরের পরম শত্রু হতাম। পৃথিবীতে আমি এমন কোন ছোট্ট মানুষকে জানিনা যাদের পরস্পরের সঙ্গে মতভেদ নেই। আমি গীতার ভক্ত, সেই ক্ষুদ্র আমার সঙ্গে যাদের মতভেদ আছে, তাদেরও আমি আমার প্রিয়তম আত্মীয়ের মত ভালবাসতে চেষ্টা করেছি।’ তিনি ভারতকে তরবারির মস্ত্র দীক্ষিত করতে চান নি। ভারতের যে নিজস্ব

বাণী জগতের সম্মুখে বলবার আছে তা অহিংসারই বাণী। তাই তিনি বলেছিলেন, ‘ভারত যেন অকৃতাবে কোনদিন ইউরোপকে অনুকরণ না করে। যেদিন ভারত এইভাবে তরবারির মস্ত্র গ্রহণ করবে সেই দিনই হবে আমার পরম পরীক্ষার দিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানব জাতিকে অহিংসার বাণী ভারতই শোনাবে, যদিও হয়ত সে বাণী ফলবতী হতে বহু যুগ লাগতে পারে। কিন্তু আমি বতটা বুঝতে পারি তাতে মনে হয় এই কার্যে ভারতকে অতিক্রম করে অল্প কোন জাতি প্রথম আসবে না।’

মানুষের মানুষে, নরনারীতে, ধনী দরিদ্রে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে ভেদ গান্ধীজীকে যেমন বেদনা দিত এমন আর কিছু দিত না। তাই তিনি বলেছিলেন, ‘আমি আর জন্মাতে চাই না। কিন্তু যদিই আমাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয় তবে যেন আমি অস্পৃশ্য হয়েই জন্মাই; তবেই আমি তাদের তৎক্ষণাৎ হৃদশার ভাগী হতে পারব, তাদের উপর বর্ষিত অপমানের অংশীদার হতে পারব। হিন্দুধর্ম্ম মরে যাওয়াও বরং ভাল, তবু যেন অস্পৃশ্যতা বেঁচে না থাকে।’

তিনি আধুনিক অর্থে জাতিভেদ ও বর্ণভেদে বিশ্বাসী ছিলেন না। যদিও তিনি নিজেকে রামমোহনের শিষ্য বলতেন না, তবু জাতিভেদ নিহারণ, নারীর মুক্তি, অস্পৃশ্যতা মোচন, প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি কার্যে তিনি রামমোহনর কাছাই অগ্রসর করে গিয়েছেন। একথা আজ কেউ স্মরণ করছেন না, কিন্তু করা দরকার। *

* আমাদের পৌষ সংখ্যা প্রকাশিত হতে বিলম্ব হওয়ার আমরা এই সংখ্যাতেই মহাত্মাজীর বিষয় লিখিলাম। ব: স:



৩ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র

Allahabad, January, 17, 1926

মা শান্তা,

তোমার ১৫ই তারিখের চিঠি কাল পাইয়াছি। * * *

আমি সম্ভবতঃ এখান হইতে বৃহস্পতিবার রওনা হইয়া শুক্রবার কলিকাতা পৌঁছিব। তাহার আগে আমার কলিকাতা পৌঁছা যদি বিন্দুমাত্র দরকার মনে কর তাহা হইলে টেলিগ্রাম করিবে; আমি তাহা পাইবার পরবর্তী মেলট্রেনে রওনা হইব। আমি মঙ্গলবার একবার কাশী যাইব মনে করিয়াছি। সেইদিনই ফিরিয়া আসিব।

এখানে ১৩ই পৌঁছিয়া ভীড় দেখিতে বাই। ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইয়াছিল। এবার সন্ধ্যা বাধ হইতে প্রায় ২২টা মাইল দূরে হইয়াছে। এই জন্ত লোক সমাগমের জায়গা খুব বিক্ষত হইয়াছিল। ১৩ই তারিখেই খুব লোক আসিতেছিল। সেদিন শুনিলাম, যামেলার ভারপ্রাপ্ত তহবিলদার আন্দাজ করিয়াছিলেন, যে, ৩৬ লক্ষ লোক হইবে। অবশ্য ঠিক একটা কিছু অনুমান করা সম্ভব নহে। সন্ধ্যার আগে বিস্তর লোক বালীর উপর উনান পাতিয়া রান্না করিতেছিল। ওরূপ বিক্ষত স্থানেও এত ধোঁয়া হইয়াছিল যে, চোখ জালা করিতেছিল। তাহার উপর ধূলিও আছেই। রাত্রে ঐ ধোঁয়া জায়গাতেই অধিকাংশ লোক শুইয়াছিল। যাহারা পাতিবার জন্ত খড় ঘোঁড়া করিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। লেপ কয়ল কাঁথা বিহীন অবস্থায় শুধু বালীর উপরই অধিকাংশ লোক রাত্রি যাপন করিয়াছিল।

১৩ই সমস্ত রাত্রি বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে ক্রমাগত নদীর দিকে লোক চলিয়াছিল। আমরা ১৪ই বেলা ১০টার সময় সন্ধ্যার দিকে রওনা হই। ফিরিয়া আসিতে প্রায় ২৪টা হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতে আসিয়াছিল। প্রায় ৫ বর্গ মাইল জায়গা জুড়িয়া ভীড়

হইয়াছিল। শুনিয়াছি এখানকার তিনটা রেলওয়ে ষ্টেশনে ২০ লক্ষ টিকিট বিক্রী হইয়াছিল। তা ছাড়া নিকটবর্তী স্থান হইতে পায়ে হাঁটিয়াও কয়েক লক্ষ লোক আসিয়াছিল। মোট ২৫৩০ লক্ষ লোক হইয়াছিল বোধ হয়। আমরা কয়েক জায়গায় জল পার হইয়া শেষ ভীড় পর্যন্ত গিয়াছিলাম। দুপুর রোজে হাঁটিয়া যাওয়ার শীত বোধ হইতেছিল না। আমি স্নান করিব বলিয়া যাই নাই। মেজর বহু স্নান করেন নাই। স—একটা গামছা লইয়া গিয়াছিল। সে স্নান করিবার পর আমি আমার wrapperটা পরিয়া স্নান করিয়াছিলাম। র—প্রভৃতি অস্ত্র দলে গিয়াছিল। তাহাদের এক মুসলমান বন্ধু এ—দেখিলাম ধূতি ও পাঞ্জাবী পরিয়া কপালে তিলক ফোঁটা কাটিয়া স্নান করিয়া আসিল। পাণ্ডারা নানা জায়গায় একটা বাছুরকে বার বার বিক্রী করিয়া তাহাই নিজেদিগকে দান করাইয়া যাত্রীদিগকে গোদানের পুষ্য লাভ করাইতেছে।

আমাদের বাড়ী ফিরিয়া খাইতে ৪ইটা হইয়াছিল। স—এর মা ও প—স্নানের জন্ত কাশী গিয়াছেন। বোধ হয় মঙ্গলবার ফিরিবেন। রাধুনীকে লইয়া গিয়াছেন। * * *

আশার সঙ্গে দেখা করিলাম। তাহার মা দুই বোন ও ভাইকে দেখিলাম। গঙ্গার বালীর উপর তাহার বাবার সঙ্গেও দেখা হইয়াছিল। মেঘরাজ মুনিয়ার যে বাংলাটাতে আমরা থাকিতাম, তাহারাই সেইটিতে থাকে। বাংলাটা তেমন আছে। আমি কোন্ ঘরটার থাকিতাম, বলিলাম। গেটের কাছে একটা ছোট নূতন বাংলা করিয়াছে; তাহাতে Miss D—ও আর একটি বাঙালী মেয়ে থাকে। তাহার principal ও lady Superintendent।

তোমার বাবা।

বাস্থকি দিতেছে নাড়া

ত্ৰীহেমলতা ঠাকুর

দাও অন্ন দাও ভুল

বুকপুঞ্জে পুষ্পফল

হায় হায় কি দুর্গতি!

নষ্ট বুদ্ধি কি দুর্গতি

ফুটাইয়া তোলা নব সৃষ্টির আলোকে;

আপনি সে আপনারে করিছে হনন

পাঁপের দংশন যত

দুর্নীতির দুষ্ট কত

মৃত্যু আলো নাহি চায়

চলিছে অন্ধের প্রায়

নিঃশেষে মিলায়ে যাক এই মর্ত্যালোকে।

হুঃসহ দুঃখের মাঝে ঘটাবে পতন।

বুগ বুগ ধরি পাপ

হিংসাপুষ্ট অভিলাষ

মৃত্যু করে পাপ শেষ

মুগ্ধ করে বশ দেব

সহিয়াছে বহিয়াছে ধরণীর প্রাণ;

শক্তি করে প্রমত্তের মত্ত কোলাহল

আজি তার প্রারশ্চিত

ধ্বংসের প্রলয় নৃত্য

আনো আলো আনো আলো

মৃত্যুর শিখরে আলো

অসংখ্য মানব প্রাণ দেয় বলিদান।

চিরসত্যে মানবের হোক পরিজ্ঞান।

বাস্থকি দিতেছে নাড়া

রক্ত পাপ পেয়ে ছাড়া

মৃত্যু সে অমৃতময়

নবমুখে মৃত্যুঞ্জয়

রক্তমাখি রাজপথে করে ছুটাছুটি;

নব পুষ্প ফলে পৃথি নিত্য স্নানোত্তিত

বিকৃত মানব দেহ

ছিন্নশির নগ্ন কেহ

তাহার আহ্বান মানো

নবযুগে তারে আনো

পড়িয়া পথের পাশে হয় লুটাপুটি।

স্বন্দরের পদক্ষেপ হটক চিহ্নিত।

শেষ রাগিণী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

তৃতীয় পর্ব

নীল সমুদ্র। তার বিশাল বক্ষ ভেদ করে এগিয়ে চলেছে ইয়োরোপাভিমুখী জাহাজখানা। প্রকাণ্ড ডেউগুলি এসে ডাঙাচ্ছে সামনে কিন্তু পারছে না বাধা দিতে।

ডিনারের পর ডাইনিং সেলুনে আয়েজন হয়েছিল সিনেমার। অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা আটকা পড়ে গিয়েছিল সেখানেই। সিনেমার জন্তে চারিদিকের বাতিগুলি নিবিয়ে দেওয়ার ডেকের অনেকটা অংশই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, লোকও ছিল না সেখানে বেশী। কেবল আধার-টাকে একটু ফিকে করে দিয়েছিল এক বালক চাঁদের আলো ডেকের উপর এসে। স্থললিতার অভিনাটিকা মিস ব্রমফিল্ড সিনেমার একজন বিশেষ ভক্ত। তিনি সিনেমার মায়া কাটাতে না পেরে একখানা চেয়ার অধিকার করে বসলেন ডাইনিং সেলুনে। ডেকের খোলা হাওয়া ছেড়ে বন্ধ ঘরে বসে থানেক কাটার ইচ্ছা ছিল না স্থললিতার। সে তাই পরিত্যক্ত ডেকের একটি কোণে রেলিং এর গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, দৃষ্টি তার আবদ্ধ ছিল তারায় ভরা আকাশের পানে। গৃহ ছেড়ে সে আজ চলেছে অনেক দূরে; কিন্তু তার অন্তে তার ছিল না একটু মাত্রও দুঃখ। গৃহ ছিল তার নামে। গৃহের একটি মাত্র লোক যিনি ছিলেন তার অতি আপনার তিনিও আজ পরের। একজনের বাগদাতা পত্নী সে; কিন্তু ভাবী পতিকে সে চোখেও দেখে নি, তার সম্বন্ধে সে কিছু জানেও না। জানবার কৌতুহলও নাই। তার পিতা তার জন্ত যে বন্ধনের ব্যবস্থা করেছেন সে তাই মেনে নেবে, কিন্তু আজকের এমন রাতে সে তার বন্ধনের কথা মনে আনবে না। সে বিষয় ভাববার চের সময় আছে। জীবনের বাকি দিনগুলি ত তারই ভিতর কাটবে। আজ সে মুক্ত পাখী। ডানা মেলে সে উড়ে চলেছে কোন অজানা অচেনা দেশের উদ্দেশ্যে। প্রাণ ভরে সে তার এই কটা দিনের মুক্তি উপভোগ করবে। সে বর্তমানটাকে বুকে আঁকড়ে ধরবে, গত জীবনের বা ভবিষ্যতের

চিন্তা মনে এনে সে তার এমন রসদীন মুহূর্তকে মান হতে দেবে না। একটা মাসের জন্ত সে সব ভুলে থাকবে।

“এ ব্যাগটা কি আপনার?” চমকে স্থললিতা ফিরে দেখে ডাইনিং সেলুনে ঢোকবার সময় যে ভদ্রলোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল, যাকে সে সাহেব বলে মনে করে ইংরাজি প্রথামত ইংরাজিতেই দুঃখ প্রকাশ করেছিল, সেই ভদ্রলোক তাকে উদ্দেশ্য করে স্পষ্ট বাংলাতেই কথা-গুলি বললেন। ব্যাগটির দিকে একবার চাইলে স্থললিতা। জিনিষটা যে তার সেটা বুঝতে পারলে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু না বলে সে বলে,—ওঃ, আপনি তা হলে বাঙ্গালী। আমি আপনাকে সাহেব বলে ভুল করে একটু আগে আপনার সঙ্গে ইংরাজিতে কথা বলে ছিলাম। নিজের দেশের লোকের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা বলতে ভাল লাগে না—

“আপনি তার জন্তে লজ্জিত হচ্ছেন কেন? আমাকে অনেকেই পাঞ্জাব অফিসের লোক বলে মনে করেন, আপনিও যদি ভুল করে থাকেন, সেটা কিছু মারাত্মক অপরাধ নয়। এই ব্যাগটা আপনাই নিশ্চয়, কারণ এটা আপনার হাতে একটু আগে দেখছিলাম। ভদ্রলোকটি ব্যাগখানি স্থললিতার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ব্যাগটা নিতে নিতে স্থললিতা জিজ্ঞাসা করলে “আপনি সিনেমা দেখতে যান নি?” ভদ্রলোক হেসে বলেন—“আমি সিনেমার দর্শক বুলি না, কোলকাতাতে ন মাসে ছ মাসে যদি একবার যাই, তাও বন্ধ বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে। আপিস ঘরে বসেই দিনের অর্ধেক সময় কেটে যায় তার পরও যদি আবার ঘরের মধ্যেই আটকা থাকতে হয় তা হলে হাঁপিয়ে মরব। কিন্তু আপনার বন্ধু মিস ব্রমফিল্ড একজন রীতিমত সিনেমা ফ্যান।” হেন সিনেমাটার নেই যার পারিবারিক ইতিহাস তিনি না জানেন। আমি তাঁর কাছে নেহাৎ বোকা বনে গেছি, যেহেতু জিনেট ম্যাকডনেল্ডের নাম করাতে আমি তাকে ব্যান্গিস ম্যাকডনেল্ডের মেয়ে বলে ভুল করেছিলাম—

হুইজনেই [হেসে উঠল; তারপর হাসতে হাসতে স্থললিতা বলে—“আপনি মিস ব্রমফিল্ডকে চেনেন নাকি?”
“আগে চিনতাম না, এই জাহাজেই আলাপ হয়। তাঁর কুশান রাগ ইত্যাদি হয়ে নিজে বাবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তাই জন্তে তিনি আমার উপর এক খুশী হয়ে গেলেন যে আমাকে তাঁর টেবিলে খেতে বসতে বলেন। আপনি তখন ক্যাবিন ছেড়ে বেরুতেন না। তাই তিনি আমারই মত একা ছিলেন—”ভদ্রলোকের কথা শেষ না হতেই স্থললিতা বলে “আজ আমি প্রথম ক্যাবিন ছেড়ে বেরিয়েছি; ডাইনিং সেলুনে খেতে আসাও আজ তাই প্রথম। তাই আমাকে দেখে ভয় পেয়ে বুঝি আপনি অস্ত টেবিলে চলে গিয়েছেন?”

“না ভয় ঠিক নয়, তবে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে আপনার আপত্তি হবে কিনা না জেনে নিজেকে আগুনাদের গভীর ভিতর চোকানটা উচিত মনে করি নি।” লোকটির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেকের বাতিগুলিসব জলে উঠল, আর “হ্যালো! মিষ্টার রায়” বলে মিস ব্রমফিল্ড সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তারপর স্থললিতার দিকে চেয়ে ইংরাজিতে বলেন, “মিষ্টার রায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ নেই না? ইনি মিষ্টার রায়।” তারপর মিষ্টার রায়ের দিকে চেয়ে বলেন—“ইনি মিস ললিতা মুখার্জী।”

মিস ব্রমফিল্ড স্থললিতাকে ললিতা বলেই ডাকতেন। “ললিতা” নাকি স্প্যানিস শব্দ তাই তাঁর পক্ষে মনে রাখা শীঘ্র; স্থললিতা বড় বড় নাম, তাঁর মুখ দিয়ে অত কথা ভাল বের হত না। জাহাজে বসত শীঘ্র লোকের সঙ্গে আলাপ হয় এমন আর কোথাও নয়। শীঘ্রই স্থললিতাদের সঙ্গে মিষ্টার রায়ের আলাপ বেশ জমে উঠল। এক টেবিলে বসে খাওয়া, একসঙ্গে ছপরে ডেকের উপর বিজ্রাম করা, একসঙ্গে বিকালে ডেকে টেনিস ইত্যাদি খেলা দেখতে দেখতে মনে হত এর পরস্পরের বহুকালের চেনা।

8

পরদিন জাহাজ সুরেজ পৌছবে। অনেকে সুরেজে নেবে কাইরো সহরে বাবার জন্ত ব্যবস্থা করতে শুরু করেছিল। তাঁর মধ্যে স্থললিতা একজন। সে মিষ্টার রায়কে বল—“চলুন না মিষ্টার রায়, একটা পাটি করে কাইরো যাওয়া যাক—” “কুকের, বন্দবস্ত আছে তবে তারা সাধারণতঃ একটা মোটরে

চারজন করে লোক নেয়। আমরা তিন জন আছি, আর একজন লোক জোটাতে পারলে একটা পাটি করা যায়—” অধীর হয়ে স্থললিতা বলে—“তা’ দেখুন না, সেকেন্ড ক্লাশে ত অনেক বাঙ্গালী আছেন। ওদের মধ্যে কেউ যাবে না—?” “দেখি একজনকে ত খুবই চিনি। তবে তাঁর বয়স হয়েছে, যেতে চাইবেন কিনা বলতে পারি না—।” মিস ব্রমফিল্ডের দিকে চেয়ে স্থললিতা বল, “ন্যান, তুমি একবার মিষ্টার রায়কে বল না? তোমার কথা উনি নিশ্চয় শুনবেন, আমি তখন থেকেই তাঁকে বলছি, কিন্তু উনি গ্রাহ্যই করছেন না—” মিষ্টার রায় হেসে বলেন, “বেশ আরামে বসে আছি, তা আপনি না উঠিয়ে ছাড়বেন না দেখছি, বাই সেকেন্ড ক্লাশে গিয়ে একটু ক্যানভাস করে আসি।” তারপর আর একটু হেসে বলেন, “এর জন্তে কিন্তু একটা ভাল বকশিশ দিতে হবে।” স্থললিতা ও হেসে বলে, “ন্যান দেবে; আমার কথায় ত আপনি ওঠেন নি।” এবার মিস ব্রমফিল্ড নাক থেকে চশমা খুলে হাতের বইখানা বন্ধ করে বলেন, “বেশ ললিতা, আমি এখনও মুখ খুলি নি; আর এর মধ্যে হয়ে গেল যে মিষ্টার রায় আমার খাতির কাইরো ট্রিপের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁর জন্তে আমাকে বকশিশ দিতে হবে?” মিষ্টার রায় হাসতে হাসতে সেকেন্ড ক্লাসের উদ্দেশে চলে গেলেন।

রাত ১২টার সুরেজে জাহাজ এসে থামতেই স্থললিতা এসে দাঁড়াল জাহাজের লম্বা সিঁড়ির কাছে। এখুনি সে নেমে পড়ত কিন্তু মিষ্টার রায় বাধা দিলেন। “দাঁড়ান, এখন না বসেন কেন? জাহাজে আগে মেডিক্যাল ইন্সপেকশন হবে তারপর যেতে পাবেন। তাড়া নেই, চলুন লাউঞ্জে গিয়ে বসি যাক।”

জাহাজে তখন মহা হৈ চৈ। অফিসাররা সব বেজায় ব্যস্ত। ভিন্ন ভিন্ন ট্র্যাভেল এজেন্টরাও এই সুযোগে হটগোল লাগিয়ে দিয়েছে। কাজ শেষ করে টমাস কুকের লোক সঙ্গে নিয়ে কাইরো বাবার বাড়ীরা যখন বাড়ী শুরু করলে তখন রাত একটা। মিষ্টার রায় সেকেন্ড ক্লাস থেকে মহেশ বাবুকে জোগাড় করেছিলেন; তাই একটা ট্যাক্সিতে মিস ব্রমফিল্ড, স্থললিতা মিষ্টার রায় ও মহেশ বাবুকে তুলে নিয়ে

কুকের লোক অভ্যস্ত বাজীরের ব্যবহার লক্ষ্যে এগিয়ে গেল। মিস ব্রমফিল্ড মিটার রায়কে তাঁর ও স্থললিতার মাঝখানে বসতে বলেন। মহেশ বাবু তার আগেই বসেছিলেন গিয়ে ছাইভারের পাশে।

তঁ'থারে মরুভূমি খুঁজ করছে, কোথাও কোন বাছুরের সাড়া নেই, তারই মধ্যে সন্ধ্যা রাত্তাধরে ছুটে চলেছে স্থললিতাদের মোটরখানা। মরুভূমির ভিতর বাবে, অভাব গরম হবে, এই ধারণা ছিল মিস ব্রমফিল্ডের; তাই ওভার কোটের প্রয়োজন হ'বে না। তিনি বলেছিলেন স্থললিতাকে। জীল দুই বেতে না যেতে তাঁর এ ধারণা বদলাতে হল। বেশ ক'নকনে হাওয়া আসছিল দুই ধার দিয়ে। নিজে ইংরেজ মাহু, তাঁর নীত সঙ্গ করা অভ্যাস ছিল, আর তা ছাড়া তাঁর পরনের কোট ও হার্ট বেশ মোটাই ছিল। কিন্তু স্থললিতার সে সব কিছু না থাকার সে ঠাণ্ডায় কমে যাবার জোগাড় হল মিটার রায় ভাড়াভাড়ি নিজের ওভার কোটটা খুলে দিলেন স্থললিতাকে; সে প্রথমে নিতে রাজি হয়নি। তবে মিটার রায় বধন বলেন—“ঠাণ্ডা লাগিয়ে নিউমোনিয়া বাধালে কি ভাল হ'বে? আমার গায়ে গরম কোট আছে, তার উপর ওভারকোট না থাকলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আপনার গায়ে এ ত একটা ছোট আত্মনের রেশমের জামা, ওতে কি এই নীত আটকাতে যেন করেন? আপনি কোট যদি গায়ে না দেন তা হলে কিরে যেতে হ'বে জাহাজে, কাইরো আর দেখা হ'বে না।” তখন স্থললিতা মিটার রায়ের কোটটা নিয়ে পরে ফেল।

মাইলের পর মাইল গিলে ফেলতে লাগল স্থললিতাদের মোটর। ছাইভারের সামনে থেকে মাঝে মাঝে নাক ভাকার আওয়াজে বোঝা গেল মহেশবাবু রাতটুকু মোটরে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিচ্ছেন। মিস ব্রমফিল্ডের অবস্থাও যে তরুণ তাঁও বুঝতে বেশী দেরি হ'ল না। মিটার রায় স্থললিতার দিকে একটু ঝুঁকে নীচু গলায় বলেন—“এঁরা হ'লেন-ত' বেশ ঘুমিয়ে নিচ্ছেন, আপনার ঘুম পারনি?” মাথা নেড়ে স্থললিতা জানিয়ে দিলে যে তার ঘুম পায়নি। স্থললিতার চোখ থেকে ঘুম চলে গিয়েছিল অনেক দূরেই। অনেকগুলি ভাবের ছোট লেগে গিয়েছিল তার মনের ভিতর। কাইরো, মরুভূমি, পিরামিড, ফিস টুটেন

খাসেনের দৃষ্টি চিহ্নের সঙ্গে তার পাশের এই লোকটিও যেন কেমন করে জড়িয়ে গেছে। শুধু কাইরো দেখা হবে, এই কি তার উৎসাহের প্রধান কারণ, না এই লোকটির সঙ্গে কাইরো দেখা হবে তারই অল্প জনের এই ক্রত স্পন্দন, এই চকলতা? কথাটা নিজের কাছেও স্বীকার করা যায় না।

খানিক পর মিটার রায় আবার স্থললিতাকে জিজ্ঞেস করলেন “ক্ষিদে পেরেছে?” কথাটা জিজ্ঞেস করার কারণ ছিল। ডিনারের সময় স্থললিতা বলতে গেলো কিছুই খায় নি। মিটার রায় সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। যুহু হেসে স্থললিতা বলে—পেলেই বা করছি কি? এ মরুভূমির মধ্যে খাবার পাব কোথায়? একটা ছোট প্যাকেট স্থললিতার হাতে দিয়ে মিটার রায় বলেন “এই নিন।”

বড় বড় শ্রাব চকোলেট বেকল তার ভিতর থেকে। স্থললিতা একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, “আনি না কি করে বুঝেছিলেন ক্ষিদে পাবেই আমার, বা হ'ক এটা এনে উপকার করেছেন, সত্যিই ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি একা এত খেতে পারব না, আপনাকেও খেতে হবে।”

“আমি ও আপনার মত ডিনার না খেয়ে যেই নি, আমার খাবার প্রয়োজন নেই। আপনি খান।” স্থললিতা গম্ভীর ভাবে বল, “আপনি যদি না খান, ত' আমিও খাব না।” তারপর খানিকটা চকোলেট ভেঙে মিটার রায়ের হাতে ওজে দিয়ে বলে—“লক্ষ্মীট খান, আমার বেলার ক্ষিদে পেরেছে।”

হুজনে চকোলেট খেতে শুরু করে দিলে। খাওয়া সাদি হতে স্থললিতা বল—“মিষ্টি ত' ওচ্ছের খাওয়ালেন, এখন তেটার যে প্রাপ বাচ্ছে।”

“তারও ব্যবস্থা আছে। আপনি যে ওভারকোটটা পরে আছেন তার বা দিকের পকেটে হাত দিয়ে দেখুন একটা ছোট ক্লাস আছে। গরম কফি পাবেন।”

পকেট থেকে ক্লাস বার করতে করতে স্থললিতা বল, “আপনার মত খটফুল লোক খুব কম দেখা যায়।” তারপর ক্লাসটা মিটার রায়ের হাতে দিয়ে বলে, “খুলে একটু ঢেলে দ্বিন ত।” মিটার রায় ক্লাসের সুখের পাত্রটিতে খানিকটা কফি ঢেলে দিলেন। স্থললিতা পাত্রটা রায়ের দিকে এগিয়ে

দিয়ে বল্লেন “আপনি খেয়ে নিন, আমি পরে খাব।” বাধা দিয়ে মিষ্টার রায় বল্লেন—“না না তা’ কি হয়। লেডিস ফাষ্ট, আপনি খেয়ে নিন।” আর বেশী কথা না বলে স্থললিতা কফিটা খেয়ে নিল। তারপর বল্লেন, “এটা কি দিয়ে ধোঁব বসুন ত! এঁটো হয়ে গেল যে। আপনি না হয় একটু কফি এতে দিন, ভাই দিয়ে ধুয়ে ফেলি।”

“অত করতে হবে না। এই মরুভূমির ভিতর সঙ্গে যেটুকু পানীয় আছে তার এক ফোঁটাও বাজে খরচ করতে চাই না। দিন কাপটা।” স্থললিতার হাত থেকে পাত্রটি নিয়ে মিষ্টার রায় তাতেই কফি খানিকটা ঢেলে স্থললিতার দিকে চেয়ে বল্লেন—“আর একটু খাবেন না? এক চুমুকও নয়?” পাত্রটা তিনি প্রায় স্থললিতার ঠোঁটের কাছ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে স্পর্শও বোধ হয় করেছিল। স্থললিতা তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে নিষে বল্লেন—“না, আমি আর চাই না। তবে আপনি ওটা না খেয়ে সোজা বোতল থেকে খান না ওটা ফেলে দিন।” কোন কথা না বলে মিষ্টার রায় সেই পেয়াল থেকেই খেতে শুরু করে দিলেন।

দেখতে দেখতে ভারাকুলি নিভে এল, আর সেই সঙ্গে পূব আকাশে একটা গোলাপী আভাও দেখা দিল। মিষ্টার রায় স্থললিতাকে বল্লেন—“রাতটা ত শ্রেক জেগেই কাটান গেল।” স্থললিতা হেসে বল্লেন—“হাঁ, এবার ত ভোরের আলো দেখা দিয়েছে ছ চারটে গাছ পালা আর ঘর বাড়ীও ত’ দেখা যাচ্ছে।”

“এবার মরুপ্রান্ত ছেড়ে আমরা মহরের ভিতর এসে পড়েছি। ঐ দেখুন দূরে হেলিওপলিস দেখা যাচ্ছে, এর পরই কাইরো।” তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে মহেশ বাবুকে একটু আশ্বাস করে বল্লেন—“কি মশায়, আর কত ঘুমবেন? ভোর হয়ে গেছে যে। আর ৫।১০ মিনিটের ভিতর কাইরো এসে যাবে। স্বর্ঘ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুমন্ত সহর কেমন করে জেগে ওঠে, একবার চেয়ে দেখুন।”

মহেশবাবু গা ঝাড় দিচ্ছে উঠে বসলেন। কথা বার্তার আওরাজে মিস ব্রমফিল্ডেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তিনিও এবার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে চশমাখানা বের করে চোখে এঁটে

চারিদিকে চেয়ে স্থললিতাকে বল্লেন—“ললিতা মাই ডিয়ার একটু কি ঘুমতে পেরেছিলে?” তারপর মিষ্টার রায়ের দিকে চেয়ে বল্লেন আপনার কি খবর মিষ্টার রায়? দয়া করে ত নিজের কোটটা মিস মুর্ফাজীকে দিয়ে দিলেন। এর দরুণ নিজে ত শীতে কষ্ট পাম নি?” “কিছু মাত্র নয়” বলে মিষ্টার রায় অল্প প্রসঙ্গ পাড়লেন।

সেপার্ডস হোটেলের সামনে মোটর এসে থামল। কুকের লোক সামনেই ছিল; সে বাত্মীদের নামিয়ে হোটেলের ভিতর নিয়ে গিয়ে ঘর ঠিক করে দিল। সকলে হোটেল রেজিষ্টারে নাম লিখে নিজেদের ঘরে চলে গেলেন। একটা ঘরে স্থললিতা ও স্থানের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আর তার পাশের ঘরটি নিষ্কিষ্ট হয় মিষ্টার রায় ও মহেশ বাবুর জন্য। মিষ্টার রায় মিস ব্রমফিল্ডকে বল্লেন—“এখন থেকে ৮।০টা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমান। ৯টায় ব্রেকফাস্ট খেয়ে, ৯।০টায় সাহারার ভিতর যাওয়া যাবে। কুকের ড্রাগোমান ঐ সময় হাজির থাকবে।” “আচ্ছা ধন্যবাদ,” বলে মিস ব্রমফিল্ড স্থললিতাকে নিয়ে নিজেদের ঘরে চুক গেলেন।

ঠিক ৯।০ টায় এসে হাজির হ’ল কুকের ড্রাগোমান। মহেশবাবুর মরুভূমি দেখবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি কেবল কাইরো এসেছিলেন এখানকার মিউজিয়ামটি দেখবার জন্য। তিনি আলগা ট্রামে করে চলে গেলেন মিউজিয়ামে। বাকি তিন জন কুকের লোককে সঙ্গে নিয়ে সাহারার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

মীনা হাউসের সামনে মোটর থেকে নেমে উঠের পিঠে চড়ে মরুভূমির ভিতর যেতে হবে শুনে মিস ব্রমফিল্ড বলে উঠলেন—“আমি উঠের পিঠে চড়তে পারি না। সারা রাত মোটরে বসে আমার গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে, আমি এই মোটরেই বসে থাকব। তোমরা তখন পিরামিড ও স্ফিংস দেখে এস।” স্থানকে ছেড়ে যেতে স্থললিতার খারাপ লাগছিল। অথচ পিরামিড দেখবার লোভ ও সে ছাড়তে পারছিল না। তাই ছ একবার মুহু যাপত্তি জানিয়ে সে যাওয়াই ঠিক করল। মিষ্টার রায় মিস ব্রমফিল্ডকে “মীনা হাউসের ভিতর নিয়ে গিয়ে লাটজে বসি: হাণ্ড পানায়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে স্থললিতাকে নিয়ে মরু ভূমি দেখা যাত্রা করলেন।

ফিংসের সামনে একজন করাসী ফোটোগ্রাফার দোকান খুলে বসেছেন। এখানে উটের পিঠে চড়ে অনেকে ছবি তোলান। মিষ্টার রায় ও স্থললিতাকে দেখে ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মিষ্টার রায় স্থললিতাকে বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন তার ছবি তোলবার ইচ্ছা আছে কিনা। স্থললিতা বললেন—“বেশ ত’ উটের পিঠে চড়ে একটা ছবি নেওয়া যাক না, মরুভূমির একটা চিহ্ন থেকে যাবে।” মিষ্টার রায় ফোটোগ্রাফারকে স্থললিতার ছবি তুলতে বলে নিজে একটু দূরেই সরে গেলেন। করাসী ফোটোগ্রাফার ভাঙ্গা চোরা ইংরাজিতে স্থললিতাকে বলল, “আপনার স্বামীকে বলুন আপনার উটের মুখ ধরে দাঁড়াতে; তা’ হলে ছবিটি চমৎকার হবে। আপনারা দুজনেই এত সুন্দর! এমন সুন্দর লোকেদের ছবি তোলবার সুযোগ আমি অনেকদিন পাইনি।” বৃদ্ধ ফোটোগ্রাফারের কথায় স্থললিতার শুভ্র গালে একটা ফিকে গোলাপী আভা ফুটে উঠল। কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে সে মিষ্টার রায়ের উদ্দেশ্যে বলল—“ওনছেন, আপনাকে না নিয়ে ভদ্রলোক ছবি ওঠাবেন না, ওঁর আঁকার আপনাকে আমার উটের মুখ ধরে দাঁড়াতে হবে। আপনার মত সুপুরুষকে উনি ছবি থেকে কিছুতেই বাদ দিতে পারবেন না।”

হাস্তে হাস্তে মিষ্টার রায় বললেন—“তার মানে বিউটি এণ্ড দি বিষ্টের একটা বিজ্ঞাপন ছাপাতে চায় আর কি।” ফোটোগ্রাফার ততক্ষণ মিষ্টার রায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—“আমুন মহাশয়, অত দূরে উটের পিঠে চড়ে ছবি না নিয়ে আপনার স্বামীর উটের মুখ ধরে দাঁড়ালে ছবিটি

আরও মানাবে। মিষ্টার রায় একবার স্থললিতার দিকে চাইলেন। ফোটোগ্রাফারের কথা সে শুনতে পেয়েছে কিনা তার মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। গাল দুটো তার একটু অস্বাভাবিক রকম লাল বলে মনে হ’ল, তবে সেটা গরমের জন্তুও হতে পারে মনে করে মিষ্টার রায় তাড়াতাড়ি উট থেকে নেবে পড়ে স্থললিতার কাছে এসে বললেন—“আপনার ফোটোগ্রাফার দেখছি নাছোড়বান্দা। ওর কথা না শুনলে অনেকক্ষণ ধরে বকাবে।”

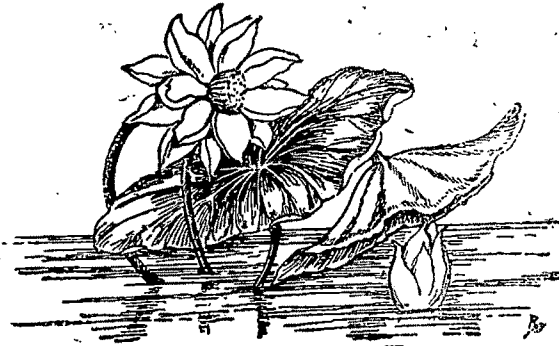
হেসে স্থললিতা বলল—“সময় নষ্ট করে আর কি হবে যা বলছে তাই করুন।—” ছবি তোলা সঙ্গ করে মিষ্টার রায় নিজের ক্যামেরাতে ফিংস এবং আশে পাশে যে ছ’ চারটে মিশরের প্রাচীনকালের পুরোহিতদের কবর ছিল তার ছবি তুললেন। লাল সিল্কের ছাতাটা খুলে স্থললিতা একটা বড় শিলা খণ্ডের উপর বসেছিল। সে মিষ্টার রায়কে বলল—“আমার ক্যামেরাটা আনতে ভুলে গেছি, আপনি যে যে ছবি নিলেন সেগুলি যখন প্রিন্ট করাবেন তখন আমাকে এক এক কপি দেবেন—বুঝলেন?” “তা’ দেব, কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা বোকশিষ পাওনা আছে তা’ মনে আছে?”

“বোকশিষ? কিসের জন্যে?” “এর মধ্যে ভুলে গেলেন? কাইরো আসবার ব্যবস্থা করে দিই নি আমি?” “ওঁ হ্যাঁ, তা কি চাই বলুন—!”

আপনার একখানা ছবি তুলতে আমার অম্মতি দিন।”

“ও এই বোকশিষ! তা তুলুন না, তাতে কি আর—” মিষ্টার রায় স্থললিতার অনেকগুলি ছবি তুললেন।

(ক্রমশঃ)



পাটনার খোদাবক্স লাইব্রেরীতে কয়েক ঘটনা

শ্রীশান্তিনাথ, বি, এ

বিহার অঞ্চলের কোনও গ্রামে বা শহরে এর আগে কোনও দিন আমার আসা হয় নি। তাই শুধু পাটনা শহরটা দেখেই বেশ অভিনব মনে হচ্ছিল। বাংলা দেশের মতই লাগল প্রায় সব, খালি সারা বছর জুড়ে বাংলাদেশে যে একটা ভিজ়ে ভিজ়ে আবহাওয়া, তার কোনও অভাস নেই বিহারে। হয়ত খানিকটা এই কারণেই পাটনা শহরটা, শহর হওয়া সত্ত্বেও বেশ পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয়েছে।

লোকালয় থেকে দূরেই ছিলাম আমরা। তার খোলা মাঠ আর নির্মল আকাশের অনেক খানিই চোখে পড়ত দিনরাত।

ঠিক কলকাতা সবারই মিলে একবার শহরের ভিতর দিকটা দেখে আসব। পথে পাটনার মিউজিয়ামটা খোলা থাকলে সেই সঙ্গে সেটাও দেখা হবে। সবারই আশ্বাস মিল—“আজ খোলাই থাকবে।”

পরমোৎসাহে সাইকেল-রিকস চড়ে সবারই বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তাগুলি দেবদারু, ঝাউ প্রভৃতি গাছের মধ্যে দিয়ে সোজা এগিয়ে চলেছে। গলির আধিক্য একেবারে নেই। মিউজিয়ামের কাছে এসে দাঁড়াতেই গ্রহরী বল্ল বে, পূজা উপলক্ষ্যে দু’দিন মিউজিয়াম বন্ধ থাকবে। আমাদের সব উৎসাহ এক মুহূর্তে নিভে গেল। কিন্তু কেহই সহজে আর বাড়ী ফিরতে না চাওয়ায় ঠিক হল শহরের ভিতরটা দেখে আসব। কয়েকটি নতুন রাস্তা পেরিয়ে খোলা ময়দানের পাশ দিয়ে গিয়ে পড়লাম পাটনা শহরের পুরানো রাজপথে। কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলের মত সরু রাস্তা। বাস আসছে, যাচ্ছে, তীর্থযাত্রীদের মত দল বেঁধে হুদিক দিয়ে লোক যাচ্ছে, সাইকেল, রিকস, ঘোড়াগাড়ী, টংগা, ঠেলাগাড়ী চলেছে স্রোতের মত, রাস্তার দু’ধারে নানা রকম দোকান। মাঝে মাঝে থাকবার বাড়ীর কালো কাঠের রেলিং দেওয়া ঝোলান বারান্দাগুলো ধুলোর ধোঁয়ায় বাপসা বাপসা চোখে পড়ে। টানা লম্বা রাস্তা মাইলের পর মাইল চলে গেছে। যেতে যেতে কত রকম লোক চোখে পড়ছিল তার ইয়ত্তা নেই।

হঠাৎ দেখি হলদে রংয়ের একটি বাড়ীতে কালো অক্ষরে

লেখা “খুদাবক্স লাইব্রেরী।” সবারই হৈ হৈ করে গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়লাম। ভিতরে গিয়ে শুনলাম, রবিবার দূর দেশাগত দর্শকদের জন্ত আজ বিশেষ করে কতকগুলি বিভাগ খোলা। ভিতরে ঢুকতেই একজন বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক আমাদের যত্ন করে কিছু কিছু বইয়ের ছবি ও কিছু পিতল কাঁসার পুরানো বাসন দেখাতে দেখাতে একটি পাশের ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরটির চারিদিকে মস্ত বড় বড় লোহার সিল্কাক। দু’ একটি চেয়ার ও মস্ত বড় একটি গোল কাঠের টেবিল। আমাদের মধ্যে যারা ছেলে মানুষ তারা দুই একবার চেয়ারে বসেছিলাম, বেশীর ভাগ ঠাড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে ছবি দেখেছি। ভদ্রলোক প্রথমে ঘরে ঢুকেই আমাদের পরিচয় নিলেন।

সৌভাগ্য বশতঃ অনেকের আত্মীয় স্বজনই তাঁর পরিচিত প্রমাণ হলেন।

ভদ্রলোক নিজে এই লাইব্রেরীর দর্শকদের সাহায্য করবার জন্তই প্রতি রবিবার সকাল থেকে বেলা ১১টা অবধি ঐ ঘরটিতে বসে অমূল্য কতকগুলি ছবির বইতে রোদ, হাওয়া দেন, কোনও দর্শক এলে, অমান্বিক ব্যবহারে মুগ্ধ করেন ও অভ্যস্ত যত্ন করে কত শত বছরের পুরনো ছবির বই দেখান। বয়েস ৬০ বৎসর আন্তাজ। কলকাতার প্রথম ভারতীয় প্রধান বিচারপতি, এক মুসলমান ভদ্রলোকের, পুত্র। কিছুক্ষনের জন্ত মাত্র ছিলাম ভদ্রলোকের ছবির ঘরে, কিন্তু যখন চলে এলাম তখন মনে হোল যেন কতদিনের পুরনো বন্ধুকে ছেড়ে আসছি।

পাশিয়ার মুসলমান চিত্রকরদের আঁকা ছবিই দেখলাম বেশী কিছু রাজপুত ছবিও ছিল। সম্রাট বাবর জয়গ্ৰন্থ করার বছ বছর আগে থেকে বাহাউর শাহের রাজত্বের শেষ অবধি ছবিতে ঝলমল করে উঠিল চোখের সামনে ঐ কয়েক ঘটনা যেন বছদিন আগের মুসলমান সভ্যতার মধ্যেই কাটিয়ে এসেছিলাম মনে হয়।

যিনি দেখাচ্ছিলেন তিনি যে অভ্যস্ত রসিক সে পরিচয়ও

পেলাম তাঁর কথার বার্তায়। আমাদের সঙ্গে একজন ভদ্র-লোক ছিলেন তাঁকে ক্রমাগতই ইনি বলে গেলেন যে, 'জিশাৎ ও জেবউরেন্সার আখিপল্লব' দেখে আপনি প্রেমে পড়ে যাবেন।' আমরা আধুনিকা ও অল্পবয়সী দেখে, কোন বাদশাহের জামার মখমল, বেগমের ঢালাই মসলিনের উড়ুনী ও পেশোয়ার্জ দেখলে হিংসেতে মরেই যাব ভাবি বসেন।

ছবিগুলি কি আশ্চর্য সুন্দর ও নিখুত দেখে অবাক হয়েছি বার বার। সব চেয়ে বড় ছবি ৮" ইঞ্চি × ১' ফুট, বাকি সবই ৬" ইঞ্চি × ৪" ইঞ্চি প্রায় কিন্তু ঐ টুকু জায়গার মধ্যে কি অদ্ভুত রং মেলানো, কি অদ্ভুত স্বচ্ছ কাজ। কোন কোন জায়গায় শুধু ঘোড়ার ল্যাজের একটি চুল দিয়ে কাজ করা। ছবির প্রত্যেকটি মানুষের মুখ আলাদা আলাদা রকম গড়নের এবং প্রত্যেকের চুল, দাড়ি ও চোখের পাতি পর্যন্ত গোনা যায়। একটি হরিনের ছবি দেখলাম, মনে হচ্ছিল হাত বুলোলে উঠু, নীচু, নরম ও গরম গাটা যেন অল্পভব করতে পারব তারও গায়ের প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম লোম গোনা যায়।

বাদশাহ ও বেগমদের বসবার জন্ত সপ্তাহের প্রতিদিন আলাদা রংএর ঘর থাকত। কালো ঘর, সোনালী ঘর, ফিকে সবুজ, গার সবুজ, ফিরোজা, গাঢ় লাল ও সাদা এই সাত রং এর সাতদিনের ঘর। ছবিতেও তাই আঁকা আছে, বাদশাহদের ঘরের দেওয়ালে, ছাদে গালিচায় সোনালী কাজ। সাদা, লাল, গোলিগা, হলুদ ও নীল রংএর গোলাপ লম্বা মুখের ফুলদানীতে সাজানো, মরশুমি ফুলও কিছু কিছু দেখলাম। যে রংএর ঘর সেই রংএর কাপড় পরা বেগম ও বাদশাহরা বসে। বেগমদের অনেকের পরনেই জলের মত স্বচ্ছ মসলিনের উড়ুনী ও ষাংরা গার বিংখাবের পেশোয়ার্জ ও জামার উপর পরা। বাদশাহদের দরবারী পোষাগ অনেকেরই লাল মখমল সত্যি মখমলের মত উঁচু হাটুও নরম করে আঁকা। হাতে বাদশাহের সোনার অলিবোলা নল ও বেগমের হাতে সোনার আভরনানী।

দরবারে কত পরিষদ, মন্ত্রী, -পণ্ডিত, গায়ক ও তাঁদের নানান যন্ত্র, এমন জীবন্ত মানুষগুলির চেহারা যে মনে হয় যেন নিজেই সেখানে দাঁড়িয়ে আছি। বাদশাহ যেন একুনি কথা বলবেন। যুদ্ধের ছবিতে কত অসংখ্য মানুষ প্রায় গোনা

যায় প্রত্যেকের চেহারা আলাদা। হাতী, ঘোড়া, হাজার রকম অস্ত্র। বা ছ' একটি গাছ ছবিতে দেখা যায় তার পাতার প্রতি দিরা উপশিরা গোণা যেতে পারে। কি নিপুণতা ও ধৈর্য যে প্রতি জিনিষের অঙ্গণে ফুটে উঠেছে—দেখে প্রতি মুহূর্তে নতুন করে বিস্মিত হতে হয়।

এরপর ভদ্রলোক-কতগুলি বিশেষ ছবি দেখালেন। কখনকার ছবি জিজ্ঞেস করায় বলেন: "যখন বৃটিশরা প্যান্টলুনও পরতে শেখেন নি তখনকার ছবি।" অবাক হয়ে গেলাম দেখে, ঐ সময়ের বহু ছবিতে পারস্যদেশীয় ভদ্রমহিলারা উঁচু গোরালির জুতো পরা। কেউ চলেছেন ঘোড়া চড়ে shortsও হাতকাটা সার্ট পরে। কোনও কোনও মহিলার মাথায় টুপি, তাতে উট পাখীর পালক। উদ্যানে ভ্রমণরতা মহিলা—আধুনিকা বৃটিশ মহিলাদের মত ছোট স্কার্ট ও Cloak পরা। ছবিগুলি দেখে অত্যন্ত বিস্মিত মনে ভাবলাম, ইউরোপীয় সভ্যতা কি সবটাই পরের ধার করা!

ছবিগুলি দেখে মনে হচ্ছিল, কোনটা যেন সবে গতকাল আঁকা হয়েছে—কোনটা বা বছর কয়েক আগে আঁকা হয়েছে। প্রশ্ন করলাম—“এমন সুন্দর এখনও নূতনের মত আছে—এগুলি কি রং?” ভদ্রলোক বলেন! “আপনি দেখছি বড় বেশী কৌতুহলী, শুনলে অবাক হ'বেন এঁরা সাধারণ রং ব্যবহার করতেন না, বহুমূল্য রত্নাদি গুড়ো বা ঘসে তাঁরা রং তৈরী করতেন।”

নীলা ঘসে নীল রং, পদ্মরাগ ঘসি ঘসে লাল রং, পাঁচা ঘসে সবুজ রং, সোণা দিয়ে সত্যি সোণার রং, এ ছাড়া বহু রত্ন তাঁরা এজন্ত ব্যবহার করতেন।

ছবির মধ্যে থেকে জিশাৎ বেগম, যোধবাজ, জেবউরেনসা, মমতাজ মহলের ফুলের মত মুখগুলি এখনও চোখ বুজলে ভেসে ওঠে; চোখের সামনে প্রত্যেকটি সুন্দরীর নীলোৎপলের মত আখিবুগল যেন এখনও সেদিনের মত চোখের সামনে ভেসে উঠে কত অজ্ঞাত গোপন কথা শোনাতে চায়।

সব দিক দিয়েই ঐ যুগের মুসলমান নবাব ও বাদশাহরা কি সৌখীন ছিলেন তাই ভাবি। এত সৌন্দর্যবোধ ও এত স্বকৃতি তাঁদের মধ্যে ছিল, তাঁদের মধ্যেই আবার কি ধ্বংসের নেশা ও রক্ত পিপাসা দেখতে পাই ইতিহাসের বই মারফৎ!

এই লাইব্রেরীতে কি ভাবে যে এতদিনের ছবি এঁরা রেখেছেন জানি না। ছবির উপর কেউ হাত দেন না শুনলাম। ভাইসরয় ও গভর্নর ইংরাজ আমলে যারা ছিলেন, তাঁদের অনেককেই এই ছবির বইগুলি দেখানো হয়নি, পাছে তাঁরা নিয়ম না শুনে ছবিতে অপবিত্র হাতের স্পর্শ দেন, পাছে তাঁরা এগুলি বলপূর্বক তাঁদের দেশে নিয়ে যান। অথচ আমরাও অমুসলমান কিন্তু আমাদের হাত বার কয়েক ছবিগুলি স্পর্শ করে গেল—তাতে কিছুমাত্র অস্বস্তি হলেন না ভদ্রলোক কল্লেন: “ভারতবর্ষীয়দের স্পর্শ ওতে অনেক আছে—আর একটু লাগলে ক্ষতি নেই।”

লাইব্রেরী ও এই ছবিগুলি সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতামত তাঁর মুক্তাঙ্করে গদ্য কবিতায় রচিত, বাঁধানো রয়েছে একটি কাঁচের আলমারীতে। তিনি বলেই তেমন স্বর্গীয় ভাষায় তাঁর ভাব ব্যক্ত করতে পেয়েছিলেন। আমাদের মত নগ্ন মাহুষ, মনে যাই ভাবি, ভাষায় তা’

ফোটাতে কোনও দিন পারব না। একটি বিরাট বাঁধানো খাতায় দেখলাম ভারতবর্ষের বহু স্বযোগ্য সন্তানের নাম লেখা—তঁরা এসেছিলেন লাইব্রেরী দেখতে এবং কেন আরও বেশী সময় ধরে ছবিগুলি দেখতে পাননি, তার জন্ত প্রায় সবাই দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত দেখলাম একটি আলাদা পাতায়।

আমরা চলে আসার সময় ভদ্র লোকটি আর যত্নাথ সরকারের অনেক প্রশংসা করলেন। ইনিই একমাত্র বাঙালী হিন্দু যিনি তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের সাহায্যে পারস্যের মুসলমানী ইতিহাস, ছবি, লিপি, গ্রন্থ উদ্ধার করে বহু অবলুপ্ত গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী ও তথ্য বিশ্বদরবারে পুনপ্রতিষ্ঠা করেছেন ইতিহাসের ছাত্রী বলেই মনে হোল আমার, এত বছর বই পড়ে যে বিদ্যা লাভ করিনি ও কৌতুহল মেটাতে পারিনি তার অনেকটাই এই কয়েক ঘণ্টায় মিটাতে পারলাম।

আকাশের ব্যথা

কবি শেখর কালিদাস রায়

দিনের আলোকে

নীলাকাশ তার

বেদনা ভুলিয়া যায়।

ধূসর ধরার

ধূলি ধূমজাল

সে ব্যথা ঢাকিয়া রাখে।

নিশীথে গোপন

বেদনা তাহার

ফুটে উঠে সারা গায়।

ব্যথা ভুলবার

চারিদিকে তার

কিছু নাহি আর থাকে।

ছল ছল করে

লোচন তাহার

জল জল করে ব্যথা

ভরাষ তারার

জগে উঠে তার

হৃদয়ের কাতরতা।

আম্পনার কল্পনা

শ্রীঅসিত কুমার হালদার,

অধ্যক্ষ, গভর্ণমেন্ট চারু ও কারু বিদ্যালয়, লক্ষ্মী।

বঙ্গলক্ষ্মীর ঘরের আম্পনার কল্পনা যে কত যুগ ধরে চলে আসচে তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তার ছিঁরি আর ভেমন নেই; আধুনিক ইংরাজী শিক্ষা গর্বিত বঙ্গলক্ষ্মীর ঘরে তার চর্চা ত নেইই, দিন দিন নতুন ঠান্দারাও তার রেওয়াজ ছেড়ে দিয়েছেন। বঙ্গলক্ষ্মীর ছোট ছোট ব্রত কথকতা, পূজোতে ঘরে ঘরে আম্পনার আঁচড় পড়ত, আর ঘরগুলি যেমনই আভিজাত্য শূন্য হোক না কেন শিউলি ফুলের মত ফুটফুটে মগুন লতায় আলো হয়ে থাকত। মেটে কোটায় সামা আম্পনা একটা কল্পনা করবারই সামগ্রী ছিল।

বাংলায় চারু শিল্পের পূর্ণ বিকাশ না হলেও প্রবর্তন যে হয়েছে তার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে কারু শিল্পের দিকে কারু নজর পড়তে দেখা যায় না। এ বিষয় আমরা প্রবাসীর পৃষ্ঠায় এবং অস্থায়ী মাসিক পত্রিকায় একাধিকবার আলোচনা করেছি। কিন্তু সেটা বঙ্গলক্ষ্মীদের গোচর করবার জ্ঞান পুনরায় পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে বলে আশা করি পাঠিকাবৃন্দ আমাদের ক্ষমা করবেন।

কারুশিল্পের প্রধান কাজ কারুকাৰ্য্য এবং সেই কারুকাৰ্য্যের গোড়ায় রয়েছে পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার পোষণ নানা দেশে নানা দিক দিয়ে হয়েছে—মোগলাই আমলের ডালিম আনার ফুল, বিলিতি আদুর লতা, দেশী পদ্মফুল ইত্যাদি নানা জিনিষকে অবলম্বন করে। ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশের মগুনরীতির বেশ একটা তফাৎ টের পাওয়া যায়—কিন্তু তা ছাড়াও প্রত্যেক দেশের মগুন চিত্রের এক একটি বিশেষ রূপ আছে যা দেখলেই বলা যায় “এটি মোরাদাবাদী কাজ”, “এটি সাহাবানপুরী”, “এটি কাশ্মিরী”, “এটি ফরাকাবাদী”, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্গালার আম্পনা ছাড়া একরূপ মগুনরীতির ঢং বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের আম্পনার কল্পনাকে এই কাজে লাগালে আমাদের দেশের

একটা ছাপ তাতে পড়বে এবং কারু শিল্পের কারিগরীর শ্রী বাঙ্গালার একটা বিশেষ ছাঁদে ধরা দেবে। খালি যে, স্বচের কাজে বা নক্সার কাজে আম্পনা কাজে লাগাবে তা নয়, বাসনে কোমনে, আসবাবপত্রে, বস্ত্রশিল্পেও তাকে কাজে আনা যেতে পারে। আম্পনা যা’ পুরানো ধাঁচের, তার প্রবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে নব নব কল্পনায় আম্পনার নতুন জীবনের সঞ্চার করতে হবে। একজন বঙ্গলক্ষ্মীদের হাতে এককালে গড়ে উঠেছিল এখনও আশা করা যায় যে নব নব আম্পনারূপে আবার তাঁদেরই হাত থেকে গড়ে উঠবে। আম্পনা আঁকতে যারা সিদ্ধহস্ত তারা জানেন যে, তাঁদের হাতে যা কিছু ছুঁনিয়ায় দেখা যায় সব জিনিষের স্বছাঁদটিকে নিংড়ে বার করে নিতে পারে এই আম্পনার কল্পনায়।

আম্পনা অল্পনা—অর্থাৎ যথাইচ্ছা নানান নব নব রচনায় তার পুষ্টিসাধন ও শ্রীবৃদ্ধি করা যায়। এটার বিস্তার খেলার ছলে এতদিন হয়েছিল এবং সেটা এখনও হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। আম্পনা আঁকায় শ্রীজাতির শ্রীবোধের একটা সম্পূর্ণতা দেখা যায়। শিল্পরচনায় গোড়ার কথাই হল শ্রী-স্বছাঁদ এই স্বছাঁদটিকে আম্পনার লতা পাতায় মোচড়ের ভিতড় নানান বন্ধন রেখায় রেখায় দেখা যায়। আম্পনা দেখলেই একটা শুভ অস্থানীয়ের কথা মনে আসে। একবার অল্পদিন পূর্বে লাটসাহেবের শুভাগমনে কোন বিভাগায়ের ছেলেরা এই আম্পনায় সমস্ত বিভাগায়টিকে শোভিত করেছিল। লাট-সাহেব বিভাগায়টিকে মগুন লতায় উজ্জল হয়ে আছে দেখে ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে বলে উঠেছিলেন “why this ceremony?” এই ceremony বা শুভাঙ্গুষ্ঠানের ভাব গৃহ সজ্জার ভিতর ফুটে উঠতে পারে যদি আমরা এই আম্পনাকে কাজে লাগাই। বাংলাদেশের এই ছেলায়—আঁকা আঁকাবাকা গৃহশিল্প দেশ বিদেশে আদর পেতে পারে যদি আমরা তার কদর বুঝি এবং

আল্পনার আলিঙ্গনে গৃহস্থীর অহুষ্ঠান কার। বজ্রবয়ন কাজে পাড়ের নক্সা ঢাকা অঞ্চলে পুরানো যা ছিল তা এখন আর দেখা যায় না। সামা খালি কাপড়ের উপর যদি আল্পনার নক্সা ছাপা যায় ত তার কদর সব যায়গায় হয়। এখনকার দিনে কারুশিল্পে দ' পড়েছে তার আর কোনই কারণ নেই—তার মধ্যে প্রাণ নেই বলে। এই নক্সা বিলাত বা জাপান হতে চালান হয়ে আসবে আর আমরা সস্তাদরে সেগুলি ঘরে বরণ করে নিচ্ছি। কাপড়ে নক্সা ছাপার নানা কৌশল ভারতের নানা দেশে এখন প্রচলিত আছে এবং তার প্রাণালীগুলি অমিত্র করতে আমরা আমাদের আল্পনায় মগ্নিত করে তুলতে যদি পারি তাহলে সেগুলি সস্তা হয় এবং সহজলভ্যও হতে পারে।

যবদীপের বাতিশিল্পের কথা হয়ত অনেক জানেন। মোমবাতি গলিয়ে কাপড়ে ছোপ দিয়ে নানান রংয়ে ছোপান যায়। এই প্রণালীতে এখন ইউরোপে ঘরে ঘরে মেয়েরা কাপড় রঙাচ্ছেন নানা নক্সা একে। আমরাও এই প্রণালীতে সহজে নানা আকারে একে কাপড় ছোপাতে পারি। অনেক হয়ত ভাববেন যে, প্রাদেশিকতা রক্ষা করতে শিল্পকলার অহুষ্ঠান শুভ না হতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ দেখা গেছে এইরূপ প্রাদেশিকতা রক্ষা করেই অনেক প্রাচীন শিল্প ভারতের নানা স্থানে এখনও বেঁচে আছে। কালীর বাসনের উপর দেবদেবীর নক্সা মোরাদাবাদী বাসনের সূক্ষ্ম লতাপাতার মডুরী অর্থাৎ মণ্ডন আপন আপন বিশেষত্বে মগ্নিত হয়ে বহুগুণ ধরে আদর পেয়ে আসচে। এইভাবে আপন বিশেষত্বটিকে ফুটিয়ে বাংলার তৈজসপত্রকে আল্পনার কল্পনায় ভূষিত করে তুলতে পারলে; বাঙলার শিল্পকলারও গৌরব বৃদ্ধি হবে এবং দেশ বিদেশে বাংলার আর্ট হিসাবে প্রচার হবে। ইউরোপ ইটালী, ফরাসী, জার্মানী, রুশ সকল দেশের আপন আপন বিশেষ ছাঁদের একটি শিল্পকলা আর তার একটি বিশেষ ধরণ ধরা যায়। ভেমনি বাংলার আবহাওয়ার উপযোগী তারই অন্তরের জিনিষ আল্পনাটিতে যদি বঙ্গলক্ষ্মী সজ্জিত হন ত বাংলার সাদাসিধা নূতনত্বের বিকাশ সহজে হতে পারে। কলের ছাঁচের আর আল্পনার সাবলীল আঙ্গুলি লেখনের তফাৎ বোধ হয় সহজে ধরা পড়তে পারে এবং বাজারের

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকেও যেতে পারে। যখন আমরা সুন্দরের পূজায় জীবন চলেদি তখন আর আমাদের সর্গোত্তা প্রাদেশিকতার ছাপটিকে অলঙ্ঘন করে থাকতে পারে না। বরং বাঙ্গালীর জাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে গড়ে ওঠা আল্পনার কল্পনা দেশ বিদেশে বাংলাকে প্রচার করে তুলবে। শিল্পকলা এই হিসাবে কোন সর্গোত্তাকে আশ্রয় করে বাড়তে পারে না।

আমাদের দুর্গা প্রতিমার চালচিত্র, কালীঘাটের পট, এগুলিকে যদি আমরা ব্যবহারে লাগাতে পারি ত আমাদের ঘরের পর্দায় গৃহিনীর ওড়নায়, বৈঠকখানায় আসবাবপত্রে সেগুলি অপরূপ শোভা ধারণ করতে পারে। শিল্পীর আনন্দ এইভাবে সব কাজকে যদি মগ্নিত করে তোলে; তখন আর কেবল আর ঘর থাকে না—গোটা শ্রীর আসন হয়ে দাঁড়ায়। সাঁওতাল পরগণার অসভ্যদের মধ্যে সিংভূমে হো জাতির মধ্যে একরূপ গৃহসজ্জার প্রচলন আছে। তারা ঘরের দাওয়ায় নানা প্রকার রংয়ের মাটি দিয়ে কত সুন্দর সুন্দর ছবি একে থাকে। তাদের ঘরের মধ্যে যে শুচিতা ও শ্রী আছে তা আমাদের দেশের অনেক ভদ্র গৃহস্থালীর মধ্যেও অনেক সময় দেখা যায় না। যেমন ভেমন করে সংসার যাজ্ঞা নিকাহ করাই আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আমরা চাকুরীজীবী বাঙালী, কোন প্রকারে গৃহস্থের আফিস যাওয়ার ক্রটি না হলেই সংসার স্বচ্ছল হলেই আমরা বেশ আনন্দে থাকতে পারি। কিন্তু এই আরামের মধ্যে গৃহ সজ্জিত শ্রীমগ্নিত করে তোলার মধ্যে বেশ একটু তফাৎ আছে। ভাল জিনিষ, ভাল গন্ধ, ভাল আসবাবপত্র অনেকে দৌখিন বলে বর্জন করতে উপদেশ দেন, কিন্তু গৃহলক্ষ্মীর হাতে গড়া সহজলভ্য গৃহসজ্জায় যে শ্রী আছে সেটা আভিজাত্যের মধ্যে নেই এবং এটাই বাঙলার কামনার বস্তু। সোনার ঝাড় লষ্ঠনের আলো আর মাটির প্রদীপের মধ্যে যে আলো দুটোই আলো সমান দেবে কিন্তু একটি উগ্রভাবে নিজেকে দেখাচ্ছে—অপরটি নম্রভাবে আত্ম প্রকাশ করবে। আমরা এই নম্রভাবে আটের সাহায্যে করতে বলি। আমরা সোনার ঝাড়বাতি জ্বালতে পরামর্শ দিই না। লক্ষ্মীর ঘরে ঝাপি ঢাকা ঘর এবং তারই সঙ্গে মন প্রফুল্লকারী আল্পনাও তার আসন পিড়িতে আঁকা থাকে চাই। যেখানে মন নেই

সেখানে ধনের পুজিই থেকে যায়। এই মনের পরিচয় পাওয়া যায় আসবাবপত্রের রুচিতে নির্বাচনে। শিল্পসম্ভারের আদর চিরকাল বহুগুণ থেকে ইউরোপ, ইজিপ্টের, চীনের, ভারতের বড় বড় সাম্রাজ্যের প্রাচীন কীর্তির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা তাঁদের সভ্যতার মাপকাঠি ঐ সকল মাটিতে পোতা শিল্প সম্ভার থেকে আবিষ্কার করে থাকেন। প্রাচীন অনেক ভাষায় লেখা এখন পঠিতব্য নম্ন শিল্পকলার ধাপ সহজেই ধরা পড়ে। শিল্পের উন্নতি বহুগুণ ধরে ধাপে ধাপে গড়ে উঠছে। একেবারে এক নিমেষে সুবিশাল রোম নগরী তৈরী হয় নি। এখনও আমরা ধীরে ধীরে নিজেদের শিল্পের ঘরে ঘরে আদর বাড়াতে পারি। যদি পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের কাজ নিজের হাতে করতে শিখি।

আমাদের দেশে এক এক জাতি এক এক প্রকার শিল্পকলার কাজ পূর্বকালে করতেন। কিন্তু আজকাল বহুধর্ম বহুঋকমের দিনে সেরূপ খাটে না এখন আর জাত ব্যবসায় বলে কোন কথা নেই। ধীরে ধীরে কাজে হাত সহজে বসে এবং যে কাজে উন্নতি করা সহজ হয় তাঁরই উচিত সেই কাজে অভিজ্ঞতা বাড়ান। জাতি বিচার শিল্পকলায় চলে না। তখনকার অর্থনীতি শাস্ত্র আর এখনকার অর্থনীতি শাস্ত্রের অনেক বদল হয়ে গেছে। তখনকার দিনের রাজারা যে জাতের লোকে যে কাজের চর্চা করতেন তার বংশাঙ্কনিক জীবন ধরনের উপায় করে দিতেন, এখনও জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে একথা প্রচলিত আছে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে শিল্পীরা ঐ একই প্রকারের জাত ব্যবসা অল্পসারে নির্বিবাদে শিল্পচর্চা করে যাচ্ছেন। এইভাবে বংশাঙ্কনিকভাবে চর্চা করে শিল্পের ধারাবাহিক প্রচার থাকে বটে কিন্তু তার আর প্রসার হয় না। ক্রমে ক্রমে বড়ই প্রাণহীন ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে। ভারত শিল্পের এই এক ধরনের কাজ জাতি বিশেষের মধ্যে প্রচার থাকায় তার নব নব উন্মেষের চেষ্টাও হয় না এবং সেই কারণেই শিল্প দিন দিন অধঃপতিত হয়ে পড়েছে।

এখন দেশের মা লক্ষীদের ঘরে ঘরে শিল্পকলার চর্চার এক নতুন উৎসাহ ও নতুন আগ্রহ যদি দেখা যায় তবে আবার প্রাচীন ভারতের মত অধুনিক ভারত ভবিষ্যৎ ভারতের কাছে

নিজেদের অস্তিত্বের পরিচয় রেখে যেতে পারবে এখন আমাদের এই আশা যে, ভারত চিত্রকলার জাগরণের সঙ্গে ভারতলক্ষীদের হাতের শিল্পকলারও যদি পুনর্মুক্তি দেখতে পাওয়া যায় তবেই ভারত সম্ভারেরা হৃদয় ভবিষ্যতের পথ উজ্জলতর এবং আধুনিক ভারতমাতাকে অলঙ্কৃত করতে পারবেন। শিল্পীদের ৩ বৎসরের দাবী নিয়ে এ আবেদন আমরা ভারত লক্ষীদের কাছে বহুবার করেছি এবং করব। আশা করি বেতন সৌখিনের ঘরে শিল্প এবং গরীবের ঘরে ধূলো এ মিলন কথার কেহই পৃষ্ঠপোষকতা করবেন না। এবং গৃহকে সুগৃহ সংসারকে শ্রীসম্পন্ন করতে হলে যেটুকু হাতের কলা কৌশলের দরকার তার জন্ত কুঁড়মি করবেন না। নারীজাতির মাতৃজাতির কোমলতার সঙ্গে মেহের সঙ্গে দয়ার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে তাঁদের চাক ও কারু শিল্পকলা পুনরায় দেশের গৌরব স্বরূপ হবে।

জাপানে দেখা যায় নারীজাতির কাজের মধ্যে যে, খালি কাজ আছে তা নয়, অদ্ভুত শ্রী আছে। তাদের ভাব ও কাজ করার ভঙ্গিটির মধ্যেও এমন একটি আর্ট আছে, যা আর কোন দেশেই দেখা যায় না—তাদের কাজে আনন্দ আছে আর্ট আছে বলে। কেবল মোটামুটি দিন চলার মত কাজ করে চলা যদি তাদের ধাত হত সে কাজ করার মধ্যে এমন মোহন ভঙ্গিটি দেখতে পাওয়া যেত না। শুধু কাজটা নয় কাজ করাটাও তাদের সুশ্রী হয়ে উঠেছে।

যতই গরীব হোক না কেন, বাড়ী আছে বাগান নেই এরূপ জাপানে বড় একটা দেখা যায় না। ইউরোপেও আজ পল্লীতে ও সহরের মধ্যে অন্ততঃ স্থানান্তরে বরোখার উপর ফুলের টব সাজানোর রীতি দেখা যায়। আর আমরা আমাদের দেশের যে শ্রীটুকু পল্লীর মধ্যে পূজাপাঠের মধ্যে ছিল সেই আন্ননার রেওয়াজও ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।

সে আজ ১৫১২০ বৎসর পূর্বেরকার কথা—তখন ভারত শিল্পের পাকা আসন শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি বা বঙ্কুর নন্দলাল বসু ও সেখানে পদার্পন করেন নি। তখন শিশু বিভাগের কয়েকটি ছাত্র শ্রীমান মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, শ্রীমান যৌরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবশর্মা শ্রীমান অন্নদা মজুমদার প্রভৃতি লেখকের কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করতেন।

তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশিষ্ট অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা উপলক্ষে আমরা এই আন্ননার সাহায্যে আশ্রম

আল্লনা অলঙ্কৃত করাব চেষ্টা করেছি। মামুলী দস্তুর মত সেই প্রথম ব্যাপার। আমরা তাঁকে আমবনের মধ্যে রঙিন কাগজের পতাকা আর দেবদারু পাতার জোড়া গেট রচনা করতুম না।

প্রবন্ধ লেখকের সে কাজে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অঙ্কের বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্রিষ্ণমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়। লর্ড কারমাইকেল যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন তখন লাট সর্ঘর্জনা আশ্রমে আল্লনা, ধূপ, চন্দন মালায় যে অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন তার সঙ্গে গড়ের মাঠের ব্যাঙাদি বিজলি বাতির চাকচিক্যের তুলনা অবশ্য করা যায় না; তবে একটি বিদ্যুরের খুদের মণ্ড, অপরটি সোনার বাটির পায়েস, এখন কোনটি গ্রহণীয় তা আপনানাই বিচার করুন।

* “বঙ্গলক্ষ্মী” ৩য় বর্ষ আবেণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ভ্রম সংশোধন—অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত “যে নদী মরুপথে হারাল ধারা” শীর্ষক গল্পটি মৌপাণা হইতে ভুল বহ।

শিশু মন

শ্রীমুজাতা রায়

প্রত্যেক শিশুর সঙ্গ ব্যবহার করতে হয় তার মেজাজ বুঝে। অনেক সময়েই এক পরিবারেই বড় ছেলেটির সঙ্গে একভাবে এবং দ্বিতীয় তৃতীয় অথবা কনিষ্ঠের সঙ্গে আর একভাবে কাজ করা দরকার হয়ে পড়ে।

সংসারগতঃ প্রথম সন্তানটি এত আদর পেয়ে মাছুষ হয় যে তার ভাই অথবা বোন ভূমিষ্ঠ হলেই তার পক্ষে জীবন কষ্টকর হয়ে পড়ে এবং সে অকাঙ্ক্ষেই নতুন আগন্তুকটির উপরে অত্যাচার করতে শুরু করে দেয়। এই সময়ে তার পিতামাতা যদি তাঁকে নিজেদের দলে টেনে নিয়ে সে যেন ছোট ভাইটির অভিভাবক—এই ভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করেন তাহলে সে খুব খুশী হয়ে যায় এবং দায়িত্ব

গ্রহণের চেষ্টা করে। যে সন্তানটি বড় ও ছোটটির মাঝখানে পড়ে যায় অনেক সময় সে একটু অবহেলার পাত্র হয়ে পড়ে। এ ব্যাপার যাতে না ঘটে তার জন্ত পিতা মাতার বিশেষ অবহিত হওয়া দরকার।

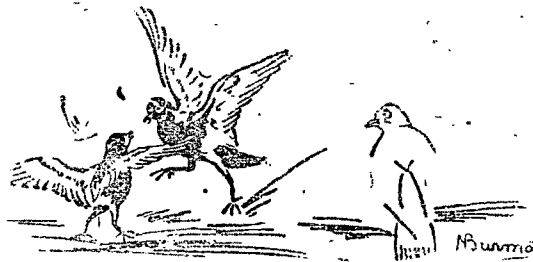
এক রোখা ছেলে—বেশীর ভাগ ছেলে মেয়েরই এক গুয়েমির কারণ হচ্ছে খারাপ স্বাস্থ্য। ছেলে মেয়ে যদি অতিরিক্ত মেজাজ দেখায় কিংবা লোভী হয় তবে প্রথমে দেখতে হবে যে তার খাওয়া দাওয়া সমন্বিত এবং উপযুক্ত ভাবে হচ্ছে কিনা, খাওয়া কম অথবা বেশী হওয়া কোনটাই ভাল না। তাদের ঘুমের সময় ঠিক আছে কিনা, তাদের পাওনা মুক্ত বাতাসের পরিমাণ যথেষ্ট এবং শারীরিক

পরিশ্রমের দিকে কিছু ভেবে দেখবার আছে কিনা তাও বুঝতে হবে। চোখ এবং দাঁত ঠিক আছে তো? এগুলির মধ্যে যে কোনওটির গোলমাল হ'লে শিশু একরোখা হতে পারে।

অবাধ্যতা—বেশীর ভাগ সময়েই শিশুর অবাধ্যতার কারণ তার গুরুজনেরাই ঘটিয়ে থাকেন। শিশুর শরীর অথবা মনের প্রয়োজন না বুঝে নিয়ম তৈরী করা চলে না। অবাধ্যতা তার অবশ্যজ্ঞাবী ফল। জগতের অল্প লোককে যে রকম শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন শিশুকেও তাই করতে হবে। তার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে কাজ করলে অবাধ্যতার প্রশ্রয় প্রায় উঠবেই না। শিশুকে কোনও কথা বুঝিয়ে বললে সে সেটা সাধারণতঃ গ্রহণ করতেই ভালবাসে। তার বুদ্ধির মধ্যমা দেওয়া হয়েছে মনে করে সে খুসী হয়।

অলসতা—শিশুরা বসে থাকতে ভালবাসে না; কাজেই শিশুকে বসে থাকতে দেখলে বুঝতে হবে যে কোথাও বিশেষ রকম গলদ আছে। কোনও রকম অন্তরঙ্গতা না থাকা সত্ত্বেও শিশু যদি চুপ করে বসে থাকে তাহলে তাকে অনিশ্চয়ের আবহাওয়াতে নিয়ে যাওয়া দরকার, এমন কাজ তাকে দিতে হবে যাতে তার মন আকৃষ্ট হয়। কাজে ভুল করলে ঠাট্টা করা অথবা তিরস্কার করা কখনোই উচিত না। তাকে উৎসাহ দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। স্থলে গিয়ে সে যদি পড়াশুনা শিখতে না চায় তবে শেখানোর পদ্ধতির ই দোষ, শিশুর দোষ নয় বলে মনে করতে হবে।

স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতা—শিশুদের মধ্যে এই কারণে অনেক রকম দোষ দেখা দেয়। মেজাজ দেখান, মিথ্যা কথা বলা, আঙ্গুল চোষা, নখ কামড়ানো, তোতলামী, লাজুকতা, দুঃস্থল দেখা ইত্যাদি অনেক সময়েই উপরোক্ত কারণে ঘটে। এই স্বভাবের শিশুর সঙ্গে ব্যবহারে সব থেকে বেশী প্রয়োজন সহানুভূতি। তার মনের মধ্যে কি কারণে গোলমাল ঘটছে সেটা সর্ব প্রথম বুঝতে হবে, তা নাহ'লে তাকে সাহায্য করা যাবে না। সে যদি রাজে কেঁদে ওঠে তাহলে তার হজমের গোলমাল হয়েছিল কিনা দেখতে হবে। সেদিক দিয়ে গোলমাল না থাকলে ঘুমের আগে কোন চিন্তা তার মনে প্রধান ছিল সেটা বুঝতে হবে। অন্ধকার সম্বন্ধে তার মনে যদি ভয় থাকে তাহলে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে অন্ধকার পৃথিবীর ওপরে একটা পদ্মার মত শিনিষ, ভয়ের কোনও কারণ নেই। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না থাকার জন্তু কিম্বা নিজেকে অবহেলার পাত্র মনে করার জন্তু শিশুর অনেক রকম মানসিক বিপর্যয় ঘটে। হিংসা, ঘেঁষ, আত্মসন্ত্রস্ততা, লাজুকতা—সবই এই একটা কারণে ঘটতে পারে। শিশুর দুঃখ কোন্‌খানে সেটা ধ'রতে পারলে তবেই তার ব্যবস্থা করা যায়। শিশুর মনের সমস্যা যদি নিজে বুঝে উঠতে না পারা যায় তবে অল্প কোনও বিজ্ঞ লোকের সাহায্যে তা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, শিশুর মনকে অবহেলা করা চলে না।



ভবিষ্যতের বাঙ্গলা

(Bengal Women's Education League এ

প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)।

শ্রীমতী নীতিবালা গুপ্তা, বি-এ, বি-টি, এম-এড্ (লীড্‌স্)

বিশ্বব্যাপী ধ্বংস, হিংসার দাবানল জলে উঠেছে, সমৃদ্ধ সম্পন্ন নগরীর রাজপথে রাজপথে ক্ষুধার্তের কাতর ক্রন্দন, গ্রামে গ্রামে শ্মশানের অগ্নির লেলিহান জিহ্বা, শৃগাল কুকুর, গৃহিনী শকুনের পৈশাচিক উল্লাস। জননী ক্ষুধার জ্বালায় সন্তানের মুখ থেকে খাবার কেড়ে খাচ্ছে, সতী সাধবী উদরের জ্বালায় মহামূল্য সতীত্বধন বিনা দ্বিধায় একমুষ্টি অন্নের জন্ত বিক্রয় করছে, আর, তার মাঝে বিশ্বের কল্যাণ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী-আমরা এই কটি নারী অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র দীপটি জালিয়ে চলেছি বিশ্বাস-ভরে সেই অনাগত দিবসের সাধনায়, যা আনবে উষার অনাবিল পবিত্র আলোক, যা আনবে বাংলার গ্রামে গ্রামে, কুটীরে কুটীরে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য সম্পদ, যা আনবে অখণ্ড বাংলার জন্ত সত্য স্বন্দরের শ্রেষ্ঠ দান অমৃতত্ব।

আমরা কি বাতুল? কোন সাহসে, কিসের আশায় আমরা বুক বেঁধে চলেছি তা লাভ করতে, যা সমগ্র বিশ্ব আমাদের বলছে নাই নাই, হ'তে পারে না। সভ্যতার উষাকালে পূর্বের রবি সমগ্র জগতে আলো বিতরণ করেছেন, অপরাহ্নে যখন রবি পশ্চিমগামী হ'লেন সঙ্গে সঙ্গে আলোকের সন্ধানে পশ্চিমদিকে আমরা মুখ ফেরালাম। দলে দলে নর-নারী পশ্চিমে জ্ঞানের সন্ধানে ছুটে গেলেন, নিয়ে এলেন মহামূল্য রত্নরাজি আহরণ করে। অকস্মাৎ পশ্চিম থেকেই এলো দিগ্নিগন্ত আচ্ছন্ন করে প্রচণ্ড ঝটিকা তার বজ্র বিদ্যুতের জ্বালা নিয়ে। চলছে

সেই ঝটিকা দেশ থেকে দেশান্তরে সব জালিয়ে, পুড়িয়ে, ছারখার ক'রে দিয়ে। কবে এর শেষ কে জানে? তবুও আমাদের বিশ্বাস অচল, অটল। আমাদের আঁচলখানি এমন শক্তিময়ী যে বিশ্বের প্রচণ্ড তাণ্ডব নর্তন আমাদের ক্ষুদ্র প্রদীপটির শিখাকে এতটুকু স্থানচ্যুত এতটুকু ম্লান করতে পারেনি।

শক্তিময়ী নারী বিশ্বের সেইরূপ যা সৃষ্টি করে ও সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখে। এই নারী কোথাও কল্যাণ, কোথাও জননী, কোথাও ভগিনী, কোথাও কল্যাণী বধু, কোথাও স্বেচ্ছাসেবিকা, কোথাও শিক্ষয়িত্রী, কোথাও আচার্য্যা, কোথাও অধ্যাপিকা। কিন্তু যে ভাবেই যেখানে তিনি থাকুন না কেন, সৃষ্টির অমূল্য বীজটি তাঁরই কাছে বিশ্বাস ক'রে রাখা হ'য়েছে। আজ বাংলার প্রায়ের তাণ্ডব নর্তনের মধ্যে বাংলার শিক্ষিতা নারীর হাতে ভার পড়েছে, বাংলার শিশু প্রাণশক্তিকে সম্যকরূপে জীবন্ত ক'রে রাখবার। প্রবল ঝটিকার অবসানে আকাশ যখন নির্মল হবে, ধরিত্রী যখন জলসিক্তা হ'য়ে শতগুণ উর্বর হবেন, নির্মল রবি কিরণে প্রাস্তর যখন উদ্ভাসিত হবে, তখন আসবে নূতন জীবন সঞ্চারের সময়। নারীর কাছে আছে সেই অমৃতের বীজ। আমাদের কাছে আছে সেই নূতন জীবনের বীজ যার কথা কবি তাঁর অমর ছন্দে গেঁধে গিয়েছেন

“আমার চিন্তে তোমার সৃষ্টি খানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি;
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেই করিচা দান।”

মানুষ সাধারণতঃ তার পার্থিব কর্মক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক কর্মক্ষেত্র থেকে ভিন্ন বলে মনে করে; কিন্তু যখন বিশেষরূপে প্রণিধান করা যায়, তখন বুঝা যায় যেমন একই মানব একাধারে দেহী ও আত্মা এবং তার দেহ ও আত্মা আলাদা হ'লেও তাদের মাঝখানে আশ্চর্য্য একটা যোগসূত্র আছে, তেমনি পার্থিব কর্মক্ষেত্রের ও আধ্যাত্মিক কর্মক্ষেত্রের মধ্যেও আশ্চর্য্য একটা যোগসূত্র আছে। যিনি এই যোগসূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রেখে কাজ ক'রতে পারেন তাঁরই জীবন হ'য়ে ওঠে আনন্দময়ের বিচিত্র খেলার ঘর এবং যেখানে সৃষ্টি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, সেখানে মানব দেবত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে হয়ে ওঠে পার্শ্বিক ভোগ বাসনা চরিতার্থ করবার যন্ত্র মাত্র।

যে নরনারীর প্রতিদিনকার কর্ম সত্য ও জ্ঞানের বুদ্ধিতে প্রণোদিত ও ক্লত, তাঁর জীবন খানি শুচি ও নির্মল। আমাদের ক্ষমতার ভিতরে, ও আয়ত্তের ভিতরে যে কর্ম, তা যদি স্ফূর্তিরূপে সম্পন্ন হয়, আমাদের দেহ, মন ও আত্মা সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। জীবন বহুমুখী, কর্তব্যও জটিল। বহু কর্তব্যের মধ্যে আমাদের দেশের প্রতি যা কর্তব্য র'য়েছে তা অপরিহার্য্য। “ভবিষ্যতের বাঙ্গলা” সেই বাংলা যা আমরা আজ তৈরী করছি। আমি করছি, আপনি করছেন, আমরা সকলে করছি। একটা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে যে যে বিষয়ের উপর তা হচ্ছে এই—

(১) রাষ্ট্র শাসন

- (২) আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ
- (৩) কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ বিবিধ দ্রব্যের উৎপাদন
- (৪) বাণিজ্য ব্যবসায়
- (৫) জনস্বাস্থ্য-ব্যবস্থা
- (৬) জ্ঞানের উদ্বোধন ও সম্প্রসারণ
- (৭) নীতি ও ধর্মপালন।

এই ৭টি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার সময় আজ নেই, ক্ষমতাও আমার নেই। কিন্তু যে শিক্ষা-ব্রতে ব্রতী আমরা হ'য়েছি, সে দিক দিয়ে আমরা কি ক'রতে পারি, সে সম্বন্ধে ২৪টি কথা আজ আপনাদের বলব।

আমরা যারা শিক্ষাব্রতিনী, শিক্ষা বিভাগে আছি তাঁদের উপর বিশেষ করে এক স্মৃষ্টি কর্তব্যের ভার পড়েছে—তা হ'চ্ছে বাংলার ভবিষ্যৎ নারীজাতিকে গড়ে তোলা। যিনি শিক্ষয়িত্রী, যিনি অধ্যাপিকা, বিশেষ ক'রে তাঁকে আহ্বান ক'রে আমরা বলছি প্রতিদিন যখন অদীত বিজ্ঞা অধ্যাপনা করবার জন্ত ছাত্রীদের নিকট গিয়ে দাঁড়ান, মনে রাখবেন তার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত কি ভাবে আপনি ব্যয় করছেন, তার উপর নির্ভর করছে বাংলার ভবিষ্যৎ। মুখে আপনি কি বলেন, খালি তার উপর সব নির্ভর করে না, আপনি অন্তরে কি, আপনার জীবন কি, চরিত্র কি, অকথিত কোন্ বাসনা আপনার অন্তরকে মথিত করছে, এ সব প্রভাবিত করছে ক্ষুদ্র শিশুর মনটিকে, যাকে আপনি পড়াবেন বলে দাঁড়িয়েছেন। আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন অকথিত বাসনা কি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে? আমি উত্তরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করব পচা ইদুরকে রেশম দিয়ে জড়িয়ে রাখলে কি তার দুর্গন্ধ লুকিয়ে রাখা যায়? তা' যেমন যায় না, চরিত্রের অশুচিতার ও পঙ্কিলতার প্রভাবও তেমনি লুকান যায় না।

আবার দেবচরিত্র নরনারী আপনার অজ্ঞাতে যে পথ দিয়ে যান সেখানে সকলের মধ্যে আপনার গুচিতা বিকীর্ণ করে দিয়ে যান ধূপের মত। অনেক সময় আমি শুনেছি অনেকের কাছে যে বর্তমানের ছাত্রছাত্রীদের দল আমাদের পুরাণ দিনের মত নয়। আমরা যেমন গুরুজনদের ভক্তি করতাম, যে ভাবে পোষাক পরিচ্ছদ পরতাম, যে ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে সাবধানে থাকতাম এরা তা করে না। আমার মনে হয় এর দুটি কারণ আছে। এক কারণ আমরা যেমন আমাদের মা ঠাকুরমাদের সময়কার সমাজ থেকে এক স্তর উপরে উঠে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করেছি, এখনকার ছাত্র-ছাত্রীর দল তেমনি অনাগত ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করেছে। এদের আমরা সাহায্য করতে পারি আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে, বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারি। কিন্তু এরা যা সৃষ্টি করবে বলে এসেছে আমাদের সাধ্য নাই তা আমরা করতে পারি।

অপর কারণ, আমরা যারা এদের আগে জন্মেছি আমাদের অপূর্ণ বাসনা, আমাদের চরিত্র, আমাদের শিক্ষাই এদের করে তুলেছে এরা যা। ভিত থেকে ছাদ উচু বলে ভিতের দুঃখ করবার কিছু নেই, কারণ ভিতরই ছাদকে উচু করে রেখেছে। এক সময় মায়ের বুকে আমরা অগ্নিশিখার মত জ্বলেছি তাঁর স্নেহপুষ্ট হয়ে আলো দান করেছি। আজ আমাদের সময় এসেছে মাটির প্রদীপ হয়ে স্নেহ দান করে অগ্নি শিখাটিকে জালিয়ে রাখবাব। আবার আমরা যখন চলে যাব, এরাই প্রদীপ হয়ে ভবিষ্যতের শিখাটিকে জালিয়ে তুলে জগৎকে আলো দান করবে। শিখা উর্দ্ধমুখী, শিখা স্বাধীন। তার চাই স্বাধীন খোলা জায়গা তার চাই বায়ু। বায়ুচলাচলশূন্য বদ্ধ জায়গায় প্রদীপ কখনও জ্বলতে পারে না। আবার ক্ষুদ্র শিখাটিকে আবরণ না দিলে সে প্রবল ঝটিকার সময় আপনাকে রক্ষা করতে পারে না। তাই চাই সমাজের পবিত্র বন্ধনের সঙ্গে উপযুক্ত স্বাধীনতা। মহত্তর মানবের জীবনী আলোচনা করলে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানবের প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয়। তা হচ্ছে এই যে সাধারণ মানব বর্তমানকে নিয়ে ব্যস্ত আর

মহত্তর মানব ভবিষ্যদ্রষ্টা ও ভবিষ্যৎকে রচনা করতে ব্যস্ত। তাঁদের আদর্শের সঙ্গে আদর্শ মেলেনা বলে অসহিষ্ণু সাধারণ মানব কোথাও তাঁদের পুড়িয়ে মারে, কোথাও বা সমাজচ্যুত করে। মনুষ্যত্বের যিনি সাধক তিনি সত্যদ্রষ্টা। রজনী যখন তমসাময়ী তখন তাঁর কাছে আলোকের দূত এসে পৌঁছেছে ভবিষ্যতের বার্তা নিয়ে। যারা অন্ধকারে বিচরণ করছে বলে দৃষ্টিহারা, সে আলো তাদের কাছে পৌঁছায় না। কাজেই আলোককে তারা অস্বীকার করে, এবং যিনি আলোক দেখতে পান তাঁকে তারা সহ্য করতে পারে না। বয়সে ছোট বহু শ্রদ্ধার পাত্রী বালিকা ও শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। নিজেদের স্বার্থ ভুলে গিয়ে তাঁরা গ্রামে ২ দেশের নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য আগ্রাণ চেষ্টা করছেন। অন্ধ গ্রামবাসী অনেক সময় তাঁদের অগ্নান শুভ্র চরিত্রে কালিমা অর্পণ করতে চেষ্টা করে। তাঁরা যখন আসেন আমার কাছে আমি বলি, “আপনারা তাদের দয়া করে ক্ষমা করুন। ওরা আপনাদের হিংসা করে, ওরা জানে আপনারা এদের থেকে কত উচ্চ। আপনারা কাছে থাকলে ওদের নীচতা নিজেদের চোখে ধরা পড়ে। তাই কষ্ট করে আপনাদের সমান হতে না পেরে আপনাদের নামিয়ে নীচু করতে চায়।”

সেই জাতিই জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে যারা বর্তমানের কুহেলিকা ভেদ করে ভবিষ্যতের আলো দেখতে পায়। শুধু তাই নয়, সে আলোকের দেশে উপনীত হওয়ার জন্য সকল বাধা বিদূর, দুঃখ কষ্ট বিপদ হাসিমুখে অতিক্রম করে। বিজয়সিংহ, প্রতাপাদিত্যের মত যারা বিপদকে বরণ করে সার্থকতার রাজপথখানি প্রস্তুত করেন, যারা নিজেদের বক্ষের শোণিতে মৃত্যু সিন্ধু করে তাকে উর্বরা করে তোলেন তাঁরা যে সব সময় তাঁদের ত্যাগের ফল উপভোগ করেন তা নয়, তাঁদের আত্মত্যাগের ফলে দেশ উপরে উঠে যায়। ভগ্নীগণ, সামান্য একটা ছুঁচ কিনতে হলে দাম না দিয়ে কেনা যায় না, একটা দেশ একটা জাতিকে শয়তানের কবল থেকে উদ্ধার করতে দাম দিতে হরেনা?

আমার মত যারা সহরে গ্রামে সকল ধর্মাবলম্বী

নরনারীর মধ্যে বিচরণ করেন, তাঁদের একটা জিনিস সহজেই চোখে পড়ে—তা হচ্ছে বড় সহরের সঙ্গে গ্রামের প্রভেদ। পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নাই, যেখানে এই প্রভেদ এত বিসদৃশভাবে দেখা যায়। আমাদের গ্রামের একটা নিরক্ষর চাষার সঙ্গে আমাদের একটা বিলাতফেরৎ ত্রিকলেস্ ব্যারিষ্টারের যা প্রভেদ আমেরিকার কোনও চাষার সঙ্গে Mr. Roosevelt এর সে তফাৎ নে। যেই কোনও অবস্থাপন্ন চাষা Roosevelt এর মত দিনে রাত্রে চার-বার খান, কোট প্যান্ট, হাট পরেন, তাঁর বাড়ীতে সন্ধ্যায় ইলেকট্রিক লাইট না হোক টেবল ল্যাম্প জলে। সান্ধ্য-ভোজনে তাঁরা স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে আহ্বারাদি করেন, আহ্বারের পর আমোদ প্রমোদ করেন। আর আমাদের দেশে ইনি হলেন চাষা আর উনি হলেন সাহেব। ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ী এলে চাষাকে বারাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, আর চাষার বাড়ীতে ব্যারিষ্টার সাহেব তো যাবেনই না এবং যদিও বা যান তাঁর সশ্রদ্ধ দান সম্বন্ধে তৈরী মুড়ির ঘোষা নারকেলের নাড়ু এর মুখে রুচবে না। আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে চাষা ভূষার যে আকাশ পাতাল প্রভেদ এতে হয়েছে এই যে যে সৌধই আমরা গড়ে তুলবার চেষ্টা করিনা কেন, তাঁর উপরটা হয়ে পড়ে বেশী ভারী এবং নীচেটা তার ভার সহিতে পারে না বলে উপরও যায় ধূলিসাৎ হয়ে, নীচও পায় সেই ধুলিতে ঢেকে। পরের দল যখন কাজ করতে আসেন সৌধ গড়বেন কি, এই সনাতন কালের আবর্জনা পরিকার করতে করতেই তাঁদের জীবন প্রায় শেষ হয়। মাঝখানের যোগ অবলম্বন হয়ে পড়েছে এত ক্ষীণ যে যা গড়া যায় তাই ভাঙ্গে। এখন ভাববার সময় এসেছে, কি করে গড়লে এই অপূরণীয় ক্ষতি বার বার হবে না। এই সোনার বাংলায় একদিন এমন দিন ছিল, যখন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবগিতা পেট পূরে খেতে পেত। লোকে স্বাস্থ্য লাভের জন্ত বাংলা ছেড়ে বাইরে ছুটে যেত না। গ্রামে মহামহোপাধ্যায় গণ্ডিত যেমন ছিলেন, নিরক্ষর চাষা ভূষাও ছিল—তাঁরা সবাই ছিলেন বাঙ্গালী, খাটি বাঙ্গালী, সাহেব ছিলেন না কেউ।

দেশ-কার? যিনি দেশকে সর্বতোভাবে ভালবাসেন

তাঁর। হোক না দেশ ছোট, হোক না দেশ ককালসার ভাইভগিনীতে, ম্যালেরিয়া মশা গচা ডোবাতে ভরা, সে দেশই আমার স্বর্গ। ‘দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ।’ এই দেশকে ভালবেসে মনে প্রাণে, গর্বের সহিত মুক্তকণ্ঠে, প্রাণের সহিত স্বীকার করতে হবে আমি বাঙ্গালী। আমি হিন্দু হই, মুসলমান হই, খৃষ্টান হই, বৌদ্ধ হই, জৈন হই—আমি বাঙ্গালী সর্বপ্রথম। আমরা যারা এখন সৃষ্টি করছি, গঠন করছি, তারা যদি প্রাণে একথা সত্যিকার অন্বেষণ করি, আমাদের হাতে যারা রয়েছে, আমাদের প্রাণ থেকে নতুন নির্মল প্রাণস্রোতের মত এ ভাবধারা তাদের প্রাণে সঞ্চারিত হবে। কিন্তু আবার বলছি—মুখে এক মনে এক রেখে যদি আপনারা শিক্ষা দিতে চান ব্যর্থ হবে, ব্যর্থ হবে সকল শিক্ষা। আগ্রহ করে ডেকে নিন্ সকল ধর্মাবলম্বী বালিকাকে; সকল বিদ্যালয়ে তাঁরা একসঙ্গে থাকুক, পড়ুক, খেলা করুক, বগড়া করুক, মারামারি করুক, কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসুক। ভাইবোনের বগড়ার কিচিমিচিতে মার কাণ কালাপালা হয়, কিন্তু তাতে তিনি ভয় পান না—জানেন ভাল না বাসলে বগড়া করা যায় না। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের যিনি প্রধানা শিক্ষয়িত্রী কিংবা অধ্যক্ষা, এখানে উপস্থিত আছেন জানবেন ভবিষ্যৎ বাংলা আপনারাই গড়ছেন। খুলে দিন বিদ্যালয়ের সকল দ্বার—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম হতে জ্ঞানের আলোকধারা আপনাদের বিদ্যালয়কে সত্যিকার বিদ্যালয় করে তুলুক। খুলে দিন বিদ্যালয়ের সকল দ্বার—জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভবিষ্যতের বাংলার শিশুদের চুকবার জন্ত যারা বাংলাকে গড়বে। খুলে দিন জন্মের দ্বার, ভালবাসুন সবাইকে বাঙ্গালী বলে। যে পিছনে পড়ে রয়েছে—আমরা তাকে যদি টেনে সমানে না চলি, তাদের পেছটানে—যাত্রা যে আমাদের ব্যর্থ হবে। বিশ্বশ্রবের রথ যখন চলে সে দড়ি যে সবাই না ধরলে যাত্রা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাকিয়ে দেখুন অতীতে বাংলা ব্যর্থ হয়েছে বাঙ্গালীর পাপে, বাংলা ব্যর্থ হয়েছে বাঙ্গালী নারীর অশ্রুজলে, অভিশাপে, বাংলা ব্যর্থ হয়েছে অহুস্ত ও পতিতাদের প্রতি স্মৃতিচার না করার জন্ত। ভগিনী আমার! অতীতে যে দোষ হয়েছে বর্তমানে তা করে

বেন ভবিষ্যৎকে আমরা ব্যর্থ না করি। কোনও রোগীর যখন পক্ষাঘাত হয় তখন সে নিশ্চেষ্ট ও পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে পড়ে। যে জাতি যত জড়, যত পরমুখাপেক্ষী বুঝতে হ'বে সে জাতির মেরুদণ্ডে তত ভাঙ্গন ধরেছে। জাতির অস্তিত্ব নরনারীতে। নরনারীর সমষ্টিই এক একটি জাতি। যে জাতির নরনারী যত অলস, যত পরনির্ভরশীল, সে জাতি তত রোগজীর্ণ। জাতির পক্ষাঘাত ধরা পড়ে ব্যক্তিগতভাবে নরনারীর অলসতা ও অধীনতা দেখে। আমাদের বয়সী নরনারীর জীবনযাপন প্রণালী না হয় আর আলোচনা

নাই করলাম, এরপর দেখব যারা এগিয়ে আসছে ঐ আমাদের নয়নের আনন্দ, প্রাণের আশা, ভবিষ্যতের ভরসা বাংলা মায়ের বুকের ধন ছাত্রছাত্রীদল, তাদের আমরা কি ভাবে গড়ছি। আজ যদি তারা পেছনটান ও অবগুষ্ঠন ছিন্ন করে ফেলে অধীর পদক্ষেপে নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়তে চায়, আমরা কি তাদের বজ্র আঁটনে বেঁধে রাখব? না উপযুক্ত অবসরের ব্যবস্থা করব যাতে তারা খাটবার, করবার ও পড়বার সুযোগ পায়? এদের বিষয় এর পর বলব।

মীরাবাই

শ্রীমতী গীতা ঘোষ, বি-এ।

ভারতবর্ষের ভিত্তি ধর্মের উপর। যুগে যুগে বহু সাধকের আবির্ভাব হয়েছে ভারতে, তাঁরা ঈশ্বর সাধনার বিভিন্ন পথ আমাদের দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু প্রাচীন সাধকদের জীবনের কোনও ইতিহাস নেই, মুখনিঃসৃত বাণীই তাঁদের সাধনার ইতিহাস। পরবর্তী যুগে এই সব সাধকদের ভক্তরা তাঁদের বাণী নানা রূপক কাহিনী এবং কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রচার করেছেন এবং তা লোকের মুখে-মুখে কীর্তিত হয়ে এক যুগ থেকে অল্প যুগে চলে এসেছে। কিন্তু যেখানে শুধু লোকের মুখের কথার উপরেই নির্ভর করতে হয় সেখানেই অনেকক্ষেত্রে সত্য মিথ্যার ভেদ নির্ণয় করা দুঃস্বপ্ন হয়ে পড়ে। তাঁর কারণ সত্য কাহিনীর উপর জনকথা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে, কারো নূতন পদের সংযোগ হয়, রূপকের ধূলি কথ্যাটি প্রচ্ছন্ন থেকে যায়, সাধকের বিশেষত্ব সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতার হারিয়ে যায়। বিশেষতঃ ঈশ্বরের বাণী স্বরের আশ্রয়ে ব্যক্ত হয় তাঁদের সাধনার কাহিনী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই তত্ত্ব মীরাবাই ভক্তগণ যত প্রচলিত তাঁর জীবনের সত্য কাহিনী তত প্রচলিত নয়। তিনি চিত্তোত্তরের রাজমহিষী হয়ে কৃষ্ণ প্রেমে সংসারভ্যাগী হয়েছিলেন বলে তাঁর জীবনের ইতিহাস তবু কতকটা জনসমাজে পরিচিত।

ভারতবর্ষের ধর্মজীবনে উৎকর্ষ জাতিভেদ, কঠোর নিয়মাবলী এবং ধর্মের শুদ্ধতা যখন মাহুঘের মনকে ক্রিষ্ট করে তুলেছে তখন পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জ্ঞানবাদের দ্বারা মাহুঘের মনকে সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন নানক, রামানুজ ইত্যাদি। পূর্বে ভারতে বাংলা দেশে সেই সময় খ্রীষ্টোত্তরদেবের ভক্তিবাদ, লীলাবাদ বাংলার হৃদয় প্রেমে প্লাবিত করে পশ্চিম ভারত অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। ধর্মজীবনে এই নূতন প্রাণের সাড়া যখন পড়েছে তখন রাজপুতানার অন্তর্গত মেড়তা তালুকের কুড়কী গ্রামে

রাঠোর সামন্ত রতন সিংহের ঘরে মীরাবাইয়ের জন্ম হয়। মীরাবাইয়ের জন্মকাল সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তাঁর জন্ম হয়।

মীরাবাই পিতৃগৃহে পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং অতি বাল্যেই মীরাবাই মধ্যে কৃষ্ণভক্তির লক্ষণ দেখা যায়। লোকপ্রবাদ আছে যে মীরা অতি শিশুকালে প্রতিবেশী কন্ঠার বিবাহ দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“মা, আমার স্বামী কে?” মা গৃহদেবতা গিরিধারীলালকে দেখিয়ে বলেছিলেন—“ইনি তোমার স্বামী।” সেই থেকে মীরা গিরিধারীলালকে স্বামীজ্ঞানে পূজা করতেন। বয়োরাজির সঙ্গে সঙ্গে মীরা অপরূপ স্বন্দরী হয়ে উঠেন এবং যেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহের পুত্র কুমার ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। লোক প্রসিদ্ধি যে মীরাবাই স্বামী ছিলেন রাণা কুস্ত। রাজস্থানের লেখক উক্ত কুস্তকেই মীরাবাই স্বামী বলে বর্ণনা করে গেছেন। কিন্তু সম্ভবতঃ একথা সত্য নয়। কারণ সন তারিখ বিচার করলে দেখা যায় যে কুস্ত মীরাবাইয়ের জন্মের এক শতাব্দীরও পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মীরাবাইয়ের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে লোকপ্রবাদের উপর বিশ্বাস ছাড়া উপায় নেই। কেহ বলেন তিনি বিবাহিত জীবনে সুখী হয়েছিলেন এবং সেই সময়ের জন্য তিনি গিরিধারীলালকে ভুলেছিলেন। কেহ বলেন তিনি বিবাহের পরেও অহোরাত্র পূজায় নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন, তাই স্বামীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিঙ্গ হওয়াতে স্বামী বিতীর্ণতার বিবাহ করেন। যাই হোক মীরাবাই দাম্পত্যজীবন বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই ভোজরাজের মৃত্যু হয়। মীরা নূতন করে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হয়ে দিন রাত্রি পূজায় এবং তাঁর অপূর্ণ কণ্ঠের ভক্তগানে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁর

ভক্তি, বিজ্ঞা এবং সঙ্গীতের খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। সাধু সন্ন্যাসীতে মীরার মন্দির ভরে উঠল। সে কথা চিতোরের রাজা বিক্রমাজিতের কানে উঠতে দেবী হ'ল না। বিক্রমাজিত ছিলেন ভোজরাজের বৈমাত্রেয় ভাই। প্রকাশ্য জনসমাজে রাজকুলবধূর এই রকম গান এবং তত্ত্বালোচনা তাঁর কাছে নিলজ্জতা ও হঠকারিতা বলে মনে হ'ল। বিক্রমাজিত মীরার উপর অত্যাচার করে তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ডাক একবার যার প্রাণে সাড়া তুলেছে সে কি আর সংসারে ফিরতে পারে? রাণার অত্যাচার দিনে দিনে বেড়ে উঠল। মীরার নন্দ উদাবাদী মীরার মন ফিরাতে এসে কুলের নিন্দা ও লজ্জার কথা বলে—

“কুল কো দাগ লগৈ হৈ ভাভী, নিন্দা হো রহী ভারী
সাধো কে সংগ বন বন ভটকে। লাজ গুদাই সারী।”

এই কথার উত্তরে মীরা বলেছিলেন—

“সাধু মাতা পিতা কুল মেরে, সজন সনেহী জ্ঞানী
সন্ত চরণ সরণ বৈণ দিন, সন্ত কহত হ' বাণী।”

মীরার মন ফিরল না। মীরার সঙ্গে আলোচনার উদাবাদী ক্রমে মীরার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্য গ্রহণ করেন। এ কথা রাজার কানে পৌঁছায় এবং শোনা যায় রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে হরিচরণমৃত বলে মীরাকে বিষের পাত্র পান করতে দেন। এক অলৌকিক শক্তিতে সে বিষ মীরার হাতে অমৃত হয়ে ওঠে। বিক্রমাজিত তবু মীরার মহত্ত্ব অনুভব করতে পারলেন না। কথিত আছে মীরা যখন মন্দিরে স্বয়ং স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ভজনে মগ্ন তখন রাজা কামানের সাহায্যে মন্দির ভেঙ্গে দেন। মন্দির ভগ্ন হলেও তা মীরাবাদী এবং গীতমুখ সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রয় করে নি। কিন্তু এর পরে মীরা আর চিতোরে বাস করেন নি। “মেরে ভো গিরিধারী গোপাল, হুসরা ন কোই”—এই বিখ্যাত ভজনটি গাইতে গাইতে মীরা চিতোর ত্যাগ করে তাঁর গিরিধারীলালের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন ধামের দিকে অগ্রসর হন।

গৃহত্যাগের পর প্রকৃতভাবে মীরার সাধনা শুরু হয়। যার জন্তে গৃহত্যাগ করেছেন মীরা ভো তখনো তাঁকে পান নি। যে মুক্তির সাধনায় তিনি রাজরাণী হায় পথের ভিখারী সে মুক্তি ভো তখনও মেলেনি।

“তুম্বহারে কারণ সব স্থখ ছোড়া;”

অব মুখে কেঁও তরসারো।” পাবার অজ্ঞ এই যে আকুলতা, এই প্রতীক্ষা এরই কল মীরার অপূর্ব বিরহপ্রতীক্ষার পদগুলি। এর মধ্য থেকে যেন মানব স্বয়ং চিরন্তন বিরহের স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এই পদগুলির মধ্যে বৈষ্ণব মহাজনের পদ্যবলীর অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবি বণিত রাধার সঙ্গে মীরা যেন এক হয়ে যান।

“তোহারী মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল, ছোড়ল গৃহ স্থখ আশ”—মীরা বাঁশীর ডাকে গৃহ ছেড়ে পথে নেমে এসেছেন কিন্তু তবু তো তিনি দেখা দিলেন না।

“প্যারে দরশন দিহ্যো আশ

তুম বিন রহো না জায়।”

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে ভক্ত রাধা তাঁর প্রতীক্ষার ব্যাকুল হন, সে ব্যাকুলতা মীরাও অনুভব করেন।

“গিগতে গিগতে যি গঙ্গি উর্গলি

যি গঙ্গি উর্গলি কি রেখ”—

বৈষ্ণব কবির কথার শুনি,—

‘কতদিন মাধব, রহব মথুরাপুর

কবে ঘুঁচাব বিধি বাম

দিবস লিখি লিখি নখর খেদায়ল্ল

বিছুরল গোকুল নাম।”

ভক্তের ব্যাকুল আহ্বানে ঈশ্বর সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না, সে সাড়া ভক্তের কানে পৌঁছায়—“হুনী মৈ হরি আবন কি আবাজ”—আমাদের দেশের কবি বলেন,

“মথুগা হইতে এখন হরি

আইল বলিয়া শব্দ করি।”

তিনি এলেন, সে পাওয়ার আনন্দ ভক্তের মুখে গানের স্বরে বেজে ওঠে—

“মেধা বরসবো করে রে

আজ প্রীতম মোরো ঘরেরে”—

মনে পড়ে—

“কি কহব রে সখি আনন্দ ওর

চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।” তবু ভয় হয় বুঝিবা পেয়ে হারাতে হয়। তাই ব্যাকুল হয়ে বলেন—

“বহুত দিনগৈ শ্রীতম পায়ে, বিছুড়নকো মোহিঁ ডররে।”
মনে আসে পদাবলীর—

“শুন হে পরাণ পিয়া

বহুদিন পরে পাইয়াছি লাগ আর না দিব ছাড়িয়া।”

মীরা বৃন্দাবনে এলেন পূর্ণজ্ঞান পেয়ে। সেখানে জীব
গোশ্বামীর বিদ্যার খ্যাতি শুনে তাঁর দর্শনের অভিলাষী হন।
কথিত আছে জীবগোশ্বামী জীলোকের মুখদর্শন করেন না
এই কথা বলে পাঠিয়েছিলেন। শুনে মীরা উত্তর করেন—
“বৃন্দাবনেও পুরুষত্বের অভিমান! বৃন্দাবনে তো শ্রীকৃষ্ণই
একমাত্র পুরুষ।” শোনা যায় মীরার জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনে
জীবগোশ্বামী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তত্ত্বালোচনা
করেন। কিছুকাল বৃন্দাবনে বাসের পর মীরা দ্বারকায় যান
এবং সেখানেই অল্পমান ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর
দেহান্ত হয়। মীরার মৃত্যু সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী এই যে
মীরার চিতোরত্যাগের পরই চিতোরে নানারকম দুর্ঘটনা
ঘটেতে থাকে। বিক্রমাজিত বৃদ্ধতে পারেন মীরাই চিতোরের

রাজলক্ষ্মী এবং তাঁরই অভাবে চিতোরের এ দুর্দশা। তিনি
মীরাকে ফিরিয়ে আনবার জন্ত ব্রাহ্মণ দূত (কেহ বলেন তিনি
নিজেই গিয়াছিলেন) পাঠান। দ্বারকায় গিয়ে ব্রাহ্মণ
মীরাকে ফিরে আসবার জন্ত অল্পরোধ করেন। মীরা বিপর
হয়ে রহোড়জীর মন্দিরে প্রিয়তমকে ডেকে বলেন—

“সাজন হুধ জেঁয়া জান তৌ লীজো হো

* * * * *

মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর মিলি বিছুড়ন কিজো হো।”
কথিত আছে এ প্রার্থনায় রহোড়জী স্থির থাকতে পারেন নি,
প্রকাশিত হয়ে মীরাকে আপনার মধ্য গ্রহণ করেছিলেন।
সেই থেকে আজ অবধি দ্বারকায় রহোড়জীর মন্দিরে রহোড়ের
সঙ্গে মীরারও পূজা হয়। *

* এই প্রবন্ধ লিখিতে শ্রীকৃষ্ণ অনাথ নাথ বহুর
‘মীরাবাঈ’ এবং স্বামী ভূমানন্দের ‘মীরাবাঈ’ এই দুইটি
পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। লেখিকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বর্তমান সংখ্যায় স্থানান্তরে “কাঁচা লেখার আসর” প্রকাশ করা
সম্ভব হইল না, আগামী সংখ্যা হইতে যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

আমাদের আসর

পরিচালিকা শ্রীবেলা দে

শক্তি চর্চার প্রয়োজনীয়তা

পরিচালিকা—বেলা দে

অনেকের বিশ্বাস দৈহিক শক্তিতে নারী পুরুষের সমান হতে পারেন না। কিন্তু আজকের দিনে এ ধারণা মনে নিয়ে নিষ্কর্মা বসে থাকলে ভুল হবে। বিশেষ করে যখন আমাদেরই চোখের উপর দেখছি ঘরে বাইরে, পথে ঘাটে, দুর্বলা নারীর দেহের ও মনের উপর অত্যাচার হতে। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন না—নিরুপায় দৃষ্টি নিয়ে এ ওর মুখের পানে তাকিয়ে, হয় তো সহ্য করে যান। বড় জোর খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ঐ সব খবরগুলি বেরোয়। তাতে কোন পুরুষ বা হুঃখিত হন, কেউ বা লাজিত হন, কেউ বা এ সব হেসে উড়িয়ে দেন। কিন্তু তাঁরা হেসে উড়িয়ে দেন বলে আমরা কেন আত্মরক্ষা করার শিক্ষা গ্রহণ করব না? বর্তমান যুগে অল্প বিস্তর সকল মেয়েকেই পথে বেরতে হয়—তা ছাড়া যাদের বাড়ীতে থাকতে হয় তাঁদের ও শক্তির দরকার আছে। বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবকশূন্য হয়েও অনেক সময় অনেক মেয়েকে থাকতে হয়, তখন নিজের দৈহিক শক্তির অভাব হলে তাকে পদে পদে নানারকম অসুবিধায় পড়তে হবে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে বাড়ীর মেয়েদের নিজের হাতেই সকল কাজ করতে হয়। কিন্তু আজকাল দেখি অল্প বয়সেই তাঁদের স্বাস্থ্যহীনা হয়ে পড়তে তাহলে তাঁরা তো কোন কাজই অসম্পন্ন করতে পারবেন না। তাছাড়া স্বাস্থ্য ও শক্তিহীনা মেয়েদের পুত্রকর্তাদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়বে এতে আর সন্দেহ কি?

এখন যাদের বাইরে চলাফেরা কর্তে হয় তাঁদের কথাই বলি—তাঁদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। শক্তির অভাবে

আমাদের মনের নেই বল—যেখানে কোন গোলমাল হবার সম্ভাবনা সেখান থেকে আমরা সসবাস্ত হয়ে সরে দাঁড়াই—অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত প্রেরণা কোথায়? তাই প্রতিদিন কত অত্যাচার অবিচার যে আমরা নীরবে সহ্য করে যাচ্ছি তার ইয়ত্তা নেই!

বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে নারীর দৈহিক শক্তি বর্দ্ধিত করবার উপযোগী ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের প্রত্যেক ঘরে ঘরে করা উচিত। এবং এটাকে ‘নিখিল বঙ্গীয়’ বিষয় স্বরূপ গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে এই ধরনের ব্যায়াম কেন্দ্রের স্থাপনা করা আজকের দিনে নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছে। যারা যথার্থ ভাবেই দেশের ও সমাজের মঙ্গলকাজে সেই সব উচ্চমনা মনস্বিনীরা যদি ‘শক্তিচর্চা শিক্ষাগার’ প্রতিষ্ঠা করে মেয়েদের ব্যায়াম শিক্ষার জন্ত বন্ধপরিকর হন এবং প্রত্যেক নারীর এই শিক্ষাকে অপরিহার্য ব্রত হিসাবে গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করেন তবে ঘরে ঘরে আমাদের মা বোনেরা আত্মরক্ষা করবার মস্ত্র দীক্ষিত হতে পারবেন। সেই শুভদিনের আশায় রইলাম।

রূপচর্চার টুকটাকি

১। মুখের রং মলিন হলে তার প্রতিকারের উপায়। এক টুকরো শশা কুচি কুচি করে কেটে তার সঙ্গে অল্প দুধ মিশিয়ে বেশ করে খেঁতো করে নেবেন, তারপর চটকে নিয়ে মুখে ১ ঘণ্টা আন্দাজ মেখে, ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেসবেন, তাহলে ঐ মলিনতা আর থাকবে না।

২। শীতকালে গায়ের রং মলিন হলে—জলপাইতেল আর পাতিলেবুর রস একত্রে মিশিয়ে নিয়ে

গায়ে মাখতে হবে, এতে শুধু বর্ণের উজ্জলতাই বাড়ে না, হাতের কর্কশতাব এবং কালচে দাগ ও বেশ কমে যায়।

৩। **অচেততা ও ভ্রূতের উপর বিকৃততাব** দেখা দিলে ছাঁভাগ ম্যাগনেশিয়া, ১ ভাগ হুধ একত্রে মিশিয়ে প্রলেপাকারে প্রয়োগ কর্তে হয়। প্রলেপ শুকিয়ে গেলে যথারীতি ধুয়ে ফেলবেন। তা ছাড়া ম্যাগনেশিয়া ও পাতিলেবুর রস ও একত্রে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়। এই প্রলেপ সারারাত মুখে রাখাই হচ্ছে প্রশস্ত।

৪। **হাত কোমল হবে**—অনেকের হাত অত্যন্ত শক্ত থাকে। তার একটি প্রতিকার হচ্ছে পাতিলেবুর রসের সঙ্গে সম-পরিমাণ গ্লিসিরিন মিশিয়ে প্রত্যহ হাতে মাখা। তাহলে হাত কোমল ও মৃদু হলে।

“মুখশ্রী”

শ্রীগীতা বসু বি-এ,

পারীক্ষিক সৌন্দর্যের মধ্যে মুখশ্রীই মানুষকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে। গায়ের রং যত উজ্জলই হোক, চাঁপার কলির মত আঙ্গুলের গড়নই হোক সে সব নিষ্প্রভ হয়ে যায় যদি মুখের সৌন্দর্য কিছু না থাকে। অবশ্য মুখের সৌন্দর্য বলতে টানা টানা চোখ, কী নিখুঁত নাকের গড়ন বা পাতলা ঠোঁট ইত্যাদি থাকতেই হবে তার কিছু মানে নেই। এমন অনেক সুন্দর মুখ দেখেছি যাদের নাকের চোখের আলাদা কোন সৌন্দর্য নেই। আমরা কথায় বলি চাঁদের মত মুখ। চাঁদের মত গোল মুখ অবশ্য সুন্দর নয়। আসল কথা চাঁদের মত উজ্জল, দীপ্তশ্রী মুখ। মুখচন্দ্রিকা—বলতে তাই বোঝায়। মুখের উজ্জল মহিমাই আসল। এর জন্ত মুখের গড়ন নিখুঁত হবার প্রয়োজন হয় না। মেয়েদের মুখে সব চেয়ে প্রয়োজন হাসিমাখা ভাব। একখানি হাস্যময়ী মুখ আমাদের চোখে কত আনন্দ দেয়। তার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণকালের জন্ত আপন জীবনের দুঃখ ভোলা যায়। মানুষের জীবনে

দুঃখ শোক ঝড়ঝাপটা আছেই। তার ফলে মুখের স্বাভাবিক মাধুর্য অনেক সময় মলিন হয়ে যায়। তবু মানুষের অনাধ্য কিছু নেই। সংসার সংগ্রামে জীবনে বিস্তর যন্ত্রণাভোগ করেছে এমন মেয়েও দেখেছি। কিন্তু যন্ত্রণায় কোন ছাপ তার মুখের কোন একটা রেখাকেও কুঞ্চিত করতে পারেনি। আবার দেখেছি যাদের জীবনে কোন অভাব নেই, কোন দুঃখ নেই এমন মেয়ের মুখে কোন শ্রী নেই। এই সব মেয়ে অনায়াসে মুখের মাধুর্য ফুটিয়ে তুলতে পারে। জীবনে শোক তাপ যদি না থাকে তবে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা শক্ত কাজ নয়। পরশ্রীকাতরতা যতদূর সম্ভব মন থেকে তাড়ানো উচিত। আমাকে দেখতে ভাল নয়, আমার কোন গুণ নেই, আমার অর্থ নেই, আমি কাল, এই যাদের মনভাব প্রায় ক্ষেত্রে তাদের মুখশ্রী নষ্ট হয়ে যায়। ‘Inferiority Complex’ রোগে তারা ভুগছে বলতে হবে তারা স্বাভাবিক ভাবে কারুর সঙ্গে মিশতে পারে না কিম্বা মিশতে ভয় পায়; অথচ মনের দুর্বলতা ত্যাগ করতে পারে না। যারা বেশী মিশতে গল্প করতে পারে, হাসতে পারে তাদের মুখের দীপ্তশ্রী কেউ কেড়ে নিতে পারে না। মুখের সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয় অনেক সময় নানা রোগ ব্যাধি। এই ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের হাত বেশী নেই। কিন্তু ইচ্ছে করলেই মনকে প্রফুল্ল রাখতে পারি। তবে কেন রাখবো না? নাইবা রইল আমার রূপ, কিম্বা টাকা! যার আছে তার আছে, তাই বলে পরশ্রীকাতর হয়ে আমি কেন অযথা কষ্ট পাই? মনের কষ্ট মুখে ফুটে উঠবেই; তাই মনকে যতদূর সম্ভব পরশ্রীকাতরতা রোগ থেকে দূরে রাখতে হবে। স্নো ক্রীম ক্ষণিক উজ্জলতা দেবে কিন্তু মনের স্বাস্থ্য দেবে অটুট সৌন্দর্য লাভ্যময়ী মুখ আমরা কত ভালবাসি। মনে রাখতে হবে সুন্দর মুখের শ্রী।

মহিলা সমাচার

ত্রিজেয়তিমচন্দ্র ঘোষ

বোম্বাই বাঙ্গালী মহিলা সমিতি

বোম্বাই আন্তর্জাতিক মহানগরী। কলিকাতার মতন জনাকীর্ণ ও ঐশ্বর্য্য সম্বলিত। প্রায় ছয় হাজার বাঙ্গালী এই সুদূর প্রবাসে বাস করে। এখানে দুই সহস্র বাঙ্গালী শ্রাকরা সহরের মধ্যে বহুদিন বাস ও কারবার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রায় ৪০০০ হাজার শিক্ষিত নরনারীও এখানে বাস করেন। কিন্তু এতদিন বাঙ্গালী মেয়েদের কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা শিক্ষার মিলন কেন্দ্র ছিল না।

১৯৪২ সালে দাদর সহরতলীতে ২৫ হিন্দু কলোনীস্থ এক গৃহে বোম্বাই বাঙ্গালী মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে প্রবাসের ও বাংলার মহিলাদের মিলনের ও সংস্কৃতির অনুশীলনের এক ক্ষেত্র হইয়াছে। এখানে খেলাধুলা ও ব্যায়াম চর্চাও সুবিধা আছে।

এই সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য্য, এম.এ. (বোণা দাস, এম.এল, এর অগ্রজা) শ্রীমতী প্রতিভা গুহ, সম্পাদিকা। শাস্তি সেন গুপ্তা বি.এ, মায়া ভায়া বি.টি, শান্তা গুহ, রাণী সেন, প্রীতি সেন, নীলিমা সিংহ প্রভৃতি সমিতির কন্মিউন্ডের উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা সমিতিকে উত্তর উত্তর শ্রীমণ্ডিত করিতেছে।

পরলোকে ধরিত্রী দেবী

ধরিত্রী দেবী সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী এবং স্নেহিকা শ্রীমতী চিত্রিতা দেবীর শ্রদ্ধা-ঠাকুরাণী ছিলেন। তিনি বিখ্যাত কবিরাজ সি.কে. সেন মহাশয়ের দৌহিত্রী, রায় বাহাদুর চাক্রকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয়ের কন্যা। তিনি বিদ্বা ও সমাজ সেবিকা ছিলেন। তাঁহার স্বামীর সাহিত্যসাধনার এবং “অর্জুন” সম্পাদনে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়৷ সহযোগিতা ও সাহায্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত সমগ্র

ভারত ও সিংহল ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সারদেখরী আশ্রম, মুক ও বধির বিদ্যালয় আদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সভ্য থাকিয়া বহুভাবে দেশের কাজে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার হঠাৎ সম্ভ্রাসরোগে দেহত্যাগে তাঁহার পরিবার ও নারীসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল। ভগবান এই স্বাধীন নারীর শোকসমুপ্ত স্বামী ও পুত্রকে শাস্তি প্রদান করুন।

মাজাজে মহিলা মহাসম্মেলন—বর্তমান বর্ষে নিঃ ভাঃ মহিলা মহাসম্মেলনের অধিবেশন মাজাজ নগরে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি লেডী রমা রাও এই প্রতিষ্ঠানকে ইউ, এন, ও আন্তর্জাতিক সভা গ্রাহ্য করাতে আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি মেয়েদের ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা ও সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবার জন্ত সর্বতোভাবে পুরুষদিগের সহায়তা করিতে উপদেশ দেন।

আমামী বৎসরের জন্ত শ্রীমতী অনুহুয়া বাঈ কালে সভানেত্রী আসন গ্রহণ করিলে ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা) ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ফরাসী, সুইডেন, চীন আদি দেশের প্রতিনিধিগণ শুভাচ্ছাচ্ছাপক বাণী পাঠ করিয়াছিলেন। ভারত গভর্নমেন্টের মন্ত্রী মাননীয়া রাজকুমারী অমৃত কাউর মহোদয়া সম্মেলন উদ্বোধন করিবার সময় বলেন লক্ষ্য হইতে সীতা উদ্ধারের জায় অপহৃত লাক্ষিত ভারত ললনাদের উদ্ধার করিবার জন্ত সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। রাক্ষসকুল নির্মূল করিতে হইবে। সে কার্য্য প্রধানত ভারত নারীদেরই কর্তব্য।

এই সম্মেলনে কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, লীলাবতী মুন্সী, সুখা মজুমদার, মিসেস কজিনস, সুলতাতা রায় প্রভৃতি মহিলাগণ নারী কল্যানার্থ নানা বিষয় আলোচনা ও বক্তৃতাাদি প্রদান করেন।

পুষ্পকুন্তলা দেবীর অকাল মৃত্যু

কলিকাতা করপোরেশনের শিল্পী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্নী লেখিকা ও সমাজ সেবিকা পুষ্পকুন্তলা দেবী হঠাৎ সম্যাস রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 'মাতৃমন্দির' ও 'মাসিক বসন্ততী'তে রঞ্জন ও শিক্ষা সম্বন্ধে বহু ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেন।

তিনি "পুষ্পকুন্তলা মিলনী" নামে একটি নূতন রকমের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া সভ্যেরা আলাপ আলোচনা ও গৃহ সংসার যাত্রার নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেন। সভ্য ও সভ্যাগণের বিশেষত্ব এই ছিল যে সভ্যের অধিবেশনের দিন তাঁহার স্ব স্ব গৃহ হইতে সিন্দুর ও চন্দন লইয়া আসিয়া সভ্যাদের সীমন্তে মেয়েরা সিন্দুর প্রদান ও সভ্যাগণের কপালে পুরুষগণ চন্দনের তিলক দান করিতেন।

আমরা পুষ্প দেবীর অকাল মৃত্যুতে দুঃখিত এবং তাঁহার পতি শিল্পী রায় মহাশয় এবং প্রিয় পুত্র শিল্পী অমিতাভকে শান্তি দিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

পরলোকে মণিকা দেবী

বিগত ২৮শে অক্টোবর ভক্ত কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা ও অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের পত্নী মণিকা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। বহু সামাজিক ও জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। গত দুই বৎসর তিনি বঙ্গীয় মহিলা শিক্ষা সমিতির (Bengal Women's Education League) সভানেত্রী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম সনাতনের নানাপ্রকার ধর্ম্মাহুষ্ঠানে আচার্য্যার কার্য্য ও অগ্রাগ্রসে সহায়তা করিতেন। হৃদয়গ্রাহী উপাসনা করিবার স্বাভাবিক ও অননুসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে এই শোকে সহানুভূতি জানাইতেছি।

পুস্তক পরিচয়

বন্দী বিধাতা—শ্রীমতী হাসিরামি দেবী প্রণীত।
প্রকাশক—সি, সি, বসাক এণ্ড সন্স, ১২৭, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৫৪।

এই উপন্যাসটিতে হাসিরামি দেবী গতানুগতিক মজুর কৃষাণের কাহিনী বা তরল প্রেমগীতার বর্ণনা করেন নাই। উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সাংখ্যিকতা সাহিত্যে রস ও চরিত্র সৃষ্টি। গ্রন্থকর্তা ব্রহ্মদেবীয়া কঠিন ভূমির এক বালিকার চরিত্র

অভিনবভাবে বাংলা মায়েদের শ্রামল অঞ্চলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহা পরগাছার মতন বিস্ত্রীত হয়ই নাই, বরং নূতন আকারে স্ত্রী ও উপকারী হইয়াছে। লেখিকা সমাজ সেবা জ্বীলকের আত্ম সম্মান রক্ষার অনেক বাধা বিঘ্নের কথা সুনিপুণভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। পুস্তকটি স্থপাঠ্য, ভাষাও একটু নূতন পথে চলিয়াছে। তাঁহার অগ্রজা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর প্রভা উপেক্ষা করিয়া লেখিকা নূতন ধরণের উপন্যাস লিখিয়াছেন।

জা ন য়ি কী

গান্ধী-তর্পণ

(চন্দন চিতায়)

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

নিষ্পাপ দেব শিশুর দেহখানি চন্দন চিতায়-সমপিত হল।
পরম পাবক অগ্নিদেব উর্দ্ধ শিখায় জড়ত্বের শেষ চিহ্নটুকুর
স্বস্মৃতিস্বপ্ন পরমাণুগুলি বহন করে নিয়ে চললেন উর্দ্ধলোকে।
সেখানে সেগুলি চিন্ময়-রূপ পরিগ্রহ করল। দুঃখ বেদনা-পূর্ণ
হৃদয়ে পৃথিবীর মানুষ বিম্বিত-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার পানে।
পৃথিবী শাস্ত্র অনন্তের সঙ্গে সে নিত্যযুক্ত। তার জল, মাটি,
বাতাস, আকাশ, স্বচ্ছ দিবালোক ও মাধ্যময়ী জ্যোৎস্না
উদ্ভাসিত রাত্রি চির প্রশান্তির আধার।

একান্ত প্রীতি ভরে তারা জীবজগৎকে আলিঙ্গন করে
রয়েছে।

সেখানে হিংসার স্থান নাই। হিংসার যত কুশ্রী, কুটিলতা,
অসঙ্গতি, অশ্রাব্যতা, মানব প্রকৃতির চিন্তের বিকার বিকৃতি
হতেই উৎপন্ন। মহামানবেরা তা থেকে মানবজাতিকে
উদ্ধার করার জন্য মৃত্যুপণ করে প্রাণপাত করে চেষ্টা করে
গেছেন। সফলতা গোপে হলেও নিরর্থক হতেই পারে না।

নিশ্চিত সাফল্য হবে।

মহাত্মা গান্ধীজী নিজ আত্মার শান্ত শান্তির স্বে-রূপ
দেখিয়ে গেলেন পৃথিবী তাহা কখনও বিস্মৃত হবে না।

হিংসার সাথে যুক্তিতে যুক্তিতে শক্তি হলোকি ক্ষয় ?

আপন জ্যোতিতে লইলেন তুলি তাই কি জ্যোতির্ধ্বয় ?

আমাদের পাপ নিয়ত তোমারে আঘাতি ফিরিতেছিল

হিংসার বশে বজ্র বিধারী বক্ষ বিদারি দিল

পাপে ডোবা এই ধরণীতে হবে আরোও কত পাপ জমা ॥

তব হত্যার মহাপাপ হতে পাবে কি এজাতি ক্ষমা,

অপূর্ব তব জাতি ভালবাসা অপূর্ব রাম নাম

পারিবে কি আজি বাঁচাতে এজাতি ইহাতে সফল কাম ?

হিংসার বৃকে অহিংসা নীতি অক্ষয় বীজ মন্ত্র।

মৃত্যুর পশে মহামানবেরা গড়িলেন এই তন্ত্র ॥

যাত্রা তোমার নির্বাণ লোকে অরূপের রূপধরি।

লয়েছ কি সাথে এ পাপের বোঝা চিতায় ভস্ম করি ॥

চন্দন চিতা বহিতে হ'ল অগ্নির আবাহন।

পাপের ধ্বংস পূণ্যের স্থিতি ত্বের উদ্‌যাপন ॥



Indian Fabrics

CLASSIC SILK & COTTONS

• BHOWANIPUR :: CALCUTTA •

ইণ্ডিয়ান ফেব্রিক্স (মিত্র মুখার্জী জুয়েলারের উপর তলার) ৩৫নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা। ফোন সাউথ ১২৭৮

বঙ্গলক্ষ্মী

২৩শ বর্ষ

ফাল্গুন-১৩৫৪

৪র্থ সংখ্যা

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে বর্তমান অবস্থায় কিছু লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে, আমি প্রধানত বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীতে কয়েকটি কথা লিখিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমেই আমি বলিতে পারি যে, মহাত্মাজি ছিলেন একটি বোধিসত্ত্ব। সোজা কথায়, যিনি বোধি বা পরম প্রজ্ঞা চান, বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। সাধনার দ্বারা বোধিসত্ত্বই পরে বুদ্ধ হন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই বোধিসত্ত্ব, এবং তাহার পরে বুদ্ধ হইতে পারে। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক যে, বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী, আমার মনে হয়, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে, বোধিসত্ত্বগণের জীবনের অতিউচ্চ, অতিপবিত্র ও অতিমহৎ জীবনের আদর্শ ও সাধনা। ইহা বাদ দিলে বৌদ্ধধর্মের অনেক কিছু বাদ যায়। বুদ্ধদেবের নিজেরই কথায় তাঁহার ধর্ম অত্যন্ত দ্রুত, ও "পণ্ডিত-বেদনীর" অর্থাৎ কেবল পণ্ডিতেরাই তাহা বুঝিতে পারেন। বোধিসত্ত্বগণের জীবনের মহৎ আদর্শ ও ব্রতচর্চাতেই পৃথিবীর এত লোক ঐ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। যে-যে গুণ থাকিলে কেহ বোধিসত্ত্ব হইতে পারে, তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে নিজের বাহা কিছু আছে, এমন কি জীবন পর্যন্ত, সর্বত্রের সমস্ত দুঃখ নিজের মস্তকে লইয়া তাহার কল্যাণের জন্য সেই সমস্তকেই বিসর্জন করা। এই সমস্ত

গুণের অধিকাংশই মহাত্মাজির মধ্যে দেখা গিয়াছিল। শোষিত গুণটিও যে, তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা তো দেখাই গেল।

বোধিসত্ত্বের কথায় বৌদ্ধসাহিত্যের পৃষ্ঠাগুলি উজ্জল হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ বহু চরিত্রই পড়িয়াছি, কিন্তু পূর্বে নিজের চোখে কোন বোধিসত্ত্বকে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নি। এই যুগে জনগ্রহণ করার মহাত্মাজিকে দর্শন করিয়া আমাদের সে সৌভাগ্যও হইয়াছে। অপর পক্ষে, আমাদের দুর্ভাগ্যও কম নহে। তাঁহাকে ঐরূপ অচিন্তনীয় ও জঘন্যভাবে সহসা তিরোহিত করিয়া দেওয়া হইল, আর আমরা তাহাই দেখিলাম। -

হাঁ, একটি হিন্দুই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু সত্য বলিতে হইলে, যে হত্যা করিয়াছে, সে হিন্দুও নহে, অহিন্দুও নহে, তাহার কোন জাতিধর্মও নাই। সে হইতেছে সময়ান, অথবা যদি কোন উপযুক্ততর শব্দে প্রকাশ করিতে হয় তবে বলা যাইতে পারে সে হইতেছে মার। মার শব্দের মৌলিক অর্থ হইতেছে মৃত্যু। ইহার অপর বা প্রসিদ্ধ বা প্রচলিত নাম কাম অর্থাৎ অত্যধিক ও অসংযত কামনা বা আকাঙ্ক্ষা। পুরুষধর্ম আরোপ করিয়া (personification) আমাদের শাস্ত্রে ইহাকেই বলা হয় মার, কারণ ইহা মৃত্যু ঘটায়। ইহাই হইতেছে সমস্ত অনর্থের মূল কারণ।

ইহা প্রবল হইয়া উঠিলে পিতা-মাতাকেও পিতা-মাতা বলিয়া চেনা যায় না। মাছুষ যে তখন সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া পড়ে। তাই একজন হিন্দু যে, অতবড় এক হিন্দুকে হত্যা করিবে তাহা বিশ্বাসের বিষয় নহে।

মৃত্যু অপরিহার্য। স্বাভাবিক ভাবেই হউক, আর অস্বাভাবিক ভাবেই হউক, ইহা আসিবেই। তাই যাহা ঘটয়াছে তাহার জ্ঞাত শোক করা বৃথা। যাহা হইয়াছে, হইয়াছে।

যাহারা মহাত্মাজীর অমুগামী বা যাহারা তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহারা এই অবস্থায় একটি কাজ করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদের প্রভুত উপকার হইবে। বৌদ্ধধর্মের পাঠকেরা জানেন, বুদ্ধদেব নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে দেখিতে হইলে তাঁহার “ধর্মকায়” দেখিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার আসল কায় বা শরীর হইতেছে তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম, এই ধর্মকে দেখিলেই তাঁহাকে দেখা হয়, তাঁহার স্থূল শরীর দেখিলে তাঁহাকে দেখা হয় না। মহাত্মাজির স্থূলকায় আমাদের সম্মুখে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ধর্মকায় তো রহিয়াছে, এবং পরেও রহিবে। ইচ্ছা করিলে ইহা দ্বারা জীবন্ত ভাবেই সর্বদা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আরও একটি কথা আছে। আমাদের মানসিক ব্যাপারে কোন বস্তু নহে, কিন্তু বস্তুর ভাবটাই (idea) হইল প্রধান। বস্তুটি সত্য বা কল্পিত দুইই হইতে পারে। ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাহা হইতে যে ভাবের উদ্ভব হয় তাহাই আমাদের ভাল বা মন্দে জ্ঞাত হইয়া থাকে।

রামায়ণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করা বড় শক্ত। রাম, সীতা ইত্যাদি সত্য-সত্যই ছিলেন, কে ইহা প্রমাণ করিবে? তথাপি, রাম, সীতা ইত্যাদির ভাব আমাদের চিত্তে গঠিত, এবং পরেও উঠিতে থাকিবে। যদি বা সত্য-সত্যই রাম-সীতার অস্তিত্ব ছিল, তথাপি তাঁহারা অতীত, এখন তাঁহাদের শারীরিক কোন অস্তিত্ব নাই। যাহা তাঁহাদের আছে, তাহা কেবল তাঁহাদের ভাব, ভাবমূর্তিতেই তাঁহারা আছেন। ঐশ্বর্য্যুষ্টির ঐতিহাসিকতা লইয়া পণ্ডিতেরা বিবাদ করেন। একদল বলেন তিনি ছিলেন, অন্যদল বলেন না। না হয় তিনি রক্তমাংসের শরীরে নাই ছিলেন,

কিন্তু তিনি জগতের দুঃখভার নিজের মাথায় বহিয়াছিলেন, এই ভাবের মূর্তিতে তিনি যে ছিলেন, আছেন, এবং পরেও থাকিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই? এই ভাব মূর্তিতে তিনি সম্মুখে ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া নীনবন্ধু এণ্ড জ হইয়াছিলেন এণ্ড জ, যাহার সংসর্গে আসিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম, যাহাকে আমি গুণব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতাম, আর বৈষ্ণবের দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে করিতাম এক জন পরম বৈষ্ণব। ঠিক এই রূপেই মহাত্মা গান্ধী ভাবমূর্তিতে আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিবেন, এবং নিজের কার্য করিয়া যাইবেন—যদি কেবল আমরা সত্য-সত্যই তাহা চাই।

নির্বাণ লাভের ঠিক পূর্বে বুদ্ধদেব প্রিয় শিষ্য আনন্দকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন ‘আনন্দ, তোমাদের মধ্যে কাহারো কহোরো মনে এইরূপ চিন্তা হইতে পারে “আমাদের শাস্ত্রের (অর্থাৎ উপদেশকের) কথা শেষ হইয়া গেল। আর আমাদের শাস্ত্র থাকিবেন না।” কিন্তু, আনন্দ, এরূপ মনে করিও না। আমি যে ধর্ম ও বিনয় উপদেশ করিয়াছি, আমার পরে তাহাই তোমাদের শাস্ত্র।’

মহাত্মাজিরও সম্বন্ধে কি তাহাই বলা চলে না?

এই স্থানে একটি কথা বলিতে পারা যায়। বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের পর তাঁহার উক্তিসমূহ সংগ্রহের জ্ঞাত ভিক্ষুগণের যে প্রথম মহাসভা (ধর্ম-মহাসম্মেলন) হয়, তাহার কার্য-বিবরণে দেখা যায়, প্রথমে বিনয় ও তাহার পরে ধর্ম-বিষয়ক বচনগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছিল। কেন এরূপ করা হইয়াছিল? কেন প্রথমে বিনয়কে ও পরে ধর্মকে স্থান দেওয়া হইয়াছিল? বুদ্ধঘোষ এ সম্বন্ধে বলেন যে, ঐ মহাসভায় মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে সেই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ বলেন যে, বিনয়কেই প্রথম স্থান দেওয়া কর্তব্য, কারণ ধর্ম ও বিনয়ের মধ্যে বিনয় হইতেছে বুদ্ধ শাসনের অর্থাৎ বুদ্ধবচনের আয়ু। বিনয় থাকিলে ধর্ম থাকিবে, বিনয় না থাকিলে ধর্ম থাকিতে পারে না।

আলোচ্য বিষয়েও যাহারা মহাত্মা গান্ধীর অমুগামী বা তাঁহাকে অমুগমন করিতে সত্য-সত্যই চাহেন তাঁহাদেরও প্রথমে তাঁহার উপদিষ্ট বিনয় বা নিয়ম-সংযমকে প্রথম স্থান দেওয়া আবশ্যিক, অত্যান্ত কর্তব্য হইবে পরে।

উপসংহারে আমরা একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ-শাস্ত্রের
নিম্নলিখিত শ্লোকটি চিন্তা করিয়া দেখিতে পারি—

“তিষ্ঠন্তং পূজয়েদ্ বস্তু যশ্চাপি পরিনিবৃত্তম্।

সমচিন্ত্যপ্রসাদেন নাস্তি পুণ্যবিশেষতা।”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান বুদ্ধকে পূজা করে,
আর যে ব্যক্তি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধকে পূজা করে, ইহাদের

পুণ্যের মধ্যে কোন ভেদ নাই, কারণ ঐ রূপ পূজায় চিন্তের যে
নির্মলতা বা শুদ্ধি হয় তাহা উভয় স্থলেই সমান হইয়া থাকে।

এই অল্পসারে, যদিও আজ মহাত্মাজি আমাদের নিকট
হইতে তিরোহিত, তথাপি তাঁহার নিকট হইতে জনগণের
সেই কল্যাণই হইতে পারে—যাহা হইয়াছিল তাঁহার জীবিত
অবস্থায়।

মহামানবের মহাপ্রয়াণে

ডক্টর রমা চৌধুরী

জগতের শ্রেষ্ঠ মানব, মহামানব মহাত্মা গান্ধীর আকস্মিক
মহাপ্রয়াণে আজ কেবল ভারতবর্ষই নয়, সমগ্র পৃথিবী
শোকে মূহ্যমান। বহু পুণ্যের ফলেই আমরা এরূপ একজন
মহাপুরুষকে আমাদের একান্ত আপনজন রূপে লাভ
করেছিলাম; এবং বহু পাপের ফলে আমরা নিজেরাই
সেই অমূল্য নিধি হারালাম। কিন্তু তাঁর পার্থিব, নশ্বর
দেহ চিতাভয়ে পরিণত হ'লেও, তাঁর অমর আত্মা আজও
এবং চিরদিন সমগ্র মানব সমাজকে পূর্ববৎ অল্পপ্রাণিত ও
উৎসুক করবে। ভারতবর্ষ শাস্তকাল আত্মার অমরত্ব
বিশ্বাসী। কঠোপনিষৎ বলেছেন যে, আত্মার জন্ম নাই,
মরণও নাই; ইহা কোনো বস্তু থেকে উৎপন্ন হয় নাই;
ইহা থেকেও অন্য কোনো পদার্থ উৎপন্ন হয় নাই;
ইহা অজ, নিত্য, শাস্ত ও পুরাতন; শরীর বিনষ্ট
হলেও আত্মা নিহত হয় না (কঠোপনিষৎ ২-১৮)।
ভগবদ্গীতাও বলেছেন যে, অস্ত্রসকল আত্মাকে ছেদন
করতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দহন করতে পারে না,
জল ইহাকে আর্দ্র করতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক
করতে পারে না; ইহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেশ্য, অশোষ্য,
চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপী, অবিকারী, স্থির ও নিত্য (গীতা ২-
২৩, ২৪)। সেজন্য আজ এই মহাশোকের মধ্যেও আমরা
ভারতবাসীরা এই চিন্তায় সাস্তুনা লাভ করছি যে, মহাত্মার
মহান আত্মার বিনাশ নাই—তাঁর পুণ্য আদর্শ এই

বনান্ধকারের মধ্যে আজও আমাদের সম্মুখে স্থির আলোক-
বর্তিকারূপে পথ প্রদর্শন করবে।

জাতির পিতৃস্বরূপ “বাপুজী” আমাদের নিকট কি ছিলেন,
তাহা বর্ণনাপ্রচেষ্টা ধুটতামাত্র—জাতীয় জীবনের এরূপ
কোনো অংশ নেই যা তাঁর অতুলনীর দানে পরিপুষ্ট নয়—
ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, সমাজসংস্কার, রাজনীতি, প্রত্যেক বিভাগই
তাঁর চিন্তাধারায় ও প্রেরণায় সজীবিত হয়েছে। পৃথিবীর
কোনো মহাপুরুষেরই এরূপ সর্বোত্তম দানের বিষয় আমাদের
জানা নেই। এককথায় কেবল এই বলা চলে যে, মহাত্মা
ছিলেন আমাদের স্বপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মূর্ত প্রতীক।
ভারতীয় কৃষ্টির মূল মন্ত্র সত্য, ত্রায়, প্রেম ও অহিংসা।
জগতের আদি দার্শনিক বৈদিক ঋষি থেকে আরম্ভ
করে পরবর্তী সকল ভারতীয় দার্শনিক, ধর্মগুরু ও
জ্ঞানিবৃন্দ এই সত্যের সন্ধানেই যুগে যুগে জীবনপণ
করেছেন। সেজন্য ভারতীয় দর্শনের মূল কথা
সত্যলাভ বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ। অজ্ঞান বা অবিজ্ঞাই
হ'ল মানবের বৃহত্তম, ভীষণতম শত্রু, এই অবিজ্ঞাই হ'ল
বন্ধের মূল কারণ। মানবের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মোক্ষ বা মুক্তির
একমাত্র সাধক জ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান, সত্যজ্ঞান। ব্রহ্ম ও
আত্মার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। সেজন্য বিভিন্ন
উপনিষদ্ প্রভৃতিতে বারংবার ব্রহ্ম ও আত্মাকে “সত্য” রূপে
বর্ণনা করা হয়েছে। কথা, “সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম”

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২-১-১), “তৎ সত্যং স আত্মা” (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬-২) প্রভৃতি। সত্যের প্রকৃতি ও প্রকার ভেদ সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনে বহু বিভিন্ন মতভেদ দৃষ্ট হ’লেও, এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, সত্যলাভই জীবনের চরম লক্ষ্য, পরম উদ্দেশ্য।

এই সত্যলাভের উপায় কি? এই বিষয়েও ভারতীয় ঋষি ও মনীষিগণ একমত—সত্যলাভ হবে কেবল ত্যজ ও নীতির সূকঠোর পন্থা দ্বারাই। এই ধর্মনীতির পন্থাকে কঠোপনিষদে “ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা ছুরন্তয়া দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি” (৩-১৪) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শাণ্ডিল্যের উপর পরিভ্রমণ যেরূপ কঠিন, সেরূপ সত্যলাভের পন্থাও দুর্গম, সূকঠিন ও দীর্ঘকালব্যাপী সাধনাসঙ্কুল। বাসনাভ্যাগ ও নিষ্কাম মানবসেবাই এই দুর্গম মার্গের সোপান-স্বরূপ। অহিংসা ও বিশ্বপ্রেম দ্বারাই এই মার্গ অতিক্রম করা যায়। সাধারণ বিশ্বাস যে, “অহিংসা পরমো ধর্ম” এই পুত নীতি কেবল জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদেই বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অহিংসা ও বিশ্বপ্রেম সমগ্র ভারতীয় সভ্যতারই মূলমন্ত্র। অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য অশ্বমেধ (চৌধ্যাভাব) ও অপরিগ্রহ (পাণ্ডি ব ভোগবিমুক্ততা বা দান-গ্রহণাভাব)—এই পঞ্চমহাব্রত সকল দার্শনিক মতবাদেই মুক্তির অত্যাশঙ্কক অঙ্গ বা সাধন রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা, ষোণসূত্রে (২-৩০) ইহাদের অষ্ট ষোণাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিকগণ কর্মবাদী, অর্থাৎ তাঁদের মতে স্বকৃত কর্মের ফলভোগ্য কর্মকর্তার অবশ্যজ্ঞাবী—পুণ্য কর্মের ফলে পুণ্য ও সুখ, পাপ কর্মের ফলে পাপ ও দুঃখ, নিষ্কাম কর্মের ফলে মুক্তি—ইহাই ধর্মের, ত্যজের অমোঘ বিধান। এরূপে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সমগ্র জগৎ ত্যজের বিধানে চালিত; এবং সেজন্ত কেবল ত্যজ ও নীতির পথেই আছে মুক্তি; অত্যাগ ও পাপের পথে নয়।

পরম দুর্ভাগ্যবশতঃ, কালক্রমে সত্য ও ত্যজের এই স্তমহান ও সুপবিত্র আদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে আমরা ক্রমশঃ অন্তঃসার-শূন্য বাহ্যিক আচার বিচারকেই কেবল ধর্মের সার বলে গ্রহণ করে আমাদের শাস্ত্রত কৃষ্টির অবমাননা করি। ফলে, যে সভ্যতা উচ্চাচল সকলকেই একই পরমাত্মার প্রকাশ বলে অকুণ্ঠিত স্বীকার করেছে, যে সভ্যতার স্তমহান ত্যজ ও নীতি,

সেই সভ্যতাতেই ধর্মের নামে ছুৎমার্গ প্রভৃতি অসংখ্য অনাচার ও কদাচার প্রবেশ করে, এবং আমাদের জাতীয় জীবনকে সর্বদিক থেকে পঙ্কু করে ফেলে। দ্বীতির এই চরম দুর্গতির কালে মধ্যযুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং বর্তমান যুগে রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ যুগপ্রবর্তক সাধুগণ ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই স্তমহান প্রচেষ্টা শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ ভাবে মূর্ত হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য জীবনে। আজীবন সত্য ও অহিংসার পূজারী তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ জগৎ সমক্ষে প্রকটিত করে আপামর সকলকে সেই সুপ্রাচীন অথচ চিরসত্য ও চিরনবীন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মহাত্মা ছিলেন সত্যাহ্বেষক ও সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তাঁর নিকট সত্যের অপেক্ষা অধিক বরণীয় অপর কিছুই আর ছিল না। “সত্যমেব জয়তে নানৃতম্” (যুগুৎ উপনিষদ্, ৩-১-৬)—কেবল সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়—এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নানা বিঘ্নবিপদের মধ্যেও সত্যকেই একমাত্র ধ্রুবতারকার ত্যজ অমূল্যস্বরূপ করেছেন। রাজরোষ, বন্ধুজনের অবিশ্বাস, শত্রুগণের নিন্দা—কোনো কিছুই তাঁকে লক্ষ্যপথ চ্যুত করতে পারেনি।

ভারতীয় ঋষিগণের সহিত স্মর মিলিয়ে মহাঋষি গান্ধীও বলেছেন, এই সত্যলাভ হ’তে পারে কেবল ত্যজ, নীতি, অহিংসা ও প্রেমের পথেই। হিংসার উন্নত পৃথীর রণকোলাহল উপেক্ষা করে তিনি বজ্রকণ্ঠে বোষণা করেছেন, হিংসার ফলে কেবল হিংসা বর্জিতই হয়, হিংসার শেষ নাই, অহিংসাই মানবের একমাত্র আশা। তিনি আমাদের ভারতীয় নীতিরই বারম্বার উল্লেখ করে বলেছেন, “অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্, অসাদ্ধুন্ সাধুন জয়েৎ। জয়েৎ কদর্থং দানেন, জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥” (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৩৮-৭৩)—ক্রমা দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে, উপকার দ্বারা অপকারকে ও সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করবে। তিনি কেবল এই নীতি মৌখিক ভাবে প্রচারই করেননি, স্বয়ং তাহা ক্ষুদ্র বৃত্তে প্রতি কার্ধে প্রমাণ করে গিয়েছেন। আততায়ীর হস্ত আহত হয়েও শেষ মুহূর্তে তিনি তাকে ষোড়হস্তে ও শ্মিতহাস্তে ক্রমা বিতরণ করেছেন—এর চেয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হ’তে পারে?

মহাত্মা গান্ধী অপর একটা নীতিও জীবন দ্বারা প্রমাণ

করেছেন—বিশ্বপ্রেম ও জনসেবার পূণ্য আদর্শ। অহিংসার অর্থ কেবল এই নয় যে, আমরা অপরকে হিংসা থেকে ক্ষান্ত হ'ব, কিন্তু তাদের প্রতি আর কোনো কর্তব্য আমাদের থাকবে না। অহিংসার প্রকৃত অর্থ বিশ্বপ্রেম ও জনসেবা। সত্যদ্রষ্টা মহাত্মা গান্ধীর জীবনে এই জনসেবা ও বিশ্বপ্রেম স্রবতঃ শ্রেষ্ঠভাবে সার্থকতা লাভ করেছিল। উপনিষদে আছে “বস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মশ্চেবানুপশ্রুতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপসতে।” (ঈশোপনিষৎ ৬)—যিনি আত্মাতে সমুদায় বস্তু দেখেন এবং সমুদয় বস্তুতে আত্মা দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না। মহাত্মা গান্ধী এই সত্য স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন, “সর্বং ধনু ইদং ব্রহ্ম” (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৩-১৪-১), উপনিষদের এই মহতী বাণী তিনি প্রকৃতই সত্য বলে অনুভব করেছিলেন। তজ্জন্ত তাঁর নিকট মানবে মানবে, ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে কোনোরূপ ভেদ ছিল না। এরই ফলে তিনি হরিজন, নারী আন্দোলন, গ্রামোন্নতি ও খদর প্রচার প্রভৃতি অসংখ্য প্রগতি ও সেবামূলক আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও স্বযোগ্য পরিচালনায় অল্পদিনের মধ্যেই আমরা যুগযুগান্তবাপী কুসংস্কার ও মূঢ়তার তমসাজাল ছিন্ন করে নূতন জীবন লাভে ধস্ত হয়েছি। তিনি ছিলেন একাধারে সত্যদ্রষ্টা

স্বর্ষি, ধর্মগুরু, সাধকশ্রেষ্ঠ, রাষ্ট্রনেতা, সমাজসংস্কারক ও বিখ্যাত লেখক। একত্রে এরূপ অসংখ্য গুণের সমাবেশ পৃথিবীতে পূর্বে দৃষ্ট হয়নি। সেজন্ত তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ মানবরূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করেছেন। এরূপ একজন মহামানবের কথা আমরা ভাষায় আর কিরূপে বর্ণনা করব? তাঁর আত্মজীবনী থেকে ছ'এক ছত্র উদ্ধৃত করে এই শ্রদ্ধাজলি সমাপ্ত করছি :—

“আমার সমগ্র অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে, সত্য ব্যতীত অপর কোনো ঈশ্বর নাই, এবং অহিংসা ব্যতীত এই সত্যে উপনীত হ'বার অপর কোনো পন্থাও নাই।……সমগ্র ও সর্বব্যাপী সত্যকে সাফাৎ উপলব্ধি করতে হ'লে ক্ষুদ্রতম, দীনতম প্রাণিকেও নিজের মত ভালবাসতে হ'বে।……আত্মশুদ্ধি ব্যতীত সর্বভূতকে আত্মাৎ উপলব্ধি করা অসম্ভব, আত্মশুদ্ধি ব্যতীত অহিংসা ব্রতপালন অসম্ভব, কলুষচিত্তের পক্ষে ঈশ্বরোপলব্ধি অসম্ভব। অতএব আত্মশুদ্ধির অর্থ জীবনের প্রতি ব্যাপারেই শুদ্ধিলাভ। শুদ্ধতা অতীব সংক্রামক বলে আত্মশুদ্ধি হ'লে চতুঃস্পর্শস্থ সকল বস্তুই তৎসঙ্গে শুদ্ধিলাভ করে। কিন্তু আত্মশুদ্ধির পন্থা কঠিন ও বহুর। পূর্ণ শুদ্ধিলাভ করতে হ'লে চিন্তার, বাক্য ও কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্কাম হতে হ'বে; এবং রাগদ্বৈষ প্রমুখ বিপরীত ভাবাবেগের উর্দ্ধে আরোহণ করতে হ'বে।”

পুনর্জন্ম

“I do not want to be reborn. But if I have to be reborn I should be born an untouchable, so that I may share their sorrows, sufferings and affronts levelled at them, in order that I may endeavour to free myself and them from that miserable condition. I therefore pray that if I should be born again, I should do so not as a Brahmin, Kshatriya, Vaisya or Shudra but as an Atishudra.”

Mahatma Gandhi

আমি কিছু নাহি চাই জন্ম নিতে ধরার আবার
এই মর্ত্য মানব সমাজে,
তবু ভাগ্যে যদি মোর লেখা থাকে জন্ম পুনর্বীর
জন্ম চাই অস্পৃশ্যের মাঝে;
তাদের দুঃখের জ্বালা একই মাঝে সহিব তাহলে
বহিয়া তাদেরই অপমান,
প্রয়াস রহিবে নিজ মুক্তিপথে তাদেরও সবলে
দুঃখ দশা করি অবসান।
জন্ম যদি লেখা থাকে ভাগ্যে মোর তবে পুনর্বীর
জন্ম যেন লভি—ক্ষতি নাই;
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নাহি হতে চাই আর,
অতিশূদ্ররূপে জন্ম চাই।

(ত্রীজীবনময়রূপের কড়ক অমৃদিত)

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীমতী ঘোষ

বেতারে পঠিত।

সমগ্র বিশ্বের মানবজাতিকে যিনি নীচতা ও ক্ষুদ্রতার হাত থেকে রক্ষা করে অমৃতত্বের অধিকারে ফিরিয়ে আনবার পথ দেখিয়েছিলেন, সেই দেবকল্প মহাশুদ্ধর নিপাতের কলঙ্ক স্পর্শ করেছে আজ ভারতবাসীকে। জানিনা কোন স্বকঠোর প্রাশ্রিত বিধিতে পাণিষ্ঠ ভারতের এই কলঙ্ক মোচনের পথ নির্দিষ্ট হবে। অসমাপ্ত মহাযজ্ঞের প্রারম্ভেই যে যান্ত্রিক অকস্মাৎ বিদায় নিলেন, সে যজ্ঞ শেষ করবার শুধু দায়িত্বভার মাথার তুলে নিতে সাহসী হবে কে? কার এমন শক্তি আছে? ভারতবর্ষ তাই আজ পিতৃহীন অনাথ; সমস্ত পৃথিবী আজ শোকার্ত, ভীত, দিক্‌ভ্রষ্ট।

কত পুণ্যের ফলে আমাদের দুই চোখ প্রত্যক্ষ করেছিল মহামানবের জ্যোতির্কন্ডাসিত মুখমণ্ডল; আমাদের দুই কান শ্রবণ করেছিল সেই মুখ নিঃসৃত অমৃতময় বাণী; আমাদের দুই হাত স্পর্শ করেছিল সেই পবিত্র চরণ যুগল; আমাদের দীন মস্তক লাভ করেছিল সেই পুত অঙ্গুলিস্তবকের স্নেহ আশীর্বাদ স্পর্শ।

কত অগাধ সঞ্চিত পুণ্যবলে ভারতবর্ষের মাটিতে আবার জন্ম নিয়েছিলেন পতিতপাবন মহাপুরুষ! দুই হাজার বৎসর আগে এমনি একটি শুক্রবারে যিনি নখর মানব প্রাণ বলি উপহার দিয়েছিলেন কতকগুলি নীচাশয় কাপুরুষের হাতে! হায়! আমরা পাণিষ্ঠ ভারতবাসী! আমাদের পিঠাচ প্রবৃত্তিতে আমরা হত্যা করেছি—আমাদের পিতাকে, আমাদের মহাশুদ্ধকে আমাদের উদ্ধারকর্তাকে, স্বর্গের দুর্দিনে আমাদের একমাত্র রক্ষা কর্তাকে।

কত অগাধ সঞ্চিত পাপরাশির ফলে এমন করে হারাতে হ'ল যে সম্পদ পেয়েছিলাম আমরা স্বর্গের কাছ থেকে! হাজার হাজার বৎসরের সঞ্চিত অশ্রুজলের কি সাধ্য হবে দিল্লীর মহাশ্মশানের কলঙ্ক মোচন করতে?

যিনি চলে গেলেন অমর পথে, স্থিত মুখে দুটি মুক্ত পাণিতে ক্ষমা চেয়ে গেলেন বিশ্ববিধাতার কাছে আমাদের হুঙ্কতির জন্য, বিধাতার রোষ থেকে আমাদের পরিজ্ঞানের জন্য, তাঁর তো সে জয়যাত্রা! তাঁর জন্য শোক কিসের? শোক করব আমরা ভারতবাসী আমাদেরই জন্তে। আমরা যাত্রা পড়ে রইলাম! যে দীপা ছিল আমাদের পাথের যে উপদেশ ছিল আমাদের একমাত্র ভরসা, সময় না হতেই সে সম্পদ হয়ে গেল আমাদের স্মৃতির ধন; হায়! এ ক্ষতি আমাদের কে পূরণ করবে? ভারতবর্ষে প্রজ্জ্বলিত যে অনির্বাক্য দীপশিখার দিকে সমস্ত বিশ্ব তাকিয়েছিল নিনিমেষে, সে দীপশিখা যদি নির্বাপিত নাও হয়, তবু সে যে আচ্ছন্ন হয়ে গেল অতীতের অস্ত অন্ধকারে, স্তিমিত হয়ে গেল তার আভা, এ শোকে আমাদের সাস্থ্যনা দেবে কে?

বিগত ইংরাজী ১৯৩০ সালে যেদিন পরাধীনতার ধানিতে নিমজ্জিত ভারতবর্ষের নির্ধাতিত, দরিদ্র এবং দুঃখী অবিবাসীদের একমাত্র আশ্রয় চীরবাসমাত্র পরিহিত দণ্ডধারী সম্যাসী মহাত্মা গান্ধীজী সমুদ্র উপকূলে যাত্রা করেছিলেন লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্যে সেদিন তাঁর সেই চির অনশনক্লিষ্ট শীর্ণ ক্ষীণ চরণ যুগলের অটল বিক্ষেপে সমস্ত ভারতবর্ষ কেঁপে উঠেছিল। অবাক্ বিশ্বয়ে চেয়েছিল সারা পৃথিবী। তখনও কেউ ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি কি দুর্বীর শক্তি ও কি অমোঘ বজ্রের তেজ ছিল সেই দুর্বল দেহযষ্টির মধ্যে এবং কি অসাধ্য সাধন করবে সেই অলৌকিক প্রতিভা একদিন।

আজও কি আমরা মূর্খ ভারতবাসী উপলব্ধি করতে পেরেছি তাঁর বাণীর বথার্থ মর্ম?

যে সাম্যবাদ বথার্থ মুক্তি দিয়েছে মানুষকে—সকল

পরাদীনতার শৃঙ্খল থেকে, সে সাম্যবাদের মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রেছিলেন মহাত্মা গান্ধীজী।

সাম্যবাদ মানবত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। মানবতার চির সত্যরূপ; হিংসা, স্বার্থপরতা, ঘেব ও নীচতার চিরসমাপ্তি। তাই অহিংসার মূর্তিমান বিগ্রহ মহাত্মা গান্ধীজী চেয়েছিলেন সাম্যবাদের মন্ত্রকে আত্মিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে। মানুষের আত্মাকে পরিবর্তিত ক'রে প্রাণশক্তির চরমোৎকর্ষ সাধন ক'রে সাম্যবাদের শাখত প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত ক'রে দিতে। তাই তিনি চেয়েছিলেন রাজনৈতিক কূটতার মানির উর্দ্ধে সাম্যবাদের আসন স্থাপন করতে।

তাই মহাত্মা গান্ধী আচণ্ডালকে কোল দিয়ে হরিজনের কাছে উন্মুক্ত ক'রে দিতে চেয়েছিলেন সমস্ত মন্দিরের রক্ত কপাট; চেয়েছিলেন অস্পৃশ্যতা ভূটিয়ে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি ঘটাতে; তাই ধনীর নির্ঘাতনে পীড়িত দরিদ্রের দুঃখে দুঃখী মহাত্মা গান্ধী দরিদ্রের সঙ্গে নিজেকে একীভূত ক'রে আজীবন সঞ্চল ক'রেছিলেন কটিনাত্র চীরবাস, প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলেন দৈনিক ১৪ আউন্স তরল পদার্থের অধিক আহার।

তাই প্রত্যেকটা মানুষকে ঘাতে অন্ন-বস্ত্র—সংগ্রহের জন্ত পরমুণাপেক্ষী না হ'তে হয়, সেই শিক্ষার পথ নির্দেশ ক'রছিলেন তিনি।

তাই মানুষ বাহাতে মানুষকে ভালবাসে, ঘাতে সাম্প্রদায়িকতার অনল মানব সমাজকে ভস্মীভূত না করে, ঘাতে ধর্মবিরোধ মানুষের আত্মার উৎকর্ষের সাধনাকে বার্থ করে না দিতে পারে, মানুষ ঘাতে দেবত্বের গৌরব থেকে ভ্রষ্ট না হয়, সেইজন্য মহাত্মা গান্ধীজী তাঁর প্রতিদিনের প্রার্থনা সভার সমবেত হাজার মানুষের কণ্ঠে সঙ্গীতে দীক্ষা দিতেন— “ঈশ্বর আত্মা তেরে নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান।” তাই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় গান “বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে” দিয়ে তিনি প্রতিদিন তাঁর প্রার্থনা শেষ করতেন। অজ্ঞ আমরা! চেতনা বিহীন! কি ক'রে বুঝব মহাপুরুষের বাণী? সে শক্তি আমাদের কোথায়?

নীচ আমরা! কুটিল, স্বার্থপর! প্রেমকে আমরা বিসর্জন দিয়েছি জীবন থেকে! প্রাণশক্তি সাধনার মন্ত্র ভুলে গেছি আমরা! ত্যাগের পথ তাই আমাদের আর আকৃষ্ট করে না। আমরা বিম্বৃত হ'য়েছি আমাদের উত্তরাধিকার, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতি! তাই আমাদের ঘৃণিত হাত উঠেছে উর্দ্ধে; সে পবিত্র চরণ ঘূর্ণনের উর্দ্ধে, যে চরণ রেণু স্পর্শ করবার কণামাত্র ষোণাতা বা অধিকার আমাদের ছিল না! তাই আজ আমাদের কিছু আর সঞ্চল নেই। শুধুমাত্র অক্ষ সিক্ত অসহ্য বিলাপ—

“পিতা আমাদের ক্ষমা কর।

তোমার জয়ধ্বজা বহন করবার শক্তি দাও।”

“গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণে”

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্‌ডী

হে ঈশ্বর, হে পৃথিবী আমাদের ক্ষমা কর, কর মার্জনা।
যদিও নিশ্চিত জানি, এ অপের, এ কলঙ্কের নেই কোনও
সামান্য সাধনা।

তবু ক্ষমা কর।

কলঙ্কিত তরবারি হিংসা ভর্তুকি

কুটিল বীভৎস মন জঘন্য বর্বর; তারে ক্ষমা কর।

আমাদের পরিচয় পৃথিবীর সম্মুখে আজ নগ্নভাবে হয়েছে প্রকাশ,

আমরা যে খুণী, এ সত্য আজ কে করিতে পারে অবিশ্বাস?

পৃথিবীর মহামানবের আজ আমরা জীবন নিলাম

অহিংসার প্রতিদান হিংসা দিয়া শুধিয়া দিলাম।

ইতিহাসে লেখা রবে আজিকার মানুষের এই ঘৃণ্য পরিচয়;

শিক্ষা আর সভ্যতার শক্তি আর প্রগতির

কি নিষ্ঠুর পরিণাম, ঘৃণ্য অপচয়।

শতাব্দীর সত্য সূর্য্য ডুবে গেল;

অন্ধকার দুঃখ রাত্রি কবে হবে শেষ?

কবে হবে আবার বোধন

হায়া, আমাদের কবে আর হবে সংশোধন?

গান্ধী সঙ্গীতি

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

[নির্দেশিকা :—প্রত্যেক স্তবক দুইজন বালিকা
ঐক্যতানে গাহিবে, তারপর প্রত্যেক স্তবকের শেষে একটি
গল্প অল্পক্ষেদে দৈববাণীর মতো উচ্চারিত হইবে, গান্ধীর উদাত্ত
স্বরে। একটি বৃহৎ গান্ধী-প্রতিকৃতির সম্মুখে গান হইবে
এবং ঐ চিত্রের পশ্চাৎ হইতে বাণী-উচ্চারণ হইলেই ভাল
হয়। শেষ স্তবক গান সকলে সমন্বয়ে গাহিলেও চলিবে।]

গীত

(ব্রহ্ম-দীর্ঘ মাত্রাভেদে উচ্চারণ কবিতা)

- ১। ভারত-চিত-রক্ত কমল অশোক চক্রধারী
তুমি মহাত্মা স্তম্ভর শুভ বিশ্ব-মানস চারী।
তব কোপীন-বাসে
জ্যোতি পুণ্য ভাসে,
তুমি আদর্শ, ত্যাগ দীপ্ত, তুমি চির সম্যাসী।
ভারত-জন-গণ-পালক, তুমি গুরু অবিনাশী।
মৃত্যুহীন সাধক তুমি দেহ-মুক্ত আজ হে,
গান্ধীজি মহারাজ হে ॥

বাণী

১। হে ভারতবাসী, মনে রেখো মহাত্মা গান্ধী মায়া
ছিলেন। তাঁকে দেবতা ক'রে ভুলো না। তাঁহাতে দেবত্ব
আরোপ করার অর্থ তাঁর মনুষ্যত্বের অমর্যাদা করা, তাঁকে ভুলে
যাওয়া। মানুষ যে কত মহীয়ান, কত বিরাট, কত
প্রতিভাবান হতে পারে, তিনি ছিলেন তারই দৃষ্টান্ত। তিনি
পৃথিবীর আধুনিক যুগের একজন আদর্শ মানব, যেমন আদর্শ
মানব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র—তাঁদের নিজ নিজ
যুগে। রামচন্দ্রের মতই মহাত্মা ছিলেন একজন আদর্শ
রাজনীতিজ্ঞ, গৃহী এবং ধর্ম-বিশ্ব, তিনি ছিলেন একাধারে জ্ঞানী
যুক্তিবাদী, প্রেমময় মানুষ

গীত

- ২। স্বাধীন নব দেশ জাগে তোমারি চরণ পাতে,
কণ্টক-পথ কুসুম-রাগে নবীন ছন্দে মাতে।
তব অহিংসা-বাণী
শান্তি দিল যে 'আনি'
মহামানব সাগর-তট উজ্জল রস-গানে,
সর্বজাতি-ধর্ম জাগে মিলন মুগ্ধ প্রাণে।
সত্য-দাতা, পরিজ্ঞাতা, রাম-ভক্তরাজ হে।

গান্ধীজি মহারাজ হে ॥

বাণী

২। হে ভারতবাসী, মহাত্মার অহিংসামন্ত্রে এখনো
পৃথিবীর সমস্ত মানব-জাতি দীক্ষিত হয়নি। ভারতের
কর্তব্য তাঁর আরক্ত কাজ সম্পন্ন ক'রে তোলা। তোমরাই
আনবে পৃথিবীতে পরিপূর্ণ শান্তি, চিরকালের জন্য বিগ্রহের
অবগান,—এই ছিল মহাত্মার উদ্দেশ্য। মহাত্মার আশা কি
সফল হবে না ?

গীত

- ৩। তোমারি দেহ-ভগ্ন-রেণু-বাহিনী শতধারা
মৃত-ভারতে চিগ্ন করি' ভাঙিল ভয়-কারা।

মন্দির দ্বার খোলে,—

দুঃখ-বেদন ভোলে,—

হরিজন-গণ দেবধামে আসিল শুচি বেশে,

সর্বপাপ-প্রাণি ঘুচিল, দেবতা উঠিল হেসে।

তোমারি পুণ্য পরশে মুছিল যত কলঙ্ক লাজ হে,

গান্ধীজী মহারাজ হে ॥

বাণী

করতে পারো, তবেই তোমার গান, তোমার কাব্য হবে
ধন্য।

৩। হে ভারতবাসী, মহাত্মার হরিজন-ভাষ্য এখনো
আমরা উপলব্ধি করিনি। শুধু মন্দির-বার খুলে হবে না,
ঘর-দুয়ার খুলতে হবে। তোমার দেশের সমাজের অস্পৃশ্য
পতিত মানুষকে যখন তুমি সম্পূর্ণ অসংকোচে তোমার
আপন মৰ্যাদা দান করতে পারবে, তখনই হবে মহাত্মার
বাণী সার্থক।

গীত

১। পাতক-ভার বহি' ঘাতক তোমায়ে নাশিতে চাহে,
মৃত্ত কি জানে—অসীমকালে তব সঙ্গীত গাহে ?
কোট-কুম্ব-ভাগে
তব জীবন জাগে,

বিশ্ব-মানব-আত্মা তুমি হে ব্যাপ্ত কুবন মাঝে,

তব চেতন অধরময় স্বচ্ছ আলোকে রাখে।

ধর্ম-কর্ম পুণ্যভীত তুমি চির পরিত্রাণ বে,

গান্ধীজি মহারাজ হে ॥

বাণী

১। হে ভারতবাসী, শুধু কবিত্ব করলে চলবে না।
কেবল মুখের ভাষার অলঙ্কার দিয়ে দেশ সাজানো যায় না।
মহাত্মার আত্মা তোমার সব চেতনার যদি স্পন্দিত হয়, যদি
সেই স্পন্দনে তোমার সমস্ত সত্যের শিহরণ জাগে, যদি সেই
শিহরণের ছন্দে ছন্দে তুমি কর্মযোগের ঐচ্ছিক সিদ্ধি উৎসারিত

গীত

১। দাও, দাও দৈন্ত তোমারি ধন-গর্বিত গেহে,
দাও হে শক্তি বজ্রগমান শীর্ণ সরল দেহে।

দাও অজস্র প্রাণ,

নির্ভর অভিমান,

দাও হে সত্য খড়্গ-দীপ্তি মিথ্যা-তিমির নাশি'

প্রেম দাও হে সিন্ধু জ্যোতি অস্তর পরিকাশি'

তোমারি মৃত্যু সকল জীবনে দি'ক সে মহিম সাজ হে,

গান্ধীজি মহারাজ হে ॥

বাণী

১। হে ভারতবাসী, পারবে কি তুমি মহাত্মার মতো
মৃত্যু লাভ করতে ? তোমার বুকের রক্ত কি দেবে ভারতের
এই উদার ভূমিকে পবিত্র ক'রে, আর সেই ভূমিতে ফুটে'
উঠবে রক্ত কমল,—ভারতের ভবিষ্যৎ জাতি ? অশোকচক্রে
বার ভিত্তিস্থাপন হয়েছিলো, সেই সিংহমৌলি শাস্তি-শিখর
কি আবার প্রতিষ্ঠিত হবে এই ভারতে ? তোমার সঙ্গীতে
কি আছে সেই আদিম উদাত্ত-সুর, সেই শাশ্বত কল্যাণের
মহাবাণী ? সেই প্রচণ্ডতম-শক্তিময়ী পরমতম-অহিংসার
বাণী ?

[পঞ্চম স্তবক গীতের মৃত্তকরে পুনরাবৃত্তি]

আপনি প্রত্যহ চিন্তা করিয়া দেখুন
মহাত্মা গান্ধীর
মূল্যবান উপদেশগুলি মানিয়া চলিবার চেষ্টা
করিতেছেন কিনা ।
যদি সে চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে
স্বনিশ্চিত জানিয়া রাখুন, ভারত ও
পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ
অন্ধকারময়
--উভয়কেই পুনরায় দাসত্ব-শৃঙ্খলে
আবদ্ধ হইতে হইবে ।

মহাত্মা গান্ধীর শ্রদ্ধা স্মরণে :—

এল, মল্লিক
উল হার্ডস

১৮৩নং ধর্মতলা স্ট্রিট ; কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত ।

গান্ধীজী শ্রীকল্যাণী দেবী

চলে গেছে আজ সেই অমরার
তুচ্ছ করিয়া এ ভাঙ্গা গড়া,
যুগ যুগান্তে শুনি এই বাণী
গেছে যারা চলে ফেরেনা তারা ॥
আজিকে মোদের স্বপ্ন বেদনা
রেখেছি চাকিয়া গোপন কোণে,
শক্তির বৃকে মুক্তার মত—
বন্ধ সে আছে সজোপনে ॥
মরণ! সে কি নিতে পারে কাড়ি
স্বরণ গ্রন্থি টুটিয়া?
স্বতি জেগে রয় গন্ধ আঁকড়ি—
পড়িলে কুসুম ঝরিয়া ॥
আজি কি কার্য্য হয়ে গেল শেষ
স্বাধীনতা দিলে আনি?
তাই কি গিয়াছ শাস্তির পারে
ছাড়িয়া জন্মভূমি?
আজিকে মোদের কে জাগাবে প্রাণ
কে দিবে প্রেরণা আনি,
তুমি আজ নাই কে শুনাবে আর
তব মধুময় বাণী ॥
পারিনি জানিতে মৃত্যুর দূত
এসেছিল তব দ্বারে

অভিশাপ আঁকি দিয়ে গেল আজি
এই ভারতের পরে ॥
তব চিত্তানলে হেরি আজ জলে
দুখের রক্ত রেখা
সহিতে হবে তা লাজ, অপমান
ভাগ্যে বা আছে লেখা ॥
আজিকার এই দুঃসহ বাখা
হয়ে যাক অবসান।
হে মহামানব! আসিও আবার
লইয়া মহৎ প্রাণ ॥
জন্ম লভিয়া ভারতবর্ষে,
রেখে ভারতের মান ॥
সর্বকণ্ঠে ধনিয়া উঠুক—
তোমারি সে আহ্বান।
কঠিন যে কাজ করি গেলে আজ
ভারত মুক্ত তাই,
তব স্বতি জাগে আজো মন মাঝে
তুমি আজ হেথা নাই ॥
প্রভু, করিও কল্পণা মিওগো শাস্তি
যে গিয়েছে তব পাশ।
সান্ত্বনা বাণী পাঠায়ো মোদের
মিটায়ো সকল আশ ॥

দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মাজী

শ্রীকালিদাস নাগ

পোড়বন্দর রাজকোটের দেওয়ানবংশে জন্মগ্রহণ করে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হয় কাথিয়াবাড়ে কোথাও দেওয়ানী করবেন নয় বোম্বায়ে ব্যারিষ্টারী করে প্রচুর অর্থোপার্জন করবেন এই আশা তাঁর আত্মীয়েরা করেছিলেন। ২২ বছর বয়সে ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠা পাওয়া দূরের কথা খরচ চালাবার মত আয় করতেও পারেননি। হঠাৎ ডাক এল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাঁদের মোকদ্দমা চালাবার জ্ঞাত। ১৮৯৩ সালে গান্ধীজী ২৪ বছরের যুবক নামলেন এক অজানা দেশে; অবাক হয়ে দেখলেন ইংরেজ মাঠাররা যে আইন তাঁকে শিখিয়েছেন সেটা শাদা খুঁটান প্রভুজ্ঞাতের পক্ষে উপযোগী কিন্তু কালো আফ্রিকার বা এশিয়ার মানুষদের পক্ষে প্রয়োজ্য নয়। তারা যেন ইউরোপীয় মনিব ও মালিকদের চাকর-কুলী হতেই জন্মেছে। এই প্রচণ্ড অত্যাচার প্রতিবাদ করে বহু নির্ধ্যাতন বরণ করে গান্ধীজী শুরু করলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবন। নেতৃত্বহীন প্রবাসী ভারতবাসীর নিঃস্বার্থ নেতা হলেন তিনি। তাঁর খেতাব হল “কুলী ব্যারিষ্টার”; দেশনায়ক হিসাবে সেই তাঁর প্রথম জয়মালা। শাদা পাহারাওয়ালা তাঁকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেয়; এরকম অপমান ও পীড়ন তিনি কতবার সহ্য করেছেন। ১৮৯৪ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দশ বছর পরে গান্ধীজী “নাতাল ভারতীয় কংগ্রেস” প্রতিষ্ঠা করেন; এবং ১৯১৪ সালে যখন তিনি আফ্রিকা ছেড়ে দেশে ফেরেন তখন পর্য্যন্ত গান্ধীজী প্রায় ২০।২১ বছর ধরে তাঁর অসহায় দেশবাসীদের স্বার্থ ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জ্ঞাত কত কাজই করেছেন। এসব কথা ভাল করে জানতে হলে তাঁর নিজের রচনা “দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যগ্রহ” (অনুবাদক শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত) বইখানি মন দিয়ে পড়া দরকার। গান্ধীজী দেখেছিলেন যে চুক্তিবদ্ধ

শ্রমিক (‘গিরিমিটিয়া’রা) হয় কলকাতা নয় মাদ্রাজ থেকেই আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের আবাদে কুলীর কাজ করতে বণ্ডনা হ’ত। তাই গান্ধীজী ১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি নাতাল থেকে কলিকাতাগামী জাহাজ ধরে সোজা কলকাতায় নামেন; সেখান থেকে এলাহাবাদের বিখ্যাত Pioneer পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা ও আলোচনার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা লেখেন ও তার ৫৮০০ কপি বিতরণ করেন। বোম্বাই পুনা ও মাদ্রাজে বক্তৃতা দিয়েও তিনি বিশিষ্ট নেতাদের সহায়ভূতি আকর্ষণ করেন। বিচারপতি রাগাডে ও বদরুদ্দীন তায়াবজী, লোকমাত্রা ভিলক, ফিরোজ শাহ মেহতা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, স্বরক্ষণ্য আয়ার প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করে গান্ধীজী কলকাতায় আসেন। এখানে জুরেল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজ বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও ইংলিশম্যান কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যান। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের নেতা হিসাবে এবার তিনি প্রবল বাধা পেলেন; শাদা শাসকদল রটিয়ে দিল তিনি সঙ্গে করে ৮০০ ভারতবাসী এনেছেন; তাই ২৬ দিন তাদের জাহাজ থেকে কর্তারা নামতেই দিল না—কিন্তু শেষে নামাতে তারা বাধ্য হয়। দারবানের পথে হেঁটে চলার সময় শাদা গুণ্ডা একদল পিছন থেকে আক্রমণ করে প্রায় গান্ধীজীকে মেরে ফেলেছিল; পুলিশ কর্তৃকারীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ইংরাজ স্ত্রী সে সময় তাঁকে বাঁচান। এই কাহিনীটা আমার অনেকবার মনে হয়েছে, তাই ১৯৩৬ সালে, অর্থাৎ ঘটনার ৪০ বছর পরে, যখন দক্ষিণ আমেরিকার যাত্রাপথে দারবানে আমার জাহাজ ধামে তখন তীর্থস্থান হিসাবে এই দারবান পরিদর্শন করে থাকা ইহ। গান্ধীজী লিখেছিলেন “জীবন্ত অবস্থায় পঁছছিবার আশা প্রায়

ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু একথা আমার অরণ আছে যে এ সময়ের বাহারা মারিতেছিল তাহাদের প্রতি আমার লেশমাত্র রোধ ছিল না।” গান্ধীজী মহাত্মা আখ্যা বিনামূল্যে পাননি তা বলাই বাহুল্য।

বুয়ার যুদ্ধের শেষে গান্ধীজী (১৯০১—১৯০২ শেষ পর্যন্ত) বংলার ধানেক ভারতবর্ষে কাটান এবং কলিকাতা কংগ্রেসে প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতিসূচক প্রস্তাব পাশ করেন। ১৯০৩ সালে গান্ধীজী ট্রান্সভালে প্রবেশ করেন ও এশিয়াবাসী ভারতীয় ও চীনাদের বিরুদ্ধে যে নূতন Anti Asiatic আইন গড়ে উঠছে তার বিরুদ্ধে—সদাগ্রহ বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন তোলেন। দলে দলে নরনারী তাঁর নেতৃত্বে অশূর ঐক্যের এবং আত্মত্যাগ ও নির্যাতন সহন ক্ষমতার পরিচয় দেন এবং এই সময় (১৯০৪) থেকে গান্ধীজী সাধারণ শ্রমিকের মতন জীবন যাপন করিতে থাকেন। এ কাহিনী যেন মহাকাব্যের মত মনে হয়। ১৯০৪—০৫ সালে তিনি প্রচারের জন্ত Indian Opinion পত্রিকা, গুজরাতি, হিন্দী, তামিল ও ইংরাজী—চারটি ভাষায় ছাপান। এখন থেকে আর্য্য, দ্রাবিড় নির্কিংশেষে ভারতীয় হিসাবে তিনি ভাষা শেখায় অজুত কৃতিত্ব দেখান। জেলের মধ্যে ফার্সী, উর্দু-লিপি, দ্রাবিড় ভাষা তিনি শেখেন ও ৮ বছর বয়সে গান্ধীজী তাই বাঙলা পড়া ও লেখার ভিতর দিয়ে তার চরম পরিচয় দিয়ে গেছেন। ১৯০৬ সালে তিনি ডেপুটেশনে ইংলণ্ড যান এবং আফ্রিকায় ফেরার পথে প্রথমে গুজরাতি ও পরে ইংরাজীতে Hind Swaraj গ্রন্থ লিখে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ফুটিয়ে তোলেন। ঋষি টলষ্টয়ের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করে তাঁর নামে দক্ষিণ আফ্রিকায় এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ও ইংরেজ বন্ধু Polakএর উপহার Ruskinএর বই Unto This Last—‘সর্বোদয়’ নামে গুজরাতিতে অনুবাদ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেদিন সেবাগ্রামের সভায়

তাই দূতম সংগঠন প্রতিষ্ঠাদের মায়করণ হয়েছে “সর্বোদয় সমাজ”। উচ্চ-নীচ নরনারী নির্কিংশেষে সকল মানুষের সর্বোদয় উন্নতিই তার আদর্শ।

৪০ বছর আগে এই অমূল্য জীবন দীপ প্রায় মিটে গিয়েছিল শেষে সেকথা অরণ করাতে চাই। (১৯০৮ ১০ই ফেব্রুয়ারী) মীর আলম নামে এক পাঠান, গান্ধীজী নেতা হিসাবে তুল করেছেন এই ভ্রমে প্রায় তাঁকে মেরে ফেলেছিল। “মাঁথার উপর পিছন দিক হইতে একটা লাঠির ঘা পড়িল... আমি ‘হে-রাম’ বলিয়া অজ্ঞান হইয়া গেলাম, পরে কি হইল জানি না.....। কিছুক্ষণ পরে আমার জ্ঞান হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ‘মীর আলম কোথায়?’ ‘তাহাকে ও তাহার সঙ্গের লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।’

“উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে”—গান্ধীজীর ক্ষমাস্বন্দর মুখে এই কথাই ফুটল। এ ঘটনার ঠিক ৪০ বছর পরে—(১৯৪৮ ৩০ জানুয়ারী) আর এক নিকোদ দেশবাসী যখন তাঁর বুক গুলি করে তখনও অহিংসামন্ত্রের সাধক মহাত্মাজী তাকে ক্ষমা করে ভগবানের নাম হে—রাম—উচ্চারণ করে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন। সত্যাগ্রহের তপস্বী সূর্য হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়; সেখানেই তাঁর বড় বড় পরীক্ষা হয়ে গেছে—তার ফলেই অহিংসা নীতি ভারতবর্ষের ৪০ কোটি মানুষের সমস্তায় প্রয়োগ করে তিনি বিশ্ববাসীকে মুক্ত করে গেছেন। গান্ধী-সত্যাগ্রহের গবেষণাগার হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা তাই স্বাধীন ভারতের কাছে ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেবে। বর্ণবিদ্বেষ ও জাতি-সংঘর্ষ থেকেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম ঘনিজে আসে। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’ এই মহাবাণী মহাত্মাজী তাঁর জীবনে ও সাধনায় সার্থক করে অমর হয়েছেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় অধীর জাতিসংঘ তাই তাঁর অহিংসার মধ্যে মুক্তি ও স্থিতিরকার নিশানা খুঁজে তাঁকে চরম অধ্য নিবেদন করছে।

তর্পণ

শ্রীমুনীতিবালা গুপ্ত

যুগে যুগে যখন ধরিত্রী পঙ্কিলতার ভারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, তখন ভগবানের আশীর্বাদ মহামানবরূপে যুঁহুঁ পরিগ্রহ করিয়া নামিয়া আসিয়াছেন, তাঁর দুর্গত সন্তানদের উদ্ধার করিবার জন্ত। পৃথিবীতে তাই আসিয়াছিলেন তথাগত বুদ্ধ, প্রিয়পুত্র বীশ্বক্সীষ্ট, ধর্ম প্রবর্তক মহম্মদ, যুগধর্মপ্রবর্তক মহামতি রামমোহন, পরম মাতৃকার সন্তানশ্রেষ্ঠ সাধু পরমহংসদেব, আজন্মসিদ্ধ সমাজসেবক বিবেকানন্দ, নিপীড়িত দরিদ্র ভারতবাসীর আপনার জন “বাপুজী”।

মহামানবের জন্ম ও মরণের লগ্নের মধ্যবর্তী যে কাল তাহা ধরিত্রীর “নব চেতনার” জঠরশায়িত জগাবস্থা। ঐশ্বরিক শক্তি বলে, অপার্থির আত্মত্যাগের ফলে তিলে তিলে বলীয়সী হইয়া “নব চেতনা” যখন জন্ম পরিগ্রহ করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তথা মহামানব স্বীয় সাময়িক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া আত্মিক জীবন শুরু করেন। তাই তাঁহাদের সত্যকার কার্য আরম্ভ হয় তাঁহাদের পার্থিব জীবনের অবসানে। “বাপুজী” ভারতের “নবচেতনার” প্রতীক তাই আজ তিনি মৃত নহেন, তিনি অমৃতময়। আজ

নৈনংছিন্দন্তি শত্ৰুগি নৈনংদহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এবচ ।

নিভ্যঃ সর্গগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥

তাঁহার নশ্বরদেহের অবসানে আজও পৃথিবীময় শোকের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু যাহাদের মধ্যে তাঁহার অমরাত্মা কাজ করিবেন, দীর্ঘকালব্যাপী শোক তাঁহাদের পক্ষে বিলাসমাত্র এবং জড়জের নামান্তর। ইহাদের লক্ষ্য করিয়াই শ্রীভগবান বলিয়াছেন, “ক্লেব্যং যাস্মৈ গম পার্থ, নৈতৎ তদ্যুপপত্তো”। যাহারা ভাববিলাসী, যাহারা ক্লীব

তাঁহারা এই এখন হাহতাশ করিবেন। কিন্তু যাহারা প্রকৃতই দেশ সেবক ও দেশসেবিকা তাঁহারা যাহাতে শিশু নব চেতনা অকালে কালনিদ্রায় অভিভূত না হয়, যাহাতে ক্রমে ক্রমে বিপুল “আত্মচেতনা”য় পরিণত হইয়া ভারতে নব জীবনের স্রুতপাত করিতে পারেন, তাহার প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবেন।

“বাপুজীর” আরম্ভ জাতি সংগঠন মূলক কার্য অষ্টাদশ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা;

- (১) সাম্প্রদায়িক ঐক্য (২) অস্পৃশ্যতাবর্জন
- (৩) মাদকতা নিবারণ (৪) খাদ্যবয়ন ও প্রচার (৫) উটজ শিল্পের সম্প্রদারণ (৬) গ্রামোন্নয়ন (৭) জাতিবর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে বয়স্ক নরনারীর শিক্ষা (৮) বুনিনাদী শিক্ষা
- (৯) নর ও নারীর সমান অধিকার স্থাপন (১০) ব্যক্তিগত ও সমাজগত স্বাস্থ্যজ্ঞান (১১) প্রাদেশিক ভাষা উন্নয়ন (১২) রাষ্ট্রভাষা প্রচার (১৩) আর্থিক বৈষম্যের দূরীকরণ (১৪) ক্রিয়ণ উন্নয়ন (১৫) শ্রমিক উন্নয়ন (১৬) আদিবাসী উন্নয়ন (১৭) কুষ্ঠব্যাধি চিকিৎসা ও প্রতিরোধ (১৮) ছাত্র সংগঠন।

একাকী কোনও ভারতবাসীর পক্ষে এই দুর্লভ অষ্টাদশ ব্রত জীবনে উদযাপন করা সম্ভব নহে। কিন্তু প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে অন্ততঃ একটা ব্রতের কিয়দংশ জীবনে সাধনা করিয়া যাইতে পারেন। সমগ্র ভারতব্যাপী পরিকল্পনার ভার যোগ্যতমের হস্তে রাখিয়া গ্রামবাসী যদি নিজের গ্রামোন্নয়নের জন্য আপনাপন গ্রামের নির্মিত সেবা কেন্দ্র গঠন করেন ও আপনাদিগকে সেবক ও সেবিকা মনে করিয়া অন্ততঃ একটা কাজ শুরু করিয়া দেন, মনে হয় একটা মহতী সম্ভাবনার বীজ বপন করা হইবে, যাহার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসী যদি অথবা পূর্ব ও পশ্চিম

পাকিস্থানের দোষ কীর্তন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ছিদ্রাঙ্কন না করিয়া আপন আপন ক্ষমতানুসারে কেন্দ্র গঠন করিয়া এক একটা ব্রত উদ্‌ঘাপনে প্রবৃত্ত হন, অতি সত্তর পশ্চিম বাঙ্গলা ভারত মাতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ বলিয়া পরিচিত হইবেন। আস্থন বাঙ্গলার শিক্ষাব্রতিনী ভগিনীগণ, আমরা সংঘবদ্ধ হই, পশ্চিম বঙ্গের বালক বালিকা ও বয়স্ক ভগিনীগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণরূপ পবিত্র ব্রত পালনে। আমাদের মধ্যে কাহারও অর্থ আছে, কাহারও বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, কাহারও অভিজ্ঞতা আছে, কাহারও শারীরিক শক্তি আছে, কাহারও বা নৈতিক শক্তি ও ভগবানে বিশ্বাস আছে। যাহার যাহা আছে, তাহাই দান করি। এই ব্রত উদ্‌ঘাপনের পূর্বে কতকগুলি বিশেষ তথ্য সংগ্রহের দরকার, একটা পরিকল্পনার দরকার। পূর্ব-বদ্ধ হইতে লক্ষ লক্ষ বালক বালিকা আসিতেছে, তাহাদের জন্মও ব্যবস্থা করা দরকার। সকল তথ্য এখনও সম্পূর্ণ ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। স্মরণ্য ১৯৪১ সনের সংগৃহীত সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া আনুমানিক খসড়া প্রস্তুত করিতে হইতেছে। এই আনুমানিক পরিকল্পনার খসড়াই আমার আজিকার এই প্রাক্কবাসরে তর্পণ। বালক বালিকার শিক্ষাদান আমার জীবনের সর্বপ্রথম, সর্বপ্রধান ও পবিত্রতম ব্রত। যদিও যোগ্যতা আমার অত্যন্ত কম, ভরসা এই অন্তরের প্রকার সহিত প্রদত্ত নিরাভরণ অঞ্জলি তিনি গ্রহণ করিবেন, যিনি অন্তর্যামী। নরসেরা নারায়ণেরই সেবা। সেবার ভার লইয়া যদি আমি পুঙ্খবিলীর্ণ পিঙ্কোদ্ধার করি, গলিতদেহ কুষ্ঠের অঙ্গমার্জনা করি, বা বালক বালিকার পাঠ শিক্ষা দিই সে কাজ নারায়ণের প্রীতি উৎপন্ন করিবে। “রক্তধারার সঙ্গে দেহবীণার তার” যদি সর্বদা আনন্দে “সেই নামের বাজার তোলে,” তবে আমি যে কাজেই ব্যাপৃত থাকি না কেন, সে স্থান তাঁর মন্দির, সে কাজ তাঁর পূজা।

পশ্চিম বঙ্গের ৬ হইতে ১২ বৎসরের বালক বালিকাদের নিরক্ষরতা দূর করিবার নিমিত্ত

পরিকল্পনার খসড়া

১। উদ্দেশ্য :—

(ক) নিজের মাতৃভাষা শুদ্ধরূপে শেখা ও কথা ও লেখা ভাষায় সুস্পষ্ট ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা।

(খ) অন্ততঃ এমন একটা শিল্প শিক্ষা করা যাহার সাহায্যে দশ বৎসর হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহার্থ উপার্জন করিতে পারিবে।

(গ) নিজের পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া—সংক্ষেপে সরল ভাষায় ভূবৃত্তান্ত, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ, গ্রামের পথ ঘাট, দেউল, দীঘিকা, ইতিহাস, সাধু জ্ঞানী ও দেশপ্রেমিক নর ও নারীর জীবন-কথা শেখা, গ্রামের রাখাল মাঝি মোল্লার গান, গ্রামের খেলা ধূলা, ব্যায়াম, গ্রামের উৎসব, নৃত্যগীত, বিবিধ শিল্পকলা চর্চায় সাধ্যমত যোগদান।

(ঘ) গ্রামকে, গ্রামের সমাজকে, গ্রামের নরনারীকে ভালবাসা, গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বৃহত্তর গ্রামের বা দেশের পরিচয় লাভ করা। গ্রামও যে বিশ্বের একটা অংশ, গ্রামছাড়া বিশ্বের চলে না, বিশ্ব ছাড়া গ্রামেরও চলে না তাহা উপলব্ধি করা।

(ঙ) সকলে একসঙ্গে আহার, পান ও স্তোত্রপাঠ করা।

(চ) সত্যকে জানিবার, সত্যপথে থাকিবার এবং দৈহিক ও মানসিক পবিত্র জীবন যাপন করিবার শিক্ষা লাভ করা।

(ছ) স্বাবলম্বী হওয়া এবং আত্মরক্ষা ও গ্রামরক্ষার কৌশল শিক্ষা করা।

(জ) উচ্চতর শিক্ষার অথবা পরবর্তী কার্যময় জীবনের জন্ম প্রস্তুত হওয়া।

২। কয়েকটা জাতব্য বিষয়।*

(ক)	পশ্চিম বঙ্গের জেলার সংখ্যা—	১৪
(খ)	“ মহকুমার ” —	৪০
(গ)	“ ইউনিয়নের ” —	১,৭০০
(ঘ)	“ গ্রামের ” —	৩৪,২৫২
(ঙ)	“ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ” (আনুমানিক)	
	বালকদের জন্ম —	১৪,০০০
	বালিকাদের জন্ম —	২,৬২৭

(চ) “ ৬ হইতে ১২ বৎসরের

বালক বালিকার সংখ্যা (আনুমানিক)— ৩৪,০০,০০০

* সংখ্যাগুলি ১৯৪০ সালের Statistics এর উপর নির্ভর করিয়া স্থির করাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুমানিক।

ঐ বৎসরের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা— ৮,২৫,০০০

উপরিলিখিত সংখ্যাগুলি আনুমানিক হইলেও মোটামুটি এই বোঝা যায়, যে,

১। পশ্চিম বঙ্গের ২০,০০০ এর উপর গ্রামে একটীও বিদ্যালয় নাই। আনুমানিক ৩১,৭০০ গ্রামে একটীও বালিকা বিদ্যালয় নাই।

২। আনুমানিক ২৫,৭৫,০০০টি বালক বালিকার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।

(৩) যদি শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, তবে ২০,৭৩৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই চলিবে। যদি কেবল শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, তবে সে বিদ্যালয় দ্বারা বালিকাদের শিক্ষার বিশেষ কিছু স্বরাহা হইবে না। ডিগ্রীষ্ট স্কুল বোর্ডের অধীনস্থ এই প্রকার বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার মত বাহাদের অতিতিন্ত অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা আমার কথা সমর্থন করিবেন।

৩। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী

(১) বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ৩২,৫০০

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় „ ৬৬,৫০০

(৩) বিশেষরূপে শিক্ষা প্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ১২,০০০

(৪) „ „ „ „ প্রয়োজন—৮০,০০০

(৫) বর্তমানে শিক্ষার ব্যবস্থা ১৭০০

(৬) দশ বৎসরের মধ্যে সকলকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে হইলে প্রতিবর্ষে কি সংখ্যক শিক্ষকের শিক্ষা দানের ব্যবস্থায় প্রয়োজন। ৮,০০০

৪। প্রতি ২০০টী বালক-বালিকার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আনুমানিক ব্যয়

এক কালীম জমী, বাড়ী, পুস্তকাগার প্রভৃতি ৫০০০ মাসিক—

শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের বেতন— ২৫০০

অন্যান্য খরচ ৫০০

মোট—৩০০০

অর্থাৎ শিশু প্রতি মাসে ৩১১০ টাকা

ভাল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) চালাইতে হইলে কলিকাতায় আনুমানিক ব্যয় মাসিক ৬০০ টাকা ও মফঃস্বলে ৩০০ টাকা। ইহাপেক্ষাও কম টাকায় চলে কিন্তু সে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বেতন পান দারোয়ানের চেয়েও কম ও অনেকেই দুই বেলা টিউশনি করিয়াও অর্জাশনে থাকেন।

যদি কখনও এ দেশে Income এর অল্পপাতে Education Cess হয় এবং তাহা যথাবিধি আদায় করা হয়, তবে এই সকল বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। নতুবা বর্তমানে আপন আপন আয় অল্পব্যয়ী অভিজ্ঞাবকগণের বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া উচিত এবং যিনি দারিদ্র্য হেতু সন্তানের শিক্ষা ব্যয় ভার বহন করিতে পারেন না, কেবল তাঁরই সন্তানের শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া উচিত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে পশ্চিম বঙ্গের ২০,০০০ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত মাসিক খরচ হইবে ৬০ লক্ষ টাকা ও বার্ষিক ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। টাকাতার পরিমাণ শুনিয়া চমকাইবার কারণ নাই। সহরে বেশী ভাগ বিদ্যালয়েই শিশু শ্রেণীতেও মাসে ১১০ টাকার বেশী বেতন দিতে হয়। গ্রামের বিদ্যালয়েও পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর বেতন ১১০ টাকা।

বুনিয়াদী শিক্ষার নিয়মামুসারে বালকবালিকারা যখন মাসে মাসে কিছু উপার্জন করিবে ও সেই টাকায় দিয়া বিদ্যালয়ের বেতন দিবে এবং যখন শিক্ষা-কর প্রথা কার্য্যকরী হইবে, তখন এ ব্যয়ের পরিমাণ সরকার পক্ষের তিন চতুর্থাংশ কমিয়া যাইবে।

ইহা ব্যতীত বেশীর ভাগ গ্রাম্য বিদ্যালয়েই প্রথম বৎসর তিনটি শ্রেণী খোলা যাইবে এবং তিন বা চার বৎসরের মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত বালক বালিকা পড়িতে আরম্ভ করিবে। এবং বৎসরে যদি ২,০০০ করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, প্রার্থিত বৎসরের খরচ সরকারের তরফ হইতে হইবে ১৮ লক্ষ টাকা।

এককালীন ব্যয় অর্থাৎ জমী, বাড়ী, পুস্তকাগার প্রভৃতির

জন্ম বহু দান পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রাতিশ্রুতীয় দানশীল নরনারীর অভাব নাই। অভাব কেবল আমাদের কর্মকুশলতার। যুদ্ধের সময় যদি বাঁকুড়ার মত গরীব জেলা হইতে অর্ধলক্ষাধিক টাকা উঠিতে পারে, তবে অগ্রাণু ধনীপ্রধান অঞ্চলে কি না করা যাইতে পারে? পশ্চিম বঙ্গে ব্যবসায়ী বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর ভিতর টাকার ছড়াছড়ি। তাঁহারা দানকাতরও নহেন। কিন্তু অভাব আমাদের সংগঠন ক্ষমতার। যুদ্ধের সময় প্রত্যেকটা জেলার জজ, ম্যাজিস্ট্রেট হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষক, কর্মকার, চর্মকার পর্যন্ত যে ভাবে যুদ্ধের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ দেশের এই নিরক্ষরতা দূররূপ পবিত্র ব্রত উদ্‌ঘাপনের জন্ত কি সে ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যায় না? স্বাধীন পশ্চিম বঙ্গের বহু করণীয় কার্য আছে, জাতীয় সরকার একে একে সকল ভারই বহন করিবেন। কিন্তু আমরা কি এই জাতীয় সরকারের সাফল্যের জন্ত নিজ নিজ ক্ষমতামুখ্যায় কিছু কবিত্তে পারি না? যদি অনিবার্য কারণে সরকারের শিক্ষা বিভাগের এই কার্য শুরু করিতে কিছু দেরী হয়; বাঙ্গলা

মায়ের শিক্ষিতা কণ্ঠাগণ সংধবন্ধ হইয়া কি কিছু করিতে পারেন না?

সে ক্ষমতা যে তাঁহাদের আছে, তাহার পরিচয় দিয়াছেন পূজনীয়া শ্রীযুক্তা অবলা বসু, স্বর্গগতা শিক্ষাব্রতিনী সরলা রায়, আদর্শ বঙ্গনারী সুরোজনলিনী। একটা বিদ্যালয় স্চাৰুপে পরিচালনা করিতে পারিলেই যে বহুল উপকার সাধিত হয়।

একটা বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া বিগ্রহের নারীদের ও রাত্রি পুরুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা অল্প ব্যয়ে হইতে পারে।

দেশে অর্থ আছে, জমী আছে, দেশে সেবক সেবিকা আছেন। মহাত্মাজীর পথপ্রদর্শিত এই স্মহান্ ব্রত উদ্‌ঘাপনে আসুন তাহা কাজে লাগাইবার চেষ্টা করি। নতুবা বৃথা সমিতি স্থাপন, বৃথাই বক্তৃতা দান, বৃথা কাগজে কাগজে প্রবন্ধ ছাপান।

He fell for us

We have to live for him.

স্মরণে

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

মহাত্মা গান্ধী নিজ জীবনের ব্রত উদ্‌ঘাপন করে চলে গেলেন, জাতির পাপ ধ্বংস করে গুণ্য জাতিকে স্থিতিদান করে। আমরা আজ ছুটার কথায় আলোচনা করে দেখব সে ব্রত কি ও কেমনতর এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে তার মিল কোথায় ও কতখানি। মহাযুগ জগতের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী এক অতি আশ্চর্য্য নমুন্যর মানুষ, অসাধারণ তাঁর অনেক দিকে কিন্তু আশ্চর্য্য তিনি আত্মত্যাগে; অনেকে অসাধারণ আছেন কিন্তু তাঁরা আশ্চর্য্য নন। ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে মহাত্মার

আত্মত্যাগ বিচিত্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে। ধনসম্পত্তিত্যাগ, স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগ-বিলাস ত্যাগ, অনশন-অভ্যাস, আহার ত্যাগ তাঁকে আশ্চর্য্য মানুষ করে তুলেছে। তিনি সত্য, স্বচ্ছ, স্বস্পষ্ট, তিনি পুণ্যচারী, ব্রতধারী, খোলা পথের পথিক। মানুষকে তিনি ঠকান নাই, নানাজন নানাভাবে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাঁকে দেখবে, ভাববে এবং বিচিত্র রকমে তাঁকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করবে, যে যতটা পারে।

সকল মানুষের জন্ম একইভাবে নিয়ন্ত্রিত, দেখানে

উচ্চ-নীচ শ্রেষ্ঠ নিরুচ্চ কোনরূপ ভেদাভেদের স্থান নাই। মহাত্মা গান্ধীজীও জন্মেছিলেন সাধারণ মানুষেরই মত মায়ের কোলে মানবশিশু হয়ে, বেঁচেছিলেন মায়ের স্তন্যপান করে, নতনত্ব দেখা দেয়নি কিছু সে সময়।

কিন্তু জীবনের গতি ও পরিণতিতে তাঁর যে পরিচয় পাওয়া গেল তাতে জানা গেল তিনি এক আশ্চর্য্য জাতের মানুষ। আমাদের দৃষ্টিতে মহাত্মাজীর জীবন যেন একটি ব্রতলীলার ক্ষেত্র, সারাজীবন তিনি ব্রত সাধনা করেই চলেছেন; ভগবানে আত্মসমর্পণ, আত্মিক শক্তিতে স্বাধীনতা অর্জন, মহাজাতি সংগঠনের সঙ্কল্পগ্রহণ। মহাব্রতের ত্রিধারা সম্মিলিত হয়েছে, তাঁর মধ্যে। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত তাঁর ভগবানে আত্ম সমর্পণ। কবে কোন মুহূর্তে আত্মসমর্পণের ভাবটি তাঁর অন্তরে প্রথম জাগ্রত হয়েছিল কেউ তা জানে না। হয়ত যে মুহূর্তটি তাঁর নিজের স্মরণের মধ্যেও ছিল না, সর্বদর্শী ভগবানের দৃষ্টিতেই সেটি সত্য হয়ে ফুটেছিল। সেই সত্যই সংঘাতে সংঘাতে, মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁকে আত্মসমর্পণে প্রবুদ্ধ করেছে, “তাঁর গত কয়েক বৎসরের প্রার্থনাময় জীবন তাঁর সাক্ষ্য দিয়েছে জগতের সমক্ষে।

প্রার্থনা পথে চরম আঘাতে এই মহাপথিকের ক্ষীণ দেহখানি যখন লুটিয়ে পড়ল মাটির কোলে, তখন সম্পূর্ণ হ’ল যেন শেষ সমর্পণ। তাই “হে রাম” উচ্চারিত হ’ল অন্তরের শেষ বাণীতে। পুণ্যব্রত গান্ধীজির ব্রতসাধনের দ্বিতীয় পর্যায় আত্মিক শক্তিতে স্বাধীনতা অর্জন। মানুষের চরম উৎকর্ষ স্বাধীনতায়। স্বাধীন ক্ষেত্র না পেলে মানবাত্মা আত্মপর কারুর কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয় না। স্বাধীনতার আদর্শ জগতে নতুন নয়, যুগে যুগে মহামানবেরা ঐকান্তিক দুঃখ স্বীকারের দ্বারা মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে জগতে স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। ভগবান বুদ্ধ আত্মশক্তির বলে ‘মার’ অর্থাৎ রিপুর সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করে চূড়ান্ত স্বাধীনতার আদর্শ রেখে গেছেন নির্ঝঞ্ঝের বাণীতে। রাষ্ট্রীয় অধীনতায় জর্জরিত জাতিকে স্বাধীনতার উচ্চস্তরে তোলার জন্য মহামানব গান্ধী আত্মিক শক্তির বলে দুর্জয় পরাধীনতার মূলে প্রচণ্ড আঘাত করে তার ভিত্তি নড়িয়ে দিয়ে গেছেন চিরদিনের

মত। পরাধীন জগতে এই আশ্চর্য্য মানুষের এই আশ্চর্য্য কীর্তি বিশ্বজগতে ঘোষিত হতে থাকবে “যাবচ্ছত্র দিবাকরঃ।” ব্রতের তৃতীয় পর্যায়—মহাজাতি সংগঠনের সঙ্কল্প গ্রহণ—হরিজনে কোল দেওয়া যার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ। আচণ্ডালে কোল দেওয়ার কথা শোনা গেছে পূর্বেও। খ্রীষ্টচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমের কোলে সম্মিলিত হয়েছে সকল জাতি—যবন হরিদাস হ’ল ঠাকুর হরিদাস, অস্পৃশ্য জাতি হ’ল জলাচরণীয়, কিন্তু সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রশক্তি না থাকায় মহাজাতির এক কোণে পড়ে রইল তারা পৃথক একটি সম্প্রদায় হয়ে। সাম্প্রদায়িক ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হলে সম্প্রদায় বাড়ে, রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হলে জাতি গঠন হয়। রাষ্ট্রশক্তির জাগরণ ব্যতীত মহাজাতি সংগঠন সম্ভবপর নয়। ভগবান বুদ্ধের ঐক্য সংগঠনের আদর্শে অনুপ্রাণিত রাজচক্রবর্তী সম্রাট অশোক মহাজাতি সংগঠনের একটি রূপ দেখিয়ে গেছেন নিজের রাজত্বকালে।

ভারতের বক্ষ থেকে ভগবান বুদ্ধের মহান ঐক্যের আলোক অপসারিত হওয়ায় বিশ্বমৈত্রীর আদর্শটি জীবনের ক্ষেত্র থেকে অস্তহিত হয়ে পুণ্ড্রিগত হয়ে রইল। অতীতকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূলতত্ত্ব আত্মচৈতন্যে বিশ্বচৈতন্যে ধ্যান বা উপলব্ধি সম্যাসীদের যোগ সাধনায় পর্যাবসিত হল। জনসাধারণ ছোট হয়ে পড়ে রইল তার বাইরে বহু দূরে। ফলে ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠল ভারতবাসীদের মধ্যে। ভারতবাসীরা শতভাগে বিভক্ত হল, মহাজাতি গঠনের আদর্শ বিলুপ্ত হল বহুকালের জন্য। স্বদীর্ঘ দিনের আত্মবিশ্বস্তির পর কোন এক মুহূর্তে যুগ পরিবর্তন সূত্র হল, যুগমানবগণ দেখা দিতে লাগলেন একে একে, জনসাধারণের ডাক পড়ল ঐক্যের ক্ষেত্রে, ভেদনীতি বিসর্জিত হতে লাগল ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে। মহাজাতি সংগঠনের পথ রেখা দেখা গেল ভারতের পথে।

খ্রীষ্টচৈতন্যদেব, গুরু নানক, মহাত্মা কবীর, রাজা রাম মোহন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহামানবেরা

ধর্মগত ঐক্যের সাড়া জাগালেন—নূতন চেতনার উন্মেষ হল, রাষ্ট্রীয় চেতনা উকি দিতে লাগল তার অন্তর থেকে, পথ প্রশস্ত হল ক্রমে। বড় বড় দেশপ্রেমিক দেশসেবক আবির্ভূত হলেন দেশে।

এল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অবতার মহাত্মা গান্ধীর যুগ। অহিংসা নীতিতে সংগ্রাম স্বরূপ করলেন তিনি রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার সঙ্গে। অসাধ্য সাধনে সার্থক করে তুললেন জাতির রাষ্ট্রীয় মুক্তি; অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটল পৃথিবীর ইতিহাসে।

মহাত্মাজীর শেষ সংগ্রাম মাহুষের নীতিদৃষ্ট ভেদবুদ্ধির সঙ্গে। প্রার্থনা সম্বল করে তিনি ভেদ বিভেদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলেন।

নিরস্ত্রের অস্ত্র তাঁর আত্মার আলোক।

ধোত করে ধরাতল দৃষ্টি অপলক।

তিনি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ভগবানের দিকে, প্রেরণা চাইতে লাগলেন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে। প্রার্থনায় পরিবেশিত হতে লাগল সেই প্রেরণার বাণী। দেশবাসী কুঁতর্ভার হল শুনে। আত্মাকে ভগবানে সমর্পণ করে দেহখানি দেশবাসীর হাতে তুলে দিয়ে মহাত্মা গান্ধী যাত্রা করলেন শেষ, মহাজাতি সংগঠন সম্পূর্ণ করার ভার পড়ে রইল দেশবাসীর উপরে।

প্রার্থনায় জাতির চিত্তভুদ্ধি হোক, গুপ্ত পাশ—দুর্নীতি বিদূরিত হোক, প্রার্থনাকে অগ্রণী করে জাতি মহাব্রত সাধনে অগ্রসর হোক, সত্য সঙ্কল্প মহাত্মা গান্ধীর মহাজাতি সংগঠন-সঙ্কল্প সিদ্ধিলাভ করুক জাতির জীবনে।

ভগবান তোমার বিধান।

এক জাতি এক ভগবান।

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

ভুলিয়া না যাই

(মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী)

(বাপুর লেখা হইতে চয়ন। প্রকাশের তারিখ বিক্রম সংবতে দেওয়া হইল। বিক্রম সংবৎ = খৃষ্টাব্দ + ৫৬ অথবা ৫৭ বৎসর

—বালজী গোবিন্দজী দেশাই)

মৃত্যু ও অমৃতত্ব (মৃত্যুই অমৃত)

(ক)

মৃত্যু সর্বদাই বরণীয়, কিন্তু আদর্শ অর্থাৎ সত্যের জন্ম বীরের আত্মত্যাগ অনেক বেশি বরণীয়। মৃত্যু দুঃসমন নয়, মৃত্যুই যথার্থ বন্ধু। দুঃখকষ্ট হইতে মৃত্যুই আমাদের মুক্তি দেয়। আমাদের বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া মৃত্যু আমাদের সাহায্য করে। মৃত্যু কেবলই আমাদের নূতন স্বযোগ দেয়, কেবলই নূতন করিয়া আশার সঞ্চার করে।

নিজের মতই মৃত্যু ক্লান্তিহরণ করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। তবুও বান্ধবজনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করার রীতি আছে। আত্মত্যাগী বীরের মৃত্যুতে তাহার কোন প্রয়োজন নাই (১৯৮৩)।

(খ)

আমাকে দিয়া কোন কাজ করাইতে হইবে ঈশ্বর তাহা জানেন। তাঁর কাজের জন্ত যতক্ষণ আমার বাঁচা দরকার তার বেশি এক মুহূর্তও তিনি আমায় বাঁচিতে দিবেন না। (১৯২৪)।

(গ)

জন্ম এবং জীবন একটা ধীর ও ক্রমিক বিকাশ। মৃত্যু একটা দ্রুত ও আমূল বিপ্লব। জন্মের মত মৃত্যুও চিরন্তন

সত্য। আত্মার বিকাশের জন্য জীবনের যতখানি দরকার মৃত্যুও ততখানিই দরকার (১২৭৮)।

(ঘ)

প্রকৃতির বিলি বরাদ্দের হিসাবে মৃত্যু যে কত বিচক্ষণ ব্যবস্থা তাহা মনে রাখিলে মৃত্যু যখনই আসুক, তাহাকে আর ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয় না। আমরা যদি আমাদের স্বভাবের ধর্মকে উপলব্ধি করি এবং মৃত্যুকে বন্ধু ও মুক্তি-দাতা হিসাবে অভিনন্দন করিয়া লইতে প্রস্তুত হই তাহা হইলে ঝাঁঝিয়া থাকিবার জন্য উদ্ভ্রান্তের ত্রায় চেষ্টা হইতে আমরা বিরত হইব। সমাজের হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া এবং অপরের জীবনের ক্ষতি করিয়াও নিজের জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছা হইতে আমরা বিরত হইব। (১২৩৮)।

(ঙ)

জীবন এবং মৃত্যু একই জিনিষের বিভিন্ন দিক, একই মূর্ত্তার সোজা এবং উল্টা দুই পিঠ। বস্তুতঃ স্থলভাগ অথবা জীবন অপেক্ষা দৃঃখভাগ ও মৃত্যুর দিকটাকেই আমার অনেক বেশি মহৎ বলিয়া মনে হয়। পরীক্ষা ও দৃঃখকষ্ট জীবনে স্বাদ আনিয়া দেয়। ইহারা না থাকিলে জীবনের মূল্য কি থাকিত? রাম সীতার পরীক্ষা, দৃঃখ কষ্ট ও

তপস্যার কথা বাদ দিলে রামায়ণে আর কি থাকে? আমি চাই যে সকলে মৃত্যু এবং দৃঃখভাগকে জীবন অপেক্ষা বেশি মূল্যবান বলিয়া মনে করুক এবং তাহারা যে মানুষকে নির্মল ও পবিত্র করে তাহা উপলব্ধি করুক (১২৮৬)।

(চ)

যতদূর ফল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমি আশাবিত্ত হইয়াছি, কিন্তু আশা পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি আমার দেহত্যাগ হয় তবুও এ কথা আমি মনে করিব না যে, আমি অকৃতকার্য হইয়াছি। কেননা আমি এ জন্মে যেমন বিশ্বাস করি পুনর্জন্মেও তেমনই বিশ্বাস করি। সেই জন্যই আমি জানি যে সামান্য চেষ্টাও বিফলে যায় না।

(ছ)

আমি আত্মার অমৃতত্বে বিশ্বাস করি। আমি সমুদ্রের তুলনা দিতে চাই। বিন্দু বিন্দু জল লইয়া সমুদ্র। প্রত্যেকটি বিন্দুই এক একটি সত্তা এবং প্রত্যেকটিই আবার সমুদ্রের অংশ, 'এক অথচ বহু'। এই জীবন-সমুদ্রে আমরা ছোট ছোট জলবিন্দু মাত্র। আমার বিশ্বাসের মানে এই যে, সমগ্র জীবনের সঙ্গে আমাকে মিলাইয়া দিতে হইবে, জীবমাত্রের সঙ্গেই, যাহাতে ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া এই মহিমাময় জীবনে আমি অংশ গ্রহণ করিতে পারি। সমগ্রভাবে এই জীবনই ঈশ্বর (১২৮৫)।

গৃহী মোহনদাস

শ্রীশান্তা দেবী

যে মানুষ দেশসেবা, বীরত্ব বা বিদ্ভাচর্চা কোন একটা বা একাধিক বিষয়ে কৃতিত্ব ও অসাধারণত্ব দেখান মানুষ তাঁকেই সচরাচর মহাপুরুষ আখ্যা দিয়া বসে। কিন্তু বাস্তবিক যে-মানুষের চরিত্রে সকল দিকে খ্যাতি হইবার চেষ্টা নাই তাঁহাকে মহাপুরুষ কেনে সংমান্য প্রকৃত মানুষও

বলা যায় না। আমরা সর্বদা এমন অনেক মানুষ দেখি যাহাদের কেহ হয়ত বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ, কেহ হয়ত দেশের সেবায় বারে বারে কাঁদাবরণ করিয়াছেন, কেহ হয়ত বড় বক্তা কি শিক্ষাপ্রচারক, এমন কি ধর্মপ্রচারক, অথচ তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে বড় বড় ত্রুটি আছে। কেহ

আর্থিক ব্যাপারে সত্যরক্ষা করিতে পারেন না, কেহ বা নৈতিক স্বলনকে দোষ বলিয়া মনে করেন না, কেহ বাহিরে সাধুতার মুখোঁস পরিয়া বেড়ান কিন্তু স্বগৃহে নিষ্ঠুর অবিবেচক ও অত্যাচারী। এই সব মানুষকে আমরা সংসাহসের অভাবে অথবা নিজেদের আদর্শের হীনতার জন্য প্রকাজলি দিয়া থাকি এবং মনে করি মানুষ সব দিকে সমান হইতে পারে না। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়। সত্যকে, স্ননীতিকে ও ধর্মকে যে চিনিয়াছে তার খ্যাতি প্রতিপত্তি যত সামান্যই হোক, চমকপ্রদ কৃতিত্ব তার জীবনে যত কমই থাকুক, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শকে মানিয়া চলিবার চেষ্টা তাহার মধ্যে সর্বদা থাকে এবং প্রত্যেক ছোট বড় মানুষেরই তা' থাকা উচিত, যদি তাহারা ভদ্র ও শিক্ষিত নামটুকুও পাইতে চায়।

আদর্শ পালনের চেষ্টার মধ্যে শক্তি ও বিবেচনা অল্পসারে কমবেশী হইতে পারে। ঋাহার শক্তি ও বিবেচনা সাধারণের সীমা ছাড়াইয়া উঠে তাঁহাকেই আমরা মহাপুরুষ বলিতে পারি। মহাত্মা গান্ধী যে এই অর্থেও মহাপুরুষ ছিলেন তাহারই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত আজ দিব। প্রধানতঃ গৃহী হিসাবে তিনি কত বড় ছিলেন সেইটাই দেখাইব, কারণ দেশব্যাপী ঋাহাদের কর্মজাল, গৃহের দিকে মন দিবার অবসর তাঁহাদের থাকে না।

মোহনদাস শৈশব হইতেই পিতৃমাতৃভক্ত ছিলেন। শৈশবেই 'শ্রবণ পিতৃভক্তি নাটক' প্রভৃতি পড়িয়া তাঁহার স্বাভাবিক পিতৃভক্তি দৃঢ়মূল হয় এবং শ্রবণের মত পিতৃসেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। যতদিন মোহনদাসের পিতা জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি পাঠাভ্যাসের পর প্রায় সমস্ত সময়ই পিতৃসেবায় ব্যয় করিতেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর সময় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পিতৃসেবা করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার মনে চিরকাল অহুশোচনা ছিল।

মোহনদাস যখন বিলাতে যান তখন মাতার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া যান যে বিলাতে মগ্নমাংস স্পর্শ করিবেন না। বিলাতের শীতে এবং সেখানকার আহারাদির ব্যবস্থায় নিরামিষ আহার করা খুবই কঠিন ছিল এবং তাহাতে মোহনদাসের শরীরও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেও মনে

করিতেন ডিম খাইলে নিরামিষ আহারের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হয় না। কিন্তু তাঁহার মা নিরামিষ বলিতে যাহা বুঝিতেন ডিম খাওয়া-তাহাতে চলে না। এইজন্য মাতার নিকট সত্যপালনের জন্য তিনি ডিমও স্পর্শ করেন নাই।

মোহনদাসের তের বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমকে তিনি জীবনের আদর্শ বলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং আজীবন তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসকালে গান্ধীজির পুত্রদের শিক্ষার জন্য তাঁহাকে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। তিনি তাহাদের ইউরোপীয় স্কুলে দেন নাই, কারণ তাহা ইউরোপীয়ানদের কুপাভিক্ষার সামিল মনে হইত। সেই-জন্য ছেলেদের গুজরাটি ও অত্যাগ্ন অনেক শিক্ষা তাঁহাকে স্বয়ং দিতে হইয়াছিল। তখনকার দিনেও ইংরাজী শিক্ষার জন্য মাসে ৭ পাউণ্ড দিয়া ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী তিনি বাঙীতে রাখিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে ছেলেদের ভারতবর্ষে পাঠাইয়া তিনি পড়াইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে শিশুদের পিতামাতার কাছছাড়া করা উচিত নয়। সংগৃহস্থের গৃহে সন্তানেরা স্বাভাবিকভাবে যে শিক্ষা সঞ্চয় করিয়া লয় তাহা কোনও ছাত্রাবাসে সঞ্চয় করা অসম্ভব ইহা তাঁহার ধারণা ছিল এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও সং পিতামাতার তাহাই ধারণা হওয়া উচিত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীদম্পতির কোন আত্মীয় স্বজন ছিলেন না। কিন্তু সেখানে তাঁহাদের দুইটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। প্রত্যেক ন্যায়বান পতিরই কর্তব্য এই সময় স্ত্রীকে যথাসাধ্য সমস্তে সকল বিপদের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করা। কিন্তু ভারতীয়দের অনেকের সে কর্তব্যবোধ নাই। গান্ধীজি পত্নীর সেবাস্বত্বের জন্য শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও ধাত্রীর ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু অসময়ে বিপদ ত হইতে পারে, এইজন্য তিনি স্বয়ং বই পড়িয়া ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তানের জন্মের সময় ডাক্তার আসিতে দেবী হওয়ায় গান্ধীজিকেই ধাত্রী ও চিকিৎসকের সকল কাজ করিতে হয়। সন্তান তাঁহারই হাতে ভূমিষ্ট হয় এবং তিনি ভীত বা বিচলিত হন নাই। শিশুদের জন্মের পর দুই মাস ধাত্রী রাখিয়া তিনি স্ত্রীর সেবা করাইতেন, কিন্তু সদ্যোজাত শিশুদের গান্ধীজি স্বয়ং লালন

পালন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন প্রত্যেক মাতা ও পিতার শিশুপালন শিক্ষা করা উচিত, এবং তিনি স্বয়ং যদি শিশুপালন শিক্ষা না করিতেন তাহা হইলে আজ তাঁহার ছেলেদের সাধারণ স্বাস্থ্য একরূপ ভাল হইত না।

শিশুদের জীবনের প্রথম পাঁচ ছয় বৎসর তারা পিতা মাতারই অঙ্গকরণ করে। তাহাই তাহাদের প্রকৃত ও প্রথম ভিত্তিগত শিক্ষা বলিয়া গান্ধীজির বিশ্বাস। সে শিক্ষায় সন্তানদের (বিশেষতঃ কনিষ্ঠদের) সাহায্য করিতে গান্ধীজি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন।

গৃহকর্মে ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য রন্ধন, কাপড় কাচা ইত্যাদি প্রভৃতি কাজ গান্ধীজি স্বয়ং ভাল করিয়া শিখিয়া পত্নীকেও শিখাইয়াছিলেন; পত্নীর স্বক্ষে সমস্ত বোঝা সাধারণ স্বামীর মত চাপাইয়া দেন নাই। গম ভাঙা ও রুটি বেক করার কাজও তিনি করিয়াছেন। এই কাজে মিঃ ও মিসেস পোলাক এবং গান্ধীজির পুত্রেরা তাঁহার সহায় ছিলেন। অনেকে হয়ত জানেন না যে পাখখানা পরিষ্কারের কাজও তিনি স্বয়ং করিয়াছিলেন এবং ছেলেদের শিখাইয়াছিলেন।

কম্বরবা গান্ধীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য গান্ধীজী তাঁহাকে এক বৎসর ডাল ও ছুগ খাইতে বারণ করেন। কিন্তু কম্বরবা রাজী হন নাই। বার বার জেদ করিতে কম্বরবা বলিলেন, “তোমাকে যদি ডাক্তার এগুলি ছাড়িতে বলিতেন তুমিও পারিতে না।”

গান্ধীজী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “না, এটা তোমার ভুল ধারণা। তুমি ছাড় বা না ছাড়, ডাক্তারের উপদেশ বিনাও আমি আজ হইতে ডাল ও ছুগ ছাড়িয়া দিলাম।”

কম্বরবা স্বামীর এরকম প্রতিজ্ঞায় ব্যথিত হইলেন এবং চোখের জল ফেলিয়া তাঁহাকে কথা ফিরাইয়া লইতে বলিলেন। নিজে খাদ্যগুলি ছাড়িবেন সে প্রতিজ্ঞা যে করিলেন তাহা ত বলাই বাহুল্য।

গান্ধীজী পত্নীর প্রতি ভালবাসার জন্ত এবং তাঁহাকে সাহস দিবার জন্তই এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং এক বৎসরের চেয়ে অনেক বেশী দিনই তাহা পালন করিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার নিজের ইহাতে কোনই প্রয়োজন ছিল না।

পরিবারের প্রতি কর্তব্য ছাড়াও গৃহীর আরও কতকগুলি কর্তব্য আছে, যে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি থাকে না। ভৃত্যদের প্রতি আজকাল কঠোর ব্যবহার করা যায় না, কারণ এখন তাহারা সহজেই মনিবদের জব্দ করে। কিন্তু ৪৫ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ভৃত্যেরা অবজ্ঞা, অনাদর ও অত্যাচার অমানবদনে সহ্য করিত। কিন্তু গান্ধীজী তাঁহার ভৃত্যদের আত্মীয় পরিজনের মত দেখিতেন।

অনাচার ও অবহেলিত রোগীদের পরিচর্যাও গৃহীদের কর্তব্য। গান্ধীজী চিরজীবন সেবা ধর্মের অনুরক্ত ছিলেন। তিনি কম্পাউণ্ডার নাম ডাক্তার সকলের কাজ স্বেচ্ছায় বহুবার করিয়াছেন। প্লেগ মহামারীতে সহর রক্ষা করার কাজে এবং কুষ্ঠরোগীর ব্যক্তিগত পরিচর্যাও তাঁহাকে লাগিতে দেখা গিয়াছে।

মহৎ মানুষের চোখ ছোট বড় সকল দিকে থাকিলে তবেই তাঁহাকে প্রকৃত মহৎ বলা যায়। কেবল খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য বাহিরের বড় কাজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া গৃহে পরিবারে ও সামান্য জনের কাছে অন্তরের ক্ষুদ্রতাগুলি উজাড় করিয়া দিলে যে মানুষ মানুষ হয় না ইহা আমাদের দেশের মানুষকে গান্ধীজী তাঁহার জীবন দিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। ভিতরে বাহিরে এইরূপ খাঁটি মানুষ আমাদের দেশে আরও ছিলেন, আশা করি এখনও আছেন। কিন্তু গান্ধীজীর মত দেশজোড়া খ্যাতি বাহাদের নাই, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেশের কাজে লাগানো শক্ত। গান্ধীজীর দৃষ্টান্তে যদি মানুষের চेतনা কিছু ফেরে, তবে দেশের মহোপকার হয়।

মহাত্মার আহ্বান

(শ্রীপদ্মিনী সেনগুপ্তার রচনার মর্ম্মানুবাদ)

শ্রীমুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও শ্রীমুক্তা সরোজিনী নাইডু এই দুইজন ভারতীয় নৈত্রী জাতির জনক মহাত্মাজীর বিয়োগজনিত গভীর মর্ম্মবেদনা ভুলে গিয়ে জাতিকে কর্তব্য সম্পাদন করার যে আহ্বান জানিয়েছেন, তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ মহাত্মাজী স্বয়ং সেবা করার জন্তুই এসেছিলেন, কাহারো সেবা তিনি নেন নি। এই গভীর দুঃখের দিনে আমাদের সাধনা এইটুকু মাত্র যে, আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। গান্ধীজী মৃত্যু বরণ করে আমাদের জন্তু জীবন ও কর্ম্মের ভার রেখে গিয়েছেন।

শ্রীমুক্তা পণ্ডিত মহাত্মাজীর জন্তু শোক প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, ‘যে পবিত্র ব্রত উদ্‌ঘাপন করার জন্তু বাপুজী প্রাণ দিলেন, তাহা সাধন করতে নির্ভীকভাবে কাজ করে যাব।’ শ্রীমুক্তা পণ্ডিতের সামান্য এই কয়টি কথা সাধারণের কর্ণে এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শ্রীমুক্তা নাইডু অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে মহাত্মাজীর শোকে আবেদন জানিয়েছেন, “তঁার মহান ব্রত, তঁার আদর্শ ও তঁার কাজের আমরা কি উত্তরাধিকারী নই? ব্যক্তিগত দুঃখ প্রকাশ করার সময় অতীত হয়ে গেছে, আমরা তঁার আদর্শের জীবন্ত প্রতীক ও মৈনিক, হিংসায় ক্ষতবিক্ষত জগতে তঁার পতাকা-বহনকারী, আমাদের পতাকা সত্যের পতাকা, বর্ম্ম অহিংসা এবং তরবারি হচ্ছে আত্মা—যা বিনা রক্তপাতে জয়লাভ করে। বাপুজীর নির্দেশ মেনে নিয়ে তঁার সংগ্রামকে আমরা কি জয়যুক্ত করব না? তঁার কণ্ঠস্বর জগৎ আর স্তনবে না, ইহা সত্য, কিন্তু আমাদের কোটি কোটি কর্ম্মচারী কি তঁার বাণী জগতে ঘোষণা করতে সক্ষম হবে না?”

মহাত্মাজীর বিয়োগের অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনা থেকে মনকে মুক্ত করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের নারী সমাজকে গান্ধীজী ভালবাসতেন, এবং নারী সমাজের উন্নতি-

কল্পে তিনি কঠোর ঐকান্তিক চেষ্টা করে গেছেন এবং তঁার চেষ্টায় নারী সমাজের উন্নতিও হয়েছে অনেক। তাই সমগ্র নারীসমাজের কর্তব্য শ্রীমুক্তা পণ্ডিত ও শ্রীমুক্তা নাইডুর ন্যায় মহাত্মার আদর্শানুযায়ী সেবার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

“আমরা কি করতে পারি?” এই কথা আমাদের প্রায় সকলকেই বলতে শুনা যায়। কিশোরী ছাত্রী লজ্জনতা বধু তরুণী মাতা প্রোঢ়া কি প্রাচীনা বিধবা, শিক্ষিতা অশিক্ষিতা কেহই বাদ যান না। মহাত্মাজীর জন্য অশ্রুগাত ইহারা সকলেই করিয়াছেন। কিন্তু শুধু অশ্রুজল নয়, সেবা দ্বারা কর্ম্মের দ্বারাই তিনি তঁার শিক্ষামন্ত্র চিরজীবী করে রাখতে চেয়েছিলেন। সত্যী সাধ্বী স্ত্রী কি সেবাপরায়ণা জননী কি শোকলিষ্টা বিধবাই নারীজীবনের একমাত্র আদর্শ আর নেই। আমাদের সত্যী সাধ্বী স্ত্রী কিংবা সেবাপরায়ণা জননীও হতে হবে এবং গৃহ সীমানার বাহিরের মহান কর্তব্য সম্পাদনের গুরু দায়িত্বও নিতে হবে। লবণ-আইন অমান্য করার সময় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সহস্র নারী ঘরের আশ্রয়, পর্দা ও নানান প্রাচীন প্রথা ছিন্ন করে যে পুলিশের উপদ্রব, কারাদণ্ড ও জলন্ত ক্রোধোন্মত্ত সরকারের সম্মুখীন হয়েছিল। সেই পুণ্য কাহিনী এখনও মনে পড়ে। মহাত্মাকে আজ অনুসরণ করার সৌভাগ্য হতে আমরা বঞ্চিত হয়েছি সত্য, কিন্তু বস্তু হাতে সেই মূর্ত্তি মানস চক্ষে এখনও জীবন্ত দেখছি।

আমাদের এই সুন্দর দেশ ছিল আমাদের গৌরব। আজ তা মহাত্মা-হত্যার অপরাধে অপরাধী। এই জঘন্য পাপে মস্তক অবনত করে থাকলেই চলবে না। সেই কলঙ্করোখা আন্তরিক সেবা দ্বারা ধোঁত করতে হবে। বর্তমানে প্রত্যেক নারীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিজের নিজের সংসারকে সংশোধন করা। হিন্দুধর্ম্মে বহু অনাচার প্রবেশ করে হিন্দুধর্ম্মের নাম কলঙ্কিত করে রেখেছে। মহাত্মা

গান্ধী বলেছেন, “আমাদের নারীজাতির পূর্ণ স্বাধীনতা আমি কামনা করি। বাল্যবিবাহকে আমি ঘৃণা করি। বাল্যবিবাহ করণ মূর্ত্তি আমাকে ব্যাধিত করে এবং যখন দেখি স্ত্রী বিপত্নীক পুরুষ অনায়াসে পুনর্ব্বার বিবাহ করতে অগ্রসর হচ্ছে তখন রাগে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপে। যে পিতামাতা কন্যার শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন থাকেন এবং কোন ধনী পুত্রের সহিত বিবাহ দিবার উদ্দেশ্যেই মেয়ের লালন পালন করেন, সে পিতামাতাকে আমি অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী বলে মনে করি।”

মহাত্মাজীর মৰ্ম্মস্পর্শী আহ্বানে সাড়া দিবার সময় এসেছে। এ আহ্বান নারীজাতিকেই।

মহাত্মাজী বার বার বলেছেন যে, আমাদের স্বাধীনতা শুধু ভোট সংগ্রহের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তার আলোকে প্রতিটি গৃহ হবে আলোকিত। কোন মা বালিকা কন্যার বিবাহ দিয়েছেন কি না সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। যদি এ অপরাধ একবার করে থাকেন দেখতে হবে ভবিষ্যতে আর ঘেন না করেন। সমস্ত সমাজ বিরোধী হলেও সমস্ত গৃহ বিপক্ষে হলেও এ পাপের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই দরকার।

বাল্যবিবাহকে কুসংস্কারের গণ্ডি হতে মুক্তি দিয়ে শিক্ষার আলোকে এনে দেশ সেবায় তাকে লাগাতে হবে এবং সে যদি পুনর্বিবাহে ইচ্ছুক হয় তা হলে তাকে বিবাহও দিতে হবে। বিধবাদের সম্বন্ধে বেদে উক্ত

আছে, “ইহাকে বৈধব্যের যত্নগ্ৰা ভোগ করিতে দিওনা। ইহারা অশ্রুপাত না করিয়া বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া গৃহে প্রবেশ করুন।”

অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে সমাজকে মুক্ত করতেই হবে এবং মহাত্মার আদর্শ নিয়ে সে কাজে সর্ব্বাঙ্গে আমাদের এই নারী সমাজকেই অগ্রসর হতে হবে। নারীদের নিরক্ষর হয়ে শুধু বিবাহের জন্য জীবন ধারণ করলে আর চলবে না।

কর্মীদের প্রতি মহাত্মাজীর শেষ নির্দেশ ছিল, “সকল ধর্ম্মকেই পবিত্র ও সমান বলে মনে করতে হবে; সকল জাতি এবং নারী পুরুষকে অভিন্ন মনে করতে হবে। পল্লীর স্বাস্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এবং পল্লীবাসিনদের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে। এই পল্লী উন্নয়নে আমাদের নারী জাতির অনেক কর্তব্য করার রয়েছে এবং পুরুষদের চেয়ে আমাদের অধিক সময়ও আছে। নিরক্ষরদের শিক্ষা দেবার জন্য আমরা দিনে অন্ততঃ ১ ঘণ্টা সময় দিতে পারি। নিকটস্থ বা পার্শ্ববর্ত্তী বস্তি সূর্য্যে আমরা অবাদে যেতে পারি। আমি জানি যে আমরা যদি এই ভাবে কাজে অগ্রসর হই তা হলে পল্লীবাসিনীরা আমাদের সামনে গ্রহণ করবেন। ঐকান্তিক সেবা ব্রতের ভিতর দিয়েই আমাদের নারী সমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হবে। মহাত্মা বলেন, “নারী জাতির মুক্তি নারীদের হাতেই।”

সত্যগ্রহের মূলকথা

শ্রীমুক্তা রায়

জীবনের যে কোনও সমস্যা সমাধানে সত্যগ্রহ অথবা সত্যকে আগ্রহ করা আজকাল সর্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ নীতি হলেও কার্যতঃ কেবলমাত্র জন কয়েক লোক ব্যবহারিক জীবনে এই নীতি প্রয়োগের চেষ্টা করে। এই নীতির সম্যক তাৎপর্য বুঝতে অথবা ইহা ব্যবহারিক জগতে প্রয়োগ করতে এখনও আমরা সকলে শিখিনি।

অসাধুতাকে সাধুতা অথবা অসৎকে সৎ দিয়ে জয় করা—তার নামই সত্যগ্রহ। অসাধুতা পৃথিবীতে সব স্থানেই আছে এবং সাধারণতঃ তাকে আরও বড় অসাধুতা দিয়ে জয় করার চেষ্টা হয়। তার ফলে অসাধুতার শক্তি বৃদ্ধি পায়। আমরা সকলে বিশ্বাস করি যে আত্মিক বিবর্তন শক্তির (evolution) ফলে জড়ত্বের থেকে পশুত্ব, পশুত্বের থেকে মানবত্ব এবং মানবত্বের থেকে ক্রমে দেবত্বের জয়লাভ হবে। যেখানে এই গতি বিপরীত মুখে যায় তাকেই আমরা বলি অসাধুতা। মানব জগৎ পশুত্বের উপরে উঠছে, পশু শক্তির থেকে মানুষত্বকে বড় শক্তি বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু কোথায়ও পশু শক্তির প্রকাশ দেখে যখন আমরা আমাদের মানুষত্বের কথা ভুলে গিয়ে আবার পশুশক্তি প্রয়োগ করে তাকে জয় করতে চেষ্টা করি তখন আমরা অসাধুতার পথে নেমে যাই। এই কথাই মহাত্মাজী আমাদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি আমাদের বলেছেন যে পশুশক্তির থেকে মানুষত্বের শক্তি বড়, সেই জন্য অতি দুর্বল মানুষও পশু শক্তিকে পরাস্ত করতে পারে।

সত্যগ্রহের মধ্যে তিনটি গুণ দেখা যায়। সত্যগ্রহীর মনে থাকবে একদিকে অসীম প্রেম এবং অন্যদিকে অসীম শক্তি; এবং সহিষ্ণুতা বা আত্মত্যাগের ক্ষমতা; এবং এই গুণগুলি প্রকাশ পাবে সমষ্টির সেবার মধ্যে দিয়ে।

সত্যগ্রহ মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়। সত্যগ্রহীকে অগ্রসর

হয়ে গিয়ে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে কাজ করতে হবে এবং অন্তের হৃৎকের বোঝা নিজেকে নিতে হবে। তার মনে তিক্ততা অথবা বিদ্বেষ থাকবে না। তার মূল মন্ত্র হবে প্রেম।

ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টির মঙ্গল কাজে নিয়োগ করে, সম্পূর্ণভাবে আত্মবলিদান দিয়ে অন্যের মঙ্গলের প্রচেষ্টায় কাজ করলে তবেই সত্যগ্রহ অবলম্বন করা হয়। কেবল মাত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে সত্যগ্রহ করা হয় না। সত্যগ্রহীকে অনেক সময় বাইরের দিক থেকে দেখতে নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয় কারণ সে যা করতে চায় হয়তো বা তার পারিপার্শ্বিক পশু শক্তি তা করতে তাকে বাধা দেয়। তখনকার মত সেখানে তাকে নিষ্ক্রিয় দেখায় বটে; কিন্তু তার বাধা যদি সরে যায় অমনি বোঝা যায় যে সে কতদূর শক্তিমান। তখন সে সমষ্টির সেবায় নিজেকে নিয়োগ করে। তার কাজে যখন সে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল তখন বাইরের দিকে সে নিষ্ক্রিয় ছিল, কিন্তু মন তার চুপ করে ছিল না। সেই অবস্থায় শরীরকে বসিয়ে রাখতে পারাটাই তার ক্রিয়া ছিল। বাইরের বাধা না থাকলে সত্যগ্রহী গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে। আর বাধা পেলে সে স্বৈর্য্যের সঙ্গে প্রতিরোধীর পন্থা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

সত্যগ্রহী কোনও সময়েই প্রতিশোধ নিতে চাইবে না অথচ হার স্বীকারও করবে না। দৈহিক শক্তির ব্যবহারের ফলে জয়ী ও পরাজিত উভয় ব্যক্তিবই ক্ষতি হয়। কোনও লোক যখন ক্রোধের প্রকাশ করে তার পরে তার নিজেরই দেহ এবং মন অবসন্ন হয়ে যায়। আবার যার প্রতি ক্রোধের অভিব্যক্তি করা হয় তার মনে ভয়ের ভাব জেগে উঠলে তারও আত্মার প্রসার নষ্ট হয়। ক্রোধ প্রকাশের দ্বারা জেতা এবং বিজিত দুজনেই আত্মিক ভাবে সমানে

পরাজিত; কিন্তু অভ্যাচারপীড়িত ব্যক্তি যদি ভীত না বোধ করে সাহস, ধৈর্য্য এবং ক্ষমা মনে নিয়ে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সম্মুখীন হতে পারে তবে সেখানে সেই জয়ী হল। মানুষের আত্মার স্ফোট অথবা প্রণারের ওপরেই তার পরাজয় অথবা জয় নির্ভর করে। কোনও সময়ে আপাতদৃষ্টিতে দৈহিক শক্তির কাছে আত্মিক শক্তি পরাজিত হলে বলে মনে হলেও কিছুদিন পরে আত্মিক শক্তিরই জয় সমস্ত দেশে ও কালে দেখা যায়।

আত্মিক শক্তির বীজ সব মানুষের মধ্যেই স্তূপ্ত ভাবে আছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য অনেক সময়েই এটা জাগ্রত করে তোলবার কাজ অভ্যাস করতে হয়।

দেহকে পুষ্ট করতে হলে খাদ্যের প্রয়োজন হয়, সেই রকম মনের শক্তিকে পুষ্ট করতে হলেও কতকগুলি নীতি ও তথ্য বারে বারে বুঝে দেখা দরকার। সেই জ্ঞান শিক্ষা জগতে শৈশব থেকে আরম্ভ করে পরিণত বয়স পর্যন্ত এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার যাতে শিক্ষার্থী সত্যগ্রহের মূল নীতিগুলি বুঝতে শেখে এবং সেগুলিকে কার্য্য দিয়ে অভ্যাসে পরিণত করতে পারে। এই জাগিয়ে তোলবার এবং অভ্যাস করবার পথই হচ্ছে শিক্ষার পথ।

এই শিক্ষা আরম্ভ হয় ব্যক্তি বিশেষের সহ, ক্ষমা ও প্রেমের শক্তি দিয়ে। তার পরে সেই ব্যক্তির প্রভাব সমাজের ওপরে অল্পভূত হয় এবং ক্রমে তার ক্ষেত্র পরিসর লাভ করে সমস্ত জগতে বিস্তৃত হয়ে যায়—এই আশা মহাত্মাজী করেছিলেন। এর মধ্যে স্বার্থান্বেষণের কোনও স্থান নেই; সমষ্টির মঙ্গল ছাড়া অন্য কোনও মঙ্গল সত্যগ্রহী চায় না। দৈহিক শক্তির অপেক্ষা আত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বে সে বিশ্বাস করে এবং মৃত্যুকে সে কোনও রকমেই ভয় করে না।

সত্যগ্রহ অবলম্বনের আগে এর মূল নীতিগুলি ভাল ভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের পক্ষেও এই নীতি বোঝা শক্ত নয়, এর জ্ঞান বিদ্যা অথবা পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই। মন যদি সহজ ও সবল হয়, জীবন যদি ক্রোধ ও ঘেঘের পথে চালিত ও অভ্যস্ত না হয়ে থাকে তবে এই নীতি জীবনে সহজ ভাবেই আসে। যাদের আমরা নিঃক্ষর ও অজ্ঞ বলে

মনে করি সে রকম হাজার হাজার লোক এই নীতি গ্রহণ করে কাজ করতে পেরেছে। কিন্তু মনে যদি ক্ষমা ও প্রেম না থাকে তবে সত্যগ্রহ করা যায় না। বার মধ্যে ঘেঘ ও হিংসা রয়েছে তার মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশ এখনও হয়নি; যতদিন না সে পশুত্বকে মনুষ্যত্বের থেকে নীচের স্তরের জীবন বলে বুঝতে পেরেছে ততদিন পর্যন্ত সত্যগ্রহ অবলম্বনের সে উপযুক্ত হয়নি। মহাত্মাজীর জীবনের ইতিহাসে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে তিনি সত্যগ্রহের যুদ্ধ আরম্ভ করে আবার তা বন্ধ করে দিয়েছেন। সেই সব ক্ষেত্রে তিনি এমন মনে করেননি যে সত্য পরাজিত হয়েছে, তিনি মনে করেছেন যে সেখানে সত্যগ্রহের সৈনিকদল প্রস্তুত হয়নি, তাই তিনি সেখানে সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের অজ্ঞাত ভাবে এবং জ্ঞাত ভাবে এই শক্তি যে পৃথিবীতে জয়লাভ করবে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। সত্যগ্রহের যুদ্ধের একটি বিশেষত্ব আছে যা পশুশক্তির যুদ্ধের বিপরীত।

যেখানে সত্যগ্রহী যুদ্ধ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সেখানেও সে সত্য পরাজিত হয় না। সেই সময়ে যুদ্ধে নিরস্ত হওয়াটা কর্তব্য বলেই সে যুদ্ধ বন্ধ করে, পরাজিত হয়েছে বলে করে না। সময়-উপযুক্ত হলেই সে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করতে পারে। সত্যগ্রহে পরাজয় নেই। সত্যগ্রহী যদি আত্মবলিদান করতে বাধ্য হয় তবে সেটা তার বড় রকমের জয়, পরাজয় নয়। তার মৃত্যুর পরে তার শক্তি আরও ছড়িয়ে পড়ে এবং আরও জোরের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে।

অন্য পক্ষে সত্যগ্রহী যাকে পরাজিত করে তারও আত্মিক উন্নতিই হয়; কারণ সে দেখতে পায় যে সত্যগ্রহী বিশ্বের মঙ্গলের মধ্যে শত্রুরও মঙ্গল কামনা করে। এই ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হওয়ার পরে শত্রুর মনের বিদ্বেষ নিরস্ত হতে বাধ্য। তখন সে সত্যগ্রহীর বিপক্ষদলের লোক না থেকে স্বইচ্ছায় তার দলের লোক হয়ে যায়। পৃথিবীর সাধারণ যুদ্ধে এই ফল দেখা যায় না। সেখানে সব সময়েই বিজ্ঞতার প্রতি বিজ্ঞিতের লুকায়িত বিদ্বেষ থেকে যায় এবং কালে সেই বিদ্বেষ আবার যুদ্ধের আকারে প্রকাশ পায়। এই কারণে সত্যগ্রহের পন্থাই জগতে শ্রেষ্ঠ পন্থা।

মহাত্মাজীর স্মৃতি

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

আজ বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে ১৯০৬ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল মহামতি গোখলের বাটীতে। সেই বৎসর দাদা-ভাই নৌরোজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিরাট এবং যুগ-প্রবর্তকারী অধিবেশন হয় ভবানীপুরের পোড়াবাজারের কলের ময়দানে (বর্তমান আলেকজান্ডার কোর্ট)।

তার আশুতোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে আমরা স্বেচ্ছাসেবকের দলভুক্ত হইয়া প্রতিনিধিদের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। বয়স তখন আঠার। গোখলে মহাশয় ৪নং রোলাও রোতে অবস্থান করিতেন। ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য হিসাবে গোখলে মহাশয়ের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত হইয়াছে। সেই বৎসর কংগ্রেসে ‘স্বরাজ’ ও ‘বিলাতি দ্রব্য বর্জনের’ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যারিষ্টার অনাডম্বর কৃষকায় সরল সহায় বদন গান্ধী মহাশয়কে দেখিয়া তখন আমাদের চিত্তে কোন প্রকার ভক্তির ভাব জাগ্রত হয় নাই। কয়েকদিন সকাল হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত তাঁহার সেবার ভার আমার উপর নির্দিষ্ট। থাকা সত্ত্বেও আমি মুহূর্তের জন্তও তাঁহার সেবা করিবার অবসর পাই নাই। তখনকার দিনের ব্যারিষ্টারদের সম্মান ও বিলাতী চাল অতি উৎকট ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর নিত্যকার জীবন যাত্রা অতি সাধারণ। তাঁহার আহার ও বিহার বেশ সংযত, অল্পতে তিনি সন্তুষ্ট, প্রয়োজনের অধিক কোন দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না।

কোন কার্য করিতে যাইবেই তিনি বলিতেন—“আচ্ছা সময় মতনই হইবে। ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নাই।” আমরা দেখিয়াছি সাধারণতঃ তিনি অস্ত্রের সাহায্য লইতেন না এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পাদনে তুষ্টি পাইতেন।

তিনি অতি ভোক্তার বিরোধী ছিলেন। আমাদের বলিতেন ঠিক এবং বাঁধা সময়ে অল্প আহার করিলেই ব্যাধির হাত

হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। স্বল্প আহার বা অভ্যস্ত উপবাসে শরীরের শক্তি ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি পায়। দুপুরের পর এবং রাত্রি ৮টার পর আহার করিতে নিষেধ করিতেন।

তাঁহার পরিণত বয়সে তিনি সূর্য্য অস্ত্রের পর আহার করিতেন না। যখনই যত প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যস্ত থাকুন না কেন তিনি ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে পান ও আহার করিতেন।

সেই ১৯০৬ সালেই দেখিয়াছিলাম তাঁহার হাঁটুবার অগ্ন্যাস। রোলাও রোড হইতে পোড়া বাজার এক মাইল দূরত্ব তিনি প্রত্যহ ৩ বার যাতায়াত করিতেন। সকল মমতাই হাঁটিয়া যাইতেন। আমরা তাঁর সঙ্গে অত দ্রুত যাইতে পারিতাম না। তিনি পিছন দিকে তাকাইতেন আর হাসিতেন। অবশ্য অনেক সময় আমাদের ক্লান্ত দেখিলে গতি মন্থর করিতেন। কখন তিনি আমাদের উপর তাঁহার কর্তৃত্বের কোন আভাষ দেখান নাই। আগাদের যেন তাঁহার ‘নিজ পরিবারভুক্ত’ মনে করিতেন। তিনি আমাদের বলিতেন—বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীরাই পরাধীনতার শিকল ছিঁড়িতে পারবে। তার জন্ত এখন হইতে তৈয়ার হও। তার পরই গোখলে মহাশয় বলিয়াছিলেন—What Bengal thinks to-day, the rest of India will think to-morrow.

তখন গান্ধী প্যান্টুলেন ও কোট পরিধান করিলেও হাট বা বিলাতি চংএর টুপি মাথায় দিতেন না, এক প্রকার ক্যাপ পরিতেন। এখনকার গান্ধী ক্যাপের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নাই। প্রত্যেক কথায় তাঁহার হাসি মুখে প্রকাশ পাইত। কথা কমই কহিতেন। তখনও নিরামিষ আহার করিতেন। গোখলেও নিরামিষ আহার করিতেন। কেবল পথ দেখান ব্যতীত আমাদের কোন কার্য করিতে দিতেন না। অবসর হইলেই আমাদের ডাকিয়া পারিবারিক গল্প করিতেন।

তাঁহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে যেদিন সোদপুরে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই, তখন তাঁহাকে সেই সব দিনের

কথা স্বাধীন করিয়া দিলে সংক্ষেপে তিনি সম্মানে বলেন—
Mr. Gokhale was my friend, philosopher & guide. অবশ্য সেরিন আমি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার দাবী লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়াতে, এবং নানা রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁহার চিন্তা ভাবাক্রান্ত থাকতে সেই বাংলা জীবনের সরল ও প্রাণ খোলা হাসি দেখিতে পাই নাই বটে, তথাপি আমার আবেদন নিবেদন তিনি ২৮ মিনিট ধরিয়া স্থির চিত্তে শ্রবণ করেন। বাংলা ভাষার প্রসারে আমাদের কার্য পদ্ধতি শুনিয়া—এক গালে হাত রাখিয়া গভীর কণ্ঠে বলিলেন—“অতি উত্তম প্রচেষ্টা।”

আর একটি গৌরবের বিষয় যখন তাঁহাকে বাংলার বৃক্ক বসিয়া, শতকরা নব্বই জন বাঙ্গালী শ্রোতার সম্মুখে প্রার্থনা বা গান বাংলা ভাষায় (বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের গান) না করানোয় আমাদের ক্ষোভের কথা বলিলাম তিনি কেবল হাসিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা পরদিন হইতে বাংলা

গান বেশীর ভাগ গুরুদেবের গান প্রার্থনা সভায় গীত হইত। তাহার পরই মেদিনীপুর, কাঁচি ও রামপুরহাটে তিনি বাংলা ভাষায় সভার কার্য পরিচালনার অনুমোদন করেন। এমনই পরমত সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন।

এই দিবস যখন বাংলার সীমানায় অবস্থিত বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা তুলি, তখন তাহা তিনি অনুমোদন করেন, এবং বলিয়াছিলেন—স্বাধীনতা লাভ করিলেই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করা হইবে।

তিনি যে বাংলা ভাষা নোয়াখালি যাবার সময় শিথিতে-ছিলেন তাহা বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য ও মধুরতার মুগ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া নহে—বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দান করিবার জন্তে।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কগণ বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করিলে মহাত্মাজীর পথ ও মত এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইবে, অশান্তির মূল উচ্ছেদ হইবে। শান্তি! শান্তি!

“দু’হাত দিয়ে তুলব ধরে তোমার

জয়শঙ্খ”

শ্রীবেলা দে

মহাত্মাজী নাই, ভারতবর্ষ আজ গান্ধীজী শূন্য এ কথা ভাবতেও বিচারবুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে! আজ আমাদের চারিদিকে বিরাট শূন্যতা, বিরাট অবসাদ! যিনি প্রতিদিন প্রতি নিশায় আমাদের কল্যাণ সাধনায় সমাহিত থাকতেন আজ তাঁকে আমরা হারিয়েছি! গাঢ়তম কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আজ তাই আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অন্ধকার, দিগন্ত ব্যাপিয়া অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে! অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে কে আজ আমাদের রক্ষা করবে? ঐ তো ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ভাবোদ্দীপ্ত কণ্ঠধ্বনি শোনা যাচ্ছে—“যে মর্যাদা আমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত রাখত তাহা অন্তমিত হয়েছে! আমরা শীতান্ত, অন্ধকারে কাঁপছি! কিন্তু আগুন এখনও নেভেনি! যে বহুশিখা তিনি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, তা আমাদের অন্তরে জ্বলছে! সমগ্র জীবনে সকল কর্মে ও সকল বাক্যে মহাত্মাজী সর্বাপেক্ষা বড় করে যা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো আত্মবিশ্বাস—“বিশ্বাস হারাইওনা, বিধাতার এবং সৃষ্টির লক্ষ্য যে কল্যাণ তা ভুলো না!” মহাত্মাজীর জীবনে বারে বারে এই আমরা দেখেছি যে চরম দুঃখের মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি কল্যাণের সম্ভাবনাকেই লক্ষ্য করেছেন, মুহূর্তের জন্তও তিনি বিশ্বাস হারান নি! তাঁর দেহান্তরে আমাদের চারিদিকে যে ঘোর অন্ধকার সহসা ঘনিয়ে

এসেছে সেই অন্ধকারের মধ্যে তাঁর বাণী তাঁর আদর্শ আমাদের পথের সন্ধান দেবে!

১৮৬৯ সালে ২রা অক্টোবর গুজরাটের অন্তর্গত পোর-বন্দরে যে ক্ষুদ্র শিশুটি আবির্ভূত হন, উত্তরকালে যিনি মহাত্মা গান্ধীরূপে চল্লিশ কোটি ভারতবাসীকে শৃঙ্খলমুক্ত করেন, যিনি সমগ্র বিশ্বকে সত্য, অহিংসা ও মৈত্রীর বাণীতে নুতন করে দীক্ষা দান করেন, সেই মহামানব মহাত্মা গান্ধী ভগবান নির্দেশিত কাজ সাধন করতে ঐতিহাসিক যুগ প্রয়োজনে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন! দুর্বীর লোভ ও কুটিল হিংস্রতার পৃথিবী যখন উন্নত, স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতার নামে নিম্ন বর্বরতা, স্বাধিকারের নামে নিলজ্জ স্বার্থ, জাতীয়তার নামে অবাধে পরস্পরহরণ, কুটিল হিংস্র রাজনীতি মনুষ্য সমাজকে যখন পরিব্যাপ্ত করে তাকে চরম ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছিল ঠিক সেই সময়ে মনুষ্য জাতিকে, মনুষ্য সমাজকে রক্ষা করার জন্ত আবির্ভূত হলেন—আমাদের বাপুজী, বিশ্বের বিশ্বয় মহাত্মা গান্ধী! বিংশ শতাব্দীর ছিন্নমস্তা সভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াগেন কটিবাসপরিহিত অতি সহজ সরল সত্যপ্রিয় গান্ধীজী! অগণিত সেনাপাহিনী, মেসিনগান, কামান, বিমান পশুবলের সমস্ত কিছুই গান্ধীজীর অদৃশ্য শক্তির কাছে মাথা নত করলো। বিধ্বংসনের মানস

জগতে মহাত্মাজীর তাই মৃত্যুঞ্জয় প্রতিষ্ঠা! মহাত্মাজীর হস্তে অস্ত্র নেই, সৈন্য নেই, পশুবলের কোন শক্তিরই তাঁর নেই। তথাপি তাঁর কাছে বারে বারে পশুশক্তি মাথা নত করে! একি আশ্চর্য্য! সন্মোহনী শক্তি, এ শক্তির উৎস কোথায়? এ শক্তির উৎস তাঁর আত্মিক বল, সত্য, প্রেম ও অহিংসা। মানুষের অধিকার ও মর্যাদাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন সকল অত্যাচার অবিচারের হিংসাহীন প্রতিরোধের উপর। রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর অভ্যুদয় এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক ঘটনা। স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠার জন্য নিজে মৃত্যু বরণ করব তবু শত্রুর গায়ে অস্ত্রাঘাত করব না, শত্রুকে হিংসা করব না; মরিয়াও জয়ী হব, এই রকম আদর্শ জগতের কোনও রাজনীতিবিদ এত বিস্তৃত ক্ষেত্রে এত দীর্ঘকাল ধরে পালন করতে পারেন নি। সকল সংগ্রামে তাঁর প্রধান অস্ত্র 'সত্যগ্রহ', অসহযোগ আন্দোলন, রাগহেব বিবর্জিত অহিংসা চল্লিশের নিজস্ব প্রতিরোধের সমর্থনী। ভারত ও বিশ্বের কল্যাণের জন্য গান্ধীজী চিন্তাশক্তি, চারিত্রিক সংঘম ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে বার বার এই অহিংসা নীতিই প্রচার করেছেন। রাজনীতির প্রচলিত পন্থার সঙ্গে

অহিংসা ও সত্য ধর্মকে যুক্ত করে জগতে স্বাধীনতা ও স্বাভাব্য লালভের এক অভিনব পথ তিনি উৎপাদিত মানব সমাজের সমুখে খুলে দিয়েছেন। এই অহিংসানীতি শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তিনি এই অস্ত্র ব্যবহারে আমাদের বার বার পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রমিককে তিনি বলেছেন তাদের বিরাট আত্মশক্তিকে উপলব্ধি করতে, সেই শক্তিকে জাগ্রত করে তুলতে। তাঁর মতে এই চেতনা যেদিন শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে সেইদিনই ধর্মের শোষণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। বিগত ত্রিশ বছর ধরে তিনি আত্মশক্তিকে কেন্দ্র করে অহিংসা ধর্মকে আদর্শ করে রাষ্ট্রিক, আর্থিক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অপরিমেয় মহত্বের আকর্ষণে সমগ্র জাতিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের শুধু স্বাধীনতা অর্জন করা হয় নি, মহাবাহু ও মহৎ পুনঃপাতি করার প্রেরণা এসেছে। সত্য ও অহিংসার একনিষ্ঠ সাধক মহাত্মাজী যে সাধনার হোমানসে আজীবন আপনাকে তিলে তিলে আহুতি দিয়ে তাঁর তপস্রাপ্ত জীবন উৎসর্গ করলেন আজ তাঁর দেহাবসানের পর তাঁর সেই সাধনা কি ব্যর্থ হবে? অসম্ভব! আমরা যারা তাঁর উত্তরাধিকারীতার "জ" হাত দিয়ে তুলব ধরে তোমার জয় শঙ্খ।"

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

৩০শে ভাদ্রয়ার সন্ধ্যায় মহাত্মাজীর মৃত্যু সংবাদে সমস্ত দেশ ক্ষুব্ধ ও স্তব্ধ। পরদিন সকালে সাধারণ সব কাজ আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত না মহাত্মাজীর নম্র দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল ততক্ষণ সমস্ত ভারতবর্ষ ধ্যান নিমীলিতের মত এক মনে তাঁহারই বিষয়ে চিন্তা করিল। শনিবার সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময়ে মহাত্মাজীর শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর দেশের সকল লোক নদীর পাশ হইতে শোকাক্ত হৃদয়ে আনত মস্তকে ফিরিয়া আসিল।

সরোজনলিনীর আবাসিক ছাত্রীবৃন্দ শনিবার সন্ধ্যায় পবিত্র কালীবাটের গঙ্গার তীরে মহাত্মাজীর আত্মার তর্পণ করিয়াছিল। সোমবার সকালে স্কুলের সময় সকলে একত্রিত হইলে শ্রীযুক্তা সূজাতা রায়ের নেতৃত্বে একটি সভা হয়। সেই সভায় মহাত্মাজী সম্বন্ধে পাঠ হয় এবং সঙ্গীত ও রামধুন কীর্তন হয়।

পরের দিন সকালে বালিগঞ্জস্থিত অজ্ঞাত ছাত্রী প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হইয়া সরোজনলিনীর ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ মহাত্মাজীর চতুর্থী উদ্‌যাপন করিলেন। এই সভায় ডাঃ কালিদাস নাগ পোরোহিত্য করেন এবং সঙ্গীত ও রামধুন কীর্তন হয়।

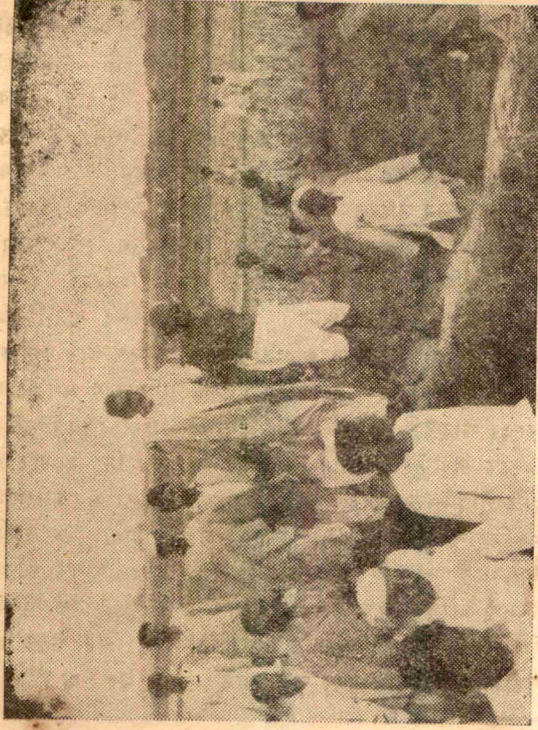
আটদিন পরে আবার সরোজনলিনীতে মহাত্মাজীর স্মরণার্থে একটি সভা হয়। বালিগঞ্জের নানা মহিলা সমিতি ইহাতে যোগদান করেন। শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্তী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী অতি মনোরম ভাষায় মহাত্মাজী সম্বন্ধে নানা কথা বলেন।

১২ই তারিখে সরোজনলিনীর আবাসিক ছাত্রীরা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর সহিত একত্রে হবিষ্য পালন করিবেন কথা ছিল, কিন্তু সেদিন অনেকেই ব্যাধাকপূরে মহাত্মাজীর তপ্ত বিসর্জন উপলক্ষ্যে চলিয়া যাওয়াতে অল্পসংখ্যক পূরোহিত্যের পরের দিন করা স্থির হয়। নির্দিষ্ট দিনে সকলে একত্র হইয়া হবিষ্যায় আহার করা হয় এবং শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী মহাত্মাজীকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা ও বক্তৃতা করেন। সভাটি অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল।

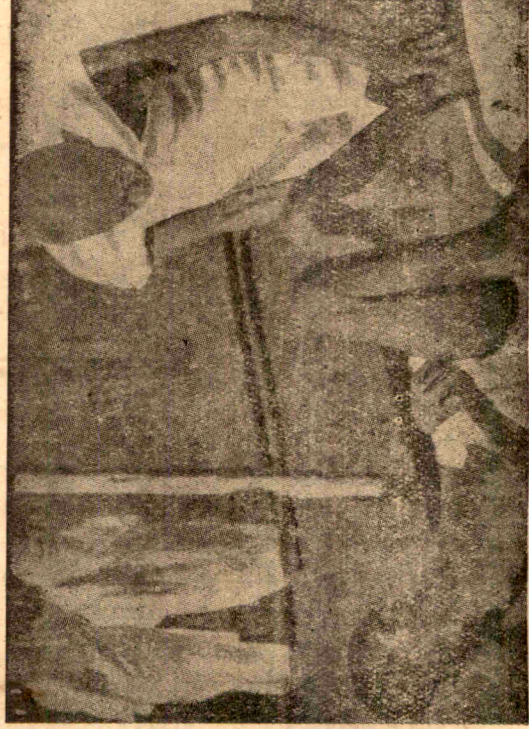
সরোজনলিনীর ছাত্রী, শিক্ষক ও পরিচালকবৃন্দ মহাত্মাজীর হরিজন ভ্রমবিলের জন্য ছোট বড় সকল প্রকার দান সংগ্রহ করিয়া ১০১ বাংলা দেশের গভর্ণর শ্রীযুক্ত রাজাজীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই দানে মূল্যবান বালিকা শিক্ষায়তনের ছাত্রীরা ৫০০ দিয়া সরোজনলিনীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।



লবণ আইন ভঙ্গের জয় ডাঙী যাত্রা



বিহারের দাঙ্গা বিদ্রোহ অঞ্চল (শিক্ষক পত্রিকার সৌজত্রে)



মহাত্মা কুষ্ঠ রোগীর সেবা করিতেছেন।

বঙ্গলক্ষ্মী

২৩শ বর্ষ

চৈত্র-১৩৫৪

৫ম সংখ্যা

লৌহ-দ্রুতিক্রম অপনোদনের উপায়

জীনগেশ নাথ রক্ষিত

অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বরে আমি ইয়োরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া আসি। আমার এই ভ্রমণ বিলাত বিহার বা জার্মানির অভিবাসন নহে। আমি এই পরিণত বয়সে গিয়াছিলাম দেশের ও দেশের একটি গুরুতর অভাব মিটাইবার পথ করিবার উদ্দেশ্যে। অতএব আপনারা আমার নিকট হইতে কোন সরাসরি ভ্রমণকাহিনী পাইবেন না, নিরস গুরুতর এক সমস্যা সমাধানের বিষয় জানিতে পারিবেন মাত্র।

ভারতবর্ষ বর্তমান যুগে দারুণ লৌহ সরবরাহের অভাব ভোগ করিতেছে। প্রত্যেক ভারতবাসী এই লৌহের দারুণ দ্রুতিক্রমের স্বপ্ন দেখিতেছে। ইহার প্রধান দুইটা কারণ, একটি বিলাতি লৌহসম্ভারের রপ্তানীর হ্রাস এবং অপরটি ভারতের লৌহ প্রস্তুতের কারখানার এবং উৎপাদন শক্তির স্বল্পতা। লৌহ ও ইস্পাতের অভাবে যাবতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, লৌহ ঢালাই প্রতিষ্ঠান এবং কলকল্যাণ নির্মাণ করিবার কারখানা সব বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। দেশের পক্ষে ইহাতে যে ক্ষতি নিত্য হইতেছে তাহার গুরুত্ব ও পরিমাণ তাঁহারাই কেবল পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যাহারা এই কাজের কাজি বা ব্যবসায়ী।

আজ ভারতে অর্ধ উৎপাদিত লৌহ অর্থাৎ “সেমিজ”, “বিলেট”, পিগ আইরন” ইত্যাদির অত্যন্ত অভাব হইয়াছে।

এই সব দ্রব্যের অভাবে নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদিত হইতেছে না। এই ‘সেমিজ’, ‘পিগ আইরন’ ও ‘বিলেট’ আদি উৎপন্ন না করিতে পারিলে আমাদের দেশের শিল্প উৎপাদন শক্তি কিছুতেই বৃদ্ধি পাইবে না। আমাদের পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। লৌহ ইস্পাত না উৎপাদন করিতে পারিলে অত্যন্ত কোন শিল্প উৎপাদনের পথ সূগম হইবে না।

এই ‘সেমিজ’ আদি কাঁচামাল উৎপাদনকারী কল কলার সম্মানে আমি ইয়োরোপ ইংলণ্ড, জার্মানী, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড আদি নানা দেশে গিয়াছিলাম। ভারত সরকারই এই অভিযানের প্রধান উৎসাহদাতা। তাঁহাদের অনুরোধ এবং সহযোগিতা ও সুরক্ষা প্রদানের ফলেই আমি নির্বিঘ্নে এই দুরূহ কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাকে প্রায় বিশ হাজার টাকাও ব্যয় করিতে হয়। আমি বহু কল কারখানা নানা দেশে দেখিয়াছি; তাহার মধ্যে সর্বাধিক ও সর্ব উৎকৃষ্ট কল কারখানা দেখিয়াছি জার্মানিতে। কি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ও শিল্প উৎপাদন শক্তি সম্পন্ন এই জার্মান জাতি। ইহাদের ধ্বংস-শিল্প-সৃষ্টি জগতের অপূরণীয় ক্ষতি। যে সমস্ত কল কারখানা আমি দেখিয়াছি তাহার বিবরণ ও বর্ণনা প্রদান করা অনেক সময় ও স্থান সাপেক্ষ। আমি কেবল যে ৫১৬ টি কল কারখানা ভারতের উপযোগী এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিষ্টায়

ভারতের প্রাপ্য তাহারই উল্লেখ করিব। মোট ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যের তালিকার ভারত মাত্র ২২ অংশ পাইবে।

আমি জাৰ্মানীতে যে উৎকৃষ্ট, সম্পূর্ণ, আধুনিকতম লৌহ ইস্পাত প্রস্তুত করিবার কল কারখানাটি ভারতের জন্ত পছন্দ করিয়াছি এবং বার্লিনের ট্রেড ডেভেলপীং অফিসারের পরামর্শে ভারতে আনিবার অস্বাভাবিকতাই পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার কথা প্রথমে বলিব। এই কল কারখানাটি সর্বোৎকৃষ্ট ভাল কার্যকারী অবস্থায় আছে। এই কারখানা যদি ভারতে আনিয়া স্থাপন করা হয় এবং উৎপাদনের জন্ত চালু করা হয় তাহা হইলে প্রতি বৎসর ৩,৫০,০০০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করিতে পারিবে। ইহাই ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট বৃহৎ লৌহ কারখানায় পরিণত হইবে। আমি নিজে এবং বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা পরিদর্শন করাইয়া বুঝিয়াছি এই কারখানা অতি উচ্চাঙ্গ এবং নব পরিকল্পনার “স্টীল প্ল্যান্ট।” এই কল কারখানাটি সমগ্র ভাবে ভারতে আনিয়া একটি লৌহ উৎপাদন কারখানা স্থাপনের জন্ত ভারত গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছি।

এখন এই কারখানা স্থাপন করিবার স্থান নির্বাচন প্রথমে করিতে হইবে। আমি অবগত হইয়াছি যে জাৰ্মানী হইতে কারখানাটি আনিতে সেখানকার লোকেরা এবং বৃটিশ সরকার ভারত সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে। সমস্ত এই কারখানা স্থাপন ও চালু করিতে হইলে কারখানাটি বর্তমান জিম্মায় পানাগড়ে স্থাপন করিবার জন্ত ভারত সরকারকে সুপারিশ করিয়াছি। পানাগড়ে লৌহ কারখানাটি বসাইবার অনেক সুযোগ ও সুবিধা দেখা যায়। প্রথমতঃ কারখানাটির জন্ত অন্ততঃ পাঁচ হাজার মাইল উন্মুক্ত ভূমি চাই। সে পরিমাণ স্থান ভারত সরকারের নিজের কবলে পানাগড়েই আছে। পানাগড় ই, আই রেলের প্রধান পথের উপরেই অবস্থিত। কলিকাতার মতন প্রধান বন্দরের নব্বই মাইলের মধ্যে অবস্থিত। সন্নিকটে দামোদর নদ, জল পাওয়ার সুবিধা হইবে। কয়লার খনি সব সন্নিকটেই আছে, কয়লা পাওয়া বা আনা অল্প ব্যয়ে হইবে। লৌহ খনিও নিকটে নিকটে বর্তমান। দামোদরের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে হাইড্রো ইলেক্ট্রিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাইবে। নিকটেই অনেকগুলি কারখানা থাকিতে আদান প্রদানের সুবিধা হইবে। অল্প

মজুরীর সহায়ত মজুর যথেষ্ট পাওয়া পাইবে। এই কারখানার উন্নতির সহিত পশ্চিম বাংলার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে।

স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি ; তাহার সুযোগ গ্রহণে ও রক্ষায় দেশবাসীদের জীবনযাত্রার মান, স্বথ ও সুবিধা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য প্রত্যেক দেশবাসীর আশ্রয় চেষ্টা করা উচিত। দেশের শিল্প বিশেষতঃ লৌহ ইস্পাত শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি না করিলে দেশ সমৃদ্ধিশালী হইবে না, দেশবাসী স্বথ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না, রাষ্ট্রও প্রবল হইতে পারিবে না। সেই জন্ত জাৰ্মানী হইতে বাংলায় প্রধান মন্ত্রীকে আমার এই কল-কারখানাটি নির্বাচনের কথা অবগত করাই এবং যাহাতে ইহা পানাগড়ে স্থাপিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে বলি। কিন্তু বাংলা ও বাঙ্গালীর চিরাচরিত স্বভাববশতঃ এ বিষয়ে তাঁহাকে উদাসীন দেখিয়া আমি ভারত সরকারকে তার করি। সুখের বিষয় ভারত সরকারের শিল্পবিভাগে বাংলার এক স্নাতকবুদ্ধিসম্পন্ন সহকারী মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আছেন। তাঁহাকে জানান মাত্রই তিনি আমার পরিকল্পনার প্রাকৃতিক সুবিধা উপলব্ধি করিয়া কারখানাটি ভারতবর্ষে আনয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ একটি কারখানা চালাইবার এবং শিল্প পুরাদমে উৎপাদন করিবার বিশেষজ্ঞ মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার এদেশে নাই। জাৰ্মানীতে কলস্থাপন ও পরিচালনা করিবার অনেক বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারগণ এখন বেকার হইয়া আছেন। চেষ্টা করিলে তাহাদের অল্প বেতনেই ভারতে আনান যাইতে পারে।

লৌহ প্রস্তুত কল কারখানা বাতীত ছোট ছোট কুটির শিল্প উৎপাদন উপযোগী নানা প্রকার কল জাৰ্মানী, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ডে যুদ্ধের ব্যয়ের খেসারৎ বাবদ পাওয়া যাইতে পারে। তার মধ্যে মাঝারী আকারের ‘মোটর’, বাঁহা কুটির শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার খুবই সহায়ক জাৰ্মানীর সিম্যান কোং এবং সুইজারল্যান্ডের জুরিকের ট্রেড ডেভেলপিং অফিসারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

ভারতের শিল্প উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে প্রস্তুত করিবার কল কলার উপর। যে কোন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে হইলে সর্বোপরে চাই উৎপাদনের কল। আমার এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি, সর্বত্রই উৎপাদন করিবার

কল কলার চাহিদা অধিক এবং সরবরাহ শক্তি কম। আমরা যদি সব কাজেই ইউরোপের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি আমাদের ক্ষতি হইবে। শিল্পবিদ্রা এ বিষয়ে এখন হইতে মনোযোগ প্রদান করুন। আমার মনে হয় বিদেশের উপর নির্ভর করিলে আমরা শিল্পের ক্ষতি প্রসার করিতে পারিব না। অবশ্য ইহা ঠিক ও স্বাভাবিক যে আমরা প্রথমে বিদেশ হইতে কল আনা হইব। এবং তাহাই আজও করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে সব কল আমরা পাই তাহা পুরাণ চালের। আধুনিক উন্নত ও ক্ষমতা উৎপাদন শক্তিশালী কলের অভাবে আমাদের দেশের উৎপাদিত শিল্প বিদেশীয় শিল্প-সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না এবং পুরাতন কলের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যগুলি পাশ্চাত্য দেশের শিল্প অপেক্ষা কম মজবুত ও কার্যকরী হয়।

আমরা পরাধীন ছিলাম, আমাদের মনের মতন কল সংগ্রহ করিতে পারিতাম না। এখন আমাদের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন পূর্ব অপেক্ষা শিল্প উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। কেবল আমাদের চাহিদা মিটাইলে চলিবে না, দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য বিদেশেও পণ্য রপ্তানী করিতে হইবে। আমার মতে যতদিন না আমরা শিল্প উৎপাদন করিবার কলকল্লা প্রস্তুত করিতে শিখিব ততদিন আমাদের শিল্প ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইবে না, দেশ দরিদ্র হইয়া থাকিবে। আমরা পরের অন্নবৃত্তি কেবল করিব না, আমাদের যুবকদের নিত্য নূতন উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ইহার জন্য জাতীয় সরকার এবং শিল্পপতিদের বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে। কলকল্লা উৎপাদন করিতে হইলে

দুইটি জিনিষ প্রয়োজন—লৌহ তত্ত্বের গবেষণাগার ও গবেষণার প্রয়োজন (Metallurgical research in alloy and other metal) কল কলার নক্সাবিদ (Mechanical drawing) থাকা চাই। ইংলণ্ডে প্রত্যেক বড় বড় কারখানায় একটি রিসার্চ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত আছে, তথায় নিত্য নূতন উন্নততর পরিকল্পনা সৃষ্টি করিতে বিশেষজ্ঞগণ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা ই কারখানায় মাথা। তাঁহারা কেবল কলগুলির উৎপাদনীশক্তি এবং উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিয়া থাকেন। ভারতের কারখানায় চাকুরিয়াদের অবস্থা ও ব্যবস্থা অতি হীন। তাহাদের কারখানায় সমস্ত বুদ্ধি ও প্রাণ নিয়োজিত করিবার জন্য সুরক্ষা ও সুবিধা প্রত্যেক শিল্প কোম্পানীকে দিতে হইবে। তবেই অন্য চিন্তে তাঁহারা কলকল্লা ও কারখানার উন্নতি পারিবেন। ইহার জন্য প্রত্যেক কারখানায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য লাভের অংশ হইতে নির্দিষ্ট টাকা রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থার দ্বারা ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা তাঁহাদের কারখানাকে অধিকতর লাভবান করিয়া থাকেন।

উপসংহারে আমার নিবেদন এই যে, আমাদের দেশে স্বাধীনতার মর্যাদা রাখিতে এবং দেশবাসীর অবস্থা ও জীবন যাপনের মান বৃদ্ধি করিতে হইলে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া শিল্প উৎপাদন বিষয়ে লৌহ ও ইস্পাত করিবার জন্য মন দিতে হইবে। ইহার ক্ষমতা সর্বপ্রথমে চাই জনমত ও চরিত্র গঠন। হইতে হইবে আমাদের কর্মঠ এবং শিথিল হইবে সত্যতা। আশা করি জাতীয় সরকার দেশ নেতাগণ, ও সাংবাদিকগণ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিবার চেষ্টা অচিরেই করিবেন।

সময় আগত শ্রীক্ষণপ্রভা ভাঙ্কড়ী

একধারে দেশের সর্বত্র দেখি ;

বিরাট নারীর সংখ্যা জাগ্রত শিক্ষিত ।

ভাদের গৌরব গাথা; অসামান্য কৃতিত্বের

সর্ব সফলতা ;

জীবন সময়ে জয়ী মুক্ত প্রাণ

ছিন্ন অধীনতা ;

শক্তিমতী নারীত্বের পূর্ণ প্রকাশ,

প্রশংসায় উদ্বেলিত বর্তমান যুগের আকাশ ।

সমাজের শাৰ্ধদেশে অন্বেষিত জয় পত্রি

আজি উত্তোলিত ।

সনাতন সমাজের রক্তচক্ষু ক্রুদ্ধ বিস্ফারিত ।

ক্ষুদ্র গভী গৃহের সীমানা ;

তারি মাঝে নিঃশোধিত হয়নি তাহার সত্তা ;

তারও প্রয়োজন আছে মুক্ত আলো

পৃথিবী প্রাঙ্গনে ।

সেই উপলক্ষি আজ সভ্য রূপে সর্বক্ষেপে

দেখি প্রতিষ্ঠিত ।

হায়,

সেই সব নয় ।

পশ্চাতে পড়িয়া আছে আরও এক

শূন্যলিত নারীর জগৎ ।

মুষ্টিমেয় নারীসংখ্যা জাগিয়াছে

সত্য স্থানিশ্চিত,

তথাপি একথা সত্য সেই সব নয় ।

বর্তমান নারী সমাজের ;

একটা বিরাট অংশ চাপা পড়ে আছে ।

অশিক্ষা অজ্ঞতা, আর আলস্যের নীচে ।

নিজেরাই রক্ষা করে নিজ অবরোধ ;

আপনার অক্ষমতা ভাবে তারা

স্বহূল্যত আভিজাত্য বোধ ।

পরকুণ্ডলায় তারা আজও পায়

আনন্দ প্রচুর ;

তারি মাঝে কর্মহীন অবসরে জাগে বিচিত্রতা

পরিভ্রষ্ট আলস্য মধুর ।

এখনও বোঝেনা এরা

আপনার মূল্য কি ? বিশেষত্ব কোথা ?

ভাইত রয়েছে মুক রয়েছে পিছনে পড়ে ;

সকলের কৃপা দৃষ্টি লাভে সঙ্কুচিত ।

আর দেৱী নয় ; এই অবসর ;

এদের জাগাতে হবে ; হও অগ্রসর ।

হে রুদ্রাণী, তুমি ডাক দাও ;

যুগান্তের অক্ষমতা অচিরে ঘুচাও ।

সঙ্কোচের অশিক্ষার সর্বব্যবধান

নিষ্ঠুর হাতে তুমি ছিন্ন করো ;

আনো, মুক্তি আলোর সন্ধান ।

অহঙ্কার জড়তার মর্মমূল

হানিয়া আঘাত ।

এদের স্ববির প্রাণে

আনো নব জাগ্রত প্রভাত ।

তখনি ত হবে সুগার্ভক ।

বর্তমান সমাজের জাগ্রত নারীর রূপ

সংস্কারমুক্ত কর্মনীতি ।

সমগ্র নারীর সত্তা বিশ্বের দরবারে নিজ

জানাবে প্রস্তুতি ।

আপনার বাক্য আর কার্য মাঝে

লভিবে প্রত্যয়

সর্বত্র রচিবে নিজ অধিকার প্রাধান্যের

বিশাল বিস্তৃতি ।

হে রুদ্রাণী তাহাদের ডাক দাও ;

আগত সময় ॥

আগ্রায় যখন গিয়েছিলুম

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

পৃথিবী ব্যাপী মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্করী মরুশূন্যে ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে ভ্রমণে বের হয়েছিলুম।

ইউরোপের সমরাদ্বন্দে তুমুল রণ দামামা বাজিয়ে চলেছে জার্মানীর পরাক্রম শক্তি। দেখতে দেখতে এসিয়া প্রান্তরে জাপানীও বীর বিক্রমে মাথা উচু করে তুললো।

শঙ্কিত ভারতবর্ষ। সতর্কতার অন্ত নেই, নিরাপত্তার অন্ত নেই,—মানুষ চাট মানুষ; সৈন্য, কর্মী;—জার্মানী এগিয়ে এল, জাপানী এগিয়ে এল। বর্বর ফ্যাসিস্ত আর নাৎসীকে রুখতে হবে। তখন-দিল্লী থেকে আগ্রা যাচ্ছিলুম। নিউ দিল্লী আর ভাইসরয় স্টেশন। সুন্দর ফুলবাগান ঘেরা সুসজ্জিত ভাইসরয় স্টেশনে একটু অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন নেই, নোংরা আর অসভ্য মানুষের ভীড় নেই, কোলাহল ও কলরব নেই—পূর্ণ মাত্রায় ভাইসরয়ের হেঁটে যাবার স্বাভাব্য ও সম্মান রক্ষা করেছে।

নিউদিল্লী ও ভাইসরয় স্টেশনের মধ্যস্থিত প্লাটফর্মে পায়-চরী করে ঘুরছিলুম। বসে, পাঞ্জাব মেল কত গাড়ী বেরিয়ে যায়, কত সৈন্ত গাড়ী, বিহারী পাঞ্জাবী বাঙ্গালী সৈনিক, নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট এর বিরুদ্ধে ওরা বীর বিক্রমে লড়াই করবে, বণিক শাসন কায়েম করবে। হ্যাঁ, ওরা নাৎসী আর ফ্যাসিষ্টদের রুখবে, ওরা ইংরেজদের শাসন কায়েম করবে।

ঘণ্টা কয়েক পর রাত্রি বারোটোর সময় আমাদের ক্রুটিয়ার মেল এল। নিশ্চিন্দীপ বাঙ্গালী দেশের প্রেত পুরীর মত বিকট অন্ধকার এদিককার গাড়ীগুলি নয়। আলোকোজ্জ্বল কামরা, যাত্রী বোঝাই হলেও বাঙ্গালী দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ফাঁকা গাড়ী বসেছিলুম। আসন পাইনি, নিজেদের বেড়িঙের উপরেই বসেছিলুম, জলের ফ্লাস্ক ভেঙ্গে প্রায় অর্ধশ্রান্ত হয়েছিলুম, তবু বলতে হবে গাড়ীর মধ্যে মাল বোঝাই হয়ে উঠতে হয়নি।

রাত্রি ছোটোর সময় আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে এসে

নামলুম। সম্রাট শাজাহানের দেশে প্রথম পদার্পণ করলুম। তখন ছিল বৈশাখ মাস, ঝিরঝিরে বৃষ্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভিজ়ে কাপড়, হাড় পর্যন্ত কঁপে উঠছে; তবু তাজমহলের দেশে নেমেছি সেই স্বথের মোহে বিজ়োর হয়েছিলুম। সেই মধুর স্বপ্নেই আচ্ছন্ন হয়ে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু এক বিচিত্র অহুভূতির স্বচ্ছন্দ নিদ্রার মধ্যে ওয়েটিংরুমে অতিবাহিত করলুম।

পরদিন সকালবেলা টাঙ্গা ভাড়া নিয়ে সহরের দিকে রওনা হলাম। শিল্পী শাজাহানের দেশ, কল্পনা করেছিলুম তার এক রূপময় সুন্দর শোভম সজ্জা;—কিন্তু দেখলুম অত্যন্ত সাধারণ প্রাচীন সহর; সক্ষীর্ণ অপরিচ্ছন্ন রাস্তা দোকান বাজার এবং পুরাতন জীর্ণ ঘর বাড়ী দুই ধারে রেখে আমাদের টাঙ্গা চলতে লাগলো। মাইল খানেক পথ অতিক্রম করে Calcutta Hotelএর সামনে এসে গাড়ী থামল। ছোট দ্বিতল একখানা বাড়ী এই Calcutta Hotel; প্রতিদিন প্রতিঘর দুই টাকা ভাড়া, কিন্তু স্থান অভাবে আমরা জায়গা পেলাম না।

শেষ পর্যন্ত আরও খানিকটা এগিয়ে এসে আগ্রা ফোর্ট স্টেশনের ঠিক সামনে মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠিত এক ধর্মশালার আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

আশ্রয় বই কি! ধর্মশালা যেন পুণ্য সঙ্ঘের প্রতীক; এক তলা বড় বাড়ী, চতুর্দিকে ঘর আর রানান্দা, কেমন একটু গোলাক ধাঁধার সৃষ্টি করে। ঘরগুলি যেন অন্ধকূপ হত্যার কক্ষ, মাথা নীচু করে ভেতরে ঢুকতে হয়, জানালার কোনও উৎপাত নেই।

প্রথমে ভেতরে পা দিয়ে মানুষ এবং মাছিকে চিন্তে পারি নি। কেবা মানুষ, কেবা মাছি! মাছিতে মানুষে একাকার বাড়ী, উত্তর পক্ষ যেন প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে কিলবিল করছে।

তবুও আশ্রয় লাভের একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভেবে-
ছিলুম, একবার স্নান, বার কয়েক খাওয়া, আর একটু শান্তি
ও স্বথের নিভ্রা ছাড়া এই অন্ধ কূপের সঙ্গে আমাদের কিসের
বা প্রয়োজন? কয়েকটা দিন নির্বিঘ্নেই কেটে যেতে পারবে।
সময়ের অপব্যবহার করে কোথায় হোটেল খুঁজে বেড়াই?
কিন্তু ভাগ্যটাই ছিল সেদিন আমাদের প্রতিকূলে; বিরাট ভুঁড়ি
সহ এক মাদোয়ারী আমাদের জানিয়ে দিলেন, “সন্ধ্যার মধ্যে
ধর্ম শালা ছাড়তে হবে, ঘণ্টা আটকের বেশী আশ্রয় লাভের
নিয়ম নেই”।

সন্ধ্যার পর নিকটেই কক্ষ হোটেলের একখানা ঘর পেলাম।
প্রত্যেক দিন ঘর বাবদ ভাড়া দশ আনা, এ ছাড়া খাটের
পিছু একআনা দিতে হয়, লাইট চার্জ আলাদা, খাবার
ইচ্ছেমত নেওয়া যায়। তবে ধর্মশালার ব্যবস্থায় এক
দোকানের সঙ্গে আমরা বন্দোবস্ত করেছিলুম। একজনের
উপযোগী মোটা ও রান্না চালের ভাত, জলবৎ ডাল ও একটা
অখাদ্য তরকারীর জন্ত বারো চৌদ্দ আনা দিতে হয়।

কেরোসিন তেল এবং চিনির জ্বলভতা ছাড়া, যুদ্ধের প্রভাব
যুদ্ধপ্রদেশে বিশেষ অমুভব করতে পারিনি। মাহুঘের
নিশ্চিন্ত জীবন যাত্রা; তখন ও সাজো সাজো রব শুরু হয়নি।

দিল্লী পাঞ্জাবের তুলনায় টাঙ্গা ভাড়া অনেক কম, এবং
বান বলতে একমাত্র ওই টাঙ্গা।

আগ্রা কোর্ট আগ্রার অন্ততম দ্রষ্টব্য স্থান। সকাল
আট-টা থেকে দশটা এবং বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা
পর্যন্ত দর্শনের সময়। সুউচ্চ রান্না প্রাচীরে বেষ্টিত এই দুর্গ,
দিল্লী এবং অমর সিং তোরণ অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ
করলুম। মুসলিম ইতিহাসের কত আনন্দ ও বেদনা স্বস্তি
বিজড়িত এই প্রাচীন দুর্গ, দরবার কক্ষ, অর্থাৎ দেওয়ানি
আম ও দেওয়ানি খাশ দেখে আমরা অন্দর মহলের দিকে
এগিয়ে গেলুম। হীরামণিক জহরতের চিহ্ন, ঝলমলে
ঐশ্বর্যের পরিচয় আজ অবলুপ্ত হলেও শিল্পনৈপুণ্য ও স্থাপত্য
বিদ্যার দিক থেকে এই দুর্গ যে কত উচ্চাঙ্গের ছিল প্রাচীরের
গায়ে গায়ে পাথরের বিচিত্র কারুকার্য, জাকরী ইত্যাদির
মধ্যে তারই প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন পাওয়া যায়।
আহাদীর মহলে সম্রাট আকবরের হিন্দুসম্প্রদায়ের পরিচয়
কিছু কিছু রয়েছে। তাঁর হিন্দু স্ত্রী রাণী বোধবাজীর কক্ষে

প্রাচীরে মার্বেলমণ্ডিত মেঝেতে শিল্পকলাগুলি হিন্দু
ভিজাইনে অঙ্কিত। নূরজাহান, সম্রাট শাজাহান, জাহানারা
এঁদের বিরাট মহলগুলির মধ্যে বিরাট কক্ষ ও একটা
নিঃসঙ্গ শূন্যতার অব্যক্ত রিক্ততা ছাড়া আর কিছু অমুভব করা
যায় না। স্নানঘর অর্থাৎ চামেলীমহলে সম্রাট দম্পতির
স্নানবিলাসের পরিচয় অতীতের ভগ্ন গরিমায় মূর্ত হতে
রয়েছে। ঠাণ্ডা ও উষ্ণ জল, গোলাপ জল ও আতর প্রভৃতির
বিচিত্র স্নানরপাথরের ফোয়ারা। চৌবাচ্চা, বসিবার আসনের
আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন। এইখানে শাজাহান ও মমতাজ এক
সঙ্গে স্নান সমাপন করতেন।

শিবমহলটি স্নানর। কারুকার্য স্নানর, প্রাচীরের গায়ে
গায়ে রং বেরঙের অসংখ্য আয়নার টুকরো খচিত, প্রতিটি
কাঁচে প্রতিবিম্ব এক সঙ্গে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। অন্ধকার
ঘরে রক্ষক মশাল জ্বালানো,—রত্নিন কাঁচগুলি ঝকঝক করে
উঠলো।

ফেরবার মুখে সম্রাট শাজাহানের বন্দীকক্ষের সম্মুখে
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম, তৎখবিজড়িত এই কক্ষ! হায়রে বন্দী
শাজাহান, এই কক্ষেই তুমি তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে
নিয়েছিলে, মৃত্যুই তোমার অভিশপ্ত বার্কাক্যকে মুক্তি দান
করেছিল।

ঘণ্টা বেজে উঠল; সময় উত্তীর্ণ হয়েছে, দুর্গ পরিভ্রমণ
করতে হবে। গাইড দেওয়ালে খচিত এক টুকরো কাঁচ
দেখিয়ে বললো “এর নাম পেণ্টি গ্লাস, বন্দী শাজাহান এর
মধ্যে দিয়ে প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতিসৌধ তাজমহল দর্শন
করতেন।”

শুনলাম বিচিত্র সে আয়নার কৃতিত্ব—এক টুকরো কাঁচ,
তবু তার ভিতর দিয়ে তিন মাইল দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ
তাজমহল দেখতে পাওয়া যায়।

* * *

তাজমহল আমি প্রথম দেখলুম। তবু বিষয়ে অভিভূত
হয়ে পড়িনি, আনন্দে বা বেদনায় দিশেহারা হইনি, সম্রাটের
প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতিসমাধি দেখে উচ্ছসিত হয়ে উঠিনি—
বরং তাজমহল দর্শনের যে একটা স্বপ্ন ছিল মনে, তা
বাস্তবে পরিণত হয়ে যেতে একটু ক্লান্তি অমুভব করলুম।

প্রকাণ্ড তোরণ দ্বার অতিক্রম করে একদিকে মিউজিয়মে

রক্ষিত কতকগুলি ভাজের ছবি দেখে গাছপালা সজ্জিত রাজা সুরকী চালা পথ বেয়ে এগিয়ে গেলুম। দুই ধারে লাল রঙের মসজিদ ও অতিথিশালার মধ্যে সুন্দর উদ্যান পরিবেষ্টিত মন্দিরে রচিত শুভ তাজমহলের দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম।

সম্রাট শাজাহান একদিন প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতিরক্ষার্থে এই সমাধি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জানি না সম্রাট শাজাহান, তুমি আদর্শ প্রেমিক ছিলে কিনা। আমি মনে করি তুমি উচ্চাঙ্গের শিল্পী ছিলে। শিল্পী প্রতিভার অন্তর প্রেরণায় উদ্ভূত হয়ে এই বিখ্যাত তাজমহল তুমি সৃষ্টি করে গিয়েছ। সৃষ্টির উন্মুখ প্রেরণায় যে সৃষ্টি বিকাশ লাভ করে তা শাশ্বত সত্য, চির অমর ও চির সুন্দর। তাই বিশ্বের দরবারে তাজমহল অন্ততম শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে।

সত্যি এই প্রসিদ্ধ তাজমহল শিল্প নৈপুণ্যের দিক থেকে অতুলনীয়। চতুর্দিকে ফটিক স্বচ্ছ মিনার, দুই ধারে ও মধ্যে প্রকাণ্ড গম্বুজ, অলিন্দ, মন্দিররচিত বিচিত্র কারুকার্য বিশ্বয় মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে সমাধি সৌধ প্রাক্ষনে প্রবেশ করলুম।

অপরূপ কলা নৈপুণ্য স্মৃতি সমাধির প্রাঙ্গনকেও বিভূষিত করেছে, মন্দির রচিত বিচিত্র কারুকার্য খচিত জাফরী, অপূর্ব শিল্প সজ্জা, সুস্নিগ্ধ সৌরভে আমোদিত কক্ষ শুভ পাথরের বেদীতে সম্রাট ও সাম্রাজ্যের স্মৃতি সমাধি, প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে, সুগন্ধী স্মৃতি প্রদীপ জ্বলছে। বাইরে বেরিয়ে এসে সমাধি সৌধের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলুম। কত হাজার হাজার শ্রমিকের শ্রম তাজমহলের মন্দিরে অমর হয়ে রয়েছে, কত কোটি মুদ্রার পৃথিবীর এই অন্ততম শ্রেষ্ঠ শৌধ রচিত হয়েছে।

তাজমহল শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে সত্যি ভারতবর্ষের গৌরব। তাজমহলের প্রান্তে শীর্ষা যমুনা নদী প্রবাহিত, ক্ষীণাঙ্গী যমুনা। ইতিহাসবিখ্যাত যমুনার কালো জল কাদায় ঘোলা হয়ে উঠেছে। কয়েকজন রজক তখন কাপড় পরিষ্কার করছিল। তাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান বলে কোন জিনিষ কলনার ও অতীত বোধ হয়।

আগ্রায় আরও কয়েকটি সমাধিসৌধ আছে। সম্রাট

আকবরের সিকান্দ্রা, নুরজাহানের পিতার ইতমদৌল্লা প্রভৃতি। একদিন দয়াল বাগ দেখতে গেলাম। মাইল তিন চারেক দূরে অপেক্ষাকৃত নির্জন পরিবেশে এই দয়ালবাগ অবস্থিত। দয়াল বাগ অর্ধে ঈশ্বরের বাগান। সুন্দর আদর্শ, সুন্দর তার পরিকল্পনা। প্রেম, শ্রুতি ও বিদ্যা নগর এবং সংসদ হল, রাধাস্বামী Educational Institute প্রভৃতি নিয়ে মাইল কয়েক জায়গার মধ্যে গঠিত কলোনী যেন মানুষের সুন্দর জীবন যাত্রার পূর্ণ প্রতীক। বিদ্যা ও শ্রুতি নগরে Model Industries এর পরম বিকাশ লাভ ঘটেছে। বস্ত্র, চর্ম টিন প্রভৃতি শিল্পভবন গুলির কাজ পূর্ণোত্তমে চলেছে। সাবান তেল, পাউডার প্রস্তুত হচ্ছিল। দেশ বিদেশে রপ্তানী হয়ে যায়, দয়াল বাগের বিপনী গুলিতে শূজালার সঙ্গে বিক্রয় কাজটি সমাধান হয়। চর্ম শিল্প ভবনটি তখন যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ভার গ্রহণ করেছিল। ভাই ওই বিভাগটি দর্শকের দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। ডায়ারী ফর্ম গুলিতে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে যি মাখম ইত্যাদি ধরে ধরে প্রস্তুত হয়, একটু ভেজাল নেই, খাঁটী জিনিষ। শিল্প ভবন ও কারখানার কর্মী ও শ্রমিকরা শ্রমের যথাযোগ্য পারিশ্রমিক ও মর্যাদা পেয়ে থাকে। পরিবার সহ তাদের এই নগরেই বাস করতে হয়। দয়ালবাগের শিল্প ভবনের মূল আদর্শ মুনাকার চেয়ে বড় কথা শ্রমিক ও কর্মীদের সুন্দর ও সুস্থ জীবন যাত্রা। ধর্ম চর্চা, ধর্ম আলোচনা, আধুনিক রুচি সম্মত প্রথায ঈশ্বর বন্দনা এই দয়ালবাগের বাধ্যতামূলক কার্যসূচি।

প্রকাণ্ড সংসদ হলটি অনেকটা ইংরেজদের চার্চের উপাসনা কক্ষের মত। প্রত্যেকদিন সকাল ও সন্ধ্যায় প্রত্যেক নর নারীর সংসদ হলে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বর বন্দনায় যোগ দান করতে হয়। প্রেম বিদ্যালয়ে মেয়েরা এবং রাধাস্বামী বিদ্যালয়ে ছেলেরা পুস্তকগক বিদ্যা অর্জন করে। আমরা যখন গিয়েছিলুম বিদ্যাভবনগুলি ইন্টার মিডিয়েট শ্রেণী পর্যন্ত ছিল উন্নতির আয়োজন চলছিল। অর্থকরী এবং কর্মকরী শিক্ষা আপন রুচিমত অর্জন করতে হয় এবং তা একান্তই বাধ্যতামূলক। ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলকে এই নগরে বাস করতে হয়। এ ছাড়া প্রেম নগর নামীয় নগরটিতে রিটার্ড অফিসার প্রকেষর প্রভৃতি বিদ্বান ও সুদীদল সত্যকার জ্ঞান

আনন্দ ও স্বাধীন বন্দনার মধ্যে জীবনের উদ্ভূত দিনগুলি অবসান করতে আত্মীয় পরিজন সহ স্থায়ী বসবাস করছেন।

আমাদের বর্তমান জীবন যাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত স্বথ স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে যেয়ে মানুষ অত্যন্ত আত্ম কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এইদিকটা ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ ছাড়া বাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্যে আত্মরক্ষা করতে হয়—, সাংস্কৃতিক দিকটার সঙ্গে তাদের কোনওই যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়না।

দয়ালবাগ যেন সংস্কৃতির মূর্তি প্রতীক। মার্জিত রুচি সম্মত জীবন যাত্রা সহজ ও স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশের মধ্যে সাব-লীল সৌন্দর্যে, High thinking and plain living এর আদর্শ রূপ পরিগ্রহ হয়ে উঠেছে।

দয়াল বাগ কলোনির মধ্যে থানিকটা দূরে, রাধাস্বামী স্মৃতিমন্দির “স্বামীবাগ”; মন্দির তখনও সমাপ্ত হয়নি। আধুনিক রুচি সম্মত পরিকল্পনার মধ্যে মন্দিরটির নির্মাণ কার্য চলছিল। জব্বলপুরের ধবধবে সাদা পাথর ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত, শ্রমিক ও কর্মীরা পূর্বোদ্যমে কাজ করছে, স্থান শিল্প কার্যের অপূর্ণ নৈপুণ্যের মধ্যে মন্দির রচিত এই “স্বামী বাগ” মন্দির একদিন অতুলনীয় সৌন্দর্যে আত্ম প্রকাশ করবে। দ্বিতলের অর্ধ নির্মিত সিঁড়ি বেয়ে আমরা উপরে গেলাম। কারুকার্য খচিত সুন্দর প্রাচীরবেষ্টিত মাবেলমণ্ডিত কক্ষের মধ্যস্থলে রেশমী চাঁদোয়ার তলে রত্নিন একটি বস্ত্রের আচ্ছাদনে স্বামীজির পবিত্র সমাধি রয়েছে। অর্থাৎ দেহ ভস্মাবশেষের একটুকু ছাই ওই স্থানে প্রোথিত হয়েছিল। জানিলাম, রাধাস্বামীর মূর্তি নিখিত হবে। বাজলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের তীর্থ স্থান ও ধর্ম মন্দির গুলিতে দেখতে পাই—, পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটি রুচিবোধ এবং ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার একান্তই অভাব। এই সব মন্দিরে মন্দিরের দেবতার আদর্শ রক্ষার চেয়ে ধর্মের নামে কুসংস্কার অজ্ঞতা কম কমতার অপব্যয় না ঘটে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। আধুনিক রুচি সম্মত প্রণালীতে মন্দিরের পরিকল্পনাই হিন্দুর কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে যথার্থ সম্মানীয় করবে। মহামানব শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ আমাদের জীবনে কাঙ্ক্ষাকরী করে তুলতে হবে—এমনি বাদের নামে মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় তাদের আদর্শকে সমস্ত পরিবেষ্টনীতে পরিষ্কৃত করে তুলতে হবে। তবেই মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা যথার্থ সাধকতা লাভ

করবে। এক কথায় বলতে গেলে এই দয়াল বাগ কলোনি জাতীয় জীবনের কল্যাণের প্রতীক, মঙ্গলের মূর্তিমতী রূপে ইহা মৎস্তর খেরনার জীবনকে উদ্ভূত করে, নব নব ছন্দে রূপায়িত করে তোলে।

মনে বেশ একটা তৃপ্তি জনক আনন্দ নিয়ে আগ্রা ফোর্ট স্টেশন হয়ে আগ্রা টুওলা প্যাসেঞ্জার চড়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে টুওলা স্টেশনে এসে পৌছেছিলুম।

তখন বেলা পাঁচটা বেজেছিল, রাজি বারোটার আমাদের গাড়ী; কুলি জিজ্ঞেস করলো, “ওয়েটিং রুমে মাল পত্র রাখবে কী—”?

না বাপু, ওয়েটিং রুমের ওই ইট কাঠের স্তূপ— চেয়ার টেবিলের সম্ভ্রা ভালো লাগে না। ভালো লাগে না মেয়েলি গল্পের ফাঁদের রসালো আলোচনার জমে উঠতে; অসহ। প্লাট ফর্মের নিরীলা এক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন নিজ নিজতার মধ্যে দূর দূরান্ত ভ্রমণের কথাই ভাবতে ভাল লাগছিল। ইঠাৎ কার যেন কণ্ঠস্বরে আমেজমধুর চিন্তাতন্ত্রী ছিন্ন হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলুম করেকজন তরুণ যুবক আমার সামনে দাঁড়িয়ে, মিলিটারী পরিচ্ছন্ন তাঁদের। “আমাকে কিছু বলছেন আপনারা”? একটি ছেলে বললো—“আপনাকে যেন কলকাতায় দেখেছি মনে হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই কোলকাতায় থাকেন”।

“দেখে থাকবেন”, আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করলুম—“আপনারা বুঝি মিলিটারীতে নাম দিয়েছেন? নিশ্চয় ছাত্র ছিলেন? কোন্ পন্থা? নিশ্চয়ই ক্যাসিষ্ট বিরোধী পন্থা। জাপানকে রুখবেন—”?

ছেলেগুলি একসঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে একজন একটু ত্রিমাণ কণ্ঠে বললেন—“কলেজে পড়ছিলাম সত্যি, যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হয়েছিলাম, কোনও পন্থা হবার আমাদের সৌভাগ্য হয়নি। তবে স্বপ্ন, আদর্শ অনেক কিছুই ছিল” বলতে বলতে ওঁর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল, থেমে গেলেন। ওঁর কথা শেষ করে আর একজন বললেন, “কিন্তু পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধের এই তাণ্ডব নৃত্যে ও অন্ন সমস্তায় সব কিছু ভূমিসাৎ হয়ে গেল—, গরীব ইস্কুল মাঠার আর কেরাণী বাপের ছেলে আমরা, কটির মীমাংসা করতে যেয়ে পড়ার খরচ বন্ধ হয়ে গেল, উপরন্তু সংসার অচল—; যুদ্ধের লোভনীয় ডাকে সাড়া না দিয় আর কী করি—? বণ্ডে স্বাক্ষর করেছি—, ট্রেনিঙে বেরিলি চলেছি—। কী বলব আমি? নিরস্তর রইলুম—দেশের দারিদ্র্য, কংগ্রেসের আদর্শ ক্যাসিষ্ট বিরোধী আন্দোলন সব মিলিয়ে আমার চিন্তাকে ভারাক্রান্ত ও জটিল করে তুলেছিল।

আধুনিক জীবনযাত্রা

শ্রীশাস্তা দেবী

সভ্যতার ক্রমবিকাশ মানব জাতির উন্নতির জন্তই। তবে আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখি যে সভ্যতার নবতম আবিষ্কার সমূহের ফলে মানবজাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব পথ হইতে মানুষকে ফিরাইবার মত শক্তি মানুষের মধ্যেই জাগিবে এই আশা মনে লইয়া আমরা এখনও ভাবি যে এই ধ্বংসলীলাও আমাদের স্থিতি ও স্থিতির নূতনতর পথ দেখাইয়া দিবে। আনবিক বোমার মারণ লীলা সভ্যতার চরম অভিলাপ রূপে এখন আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে বটে, কিন্তু সভ্যতার ছোটখাট বহু আধিব্যাধির সঙ্গে ত অনেক দিন হইতেই আমরা পরিচিত। তবুও আজ সভ্যতার নিন্দা করিবার জন্ত আসি নাই, সভ্যতা আধুনিক জীবনযাত্রাকে মানুষের সুখ স্ববিধা ও শান্তির জন্ত কত রকম খোঁজা-খোঁগাইয়াছে তাহাই ভাবিতেছি।

এক যুগে আমাদের আহ্বারের অস্থব্ধে বনে বনে দৌড়াইয়া বেড়াইতে হইত, তারপর ধাপে ধাপে রন্ধন, কর্ণণ, বাণিজ্য কত স্তর অতিক্রম করিয়া আজ আমরা ভোজন বিলাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছি। বস্ত্রেও গাছের পাতা গাছের ছাল দিয়া স্নক করিয়া রেশম পশমকে আজ ছাড়াইয়া গিয়াছি নব নব উদ্ভাবনার সাহায্যে। যানবাহন আমোদ-প্রমোদ সকল জিনিষেরই এই রকম ক্রমবিকাশ আছে, সে সকলের ইতিহাস বলিবার ইচ্ছা না সময় আজ নাই। আজ দেখিতে চাই সভ্যতা আমাদের জীবনকে যতদিকে স্বযোগ দিয়াছে আমরা বাঙালীরা তাহা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি কিনা। ধরা যাক বৈদ্যুতিক শক্তির কথা। ইহার সাহায্যে ট্রেন চলে, সিঁড়ি আপনি হাঁটে, মানুষকে হাঁটিতে হয় না, দেশ-দেশান্তরের সঙ্গে কথা বলা যায়। সে সকলের স্বযোগ আমাদের পরাধীন দেশে নেওয়া ততখানি সম্ভব ছিল না, যতখানি স্বাধীন দেশে আছে। তাই আশা করি ভবিষ্যতে এদিকে আমাদের আরও উন্নতি হইবে। কিন্তু ছোট ছোট কতকগুলি কাজও বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে হয়, বাহার জন্ত স্বাধীন কি পরাধীন রাষ্ট্রের মুখ

চাহিয়া থাকিতে হয় না। ইহা সামান্য একটু মূলধন খরচ করিলে অনেকেরই নিজেদের ঘর সংসারে পরিশ্রম লাঘবের জন্ত করিতে পারেন।

আজকার পাচকের অভাব এবং কয়লার তিরোধানের ফলে না ভুগিয়াছেন এমন গৃহস্থ পরিবার কম আছেন। অর্থচ এই দুইটি বড় বিপ্লবকে সংসারে অনেক খানি এড়ান যায় বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে। কলিকাতার অধিকাংশ বাড়ীতেই বৈদ্যুতিক আলো আছে বোধ হয়। অথচ আমরা রন্ধনের কাজে বিদ্যুৎকে বিশেষ লাগাই না। আলো জ্বালিতে প্রতি ইউনিটে আমাদের খরচ হয় ১৪ পয়সা অথচ প্রতি ইউনিটে চার পয়সা খরচ করিয়াই যে রন্ধন করা যায় এ খবরটাও আমরা অনেকেরই রাখি না। আমি ইলেক্ট্রিক কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন প্রচার করার জন্ত একথা লিখিতেছিলাম, সংসারভারপীড়িতা গৃহিণীদের শ্রম লাঘবের জন্তই বলিতেছি। ছোট একটি বৈদ্যুতিক উনানের জন্ত রান্নাঘরেরও দরকার নাই। যে কোন একটু ছোট জায়গায়, ঝড়বৃষ্টি যেখানে লাগে না, উনান বসানো চলে। ছোট খাট গৃহস্থালীর অমেক রান্নাই এতে করা চলে। যদি একটু দামী উনান হয় কাজ ও রকমারি সহজেই বেশী হয়। ইকমিক কুকারও বৈদ্যুতিক শক্তিতে কাজ করিতে পারে।

অবশ্য একটা অস্ববিধা আছে যে, নূতন একটা মিটার ও তার আনুষঙ্গিক তোড় জোড় কিছু না থাকিলে সম্ভা দর পাওয়া যায় না। নূতন মিটার বসানো প্রকৃতি কাষে কোন কোন বাড়ীর পুরুষেরা কোমল সাহায্য করিতে চান না; কেহ বা একটু দয়াদর্শী হইলে করিয়া দেন। যেখানে বাড়ীর পুরুষদের সাহায্য পাওয়া যায় না, সেখানে যদি শুধু আর্থিক সাহায্যটুকু তাঁরা করেন তা হইলে আধুনিক মেয়েদের পক্ষে পাড়ার দোকান হইতে মিষ্ট্রী ডাকিয়া আনা কিছু শক্ত নয়।

সনাতন কড়ানাড়ার পরিবর্তে কলিংবেল ব্যবহারও মানুষের সময় অনেক বাঁচে। যে জায়গায় সর্দার মানুষ থাকে সেই খানে যদি ঘণ্টাটি বাজিয়া উঠে, তবে বন্ধ দরজার বাহিরে

মানুষকে পরের বাড়ী আসিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না, দেউড়ীতেও লোক বসাইয়া গৃহকর্তাকে মানুষের আনাগোনা পরিদর্শন করাইতে হয় না। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও একটু খরচ আছে। এই রকম বর্ষাকালে কাপড় শুকানো, সময় অসময়ে কাপড় ইস্ত্রী প্রভৃতি অনেক কাজই বৈজ্ঞাতিক শক্তি দ্বারা করা গেলেও, আমরা করিনা প্রধানত দুটি কারণে। এক, ভাবি যে ভীষণ খরচ; কিন্তু খরচ বেশী এটা সত্য নয়। দ্বিতীয়, প্রাচীন প্রথা মেয়েরা সহজে ছাড়িতে পারে না। তৃতীয় আর একটা কারণও আছে, সেটার সম্বন্ধে আমার সহানুভূতি মেয়েদেরই দিকে। যে সব গৃহকর্তা চাকর বাকরের পিছনে কিছু টাকা খরচ করিতে পারেন, তাঁহারা যদি দেখেন সব কাজই সহজ হইয়া গেল, তাহা হইলে গৃহিণীর প্রতি মমতা না থাকিলে তাঁহারা হয়ত চাকরের খরচ বাঁচাইয়া সব কাজই গৃহিণীর স্বন্ধে চাপাইয়া দিতে চাহিবেন। সেটা অবশ্য আমি চাহি না। আনাড়ী ভৃত্য দিয়া কাজ চালাইবার প্রথা রাখিতে হইলে খুঁটে কয়লা কাঠই ভাল সে ক্ষেত্রে বলিতে হইবে।

তবে ইহার বদলে আর একটা কাজ করা যায়, যার চলন এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। বি চাকর না রাখিয়া ভ্রম

ঘরের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের যদি দৈনিক কিছুক্ষণের জন্ত গৃহিণীর সহায়তা করিবার জন্ত রাখা যায়, তবে কলকজা না ভাঙিয়া এবং না বিগড়াইয়া তাহারা কিছু কাজ করিয়া দিতে পারে। তার পরিবর্তে তাহারা কলেজ ইস্কুলের এবং পোষাক আসাকের জন্ত কিছু রোজগার করিয়া লইতে পারে।

জলের হাঙ্গামও আমাদের এই সহরে কম নয়। কর্পোরে-শনের কাজটা গৃহস্থদের স্বয়ং করিয়া লইতে আমি বলিতেছি না। কিন্তু যখন আমাদের অদৃষ্টে ট্যান্ডার পরিবর্তে জল ইচ্ছামত পরিমাণে পাওয়া ত যায়ই না, তার উপর সে জলে কখন যে টাইকয়েড আর কলেরার বীজ ঢুকিয়া বসিয়া আছে বলা যায় না; তখন সম্পন্ন গৃহস্থরা প্রত্যেকে বাড়ীতে টিউবওয়েল বসাইলে অনেক নির্ভয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন। অনেক গহনার মজুরি ও সিনেমার পিছনে ২৩ বছরে যত খরচ করেন তাতে একটা ভাল টিউবওয়েল হইতে পারে।

সভ্যজাতির প্রয়োজন শরীরিক মানসিক নানারকম আছে। সেই বুঝিয়া আরও কতকগুলি কাজকে সহজসাধ্য করিবার উপায়ের কথা পরে বলিব।

১৬ই মাঘ

শ্রীবীণা দেবী (শান্তিনিকেতন)

কি কক্ষণে আজকের রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। আজ ভারতবাসী আমরা আমাদের বাপুজীকে হারালাম! ভারত আজ পিতৃহীন, সারা পৃথিবী আজ বন্ধুহীন মহাত্মাহারা হল। কে সেই বাতক? যে মহাত্মাজীর বুকে গুলী চালাতে পারল? অথবা বাপুজীর ভাষায় বলব—এইই ভগবানের ইচ্ছা। “দয়কার হইলে বাতকের হস্তে প্রাণ দিব, তাই যদি দেখরের ইচ্ছা হয়।” তাঁরই বাক্য কী বাতক সত্য ও সার্থক করলে তাঁকে গুলীবদ্ধ করে?

শ্রীকৃষ্ণের ও যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর কথা মনে হত ভক্তদের দ্বারা অতিরঞ্জিত। আজ আর তা মনে হচ্ছে না, আজ সব

সত্য চোখের সামনে প্রতিভাত হল। অসম্ভব বলে জগতে কিছুই নেই। মানুষে সবই পারে। মহাত্মা গান্ধীও মানুষ, মহাত্মাদের দ্বারা গুলীবদ্ধ ক্রুশবদ্ধ করে তারাও মানুষ।

কবির বাণীও সত্য ও সার্থক হল আজ।

“হৃদপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্ত-পদ্ম অর্থা উপহারে
ভক্তিতরে জয়শোধ শেষপূজা পূজিয়াছ তাঁরে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।”

সত্য ও বিশ্বাসের বেদীমূলে আজ মহাবলি দিলে মহাত্মা নিজের মহাপ্রাণ।

দিল্লীর মাটি কি সত্য সত্যই আজ বাপুজীর বুকের রক্তে
ভিজ লাল হল ? বিশ্বাস হয় না।

বিপদসূচক ঘটনাক্রমে সারা আশ্রম সচকিত হয়ে যখন
গৌরপ্রাঙ্গণে মিলিত হলাম, আশ্রমপ্রধান তো এই কথাই
আমাদের জানিয়ে দিলেন। যে প্রাঙ্গণে বাপুজী প্রার্থনা
করে গেছেন, সেই প্রাঙ্গণের মাটিই তো আজ চোখের
জলে ভিজ গেল।

মাহুঘের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে বাইরের বিশ্বপ্রকৃতিও
যেন মিলে গেছে। আকাশ, বাতাস, গাছ, পাতা,
পশু, পাখী সবাই যেন এক মর্মস্বন্দ শোকে মুহমান। নিস্তব্ধ
রাত, নিঃস্রাব, নিঃশব্দ। দূর থেকে কাণে ভেসে
এল—

“হুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।”

থামবে কী বন্ধ। তোমার রথ এবার মাহুঘের বুকের
দরজায় ?

হে অহিংসার শ্রেষ্ঠ পূজারী ! তুমি আজ জঘন্য হিংসার
হাতে দেহ বিসর্জন দিলে, তোমার এই মৃত্যুর মহাবেদনা
মহাশোকের মধ্যে দিয়ে কি আমরা সেই অমৃতের পরশ পাব ?
যে অমৃতের স্পর্শে ক্ষুদ্রের অবিচলিত নিষ্ঠা, অসীম বিশ্বাস,
অকপট ভক্তি ও অগাধ প্রেমের উদয় হয় ?

কে দেবে বাপুজী, আজ আমাদের লক্ষ প্রশ্নের উত্তর ?
শত জটিলতার সরল সমাধান যে একমাত্র আমরা তোমার
কাছেই পেয়েছি।

হে ভারতের মুক্তিদাতা, মহাপুরু ! জাতির জনক !
আশীর্বাদ কর তুমি, আমরা যেন তোমার বাণী, তোমার
জীবন, তোমার আদর্শকে অক্ষুন্ন উজ্জ্বল রেখে তোমার প্রদর্শিত
পথে নির্ভীক চরণে এগিয়ে যেতে পারি, তোমার লক্ষ্যের দিকে।
তোমার হাতের এই সত্যের পতাকা, প্রেম ও মুক্তির পতাকা।

বহন করবার ও উন্নত রাষ্ট্রবার শক্তি দাও বাপুজী, তোমার
সন্তানদের। হিংসা, প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা সম্পূর্ণ বিসর্জন
দিয়ে, যেন আদর্শের জন্ত প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি, ভগবানের
নাম নিয়ে।

গীতার মূর্ত্য প্রতীক বাপুজী ! উন্মাদ ঘাতকের গুলীতে
কি তোমার মৃত্যু হ’তে পারে ?

“নৈনং ছিন্তস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।”

তোমার মৃত্যু হয় নাই—কোনও দিন মৃত্যু হবে না।

জীবন যে প্রাণ পারেনিকো দিতে

মরণ সে প্রাণ দিল

এক মহাপ্রাণ মৃত্যুরে বরি’

লক্ষ পরাণ হ’ল।

এতদিন তুমি একটি মাত্র দেহধারী ছিলে, আজ থেকে
তুমি লক্ষ কোটি দেহে দেহ ধারণ ক’রলে। তোমার আত্মা
তোমার সন্তা আজ কোটি অণু পরমাণু হ’য়ে আমাদের মাঝে
মিশ্লে। যে এতদিন তোমার চেনেনি, আজ থেকে চিন্বে।
যে বোঝেনি সত্য অহিংসার মর্ম, সে বুঝবে। তোমার স্বপ্ন
তোমার সাধনা তোমার ইচ্ছা আমাদের জীবনে মূর্ত্য হবে সত্য
হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও তোমার আদর্শ
তোমার বাণী বহন ক’রবে, “হিংসা নয়, হিংসা নয়”। একশো
পঁচিশ বছর তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে।—একশো পঁচিশের বহু
বর্ষ পরেও ধনিত হবে, হিমালয় থেকে কচাকুমারী পর্যন্ত—
জয় মহাত্মা গান্ধীর জয়, পৃথিবীর দিকে দিগন্তে প্রতিধ্বনিত
হবে—জয় মহাত্মা গান্ধীর জয়—জয় অহিংসা সত্যের জয়।

আজ আমাদের সকলের প্রাণে এক চিন্তা এক ব্যথা এক
শোক—এক হুঃখের সূত্রে গাঁথা আমরা এক গাছি মালা।
প্রার্থনা আমাদের এই একতা স্থায়ী হোক, আমাদের বাক্য
চিন্তা কর্ম এক হোক, মহাত্মার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

লীলাদেবীর কাব্য

আমরা এখানে 'কিশলয়ের' কবি লীলাদেবীর প্রেমের
আবেশ সঙ্ক্ষে আলোচনা করিব। যেখানে প্রেম, প্রণয় ও
ভালবাসা, সেখানেই বিরহ, বেদনা, অভিমান, অপবাদ
ও হতাশার সঞ্চার হয়। তখনই হয় কামনারও প্রকাশ।
কামনা তখন কবির হৃদয়বনে বিকশিত হয় পুষ্পিত কুসুমেরই
মত। কবি বলিতেছেন—

কামনা মোর কুসুম হয়ে
উঠুক ফুটে,
লালসা থাক বিরাগ হয়ে
হৃদয় পুটে।

কেননা কবির এই যে প্রেম তাহা হইতেছে আত্মনিবেদন।
প্রেমিকা প্রেমিকের কাছে করিতেছেন আত্মসমর্পণ।

তোমায় চাহিনি আমি।
আমি শুধু চাই আমারে দিইতে
তোমার করিয়া স্বামী।
তোমার পরাণ আমার করিতে
কছু আমি চাহি-নাই,
আমার সকলি তোমারে সঁপিয়া
কাদাল সাজিতে চাই।

এই যে আত্ম সমর্পণের ভাব তাহা মনে করায় বৈষ্ণব
কবি চণ্ডীদাসের—

বধু কি আর বলিব আমি ?
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে বান্ধিব প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী।
কবির এই আত্মনিবেদনের ভাব কবিতায় অতি
সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'আত্মনিবেদন' কবিতা
এখানে সার্থক রচনা। এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

বিলাব আমারে বিলাব।
সুন্নতি সমীরে অনিলের সম,
দিগ্ দিগন্তে মিলাব।
প্রথম প্রভাত কিরণের সম

আপনারে দিব মেলিয়া ;
বিমল রক্তত স্ফোচ্ছনার মত
ধরণীর বুকে খেলিয়া।

ঈঙ্গিত চির দয়িত যিনি তাঁহাকে কি অমনি পাওয়া যায় ?
কামনাবিহীন ভালবাসাই হইতেছে শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম প্রেম
নিবেদন। কবি তাই বলিতেছেন :

যে দিন তোমার লোভে জড়িয়েছিলাম কামনা,
সেদিন তোমায় পাইনি আমি পেয়েছিলাম যাতনা।
কিস্ত তারপর তোমাকে কখন পেলাম ? যখন
ভালবাসা পাবার আশা ভালোবেসেই অসীম লীন,
'আপনাকে আজ তোমায় দিয়ে পেলাম তোমায় চিরদিন।
'বিরাগ', একটি কথা কও, 'দুঃখে' স্মৃথ, প্রভৃতি কবিতায়
দুঃখ বেদনা ও বিরহের বিষ্ময়গব্যথার সহিত জড়িত রহিয়াছে
বিরহানন্দ। সেই বিরহ বেদনার দুঃখের ভিতর দিয়াই—
তড়িৎ বিকাশের মত করিয়া মানস পদ্ম বিকশিত হয়, মেঘাচ্ছন্ন
দিবসের মধ্যে সহসা যেমন সূর্যের অরুণ আভা প্রকাশ পায়
তেমনি ; তাই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠে :

অবহেলায় আপন জনে
যতই আমার ছাড়ে,
ততই আমার তোমার দিকে
আর ও যে টান বাড়ে।
তখন] ঐ যেখানে ধানের হরিৎ
পদ্ম ফোটা সবুজ সন্নিৎ
ঐ যেখানে জাফরানি লাল
মিসায় মাঠের পারে !

ঐ যে গো মোর প্রাণের স ডা
ফুল ঝরান শাখার নাড়া
কাদলে যে দেয় সোহাগ তাড়া
সুবাস ঝোড়ো বায়,
উড়িয়ে অলক জুড়িয়ে এ বুক
ধমক দিয়ে যায়।

তাহা হইলে কি হইবে ? কবি সেখানে উপলব্ধি করেন

বিশ্বজনের প্রীতি ও ভালবাসা এবং সহৃদয়তার পেলব স্পর্শ,
যেন সারা পৃথিবীর সকলের কাছ হইতেই পাইতেছেন সহানু-
ভূতি ও ভালবাসা। তখন উপলব্ধি করেন

ঐ যে পথিক ঐ যে পাখী

ঐ যে সজল কমল আঁখি

ঐ অজানা তরুণ আনন

সজনে গাছের ধারে ;

সবাই আমার আপন যে আজ

বাঁধা প্রাণের তারে

এখানেই সর্বানুভূতির মহান দান কবির হৃদয়কে হৃৎথের
ভিতর দিয়াও আনন্দের স্পর্শ দিতেছে। যে দিব্য ভাবটি
পাইয়াছেন তাহার অভিব্যক্তনাই অব্যাহত রাখিয়া চলিয়াছে
স্বর মন্দাকিনী নানা ভাবে নানারূপে।

কবির লিখিত “হৃদয়কমল,” আত্মদান, প্রভৃতি বড় কবিতা
ও ‘অনন্ত রূপ’ ছোট কবিতার মধ্য দিয়া কবি সৌন্দর্য্য,
প্রেম, স্বথ হৃৎথকে যে নানাভাবে নানারূপে অল্পভব করিবার
স্বযোগ লাভ করিয়াছেন তাহাই দেখিতে পাই—

কত রূপে তুমি এলে যে জীবনে

দেখিছ তোমায় সব,

অনন্ত তব রূপের আধার

অনন্ত অল্পভবে।

তাহা কি সত্য নয় ? কিন্তু সে অল্পভবকে যখন পাইয়াও
হারাইতে হয়, তখনই বেদনা জাগিয়া উঠে। কখনও নিবিড়
নিশীথে আসেন তিনি ভক্তের দ্বারে। ভক্ত তাহা জানিতেও
পারে না।

শিয়রে বসেছ এসে ললাটে রেখেছ হাত

তবুও যে ঘুম ঘোরে কেটে গেলো সারারাত !

মদির সরস, তব পরশ কোমল করে,

সরালে অলকরাশি কত না সৌহার্গ ভরে !

কাকলী করিয়া গেলো হরষে বনের পাখী,

আকুল সেফালি স্থাসে ফেলে গেলো থাকি থাকি,

তবুও যে মৌনমূক নীরবে রহিছ পড়ে,

কেটে গেলো সারা রাত্রি, এমনি ঘুমের ঘোরে।

এমনি করিয়া ভক্ত তাহাকে পাইয়াও পায় না, শুধু সে
বুঝিতে পারে মদির সরস তব পরশ ! তখন প্রাণে জাগে
ধিক্কার হাস ! হাস ! কি হইল।

রবীন্দ্রনাথের গানে দেখি,

“সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি।

কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।

এসেছিল নীরব রাতে বীণাখানি ছিল হাতে

স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিনী।”

বাংলাসাহিত্যের চিরস্তুনী প্রেমময়ী মূর্তি শ্রীরাধিকা ও
প্রেমের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়াই হইতেছে কাব্যের
রস উৎস ! আমরা রাধাকৃষ্ণের বা বৈষ্ণবপ্রবাহের অন্তঃ-
প্রবাহ উৎসারিত দেখিতে পাই শরীরজ রূপসৌন্দর্য্যে।
শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন :

“স্বথ ছানিয়া কেবা ওঁ সুধা চলেছে গো

তেমনি শ্রামের চিকণ দেহা।

অল্পন গঞ্জিয়া কেবা শ্বজন আনিলবে

চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেধা।”

‘কিশলয়ের’ কবি আনন্দময় শ্রামের অরূপ রূপকান্তির
মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের আরাধ্য দেবতাকে দেখিয়াছিলেন,
তাঁহার সেই রূপ কেমন ? শুধুন :

(সখি) ! এই কি আমার শ্রাম ?

নবীন নীরদ মোহন কান্তি,

চির নয়নাভিরাম ?

* * * * *

চির জনমের স্বামী সে আমার

চিরদিন জাগে যবে

তবু তারে আমি নারিছ চিনিতে

ক’দিন অদর্শনে ?

ওই কি আমার শ্রাম ?

কিন্তু শ্রাম যে নিরদয় ! সে কি আমার মার্জনা করিল ?

কই তাত নয়। কেন না,—

“নিরদয় শ্রামরায় মথুরায় বাইল

ভুলিলরে স্বজনলো সকলি সে ভুলিল,

যমুনার পুলিনে বিগিনেতে বিজনে

কদমের তলে ঐ মাঠে ঘাটে সকলে

—বীশরীতে রাধা রাধা, রাধা বলে ডাকিত,

কি শয়নে কি স্বপনে রাধা বলে উঠিত,

সেই মন প্রাণধন কেমনেই ভুলিল ?

কিন্তু সেই প্রিয়ের স্তম্ভ কত কলঙ্কের বোঝাই না জীবনে ব্যথিত করিত না। তাই কবি হৃৎক বিরহে ব্যথিত হইয়া বহন করিয়াছি? কত অপবাদই না সহিতে হইয়াছে! বলে—

তমাল তালী কুঞ্জবনে
লাগলো পরাগ রাগ,
সবাই বলে ওই যে লো তোর,
কলঙ্কের দাগ!

পথের রাঙা ধুলোয় আমার
অঙ্গ হলো আলো,
সবাই বলে ঐ যে লো তোর
কলঙ্কেরি কালো,
কালিন্দীরই চেষ্টে লেগে এই
ভিজল আঁচল খান,
সবাই বলে কালার প্রেমে
ডাকলো চোখের বাণ।

কিন্তু সবই যে মিথ্যা! সবই যে শূন্য!

বিশুদ্ধ হয়েছে মরি মঞ্জুস কানন
আঁধার তমাল তালী নীপ বন।
কোন মহা অপরাধে দিলে হেন সাজা?
ওগো গোকুলের নিধি রাখালের রাজা!
আর দেখা নাহি মেলে মরি পলে পলে
ত্যাজিব পরাগ শ্রাম যমুনীর জলে।

শত অপবাদ, লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়াও যখন তোমাকে পাইলাম না, তখন কি আর আছে রাধিকার শেষ সম্বল? যমুনীর জলে বিসর্জন! বৈষ্ণব কবির রাধিকার সুরে সুর মিলাইয়া আমাদের কবিও গাহিলেন:

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।

এ ছাড়া আর কিইবা সাহসনা আছে বা থাকিতে পারে? কিন্তু মৃত্যু অপেক্ষাও সুন্দর রূপে কবির মানস পদ্য বিকশিত হইল ত্যাগের মধ্য দিয়া—তাই বিরহিনী শ্রাম-বিস্তৃতা রাধিকা অন্তর্ভব করিলেন:

ত্যাগের মাঝে যে সুর বাজে মধুর সে যে সুমধুর। তাই উপলব্ধি হইল:—‘এই কাঁটা পথ বাজুক পায়ে, প্রাণে ত্যাগের মধুর সুর।’

মায়ায যখন কোন বিষয়ে আশা করিয়া থাকে, যখন সে আশা পূর্ণ হয় না, তখনই সে প্রাণের মধ্যে বেদনা অন্তর্ভব করে, ব্যর্থতার প্রাণ অবসাদগ্রস্ত হয়। কিন্তু যদি সে আশা না করিত, তবে নিরাশার বেদনা তাহার চিন্তকে

মহন করা সার হল শুধু
নবনী উঠিল কই?
বন্দন বুখা বন্দিত জন
তৃপ্ত না হওয়া বই।

তখনই মনে হয় কিসের বেশ কিসের ভূষা, কেনই বা এত অভিমান সজ্জা? লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের ব্যর্থতাই শুধু তাকে পীড়া দিবে! আশাহত প্রাণে তখন আক্ষেপ জাগে:

গাঁথবো না আর আশার মালা
বাঁধবো না আর প্রেমের গান
ভরবো না আর ফুলের ডাল,
রাখবো না মান অভিমান।

সাধবো না সুর বীণার তারে
তুলবো না ফুল কানন ছায়
ভুলবো না পথ নদীর ধারে
ঝুলবো না আর ফুল দোলায়।

ছুটবো না আর বাঁশীর ডাকে
তমাল কদম কুঞ্জবন
জুটবো না নীল সলিল বাঁকে
কলসী কাঁধে ভরতে মন।

আর কত কালই বা প্রতীক্ষায় থাকিব?

‘বুঝি দেবী নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে
বেলা শেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নব মিলনের সাজে!’

আশাহতা ত্রিরাধার ও কুঙ্কের পূর্বরাগ, বিরহ ও আশা নিরাশার বেদনার প্রকাশ বৈষ্ণব বিভূতাপতির আশাহতা ত্রিরাধিকার হৃৎক বিরহ বেদনার জায়গা ছন্দে, শব্দ সম্পদে প্রকাশিত হইয়াছে। বিভূতাপতির রাধিকার জায়গা আমরা কবির কণ্ঠে শুনিতে পাইতেছি:

“সজনি, কে কহ আঁওর মথাই

বিরহ পয়োধি মধু মনে নাহি পতিয়াই।

এখন তখন করি দিবস গমাওল

দিবস দিবস করি মাসা;

মাস মাস করি বরষ গমাওল

ছোড়লু জীবনেক আশা।

মেয়ে আর পুরুষের ভেদ ও অভেদ

শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়

গা-সওয়া হয়ে গেছে। বাস ট্রামে মেয়েরা গা ঘেঁসে উঠে পড়ে, কেউ গা ঠেলে মেয়েআসনে জায়গা দখল করে, নামবার সময় কেউবা কহুই এর গুঁতো দিয়ে যায় পুরুষকে।—এসব গা-সওয়া হয়ে গেছে।

নিতম্বিনী পিসীর আট বছরে বিয়ে হয়েছিলো, ন বছরে বিধবা হ'লেন। হেঁটে পুরীযাত্রা করেছিলেন। এখনো একে বেকে বেকে রয়েছেন। ঠুর নাতনী কজ্জলী সেন এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে; বয়স নিতম্বিনী পিসী অনেক কমিয়েও সন্তোষের নীচে নামাতে পারেন না। কেন না, কজ্জলী আবার অনেক কলেজে পড়ুয়া মেয়ের মতো রোগাপটকা না হয়ে বেশ ডাগর সাগর। তবু কজ্জলীর মতো, “সোমত” মেয়েও গা-সওয়া হয়ে গেছে তাঁর।

গা সওয়া হ'লেও মন সওয়া হয়নি আমাদের। মন খুঁৎখুঁৎ করে এখনো। বিপ্লব বিপাকে নারী যাত্রা উঠো পাকে ঘুরে গেলে খুসী হ'তো মনটায়। কিন্তু তা আর দেখছি হলো না। সেদিন নিতম্বিনী পিসী প্রতিবেশিনীর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে বখন শুধোলেন, “হ্যারে সর্বমঙ্গলা, তোর বোনঝি নাকি এই খানেই রয়েছে? কই তাকে যে দেখছি না?” বন্ধু সর্ব মঙ্গলা বললেন “এখনই এসে পড়বে।” সাড়ে পাঁচটা বেজেছে।” নিতম্বিনী শুধোলেন, “বলি, গেছে কোথা?” উত্তর হলো “অফিসে। ওদের পাঁচটায় ছুটি।” শুনে নিতম্বিনী পিসীর মাথা ঘুরে গেলেও গা টলেনি। কেন না, এমন সব বে-আকিলে খবর মন সওয়া না হলেও গা-সওয়া হয়ে গেছে।

ইংরেজ ভারত ছাড়লো; কিন্তু ওরা সঙ্গে করে এনেছিলো যে সব শিক্ষা তা আর ভারত ছাড়লো না। ছেলেদের জন্য ইন্সকুল বানাবার সঙ্গে সঙ্গেই অল্প স্বল্প করে মেয়েদেরও ইন্সকুল হলো। ক্রমে কলেজ হলো। তারপর মেয়েরা সভা-সমিতি, নাচ গান থিয়েটার সিনেমা, হাট-বাজার সবতেই নেমে পড়লো। মোগলাই পোষাক ছেড়ে সার্ট কোর্ট ধরলো

পুরুষরা, মেয়েরা ধরলো সেমিজ, ব্লাউজ, জুতো। খুললে ঘোমটা, ফুটলো বুলি, ছাড়লো ডুলি—হন হনিয়ে হাঁটুনি স্ক্রু করলো ওরা। ফিরিঙ্গিদের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়েছিলো আগেই, আমাদের দেশ শাসন তারা স্ক্রু করেছিলো আগে ভাগেই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সমাজ শাসনের দণ্ডটা রঘুনন্দনের হাত থেকে মিল বেহামের হাতে চলে গেলো। ফিরিঙ্গিমানার অনেক কেতার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বাইরে আসাটাও আমাদের রীতিতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মুসলমান যুগের পর্দা ত ঘুচে গেছেই।

যারা অস্বস্তি পাচ্ছেন তাঁরা বলছেন মেয়েরা কি পুরুষ, যে তারাও পড়বে? আর যদিই বা পড়ে তবে পুরুষের মতো একই পড়া পড়বে? সভায় যাবে? কৌশলি করবে? তবে আর মেয়ে মানুষের মেয়েত্ব রইলো কোথায়? উগ্র আধুনিকতা বলবেন, মেয়ে মানুষ আবার কি? মেয়েও মানুষ, পুরুষও মানুষ। তফাৎ যা সামান্য। বাইরের তফাৎ। মেয়েরাও ইচ্ছে করলে কলেজে পড়তে পারে, প্রফেসরি করতে পারে, ডাক্তারি করতে পারে, রাজনীতি করতে পারে, প্রদেশের গভর্ণরি পর্যন্ত করতে পারে। মেয়ে পুরুষ অভেদ। ভেদটা বাইরে। ওটা চোখের ভুল।

মেয়েরা কলেজে পড়ুক, বাদ সাধবো না। ডাক্তারি করুক পশারের শ্রীবৃদ্ধিতে বাধ্য ঘটাবো না। ব্যারিষ্টারি করতে গেলেও পথ আটকাবো না। কিন্তু একথা মানতে পারবো না যে মেয়ে পুরুষ অভেদ। মেয়েরা নিকট আর পুরুষরা উৎকৃষ্ট এ কথা বলবো না নিশ্চয়ই। কিন্তু মেয়ে পুরুষ একই—একথা মানি কি করে?

আমি তো দেখি হাতের বুড়ো আঙ্গুল থেকে মাথার শিখাটি পর্যন্ত পুরুষ মানুষ ব্যাটা ছেলে। আর, চাঁচর চিকুর রাশি থেকে পদ নখর প্রান্ত পর্যন্ত মেয়ে মানুষ নিছক মেয়ে মানুষ। হাত আর পা কারো মেড়টা বা আড়াইটে নয় দুজনেরই ছোটো করে। চোখ ছোটো সংখ্যায় একই

উভয়ের। মুখ গহ্বর তো একে অণ্ডে ভিন্ন রকমের পায় নি? কাঠামোর কাঠ খড় তো প্রায় একই ধরণের। কিন্তু কারিগর সামান্য যা রকমফের করেছেন তাতে যে অনেকখানি তফাৎ হয়ে গেছে। কাঠামোর তফাৎ; রসায়নেরও তফাৎ। ছাভেলক এলিসের “Man and woman” বইখানা পড়লেই ধরা পড়বে তফাৎটা কতো প্রধান, মুখ্য।

সন্তান সৃষ্টিতে জনক জননী দুজনেই অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু গর্ভধারণ করেন জননী।

সন্তান চাই আমিও আমার স্ত্রী-ও! কিন্তু সন্তান ধারণের ঝঞ্জাট আমার স্ত্রীরই।

সন্তানকে ভালোবাসি আমিও আমার স্ত্রীও।

কিন্তু তিনি ক্ষণে ক্ষণে সর্বক্ষণে সন্তানের লালনে পালনে রত থাকেন এবং সেই নিরন্তর কর্মে আনন্দ পান। কিন্তু আমি পালনের মূলমন্ত্রগুলি নির্দ্ধারিত করে দিয়েই থালাস। আর সেই মন্ত্রের সাধারণ নির্ধারন ক্রমে বিশেষ নির্ধারন, অঙ্কন ও প্রমাণে (জ্যামিতির পরিভাষা) শেষ হ'লে সিদ্ধান্তটা দেখে নিই। আমাদের লক্ষ্য একই, উপাদান একই, কর্ম পদ্ধতি ও কর্মসূচী বিভিন্ন। এই তফাৎ কি সামান্য তফাৎ?

মেয়েরাও রাজনীতি করে, সমাজনীতি করে। কিন্তু যেসব মেয়ে ঐ সব ক্ষেত্রে সৃষ্টি ক'রে যান তাঁদের দান কি পুরুষের দানের সঙ্গে একই? অবশ্য এখনো অনেক খানিই তাই রয়েছে। কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত থাকবে না। পারিবারিক প্রতিপালনে মেয়েদের আর পুরুষদের ক্রিয়াকর্ম যেমন স্বতন্ত্র; সামাজিক বৃহত্তর প্রতিপালনেও মেয়ে পুরুষের ক্রিয়াকর্ম হবে স্বয়ং স্বতন্ত্র।

মেয়ে আর পুরুষ যদি হয় একই, তবে মানব সৃষ্টির তা হবে সমূহ ক্ষতি। সেটা তবে, বিধাতার বেহিসেবের প্রমাণ দেবে। মেয়ে মেয়েই, পুরুষ পুরুষই। একই পরিবার পালনে তাদের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন একই জাতি স্বত্বনে।

মেয়েদেরও বাইরে চাই। মানুষের অন্তর সৃষ্টির জন্ত চাই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ক্রিয়াকর্ম। মেয়ে পুরুষ সমান ভাবে তার অধিকারী। কিন্তু ক্ষমতার বিকীরণ ক্ষেত্রে কোনো বাধা না থাকলেও তার ধারা স্বতন্ত্র হবেই। সেইটিই চাই। তারই জন্ত চাই নারীর বাইরে আসা।

শত্রুহস্ত হ'তে সন্তান রক্ষা করবার জন্ত বাবিনীর যে-তৎপরতা ও ব্যগ্রতা, আত্মরিক শক্তির হাত হ'তে জগৎ ও দেশকে রক্ষা করবার সময় নারীর সে-তৎপরতা কই? যে নৃশংস কাণ্ড জাতির বুকে ঘটে গেলো তাতে নারীর বিশিষ্ট দান কই? সতীত্বনাশী অহর বারণে সতীদের দান কই? জীবধাত্রী মেয়েজাত যারা, জীবজবাই-যজ্ঞের আগুন নেভাতে তাদের দান কই? শিক্ষাক্ষেত্রে টিচার ডিপ্লোমা নিয়ে আমিও আমি বিলেত থেকে, আমার সহধর্মিনীর সহোদরও আসেন। কিন্তু শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর স্বভাব জাত দান কই তাঁর? তিনি ও তো পেটালজি আর ফ্রোবেল আউড়ে চলেছেন। সমাজ সেবাকর্মে তিনিও দেখি হয় কংগ্রেসের দলে পাড়ার যুবকদের সরকারী দিদি, না হয় হিন্দু সভার সরকারী দাসী, নচেৎ স্বয়ংসেবক সংঘের বেসরকারী পিসী। কিন্তু নারীর দান কই? সমাজ কল্যাণে মেয়েরা পরিবার প্রতিপালনের মেয়েলি প্রতিভার বিকাশ করলেন কই?

মেয়েরা দাসী আর পুরুষরা মনিব—একথাটা বিলকুল ঝুঁটো। ও কথার মধ্যে বোকামি আছে, দুটো মিও আছে। সমাজ রক্ষার জন্য প্রবৃত্তির বশে মিলিত হয় নারী আর পুরুষ। সন্তানসৃষ্টি আর সন্তানপালন করে চলে তারা। কিন্তু ওদের মধ্যে স্বার্থ বলে একটি কীট আছে। সেই কীট দংশনে প্রেমের ফুল ক্ষত ধরে। তখন পুরুষ সাজে মনিব মেয়ের বাজে দাসীত্বের শৃঙ্খল।

একজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষকে ভালোবাসে—একজন পুরুষকে একজন মেয়েকে ভালোবাসে একজন মেয়ে অন্য একজন মেয়েকে ভালোবাসে—একজন মেয়ে একজন পুরুষকে ভালো বাসে। সম জাতীয়ের প্রতি সখ্য আর প্রেম, ভিন্ন জাতীয়ের প্রতি প্রেমের সঙ্গে তুল্যই নয়। মেয়ে পুরুষের সখ্যের মধ্যে Sex আছে বলে নয়। অন্য একটি মন্ত্র, কারণেই সে সখ্যের দাম আলাদা, জাত আলাদা, কাজ আলাদা।—ক্রিয়াকর্ম-নাকি বহু পত্নী ছিলেন। আবার তাঁর ছিলো সখী দ্রৌপদী। সখা সজ্জও স্বতন্ত্র সখী তিনি। তাঁর সখ্যের একটি অপরূপ মাধুর্য। দ্রৌপদীর প্রতি তাঁর যে সখ্য সে অতুলনীয়। লাক্ষিত দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণে অসমর্থ হলেন যখন পঞ্চ পাণ্ডব, কোঁরব রথীরা।

বথন নির্বাক ও পঙ্গু—তখন দ্রৌপদীর একমাত্র মুক্তিদাতা হলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা। নরনারীর মধ্যে এমনি একটি অতি স্নেহ সখ্যের আদান প্রদান আছে। সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তির ঘোলা জলে তাকে ঘুলিয়ে রেখেছে। অসাধারণ মানুষ তাকে উজ্জীবিত করে তোলেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যা দেবেন, বহুমূল্য সে সখ্য-মঞ্জরী ঐশ্বর্যময় মধুময়। কিন্তু দ্রৌপদীর সখ্য অতুলনীয়। সে যে ফুলফল ধানহরীর অর্ঘ্য উপচার। তার মধ্যে স্নানামার ভক্তি, অর্জুনের সখ্য, শ্রীমতীর মাধুরী। সে দান যে স্বয়ং স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ স্নানামাকে দেন স্নেহপ্রীতি, অর্জুনকে দেন প্রীতি প্রেম। কিন্তু দ্রৌপদীকে দেন লজ্জার বস্ত্র, লাজনার মোচন, সংকটের সংহার।

মেয়ে আর পুরুষ ভেদাভেদ নিয়েই এসেছে। যেখানে তাদের অভেদ সেখানে সাম্যের জয় গাঁও, আপত্তি নেই। কিন্তু যেখানে তারা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র সেখানে বৈশিষ্ট্যের স্বর ধরো। না হলে কাণে বেহুরো বাজে, প্রাণে বেতাল ঠেকে। সপ্ত স্বরের সব কটিই যদি একটি মাত্র স্বর হতো? তবে কি আর ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সৃষ্টি হতো? সাতটা মূল রং এর রঞ্জন রয়েছে ছিন্নিয়ার সর্বত্র। তা ছাড়া একটা মাত্র

রং এরই কতো আলো ছায়া। ঘাসের সবুজ, পাতার সবুজ কুড়ির সবুজ—কতো স্তরের। বসন্তে পাতার সবুজ আর বর্ষায় পাতার সবুজে কতো তফাৎ। সেই রকম মেয়ে পুরুষের তফাৎ, কীষ্টির তফাৎ কারণের তফাৎ। মেয়ে পুরুষের এই অন্তরে ও বাহিরে তফাৎ আছে বলেই না আনন্দ। নচেৎ ঐ অধিকন্তু সৃষ্টি যে অনাসৃষ্টি হবে।

দুর্গা দশগ্রহরণধারিণী অম্বরনাশিনী; মহাদেব শ্যান স্তিমিতলোচন যোগনিদ্রারত। কিন্তু শঙ্কু তাম্র নৃত্যচঞ্চল শিব আর উমা সর্বমঙ্গলা শান্তি বিধায়িনী। শক্তির প্রকাশ উভয়েই। কিন্তু উভয়ে স্বতন্ত্র। তাই না এতো বৈচিত্র্য এতো আনন্দ।

যথার্থ সমাজ কল্যাণকর্মে নারীর স্থান চাই। পুরুষেরই দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে নয়। নারীর স্বতন্ত্র দান নিয়ে। আজ ভাংতে চতুর্দিকে সৃষ্টির শতদ্রু বিপাশা-ইরাবতী-চন্দ্রভাগা বিতস্তার বান ডাকাতে হবে। আজ নারীকে বাইরে চাই-ই। বাইরের বিস্তৃততর প্রাঙ্গণে লুকানো আছে যে অস্তহল নির্গুঢ় নিভৃত কক্ষ সেইখানে নারীর পাণি প্রসারণ চাই। সেইটা সম্ভব হলেই চক্রপাণি খুদী হবেন—নচেৎ আঁত চক্রপাণির রোধে নিপতিত হবে।

শিক্ষার নববিধান বিষয়ে ছুটার কথা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

ইউরোপীয় শিক্ষাতত্ত্বমণ্ডলী কার্শেনষ্টাইনারের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত মৎপরিদৃষ্ট জার্মানীর হামবুর্গের পরীক্ষামূলক স্কুলগুলি ও বিলাতের বিভিন্ন প্রকারের স্কুলের কথা মনে করিয়া আমার লিখিত শিক্ষাসংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবটি বছদিন হইল প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় এবং পরিবর্তিত আকারে অল্ বেঙ্গল টিচার্স জার্নালে প্রকাশিত হয়। এতে ক্র্যাপহাম সেকেন্ডারী স্কুলের অঙ্করণে অধুনা সার্জেন্ট স্বীমে বর্ণিত শিক্ষায় ত্রিবেণী ব্যবস্থা ছাড়াও লণ্ডন কেন্দ্রীয় স্কুলগুলির ত্রায় বিশেষ শিক্ষাগারের কথাও ছিল।

বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দেশের নানান সংশ্লিষ্ট অবস্থিত সকল স্কুলকেই এক ছাঁচে ঢালা সমীচীন বোধ হয় না। বিলাতে যেমন দেশকালের বিশিষ্টতাকে বজায় রাখা হইয়াছে, তেমনি আমরা কেতাবী বিদ্যার পাশে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি যেখানে যেটা শিক্ষাদানের সুবিধা সেইটাকেই ব্যবহারিক হিসাবে জুড়িয়া দিতে পারি; খাল, বিল, পুকুরের সুযোগও আমরা অগ্রাহ্য নাও করিতে পারি।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক অবস্থায় কারীগরী শিক্ষাদানের প্রস্তাব বিষয়ে আমার মনে হয় যে ছেলেমেয়েদের গার্হস্থ্য জীবনে কাজে আসিতে পারে এমন ধারা কাজ সব শিখানো

দরকার ; চামড়ার কাজ, ধোপার কাজ, তাঁহের কাজ, দর্জির কাজ, ছুতারের কাজ ও রাজমিস্ত্রীর কাজ—দরকারী সকলই, খানিক খানিক, যতটা সম্ভব, কার্য তালিকায় স্থান পাইবে। অনাবশ্যক পোষাকী ব্যবহারিক শিক্ষা নিজের জীবনহীনতার জন্ত নিশ্চিত হইয়া পড়ে। নিম্ন শ্রেণী হইতে ম্যাট্রিকের অব্যবহিত নিম্নতর শ্রেণী পর্যন্ত ব্যবহারিক শিক্ষার চলন হইতে পারে, যাহাতে সকল ছাত্রছাত্রীই স্কুল ত্যাগ কালে কিছু না কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়া যাইতে পারে। বৎসরের প্রথমার্ধে টানা দুই মাস ও শেষার্ধে টানা দেড় মাস ব্যবহারিকের ব্যবস্থায় শিক্ষা ভাগ হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা ইংলণ্ডের আউগেল স্কুলে দেখিয়াছিলাম। নতুবা, দিনের প্রথমার্ধে কেতাবী শিক্ষারও শেষার্ধে ব্যবহারিক শিক্ষার বিধান দেওয়া যাইতে পারে, অন্ততঃ বছরের ছয় মাসের জন্ত। শেষোক্ত ব্যবস্থা সুইটজারল্যান্ডে ওনেস্ক-বিদ্যালয়ে আছে।

গভর্ণমেন্ট স্কুলগুলিতে ও যেখানে সম্ভব ভাল ভাল প্রাইভেট হাইস্কুল লইয়াও আদর্শ পরীক্ষামূলক স্কুল করা যাইতে পারে। অধ্যক্ষ লয়েড মরস্তানের পরামর্শমত প্রথম মহাসময়ের পরে স্থাপিত এইরূপ পরীক্ষামূলক স্কুল জার্মানীতে দেখার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আমার মডেল এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল বিষয়ে প্রবন্ধের সারমর্ম মহামাণ্ড গভর্ণর বাহাদুর সমীপে শিক্ষাবিস্তারের জন্ত প্রেরিত হয়।

যে ক্ষেত্রে উচ্চ স্কুলের কাজ কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে যোগে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হইবে সে ক্ষেত্রেই স্কুল নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীগুলিকে পৃথক করিয়া পৃথক অধ্যক্ষের বা সহকারী অধ্যক্ষের অধীনে রাখিতে হইবে।

শিক্ষক তৈয়ারী বিষয়ে শিক্ষাদান কার্যে ঝাঁকবিশিষ্ট উপরিতন শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র ছাত্রীকে নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষকতা করিতে সমর্থ বিশেষে দেওয়া যাইতে পারে; এ বিষয়ে পারদর্শিতার মার্টিফিকেটেরও ব্যবস্থা এতে হইতে পারে, এতে ট্রেনিং এর খরচও কম হইবে এবং অল্প সময়ে শিক্ষকও বেশী মিলিবে। এ বিষয়ে বহুদিন পূর্বেও আমি লিখিয়াছিলাম।

ফলপ্রসূ ব্যবহারিক শিক্ষা দানে সমর্থ মিশ্র ব্যবস্থার স্কুল বাড়াইয়া তুলিবারে পূর্বে পর্যন্ত সাধারণ স্কুলকেও জীয়াইয়া রাখিতে হইবে; কারণ সে গুলিও গ্রাম ও

গ্রামান্তরের জীবনকেন্দ্রস্বরূপ, আর অছাত্রের মত সে গুলির গণ্ডী হইতেও লোকশিক্ষার অভিধান চালান যাইতে পারে। রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও এদের আঞ্চলিক প্রয়োজনীয়তা কম নহে।

আদর্শ পৌরজনগঠনে রাজনৈতিক শিক্ষা এবং আত্ম ও দেশরক্ষার্থ সামরিক শিক্ষা ও শিক্ষার অঙ্গীভূত হইবে; প্রত্যেক গণতন্ত্রের রক্ষকই হইল তার তরুণ স্বেচ্ছা সেবকদল। অছাত্রান বিশেষ উপলক্ষ করিয়া মাঝেমিশেলে জাতীয় পতাকাভিযান ও সকল স্কুলের একসঙ্গে রুট মার্চ ও গল্পীপরিক্রমা লোকশিক্ষার অভাবনীয় প্রেরণা আনিয়া দিবে। তাই সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা সকল শ্রেণীর উচ্চ স্কুলে উচ্চস্তরে থাকিবে।

পাঠিতব্য সাহিত্য, ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে পুস্তকাদি জাতীয় বীর ও জ্ঞানী গুণীগণের কীৰ্ত্তি, চরিত্র বা বাণীর প্রোজল ছটায় বিভাসিত হইবে, ভূগোলজ্ঞান জাতীয় বিকাশ ও মানব কল্যাণের পথনির্দেশে সহায়তা করিবে; জাতীয় জীবনউৎস ও দর্পণরূপ পুস্তকাদি নব জীবনের স্পন্দন স্পন্দিত হইবে। আর, সর্বোপরি জাতীয়তাপ্রদীপ্ত জীবনময় শিক্ষা প্রণালী পাঠ্যকে নবভাবে বিভাবিত করিবে। পরিশেষে মনে রাখার দরকার শিক্ষা সম্পর্কে সংস্কারের ধারা কৃষ্টি, শিল্প ও কৃষিমূলক ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা এই ত্রিধারায় কি ভাবে কম বেশী প্রবাহিত হইবে।

আর এক কথা, সমাজের স্তর বা অংশ বিশেষের সর্ব ও শেষে আত্মগ্রামী শোষণনীতির মুখে সমাজের সাম্য রক্ষা করিতে ভূমিসম্পদ, ভূস্বামী ও চাষী এ দুইএরই হাত হইতে, রাষ্ট্রের অধিকারে আনা দরকার। রাষ্ট্র তাহা কৃষিক্ষেত্রে ও এমন কি তৎসহযোগিতা স্কুল কলেজ প্রভৃতির মধ্যে দিয়াও বিতরণের ভাব গ্রহণ করিবেন; এতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও শেষে নিঃসম্মল বোধ করিবেন না; তবে তথাকথিত ভদ্রদের ছেলে মেয়েদেরও ফসল উৎপাদন ও বিতরণে বিশেষ অংশ শিক্ষালয়ের কাজের মধ্যেই গ্রহণ করিতে হইবে। যেহেতু অশিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিবে। সেজন্য মনে হয়, এ ব্যবস্থা সমাজকে কতকটা প্রকৃতিস্থ করিবে।

উপসংহারে বলিতে চাই, শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাবমাত্রই সাফল্যবিষয়ে জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে; সুতরাং এ বিষয়ে জাতীয় সম্পদ ও স্বাস্থ্যোন্নতির কার্যকরী পরিকল্পনারও দরকার; ক্ষুধার্ত, স্বল্পবয়স্ক, অসুস্থ ও নিরানন্দ শিশু উন্নতশিক্ষাপ্রণালী আর কতটুকু গ্রহণ করিতে সমর্থ?

শেষ রাগিণী

শ্রীদীপ্তি দেবী

(৫)

সারেতে একখানা ছোট বাড়ী ছিল মিস্ ব্রমফিল্ডের। ভারতবর্ষে থাকতে তাঁর কোন্ এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে বাড়ীখানা তাঁরই হয়। এতদিন সে বাড়ী ভাড়া দেওয়া ছিল। এবার ভারতবর্ষের পাট উঠিয়ে মিস্ ব্রমফিল্ড নিজের দেশে শেষ জীবন কাটাবেন; তাই ভাড়াটে তুলে দিয়ে Surreyর বাড়ীখানা নিজের মত করে গুছিয়ে নিয়ে গেলেন। লগুনে তাঁরা ছিলেন দিন সাতেক। এদিক ওদিক ঘুরতেনও বটে। মিস ব্রমফিল্ডের আশা ছিল হয়ত পথে ঘাটে একদিন মিষ্টার রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা' ঘটে ওঠে নি। মনের ইচ্ছা মনে নিয়েই তাঁকে চলে যেতে হয় Surreyতে।

বাইরে থেকে স্থললিতার বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, তবে মিস্ ব্রমফিল্ড সেই বালিকা স্থললিতাকে আর খুঁজে পেলেন না। তার স্থানে পেলেন তিনি একটি স্থির ধীর নারীকে। দেখতে দেখতে অনেকগুলি দিনই কেটে গেল। মিস্ ব্রমফিল্ডের অনেক বন্ধুবান্ধব কাছে পিঠে থাকায় তিনি খুব কমই থাকতেন বাড়ীতে। স্থললিতা বিশেষ কোথাও বেরুতে চাইত না, তাই তার দিনগুলি কাটত “হোপ কটেজ”র ছোট্ট বাগানটিতে।

একদিন সে বসেছিল বাগানের একটা কোণে। ইচ্ছা ছিল লাইব্রেরীর বইখানা শেষ করবার; কিন্তু সেটা অগ্রসর হয় নি বেশী দূর। বইখানা খোলা ছিল বটে, আর চোখ দুটোও তাতে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু মনটা যে তার কোথায় ছিল তা' কে জানে। একজনের অসমাপ্ত কথার স্মরণ বাকছিল তার কানে দিনরাত্রি। সেই না বলা বাণীর শেষ কি সে শুনতে পাবে কোন দিন?

একটি স্যালভারের উপর একখানা চিঠি নিয়ে এসে দাঁড়াল স্থললিতাদের ছোট মেড্ জেমিকা। বলে সে— পোষ্টম্যান এখনি বিদেশী ডাক দিয়ে গেল, তাই তাড়াতাড়ি

আপনাকে দিতে এলাম। চিঠিখানা তুলে নিলে স্থললিতা। চিঠিখানা লিখেছিলেন তার বিমাতা বিভা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান তার পিতা। একদিকটা তাঁর একেবারে অবশ হয়ে গিয়েছে, চলতে পারেন না, বিছানায় শুয়ে। কথা বলাও খুব কষ্টকর হয়ে গিয়েছে। স্থললিতাকে শীঘ্র দেশে ফিরতে হ'বে। মিস্ ব্রমফিল্ডের আসবার প্রয়োজন নাই। বিভারই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় বিলেতে আছেন, তিনি ফিরছেন দেশে শীঘ্রই! তাঁকে স্থললিতার ঠিকানা দেওয়া হয়েছে, তিনি দেখা করবেন তার সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে তার ফেরবার ব্যবস্থা তিনি করে ফেলবেন।

চিঠির সঙ্গে সঙ্গে উমাকান্ত বাবু এসে হাজির হলেন এবং এক হপ্টার মধ্যেই দেশে ফিরে যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। স্থললিতার আর অল্প কোন বিষয়ে মন দেবার সময় রইল না। সে কেবল ভাবতে লাগল কখন গিয়ে নে দাঁড়াবে তার পিতার পাশে।

যথাসময়ে সে এসে পৌঁছল তার নিজের বাড়ী। পিতার বুকের উপর পড়ে তার বুকের সব কান্না উজাড় করে ঢেলে দিল। সেই সঙ্গে ধূয়ে মুছে গেল বিভার এতদিনের ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা ব্যবধানটি।

চারিদিকে একটু গুছিয়ে নিতে নিতে আবার উঠল সেই পুরাতন কথা—স্থললিতার বিবাহ। অনেক দিন কথা দেওয়া আছে, আর ফেলে রাখলে মান-সম্মত থাকে না। বিবাহের উদ্যোগ সুরু হ'ল পুরো দমে। বিভার ইচ্ছা ছিল বিবাহটা একটু জাঁকজমকেই হয়। পাঁচজনে যদি নাই দেখল কত বড় ঘরের ঘরগী সে, তবে বড়লোক হয়েই বা লাভ কি! কিন্তু বাধা পড়ল এতে আর একদিক থেকে। শোনা গেল বরের সদ্য আত্মীয়বিরোগ হয়েছে, স্ততরাং কোন রকম আড়ম্বর

তিনি করতে চান না; কেবলমাত্র কথাসম্প্রদান করে দিয়ে হ'ল। এমন কি স্ত্রীস্বাচারও হবে না। এ রকম বিবাহ সে বাপের সম্মুখে দেখে নি। কি বলে স্বামী তার এমন বিবাহে মত দিলেন সে পারল না বুঝতে। এমন পাত্রে দিয়ে নাই দিলেন। তার ভাইপো নরেনের ত এখনও দিয়ে হয় নি, বলে নিশ্চয় সুললিতাকে দিয়ে করতে রাজি হবে সে।

সুস্থ অবস্থায় সনৎকুমারের মনে যে জোর আসে নি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে জোর যে কোথা থেকে এল তা তিনি নিজেই বুঝে উঠতে পারলেন না। যে পাত্রকে তিনি মনোনীত করেছেন সেই পাত্র ছাড়া সুললিতার বিবাহ অন্য পাত্রে দেবেন না এই হল তাঁর পণ। অসহায় শিশুর জোরে বিভা স্বামীর উপর জোর ফলাতে পেরেছিল, কিন্তু আজ স্বামীই অসহায় অবস্থা তাকে পরাস্ত করল।

বয়ের দিন এসে পড়ল দেখতে দেখতে। সনতের বাড়ী দেখে মনে হল না এ বাড়ীতে কোন উৎসব আছে। বর এল যথা সময়ে, কিন্তু তার আগমনী জানাবার জন্তে শাঁখ ও বাঁজল না, উলুধ্বনিও শোনা গেল না। বিভা এসে দাঁড়াল সুললিতার ঘরে। তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে বিভা বলে উঠল—“এখনও বিছানায় শুয়ে? এদিকে বর এসে গিয়েছে যে! না বাঁজল একটা শাঁখ, না দিল কেউ উলু, তোমার বাপের যেমন ব্যবস্থা, এ সব ত' এর আগে কখনও দেখিও নি শুনিও নি। যাই হ'ক এখন উঠে পড়।” তারপর হাতের বেণারসী শাড়ীখানি দেখিয়ে বলল—“বর এ হ'য় নাই পরল বেণারসী জোড়, তা বলে কনেকে ত আর মিলের শাড়ী পরিয়ে বের করা যায় না। এই শাড়ী খানা নাও।” পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল সুললিতা। বিভা তাকে যেমন ইচ্ছা করেই সাজিয়ে দিল। সে বলল না একটি কথাও। সাজ শেষ করে বিভা তার আপাদমস্তক চেকে দিল একটা মস্ত ওড়নায়। সনৎকুমার নিজে কিছু করতে পারবেন না, তাই তাঁর এক দূরসম্পর্কের জ্ঞাতীজাতা ধীরেন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন কক্কাবর্তী হয়ে। তিনি এবার এসে বললেন—“বৌদি, কনেকে এবার ছেড়ে দিন, আর কতক্ষণ ভক্তলোকদের বসিয়ে রাখবেন?” বিভা বলল “হয়েছে ঠাকুরপো, এবার শুকে নিয়ে যাও”—

ধীরেন্দ্রনাথ সুললিতাকে সঙ্গে নিয়ে সভায় উপস্থিত হলেন। কে কে এবং কয়জন যে ঘরে উপস্থিত ছিলেন সুললিতা তা কিছুই বলতে পারত না। তার সমস্ত অন্তর্ভুক্তি যেন হয়ে গিয়েছিল অসাড়। বিবাহের মন্ত্র পুরোহিত পড়ছেন, কিন্তু আর যে কে কি করছে বা বলছে সুললিতা তা বুঝতে পারল না। সে মাথা নীচু করে সভায় বসে রইল। চোখ তুলে একবার দেখলও না বর কে এবং কেমন দেখতে। সম্প্রদানের পর তার মাথা কেমন ঘুরে উঠল। সে এলিয়ে পড়ল সভাতেই। তাকে কখন যে তুলে এনে শোবার ঘরে শুইয়ে দিয়েছে তা সে টেরও পেল না। মনে পড়ল না সম্প্রদানের সময় কারুর গলা শুনেছে কিনা। যখন সে পাখার বাতাস আর জলের ঝাপটায় প্রকৃতিস্থ হয়েছে তখন ডাক এল তার পিতার কাছ থেকে। সনৎকুমার মেয়ের বাঁ হাত খানা তুলে নিলেন, তারপর বাগিসের নীচ থেকে একখানি সোনারাধান লোহা বার করে অতি ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে বললেন—“এটা তোমার মার হাতের লোহা। তিনি যেমন তাঁর স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে স্থখী করেছিলেন, আশীর্বাদ করি তুমিও তাই করবে।” মার লোহা হাতে পরে জলভরা চোখে সে ফিরে গেল তার নিজের ঘরে। এবারও সে পারল না বিশ্রাম করতে। বিভা এসে দেখা দিলেন, বললেন তিনি—“শুনলে বাছা, তোমার বর অফিসের কাজে আজ রাতেই চলে যাবেন। যেমন অদ্ভুত বিয়ে তার তেমনি অদ্ভুত সব ব্যবস্থা। এখন যতদিন না তার মজি হয় ততদিন তোমার থাকতে হবে এখানেই। আর শুয়ে কি করবে? বরের ত মিষ্টি মুখ করবার অবসর হল না। আধখানা সন্দেশ ভেঙ্গে খেয়েই সে দিল পিটান। এখন তুমি উঠে একটু খাও, সারাদিন ত' উপোস দিয়ে আছ।” কথাগুলি বলে বিভা হাতের খালাখানি টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে চলে গেলেন।

প্রায় মাসখানেক এই ভাবে কাটবার পর একদিন বিভাই এসে বললেন সুললিতাকে—“আর কেন, এবার তৈরী হয়ে নাও, জামাই যে তোমার নিয়ে যাবার জন্তে গাড়ী পঠিয়েছে। এমন লোক ত বাপু কোথাও দেখি নি। এতদিন পর ফিরে এলি, একবার নিজে এসে খণ্ডরের সঙ্গে

দেখা কর, তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর ঘেয়েকে নিয়ে যা। আমার না হয় নাই গ্রাহি করলি, আমি না হয় পরই। খণ্ডর ত আপনায়? তা কথাবার্তা নেই গাড়ী এল আর সঙ্গে এল এক বুড়ো সরকার। তোমার বাবাকে ত এসব বিষয় একটি কথা বলবার যো নেই, কি যাহু করেছে তাঁকে তা' বলতে পারি নে বাপু। জামাইয়ের বিরুদ্ধে একটি কথা বলবার উপায় নেই। আমার ত' ইচ্ছা নয় তোমায় পাঠাই। কিন্তু আমার কথা কি তোমার বাবা শুনবেন? সব অপমান সেখানে গায়ে মেখে নিয়ে হজম করে ফেলবেন। এখন আর গোল বাধিয়ে কি হবে? যেতে যখন হবেই তখন মানে মানে যাওয়াই ভাল, তৈরী হয়ে নাও—”

স্বললিতার ধারণা ছিল তার স্বামীর অবস্থা স্বচ্ছল নয়, তাই তিনি তাকে নিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু মোটর থানি দেখে তার মনে একটু সন্দেহ হল। তারপর গাড়ী যখন একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করল আর বৃদ্ধ সরকার মহাশয় যখন তাকে সোজা উপরে উঠে যেতে বলেন তখন সে সত্যই আশ্চর্য হল। ধনী বাড়ীর মত বাড়ী। তারই উপযুক্ত সাজসজ্জা। কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। প্রত্যেক জিনিসই সুরুটির পরিচয় দেয়। দাসদাসী ছাড়া গৃহে অল্প লোক কেউ ছিল না। সরকার মহাশয়ের মুখে সে শুনল যে তার স্বামী অফিসে গিয়েছেন এবং উপস্থিত তার যা কিছু প্রয়োজন উপস্থিত তার ব্যবস্থা সরকার মহাশয়ই করে দেবেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সে একরকম শুছিয়ে বলল। সন্ধ্যার সময় তার স্বামী ফিরবেন অফিস থেকে। তখন হতেই তার নতুন জীবনের আরম্ভ।

কাহ্নি যখন তার হাতে একখানা চিঠি এনে দিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। চিঠি লিখছেন তার স্বামী :—
সুচরিতাসু,

তোমার কাছে আমি অপরাধী। জানি না কোন দিনও তুমি আমার ক্ষমা করতে পারবে কিনা। তোমাকে দেবার মত আমার কিছুই নেই। অন্তরে আমি বড়ই দীন। শুধু খাওয়া পরার দাবী ছাড়া অনেক দাবী আছে তোমার আমার উপর। সেটা স্বীকার করছি কিন্তু পারছি না গ্রহণ করতে। তোমার উপরও আমার কোন দাবী রইল না। যাতে তোমার

আর্থিক, কষ্ট কোনদিনও না হয় তার ব্যবস্থা আমি পাকাপাকি ভাবেই করেছি। তুমি এ বাড়ীতে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আমার সঙ্গে তোমার কোন দিনই দেখা হবে না। কাজ নিয়ে আমার প্রায়ই বাইরে ঘুরতে হয়। যদি কখনও বাড়ী আসি তবে লাইব্রেরীর ঘর ছাড়া আর কোথাও আমি প্রবেশ করব না। থাকব আমি ক্লাবেই। তোমার বন্ধন যত হালকা হয় উপস্থিত তাই ব্যবস্থা করলাম, তবে এই ভাবে তোমার তরুণ জীবন নষ্ট হতে দেব না। যাতে তুমি সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাও তার ব্যবস্থাও আমি করব। এ বিষয়ে আইনের পরামর্শ নেব। এ বিবাহ ছিন্ন করলে দোষ হবে না। যতদিন না তোমার পুরোপুরি মুক্তির ব্যবস্থা করি ততদিন তুমি ধৈর্য ধরে থাকবে। তোমার মঙ্গল ছাড়া এখন আর আমার অল্প কোন চিন্তা রইল না, এ কথাটা বিশ্বাস কোর—

সই করেছে সে নিজেকে তার অযোগ্য স্বামী সূজয় বলে।

দিনগুলো স্বললিতার মন্দ কাটছিল না। অচেনা স্বামীর ঘর করবার যে একটা ভয় ও ভাবনা ছিল তার, সেটা কেটে গিয়েছিল সূজয়ের চিঠি পেয়ে।

ছপরের খাওয়া দাওয়া সেরে সে যায় তার বাপের বাড়ী। ফেরে যখন, তখন খেয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া আর বিশেষ কোন কাজ থাকে না তার। কয়েক মাস কেটে গেল বটে, কিন্তু স্বামী তার যেমন অপরিচিত ছিলেন তেমনই রয়ে গেলেন, চোখের দেখাও হয়নি একদিনও।

বাপের বাড়ী গিয়ে সে বসে তার বাপের কাছে। পিতার শুশ্রূষায় তার কেটে যায় সমস্ত সময়। আজকাল সনৎকুমার আগের থেকে অনেক ভালই আছেন। অল্পখন্ড চলে হেঁটে বেড়াতে পারেন, কথাও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে এসেছে। বিকালে চাকরেরা তাঁকে চেয়ারে করে নীচে নামিয়ে এনে গাড়ীতে তুলে দেয়, তারপর স্বললিতাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কখনও গঙ্গার ধারে কখনও লেকের ধারে বেড়িয়ে আসেন। প্রথম প্রথম এতে বিভার কোন আপত্তি দেখা যায় নি, কিন্তু আজ কাল তিনি আর স্বললিতার আসাটা তত পছন্দ করেন না। হয়ত মনে ভাবেন এমন করে মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াটা তাঁর পুত্রের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। কি জানি যদি বিষয় সম্পত্তি কিছু ভাগ হয়ে যায়। আজকাল স্বামী

তঁার হাতের মধ্যে নাই। আর এই রকম সাত পাঁচ ভেবে তিনি একদিন বন্ধন স্থললিতাকে—“এখন তো তোমার বাবা একটু ভালই আছেন। আর তোমার রোজ রোজ সংসার ফেলে আসাটা ভাল দেখায় না, জামাই কিছু মনে করেন না ত ?—” স্থললিতা বুঝলে পিতার কাছে তার বেশী আসা চলবে না। আজকাল অনেকটা সময় তার নিজের বাড়ীতেই কাটাতে হয়। সংসারের কাজ নামোজ্ঞ। অনেক সময় থাকে তার হাতে। তাই সে বই পড়তে মন দিল। বাপের বাড়ী থেকে, লাইব্রেরী থেকে, দোকান থেকে কিনে সে যেখান থেকে পেল বই যোগাড় করে পড়তে শুরু করে দিল। জীবনটা তার এক রকম অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল, এমন সময় এল মিস্ ব্রমফিল্ডের চিঠি। স্থললিতা যাবার পর তিনি অসুখে পড়েন। অনেক দিন ভুগে এই উঠেছেন সবে; তাই তিনি স্থললিতার খোঁজ খবর নিতে পারেন নি এতদিন। তারপর নানা কথার পর লিখেছিলেন—“তুমি চলে যাবার কিছুদিন পর মিষ্টার রায়ের একখানা চিঠি পাই। আমাদের সঙ্গে দেখা না করে এমন ভাবে চলে যাওয়ার দরুণ দুঃখ প্রকাশ করে জানান যে লগুনে পৌছবার কয়েক দিন পরেই তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হয় কাজের জন্য। তোমার সঙ্গে তাঁর কি কথা আছে লিখেছিলেন, তুমি যদি বল ত তিনি কাজ শেষ করেই আবার চলে আসবেন বিলেত। চিঠিটা অবশ্য লিখেছিলেন অনেক আগে, তবে অসুখ থাকায় সেই চিঠি সবে এইমাত্র আমার হস্তগত হয়। বেচারী ভক্তলোক জবাব না পেয়ে কি যে মনে করলেন জানি না। তাঁকে নানা জায়গায় ঘুরতে হবে বলে তিনি বাড়ীর ঠিকানা না দিয়ে বলেছিলেন কোলকাতার টমাস কুকের জিম্মায় চিঠি পাঠাতে। আমি আজই তাঁকে সেই ঠিকানায় চিঠি দিলাম। তাঁর চিঠির ভাবে মনে হয় তিনি তোমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করতে চান; তাই তঁার মনে বুঝা আশা না দিয়ে লিখে দিলাম যে তুমি এখন বিবাহিতা—” চিঠি পড়ে স্থললিতা বসে রইল স্থির হয়ে খানিকক্ষণ। অনেক কথা তার মনের মধ্যে জড় হয়ে উঠল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিঠিখানা ভুলে রাখলো। মিস্ ব্রামফিল্ড আরও লিখেছিলেন যে তিনি মিষ্টার রায়কে স্থললিতার বাড়ীর ঠিকানা দেন নি; কারণ তাঁর ভয় ছিল পাছে তিনি ঠিকানা পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার

বিবাহিত জীবনে কোন গোল বাধিয়ে বসেন। স্থললিতার হাসি পেল। মিস্ ব্রামফিল্ড যদি একবার তার বিবাহিত জীবনের ব্যবস্থাটা দেখতে পেতেন!

একদিন বইএর দরকার হল তার বিশেষ করে। চাকরদের মুখে সে শুনেছিল যে বাবু তাদের কাজের জন্ত গিয়েছেন আসানসোল। ছ চার দিনের পর ফিরবেন কোলকাতায়। এই সুযোগে নোচেকার লাইব্রেরী থেকে বই আনতে নেমে গেল স্থললিতা। তার স্বামী যদি কখনও বাড়ী আসেন ত এই ঘরটাতেই থাকেন; তাই সেখানে তাঁর পড়ার বই কয়েকটা পড়েছিল তাঁর টেবিলের উপর। একখানা বই সে তুলে নিল তাঁর টেবিল থেকে। বার বার করে এক রাশ ছবি পড়ে গেল মাটিতে। ছবিগুলো তুলে সে শুরু হয়ে চেয়ে রইল সেগুলির দিকে। একটি মেয়ে উটের পিঠে বসে আছে আর তার মুখ ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রিয়দর্শন যুবক। সে উপর দিকে চোখ তুলে চেয়ে আছে মেয়েটির দিকে, মেয়েটি চোখ নীচু করে চেয়ে আছে তারই দিকে। হৃৎজনের মুখে লেগে রয়েছে হাসির রেখা। তাদের পিছনে রয়েছে ফ্লিংসের অর্দ্রসিংহ অর্দ্রনারী মূর্তি। তারও ঠোঁটের কোণে হাসি রয়েছে লেগে, তার মর্ম্ম আজও কেউ বুঝতে পারে নি। আগুণ লেগে গেল স্থললিতার মাথায়। স্বামী তাকে মুক্তি দিতে চান নিজে মুক্ত হবার জন্তে। জানতে পেরেছেন তিনি তার প্রবাসযাত্রার সঙ্গীর কথা। জোগাড় করেছেন তাই তিনি এই ছবিগুলো। এগুলিরই দোহাই দিয়ে তিনি এই প্রেমহীন বিবাহবন্ধন করবেন ছিন্ন। তার মাথায় কলঙ্কের ডালি ভুলে দিন তিনি, তাতে তার নাইক দুঃখ। কিন্তু আর একজনকে ভাগী সে হ’তে দেবে না কিছুতেই। যেমন করে হক তাঁর স্থান সে বজায় রাখবেই। এর দরুণ সে জন্ম জন্ম যদি মুক্তি না পায় তাতেও সে রাজি আছে। ছবিগুলো সে তুলে নিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে। লেখবার সরঞ্জাম কাছে টেনে নিয়ে লিখতে লাগল—

“মাননীয়েষু

মিষ্টার রায়, হঠাৎ আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হবেন। কিন্তু লিখবার প্রয়োজন আছে। বিলেত থেকে ফিরে এসে আমার বিবাহ হয়। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেন নি। আমাকে এ বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে

চান সে কথা তিনি আমার জানিয়েছিলেন। কিন্তু আসল কথা তিনি নিজেই মুক্ত হ'তে চান। আজ হঠাৎ তাঁর টেবিলের উপর থেকে একটা বই নিতে গিয়ে এই ছবিগুলো পেলাম। বুঝলাম আপনার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে তিনি এ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চান। এটা আমি কিছুতেই হ'তে দিতে পারি না। এ ছবিগুলো ফেরৎ পাঠাচ্ছি। নষ্ট করে ফেলবেন, নয়ত এমন জায়গায় রাখবেন যেখানে আমার স্বামীর হাত না যায়। এমন ভাবে আপনার স্মরণপথে দেখা দিলাম—কিছু মনে করবেন না। ইতি—ললিতা দেবী।

স্বললিতা না লিখে সে ললিতাই লিখল। কারণ মিষ্টার রায় তাকে ললিতা বলেই জানতেন; সেই নামেই তিনি তাকে ডেকেছিলেন একবার। টমাস কুকের ঠিকানায় চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়ে সে নিশ্চিত হ'ল।

দু'চারদিন কেটে গেল। তার স্বামী আজ ফিরবেন কলিকাতায় এ কথা সে শুনলে চাকরদের মুখে। স্বামী এসে যখন দেখবেন মুক্তির পথ বন্ধ তখন নিশ্চয় তার সঙ্গে হ'বে তাঁর বোঝা পড়া। তার জ্ঞান সে প্রস্তুত হয়েই ছিল।

বিকালে সে বসেছিল ছাদের উপর। বইয়েতে আর তার বসে না মন। মিষ্টার রায়কে চিঠি লিখে অবধি মন হয়েছিল অস্থির। ছাদের প্রাচীরের গায়ে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিম আকাশ তখন রান্ধা হয়ে গিয়েছে রবির শেষ রশ্মি বুকে নিয়ে। সেই দিকেই চেয়েছিল স্বললিতা স্থির দৃষ্টিতে। “ললিতা, তোমার চিঠি এই মাত্র পেলাম”—৫মকে সে চেয়ে দেখে মিষ্টার রায় তার সামনে দাঁড়িয়ে। বিরক্তিশূন্য স্বরে সে বল্লে—“চিঠি যদি পেয়েছেনই, তবে এলেন এখানে কি করতে? আমার স্বামীর আজ কোলকাতায় ফেরবার কথা; তিনি যদি আপনাকে এখানে দেখেন তা' হ'লে যা আমি বন্ধ করার চেষ্টা করছি, তাকি বন্ধ করতে পারব—?” একটু হেসে মিষ্টার রায় বল্লে—“আজ আমি তোমার স্বামীর বিষয় ভাবতে পারব না। যে কথার স্রোতকে মার পথ থেকে ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল, সে আজ তা'র কোন বাধা মানবে না। একটা গল্প বলবার আছে; তোমায় শুনতে হবে।” বাধা দিয়ে বল্লে ললিতা—“আচ্ছা, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই কি গল্প বলবার সময় না স্থান? যদি জানতেন এর জ্ঞান আমি

কত বিব্রত হচ্ছি তা' হ'লে আপনি এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতেন না—।”

ফের একটু হেসেই মিষ্টার রায় বল্লে—“অত উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ নেই। এই বেতের চেয়ারটাতে স্থির হয়ে বসে আমার গল্পটা শোন—” আজ মিষ্টার রায় তাঁর যা বলবার আছে তা' না শেষ করে যাবেন না বুঝে স্বললিতা গিয়ে বসল চেয়ারটিতে। মিষ্টার রায়ের দিকে চেয়ে বল্লে—“কি বলতে চান শীঘ্র শেষ করে ফেলুন—” “শীঘ্র শেষ হবে কিনা জানি না, তবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখান থেকে ছুটি পাবে না এটা ঠিক।” মিষ্টার রায় একবার গভীর দৃষ্টিতে স্বললিতার দিকে চেয়ে গল্প আরম্ভ করলেন—“একটি ছেলে ছিল। অল্প বয়সে সে তার বাপ মা দু'জনকেই হারায়। দেশের জমীজমা খুড়ো জ্যাঠার। যে ব্যার ভাগ করে নিয়ে দেয় তাকে পথে বসিয়ে। বাপের এক বন্ধুর কাছ থেকে বহু কষ্টে ভিক্ষা টিফা করে সে পাশ করলে ম্যাট্রিকুলেশন। আর পড়া চলে না। একটি দিশী মার্চেন্ট আপিসে জুটল তার একটি ক্লার্কের কাজ। ১৫টি টাকা সে যখন প্রথম হাতে পেল মনে হ'ল স্বর্গই বুঝি বা তাঁর মৃত্যুর মধ্যে পেয়ে গিয়েছে সে। এমন সময় একটি ঘটনায় তার জীবনের ধারা বদলিয়ে গেল।” মিষ্টার রায় একবার চাইলেন স্বললিতার দিকে। পাথরে গড়া মূর্তির মত সে বসেছিল, কথা গুলো তার কানে পৌঁছছিল কিনা তাও বোঝবার ছিল না উপায়। মিষ্টার রায় ফের বলতে শুরু করলেন—“আপিসের মালিক যিনি ছিলেন তিনিই ছিলেন সকলের বড় সাহেব।” একদিন তিনি লিফট চ'ড়ে উঠছিলেন দ্বিতলে তাঁর আপিস ঘরে। পকেট থেকে রুমাল বার করতে গিয়ে একটা চামড়ার ব্যাগ পড়ে যায়, তিনি তা' লক্ষ্য না করে লিফটে চড়ে চলে যান উপরে। ছেলেটি সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল তখন। নোটকেশটি দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে তখুনি সে গেল বড় সাহেবের আপিস ঘরের কাছে। সাহেবের চাপরাশী কিন্তু এই মলিন বেশ ধারী ছেলেটিকে দিলে না যেতে সাহেবের কাছে। একটা যাজ্ঞা পর্যন্ত সে নোটকেশটি বুকে করে নিয়ে রইল।

তারপর টিকিনের ছুটির সময় সে গিয়ে দাঁড়াল দরজার কাছে। একে একে সকলেই বেরিয়ে গেলেন, এলেন বড় সাহেব। ছেলেটি তাড়াতাড়ি গিয়ে নোটকেশটি তুলে দিল তাঁর হাতে। বড় সাহেব তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাঁর আপিস ঘরে। নোটকেশটির ভিতর ছিল দশখানি ১০০ টাকার নোট। বড়সাহেব ছেলেটির পরিচয় নিলেন। সব শুনে বল্লেন তিনি—“তোমার খাওয়া পরার জন্ত মাসিক ২০ টাকা দেব এবং যত দূর ভূমি পড়তে চাও তার সম্পূর্ণ ভার নেব আমি।” বড় সাহেবের আশীর্বাদে ছেলেটি বি, এস, সি পাশ করল সম্মানের সঙ্গে। তখন বড়সাহেব বল্লেন—“তোমাকে আমি বিলেত পাঠিয়ে এঞ্জিনিয়ার করে আনব, তারপর আমার ফার্মের অধীনে যত কল কারখানা আছে তার তত্ত্বাবধান করবে তুমি—” মিষ্টার রায় একটু থামলেন। স্থললিতা কিন্তু ধেমন নিশ্চল হয়ে বসেছিল তেমনই বসে রইল। মিষ্টার রায় গলাটা সাফ করে নিয়ে গল্প বলা ফের শুরু করলেন,—“ম্যাঞ্চেষ্টার স্থল অব এঞ্জিনিয়ারিং থেকে সে পাশ করে ফিরে এল। বড় সাহেবের কথায় সে বড় চাকরোই পেল, উত্তরোত্তর তার উন্নতি হ’তে লাগল। মাইনের টাকা জমিয়ে সে বড়সাহেবের নিকট হ’তে আর্থিক ঋণযুক্ত হ’ল বটে। কিন্তু তাঁর স্নেহের ঋণ যে সে কোন দিনও শোধ করতে পারবে না এটা বলা বাহুল্য। যা হক একদিন বড়সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়ে বল্লেন—“আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করলে আমি বিশেষ সুখী হ’ব। পারবে নিতে তার ভার?” যার আশীর্বাদে ছেলেটি দশের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল তাঁর কন্ঠ্যকে বিবাহ করার মত সৌভাগ্য যে তার কোন দিন হ’বে তা সে ভাবতেই পারে নি। সানন্দেই সে সম্মতি দিল। মেয়েটিকে দেখতেও সে চায় নি, বড়সাহেবের মেয়ে এই ছিল তার যথেষ্ট পরিচয়। আশীর্বাদ হয়ে গেল। বিয়ের দিনটা ঠিক হ’বার আগে

ছেলেটিকে কাজের জন্ত যেতে হয় বিলেত! জাহাজে তার দেখা হয় একটি মেয়ের সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই সে তাকে ভালবেসে ফেলেছিল—”

মিষ্টার রায় স্থললিতার কাছে সরে এসে মুহূ কোমল স্বরে বল্লেন—“বুঝতে পারলে ললিতা, ছেলেটি কে?” ললিতা কোন জবাব দিল না। মিষ্টার রায় বলে চল্লেন—“তার মনের কথা সে ব্যক্ত করবেনা ঠিক করেছিল। কিন্তু একদিন মনের আবেগে সে নিজেকে ধরা দিয়ে ফেলেছিল। সব কথা তার বলা হয় নি। মাঝপথে বাধা পেয়ে তার না বলা বাণী অধরে চেপে ফিরে যেতে হয় তাকে। এর পর আর সাহস হয় নি তার মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে। দেশে ফিরে এসে সে মেয়েটির বন্ধকে একখানি চিঠি দেয়। তাকে সে জানিয়েছিল যে, যদি মেয়েটি তাকে ডাকে তবে সব ব্যবধান কাটিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে তার পাশে। সে চিঠির কোন উত্তর সে পায় নি। তবু সে ঠিক করল বিবাহ সে করবে না। এই অভিপ্রায়ে সে গেল বড়সাহেবের বাড়ী। সেখানে গিয়ে দেখল বড় সাহেব শয্যাশায়ী। তার বলা অসমাপ্তই রয়ে গেল। যথা সময়ে বিবাহ তার হয়ে গেল। বিবাহিতা পত্নীকে দেখবারও কৌতূহল হয় নি তার একদিনও। সমস্ত মনপ্রাণ তার নিজের অধীনে আর ছিল না।” সহসা মিষ্টার রায় স্থললিতাকে নিজের আলিঙ্গনের ভিতর আবদ্ধ করে নিয়ে বল্লেন—“তারপর তোমার চিঠি পেলাম। বুঝলাম, তুমিই ললিতা আবার তুমিই আমার স্ত্রী স্থললিতাও বটে।”

কোথা থেকে গভীর লজ্জা এসে ঘিরে ফেলে স্থললিতাকে। সে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। বাধা দিয়ে মিষ্টার রায় বল্লেন—“না না। আজ আর পাল্লাতে পারবে না, ললিতা। আজ আমার না বলা বাণীর শেষ রাগিনী তোমাকে গুন্তেই হবে।”

কবি আর লেখকের দল ওদের জয় ঘোষণা করে। সভায়
স্থির হয় ওরা নাকি নিজেরাই একটা মাসিক পত্র বার
করবে এবং সেখানে কেবল তারাই প্রবেশাধিকার পাবে।
যশস্বী লেখকেরা নয়।

“ও কি টেবিলে অত কৌল লাগাচ্ছ কেন?” স্বপ্নার
হাসির শব্দে অমিতাভের তল্লা ছুটে যায়।

“একি, এতক্ষণ শুধু স্বপ্নই দেখেছিলাম?” সে বোকার
মত চেয়ে থাকে।

“চা খাবে না?” স্বপ্নার ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি।
“নিশ্চয়ই—কিন্তু আগে আমার লেখাগুলো ফিরিয়ে
দে আমায়।”

“কেন?” স্বপ্না সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

“পরে বলবো। একটা চমৎকার গল্পের প্লট আমার
মাথায় এসেছে। এবারে নিশ্চয়ই ছাপবে দেখিস্।”
অমিতাভ মনের আনন্দে হেসে ওঠে। স্বপ্না অবাক হয়ে
চেয়ে থাকে তার এই খেয়ালী ভাইটার দিকে।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—বেলা দে

মহাভারতের নারী-গান্ধারী

শ্রীবেলা দে

নারীচরিত্রের আদর্শ আমাদের দেশে যে কত মহনীয়,
তা আমরা গান্ধারী চরিত্র আলোচনা করলেই দেখতে পাই।
গান্ধারী ছিলেন গান্ধার দেশের রাজ্যের মেয়ে! কুরুবংশীয়
ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীদেবীর বিবাহ হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্র
ছিলেন জয়াক্র, কাজেই তাঁর কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজা হয়েছিলেন।
গান্ধারী রাজকন্যা হয়েও একজন অন্ধের জীবনসঙ্গিনী হলেন,
রাণী হয়েও স্বামীর অন্ধতার জ্ঞাত রাণীত্ব থেকে বঞ্চিত
হলেন। কিন্তু এই মহৎ নারীর এজ্ঞাত কোন ক্ষোভ ছিল না।
স্বামী অন্ধ, ধরণীর বিশাল প্রান্তর, দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ,
নানা বর্ণবিশিষ্ট ফুল ফল পাতা, রাষ্ট্রজৈষ্ঠ্য প্রিয়জনের মুখ কিছুই
দেখতে পান না। অন্ধের দুঃখ সীমাতীত, চক্ষুস্থান তা কি
করে উপলব্ধি করবে? স্বামীর দুঃখ গান্ধারীর কাছে
অসহনীয়। এর প্রতিকারের উপায় নেই, একমাত্র সাহসনা
নিজেরও সেই দুঃখের ভাগ নেওয়ায়। স্বামী যেখানে
চক্ষুহীন হয়ে বিশ্বের আলোক থেকে বঞ্চিত সেখানে সত্যি
গান্ধারী পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ কেমন করে উপভোগ করবেন?
তাই সত্যিরাণী চক্ষুশ্রুতি হয়েও নিজের চক্ষুদ্বয় আজীবনের
মত বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে রাখলেন। এমন কল্পসাহন ক'জন
করতে পারে? এই ভারতবর্ষে অনেক সাধ্বী নারী স্বামীর চিত্তায়

প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু এমন করে জীবিত অবস্থায়
একভাবে দুঃখ ভোগ কয়জন করেছেন? আজকের আলোচনা
প্রসঙ্গে এ যুগের এক পুত নারী চরিত্রের কথা মনে পড়ছে।
তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর প্রিয়তমা সঙ্গিনী কস্তুরীবাঈ।
তিনিও গান্ধারীর মত সমান ভাবে স্বামীর সঙ্গে কারাগার
বন্দনা ভোগ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে গেছেন। বর্তমান
যুগেও ভারতের নারী অতীতের আদর্শকে ভোলেনি,
মহিম্বী কস্তুরীবাঈএর চরিত্র তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দুঃখই ছিল গান্ধারীর জীবনের সাথী। যৌবনে পেলেন
অন্ধ স্বামী, তারপর পুত্রদের নিয়েও তিনি সুখী হ'তে পারেন
নি। তিনি ছিলেন ধর্মশীলা নারী, কিন্তু নিরানন্দই স্বন
পুত্রই ছিল শয়তানের প্রতিমূর্তি। কিন্তু এই বীরনারী
কোনদিনও পুত্রহারা অন্ধ ছিলেন না। যেখানে ধৃতরাষ্ট্র
পুত্রহারা অন্ধ পিতা, সেখানে গান্ধারী কর্তব্যপরায়ণা মাতা।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘গান্ধারীর আবেদনে’ লিখেছেন গান্ধারী
বলছেন—

“পাপী পুত্র ক্ষমা করো যদি

নিবিচারে, মর্জারাজ, তবে নিরবধি

যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষী জনে

ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে,—

তায়ের বিচার তব নির্মমতারূপে

পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে।

ত্যাগ করে

পাপী হুঁধ্যাধনে।”

পুত্র কত ভালবাসার ও সাধনার ধন, কিন্তু সেই পুত্র যখন পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে, তখন গাঙ্গারী কঠোর হাতে পুত্রকে শাসন করেছেন এবং স্বামীকেও উদ্বেজিত করেছেন পুত্রকে শাসন করবার জন্য। স্বামীপুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে ধর্মকে কোন দিন বলি দেন নি। পুত্রকে অত্যাচার সমর থেকে নিরস্ত করতে বহুবার চেষ্টা করেছেন। নারীমাত্রই কামনা করে “ছেলে আমার রাজা হোক।” কিন্তু এই মহীয়সী নারী পুত্রকে অনধিকার সিংহাসন গ্রহণ করতে বার বার নিষেধ করেছেন।

আরো কঠিন অগ্নিপরীক্ষার ভিতর গাঙ্গারীকে পড়তে হয়েছে। সেই সপ্ত মূর্ত্তে শতকরা নিরানব্বই জন স্ত্রী পুরুষই নিজের সংঘম হারিয়ে ফেলত; কিন্তু এই নারী কি করলেন? যখন রেহাম্পাদ পুত্র মায়ের চরণবন্দনা করতে এসে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন, তখনও তাঁর জন্ম ধর্মপথ থেকে বিচলিত হয় নি। প্রিয়তম পুত্র মায়ের পদপ্রান্তে বসে মাতাকে জয়কামনা করবার জন্য অহরোধ করলেন। সেই মুহূর্ত্তটুকু ও তাঁর মন বিচলিত হলো না। পুত্রকে মিথ্যা আশ্বাস দিলেন না—গভীর ভাবে বললেন—‘যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ অর্থাৎ ধর্ম যেখানে জয় ও সেইখানেই। এক শত পুত্রের জননী, তাঁর সকল পুত্রই যুদ্ধে যাচ্ছেন, তবুও তিনি যাত্রাকালে একবারও পুত্রকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারলেন না।

স্বামী পুত্র ও জামাতা কেউই গাঙ্গারীকে স্থখী করতে পারে নি। কিন্তু এই ক্ষত্রিয়রমণী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজের কর্তব্য করে গেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে গাঙ্গারীর অবস্থা দেখে আমাদের জন্ম সমবেদনায় ভরে ওঠে। রণক্ষেত্রে মৃত আত্মীয়স্বজনের মৃতদেহের নিকট এসে গাঙ্গারীর এতদিনের যুক দুঃখ মৃত হয়ে ওঠে। সে দুঃখ আর তিনি সহিতে পারলেন না। বিধবা পুত্রবধুগণকে দেখে তাঁর শোক অসহনীয় হয়ে ওঠে! তাই তিনি পুত্রবধুদের সঙ্গে অঝোর ধারে কাঁদতে লাগলেন। শেষ বয়সে স্বামীকে অবলম্বন করে বনে তপস্যা করতে গেলেন। শেষে দাবানলে মৃত্যুমুখে তাঁরা স্বামী ও স্ত্রী প্রাণ বিসর্জন দেন।

গাঙ্গারী চরিত্র মহাভারতের একটা অপ্রধান চরিত্র। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এই তেজস্বিনী নারীচরিত্রটি আমাদের মনের ভিতর রেখাপাত করে। দুঃখ বেদনায় তাঁর জন্মস্থান পুড়ে গেলো, কিন্তু যে ধর্মকে তিনি আশ্রয় করেছিলেন, সেই ত্রায়ধর্ম কোন দিনই ত্যাগ করতে পারেন নি। আর স্বামীর জন্য এই যে গভীর আত্মত্যাগ তাঁর জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা কেবল গাঙ্গারীর চরিত্রেই দেখতে পেলাম।

যরের কথা

রান্নাঘর

শকুন্তলা

ইংলিস কাষ্টার্ড—উপকরণ দুখ ১/১ সের, চিনি ১ ছটাক, ৩টা মুরগীর ডিম, কয়েক ফোটা এসেন্স অফ ভ্যানিলা।

প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমে ঐ ১/১ সের দুধকে জাল দিয়ে আধসের করে রাখুন। তিনটা ডিমের সারাংশ নিয়ে বেশ করে ফেটিয়ে ঐ ঘন করা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খুব করে ফেটিয়ে নিন। ঝারা বেশী ঘিনি পছন্দ করেন তাঁরা ইচ্ছামত ঝারা চিনি মিশিয়ে দিলেই হবে। এখন একটা পাত্রে কিছু বরফ দিয়ে তার উপর এই কাষ্টার্ডের বাটাটা বসিয়ে রাখুন; তাহলেই অল্প একটু জমে আসবে। তখন ইচ্ছামত সকলকে এই কাষ্টার্ড পরিবেশন কর্তে পারবেন। উপরে একটু এসেন্স অফ ভ্যানিলা দিয়ে দেবেন।

ফটেলের পুঁ

আমাদের দেশে ঋতুভেদে নানারকম স্বস্বাছ ফল জন্মে থাকে। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ আস্তফলই খেয়ে থাকি। পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু এই সব নানা জাতীয় ফলের সুখরোচক খাবার তৈরী হয়ে থাকে। আমি এখানে তারই কয়েকটা প্রণালী বলে দিচ্ছি—প্রথমে কয়েকটা আপেল ও আনারসের অথবা ন্যাসপাতির খোসা বাদ দিয়ে চাকা চাকা করে কেটে ধুয়ে নিন। এবারে একটি ডেকচি বা সমপ্যানে পরিমাণ মত চিনি ও জল দিয়ে উত্তুন চড়িয়ে দিন। রসটা একটু ফুটলে তার সঙ্গে ঐ ছাড়ানো ফলগুলিও দিয়ে দেবেন। যখন দেখবেন ঐগুলি সম্পূর্ণ গলে গেছে তখন আরো কতকগুলি আপেল ও গায়ে ছোঁদা করে ঐ ভাবে চাকা চাকা করে কেটে নিয়ে ফলের রসের মধ্যে ফেলে দিন। কিন্তু লক্ষ্য

ত্ৰীপিনাকীৰঞ্জন কৰ্ম্মকাৰ

সেদিন বোশেখে এলে নব আশা নিয়ে ।
সকল বিষাদ ক্লান্তি ঘুচাইয়া দিয়ে ॥
ধুয়ে দিলে মহাপাপ অতীতের কোলে ।
হাসালে বসুধা তাই আনন্দহিল্লোলে ॥
কচি ভূগুণ্ডলি যত মুকুলি' উঠিল ।
কাঁচা শ্ৰামা ঘাসে ঘাসে শিহরণ দিল ॥
বরষে বরষে তুমি আসো বাঙলায় ।
ঢেলে দাও স্নেহ বারি সহস্র ধারায় ॥
পুরাণো বেদনা-শোক মুছাও প্রাণের ।
ঘুচাও দৈন্য-দুখ যত অতীতের ॥
দিকে দিকে বাজে-ওই মঙ্গল: আৰতি ।
মৰ্ম্মেরে ধ্বনিছে শোন তব ভাষা-গীতি ॥
আবীর ছড়ায়ে এলে রাঙা উষা-বালা ।
এনেছিলে হাতে করে পারিজাতমালা ॥

সোনালী আলোক মাখি'—মধুর প্রভাত ।
হেসে হেসে ধীরে ধীরে করে প্রণিপাত ॥
(আজ) স্তম্ভুর গগন থেকে নিলে কী বিদায় ।
স্মৃতি লয়ে কাঁদে সব করে শুধু হায় ॥
এসো গো মরতে তুমি নব ভক্তিমায়া ।
সাজাই স্মরতি ফুলে—বকুল মালায় ॥
পুৰাণো স্মৃতির বনে আনো জাগরণ ।
জাগাও সবার প্রাণে প্রেরণা নূতন ॥
বিদায়ের ক্ষণে দাও মুহূৰ্ত্তলহার ।
প্ৰীতির অমৃত ঢালো পরাণে সবার ॥
ছড়াও মাধুরী তব আলো—জ্যোৎস্নায় ।
বাসনার শিখা কাঁদে আজি বেদনায় ॥
জ্যেগেছিল হিয়াখানি তোমা' পানে চাহি' ।
বিদায়ে দহিয়া গেলে ভাষা তার নাহি ॥

কাঁচা লেখার আসর

পরিচালিকা—ত্ৰীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

(নবীনাদের উৎসাহকল্পে অল্পবয়স্কা লেখিকাদের লেখা এই বিভাগে প্রকাশ করা হইবে। কোন মহিলা প্রতিষ্ঠানের মারফত প্রেরিত লেখাই অগ্রে বিবেচনা করা হইবে।)

স্বপ্ন

ত্ৰীমানসী দেবী

'অসহ'—অমনোনীত হয়ে সদ্য-ফিরে-আসা গল্পটিকে
স্বপ্নার কোলের ওপর ছুড়ে ফেলে অমিতাভ বলে ওঠে,
'অসহ'।

'ফিরে এলো বুঝি?' খবরের কাগজ থেকে মুখ না
তুলেই স্বপ্না বলে।

'তা ছাড়া—আর নতুন কি হতে পারে?' ধপ্ করে
একটা চেয়ারে বসে পড়ে অমিতাভ। ওর গলার স্বরটা
কেমন যেন একটু কাঁপা শোনায়। স্বপ্নার চোখ এই
বার তার দাঁটার ওপর এসে পড়ে।

'খুব ধৈর্য্য কিন্তু তোমার, বাপু! অন্য কেউ হলে—'

'না—না—না—' বাধা দিয়ে চীৎকার করে ওঠে
অমিতাভ, 'এইবার আমার সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে
গেছে।' অসহায় পাগলের মত ছুটে যায় অমিতাভ তার
সেই নির্জনে ঘরটিতে, বেছানো বসে সে লেখে গল্পের পর
গল্প আর লেখে কবিতা।

খানিক বাদে-বেরিষে আসে ও। হাতে তার কাগজের
বাঁশিল।

'একটা দেশলাই দেবে স্বপ্না!' হতাশার সুরে বলে
অমিতাভ। 'ওকি, পোড়াবে-নাকি?' আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন
করে স্বপ্না। 'এত কষ্ট করে করে লিখেছ সব। না, তোমার
দেখছি নিতান্তই মাথা খারাপ হয়েছে, অসম্ভবই বা কী—। কলেজ থেকে ফিরেই তো বসবে

ছাই পাশ লিখতে। সময়ে খাওয়া নাওয়া নেই—। সব সময়েই নাকি ওর মাথায় গল্পের গ্লট গজগজ করতে থাকে। এমন এক দিনও দেখলাম না ঠিক সময়ে খাবার টেবিলে কিছা চায়ে যোগ দিয়েছে—” আত্মগত ভাবে বলে চলে স্বপ্না।

“আমার যা খুসী তাই করবো—” বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলে অমিতাভ। এইবার স্বপ্না তার দাদার হাত থেকে কাগজের বাঙালি ছিনিয়ে নেয়। নিষ্কল আক্রোশে সদা ফিরে-আসা গল্পটাকে টেবিল থেকে তুলে নিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ফেলে তীব্র দৃষ্টিতে তাকায় স্বপ্নার দিকে। হঠাৎ হুঁহাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়ে সে ব্যর্থ হতাশায়। অমিতাভ আজ সত্যিই বড় ক্রান্ত। এত দিন সে ধৈর্যসহকারে সমস্ত সম্পাদকের উপেক্ষা নীরবে সহ্য করে এনেছে। কিন্তু আজ যেন সে সত্যিই একে বারের ভেঙ্গে পড়েছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অমিতাভ টেবিলে মাথা রাখলো।

“অমিতাভ বাবু—” কার যেন ডাকে ও চেয়ে দেখলো। এক ধুবক, কবিজনোচিত চেহারা, তাকে ইশারা করে ডাকছে।

“কী ব্যাপার ?” অমিতাভ অনিচ্ছাসহেও তাকে অনুসরণ করলো।

“আপনার সঙ্গে একটু বিশেষ প্রয়োজন।” আগন্তুক ফিস্ ফিস্ করে বলল। “একটু এদিকে আসুন ভোঁ।”

তাকে বোকার মত অনুসরণ করে চললো অমিতাভ। দীর মন্থর গতিতে কেমন যেন একটা লঘু স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে ও। বাঃ বেশ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে তো! একি ওখানে কারা যেন জটলা করছে। অমিতাভ নৈমিত্তিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। “আশ্চর্য্য হবেন না, অমিতাভ বাবু” আগন্তুক অমিতাভের দিকে চেয়ে বলল। “এঁরা সবাই আপনার জন্তই অপেক্ষা করছেন।” “কেন? কেন?” অধীর প্রশ্ন করে অমিতাভ। এইবার ওরা যখন এসে পৌঁছলো ওদের কাছে, তখন সেই দলের কয়েকটা লোক উঠে দাঁড়িয়ে অমিতাভকে অভিনন্দন জানালো। কে একজন একটা মালাও পরিয়ে দেয় ওর গলায়।

“এ সব কী?” বুখাই ও ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

“এঁরা”, আগন্তুক অভিভাভের দিকে ফিরে বলে, “সবাই মাসিক-প্রত্যাখ্যাত কবি আর লেখকের দল।” এঁরা সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিধান করেছেন। এবং এই মাত্র জানতে পেরেছেন যে আপনিও তাঁদের দলভুক্ত হয়েছেন। আপনার কী কোনও লেখা ফিরে আসেনি? আসেনি প্রত্যাখ্যাত হয়ে, আপনার সকল আশাকে ভঙ্গ করে, আপনার সকল পরিশ্রম আর স্বপ্নকে চূর্ণ করে? অতএব—এঁরা সবাই আপনার কাছে বাণীর প্রত্যাশা করেন।”

“আমি” অভিভাভ বলে উঠলো—“বক্তা হিসাবে বিশেষ পারদর্শী নই। কেবল মাত্র মনের ভাবকে লেখনীতে প্রকাশ করে এসেছি। তবে সম্পাদকবৃন্দের ওপর আমার নিদারুণ অভিযোগ আছে। তাঁরা অনেক উদীয়মান লেখকের গতি অস্বাভাব্যে বোধ করেছেন।”

দলের ভেতর থেকে একটা বলিষ্ঠ গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক, (এ পর্য্যন্ত, সে বলে যে, প্রায় তিরিশ জন সম্পাদক তার লেখা প্রত্যাখ্যান করেছে। তার প্রতি অবিচারই নাকি সবচেয়ে বেশী চলছে। ওর আর ধৈর্য্য নেই।) হঠাৎ চীৎকার করে বলে ওঠে, “আমরা সমস্ত সম্পাদকদের ধরে আনবো এবং যথোচিত শিক্ষা দেব।” সে তার পেশী বহুল বাহুগল উত্তোলন করে। কিন্তু হঠাৎ কী যেন একটা এলোমেলো হয়ে যায়। দেখা যায় দূরে কারা যেন দল বেঁধে আসছে। কোন বুদ্ধ প্রবীণের দল। অকস্মাৎ প্রত্যাখ্যাত কবি আর লেখকের দলের মধ্যে একটা চাকল্য দেখা যায়।

“চিনেছি—” অনেকে চীৎকার করে বলে, “এরাই আমাদের শত্রু সেই সব সম্পাদকদের দল। তারা সবাই স্ব স্ব সম্পাদকদের নাম করতে থাকে। অমিতাভও চিনতে পারে তার নিজস্ব সম্পাদকদের। এর পরে রীতিমত একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। বেশ বোকা যায়, একটা আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক ব্যাপার।

প্রবীণেরা হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। প্রত্যাখ্যাত

মিসেস সেটলা ব্রাউনের “হস্তীর সেলাম করা”
মিসেস কুমি ভান্সনএর “সমবায় কাজ” চিত্র অতিশয়
প্রশংসনীয়। আরও বহু মহিলার অঙ্কিত চিত্র চিত্তাকর্ষক
হয়।

ভুবনমোহিনী পদক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গত তিন বৎসরের মধ্যে
বাংলা-ভাষার শ্রেষ্ঠ মৌলিক সাহিত্য রচনার জন্য শ্রীমতী
শান্তা দেবীকে ‘ভুবন মোহিনী’ পদক প্রদান করিয়াছেন।
প্রতি তিন বৎসর অন্তর এই পদক প্রদত্ত হয়। পূর্বে
এই পদক মানকুমারী বসু (১৯৩৫), নিরুপমা দেবী (১৯৩৮)
অম্বরূপা দেবী (১৯৪১), ইন্দিরা দেবী (১৯৪৪) পাইয়াছেন।

লীলা পুরস্কার

বর্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীমতী সীতা
দেবীকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসাবে লীলা
পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। এই পুরস্কার ইতিপূর্বে
শ্রীমতী হেমন্তা ঠাকুর (১৯৪৪) শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী
সরস্বতী (১৯৪৬) পাইয়াছিলেন। ইহাদেয় নাম
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে মুদ্রিত হয়।

এম, বি, পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রী

শ্রীমতী পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় এম, বি, বর্তমান বর্ষে
মেডিক্যাল কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী এম, বি,
পরীক্ষা প্রথমবারেই উত্তীর্ণ হইয়া ‘রমা পদক’ পাইলেন।

বি, এ, পরীক্ষায় পদকপ্রাপ্তী ছাত্রী

স্কটিশচার্চের ছাত্রী উমা মেহাতা মনস্তত্ত্বে শ্রেষ্ঠ ছাত্রী
রূপে ‘গঙ্গামনি পদক’ ও ‘প্রভাপ মজুমদার পদক’ পাইলেন।

বি-এ পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা ছাত্রী হিসাবে সুনন্দা
সেন (স্কটিশ) ‘পদ্মাবতী স্বর্ণ পদক’, ‘সুজাতা পদক’, ও
‘সুরেন্দ্র নলিনী পদক’ ও সায়দা সন্দরী পদক বাংলায় সর্ব
উচ্চ নম্বর পাইবার জন্য পাইয়াছেন।

অঞ্জলি সেন (রাজসাহী) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে সর্ব
শ্রেষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী হওয়াতে ‘প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী পদক’,
পাইলেন।

আরতি সেন (বাঁকড়া) সংস্কৃত অনারে সর্বশ্রেষ্ঠ
ছাত্র-ছাত্রী রূপে পুরস্কার পাইলেন।

অন্নী ম্যাজিক ডালী (লরেটো) দয়ালচাঁদ পদক
পাইলেন।

ফজিলুউদ্দিনা—(লেডী ব্রোবোর্গ) নগেন্দ্র স্বর্ণ পদক
মৌলিক রচনার জন্য পাইলেন।

বি, এস, সি

এক্স মুখোপাধ্যায়—অঙ্ক শাস্ত্রসহ শ্রেষ্ঠ—মহিলা ছাত্রী
রূপে পুরস্কার পাইলেন।

ইংরাজী তর্ক ও বক্তৃতা ডিপ্লোমা পদক

উক্ত ডিপ্লোমা পদক পাইলেন—রমলা লাহিড়ী।

এম-এ

কুমারী বাসনা সেন এবার কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে
সংস্কৃত বিভাগে বেদান্তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার
করিয়া এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

হিন্দী মহিলা সাহিত্যিকের সম্মান

শ্রীমতী চন্দ্রকিরণ সোনারঙ্গা হিন্দী ভাষায় উৎকৃষ্ট
হোটগল্প লিখিবার কৃতিত্বের জন্য নিঃ ভাঃ হিন্দী
সাহিত্য সম্মেলনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ‘শাকশেরিয়া’ পুরস্কার
(১০০০) পাইয়াছেন।

বাংলার কোন সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বা সাহিত্য সম্মেলন
সাহিত্যিকদের সম্মানিত করিবার কোন ব্যবস্থা এ পর্যন্ত
করেন নাই।

কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন বঙ্গ সাহিত্য
অম্বরাজী দাতার রূপায় বাংলার সাহিত্যিকদের সম্মানের
সামান্য ব্যবস্থা আছে। স্ত্রী আশুতোষ মুখার্জির দানে
‘জগৎতারিণী’ পদক, সুরেন্দ্র লাল মিত্রর দানে “ভুবন মোহিনী”
পদক, শ্রীযুক্ত রণেন্দ্র মোহন ঠাকুর মহাশয়ের দানে ‘লীলা
পুরস্কার’, রমেশ চন্দ্র বসুর দানে ‘সরোজিনী’ পদক
প্রতিষ্ঠিত আছে।

লণ্ডনে বাংলা সাহিত্য সমিতির অনুষ্ঠানে

বঙ্গ মহিলা

২১শে মার্চ লণ্ডনে উক্ত সমিতির এক প্রীতি সম্মেলন
হয়। প্রায় ৫০টি বাঙ্গালী রমণী সমবেত কর্তে জাতীয়
সঙ্গীত করিয়াছিলেন। অনেক মহিলা প্রবন্ধ ও কবিতা
পাঠ এবং বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে
লেডী (দীরেন) মিত্র সভানেত্রী ও শ্রীমতী আশা ভট্টাচার্য
সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হইয়াছেন।

এই অনুষ্ঠানে ভারতের হাই কমিশনার বলেন “বাংলা
দেশ সমস্ত ভারতের গৌরবের বস্তু।”

ডাঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী বলেন—“শিল্প, বিজ্ঞান এবং
সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলার স্থান সকলেই স্বীকার করিয়া
লইয়াছে।”

সাময়িকী

শান্তির পথে

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রতিনিধি বৃন্দের কলিকাতায় অধুনা অনুষ্ঠিত সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় জনসাধারণ কতকটা আশ্বস্ত হইতেছে। কংগ্রেস ও লীগ তথা ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বহু এই ধরনের যুক্ত বৈঠক অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার ভিতর দিয়া শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। উভয় বাংলার এই সম্মেলন যে গতানুগতিক পথ অনুসরণ না করিয়া নূতন স্বচনার স্বত্রপাত করিয়াছে; তজ্জন্ত তাহাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি; তৎসহ প্রার্থনা করিতেছি যে, ইহার প্রভাব যেন সর্বত্র বিস্তার লাভ করে।

রাষ্ট্রের আদর্শ সকলকে সমানভাবে দেখা এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও তাঁদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা। বঙ্গ বিভাগের পর হইতে পশ্চিম বাংলা সরকার এই আদর্শ যথা সম্ভব পালন করিয়া আসিয়াছে। পূর্ববাংলা সম্বন্ধেও যদি আমরা উক্তরূপ মন্তব্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে গৌরব বোধ করিতাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তাহা আমরা পারি নাই। সংখ্যালঘুসম্প্রদায় সম্বন্ধে অবস্থার বাস্তব ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত পথে পা বাড়াইয়া ছুঃখকে বরণ করিতেছে। ইহার পিছনে যে বখাথ কারণ রহিয়াছে তাহা নিশ্চিত, দুর্বৃত্তদের প্রাধান্য দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে এবং তাহাদিগকে শাস্তি করিবার মত পূর্ববঙ্গ সরকারের ব্যবস্থা নাই বা থাকিলেও কার্যকরী

নহে। ধনসম্পত্তি বিশেষতঃ নারীর মর্যাদা যেখানে অনিশ্চিত সেখানে মানুষের তিষ্টিয়া থাকা অসম্ভব এবং রাষ্ট্রের পক্ষেও সে অবস্থা কলঙ্কের কারণ। এই বিষয়ে অধিকতর অগ্রসর না হইয়া পূর্ববঙ্গ সরকারের নিকট আমাদের নিবেদন জানাইতেছি যে, নারী মর্যাদা বাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, তার ব্যবস্থা যেন করা হয়। জনীতি দমন কল্পে সরকারী কর্মচারীরা যেন সজাগ হন, সাম্প্রদায়িকতার উগ্র বিষ না ছড়াইয়া শান্তি প্রচেষ্টা যদি করা হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের প্রত্যেকেরই কল্যাণ, কি হিন্দুর কি মুসলমানের। মুসলমান যুবকবৃন্দের নিকট আমাদের আবেদন, তাহারা যেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে মা বোনদের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

বাংলা সর্ববিষয়েই অগ্রণী। মহামাতা গোথলে বলিয়াছেন “What Bengal thinks to day the rest of India will think to-morrow” এই উক্তি সকল সময়েই সত্যে পরিণত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় বাংলার বুকেই প্রথম প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল এবং বাংলাতেই আবার সর্বপ্রথম শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় বাংলার নেতৃবৃন্দ ও যুবক সমাজ আন্তরিকতা ও সক্রিয় কার্য দ্বারা বাংলার বিষাক্ত আবহাওয়া, দুর্বৃত্তের অত্যাচার ও জনীতির প্রশ্রয়দাতাদের সংযত করিতে বদ্ধপরিকর হইবে, এই আমাদের কাম্য, বাংলা সকল দেশের আদর্শ স্থল হউক এই প্রার্থনা। কবির কথা সার্থক হউক।

বাংলার মাটি বাংলার জল,.....

সার্থক হোক হে ভগবান।

রাখতে হবে যেন দ্বিতীয় বারের দেওয়া ফলগুলি গলে না যায়। তাহলেই ফলের ঠু তৈরী হলো। যে কোন একটা কাঁচের পাত্রে ঢেলে রেখে দিন। ইচ্ছে করলে একটু ভিনিগার মিশিয়েও রাখা যায়। তাহলে নষ্ট হবে না। সে কোন স্বাস্থ্য ফলে এই ঠু তৈরী করা যায়।

টোমাটোর ঠু—কয়েকটা পাকা টোমাটোর রস ছেকে নিয়ে রেখে দিন। এবারে একটা ডেকচিতে অল্প লবণ, ও চিনি মিশিয়ে ঐ টোমাটোর রসটা ঢেলে দিন, যখন দেখবেন বেশ ফুটেছে তখন নামিয়ে উপরে একটু লেবুর রস দিয়ে রাখুন। এখন কয়েকটি ছোট টোমাটো অল্প জলে ভাপিয়ে (সিদ্ধ) নিয়ে আন্ত অবস্থায় ঐ টোমাটোর রসে ফেলে দিন। তাহলে দেখতে ও ভাল হবে খেতেও ভারী স্বাস্থ্য লাগবে। কোন রকম ঘি বা তেল এতে দেবার দরকার হবে না।

জর্জ ওয়াশিংটনের ১৩ বৎসর বয়সের সংগ্রহ হইতে।

খ্রীষ্টিয়ান্ডালা ভাড়াই সংগৃহীত

১। বিবেচনা না করিয়া কথা কহিওনা। তাড়া-তাড়ি কথা কহা অত্যাশ।

২। উচ্চারণ সম্পূর্ণ না হইলে কেহ তাহাতে মন দেয়না।

৩। যখন দেখিবে তোমার পরিহাসে কেহই স্মৃতি বোধ করিতেছে না, তখন পরিহাস ত্যাগ করিবে। অট্টহাস্ত ভ্রমতা বিরুদ্ধ।

৪। যেখানে অনেকে মিলিয়া কথোপকথন বা তর্ক বিতর্ক করিতেছেন সেখানে যিনি যাহা বলেন শ্রবণ করিবে। পার্শ্বস্থ লোকের সহিত বাক্যালাপ করিয়া শ্রোতাদিগের বিরক্তি জন্মাইওনা।

৫। প্রবীণ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে আকারে ইঙ্গিতে বা কথাবার্তার চঞ্চলতা বা বাচালতার পরিচয় দিওনা।

৬। গুণী লোকের নিন্দা করিওনা। তোষামোদ করাও দূষ্য। নিন্দা বা প্রশংসা স্থলে তিলকে তাল করিওনা।

৭। অপরের সম্বন্ধে মানির কথা শুনিলে হঠাৎ তাহাতে বিশ্বাস করিওনা।

৮। কেহ হিজ্জাসা না করিলে পরামর্শ দিওনা, পরামর্শ দিবার প্রয়োজন হইলে তাহা সংক্ষেপে দেওয়া উচিত।

৯। যেখানে দশজনে সমবেত হইয়া কোন কার্য বা পরামর্শ করিতেছেন, সেখানে হঠাৎ প্রবেশ করিওনা।

১০। অন্যের গোপনীয় বিষয় জ্ঞানিবার জন্য আগ্রহ করিওনা।

১১। লোকে যে কারণেই বিপন্ন হউক, বিপদের সময় কাঁহাকেও বিক্রপ করিওনা। শত্রুর বিপদে স্মৃতি বোধ করিওনা।

১২। নিমন্ত্রণে যাইয়া ভোজনের সময় খাদ্য দ্রব্যের দোষের উল্লেখ করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিওনা।

রান্নাঘর

লেবুর আচার

শৈল মিত্র

উপকরণ—পাকা নিখুঁৎ পাতিলেবু কিছু, লস্কার গুড়া, দেশী ছুন।

প্রথমে কয়েকটা পাকা গোটা পাতিলেবু (আপনি যতগুলি আচার কোরতে চান ততগুলি) ঘোলে ডুবিরে রাখবেন। ঘোল একটা হাঁড়িতে রেখে তাতে পাতিলেবুগুলো দেবেন। যেন লেবুগুলি সম্পূর্ণ ডুবে যায়। এই ঘোলে ডুবান লেবু প্রতিদিন ২৩ ঘণ্টা ধরে নাড়াবেন। এই ভাবে ঘোলের মধ্যে থাকবে চার-দিন। কিন্তু রোজ যেন ২৩ ঘণ্টা নাড়ান হয় চার দিন পরে লেবুগুলো ঘোল থেকে তুলে নিয়ে একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ১৫২০ মিনিট রোদে শুকাবেন। তারপর আবার একটা হাঁড়িতে কিছু দেশী ছুন রাখবেন এবং লেবুগুলো ঐ হাঁড়িতে দেবেন। ঐ ঠাণ্ডে পরিমাণে ছুন দিতে হবে। চার দিন ঐ ছুনের মধ্যে লেবুগুলো থাকবে এবং আগের মতই প্রতিদিন ২৩ ঘণ্টা করে নাড়াবেন। যেন লেবুগুলো ছুনের মধ্যে বেশ ঝাঁকুনি খায় এবং তাহলেই লেবুগুলো নরম হবে। চার দিন পরে লেবুগুলো ছুন থেকে তুলে নিয়ে ন্যাকড়াতে মুছে একটু রোদে শুকিয়ে নেবেন। তারপর লেবুগুলো চার টুকরো করে কাটবেন। কিন্তু টুকরোগুলো যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। ঐ কাটা অংশের মধ্যে লস্কার গুড়া (যিনি যতখানি ঝাল ভাল ভালবাসেন সেই মত) ও অল্প ছুন দিয়ে একটা কাঁচের আয়ের

মধ্যে সাজিয়ে রাখবেন। লেবুগুলো জারের মধ্যে রাখা হলে তার উপরে দেশী তুন ও লঙ্কার খুঁড়ো ছড়িয়ে দেবেন। এদিকে অন্য একটা পাত্রে লেবুর রস নিংড়ে ছেঁবে রাখবেন। এখন এই লেবুর রস ও জারের মধ্যে ঢেলে দিন। যথেষ্ট লেবুর রস দিতে হবে যেন পাত্রে রাখা লেবুগুলো সম্পূর্ণ ডুবে

যায়। তারপর প্রতিদিন রোদে দেবেন। কিছুদিন পরে নরম হয়ে গেলে খেতে পারেন। যদি খুব টক হয়ে থাকে তাহলে আরো কিছু মুন দিতে পারেন। এই ভাবে লেবুর এক প্রকার আচার তৈরী হয় এবং এটা খুব শীগগীর জিভের স্বাদ ফিরিয়ে আনে।

মহিলা সমাচার

(শ্রীমতী রমা ঘোষ)

পুরী বিধবা আশ্রমে বিশিষ্ট বঙ্গ মহিলা

পুরীর বসন্ত কুমারী বিধবা আশ্রমটি বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর এক প্রধান কীৰ্ত্তি। সরোজনিনী নারীমঙ্গল সমিতির এক শ্রেষ্ঠ অবদান। ইহা মেজর জেনারেল, এ, সি, চাটার্জির মাতার স্মৃতি বিজড়িত; বহু বঙ্গমহিলা পুরীধামে গমন করিয়া এই আশ্রম দর্শন করেন এবং নানা ভাবে ইহার সাহায্য করিয়া থাকেন।

স্বর্গীয়া ঘামিনী সেন আশ্রমস্থাপনের সময় তাঁহার নানা সাহায্য দ্বারা আশ্রমকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনী কবি কামিনী রায় কয়েকবার আশ্রমে গিয়া আশ্রমবাসিনীদের নানা উপদেশ প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বিহুয়ী জ্যোতির্ময়ী গাজুলী কিছুদিন আশ্রমে বাস করিয়া ইহার নানা প্রকার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্ত এই আশ্রমে যে আয়োজন হইতেছে তাহা খুবই উপযুক্ত।

স্বর্গীয়া কমলা ঠাকুর এই আশ্রমে বাসকালে একটি নলকূপ নির্মাণ করাইয়া দিয়া আশ্রমের পদম উপকার করিয়াছেন। তারপরও অনেক মহিলা আশ্রম পরিদর্শন করিয়া নানা ভাবে আশ্রমকে সাহায্য করিয়াছেন।

১৯৪৭ সালেও শ্রীমতী গীতা চাটার্জি, শ্রীমতী শৈলবালা

বসু, শ্রীমতী চারুপ্রভা গুহঠাকুরতা আশ্রমে অবস্থান কালে নানা প্রকারে ইহার উপকার করিয়াছেন। চারুপ্রভা দেবী, শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন যে এই আশ্রমের সেবার তাঁহার সামর্থ্য নিয়োগ করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিবেন।

পুরীর এই জনকল্যাণ নাগরীপ্রতিষ্ঠানটির প্রতি পুরী যাত্রী বঙ্গ মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নিখিল ভারত প্রদর্শনীতে মহিলা চিত্র শিল্পীর অবদান

কলিকাতা ইন্ডেনগার্ডেনের বিরাট প্রদর্শনীর চিত্র সংগ্রহে মহিলা শিল্পীদের অবদান আকর্ষণীয় হইয়াছিল।

বধু ইন্দিরা দেবী 'রাসলীলা' চিত্রের জন্ত সুবর্ণ পদক পাইয়াছেন। তাঁহার "যাত্রী", "বনঝড়ো", "অভিসারিকা", "রবীন্দ্রনাথ", "জলপ্রপাত" চিত্রগুলি মনোরম।

শ্রীমতী ইন্দিরা দত্ত তাঁহার 'শকুন্তলা' চিত্রের জন্ত রৌপ্য পদক পাইয়াছেন। শ্রীমতী কল্পনা সাহা "কলিঙ্গেশ্বর বাজার" চিত্র অঙ্কনের জন্ত ব্রোঞ্জ পদক পাইলেন।

'বাজার হইতে ফিরিবার পথে' খোদাই মুক্তির জন্ত শ্রীমতী কমলা রায় ব্রোঞ্জ পদক পাইয়াছেন।

বঙ্গলক্ষ্মী

২৩শ বর্ষ

বৈশাখ—১৩৫৫

৬ষ্ঠ সংখ্যা

“জয়গান”

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

অগতে উঠেছে জয়গান

পৃথিবী স্বাধীন হবে—মিলেছে স্বাধীন,

কোন পথে গতি হবে তার—শত মন

নিশিদিন পৃথিবীরে করিছে বিকল,

উচ্ছেদ হইবে তার; ছবৃত্ত মানব

আপনারে হানি শেষে হইবে নীরব,

বিষ অস্ত্র ফেলি যাবে রক্তসিক্ত ভূমি

নিশ্চিহ্ন করিয়া যাবে যেথা যাবে ছুঁয়ে।

আসিবে মৃতন পথে নব পরিবেশ

পৃথিবীর ভাগ্য হতে বিলুপ্ত বিষম

প্রশান্ত ললাটে তার অচ্ছ দিবালোকে

ভাসিবেন শ্রেষ্ঠ আত্মা দ্যালোকে ভুলোকে

অড়দেহে মানবের আত্মা স্বমহান

বিশ্বযোগে পৃথিবীর আত্মা জ্যোতিমান,

যদিও পৃথিবী সহে অশেষ দুর্গতি

অহিংসায় তবু তার ফুটে আত্মজ্যোতি

যদিও পৃথিবী সিক্ত অভিশপ্ত জলে

হৃদয়ের ক্ষপ তবু ফুটে ফুলে ফলে।

যদিও পাপের পন্থা অন্ধ্রমুখ হইবে

সত্য শিব হৃদয়ের তবু নিত্য জয়।

আত্মা মোর আত্মা মোর মৃত্যুজয়ী প্রাণ

গাহক পৃথিবী আজি তব জয়গান।

রুশ দেশের কথা

অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ছ'টি মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এই যুদ্ধের ফলে ক্ষেত্র এবং বিজিত জাতিরা শুধু যে ক্ষতিগ্রস্ত হল তা নয়, যে জাতিদের যুদ্ধের সঙ্গে কোনও সংশ্লিষ্ট ছিল না, তারাও ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এর কারণ সহজেই বুঝতে পারা যায়। নতুন দেশ, নতুন সাগর আবিষ্কারের সঙ্গে পৃথিবীর পরিধি যেমন বিস্তৃত হয়েছে, সেই রকম নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে দেশ ও কালের ব্যবধান দূর হয়ে পৃথিবী সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। এই সঙ্কোচনের ফলে একদেশের ক্ষতি অন্তত অন্য দেশে অতি সহজেই বিস্তৃতি লাভ করে। একটা মহাযুদ্ধ বাধলে কিংবা একটা মহামারী দেখা দিলে তার অন্তত ফল একটা মাত্র দেশে সীমাবদ্ধ থাকে না, সমস্ত পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর আবার অন্য দিকও রয়েছে। যদি সব জাতি এমন সহজ করে যে সকলে সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করবে, যা সকলের পক্ষে ভাল তাই গ্রহণ করবে, কেবল মাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথা মনে রাখবে না, তা হলে পৃথিবী এক যোগে সহজেই এগিয়ে যেতে পারবে।

শাস্ত্রমতে কলিযুগ শেষ হয়ে নতুন যুগ আরম্ভ হবার সময় এসেছে। বর্তমানে রুশ দেশে যে পরিবর্তন সূত্র হয়েছে তাতে করে মনে হয় যেন শাস্ত্রের কথাটা সত্য বলেই প্রমাণ হবে। আগেকার কালে যাকিছু ছিল কৃষিরেয়া যেন সমস্তই বদলে ফেলবে ঠিক করেছে। তাদের দেশে সপ্তাহ তারা করেছে ছদিনে। বাইরের ধর্ম তারা মানেন না। কিন্তু মাতৃষের মনের ধর্মের ওপরে ভিত্তি করে তাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মাতৃষকে মাতৃষের মর্যাদাই তারা দিতে চায়, বংশের মর্যাদাকে তারা গ্রাহ্য করে না। সে জন্যই তারা ব্যক্তির নামের সঙ্গে বংশনৃচক পদবী উঠিয়ে দিয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার তারা পুরোপুরি মানেন। তাই একদিকে যেমন কোনও কাজেই স্ত্রীলোকের অধিকার বন্ধ

করে দেওয়া হয়নি, তেমনি অন্য দিকে পুরুষের উপাঙ্গিত অর্থে স্ত্রীলোককে প্রতিপালিত হয়ে পরগাছার মত আত্ম-সম্মানহীন জীবনের মধ্যে বদ্ধ করে রাখবার ব্যবস্থার অনুমোদনও করা হয় না। একটি পরিবারে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই কর্মী। দুজনেই দুজনকে শ্রদ্ধা করেন, একজন অন্যকে অনুগ্রহ করে আত্ম প্রসাদ লাভের সুযোগ এবং অন্যজন অনুগ্রহীত হয়ে কৃপার পাত্র হবার দুর্ভোগ অনুভব করেন না। দুজনেই জানেন যে রাষ্ট্রের কাছে দুজনেরই দায়িত্ব আছে; এবং একে অন্যকে স্বার্থলেশহীন ভাবে শ্রদ্ধা করবার এবং ভালবাসবার সুযোগ পান। সম্মানপ্রতিপালনের দায়িত্বে যদি জননীকে সাধারণ অন্য কর্তব্যের থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়, তখন তাঁকে প্রতিপালন করবার ভার নিতে হয় রাষ্ট্রকে। কারণ সম্মানকে মাতৃষ করে জননী রাষ্ট্রকে সব থেকে বড় সাহায্য করছেন, কাজেই রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব সম্মান ও জননী উভয়কেই দেখা। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের এই বিনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে ব্যক্তিত্বের যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয় কিনা সেই বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ জেগে উঠতে পারে; কিন্তু কাজে দেখা যায় যে, যে মাতৃষের মধ্যে কিছু মাত্র ব্যক্তিত্ব আছে সে মাতৃষ ব্যক্তিত্ব না হারিয়ে আরও বেশী উদ্যোগী হয়ে ওঠেন এবং স্বতঃপ্রসূত হয়ে নানা দিকে নিজেকে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা করেন। এই নতুন যুগের একটি প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে প্রতিযোগিতা উঠিয়ে দিয়ে সহযোগিতার ভাব মনে বসিয়ে দেওয়া। রাষ্ট্রে সমাজে সব কাজের মধ্যেই চাই সহযোগিতা। শিশুকাল থেকে এই সহযোগিতার সাহায্যে কাজ করতে শেখান হয়। সেই জন্যই স্কুলে শিশুদের জন্য যে খেলনা থাকে সেগুলিকে এত বড় ও ভারী করে তৈরী করা হয় যে কোনও একজন শিশু সেগুলিকে একলা নাড়তে পারে না। একজন শিশু যদি মনে করে যে একটি পুতুল নিয়ে খেলা করবে তবে আরও তিন

চারজনের সাহায্য তাকে নিতে হয়। সকলে মিলে এক সঙ্গে ধরে তবেই পুতুলটিকে আলমারির থেকে নামিয়ে থেলার জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।

মাস্কের মধ্যে মনুষ্যত্ব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয় নানা রকমে। এর একটি বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় অপরাধীদের সহজে রাষ্ট্রের ব্যবস্থায়। তাদের জেলের মধ্যে বন্ধ করে রেখে শাস্তির ব্যবস্থা না করে নানা রকমে তাদের চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়—দৈহিক চিকিৎসা নয় মানসিক চিকিৎসা। তাদের অপরাধ করার প্রবৃত্তিটা কেন হল সেটা বুঝে নিয়ে তাদের কি ভাবে সাহায্য করা যায় সেই বিষয়ে চিন্তা করা হয়।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে জীবনে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়া হয় বলে বিবাহের ব্যাপারকে বাধ্যতামূলক করে রাখা হয়নি। বিবাহের ভিত্তি হচ্ছে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। যেখানে এছাড়া জিনিস লোপ হয়ে যায় সেখানে নর ও নারীকে কেবল মাত্র সামাজিক বন্ধনের দ্বারা বন্ধ করে রাখা হয় না। এই জন্যই বিবাহবিচ্ছেদের উপায়কে সহজ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে সহজে বিচ্ছেদ সাহায্যে না ঘটে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। অনেক সময়েই দেখা যায় যে দুটি নর ও নারী বিবাহবিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রারের অফিসে উপস্থিত হল। রেজিস্ট্রার তাদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে তাদের পরামর্শ দিলেন, তোমরা আরও কিছু দিন এ বিষয়ে ভেবে দেখ; তার পরেও যদি তোমাদের মতের পরিবর্তন না হয় তখন আবার এখানে এস। অনেক সময়েই এমন ঘটে যে, তারা আর ফিরে রেজিস্ট্রারের অফিসে যায় না। সাময়িক উত্তেজনা রেজিস্ট্রারের শান্ত কথায় দূর হয়ে যায়, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং প্রয়োজন হলে যে কোনও সময়েই বিবাহের বন্ধনের থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে জেনে বিচ্ছেদ ব্যবস্থার জন্ত বাস্তব হয়ে ওঠে না।

দূরের থেকে নানা কথা শুনে মনে হয় যে রুশ দেশে পারিবারিক জীবন হয়তো বা শিথিল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় তা কিছু মাত্র হয়নি। প্রত্যুষে উঠে স্বামী এবং স্ত্রী নিজ নিজ কর্মস্থানে চলে গেল, সমস্ত দিন হয়তো কর্মস্থানেই তাদের কেটে গেল; কিন্তু সন্ধ্যা বেলাটা এবং ছুটির দিনগুলি তাদের নিজস্ব। সপ্তাহটা ছয় দিনের হওয়াতে ছুটিটা পাওয়াও যায় একটু ভাড়াভাড়ি। জননী সকালে উঠে কর্মস্থানে যাওয়ার সময় শিশুকে রাষ্ট্রের অধীনস্থ শিক্ষাস্থানে রেখে যান; সেই শিক্ষাস্থানগুলির ব্যবস্থা অতি সুন্দর। শিশুদের দৈহিক ও মানসিক অভাব মোচনের সব ব্যবস্থা এবং তাদের উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সেখানে আছে। জননী যদি কর্মস্থানে না গিয়ে কেবল মাত্র নিজের গৃহস্থালীর পরিচর্যায় থাকতেন এবং সেই সঙ্গে শিশুকে পালন করতেন তাহলে তিনি একলা এত সুব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে উঠতে পারতেন না। এই শিক্ষা স্থানে শিশুকে রেখে তিনি সারাদিন একমনে তাঁর নিজের কাজ করতে পারেন। বৈকাল বেলা কর্মস্থান থেকে ফেরবার পথে শিশুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গৃহে ফিরে যান। এই সময়টা ছে মায়ের এবং সন্তানের আনন্দের সময়। তারা তখন পারিবারিক জীবনের আনন্দটা পূর্ণ ভাবেই উপভোগ করতে পারে।

রুশ দেশের এই নতুন ব্যবস্থাগুলি সমস্ত পৃথিবীর নতুন যুগের প্রবর্তন হুচনা করছে বলে আশা করা যায়। ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার, সহযোগিতার ভাব, আত্ম-মর্যাদা জ্ঞান ও আত্মশক্তির ব্যবহারের ওপরে নতুন সমাজ অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে নিশ্চয়।

* ইংলণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতিপ্রচারবিভাগের সভাপতি স্বামী অব্যক্তানন্দ কর্তৃক সরোজনলিনী সমিতিতে ও মুরলীধর বালিকাশিক্ষায়তনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

বাপুজী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী,

হিংসামত্ত পৃথিবী তখন—আলোর মেলে নি দিশা
ভারত ভাগ্যে নামিয়া আসিল ঘন কালো অমানিশা ;
আশা-বিহীন চরকি উঠিয়া নিমেষে মিলায়ে যায়
বন্ধার রোলে কান্নার ধ্বনি শুনি শুধু হায় হায় ।
কারবালা হল সেদিন ভারতে, শোণিতে ভিজিল ভূমি,
ভাবিনি কো মনে সে অন্তত ক্ষণে বিদায় লইবে তুমি
সেই দুদিনে পৃথিবী থমকি, চমকি পিছনে ফিরে—
ভারতের বুক চিরে

জাগিয়াছে একবাণী—

“হে ভারত তুমি ভুলো না নিজেরে,—ক’রো নাকো

হানাহানি ।

ক্ষমাই তোমার ধর্ম ভারত, ভার বেশী কিছু নাই,
কেবা পাণী আর কে যে নিশ্চাপ কে বিচার করে তাই,
মানুষ আমরা—মানুষে আমরা ভালোবাসা দিব ঢালি
মৃত্যুর পথে আমরা চলিব প্রেমের আলোক জালি ।”

সে ধ্বনি মিলায়ে গিয়াছে কেহ তো ডাক দিবে না কো আজি,
আকাশে বাতাসে রোল উঠে আজ—কোথা তুমি গান্ধিজী ?
আঁধারে মেলে না বন্ধুর দিশা—অতি বন্ধুর পথ,
ধ্বংস বিঘাণ উঠেছে ফুকরি—চলেছে কালের রথ ।
কত কে যে গেল, কত কে যে যাবে, কে একতা দেবে আনি
প্রলয়ের বুক শান্তি আনিবে শুনাবে মিলন বাণী ?

কে ডাকিছ কারে—বাপুজী গিয়াছে চলে—

কাদ অভাগিনী—ডাক নয়নের জলে ।

আলো হাতে নিয়ে দাঁড়াবেনা আর

মুছায়ে দিবে না, আঁখি

জানি না এখনো পিছে কি রয়েছে বাকি ।

সেই বাণী যাহা আছে আমাদের তরে—

সেই বাণী লয়ে পথ চলি যোরা আজি;

বলি চিরদিন ভেগে তুমি থাকো সম্মুখে গান্ধিজী ।

“কুমারসম্ভব”

শ্রীঅতুল চন্দ্র মাহাত

কুমারসম্ভব কাব্য কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্যপ্রবাহের
অন্ততম । কুমারসম্ভব শব্দের অর্থ কুমারের আগমন
সম্ভাবনা বা কুমারের জন্মের সম্ভাবনা । কালিদাস
কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে উমার জন্ম বর্ণনা করিয়াছেন
এবং একই সময়ে হিমালয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ।
তাহাতে হিমালয়ের ভয়ঙ্করতার লেশ মাত্র নাই । তৎপরেই
বর্ণিত হইয়াছে উমার সৌন্দর্য্যরাশি । কালিদাস কল্পনা
নেত্রে উমার যে রূপ দর্শন করিয়াছেন কুমারসম্ভব পাঠকালে
প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার মনঃক্ষেপে তাহা ফুটিয়া উঠে ।

দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের
ব্রহ্মার নিকট আগমন । তারকাস্বর-প্রদীপিত দেবগণ তাহার
নিধন নিমিত্ত ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন । ব্রহ্মা তাহাদের
“বিষবৃক্ষোহপি স্ববর্দ্ধা স্বয়ং ছেতুম্ অসাম্প্রতম্” বলিয়া
বলিলেন, “তোমরা শব্দর হৃদয় উমার দিকে আকৃষ্ট কর ।
কেবলমাত্র তাহারই পুত্র তারকাস্বর নিধনে সক্ষম ।” হরের
তপোভঙ্গ করিয়া উমার দিকে শিবকে আকৃষ্ট করিবার জন্ত
দেবগণ কামদেবের শরণ লইলেন ।

তৎপরে তৃতীয় সর্গে ধ্যানমগ্ন শিবের নিকট কামদেবের

গমন এবং উমা আসিলে শিবকে মদনবাণে বিহ্বল করিবার জন্ত বাণ প্রয়োগ ও শিবকর্তৃক মদন ভঙ্গ্য বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ সর্গে রতিবিলাপ, পঞ্চম সর্গে উমার তপস্যা, ষষ্ঠে উমাদান, সপ্তম সর্গে উমার বিবাহ, অষ্টম সর্গে হরগৌরী সন্তোগ বর্ণিত হইয়াছে।

কুমারসম্ভবের সতরটি হস্তলিখিত সর্গ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রথম আটটি কালিদাসের লিখিত। কালিদাসের পরবর্তী কালের কোন কবি, অষ্টম সর্গে মহাকাব্য হইতে পারে না বলিয়া, স্বরচিত নয়টি সর্গ তাহাতে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত সর্গ কালিদাসের রচিত অংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহা যে কোন পাঠক পাঠিকা সহজেই বুঝিতে পারেন। অষ্টম সর্গের পরবর্তী সর্গসমূহ যে কালিদাসরচিত নয় তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) কুমারসম্ভব শব্দের অর্থ কুমার বা কান্তিকের জন্ম সম্ভাবনা। সপ্তম সর্গে শিব মদনকে নিজের সেবার জন্ত পুনর্জীবিত করেন। অষ্টম সর্গে পার্বতীর প্রেমালাপ বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত পড়িলেই সহজেই বুঝা যায় কুমারের জন্ম নিশ্চিত। সুতরাং তৎপরবর্তী সর্গ সমূহ যে অতিরিক্ত তাহা বলাই বাহুল্য। কালিদাস কখনও বক্তব্যের বেশী বলিতেন না। সুতরাং অষ্টম সর্গের পরবর্তী সর্গকে কুমারসম্ভব না বলিয়া কুমারচরিত বা কুমারকাহিনী বলা উচিত।

(২) কালিদাসের প্রধান ব্যাখ্যাকারের মতেও কুমারের অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত কালিদাসবিরচিত। কারণ তিনি অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

(৩) অষ্টম সর্গের পরবর্তী সর্গ সমূহে যতিপতন ও পাদপূরণে অব্যয়ের বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস কখনও পাদ পূরণের জন্ত অর্থহীন অব্যয়ের ব্যবহার করিতেন না। (৪) কালিদাসের ঠিক পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ কালিদাসের কুমারসম্ভব ও অন্যান্য বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থাদি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অষ্টম সর্গের পরবর্তী কোন সর্গ হইতে কোন শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। উপরোক্ত কারণ হইতে সহজে প্রমাণিত হয় যে, অন্য কোন কবি উহার রচনা করিয়া কালিদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। কালিদাসের কুমারসম্ভব রচনার কাল খৃষ্টীয় তৃতীয় ইহতে

যষ্ঠ শতকের মধ্যে; উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্রভূজ্যতঃ কুণ্ডর বিন্দু শোনাঃ।

ব্রজন্তি বিদ্যাধরহৃন্দরীনামননলেখ ক্রিয়রোপবোণম্॥

অর্থাৎ হিমালয়ের অধিবাসিনী বিদ্যাধরীরা তাহাদেব প্রিয়তমগণকে প্রণয়পত্রিকা লিখিবার সময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভূজ্যপত্র কুড়াইয়া লইয়া সিন্দুর দিয়া সেই প্রেমপত্র লিখিত। ভূজ্যপত্রে লিখিবার পদ্ধতি খৃষ্টীয় তৃতীয় ইহতে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।

কুমারসম্ভবের প্রথম দৃশ্য বর্ণনাই হিমালয়ের ভয়ঙ্কর রূপে উপর এক কমনীয়তা আসিয়া পড়িয়াছে। কালিদাস স্বীয় লেখনীতুলিকার স্পর্শে ভয়ঙ্কর হিমালয়কে নবরূপে রূপায়িত করিয়া পাঠকের মানসচক্ষে তুলিয়া ধরিলেন। তুষারাবৃত হিমালয়কে করিলেন বিলাসের রঙমহল।

প্রথম সর্গকে কুমারসম্ভব কাব্যের ভূমিকা না বলিয়া দ্বিতীয় সর্গকে বলা উচিত। তারকাসুর কর্তৃক প্রপীড়িত ও পরাজিত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার নিকট সাহায্য ভিক্ষা জন্য গমন করিলেন। এই সর্গের প্রকৃত অর্থ যে কোন্ সময় পাপ দৈত্য প্রবল হইয়া উঠিয়া স্বর্গলোককে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। সেই পাপ দৈত্যকে পরাভূত করিতে হইবে যে মহৎ বীরের প্রয়োজন তাহা কোন্ উপায়ে জয়গ্রহণ করে তাহাই কুমারসম্ভব কাব্যের পরবর্তী অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় সর্গকে কবিশ্বের দিব্য দিয়া কুমারসম্ভবের সমগ্র সর্গের শ্রেষ্ঠ সর্গ বলা যাইতে পারে। অকালবসন্তে আগমনে প্রকৃতি মনোহর সাজে সজ্জিত হইল। প্রকৃতি সজে সজে তরলতা, ভ্রমর ভ্রমরী, করী করেয়, যুগ যুগী চক্রবাক্ চক্রবাকী প্রেমালাপে মত্ত হইল। হরিণী নিম্নে শৃঙ্গ দিয়া তাহার প্রিয়ার অঙ্গদেশ সোহাগভরে আঁচড়াইয় দিতে লাগিল। হস্তিনী পদ্মরেণু মিশ্রিত জল নিঃসৃত দিয়া হস্তীকে পান করাইল। চক্রবাক অর্দ্ধভূত যুগা চক্রবাকীকে খাওয়াইল। বসন্তের এই অকাল আগর দেখিয়া নন্দী বিপদের আশঙ্কায় সমস্ত বনস্থলীকে চূপ করিতে বলিলেন। নন্দীর এই সাবধান বাণীতে সমস্ত জগৎ প্রকৃতি হইল। এই স্থানে কালিদাস তাহার কবিশ্বের রথ কল্লনা সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করাইয়াছেন। তাহার ভাষা দাঁড়ায়—

“নিরুপ্প বৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেকং মুকুণ্ডজ শান্ত যুগ প্রচারম্।

তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং চিত্রাপিতারম্ভমিবাবতসে ॥৪॥

তৎপরে হরের নিকট গৌরীর আগমন হইলে রতিপতি পুষ্প সায়ক ছাড়িলেন। হর কিঞ্চিৎ বিলুপ্তধৈর্য্য হইলেন বটে, পরক্ষণে তাঁহার ধৈর্য্য ফিরাইয়া আনিয়া তপোভঙ্গ ইচ্ছাকারী মদনকে তৃতীয় নেত্রে বহির্গত অগ্নি দ্বারা ভষ্ম করিয়া ফেলিলেন।

কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গের কথা বলিলেই পার্বতীর সেই “ন যযৌ ন ভাস্কৌ” অবস্থা মনে পড়িয়া যায়। যে সম্যাসৌকে পার্বতী কিছুক্ষণ পূর্বে শিবের নিন্দার জন্য ভাঙনা করিয়াছিলেন তাহাকেই উপাস্য দেব দেখিয়া উম্মার ক্ষুদ্রে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা কালিদাস তাঁহার কল্পনা নেত্রে দেখিয়াছিলেন।

কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে আদি রসের বর্ণনার প্রাচুর্য্য হেতু বর্তমান কালে সকলে সাধারণতঃ তাহার পাঠন পাঠন হইতে বিরত হন। কুমারসম্ভবে যে হরপার্বতীর চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে তাঁহার জগৎপিতা ও জগন্মাতা। ঐ হিসাবে মন্মট ভট্ট তাঁহার কাব্য-প্রকাশে কুমার সম্ভবের অষ্টম সর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, “রতি সন্তোগ শৃঙ্গাররূপা উত্তম দেবতা বিষয়া ন বর্ণনীয়।”

আমার মনে হয় কাব্য-প্রকাশের মতে চলিলে পুরাণ প্রভৃতি বহু কাব্য গ্রন্থাদি হইতে বহু বর্ণনা বাদ দিতে হইবে।

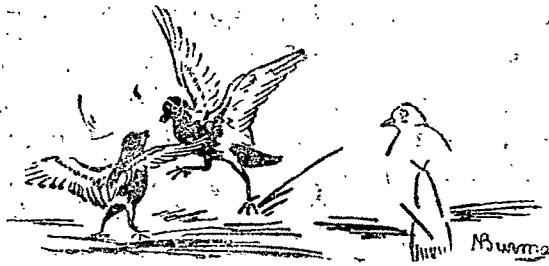
কুমারসম্ভব কাব্যের প্রধান বক্তব্য পাপ দৈত্যের ধ্বংস হেতু যে মহাবলশালী পুত্রের প্রয়োজন, তাহা কোন উপায়ে জন্মগ্রহণ করে।

কালিদাসের ঐ সমস্ত প্রত্যেক জাতির সমস্যা, প্রত্যেক

সমাজের সমস্যা, প্রত্যেক সংস্কৃতির সমস্যা, প্রত্যেক সভ্যতার সমস্যা ও প্রত্যেক কালের সমস্যা। সেই জন্যই কালিদাসের ঐ বহু পুরাতন কুমারসম্ভব চিরদিন ধরিয়া প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার হৃদয়ে আদর লাভ করিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, বিষয় বস্তুর সরসতার জন্যই কুমারসম্ভব স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। সমাজের দেশের ও কালের মহা সমস্যার এক সমাধান কুমারসম্ভবে বর্তমান বলিয়াই ইহা স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে।

কুমারসম্ভবে হরগৌরীর প্রেম মনোহর অল্পপম। মদন বাণে বিহ্বল করিয়া হরগৌরীর কামভাব জাগাইতে পারিলেন না। কিন্তু তপস্যার জোরে পার্বতী সেই অসাধ্য সাধন করিলেন। হরপার্বতীর মিলন হইল। তাঁহাদের সেই মিলনের মধ্যে বাসনা ভোগের লেশ মাত্র ছিল না। কেবল ছিল শুদ্ধতা শুচিতা। কালিদাস দেখাইলেন প্রকৃত প্রেম স্বর্গীয় জিনিষ ও তপস্যার ফল।

কালিদাস ঐ আদর্শ লইয়া কেন কুমারসম্ভব কাব্য রচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা আলোচনা করিয়াই প্রবন্ধের এই অংশ শেষ করিব। কাব্য সমাজের প্রতিকৃতিস্বরূপ। কালিদাসের যুগ ছিল নাগরিক সভ্যতার যুগ। মুনি ঋষিদের তপোবানের সেই মহান আদর্শ লোপ পাইতেছিল এবং সেই স্থানে ফুটিয়া উঠিতেছিল নাগরিকগণের বিলাস ব্যসন। ঠিক সেই সময়ে বিভিন্ন অসভ্য জাতি তাহাদের আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতেছিল। আদর্শ এবং পরাক্রমশালী বীরের অভাবে সমস্ত সমাজ ধ্বংসের মুখে যাইতেছিল। সেই জন্য কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভব কাব্যের মধ্য দিয়া এক বিরাট ও মহান আদর্শ জনসাধারণের মানসচক্ষে ফুটাইয়া তুলিলেন।



সাঁওতালী কথা ।

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

করি আমি ঠিকাদারী ।

মজুরেরা সব সাঁওতাল—আর

দুমুন্ডা জেলায় বাড়ী ।

বছরে সেখানে যেতে হয় একবার,

সবে অগ্রিম টাকা দেওয়া দরকার,

দুটা গোটা দিন কাটাইতে হয়

সভ্য সমাজ ছাড়ি ।

২

ছেড়ে দেয় গোটা ঘর,

ঘর মানে এক বাঁশের 'কুটুরী'

পাঁচ হাত পরিসর ।

গোবরে মাটিতে নিকানো চমৎকার ।

ভিতর বাহির বেশ তক্তকে তার ।

নূতন একটা খাটিয়াও দেয়

করি খুব সমাদর ।

৩

নিকটে আমার থাকে

দশ বছরের সাঁওতালী ছেলে

'টুঙি' বলে তার ডাকে ।

হাতে ধুক, বাঁশীও একটা আছে,

উঠিতে পারে সে অবহেলে তাল গাছে,

ময়ূরপাখির কাঁটা হাতে নেচে

পাড়া মাং করে রাখে ।

৪

'আখার' আশুগে হয়

তাহার মায়ের জ্বন্দর খোঁপা

হঠাৎ পুড়িয়া যায় ।

'কুটির' বদলে পুড়িয়া গেলেও মাথা

চরত হতনা ইহায় অধিক ব্যথা,

মা বেটার হায় করণ রোদনে

মোরও আঁখি বামনায় ।

কান্না সে ছেলেটার

গুরুত্ব যেন বাড়াইয়া দিল

তুচ্ছ এ ঘটনার ।

মা তার খোঁপায় পরিতে পাবে না জুল

অলক হারানো ছেলে যে কেঁদে আকুল

সবারি মায়ের খোঁপা রহিয়াছে

কথা বটে কানিবার ।

৬

ছুটে এসে বলে মোরে,

'জলদি ওয়ুধ দে তো বাবু তুই

দুটা আনৌ দিব তোরে ।

বলিল আনিয়া কটোরা ভরিয়া জল,

পড়ে নে মন্ত্র খোঁপা ফের হবে বল,

তাহার করণ কান্নার জ্বর

তুলিল ব্যকুল করে ।

৭

বালক অবুঝ সবে—

বলিলাম 'টুঙি', 'জল পড়া' নয়

তেল পড়া দিতে হবে ।

আনিল তৈল ধরে নাকো আছাদ

হাতে যেন ছেলে পেলো আকাশের চাঁদ

ফুঁ দিয়া বলিছ বছরের পর

ঠিক সেই খোঁপা হবে ।

৮

বসিয়া গুণীর মত,

তার সাথে তার বাপ ও মায়ের

দেখি উল্লাস কত ।

ভরিয়া উটিল আছাদে পুনঃ গৃহ ।

খোঁপা ফিরে পাবে নাহি আর সন্দেহ ।

যে রূপে হউক হলেই হইল

একটা বরষ গত ।

ফিরে গেণু চৈৎ মাসে,
হেরিয়া আমাকে আনন্দে 'টুটি'
লাফাইয়া কাছে আসে।
বলে, 'বাবু তোর ওষুদের বড় বল
মায়ের সে খোঁপা হইয়াছে অবিকল;
ফুল গোঁজা খোঁপা লয়ে মাতা তাঁর
হর্ষ জানিয়ে হাসে।

খোঁপাটা হইয়া হারা
কি বেদনা যেন 'ব্রহ্ম' দেশটা
হয়েছিল হাত ছাড়া।
ওলন্দাজেরা হারাইয়া গোটা জাভা
হয়ত এমন কাতর হয়নি, বাবা!
জুখ স্নেহের তারতম্যের
হিসাবই সৃষ্টিছাড়া।

বর্মায় প্লেগ ও তাহার প্রতিকার-পন্থা

শ্রীমুহুৎ মুখোপাধ্যায়

কলকাতায় প্লেগ হচ্ছে শুনে কলকাতার লোকেরা খুব ভয় পেয়ে গেছে বলে শোনা যাচ্ছে। প্লেগ রোগ কলকাতায় নতুন—নতুন রোগ সম্বন্ধে আমাদের মনে ভীতি থাকে স্বাভাবিক। তার কারণ আমরা জানি নে, সে রোগ কোন অতকিত মুহূর্তে আমাদের শরীরে ঢুকে পড়ে আমাদের আক্রান্ত করে ফেলবে।

কিন্তু প্লেগ রোগ যতক্ষণ সত্যি সত্যি না হচ্ছে ততক্ষণ ভয় পাবার কিছু নেই। আর কতকগুলো সামান্য ন্যূনতম মেনে চললে এই রোগকে এড়িয়ে চলা কিছুই শক্ত নয়। আমরা যখন প্রথম বর্মী দেশে গিয়ে প্লেগের কথা শুনি তখন খুবই ভয় পেয়েছিলাম সত্যি। কিন্তু ক্ষয়ের পর বছর অনেক সহরে বহু লোককে প্লেগে আক্রান্ত হতে দেখে দেখে আমাদের মন থেকে ভয় কেবারে চলে গেছে—এবং সাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করে আমরা বর্মীদেশে বহু বৎসর রয়েছি।

বর্মীদেশে জনসাধারণকে প্লেগ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার নারকম চেষ্টা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যবিভাগ সহরে ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে, স্কুলে স্কুলে, সাধারণ মেলার উৎসবে, রাজিক লঠনের ছবির সাহায্যে প্লেগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থা করেছে।

প্লেগের হাত থেকে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়, সে উপদেশ দিয়ে পুস্তিকা প্রচার ও বিতরণ করা হয়।

হাট বাজার, দোকানঘর, কলকারখানা, বসতবাড়ির আশে পাশে যাতে ইন্দুরের বাসা বাঁধতে না পারে তার জন্তে অনেক রকম চেষ্টা হয়ে থাকে। ইন্দুরের গর্ভের মধ্যে এক রকম বিষাক্ত গ্যাসের ঘোঁওয়া এক রকম বস্ত্রের সাহায্যে চালিয়ে দেওয়া হয় (fumigation), যাতে ইন্দুরের বংশ ধ্বংস হয়ে যায়। গর্ভের বাইরে ইন্দুরকে ধরবার জন্তে হাজার হাজার ফাঁদ ব্যবহার করা হয়।

প্রতি বছর, বিশেষত যে বছর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা, জনসাধারণকে প্লেগ বীজের টিকা (inoculation) দেওয়ার বিশেষ আয়োজন হয়ে থাকে। প্রত্যেক স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীকে টিকা দিতে হয়। কলকারখানার মজুরদের, বিশেষত যারা চালের কলে কাজ করে, ও তার সংলগ্ন কুলি-আবাসে থাকে, তাদেরকে টিকা দেওয়া হয়।

জাপানী আমলে বর্মীদেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। তখন তারা যে কঠোর বিধিব্যবস্থা করেছিল তাই ফলে দেশের লোককে এই মহামারীর হাত থেকে

বাঁচাতে পেরেছিল। সহরের প্রতি রাত্তর মোড়ে টিকা দেবার ব্যবস্থা ছিল। পথ-চলতি প্রত্যেক গথিককে ধরে টিকা দেওয়া হত। কোনো ওজর আপত্তি খাটুত না। টিকা দেওয়ার পর প্রত্যেক লোককে একখানা করে কার্ড দেওয়া হত—তাতে লেখা থাকত নাম, ধাম ও টিকা দেওয়ার তারিখ। দ্বিতীয়বার তাকে যদি টিকা দেওয়ার অস্ত্রে ধরা হত তাহলে ঐ কার্ড দেখিয়ে রেহাই পাওয়া যেত। নতুবা আবার টিকা দিতে হত। সেই অস্ত্রে প্রত্যেক অধিবাসী ঐ কার্ডখানা সদাসর্বদা সঙ্গেসঙ্গে রাখতে ভুলত না।

তা ছাড়া প্রত্যেক বাড়িতে ইন্দুর-বরা ফাঁদ দেওয়া হয়েছিল। তার সঙ্গেও একটা কার্ড থাকত—কবে কয়টা ইন্দুর ঐ ফাঁদে পড়েছে তা ঐ কার্ডে লেখা থাকত। পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে তদারক করতে ছাড়ত না। ফাঁদে ইন্দুর না পড়লে অধিবাসীকে নানারূপ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত।

স্থলের বিষয় যে কলকাতায় প্লেগ সে রকম উগ্রভাবে দেখা দেয় নি, আর কর্তৃপক্ষ খুব তৎপরতার সঙ্গে নানারকম বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। আরও দু'একটা বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্দ হবে না, যেমন :—

(১) মাটিতে বিছানা পেতে না শোওয়া। প্লেগ বীজাঙ্ক ইন্দুরের দেহে আশ্রিত একরকম ছোট ছোট

পোকার অবস্থান করে। এই পোকাগুলো (fleas) ইন্দুরের গা থেকে লাফ দিয়ে চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ে। যখন সেই পোকা লোকের গায়ে পড়ে তখন যদি বীজাঙ্ক কোনোক্রমে চামড়া ভেদ করে রক্তের সঙ্গে মিশতে পারে তখনই প্লেগরোগের সূত্রপাত হয়। দেখা গেছে যে এই পোকাগুলো সাধারণত ছয় ইঞ্চির বেশি উপর দিকে লাফাতে পারে না। সেই অল্প খাটের উপর শুয়ে থাকলে রাত্রে যদি প্লেগআক্রান্ত ইন্দুর পাশ দিয়ে চলেও যায়, তাহলেও গায়ে পোকা ওঠবার সম্ভাবনা অনেক কম।

(২) পায়ে, হাঁটু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত, সরিষার তেল ভালো করে মেখে রাখলে বীজাঙ্কর আক্রমণ খানিকটা প্রতিহত করা যায়।

পরিশেষে বলি, প্লেগের নাম শুনেই ভয় পাবার কিছু নেই। ধারা ময়লা, স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় চলাফেরা করে খালিপায়ে, (বিশেষত যদি পায়ে কোথারও কোনো সামান্য কাটা ফাটা থাকে) নেংরা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে প্লেগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ধারা সাধারণ সাবধানতা মেনে চলে, তাদের কোনো ভয় নেই। তবু সকলেরই প্লেগবীজের টিকা (inoculation) নেওয়া উচিত। টিকা নেওয়ার দফন শরীর একটু খারাপ হয় বটে—সেই ভয়ে যেন টিকা নিতে কেউ বিরত না হয়।

জাতি গঠনে মেয়েদের দায়িত্ব

শ্রীপূর্ণিমা বসাক

কিছুকাল ধাবৎ আমাদের দেশে নারীআন্দোলনের সূত্র পাত হইয়াছে এবং শিক্ষিতা মেয়েরা দাবী করিতেছেন দেশ পুরুষ নিরপেক্ষ ভাবে সমাজে তাঁদের বিশিষ্ট স্থান আছে। আমার বিশ্বাস এ দাবী কিছু কিছু স্বীকৃত হইয়াছে এবং মেয়েদের অনেকে মধ্যে সমাজের অল্প কাজ করিবার ব্যগ্রতা দেখা বাইতেছে। পৃথিবীর সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য সমাজ

সেবার উৎসর্গীকৃত গ্রাণ মেয়েদের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্পষ্টই বোঝা বাইতেছে যে পরিবারে নির্দিষ্ট আসন অধিকার ব্যতীতও সমাজে প্রত্যেক মেয়ের কোনও না কোনও কাজ আছে। তাঁরা এই কাজের জন্য তাঁরা মূল্য পান বা না পান, কর্তব্যবোধেই তাহা করিতে বাধ্য।

এতদিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও চরিত্রগঠনকেই সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় কাজ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের সভ্যতা ও শিক্ষা বতাই বিস্তার লাভ করিতেছে ততই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, জাতীয় শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের পক্ষে বিদ্যালয় অপেক্ষা গৃহশিক্ষাই অনেক অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। গৃহের আবহাওয়া হইতে ছেলেমেয়েরা শিশুকালে দেহ ও মনের যে রশদ সংগ্রহ করে ভবিষ্যৎ জাতির প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর চরিত্রগঠনে তাহাই মুখ্য হইয়া উঠে এবং গৃহপরিবারের পরিবেষ্টনীতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্য সর্বত্র অধিক বলিয়াই জাতিগঠনে নারীদের দায়িত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক।

সন্তানের জননী হওয়া বড় সহজ দায়িত্বের ব্যাপার নহে। “ওগো দেখ” বলিয়া পিতার দৃষ্টি সন্তানের প্রতি আকৃষ্ট করিলেই মাতার কর্তব্য শেষ হয় না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এতকাল পর্যন্ত আমাদের দেশে তাহাই হইয়া আসিয়াছে। সন্তানের শিক্ষা ব্যাপারেও মাতাগণ তরল পদার্থের মত স্বামী রূপ পাত্রের মধ্যে টলমলই শুধু করিতেছেন, মাতৃস্বের স্বতন্ত্র সত্তা নিজেদের মধ্যে অল্পভব করিয়া ভগবদত্ত শ্রেষ্ঠ গৌরব হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। ভগবান মাতাদের হাতে যে বহুমূল্য সম্পদ গচ্ছিত বা ন্যস্ত রাখিয়াছেন, সে সম্পদ তাঁরা একান্ত নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার অধিকারী কখনও নহেন। সমাজ বিশ্বাস করিয়া কিছু কালের জন্য তাঁহাদের উপর কঠিন কর্তব্যের ভার চাপাইয়াছে। ন্যস্ত সম্পত্তি সাবধানে রক্ষা করিয়া তাহার মূল্য বাড়াইয়া দিয়া যথাকালে সমাজকে প্রতারণা করাই মায়েদের সর্বপ্রধান কাজ। সন্তানদিগকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করিয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিবার যে প্রবৃত্তি এ যাবৎ মাতাগণের মনে কাজ করিত, বর্তমান যুগ সে প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় না; আধুনিক যুগে সন্তানগণ বিভিন্ন পরিবারের মাতাদের হাতে ন্যস্ত জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

এই ব্যাপারে পিতা ও মাতার দায়িত্ব সমান নহে। এ যুগে ইহা নিঃসংশয়ে নির্ধারিত হইয়াছে যে এখনকার মায়েদের হাতেই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল অধিক

পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। কারণ শিশুদিগের নিকলঙ্ক কচি মনে সং বা অসং রেখাপাতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মাতার। এজন্য আমরা যখনই কোনও প্রসিদ্ধ পুরুষ বা নারীর কীর্তির বিষয় শুনি, সর্বাগ্রে তাঁর মাতার প্রশংসা শুনিতে পাই। মাতা ভাল না হইলে সন্তান কখনো ভাল হইতে পারে না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

বিখ্যাত শিক্ষাপ্রবর্তক Pestalozzi বলেন, “সন্তানের উন্নতি ও বিকাশের জন্য ভগবানই মাতাকে প্রধান সহায়ক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মাতার কর্তব্য কি? চিন্তাশূন্য ভালবাসা। শিশুকে ভগবান স্বাভাবিক সব ক্ষমতা দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন; কিন্তু প্রশ্ন এই যে তাহার অন্তঃকরণ, তাহার মস্তিষ্ক, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি ভাবে কাজে লাগাইতে হইবে? তাহার কার্যে ঐগুলি উৎসর্গীকৃত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরের সহিত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ ও দুঃখ জড়িত। শিক্ষার প্রথম ও প্রধান সহায়ক মাতৃস্নেহ।”

শিশুদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আগে এই মত ছিল যে ক্ষুদ্র শিশুর মন এক ভাল নরম কাদার মত, তাহাকে ইচ্ছা মত যেদিকে ফেরানো হইবে, তাহা সেই ভাবেই গঠিত হইবে। এখন এই ভ্রান্ত ধারণা পাশ্চাত্য দেশে একেবারেই নাই, আমাদের দেশেও অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। বস্তুতঃ শিশুর মন কাদার ডেলার মত নহে, যেভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে তাহাকে ফেরানো যায় না। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে জন্মগত ও জাতিগত কতকগুলি সহজাত সংস্কার থাকে, বংশানুক্রমে প্রত্যেক শিশু কিছু মনোবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও ক্ষমতা থাকে। বীজের মধ্যে ভবিষ্যতের পূর্ণ বৃক্ষটী লুক্কায়িত থাকে; উপযুক্ত মালির হাতে পড়িয়া ঠিকমত যত্ন পাইলে ও মাটি, জলবায়ু, সূর্য্যাক্রিয়ণ প্রভৃতি হইতে খাদ্য উপযুক্তমত পাইলে তবেই বীজটী অঙ্কুরকোরকে এবং তাহা হইতে বৃক্ষে পরিণত হইয়া ভবিষ্যতে ফলফুলে পূর্ণ হইয়া উঠে। ঠিক এমনই শিশুর মধ্যে পূর্ণ মানবের সমস্ত শক্তি লুক্কায়িত থাকে, উপযুক্ত পারিপাশ্বিক ও শিক্ষার ফলে শিশুর অন্তর উন্নত ও বিকশিত হইয়া উঠে। পূর্বে প্রথা ছিল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কর্তৃক শিশুদিগকে জ্ঞান-দান করা। আধুনিক প্রণালীতে নিয়ম এই যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সহায়ক

মাত্র, তাঁরা শিশুদিগকে জ্ঞান আহরণ সাহায্য করিবেন। শিশু নিজের ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিবে, আত্মশক্তি প্রয়োগ করিবে, যুক্তি ও বিচার দ্বারা হাতে-কলমে শিখিবে। সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা এবং ঐ উপায়ে যে জ্ঞান ও শিক্ষা হয়, তাহাই স্থায়ী হয়। ঐ প্রকারে শিক্ষা করিলে শিশু আনন্দ পায়। শিক্ষার মধ্যে স্বাধীনতা থাকা চাই, স্বতঃপ্রসূততা থাকা চাই, নচেৎ সে শিক্ষা মূল্যহীন হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে এই রূপ শিক্ষার মূল্য বহুপূর্বেই বুঝিতে পারা গিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন হইয়াছে; কিংবাবগার্টেন মন্তেসোরি প্রভৃতি প্রণালীর বিষয় আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। আমাদের দেশ যদিও পাশ্চাত্য দেশসমূহের সঙ্গে সমান ভালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে না, তথাপি স্বপ্নের বিষয় এই যে নানা স্থানে আধুনিক প্রণালীর প্রচলন হইয়াছে। যদিও আমাদের দেশের বিস্তৃতির তুলনায় এইরূপ প্রচেষ্টা খুবই কম।

শিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জন নহে। জাতিগঠন করিতে হইলে কেবল বিদ্যান বা বিদ্বৎ নরনারী দ্বারা পূর্ণ জাতি বা দেশ হইলেই হয় না। সে বিদ্যা একেবারে মূল্যহীন হইয়া পড়ে যদি স্বাস্থ্য এবং নীতির দিক আমরা অবহেলা করি। প্রকৃত শিক্ষিত মানব শারীরিক মানসিক ও নৈতিক এই তিন দিকের শিক্ষায় শিক্ষিত। এই জন্য মানসিক জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষা সংক্ষেপে আমাদের কাছে সচেষ্ট ও সচেতন থাকিতে হইবে। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম মস্তিষ্ক জখম করে। এই জন্ত শিশুদের সর্বদা খেলাধুলা ব্যায়ামের প্রতি বিশেষ ভাবে যত্ন লইতে হয়। অত্যধিক মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রমে অবসাদ আসে, উপযুক্ত বিশ্রাম দ্বারা সে অবসাদ দূর করিয়া শরীরের ক্ষয়পূরক নুতন উপাদান গঠনের সুযোগ দিতে হয়। শৈশবেই শরীরের ক্ষয় ও গঠন কার্য অতি দ্রুতগতিতে হইতে থাকে; এইজন্য এই সময় বিশ্রাম ও ঘুম দরকার মত হওয়া উচিত।

আহারের পর কিছু বিশ্রাম দিয়া পরে শিশুকে দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে দিতে হয়, নচেৎ ক্ষতি হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থা এমন যে বিগ্রহের কোনও রকমে তাড়াতাড়ি নাকেমুখে

দুটি গুঁজিয়া ছেলেমেয়েদের জ্বলে দৌড়াইতে হয়। ফলে স্বাস্থ্যের সমুদ্র ক্ষতি হয়।

ব্যায়ামও শিশুদের কাছে আনন্দজনক হওয়া দরকার। আজকাল ব্রতচারী ব্যায়ামের প্রবর্তন হওয়াতে এই সমস্তার অনেকটা সমাধান হইয়াছে। নানারকম খেলাতে ব্যায়ামের কাজ বেশ ভাল হয়, সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা আনন্দ ও পায়। ছেলেমেয়ে সকলকেই সাতার শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহাতে ব্যায়াম খুব ভাল হয়। বোজ কিছু ইটার অভাস করানো উচিত। আর মায়েরা যদি বোজ মেয়েদের কিছু কিছু ঘরের কাজ করান, যেমন ঘর কাঁটি দেওয়া, মসলা বাঁটা, বাসন মাজা প্রভৃতি, তাতে মেয়েদের পক্ষে সত্যি বড় ভাল ব্যায়াম হয়। যে সকল রমণী এই রকম সব কাজ করে তাদের হস্তপদের পেশী সুগঠিত হয়, দেহের গঠন সুন্দর হয়। সঁওতাল রমণী—যাহারা মাঠে পুরুষদের সঙ্গে সমানে রৌদ্রে জলে পরিশ্রম করে তাদের সুগঠিত তলুর কথা সকলেই জানেন। আর আমাদের বাঙালী ঘরে প্রায়ই দেখা যায় মেয়েদের একটু বয়স হইলে, অদ্ভুত রকমের মোটা দেহ হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যচর্চার অনেক বিষয় আমরা জানিয়াও কার্যতঃ করিবার সময় উল্টা রকম করিয়া থাকি ইহা বড় দুঃখের বিষয়। এক বিছানায় এক মশারির তলে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া অধিক সংখ্যক লোক শোওয়া আমাদের বাংলা দেশে খুবই প্রচলিত। ছোট ছেলেমেয়েদের বন্ধিষ্ট দেহের পক্ষে উহা বড়ই ক্ষতিকর ইহা সর্বদা মনে রাখিবেন। আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি সব বিষয়েই শৈশব হইতে উপযুক্ত মত যত্ন লইয়া শিশুদের স্বাস্থ্য সুগঠিত করিতে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট থাকা দরকার।

নৈতিক শিক্ষাও শিশুর জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে। বাঙালী জাতি ভীক বুলিয়া খ্যাত। বয়স্কদের যে ভীকতা তার মূল শৈশবকালেই শিশুর মনে দৃঢ়ভাবে বসিয়া গিয়াছে। আমাদের বঙ্গজননীগণই তাঁহাদের সন্তানগণকে ভীক করিয়া তোলেন। এই বিষয়ে ২১ টা উদাহরণ দিলেই আপনারা এই কথা সত্যতা বুঝবেন :—

কোলের শিশু দুধ খাইতে চাহিতেছে না বা অল্প কোন

কথার অবাধ্য হইতেছে, মাতা অনায়াসে তাহাকে ভর দেখাইয়া থাকেন, “ঐ জুজু আসছে ধরবে, বুড়ি আসছে, তার ছেলেধরা থলের মধ্যে তোমায় পুরে নেবে,” ইত্যাদি প্রকারে ভর দেখাইয়া সন্তানকে কাবু করিয়া ফেলেন ও নিজের কার্যসিদ্ধি করিয়া লন। এই সব সন্তান পরে ভীকু হইয়া গড়িয়া উঠিবে না তো কি সাহসী হইবে আশা করেন? এই যে ভয় শৈশবে অস্থিমজ্জাগত হইয়া গেল, পরে তার যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হউক, বিচার করিয়া দেখুক, এই ভয়ের হাত সে কিছতেই এড়াইতে পারে না। চিরকালের মত মনের মধ্যে তাহা গাঁথিয়া যায়। “এটা করো না, ওটা করো না, শাস্ত হয়ে থাক” প্রভৃতি বিনীত নিষেধের বাঁধনে আমাদের ছেলেমেয়েরা এমনভাবে বাড়িয়া উঠিতে থাকে যে সাধ্য কি ভবিষ্যতে তারা সাহসী বীর হইবে? এইখানে কবীজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার অংশ উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না—

পুণ্য পাপে হুঃখে সুখে পতনে উথানে
মাহুষ হইতে দাঁও তোমার সন্তানে
হে মেহান্ত বদভূমি, তব গৃহ জোড়ে
চির শিশু করে আর রাখিও না ধরে।
প্রাণ দিয়ে, হুঃখ সয়ে আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাঁও ভালমন্দ সাথে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মাহুষ কর নি।

বাজে ভূত পেঙ্গীর গল্প বলিয়া বা ঐরূপ গল্প পড়িতে দিয়া মনে ভয় জাগাইয়া তোলা কখনও উচিত নহে। তারপর নানা প্রকার মিথ্যা কথা বলাও মিথ্যাচরণও আমাদের অজ্ঞাতে আমরাই শিখাইয়া থাকি, নিজের কার্যসিদ্ধি করিবার জন্ত। “বেড়াতে নিয়ে যাব, এই গাড়ী আসছে; পয়সা দিব” প্রভৃতি কত প্রলোভন দেখান হয়, কিন্তু শিশু দেখে পরে ঐ কথাও রক্ষা করা হইল না। এইভাবে সংসারে চোখের উপর নিজের পিতামাতাকে নানাভাবে মিথ্যা আচরণ করিতে দেখিয়া তারাও সেই শিক্ষা পাইয়া থাকে। শিশুর সম্মুখে কখনও কোনও রকম মিথ্যা আচরণ বা প্রভাবনা করা উচিত নহে।

প্রত্যেক মাহুষের মধ্যেই ভগবান সৌন্দর্য্যবোধ দিয়াছেন। মাহুষের সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, শিল্পকলা, স্বকণ্ঠের

সঙ্গীত প্রভৃতি কে না ভালবাসে? এই সৌন্দর্য্য লিপাসাও বোধ আমাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। শিশুর আশে পাশে চারিদিকের মাহুষগুলির, নিজের পিতামাতা প্রভৃতি শব্দজনের চরিত্রে ও ব্যবহারে মিষ্ট ও সৌন্দর্য্য থাকিবে, সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সর্বদা দেখিবে ও শিখিবে, বাগানে গাছপালা ফুলফলের সহিত তার পরিচয় থাকিবে, সুবিধামত নিজে বাগান করিবে, পশুপক্ষীর সহিত কিছু পরিচয় হইবে, যত্ন করিতে শেখ করিতে শিখিবে। এমনি নানা দিক দিয়া তাঁহার মনের সুন্দর ও উচ্চ অমুভূতির বিকাশ করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তার চক্ষু কণ্ঠ, প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্মুখ রাখিয়া সেগুলির ব্যবহার করিয়া যেন সে চলিতে পারে। তার জগতের মধ্যে যাহা কিছু আসে সে যেন তাহা সমগ্রভাবে খুঁটাইয়া দেখিতে শিখে, মন নিবিষ্ট করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে শিখে; তবেই বহির্জগতের সঙ্গে নানা ভাবে মিশিতে শিখিলে অভিজ্ঞতার ফলে ভালমন্দের বিচারবোধ তার মনে জাগিবে। স্ত্রীর ও অস্ত্রাঘের বিচার বোধ জন্মাইবার জন্য স্ত্রীর পথ অবলম্বনে দৃঢ়তা জাগানির জন্ত, সন্তোর প্রতি অমুরাগ বৃদ্ধির জন্ত শৈশব হইতেই ছেলেমেয়েদের কিছু পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হয়। কড়া শাসনের মধ্যে ছেলেমেয়ে ঠিকভাবে গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না, তাহাদের স্বাধীন বিচার বুদ্ধি জাগিয়া উঠিতে পারে না। কড়া শাসন ও বাঁধনের মধ্যে বর্ধিত হইলে তাহারা বিগড়াইয়া বাইতে পারে অথবা দুর্বল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হইয়া, পরমুখ্যপেশী হইয়া পড়ে; মাহুষ হইবার পক্ষে ঐ দুই অবস্থাই শোচনীয়।

পাটিকাদের নিকটে আমার এই আবেদন জানাইতেছি যে জাতিগঠন করিয়া ভুলিতে মায়ের দায়িত্বই অধিক জানিবেন। এই কারণে নানা উপায়ে সন্তানের জননীরা নিজেদের জ্ঞান বাড়াইতে সচেষ্ট হউন এবং নিজ নিজ সন্তানের সুশিক্ষার জন্ত নিজেরা যতটা পারেন করুন। কবির এই উক্তি দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব—

“না জাগিলে সব ভারতলগ্না
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।”

* বঙ্গলক্ষ্মী ১৩৪৪ এর চৈত্র সংখ্যার প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।

মুক্তি

—লীলা মজুমদার।

মৃণালিনী বারান্দা দিয়ে ঘাবার সময়ে দেখল তিনমাস পরে আবার সেজবৌদির ঘরের দরজা খোলা হয়েছে, জানালা দিয়ে সোনালী রৌদ্র ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। বুক থেকে একটা বোঝা যেন নেমে গেল। কলেজের বইগুলি হাতে নিয়েই মৃণালিনী তিন মাস পরে আবার সেজবৌদির পাশে এসে দাঁড়াল।

দেখল সেজবৌদি আলমারী খুলে রাশি রাশি রেশমি আর রক্তিন সাড়ি, গোছা গোছা জামা, সাবান, পাউডার সেট খাটের উপর নামিয়ে রেখেছে। আরও দেখল সেজবৌদির মুখে আবার হাসি ফুটেছে, চোখের দীপ্তি অমলিন। আনন্দে মৃণালিনীর কণ্ঠরোধ হয়ে এল। সেজবৌদি ওকে দেখে খুসিতে ঝগমগল হয়ে বলল, 'দেখ্ মিহু, আজ আমি কল্ল-তরু হব। ডাক্ দেখিনি বাড়ীতে যেখানে যত মেয়ে বৌ ছেলে পুলে আছে। আজ আমি দানসত্র খুলেছি'।

মৃণালিনী একদৃষ্টিতে সেজবৌদির মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে কাছে এসে বলল, 'বৌঁকের মাথাখ বস্ছি না রে। আজ আমার মনের দরজা জানালাগুলি সব কি করে জানি খুলে গেছে। আনন্দ রাখবার জায়গা পাচ্ছি না। মিষ্টি, তোর সেজদা যেদিন চলে গেলেন, সেদিন থেকে আমি কেবল নিজের কথাই ভেবেছি। ভেবেছি আমার সুখ গেল, সাধ গেল, যা ছিল সব গেল, কোনও আশা রইল না, কোনও ভবিষ্যৎ রইল না। জানিস, বিয়ে হয়ে চোদ্দ বছর বয়সে যেদিন থেকে এ বাড়ীতে এসেছি, সেদিন থেকে তোর সঙ্গে আমার এত ভাব, দশ বছর ধরে তোকে যে এত ভালো বেসেছি, তোকে দেখে আমার মন বিধিয়ে উঠত। ভাবতাম এ কী অবিচার! তোর সাম্নে কেন সোনার ভবিষ্যৎ পড়ে থাকবে, আর আমার কেন সব শেষ হয়ে যাবে? জানিস্ মিহু, তোকে পর্যন্ত আমি হিংসা করতে ছাড়ি নি।

আজ হঠাৎ আমার প্রাণ ছাড়া পেয়েছে, আনন্দ রাখবার জায়গা পাচ্ছি না। ডাক্ সবাইকে, আমি কল্লতরু হব।

'ক'নছি মহর্ষি দেবেজনাথ ঠাকুর একবার কল্লতরু হয়েছিলেন, আমিও আজ হব।'

মৃণালিনী সেজবৌদিকে আদর করে বলল, 'তা হলে আমিও আজ কলেজে যাব না।'

সেও সেজবৌদির খাটের উপর কুঁকে পড়ে, সেজবৌদির ঘিষের সাড়ি, বৌভাতের সাড়ি, গয়নার বাস্ক ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ আবার আলমারিতে তুলে রেখে বলল, 'এগুলি তোমার ছেলের বোয়ের জন্য রেখে দাও। আর সব যাকে ইচ্ছা দিও।'

দেখতে দেখতে ঘর লোকে ভরে গেল। সেজবৌদি হাসিমুখে দুই হাতে সাড়ি জামা বিলাসের সামগ্রী সমস্ত বিলিয়ে দিল। শেষে মৃণালিনীকে বলল, 'ওরে মিহু, আজ আমার আত্মা মুক্তি পেল। এখন আমাকে কাজে লাগা। দেখ্ বছরের পর বছর তুঁদের বাড়ীতে গভীর সুখে কাটিয়েছি। সে সুখ যখন নিভে গেল, ভাবলাম আমার সর্বনাশ হল। এখন আবার মনে হচ্ছে বুঝি বছরের পর বছর কেবল নিজের সেবায় কাটিয়েছি। তোর সেজদার জন্য কতটুকুই বা করতে হত! নিজেকে সেজেছি শুজেছি, বেড়িয়েছি, অতিথিসৎকার করেছি, গভীর তৃপ্তি পেয়েছি। কর্তব্য করে গেছি, তার জন্য প্রশংসা পেরেছি। পাছে নিন্দে হয় সর্বদা সাবধানে থেকেছি। যা করেছি সবই মনে হচ্ছে নিজের জন্য করেছি। আর বাইরের কারু জন্য কিছু করবার সময়ও ত পাই নি। দেখ্, ভগবান আমাকে এখন ছুটি দিয়েছেন। আমাকে কাজে লাগা।'

মৃণালিনী আছে এসে বসে বলল—'সেজবৌদি, বছরের পর বছর কাজ করতে পারবে? প্রশংসা না চেয়ে, কৃতজ্ঞতা আশা না করে, একটানা কাজ করতে পারবে? যদি পার, আমাদের বিশ্বব্রহ্মে কাজ করবে এসো। সেলাই টেলাই শেখাবার লোক আছে, কিন্তু আরও দু' একজন লোক দরকার লেখা পড়া শেখাবার জন্য। তুমি যা জান তাই

দিয়েই খুব ভালভাবে কাজ চালাতে পারবে। করবে?”
সেজবোদি বলল, “মিহু, কাজ দে, দেখ্ পারি কি না। অনেক কিছুই পারি না। ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে আমার, জানিস্ কখনও একা ট্রামে চড়ি নি, দোকানে গিয়ে জিনিষ কিনি নি, একটা চিঠি কখনও ডাক বাঞ্জে ফেলিনি। কিন্তু আমাকে কাজে লাগা, দেখ্, আমি সবই পারব।”

মৃণালিনী বলল, “সেজবোদি, মাহুষের জীবনে এমন এক একটা সময় আসে যখন একমাত্র নিজে ছাড়া ভিত্তিবনে কেউ কিছু করতে পারে না। সেজদা মারা যাবার পর তোমার সেই রকম একটা সময় এসেছিল। আমি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমাকে তুমি দূরে ঠেলে দিলে। দু’ মাস গিয়ে বাপের বাড়ী থাকলে, কিছুতেই শান্তি পেলো না। তারপর ফিরে এলে নিজের বাড়ীতে, এসেও তুমি তিনমাস ঘরের দরজা খুলে না, জানলা খুলে ঘরে একটু রোদ আসতে দিলে না, আমাদের কাউকে কাছে আসতে দিলে না। কার সাধ্য ছিল না তোমাকে সাহায্য করে। আজ তুমি নিজেই হঠাৎ বাটবার মন্ত্র পেয়েছ। কোনও কাজই তোমার অসাধ্য নেই।”

সেজদি বলে যেতে লাগল “সাজসজ্জা বড় ভালবাসতাম, সিনেমা থিয়েটার প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ছেলেটা পর্যন্ত একটা অহংকার করবার সামগ্রী হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ এমন একটা দারুণ আঘাত পেলাম, যে তার সাথে বুক পেতে দাঁড়াতেই পারলাম না।

“হুগের চেয়ে অভিশান হল বেশী, রাগ হল বেশী। চুড়িগুলি খুলে ফেলে দিলাম। জানিস্, তোর মা

কৈদেছিলেন, বলেছিলেন, ‘হুগাছি রাখ বোমা।’ আমি দস্তুর সঙ্গে বলেছিলাম, ‘বা চুকে গেছে, তাই নিয়ে আবার টানাটানি কেন?’ দেখ্ মিহু, হু’ গাছি চুড়ি পরেছি আজ। আমার মা বলেছিলেন ‘সাদাখান পরলে আমার বুক ফেটে যাবে মা,’ তখন কোনও কথা শুনি নি। আর আমি খান পরব না। বুঝতে পারছি খাওয়া পরা এত তুচ্ছ জিনিষ এ সংসারে, যে ওর জন্য কাউকে ব্যথা দেওয়া শোভা পায় না। বিশ্বাস কর, হঠাৎ আমি পথ দেখেছি, আমার জীবনটা আমি নষ্ট হয়ে যেতে দেব না। খালি একাদেশী করে আর হবিষ্য ঘরে রান্না করে গোটা জীবনটা কাটান মহাপাপ। দেখিস্, আমার ছেলে আমি কেমন করে মাহুষ করি। দেখিস্ আমার দেহ মনের শক্তি আমি কেমন করে কাজে লাগাই।

“ঐ সব কাপড় জামা সেন্ট পাউডারগুলো আঁকড়ে ছিলাম, ওদের উপর বিষম একটা রাগ জমেছিল। হঠাৎ ও সব তুচ্ছ মনে হচ্ছে। দরকার হলে, ইচ্ছে হলে ব্যবহার করব, না হলে ওদের জন্তু ভেবে এক মিনিটও সময় নষ্ট করব না। দেখলি কেমন অবলীলাক্রমে দিয়ে দিলাম, আমার মনের একটা গোলামী কেটে গেল। জীবনে ও সব জিনিষ আর বুক চেপে ধরবও না, আবার ভয় করেও চল না।

“পরজন্মের জন্য কি এ জন্মটাকে বলি দেওয়া উচিত? পরজন্মে কী হবে তাই বা কে জানে? শুনেছি বুদ্ধদেব বলতেন ‘বাহা অপ্রকাশিত রহিয়াছে তাহা উহু থাকুক’। আমারও তাই মনে হচ্ছে। এ জীবনের জন্য ধৈর্য পাবি সেটুকু সেবা দিতে ইচ্ছা করচে। মিহু, আজ আমার জ্ঞান চক্ষু ফুটেছে, আজ আমার বড় আনন্দের দিন।”

ওরা ও আমরা

শ্রীচিহ্নিতা গুণ্ডা

বিলেত দেশটা মাটির বটে,

সোনাকরপার নয়—

সেখানেতেও সূর্য্যি ওঠে

মেঘে বৃষ্টি হয়।

সোনাকরপার তো নয়ই, কিন্তু দেশটা বোধ হয় কেবল মাটিরও নয়। চুন সুরকি ও কংক্রীটের তৈরী। রাস্তাগুলি কংক্রীটে মোড়া, পীচে ঢাকা। সূর্য্যি ওঠে বটে, তবে বড় দেয়ী করে। জমিদারের বিলাসী ছেলের মত ওর ঘুম আর ভাঙতেই চায় না। শীতের সকালে লেপমুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে, ওঠে পাঁচ ঘণ্টা পরে। মেঘে বৃষ্টি হয়, কিন্তু বর্ষাকালে মেঘ হয় না। সব সময়ই মেঘ সব সময়ই থম থমে আকাশের প্যান্থেনে কান্না। নববর্ষার আবির্ভাবে, নব-ঘোবনের মত অরণ্যে পাতায় নব চেতনার শিহরণ, বীথিকায় বীথিকায় রোমাঞ্চিত কদম্বের অঙ্কুর, ঘুঁথী বেলীর গন্ধেভরা মেঘদূতের ছন্দে গাঁথা সেই আষাঢ়ের প্রথম দিবস, কোথায় এখানে পাই? সেই দিনটাই এখানেও আসে বটে—তার বেশভূষা নিতান্তই সাধারণ, অজ্ঞাত দিনের সঙ্গে তার তফাৎ মাত্র নেই। এখানে বর্ষাকালটা সমস্ত বছরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটা দিনের মধ্যে সে ঢুকে পড়তে পারে যে কোন মুহূর্তে, কেউ বলবে না অকালের বর্ষা। রোজমাথা উজ্জল দিনটার ওপরে সে যখন ধোঁয়াটে রঙের ময়লা কাঁথাখানা বিছিয়ে দেয়, আর টিপ টিপ ঝির ঝির করে বর্ষণ শুরু হয়ে যায়, তখন তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে কার চোখ সজল হয়ে আসে না। বিবহিনীর দূত করে তাকে পাঠাবে কে? তার পাওনা শুধু ঘণ্টা, শুধু অবহেলা, আর তীব্র দৃষ্টির বিষ। নব মেঘোদগমে, এখানকার সিদ্ধান্তনারা একবার তীব্র কটাক্ষ হেনে বলেন জঘন্য দিন। বৃষ্টির দিনের নামই হোল nasty day। আমরাও ঘন মেঘাকীর্ণ দিনকে হুদিন দুর্যোগ

প্রভৃতি বলে থাকি। কিন্তু সেই দুর্যোগ যে কী দুর্যোগ তা এখানে না এলে বোঝা যায় না। এখানে বর্ষার সে প্রাচুর্য্য নেই, মে প্রত্যাশাও নেই। আমাদের নিদাঘতপ্ত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দিনগুলির ভায়ে বর্ষার আশায় বিরহিনী ধরনী দেহলীদন্তপুষ্পা দিন গোণেন। এদের বর্ষাকে সবাই বলে দূর ছাই—সবাই বলে—rain rain go away; তবু সে ঘ্যান্ঘ্যানে ছেলের মত সর্বদাই গায়ে লেগে আছে। আমাদের দেশে দিনের রেলা দিন, আর রাতের বেলা রাত। এদেশে গ্রীষ্মকালে সূর্য্যি ওঠে রাত থাকতে আর অস্ত যায় মধ্যরাত্তিতে। রাত ১১টা পর্য্যন্ত পরিষ্কার দিনের আলোয় বই পড়, ছবি আঁক, টেনিস খেল, যা খুসী—তাই। এই তো গেল প্রকৃতির বৈষম্য—এখন মাহুঘের কথা আর মাহুঘের তৈরী জগতের কথা ধরা যাক। এখানকার মাহুঘগুলো ৬ ফিট লম্বা আর ধবধবে ফর্সা। আমরা হলাম বেঁটে খাটো কালো কোলো। এরা দেখতে যেমন লম্বা চোড়া, থাকে তেমনি ছোট বাড়ীর ছোট ঘরে। কাঠের মেঝে, কাঠের ছোট ছোট জানলা দরজা। পেটবোর্ডের ছাত। নীচু নীচু বাংলা গুলি, আসবাব পত্র বেকি, টেবিল, কার্পেটে ঢাকা। আমরা দেখতে ছোটখাট, কিন্তু বাস করি চুনসিমেণ্টের প্রকাণ্ড ইमारতে। বড় বড় দরজা, জানলা, কংক্রীটের ছাত। বিরাট বিরাট বাড়ীগুলির ঘর গুলি সব খালি খালি, কোথাও একটা তক্তপোশ কোথাও বা ছেঁড়া মাহুঘ আর সতরঞ্জী, কোন জানলায় ঝুলছে ছিন্নপ্রায় ময়লা একটা পর্দা কোনটা খালি। ওদের বাইরেটা পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ভেতরটা ময়লা, আমাদের ভেতরটা পরিষ্কার বাইরেটা ছেঁড়া খোঁড়া ময়লা। এদের মেয়েরা চান করে না কাপড় কাচে মাসে দু তিনবার তবু বাস করা ইজ্জত পালিস করা জামা জুতায় রং করা মুখের লালিমায় ঝক ঝক করে। আমাদের মেয়েরা তিন বেলা চান করে এবং জলে ধুয়ে প্রত্যেকবারে কাপড় কাচে

তবু আধময়লা, কৌচকানো সাড়ী জামায়, সিঁদুরলেপা চুলে ও তৈলাক্ত মুখে, কুটনো কোটায় বিকৃত ও হলুদ চূণের দাগ লাগা আঁজুলে, অগোছালো সাজ সজ্জার অত্যন্ত মলিন দেখায়। আমাদের গৃহস্থ ঘরে মেয়েরা উদয়াস্ত খাটে, পাঁজা পাঁজা বাসন মাজে ঝকঝকে করে, তবু উঠোনে কাপা, দেয়ালে তেল ও চূণ মোছার দাগ, বাড়ীর সামনে ছাই পাঁশের আঁতাকুড়। এদের মেয়েরাও খাটে বটে, তবে তাদের খাটবার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিটা অন্যপ্রকার। এরা দিনের মধ্যে কোন এক অবসর সময়ে একেবারে সমস্ত ঘরের কাজ সেয়ে ফেলে। চৌনেমাটি ও কলাইকরা কিম্বা কাঁচের বাসন সাবান গোলা গামলার জলে ফেলে ত্রাণ দিয়ে একবার রগড়ে রগড়ে পুছে নাও ঝাড়ন দিয়ে ঝক ঝকে করে। সাহায্য-কারিণী যদি না থাকে, সাহায্যকারী এরা সব সময় পায়। স্বামীর সর্বদা স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে ব্যগ্র। বাসন ধোয়ার কাজ যদি হয় স্ত্রীর, তবে বাসন পোছার কাজ স্বামীর। স্ত্রী যখন বিছানা ঝাড়েন, স্বামী কার্পেট সাফা করেন। স্ত্রী যদি মাছ রাঁধেন, পুড়িং রাঁধবার জন্তে সর্বদাই স্বামীদের পাশে পাবেন। আর আমাদের দেশে স্বামীর দলের কথা একবার ভেবে দেখুন। ঘর সাফ করা বা বিছানা করার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তাঁরা নিজেরা এক গ্লাস জল অবধি গড়িয়ে খেতে জানেন না—এবং স্ত্রী বেচারীর সারাদিনের পরিশ্রমকে একটু যে মিষ্টকথার আচার দিয়ে বস্ত্র করে খেতে হবে, সে খেয়ালটুকু অবধি তাঁদের থাকে না। এদেশের মেয়েরা সুন্দরী। ফরসা রঙের কুহক জাগে বিদেশী ছাত্রের মনে। বিশেষ করে যারা আসে পূর্ব সমুদ্রের পারে শ্রামাঙ্গিনীদের ঘোমটা ঘেরা দেশ থেকে। এই আধুনিক ভারতবর্ষে রাইরের ঘোমটার প্রতাপ হয়ত একটু কমেছে। কিন্তু তাদের শরীর, মন, কথাবার্তা সমস্তই একটা আবরণে ঘেরা। তাদের চলনে বলনে ভাবে, ভঙ্গীতে পশ্চিম সমুদ্রতীরের এ উন্মাদনা কোথায়? এদেশের মেয়েরা শুধু যে স্বামীর কাছে সাহায্য পান তাই নয়, প্রকৃতি এঁদের সহায়কারিণী। তিনিও এঁদের স্বন্দর মুখ দেখে ভুলেছেন। মাঝে কি আর বক্সিম বলেছিলেন যে ‘স্বন্দর মুখের সর্বত্র জয়।’ এঁদের কষ্ট লাঘবের জন্তে ধুলোর গতিবিধি এখানে মন্দ—হুদিন একদিন অন্তর ঘর সাফ করলে কোনই

ক্ষতি হয় না। এদের গৃহিণীদের তাই সপ্তাহের দিনগুলির কাজ ভাগ করা থাকে। কোনদিন কাপড় কাচার দিন, কোনদিন ঘর সাফ করার দিন, কোনদিন রান্নার মসলা তৈরীর দিন। রান্না এদের সাদাসিধে। মাছ মাংস, তরী তরকারী সমস্ত হয় সেদ্ধ করে নয় ভেজে খাও। আজকের দিনে অবশ্য ভাজার প্রস্নই ওঠে না—কারণ সপ্তাহে বী বা মাখন জাতীয় জিনিষের বরাদ্দ যে পরিমাণে পাওয়া যায়, তাতে কোন একজন লোকের একবেলাও রান্না চলে না। কাজেই সেই সেদ্ধ পদার্থগুলিকে কোন মতে গলাধঃকরণ করার জন্তে কয়েকরকম সস ও ঝোল জাতীয় জিনিষ আলাদা তৈরী করাই রইল। দিনে একবার মাছ মাংস আলু ইত্যাদি সেদ্ধ করে, একটা পুড়িং বা কাটাড তৈরী করে রেখে দিল। মাখন যেটুকু পায় কেউ কেউ তা দিয়ে সপ্তাহে একদিন কেক তৈরী করে রাখে। কারণ কেক কিনতে গেলে তাকে কুটির বরাদ্দ কমাতে হয়; ওদিকে তাই আর বড় কেউ একটা ঘেসে না। এমনি দাস দাসী রাখতে আজকাল সবাই পারে না বটে—কিন্তু সকলের জন্তে দুটি সাধারণ দাস ও দাসী এদেশে আছে, যাদের স্রবিধা এরা প্রত্যেকে গ্রহণ করতে ব্যস্ত, এবং দিন দিন সে স্রবিধা বেড়েই চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞান এদের দাস, প্রকৃতি এদের দাসী। বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রস্তুত যন্ত্রে এরা ঘর পৌঁছে, কার্পেট সাফ করে, কাপড় কাচে। প্রকৃতির শক্তি এদের কাছে বন্দিনী। আকাশের বিদ্যুৎ শুধু যে ঘরে এসে আলো দেয় তাই নয়—রান্না ঘরে এদের রান্না করে দেয় বিদ্যুৎদীপ্তিতে। নিত্যন্ত দিন আনে দিন খায় যে তারও একটু সামর্থ্য হলেই একটি ইলেকট্রিক উত্তুন কেনে। বোমার আঘাতে গৃহহারাদের জন্তে কাঠ ও পেট বোর্ড ইত্যাদির দ্বারা তৈরী বাড়ী গুলোকে এনে যখন মাঠের মধ্যে বসিয়ে ফিট করে দেয়, তুকে দেখেছি রান্না ঘরে সব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। আমাদের দেশে মেয়েরা পয়সা জমিয়ে গয়না কেনে সোনার। এরা পয়সা হাতে পেলেই গৃহস্থালীর স্রবিধার জন্তে নানাবিধ জিনিষপত্র কেনে। এতে করে হাতে থাকে প্রচুর অবসর। সকাল বেলা ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ঘরের কাজ সেয়ে, কোথাও চাকরী করতে যাওয়া সম্ভব হয়। বেশীর ভাগ বাড়ীতেই ছপুরের খাওয়ার হাদ্যাদা নেই। সকালবেলা স্বামীরাতে হাতাঘাতি কাজ

কর্ম সেরে নিয়ে যে ঘর বেরিয়ে গেল। লক্ষ্যে হয়ত এক দোকানে পরস্পরে বসে খেয়ে নিল অল্প কিছু। বিকেলে একেবারে দুজনে এক সঙ্গে বায়স্কোপ দেখে বাড়ী ফিরে এল। কটা কেটে, সেদ্ধ খাবারগুলি গরম করে কিঞ্চিৎ আচার সহযোগে খেয়ে নিয়ে সেদিনের মত নিশ্চিন্ত। যদি ছেলে শিলে থাকে, তাহলে হয়ত, কাজ সেরে আগে বাড়ী গিয়ে ছেলেদের প্রয়োজন মিটিয়ে, তারপরে বেরিয়ে পড়া। ছুটির দিনে হয়ত এদের কাগজ আটা তাঁদের বাড়ীকে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে রং করতে লেগে গেল, নয়ত ছোট্ট জমিটুকুর আগাছা তুলে ঘাস কেটে পরিষ্কার করে ফেল। আজকাল এদেশে গম্বনার প্রচলনও খুব বেড়েছে—তবে সোনার নয়। নকল মুক্তো ও পাথরের, কিম্বা প্লাষ্টিকের, কিম্বা কেমিক্যাল নকল সোনার। দেখতে বাকবাক করে তো, বাস্ কি দরকার ওটা সত্যি কি ধাতুতে প্রস্তুত, সেকথা জানবার? দেখতে ভালো দেখায়, সেই যথেষ্ট। আগেই বলেছি এরা প্রকৃতির প্রসাদপুষ্ট। একদিনের রাত্রি এদের তিনদিন চলে। একটা ভাল কেক এরা ছমাস একবছর অবধি রাখতে পারে। একজনের বিয়ের সিলভার জুবিলি উৎসর্বে নেয়ন্তর ছিল। আহা! আরম্ভ হল, তাদের বিয়ের সময়ে প্রস্তুত wedding cake এর টুকরো দিয়ে। ১০:৩০ বছর আগের বাড়ী এখানে সর্কজাই দেখতে পাওয়া যায়, দেখে মনেই হয় না যে বিশ বছরের বেশী পুরাণো। স্বটল্যান্ডের পথে রয়াল ওক হোটেল বলে একটা পাহািবাসে আমরা রাত্রিবাস করলাম। সাজে সজ্জায়, রঙে চঙে উজ্জ্বল। তবু ওর ষড় বড় নীচু হলর মোটা মোটা কাঠের সিলিং এ চিমনির গড়নে, ঝাড়ে লঠনে সর্কজ কোথায় একটা মধ্যযুগীয় আবহাওয়া মনটাকে আবিষ্ট করে দিল। একটু পরেই জানা গেল, হোটেলটা যথেষ্ট পুরাণো। শেলী, কীটস, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি সকলেই একবার এখানে এসেছিলেন। তাঁদের নাম টোকবার দরজার পাথরের ফলকে লেখা। আর একটা ছোট্ট সরাইধানার একবার ছিলাম। তার গড়ন পেটন ধরণ ধারণ একেবারে অন্তরকম—অথচ বেশ বাস করা যাচ্ছে। জানা গেল সেটা এলিজাবেথের সময়কার। এদেশের অরণ্য বলতে যেটুকু বা আছে হিংস্রজন্তু শূন্য। হিংস্রতা সব গিয়ে আশ্রয়

নিয়চ্ছে মানুষের মনে। বাঘের মত অস্ত্র দেশের ঝাড়ে লাফিয়ে পড়ে টুটী চেপে ধরার ইচ্ছা প্রবল। আমাদের দেশে একে তো কোনরকম বৈজ্ঞানিক জুবিধা নেই—তার ওপরে গরম। মাছ, মাংস এবেলারটা ওবেলা চলে না। সকালের দুধ বিকেল অবধি রাখতে হলে দুবার ফোটাতে হয়। এরা কাঁচা দুধ দুদিন ধরে খায়। বলে দুধ ফোটাতে দুধের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। এরা যখন খুব আদর করে বিকেলবেলা খুকুকে সকালের কাঁচা দুধ খেতে দিল, আমার গা কেমন করতে লাগল, বললাম; সে হবে না লক্ষীটী, এটা একটু ফুটিয়ে দাও। শুনে ত তারা অবাক। এ বাড়াল বলে কী—দুধ ফুটিয়ে খাবে? এরা যেমনভাবে এঁটো বাসন ধোর ও সমস্ত জিনিষপত্র সাফ করে, আমরা তাকে পরিষ্কার বলব না। বরঞ্চ একথা ঠিক যে অমনভাবে চালালে, কলরা বসন্ত, প্লেগ, টাইফয়েডে অনেকদিন আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতাম। পরাশ্রয়ী ব্যকটীরিয়ার প্রকোপ এদের শরীরে দেখা যায় না। এ সব গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এদের মনে। তাই পরের দেশের শরীরে ঢুক একটু একটু করে তাদের গ্রাস করে নিজেদের ক্ষুধা মেটাচ্ছে। আমাদের দেশে এত রোগের প্রকোপ বলেই বোধ হয় এত ধোয়া মোছার বাতিক; কিন্তু সে বাতিকটুকু কেবলমাত্র নিজের চারদিক ঘিরে। নিজের মুখটা পরিষ্কার করে ধুলাম, জলটা যদি দোতলার ওপর থেকে পথচারীর গায়ে পড়ে, গ্রাহ্য করিনা। অত্যাধিক এরা নিজেদের থুথু ক্রমালে করে নিজেদের পকেটে রাখে। মোট কথা ওরাও আমাদের মত দোষেগুণে মেশানো বটে, কিন্তু তাদের প্রকারটা ভিন্ন। তবে সবার ওপরে ওদের স্ত্রু সবল দেহ মন ওদের অক্ষুণ্ণ জীবনকে অনবরত প্রাচুর্য্য যুগিয়ে চলেছে। সে ক্ষেত্রে প্রকৃতি ওদের সহায়িনী আর আমাদের প্রতি বিরূপ। আমরা কোনমতে, দুয়ে মুছে এঁটোকাটা মেনে স্বপাক খেয়ে বঁচে আছি আর ওরা পরস্পরের মুখেরটা কেড়ে খেয়ে একসঙ্গে চান করে দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমাদের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষরা দলে ভারী—ওদের সঙ্গে তাই পেরে ওঠা শক্ত হয়! কাজে কাজেই প্রাচী ও পাশ্চাত্যের মিলন কি আর সত্যি সম্ভব হবে কোনো কালে? আজও পর্যন্ত ওরা ওরা—আমরা আমরা।

“অসমাপ্ত”

শ্রীআরতি মুখোপাধ্যায়

বৈশাখ মাসের রৌদ্রবলসিত এক ছপুয়ে—বাড়ী থেকে বেরিয়ে গলির মোড়টায় এসে দাঁড়াতেই, শান্তির মুখের উপর এক বলক তপ্ত রক্ত বাতাস বয়ে চলে গেল। মোড়টা থেকেই ছপাশে দেখা যায় প্রশস্ত রাজপথ, আর ট্রামের লাইন। বেলা তখন বোধহয় দুটোর কাছেই হবে, লোকজনও চলেছে। কিন্তু অদ্ভুত একটা ভাব পথ ঘিরে থাকে এ সময়টাকে, বিশেষ করে গ্রীষ্মের ক’টা মাসে। মনে হয় বিরাটকায় একটা দৈত্য—এদিকে থেকে শুদিক আনাগোণা করছে; আর তার মুখ নিঃসৃত অগ্নিবাণ যেন সহরটাকে জালিয়ে দেবে।

শান্তি বেরিয়েই পথ চলতে শুরু করল না। একবার থমকে দাঁড়াল, গলির ভিতর থেকে ঝিরঝিরে বাতাস আসছিল, তার সঙ্গে বড় রাস্তার বাতাসের কী তফাৎ? মনে মনে ভাবল সে। এ যেন তারই জীবনের দুটো দিক মূর্ত হয়ে ফুটেছে। এক দিকে ছোট্ট সীমাবদ্ধ এক ফালি গলি, অপর দিকে থা থা করছে উষ্ম মরুপ্রান্তর, অনন্ত পথ চলা। প্রতি পদবিক্ষেপে রয়েছে কাঠিছ, কাঁটাফোটা। মেহ, মমতা, করুণা নেই, নেই দরদীর এক বিন্দু অশ্রুজল। শুধু এগিয়ে চলা, কেউ শুধোবেনা জানতে চাইবেনা তুমি কোথায় চলেছ, বা কোথায় তোমার ভারাক্রান্ত চরণ থমকে দাঁড়াবে; এ প্রশ্ন কেউ করবেনা, তোমাকে একলাই এই ভয়াবহ পথে চলতে হবে।

শান্তি একবার পিছন দিকে ফিরে চাইল, মনে হোল এই গলিটাই যেন তার মরুস্থান। এই যে ছপাশের বাড়ীর দেওয়ালে চাপাপড়া পথটুকু, তারই মধ্যে অন্ধকার, শ্যাওলাপড়া একখানি ঘরে সে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে। বাদেইর জন্ত সে মৃত্যুপথযাত্রিণী, তাদের মধ্যেই আশ্রয় খোঁজে।

শান্তি আর দাঁড়ালনা, আরেকবার গলির দিকে চেয়ে, সে মাথায় বেশ করে আঁচলটা টেনে চলতে শুরু করল।

এ তার আজই আসা নয়; মাসের পর মাস, দিনের পর দিন করে সে গোটা কলকাতা সহরটাকে চষে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পাচ্ছে কী সে? কোথাও সহানুভূতির মৌখিক আভাষ, আবার কোথাও বা রক্ত তাড়না। তবুও তাকে আসতে হয়, আবার যেতে হয়, আর এ প্রায় তার অভ্যাসেও এসে দাঁড়িয়েছে।

তার যদি বসে থাকলে চলত, তাহলে কিছুতেই সে আজ বাড়ীর বাইরে বেরোত না; শরীর তার ভেঙ্গে গেছে, আশ সে যেন পথচলতে একবারেই পারছে না। তবুও—তাকে যেতেই হবে সেই অফিসটোতে। যদি তারা তাকে গ্রহণ করে? আজকে রাত পোহালে, কাল যে আর কিছু নেই, একমুঠো চালও নেই।

নামনে দিয়ে ট্রাম চলে যায়, ভাবে একবার উঠে পড়ে, পরম্পনেই রুমালে বাঁধা দুআনীটা সজোরে চেপে ধরে। যেন এটার গলা টিপে না ধরলে—মস্ত বড় প্রলোভনে পড়বে। আবার ভাবে, এই তো এইটুকু পথ সে আপন মনে চলে যাবে। মনের মধ্যে অজস্র চিন্তাকীট কিল বিল, করছে, মাথার ভিতরটা থেকে থেকে দপদপ করে উঠছে, আর বুকের মধ্যে অসহ্য যাতনা, তবুও হেঁটে চলেছে।

গৃহস্থ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সে, বাপ দুঃখকষ্টের মধ্যেও বুকে করে মাহুষ করে তুলেছিলেন, ঘরে বসিয়ে, বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন কাজচলা লেখা পড়া শিখিয়ে ছিলেন। মনে মনে ইচ্ছা ছিল একটা শিক্ষিত সং পাত্রের হাতে মেয়েকে দিয়ে যাবেন, অতি দরিদ্র হলেও তাঁর আপত্তি ছিলনা।

মাছুষ যা ভাবে, সব সময়ে তা বাস্তবে ঘটে না। অনুচা
শান্তিকে অনিচ্ছুক, অথবা দারগ্রহ ভাইএর হাতে সাঁপে,
তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

বছরও বুরলনা, শান্তির বিষয়ে হোল। বাবার কথা মনে
করে, কাদতে কাদতে সে আবাল্যের গৃহ ত্যাগ করল। খুব
বেশী দিনও গেলনা, স্বামীর স্বরূপ তার কাছে ধরা পড়ল।
প্রথমটায় সে একটুও দমে যায়নি, ভেবেছিল এ ছদিনের
খেয়াল। কিন্তু যত বছর কাটতে লাগল ততই সে বুঝল,
এ খেয়াল নয়, এ—অভ্যাস।

তাও একরকম করে অভাবে অনটনে দিন কেটে
যাচ্ছিল। বিপর্যয় ঘটল, যখন সে জানতে পারল তার
স্বামী কুৎসিৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। সে পতিব্রতা
সতীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারলনা, ফলে, তার মাথায়
আজও স্বামীর হাতের কাটারীর দাগটা জল জল করছে।
স্বামী ভাবল খুনের দায়ে ধরা পড়বে, এ ভেবে সে
নিকরেশ হোল। শান্তি বহুদিন জেলা হাসপাতালে রইল;
তারপর যখন বাড়ী ফিরে এল, দেখল, মহাপ্রভুটি আর একটি
মেয়েকে শান্তির পদে বহাল করেছেন।

শান্তি কাকাকে করুণ আরোদন জানাল, কিছুদিন তাকে
তার কাছে নিয়ে যেতে। অকপট উত্তর এল—সুবিধে
হবেনা।

খস্তর যাও বা একটু স্নেহ-মমতা দেখাতেন, তার অদৃষ্টপুণে
তিনিও গত হলেন। খাশুড়ীর বাক্য জালা, সতীনের অহোরাত্র
গঞ্জনা, ছেলে মেয়েগুলোর লাঞ্ছনা, সে আর সহ্য করতে পারল
না। পাড়ার একটি বৌ কথায় কথায় বলেছিল, ‘ভাই, তুমি
তো কলকাতা গেলে কিছু না কিছু কাজ করতে পারবে।
সেখানে মেয়েদের কত রকম ব্যবস্থা আছে শুনেছি।’

শান্তি তারপর ছেলেমেয়েকে নিয়ে কলকাতা চলে
এসেছিল। যেটুকু পুঁজী ছিল, তা অনেক দিন আগেই
নিঃশেষ হয়ে গেছে। একটি আত্মীয়স্বানীরে চেষ্টায়,
এই ঘরখানি চার টাকা ভাড়ায় পেয়েছিল। তারপর
থেকে, যে কোনও রকমের একটি চাকরীর জন্ত সে সম্ভব
অসম্ভব জায়গায় গেছে, কংগ্রেজে দেখা বিজ্ঞাপনের একটি
জায়গাও সে বাদ দৈয়নি। নানা জায়গায় নানা দাবী,
এবং শান্তিকে কেউ মনঃপূত করতে পারেনি।

অভাববোধটা তার খুব বেশী, কিন্তু সেই পরিমাণে
যোগ্যতা নেই যে। তাই সে কেবল ঘুরেছে।

প্রথম চেষ্টা করেছিল, কোথাও যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
একটা ১৫ টাকার চাকরীও হয়। কিন্তু হয়নি, অবশ্যে
শুনেছিল ট্রেনিং পাশ হওয়া চাই। ঘরে বসে শিল্প কাজ,
তাও বেশী দূর এগোলনা। বাড়ীর মধ্যে অল্প বাসিন্দাদের
যা একটা ছোট্ট করে আট আনা ছ’ আনা মজুরী পেয়েছিল,
তারপর আর এগোয় নি। এমনভাবে চলার পর, আজ
তা চরম পর্যায়ে উঠেছে।

কোথাও কোনও সম্ভল তার নেই, এক বিভীষিকা ছাড়া।
ছেলেমেয়েগুলো কঙ্কালসার হয়েছে, নিজে খুঁকছে। আর
দোমানীটা কুমালে বাঁধা আছে।

খুব অসুস্থ হয়ে পথ চলছিল বলে সে শুনতে পায়
নি, তার নাম ধরে কে যেন ও ফুটপাথ থেকে ডাকছে।

“শান্তিদি ও শান্তিদি?” সে মুখ ফিরিয়ে দেখল একটি
মেয়ে, দ্রুতপদে রাস্তা পেরিয়ে আসছে।

তাকে এক ঝাঁকানী দিয়ে অমিতা বলল, “কী মাছুষ
তুমি বলে ত। আমি যে পাগলের মত ডাকছি, শুনতে
পাওনি? যাক তারপর তুমি এখানে এলে কবে?” শান্তি
অমিতার হাত ধরে ক্ষীণ স্বরে বলল, “সে অনেক কথা
ভাই। বছর খানেক ঘুরতে চল এসেছি এখানে। তারপর
তুমিও তাহলে এখানে আছ?”

অমিতা শান্তির আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করে বলল, ‘এক
চেহারা করেছ, রীতিমত হাঁপাচ্ছ দেখছি। এস, একটা
রেস্তোরাঁতে বসে, কথা বলা যাক।’

শান্তি অবাক হয়ে দেখল যে কখন ধর্মতলার মোড়ে
এসে পড়েছে। সে খেয়ালও করেনি এতক্ষণ। একটা
ক্যাবিনে বসে, শান্তিকে এক গ্লাস সরবৎ খাইয়ে অমিতা
ধীরে ধীরে তার কাছে বিস্তারিত বিবরণ সব শুনল। শান্তি
বলল, “আর আমার দেবী করা চলবেনা, কারণ চারটে
বাজতে আর বেশী দেবী নেই।” কী জানি কেন, শান্তি
যেন অমিতার আকস্মিক আবির্ভাবে কেমন অস্বস্তি
বোধ করছিল। কেন সে এত কথা খুঁটীয়ে জানতে চায়,
আর কেনই বা তার ও সহানুভূতি?

এ তো নিমেষের। আরেকটা কিছু আকর্ষণের বস্তু পেলে সে এখনি ছুটে চলে যাবে।

শান্তি এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “অমিতা, খুব আনন্দ হোল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে। তবে আমি চললাম।”

অমিতা তখনও তার গ্লাসটা শেষ করেনি। সে যখন উঠে দাঁড়িয়েছে, শান্তি তখন নীচে নেমে গেছে। বেয়ারাদের বিম্বিত দৃষ্টির সামনে কয়েকটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে সেও ছুটল।

শান্তিকে ধরে জিজ্ঞাসা করল “কেন, তুমি এমনভাবে চলে এলে? তোমার কী একমিনিট দাঁড়ালে ক্ষতি হয়ে যেতো?”

শান্তি বলল, “খুব হোত, আর কেনই বা তুমি আমার সঙ্গে আসছ অমিতা; হুচারটি মিষ্টি কথা বলবে, এই তো?”

অমিতা এতটুকুও বিচলিত হলো না ওর কথায়। বলল, “চলো, আমি তোমার সঙ্গে তোমার অফিসে যাব। তারপর ধীর স্থির ভাবে এক যায়গায় বসে কথা বলা যাবে।” অমিতার সঙ্গে শান্তির আলাপ টাকা থাকতেই হয়, মহিলা সমিতির সম্পাদিকা হিসাবে। তারপর দুজনেই খুব অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। শান্তির বাড়ীর বাইরে বেরবার হুকুম ছিলনা। তাই অমিতা নানা ছলে তাদের বাড়ী যেত। বড়লোক বাপের মেয়ে বলে, শান্তির শান্তী সন্মানে কিছু বলতেন না, কিন্তু তারপর জের চ’লত, তার উপর। অমিতা শান্তির সব কথাই জানত, তবে সেও নিরুপায় ছিল। বড় ভাল লাগত তার এই মেয়েটিকে। স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ রং, আয়ত নম্র চোখ দুটি, মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। কত তার কল্পনা, আশার কথা শুনত সে। তারপর হঠাৎ অমিতার বাবা বদলী হয়ে আসামে চলে গেলেন। মাকের একটা বছর কেউ কারুর খোঁজ জানত না। তাই অমিতা অপ্রত্যাশিত ভাবে শান্তিকে কলকাতায় রাস্তায় দেখে, খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

খানিকটা হাঁটার পর তারা শান্তির গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছল। নীচে বোর্ডে অফিসের নাম সন্ধান করে, তারা চারতলার উপরে একটা ছাদের ঘরে এসে ঢুকল। পুরান চারতলা বাড়ীটার কোটরে কোটরে নানা অফিস; দস্তকিৎসক, নাস, খাজী থেকে স্ক্রু করে, বিবাহ রেজিষ্টারী পর্যন্ত।

“অভিনব জীবন বীমা” কোম্পানীর ছোট একটা সাইন

বোর্ড লাগানো রয়েছে সিঁড়ির মুখে। বেয়ারা বা দরওয়ানের বালাই নেই। অমিতা এসে দরজাতে টোকা দিল। গম্ভীর গলায় কে বলে উঠল, “ভিতরে আসুন।” ছোট, চারকোণা ঘরের মাঝে, একটা সস্তা ড্রয়ার দেওয়া টেবিল, তার ওপাশে ‘অভিনব জীবন বীমার’ স্বত্বাধিকারী বিপিনবাবু বসে আছেন। আরেক পাশে একটা টেবিল, গোটা দুই চেয়ার, এপাশে দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো লম্বা একটা বেঞ্চি।

শান্তি বলল, “আজ আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন এবং কাজ দেবেনও ঠিক করেছিলেন?”

সে একটু জোরের সঙ্গেই কথাটা বলল। বিপিনবাবু গম্ভীর ভাবে হেসে বললেন, “হ্যাঁ, দেব বৈকি, আমরা আপনাকেই কাজে নেওয়া ঠিক করলাম। তবে ঐ যা বললাম, আমাদের সঙ্গে বাইরে যেতে হবে।”

অমিতা শান্তির দিকে তাকাতাই, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—“আমি তো, আপনাদের কথা দিয়েছি, যেখানে যেতে বলেন যাব। কেবল একটা মাস সময় আমাকে দিতে হবে, ততদিন আমি কলকাতার সব কাজ করব।”

বিপিনবাবু বললেন, “বেশ, বেশ, তাই হবে। তবে কিনা জানেন, কাজ দেখাতে হবে, নইলে, বেগার দয়া দেখাই কেমন করে বলুন।”

অমিতার গা ধেন ঘিন ঘিন করছিল এই পরিবেশে। ঐ লোকটার কথায় তার ইচ্ছা হোল ঠাস করে একটা চড় কসিয়ে দেয় তার গায়ে। নেহাৎ শান্তির ব্যাপার তাই—? ও পাশের টেবিলে একটা লোক খস খস করে লিখে কি একটা কাগজ বিপিনের হাতে দিল। তিনি কাগজটার উপরে তাঁর সই দিয়ে, শান্তির দিকে মেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, “এয়াই নিন আপনার appointment letter.”

শান্তি শান্তিনেত্রে বিপিনের দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনারা আমাকে এই কাজটা না দিলে আমার যে কী অবস্থা হোত, তা একমাত্র ভগবান জানেন।” বলে সে ওঠার উপক্রম করতেই বিপিনবাবু বলে উঠলেন “সেকি উঠলেন যে, বসুন, চা খেয়ে যান—।” তারপর অমিতার দিকে চেয়ে বললেন, “ইনি বুদ্ধি আপনার আত্মীয়া?” অমিতা উত্তর দিল, “হ্যাঁ, আমি এঁর আত্মীয়া। কিন্তু আপনারা তো কৈ, কোম্পানীর ছাপানো কাগজ পত্র দেখালেন না?”—

বিপিন গলা ভারী করে বলে “কেন, সে কথা তো আমরা শাস্তি দেবীকে বলে দিয়েছি যে, কাগজ পত্র এখন ছাপা হচ্ছে—” শাস্তি অমিতার দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমি তো শুনেছি আপনাদের কাছে সেকথা।”

অমিতা আর কোন কথা বলল না, গুম হয়ে বসে রইল। বিপিনবাবুই আবার বলেন, “আপনার আত্মীয়া কী করেন? কাজ কর্ম করেন না কলেজে পড়েন?” অমিতা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, “আপনার কী খুব প্রয়োজন রয়েছে জানবার?” বিপিনবাবু থতমতভাবে বলেন—“না না, সে কি কথা? এমনিই জিজ্ঞেস করলুম। আপনার মত সপ্রতিভ চটপটে মেয়েই আমাদের দরকার কিনা?”

লাল দাগধরা, নীল বর্ডার দেওয়া পেরালাতে চা এল, সঙ্গে থান কয়েক বিস্কুট।

অমিতা চা খেলনা, জানাল সে বাড়ীর বাহিরে চা খায় না। শাস্তি আনন্দের সঙ্গে চায়ের পোয়ালাটা হাত বাড়িয়ে নিল। সে জানে এরা অসন্তুষ্ট হলে তার কাজ হবে না। তার কাছে তুচ্ছ জিনিষের, ঠুনকো মনের কোন মূল্য নেই। তার প্রয়োজন মাস গেলে নিদেন দশটা টাকাও। শুধু চাল কিনে রাখবে সে চার টাকা মণ দরে। তাই ছবেলা ছেলেদের মুখে তুলে দেবে।

এঁরা অত্যন্ত সহৃদয় লোক। শাস্তিকে অগ্রিম দশটা টাকাও দিলেন। সোমবার থেকে শাস্তি কাজ আরম্ভ করবে। তারপর নমস্কার ও ধন্যবাদের পালা শেষ হলে, অমিতা ও শাস্তি যে যার বাড়ী ফিরে গেল।

ক্রমশঃ

কাঁচা লেখার আসর

পরিচালিকা—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

(নবীনাদের উৎসাহকল্পে অল্পবয়স্ক লেখিকাদের লেখা এই বিভাগে প্রকাশ করা হইবে। কোন মহিলা প্রতিষ্ঠানের মারফত প্রেরিত লেখাই অগ্রে বিবেচনা করা হইবে।)

বুকের বোঝা

শ্রীমণালিনী দেবী।

আমার নাম নগেন্দ্রনাথ রায়। এক শীতে ঝড়ের রাত্রে পথ ভুলে কোথায় গিয়ে পড়েছিলাম, সেই ঘটনাটা আপনাদের বলব। কলকাতার চাকরি করি, মাসে এক শনিবার বাড়ী যাই। ছুটি বিস্তর পাওনা থাকে, নেই না। ছুটি নিলে কাজ বেশী জমে যায়। কোন মাড়োয়ারীর দোকানের ম্যানেজার আমি, হাহিনা দেয় চারশো। মনিষকে খুশী দেখে একদিন বললুম, এইবার মাস তিনেকের মত ছুটি দিন। মনিষ হাসি মুখে বললেন, হ্যাঁ বাবু, তা বলতে পারেন বটে। দোকানের বেশ উন্নতি হয়েছে, বেশ তো দিন তিন মাসের ছুটি। আমি ও দেশ থেকে কিছুদিন ঘুরে আসি, যাঁরা রইলেন তাঁরা চালিয়ে নেবেন। তিনি দেশে যাবার তোড় জোড় করতে

লাগলেন, আমাকে বললেন এবার যখন আসবেন ছেলেমেয়েদের ও স্ত্রী নিয়ে আসবেন। আমার বাড়ি আছে ভাড়া লাগবে না, নিজের বাড়ি মনে করবেন ও বতদিন ইচ্ছা থাকবেন। আমি বললুম, তা হয় না। আমার মা বাবা আছেন তাঁদের সেবা হবে না। আমার আর ভাই বোন নেই, আমার স্ত্রী তাঁদের সেবা যত্ন করেন, তাছাড়া আমাকে বিষয় কর্ম মাঝে মাঝে দেখতে যেতে হবে। তিনি মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন, “হ্যাঁ বাবু, ঠিক কথা, আচ্ছা তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর হল।” সেই দিনই হরিপাল যাত্রা করলুম। আমার বাড়ি হরিপালে। বিকালে হরিপাল ষ্টেশনে নামলুম। ষ্টেশন পেরিয়ে একখানা মাঠ পড়ে। মাঠের কাছে এসে দেখি খুব বজ্রতা চলছে।

দেশের দুর্গতি, শ্রমিকদের দুর্গতির ব্যাপার নিয়ে মজহুর মণ্ডলীর বিরটি সভা, লোকে লোকারণ্য। বক্তা উচ্চ শিক্ষিত বলেই মনে হলো। মজহুরদের সঙ্গে আমিও তম্বর হয়ে শুনে লাগলুম। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকচ্ছে, পশ্চিম আকাশে অনেকটা জুড়ে মেঘ জমেছে। কালো মেঘ যেন ক্রমে ক্রমে নীচে নেমে আসচে, কারুরই সৈদিকে লক্ষ্য ছিল না। দেখেও যেন দেখে না। সকলের লক্ষ্য বক্তার দিকে। সোঁ সোঁ শব্দ কোরে বড় হঠাৎ বেড়ে উঠল। যেন দুর্দান্ত এক পাগলা বোড়ার সাহনে পড়লুম। সকলেরই এক অবস্থা। শীতের বেলা পাঁচটা বেজেছে, তার মেঘে হজ্জকার হয়ে আবার জল বড় এক সঙ্গে নামল। যে যে দিকে পারল ছুটে লাগল। ঐ লোকারণ্য শুকনো পাতার মত সাফ হয়ে গেল। আমিও প্রাণপণে ছুটে লাগলুম। সেখান থেকে আমার বাড়ি আধক্রোশের কম নয়। এই ক্ষণেকের নির্বুদ্ধিতার জন্য আপনাকে আপনিই দিকার দিতে দিতে বড়ের সঙ্গে পাঞ্জা দিয়ে ছুটে লাগলুম। ঠিক পথে চলতে চলতে অন্ধকারে দিকভ্রম ঘটলো যে কখন তা বুঝতেও পারলুম না। বড়ের ধাক্কা খেতে খেতে বিপথে ছুটে লাগলুম। কখন বা গুড়ি ঘেরে বসে পড়ি। হঠাৎ বিছাওর আলোর যেটুকু দেখতে পাই, সেটুকু পথ চেনবার মত নয়। একটা ডোবার মত পুকুরে পড়ে গেলুম রূপ কোরে। লাগলো না বিশেষ, ডুবেও গেলুম না। তাতে কেবল বাঁশ পাতায় ভর্তি, সামান্য জল আছে। বৃষ্টি খুব স্নোরে আরম্ভ হয়েছে, শীতে দাঁতে দাঁতে ঠেকে যাচ্ছে, ঠকঠক কোরে কাঁপচি। ডোবার হাঁটু পর্যন্ত জল, তবু মনে হচ্ছে বড়ের ধাক্কাটা যেন কম, একটু দাঁড়াই। কি অপদ, এ যে ব্যাঙে ভর্তি। তারা লাফিয়ে কাঁপিয়ে আমার ঘাড়ে পিঠে শেষে মাথার পর্যন্ত উঠে পড়ল। ডোবা থেকে উঠে গা পা জামা বাড়ি দিতে লাগলুম, জোরে সেগুলো ঝুপঝুপ কোরে জলে লাফিয়ে পড়ল; মনে হল আমার বাসার চাকরটা বেরোবার সময় ছু তিনবার পেছা ডেকেছিল, হতভাগটা! এবার বিছাওর আলোয় দেখা গেল যেন কিছু দূরে একটা ছোট্ট একবিন্দু আলো সরে সরে একদিক থেকে অন্য দিকে চলে গেল। আর দেখা গেল না।

শীতে হাত পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। ভয় যে হচ্ছে না এমন নয়। তাই তো, ঐ আলোটা আলোয়া নয় তো? যাই হোক ঐদিকে ছুট দিলুম। কিছুটা দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছ বড়ের দাপটে হুড়মুড় কোরে পড়ে গেল, ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। আবার সেই ছোট্ট আলোর রেখা এদিক ওদিক আনা গোনা করতে লাগলো। আমি সেই দিক লক্ষ্য কোরে দৌড়তে লাগলুম, বৃষ্টির ঝাপটা চোখে মুখে যেন স্বেচ্ছা বিধিতে লাগল। পায়ে একটা কি লেগে হুড়মুড় কোরে পড়ে গেলুম। তখনই কোথায় একটা বাজ পড়ল, তার ককড় শব্দে আরো একটু ছুটে যেতে দেখি ক্ষীণরশ্মি আলোটা যেন কে উঁচু কোরে ধোরে দাঁড়িয়ে আশায় দেখে। আমি তাড়াহাড়ি একটা বারান্দায় উঠে দাঁড়ালুম, দেখলুম একটা মেয়ে সেই কালিপড়া ভাঙ্গা হারিকেনটা উঁচু কোরে আমার মুখের দিকে ধোরে দেখলে। পরে একখানা ঘর আশায় দেখিয়ে দিয়ে আলোটা নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। উলু খড়ের ছাউনির অতি ছোট্ট ঘরটি, দুই খানি মাত্র ঘর, সরু লম্বা বারান্দা। ঘরের মেঝে সিমেন্টের। জীলোকটি যে ঘর দেখিয়ে দিলে তার চৌকাঠের কাছে এসে দেখি একখানা তক্তপোসের ওপর এক অতি বৃদ্ধ বোসে তামাক খাচ্ছে, ঘরের আর এক ধারে আর একখানা তক্তপোস পাতা আছে, তাতে একটা বড় হারিকেন আছে। সেটা পরিষ্কার, তার আলো খুব উজ্জল। ঘরটা বেশ ভাল ভাবে দেখা যাচ্ছে। আমি ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়াতে বৃদ্ধ আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো কোরে দেখে বলল, “হু, বড় বৃষ্টির ঠেলায় এসে পড়েচেন দেখছি। এঃ, কাপড় জামা একেবারে কাঁদায় মাথামাথি। কেন যে এই দুর্ঘোণে বেরিয়েছিলেন বাবু? অবস্থার ব্যবস্থা রাখিনি। আপনার বাড়ি কোথায়, কি জাতি, কোথায় যাওয়া হচ্ছিল বাবু?”

এই সব অনেক কথা বলে বৃদ্ধ আমার মুখ পানে চেয়ে রইল। আমি বললুম, ‘আমি ব্রাহ্মণ, বাড়ি এই হরিপালেই কলকাতা থেকে আসছি।’ “পথ ভুল কোরেচেন উঁটো রাস্তায় অনেকটা দূরে এসে পড়েচেন বাবু” বলে হুঁকোটা নাবিয়ে রেখে আমায় প্রণাম করে হারিকেনটা তুলে নিয়ে

তার সঙ্গে বাগানদার যেতে ইসারা করলে। বাগতি জল ও ঘটি দেখিয়ে বললে, 'লেন বাবু গা হাত পা ধুয়ে।' আমি তাই নিলুম। একটু যেন স্বস্তি বোধ হল। হাত পা জলা কচলে। ধান কাটা হয়ে গেছে, তার গোড়া গুলোতে যেন কুশের মতন কর করে ধার। হাত পা ছড়ে কেটে গেছে, জল পেয়ে খুব জালা কচলে। বৃদ্ধ একখানা মাহুর পেতে দিলে তক্ত পোসের ওপর, বললে, 'বসেন বাবু, আমি লাত বোটারে ডেকে আনি, কিছুটা সেবা হোক। বেরাভন অতিথি নারায়ণ, আমার ভাগ্যে তো জোটে না। কেই বা আসবে এই বোনালয়ে? হ্যা, যত বুনো জন্ত নিয়ে আমার সংসার।' বকতে বকতে বুড়ো নাত বৌয়ের দোরে ধাক্কা দিলে। দোর খুলে গেল। আমি বৃদ্ধের ঘরে তক্তপোসের ওপর বসে পায়ে হাত বুলোতে লাগলুম। হাঁটু দুটো কন কন কোচ্ছে, কতবার যে আছাড় খেয়েছি তার ঠিক নেই। সন্ধ্যা ছটা থেকে আর এই রাত এগারোটা অবধি দুর্দান্ত শীত ও তার ওপর ঝড় বৃষ্টি, অশ্রু লোক হোলে মাঠে মরে পড়ে থাকত। হাতের ঘড়িটি ঠিক চলছে, এত বিপদেও অচল হয় নি। এখন রাত এগারোটা। পাঁচ ঘণ্টা প্রকৃতির সঙ্গে লড়ে জয়ী হয়ে কিনারায় উঠলুম, কিন্তু কিনারায় এসে তরী না ডুবলে বাঁচি। এখনও জল ঝড়ের তর্জ্জন গর্জ্জন চলছে, মাঝে একটু কমেছিল, আবার ভেড়ে লেগেছে। এই আশ্রয়টুকু যে নিরাপদ তাই বা কি জানি? ব্যাগে এক মাসের মাহিনা। আর তিন মাসের মোটা ছুটি পেলে যা হয়; যত রাজ্যের জামা কাপড় মায় সন্দেশ বিস্কুট চকোলেট পর্য্যন্ত। ভাবি-বেগতিক দেখলে সব ধোরে দেব, যদি রেহাই পাই। না; তা হয় না। ওরা আমাদের মত স্ত্রু গায়ের জোর নিয়ে কারবার করে না। দুষ্টামিতে আমাদের চেয়ে ওদের চেয়ে বেশী বুদ্ধি আছে, যার কাছ থেকে কেড়ে নেয় সাক্ষি দেবার জন্যে তাকে বাঁচিয়ে রাখে না। তবে একটা অতি বৃদ্ধ ও একটা মাত্র জীলোক কি করতে পারবে আমার মত একটা যশুমার্ককে? আবার ভাবি বুড়োটা লোক ডাকতে গেলো হয়তো সেবার নাম ধোরে। কি সেবাটাই চলবে তাতো বলা যায় না, পালাব নাকি এই ফুরন্ততে? উহ, সে সুবিধা হয়ে উঠবে না এই জল কাদায়। ওদের হয়ত দল আছে, তাদের সঙ্গে পালা দেবার শক্তি এখন আর নেই। দেখা যাক বেরাভনের সেবাটা-কর্তদুর গড়ায়।

নাৎবোকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ ফিরে এল। ঘরের মধ্যে আমায় দেখিয়ে দিয়ে হাতের ইসারায় জানালে, 'এঁকে খেতে দাও, ইনি ব্রাহ্মণ, সেবা করো।' উপর দিকে হাত তুলে বৃদ্ধ ইসারায় কি সব জানালে। আমার মনে হয় তাকে স্বর্গে যাবার সিঁড়ি দেখিয়ে দিলে ব্রাহ্মণ সেবার দৌলতে। নাৎবোটি গলায় আঁচল দিয়ে আমার প্রণাম করলে। বৃদ্ধের নাৎবো বোধ হয় হাবাকালা, হাত ইসারায় সব কথা বুঝে নিলে। বৃদ্ধ আমার বললে, 'বাবু, নাৎবো আমার হাবা কালা। কিন্তু ওর বুদ্ধির অভাব নেই। আমার এই ছুখের সংসার ওই একা চালায়। আমার ও ছাড়া আর কেউ নেই, ওর নাম রেখেছি মায়। ওকে বিশ সালের বস্ত্রায় কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।' আমি মায়ার দিকে চেয়েছিলুম ও হাতের ইসারায় কৌশলটা দেখছিলুম। মায় বোকা নয় এবং সে অনিন্দ্যসুন্দরী, একখানা খান কাপড় ও নিরাভরণ নিটোল দুখানি হাতও একটা দেখবার জিনিষ। আমি ভাবছিলুম, তাই তো মায় নিশ্চয় কোন সন্ধান ঘরের মেয়ে, মায় বিধবা। কিছুক্ষণ পরে মায় এলো, তার এক হাতে ছুখের বাটি অশ্রু হাতে এক থালায় সাদা ধবধবে সন্ক চিড়ে, কলা এক ছড়া ও খেজুরের শুড়ের পাটালি। সেগুলি ঘরের মেয়ের এক ধারে রেখে মেয়ের হাত বুলিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে একখানা কবলের আসন পেতে দিয়ে দরজার পাশে সড়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধ বললে— 'বাবু আমরা জেলে, আমাদের জল আপনাদের খাওয়া চলবে না তো, নয় তো ছুখ বেশী করে দেব। তাতে আপনার পিপাসা নিবারণ হবে, তুধে কোন দোষ হবে না। তুধ সব জাতেরই চলে, আমার ঘরে গরু আছে, যথেষ্ট তুধও আছে।' আমি তখন আবোল তাবোল ভাবি, কোথায় জনকনেক লোক এসে লাঠি ঠেঙ্গা নিয়ে আমায় খুন কোরতে আসবে, তা নয় ফলারের যোগাড়? নিজের চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস কোরতে পাচ্ছি না। এমন সময় বৃদ্ধ ডাকলে, "উঠে বসুন বাবু, আহারে বসুন। দ্বিতীয় পহর গড়িয়ে গেল যে।" তার ডাকে হাঁস হলো, হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি সতাই তো একটা বেজে গেছে। বৃদ্ধকে বললুম, 'তোমাদের জল খেতে আমার কোন আপত্তি নেই। জলটা পরিষ্কার হলেই হলো।' বৃদ্ধের ইসারায় তার নাৎবো বেশ বাকবকে মাজা ঘটতে এক ঘটি জল আমার খাবারের কাছে বসিয়ে দিয়ে ছুখের বাটিতে চিড়ে ফেলে দিল।

আমি একটু অনমনস্ক ভাবে ছুধের বাটিতে চুমুক দিতে বাচ্ছি, কানে এক অদ্ভুত শব্দ এল। উ, উ, শুয়া, আমি চমকে গিয়ে হাবা মেয়েটির মুখ পানে চাইলুম। সে একটু হেসে আমার ছধ চিঁড়ের ওপর কলা, পাটালি গুড় ফেলে দিলে। আরও চিঁড় দিতে আসচে। মেখে ইসারায় নিজের পেটে হাত দিয়ে জানালুম আর খেতে পারবো না, ক্ষিদে নেই। ব্যস ঠিক বুকে নিলে ও, বাকি জিনিষগুলি নিয়ে তার ঘরে চলে গেল। আমি হাত মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে বসলুম। বুদ্ধ ছোট একটা হাঁকায় তামাক সেজে আমার দিলে ওঃ নিজের হাঁকাটা সেজে নিয়ে তার জায়গাটিতে উঠে বসল। আমি ও বুদ্ধ তামাক খাচ্ছি মেখে মায়া হুখানি কখন এনে আমি যে তক্তাপোসটা বসেছি সেখানে রেখে চলে গেল। আমি বুঝতে পারলুম বিছানার জন্য দিয়ে গেল। পেতে নিয়ে বসলুম ও ভাবতে লাগলুম তার লক্ষ্য সরমও বেগ আছে। তার দিকে চেয়ে তখন ভাবি, কি আশ্চর্য্য রূপ মেয়েটার, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য মেয়েটার। চেয়ে দেখলে মায়া খুব বিরক্ত হয় বলে মনে হয়। আমি তার দুর্ভাগ্যটা চেয়ে দেখি মনে মনে। পেটে কিছু পড়ে কখনো শীত নিবারণ হতে ভয়টা কমলো। এতক্ষণ আছি তৃতীয় ব্যক্তিকে তো দেখছি না। বৃষ্টি কমতে বাড়টা বাড়লো। ঘরের চালটা মট মট কট কট শব্দ কোচ্ছে, কি জানি চাপা পড়ে মরবো না তো? বা হয় হবে, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করা থাক তেবে একটা কখন পেতে আর একটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম। হাতের ঘড়িটা খুলে রাখতে ভরসা হলো না। বুদ্ধের অলক্ষ্যে হুটকেশটা কখনের নীচে পেতে বালিসের মতন কোরে মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লুম। কেউ যদি মাথায় একখান লাঠি মারে তো পটল তুলতে হবে। তখন কোথায় থাকবে সখের ঘড়ি, আর কোথায়ই বা থাকবে সখের জিনিষ শুদ্ধ হুটকেশটি। তবু ভালর দিকটাও ভাববার বিষয়; ফলারের ও বিশ্বাসের ব্যবস্থা উত্তম বলা চলে, মধ্যমের ব্যবস্থা আপাততঃ অনিশ্চিত। আমার ঘড়িতে দুটো বেজেচে। ছোট একটা ফোকরের মত জালনা খুলে বুড়ো থুথু ফেললে; সে দিকে চেয়ে দেখি অন্ধকার ভীষণ। ব্যাঙ ও বিঁবিঁ পোকাক ডাকে কান বধির কোরে দিলে, এদের ডাকের আর বিরাম নেই। বুড়ো জানালার বাঁপ টেনে বন্ধ কোরে দিয়ে স্বস্থানে বোসে তামাক টানতে লাগলো। আশ্চর্য্য এই যে বুড়োর

তামাক খাওয়ার বিরাম নেই। আমার বড় তন্দ্রা এসেছিল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বুঝতে পারিনি। একবার পাশ ফিরে শুনলুম, তক্তাপোসটা মচ মচ করে উঠলো। অমনি বুদ্ধ বললে, 'বাবুর ঘুম ভাঙলো?' তাইতো বুদ্ধ এখনও শোয়নি? এখনো হাঁকা হাতে তেমনি ভাবে বোসে আছে। আমি বললুম, 'ঘুমোও নি?' বুদ্ধ বললে, ঘুম কি আছে বাবু যে ঘুমোব? আমি বললুম, 'তোমার নাথবোকে কি ভাবে কুড়িয়ে পেয়েছিলে বলতো। আর তোমার কাছে নিয়ে সংসার ছিল আমাকে বলবে?' বুদ্ধ বলে, 'হ্যাঁ বাবু বলবো বইকি! আচ্ছা বাবু স্বর্গ আর নরক কেন সৃষ্টি হয়েছিল বলবেন বাবু?' আমি বললুম, 'ওসব বাজে কথা, এখন তোমার কথাই শোনাও।' হাতের ঘড়ি দেখে নিলুম রাত চারটে, বাড়ের বেগ কমেচে, বুর বুর করে বৃষ্টি পড়চে, ঘরের বাইরে কানাচের ধার বেয়ে জল চলেচে কুল কুল শব্দে। শীতের সময় চারটের রাত বলা যায়। বুদ্ধ হাঁকাটা বাঁ হাতে ধরে নতুন করে সাজান কলকে ধরিয়ে ফুঁ দিচ্ছে, যেন অনামনস্ক ভাবে আছে। আমি তার দিকে মুখ কোরে শুয়ে ভাবছি, এতক্ষণ পর্যন্ত নিব্বিয়ে কাটলো, মন্দ কি? আমি অতিথি অস্বীকার করতে পারি না যে আমার নারায়ণের মত সেবা হয়নি, এখনও আগা পান্তলা কখন মুড়ি দিয়ে বুদ্ধের কাছে গল্প শুনিচি, যদিও ভয় পূর্ণ কুটীর, কিন্তু এই আশ্রয় না পেলে আমার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটতো। আমি বুদ্ধকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগলুম; জীবন যে আছেন এতদিন পরে বিশ্বাস হল, কারণ মাঠের মধ্যে শীতে বড় বৃষ্টি যখন আসন্ন তখন ভগবান রক্ষা কর, এই কথাটি মনে হওয়া মাত্র বুদ্ধের এই কুটীরের আলো আমার পথ দেখিয়ে এখানে এনে ফেলেছিল। আর ঐ মায়া আমার বাঁচানর উপলক্ষ্য। সে সেই সময় নিজেদের গরুকে রক্ষা করতে ছুটে আলো নিয়ে এসে গরুকে তার শোবার ঘরে রেখেছিল, গরুর ঘরটা পড়ে গিয়েছিল বলে। "হ্যাঁ বলি বাবু! এই যে, বিশ শালের বন্যায় যখন সকলের ঘর বাড়ী ভেঁসে যায়, তখন কাকুর বা সর্বনাশ কাকুর বা পৌষ মাস হলো। আমি তখন দল বল নিয়ে লুট করতে যাই, কিন্তু হুবিধা করতে পারিনি। ঐ যে বন্দে মাতরম দলের তাড়া খেয়ে আনাচ কানাচ দিয়ে লোকা বেয়ে পাগিয়ে আসচি, দেখি জলের মধ্যে গাছের ডাল একটুখানি জেগে আছে। তাতে জামা আটকে

একটি এক বছরের মেয়ে ঝুঁগড়ে, লোকের তুলে-গিলাম, তারপর আঙনে সেকঁ হুধ খাইয়ে বাঁচান্ন। বাড়ী আনতে আমার ইস্তিরী তাকে বুকে নিয়ে কত যতন করতে লাগলো; তখন আমার বংশের পেশা ছিল লুটতরাজ ডাকাতি চুরি করা, মায় খুন জখম পর্য্যন্ত।” আমি তো একেবারে কাঁঠের মত হোয়ে শুনতে লাগলুম, শুনতেই হবে, বুড়োকে ঘাঁটিয়েছি যখন আর না শুনে উপায় নেই। বুড়োকে ঘেটুকু সন্দেহ ছিল তার এক বর্ষও মিথ্যে নয়, আমিও এখন ওর হাতের মধ্যে। তবে বুড়ো একা ও হাবি আমার সঙ্গে জোরে পারবে না এ নিশ্চয়, যদি এর মধ্যে কোন দল রল না আসে। একটা ভরসা বুড়ো একবারও আমার নজর ছাড়া হয় নি, কেবল তামাক টানে আর বকবক করে, এ-ছাড়া এখন পর্য্যন্ত কোন উৎপাত নেই। “বাবু ঘুমোলেন নাকি?” বলে বুড়ো; আমি বললুম “না ঘুমাইনি, কি একটা শব্দ হচ্ছে তাই শুনছি।” “ও আমার ক্যাংলা শেরাল তাড়াচ্ছে। ভয়কি বাবু, ওটা এতটুকু বাচ্ছা থেকে পুবেছি”, বড় তেজী কুকুর, বলে বুড়ো। আমি বললুম ‘তারপর বল।’ বুড়ো হাঁকোয় জোর টান দিয়ে ঘোঁয়া ছেড়ে বলে, হ্যাঁ বলি বাবু—হাবু যখন বছর তিনের তখন নানা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ল। আমার তিন ছেলে ও দুই ভাইকে অপরাধী বলে ধরে নিয়ে গেল, তারা আর ফিরলো না। আর আমি এমন ডুব মেরেছিলাম একেবারে পাঁচটি বছর পরে ফিরল; ফিরে দেখি আমার লাতিটি ছাড়া আর বংশের কেউ নেই বাবু। লাতির বয়স পনের বোল হবে। আমি এসেই হাবির সঙ্গে লাতির বিয়ে দিচ্ছি। হাবি-তখন আট বছরের মেয়ে, গোবর গাদায় পদ্ম ফুলটির মত; কিন্তু হাবা কালা বোলে লাতি বিয়ের, অরাজি হল না। বিয়ে হোয়ে গেল, হাবি আমার ইস্তিরির খুব সেবা করতো; শোকে তাপে সে যেন কেমন হয়েছিল। আমার ইস্তিরী আমার ফিরতে দেখে যেন ক্ষেপে উঠলো; বলতে লাগলো “আমার ছেলেরা ফিরলো না, তুই শতুর কেন ফিরে এলি?” আমার লাতিটির শেষ না কোরে ছাড়বি না, বেরো বাড়ী থেকে।” লাতিটি আমার বড় ভাল, সে কোন রকমে তার ঠাকুরমাকে ভুলিয়ে রাখে। হাবিও তাকে খুব শতন করে, মেয়েটার খুব বুদ্ধি আছে বাবু।” আমি বললুম—“হ্যাঁ তা দেখেই মনে হয়েছে, হাবা কালা বটে, বোকা নয়।” বুড়ো বললে—আমার ইস্তিরি সর্ব্বদাই আমার মায় খোর

কোরতে লাগলো। বছর খানেক সহি করলুম, একদিন এমন রেগে গেলাম, এক লাঠি তার মাথায় বসিয়ে দিতেই সে পড়ে গেল আর উঠলো না, আর লাতিটি আমার ঘরে দৌর দিয়ে রেখে আমার ইস্তিরিকে নিয়ে আমার ঘরের কানোচে একটা শুকনো ডোঁবা ছিল সেখান পুঁতে রেখে এলো। আমার ইস্তিরির খুব দয়া মায়া ছিল, আমার খুব সেবা করতো। মাস কয়েক পরে মনটা যেন কেমন করতে লাগলো, যাই ডোঁবাটা খুঁড়ে হাড় কথানা দেখে আসিগে বলে সন্ধ্যা বেলা সেখানটা খুঁড়েছি অমনি আমার মাথার ওপর গাছের ডালে গৌ গৌ শব্দ করে একটা জানোয়ার আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েই এক কামড়ে খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে ছুটে পালালো। আমি সেইখানে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে রইলুম; রক্তে ভেসে যেতে লাগলো যায়গাটা। যখন জ্ঞান হল দেখি ঘরে শুয়ে আছি, লাতিটি ও হাবি শুধুপাতা ও শেকড় বেটে ফালি দিয়ে বাধে ও রক্ত মুছিয়ে দিচ্ছে। আমি চোখ চাইতে নাতি বলে “ঠাকুরমা হুধ খা”, মুখে হুধ তেলে দিলে তার পর নাতিটা বলে কি শোনো—ঠাকুরা ঠাকুরমারে মেরে ফেলেছিল মনে নেই? শালা, কেমন জন্ম? ভূত হোয়ে কেমন শোধ লিলে ঠাকুরমা এ শালা খুনে, সোহাগ জানিয়ে তার হাড় দেখতে গেচে। কেমন হোলো তো সোহাগ করা? আমি ভাবচি নাতি ঠিকই বলেচে। তারপর বুড়োকে জিজ্ঞাসা করলুম “হোমার নাতি কিসে মারা গেচে?” বুড়ো ভয়কি হোয়ে আলোর দিকে চেয়ে জোর করে তামাক টানচে; কলকেশ ছাই আছে আশুন নিভে গেচে। বুড়োর মতন কলকেটার দশা হয়েছে। ভোর হতে কিছু বাকি, বোধ হয় পাঁচটা বেজেচে; বড় জল থেমেচে। উঠে জানলা খুলে দেখি অন্ধকার ঘুট-ঘুট কচে, শীতে কাঁপিয়ে দিলে। আমি কবল টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লুম, চেয়ে দেখি বুড়োর দিকে, সেই ভাবে ছাই পড়া তামাক টানচে। কিছুক্ষণ পরে একটা জোয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বলে—“বাবু ঘুমোলেন নাকি?” যে শীতটা পড়েচে, বার হওয়া দায়। রাত অল্প বাকি। আমার ডাকে, বাবু ঘুমোলেন নাকি? আমি বললুম, “না” বুড়ো বলে, বাবু সগগো আর লরক যে কি আপনারা পণ্ডিত লোক সব জানেন আমার কিছু বলতে পারেন?” আমি বললুম “না বাপু কখন ও

স্বর্গেও যাইনি, নরকেও যাইনি, কি করে বলবো বল ?” বুড়ো বলে, “পাপীদের সাজা দেয় লরকে ; ই্যা বাবু আপনি সব জানো। বামুনরা সকল শাস্তর জানে। আমি তাদের কাছে শুনছিলাম বহুদিন আগে যে, যে সব লোক আমার মতন পাপী তাদের লরকে ডুবিয়ে মাথার বাড়ি মারে, আঙুনে লোহা পুড়িয়ে ছেঁকা দিয়ে ফোঁকা তুলে দেয়।” আমি বলুম—“তা হবে, তাতে তোমার ভয় কি ? তোমার তো শাস্তি হোলো, ছেলেগুলো অকালে বেঁধোরে মলো, পরিবার ভূত হোয়ে ঘাড়ের মাংস তুলে নিলে, এবার বোধ হয় তোমার চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বানাবে, মাথা নিয়ে ভাঁটা খেলবে, এই সব ভূত পেত্তিতে করে বোধ হয়। তায় আবার তোমার ইস্তিরি ভূত সহজে ছাড়বে না, তোমার ঘাড়ের মাংস অনেকটা ছিঁড়ে নিয়েছে, একটা বাটির মত গর্ত হোয়ে আছে দেখছি।” আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে বৃদ্ধ বলে, “সেটা ভূত নয় বাবু, বন বিড়েলের ছা, শালার জাত বড় রাগি।” আমি তবুও বলতে ছাড়লুম না। পরে বললুম “ই্যা তোমার নাতিটা কিসে মারা গেল বলে, না তো ? আমি তোমায় নরকের অনেক খবর দিলুম তো। আমি ব্রাহ্মণ সকল শাস্ত্র আমার জানা আছে। স্বর্গের সংবাদটা আমি ঠিক জানি না, তবে সেখানে জোর আরি করে একবার পৌঁছতে পারলে বোধ হয় সুখে থাকতে পারা যায়।” বুড়ো এতক্ষণে একটু প্রফুল্ল হোল। নড়ে চড়ে একটু সরে বসে নতুন করে কলকে ধরিয়ে তাতে ফুঁ দিয়ে আঙুন কোরে নিয়ে টানতে লাগলো ও বকতে শুরু করলে। “সত্যি বাবু লরক যন্ত্রণা আর কাকে বলে ? এই বাড়টা জখম হয়ে অবশি সব কাজের বার হোয়ে গেছি। আমার হাবা কালা মায়া ছিল তাই বেঁচে থাকা আর বেঁচে থেকে কেবল পরিতাপ ভোগ করা, ই্যা বাবু আমার নাতিটা কিসে মলো শুধোচ্ছেন ? বলি এবার, সেটা বড় পরিতাপের কথা বাবু। শেষ বয়সে সেটা বুকে বড়ই বাজে বাবু, ই্যা, বলি এবার। বছর চার আগে আমার নাতিকে দারোগা বাবু সন্দেহ কোরে ধরে নিয়ে গিয়ে এমন মার দিলে সে মর মর হোয়ে পড়লো। তখনও ছাড়ে না, বলে—অমুক জায়গায় চুরি হয়েছে মাল বার কোরে দে ; সেতো চুরি চানারির দিকে যেতো না বাবু ? তা মালের খবর কি জানবে ? লাতিভা আমার বংশ ছাড়া হয়েছিল। যেমন যাত্রায় দেখেছিছ দৈত্য কুলের পেল্লাস—ঠিক তাই ছিলো।

আমি তো খাঁটি ডাকাত আমার ধরলেনি, জোয়ান দেখে নাতিভারে ধরে নিয়ে গেল। আমি বলুম—“আমারে শাস্তি দাও, এখন চুরি ডাকাতির বয়স নেই এককালে করেছি তো ?” দারোগা বাবু বলে—“তোকে নিয়ে গেলে জেলের লোক হাসবে” বোলে আমার নাতিভারে নিয়ে গেল। তার পর, মেয়ে ধরেও হোলো না, সারা ছপুয় রোদে ফেলে রাখলে হাত পা বেঁধে, তাতেই মারা গেল।” বুড়ো হকোর জোর জোর টান দিতে লাগলো। আমি বললাম—“দ্যাখো জেলের পো, স্বর্গ বোলে লোকে যে কথা বলে, সেটা তো এই পৃথিবীতেই আছে। যারা পৃথিবীতে সুখে স্বচ্ছন্দ থাকে তারা পুণ্যাত্মা। তারা আরামে থাকে, তাকেই স্বর্গ সুখ বলে। আনার তো তাই মনে হয়। আর তুমি তো শোকে তাপে দগ্ধ হচ্ছে। তোমার দুঃখকষ্টের সীমা নেই ; অক্ষম হয়ে আছ, একটি হাবা কালা মেয়ের ওপোর নির্ভর কোরে, এর চেয়ে নরক যন্ত্রণা আর কি হতে পারে ? তোমার পাপের ভোগ ক্ষয় হোয়ে যাবে। মৃত্যুর পর তোমার আর খারাপ জন্ম হবে না। তাতেই তোমার সব পাপ কর্ম শেষ হবে, পরজন্মে তুমি সুখী হতে পারবে।” এই কথা শুনি বলতে হোলো বুড়োকে সামান্য দেবার জন্যে। স্বর্গ নরকের সংবাদ আমি কোন কালেই জানি না। বুড়োর চোখে মৃত্যুর ছায়া নেচে নেচে তাকে অনবরত ভয় দেখাচ্ছে, পাপের জন্যে অহুতাপে পুড়ে মছে। তাকে সামান্য দেবার জন্যে এত কথা বলা। তার বিশ্বাস ব্রাহ্মণরা সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত। সেই কারণে যাতে নরক যন্ত্রণার হাত এড়াতে পারে তার বিধান নিতে চায়, মুক্তির পথ কি জানতে চায়। কাজেই তাকে একটা সামান্য পথ ধরিয়ে দেওয়া চাই। আমার কথা শুলো বুদ্ধ যেন ইঁ কোরে গিলছিলো। আমি ধামতে—সে যেন সুখা পান কোরে অমরত্ব পেলে। কিন্তু নরকের ভয় অনেকটা কমে গেল, প্রাণে কিছু শাস্তি পেয়েচে বোধ হল। কলকেটা ছাইএর মালসার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তক্তপোস থেকে নেবে এসে বলে, বাবু উঠে পড়ুন ভোর হয়েছে। আমি উঠে দাঁড়াতে আমার পায়ের ওপোর মাথা রেখে বলতে লাগলো, “আমার বুকে যেন একখানা ভারি পাথর চাপান ছিল। আপনি কোন দেবতা নিশ্চয় ? আমার কুঁড়ের এসে পাপীর বুকের পাথরখানা নাবিয়ে দিলেন। আমি

তিরিশ বছর ধরে কেঁদেচি যাতনায়। এমন মধুর মুক্তির কথা কেউ আমার শোনায়নি বাবু। আজ আমার বুকের পাথর নাবলো; আপনি বাড়ী যান। ভোর হয়ে এলো, আমার ঘরে আর থাকা নয়। এখনও এই অথমের ওপোর দারোগা বাবুর লজর আছে।” হো হো করে হেসে উঠে বসে বুড়ো, “আমার চার কুড়ি বছর বয়স হল, কি পদার্থ আছে আমার?” ব্যাগ নিয়ে জামা পরে বেরিয়ে আসচি, তখনও অল্প অল্প অন্ধকার আছে। মাঠা সেরে দুই ওজনের খেজুরে গুড়ের পাটালি নিয়ে পথ আগলে দাঁড়ালো; কিছুতেই পথ ছাড়ে না। ব্যাগ নিয়ে টানাটানি। আমি বলি, জল কাদায় এত ভার বহিতে পারবোনা। মাঠা ও ছাড়ে না; নিতে হল। মাঠা ব্যাগ

ঘাড়ে কোরে আমার পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। বুড়ো তাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলে, সে ঘাড় নেড়ে রাজি হল। আগে চললো মাঠা পিছনে আমি। বুড়ো আমার বললে, “বাবু ভয় নেই। হাবি হরিপালের বাজার পর্যন্ত আপনার মোট বয়ে পৌঁছে দেবে। আপনি ভুল পথে এসে পড়েছিলেন, হরিপাল এখান থেকে পাঁচ কোশ রাস্তা। হাবি পথ চেনে, ঠিক পৌঁছে দেবে।” নিরাপদে পৌঁছেছিলুম; সে আজ দশ বছরের কথা। মাঠাকে ও সেই বৃদ্ধ ডাকাতকে আজও ভুলতে পারিনি। অন্ধকার রাত্রে ঝড়জলে তাদের কথা ও সেই কুঁড়ে ঘর আর ফলার খাওয়ার কথা মনে হয়।

“রবি-বন্দনা”

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শেখর শাস্ত্রী।

এসো বিবেক বিমল জ্যোতি
তুমি জগিছ হৃদয় মাঝে
তোমার আলোকে
তোমার কাব্যকে
তোমার লেখাকে
স্মরণ করি এতক্ষণ।
এসো বঙ্গ-রবি
এসো বিশ্ব-কবি
এলো যে শুভক্ষণ।
যারা বলে তুমি আজও নাই
মুখ তারা অতি

তারা জানে না যে তুমি
অমর হয়ে দিতেছ জ্যোতিঃ
এসো গুরু-কবি
এসো স্বরা-কবি
দাও আলো তুমি
বেলা হ'লো এবে।
লহ নমস্কার
কর আশীর্বাদ
ফিরায়োনা মোরে
করি তিরস্কার।
“বঙ্গ তামিলন”

আমাদের আসর

পরিচালিকা—ত্রিবেলা দে

সংগ্রহ।

পরমার্থ প্রসঙ্গ হইতে।

শ্রীহিমাংশুবালা ভাট্টী সংগৃহীত

১। স্বাধীনতা পরম স্বখ। পরাধীনতা মহাদুঃখ।
ঈশ্বরের দাসত্ব যথার্থ স্বাধীনতা। যড়রিপুর দাসত্ব ত্যাগ
না করলে ঈশ্বরের দাস হওয়া যায়না।

২। মাতৃষের নিজের বন্ধন নিজের হাতে, নিজের
মুক্তি ও নিজের হাতে। নিজেরা জেনে শুনে বন্ধনে পড়ে
ভুগে মরি।

৩। ভগবান বাস্তবিক কোন অভাব রাখেন নি,
মাতৃষের অভাব কেবল মনে। স্তব্ধ দুঃখ মনে বাইরে
নয়। যেমন ভাব, তেমন লাভ।

৪। আপনাকে দাঁড়াত আপনাকেও পাবে, পর ও
আপনার হবে। যত আপনাকে বাঁচাতে যাবে, তত
আপনাকে খোঁসাবে, আপনও পর হয়ে যাবে।

৫। বিশ্বাসে অসম্ভব সম্ভব হয়, সংশয়ে হাঁটু জালও
ভুবে মরতে হয়।

৬। সংসার ত্যাগ করতে হলে যে সন্ন্যাসী হয়ে
বনে যেতে হবে তা নয়। আসল ত্যাগ হচ্ছে মনে।
মনে ত্যাগ করলে সংসারেই থাক আর বনেই থাক, একই
কথা। মনে ত্যাগ না করে বনে গেলেও সংসার সঙ্গে
সঙ্গে যাবে ও ভোগাবে, নিস্তার পাবেনা।

৭। পিতা সন্তানের কাছে, গুরু শিষ্যের কাছে
পরাজয় ইচ্ছা করেন। সন্তান ও শিষ্য তাঁদের চেয়েও
বড় হোক, এই তাঁরা চান।

৮। পুরুষ বা স্ত্রী প্রত্যেকেরই কোন না কোন
অর্থকরী বিদ্যা বা শিল্পাদি শিক্ষা করা একান্ত দরকার,

যার দ্বারা নিজে স্বাধীন ভাবে খেটে খুটে জীবিকা নির্বাহ
করতে পারে। পর বশ হওয়া মহা দুঃখকর, জীবনকে
দুর্ভিক্ষ করে দেয়, ধর্ম কর্ম করা তো দূরের কথা।

৯। দেবদর্শন বা সাধুদর্শনে এলে খালি হাতে আসতে
নেই। অন্তত দু'এক পয়সারও ফল, মিষ্টি বা অন্ন কিছু নিয়ে
আনবে।

১০। উপদেশ তো অনেক শুনেছ, পেয়েছ।
উপদেশ ত অনেক জান, অনেককে দিয়েও থাক। কিন্তু
তোমার কথা শুনে কে, যদি তুমি তার খানিকটা অন্ততঃ
নিজে করে না দেখাতে পার। কথাই ও কাজে আকাশ
পাতাল প্রভেদ। মেলা উপদেশ পড়বার বা শোনবার
দরকার হয়না। মুক্তি পথের একটা উপদেশও যদি নিজ
জীবনে প্রতিকলিত করতে পার তা হলে তুমি ধন্ত হবে,
জগত্তেরও কল্যাণ হবে। আর তুমি মার কৃপায় দ্রুত
ভবসাগর পার হয়ে আনন্দধামে প্রয়াণ করবে।

ঘরের কথা—শকুন্তলা।

কাপড় ও জামায় রং করা (দেশী প্রণালীতে)

আমি আজ পরিধেয় বস্ত্রাদিতে রং করার প্রণালী
বিষয়ে বলছি। রং করার জন্ত যে সব জিনিষের
প্রয়োজন হয় সেগুলি বেনের দোকানে পাওয়া যাবে।
রং করার জন্ত দরকার হয় ছ'তিন খানি মাটির গামলা
আর শাড়ী যদি ১১হাত হয় তাহলে ১৬ সের আন্দাজ জলের
দরকার।

হলুদে রং—প্রথমে ১৬ সের গরম জলে হলুদ
গুঁড়ো মিশিয়ে কাথ তৈরী করে নিতে হবে। যে কাপড়
বা জামায় রং করা হবে প্রথমে সেগুলো একবার পরিষ্কার
জলে কেচে নেবেন। এবারে ঐ হলুদ মেশানো কাথে
সাদা কাপড়খানি প্রায় আধ ঘণ্টা রেখে নাড়াচাড়া করে

নিতে হবে, যাতে সমস্ত জমিতেই রং সমান ভাবে লাগে। তারপর কাপড় নিংড়ে নিয়ে অপর একটি পাত্রে (মাটির) খানিকটা জৈবদুগ্ধ জলে সামান্য ফটকিরি মিশিয়ে সেই জলে আর একবার ভাল করে ডুবিয়ে কেচে নেবেন। খুব জোরে কখনও নিংড়াবেন না। অল্প অল্প জল থাকা অবস্থায় হাওয়ায় শুকিয়ে ইত্থি করে নেবেন, তাহলেই হল্‌দে রং হবে।

লাল রং—লাল রং করতে হলে তিন ছটাক মঞ্জিষ্ঠার ভাল, ১ তোলা ফটকিরি লাগবে। প্রথমে ছোট ছোট করে মঞ্জিষ্ঠার ভাল কেটে ১/৫ সের জলে মিশিয়ে নেবেন। এবারে ঐ জলে ১ তোলা ফটকিরি গুঁড়ো মিশিয়ে দেবেন। যখন দেখবেন ফটকিরি সম্পূর্ণ গলে গেছে তখন তাতে সাদা কাপড়খানি ডুবিয়ে প্রায় আধঘণ্টা নাড়াচাড়া করবেন। পরে অল্প জল শুদ্ধ কাপড়খানি হাওয়ায় শুখিয়ে নেবেন, তাহলেই লাল রং হবে। তবে যদি কেউ গাঢ় লাল করতে ইচ্ছা করেন তাহলে এই প্রণালীতে আরো ৩৪ বার কাপড়খানি রং করে প্রতিবার শুখিয়ে নিয়ে আবার তার উপর রং করবেন, তাহলে গাঢ় লাল রং হয়ে যাবে।

বাদামী রং—যে কাপড় বা জামায় বাদামী রং করবেন, সেই কাপড়ের বা জামার ওজনের শতকরা ১০—১৫ ভাগ খয়ের ও ১ভাগ তুঁতে নিয়ে কাপড়ের ওজনের ২০গুণ পরিমাণ জলে কাপড় খানি ছেড়ে দিয়ে প্রায় ১ঘণ্টা ফুটিয়ে নিংড়ে নেবেন। এদিকে আর একটি পাত্রে আড়াই ড্রাম বাইক্ৰোমেট (যে কোন ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে) ১/৫ সের আন্দাজ জলে; মিশিয়ে সেই জলে ঐ কাপড়খানি প্রায় আধ ঘণ্টা নাড়াচাড়া করে তারপর নিংড়ে হাওয়ায় শুকিয়ে নেবেন তাহলেই বাদামী রং হবে।

আজ শুধু তিন রকম রং করার প্রণালী জানালাম। এর পরে আরো কয়েক রকম রং করার প্রণালী বলবার ইচ্ছা রইল।

রান্নাঘর

মাছের আচার প্রণালী

ক্রীশৈল মিত্র।

উপকরণ—ভাল পাকা রুই মাছ—/১০

,, সরষের তৈল—/৫০

,, শুকনো লঙ্কা—৮টা

,, পাঁচ ফোড়ন—অল্প

নুন ও হলুদ গুঁড়া—সামান্য।

প্রথমে মাছগুলি বেশ করে নুন ও হলুদ দিয়ে মাখিয়ে ভেজে নেবেন। তারপর সরষের তৈলটি ১টা মাঝারী বোয়ামে করে লঙ্কা ও পাঁচফোড়ন দিয়ে রোড়ে দেবেন। ঘণ্টাখানেক পরে ঐ ভাজা মাছগুলি দিয়ে দেবেন। তারপর ঘণ্টা তিনেক করে প্রত্যহ রোড়ে দেবেন। এইটা প্রায় ১৫ দিন খাওয়া যায়।

আমাদের কর্তব্য

ক্রীবেলা দে।

আজকের ঘরে বাইরের কথায় সেই পল্লীগ্রামের বোনাদের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক, যার অশিক্ষার অন্ধকারে দারিদ্র্যকে নিয়ে বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অসুবিধাকে মেনে নিচ্ছে। আজকের স্বাধীন দেশের শিক্ষিত বোনাদের প্রধান কর্তব্য হবে সেই অন্ধকার থেকে তাদের মুক্ত আলোতে নিয়ে আসা। পল্লীগৃহের নিভৃত কোণে আজও রয়েছে গ্রামের রমণী জীবন্ত যন্ত্রেরই মত। শিক্ষা তাদের করে নি সংস্কৃত, মনে তাদের বাসা বেঁধে আছে মধ্যযুগীয় অন্ধসংস্কার। শিক্ষার আলো, মধুর গান, প্রাণ খোলা হাসি এ যেন তাদের জন্ত নয়। তারা জানে না তাদের জীবনের অস্তিত্ব আছে কি নাই। সংসার নামক কারখানাতে তারা যেন গৃহিণী নামধারী চালিত এক একটি ষড় মাত্র। আজকার এই সভ্যতার যুগে তাদের দিকে কিরে তাকাবার সময় এসেছে! পল্লীর বোনাদের প্রাণে নব জীবনের গান ধ্বনিত করে তুলবার দায়িত্ব আজকের শিক্ষিত বোনদের। এর জন্ত কেবল কয়েক খানা বই পড়বার কথা বলছি না। গ্রামে গ্রামে গিয়ে নানা রকম বক্তৃতা ইত্যাদির সাহায্যে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করে

হবে। তাঁদের মনে বাসা বেঁধে দিতে হবে ভাল ভাবে থাকবার ইচ্ছা এবং বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বোধ। এই আকাঙ্ক্ষা আর প্রয়োজন বোধ না জন্মাতে পারলে তাঁদের এই অসহনীয় কষ্ট দূর করা অসম্ভব হবে। মনে প্রয়োজন বোধ জাগলেই আকাঙ্ক্ষা আপনা থেকেই জাগবে। তখন সে নিজের চেষ্টাতেই ভাল ভাবে মাছুষের মত বাঁচবার চেষ্টা করবে। তাঁত শিল্প, রোগীর পরিচর্যা, হাতের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে তারা প্রয়োজন হলে বাড়ীতে বসেই আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে। এই ব্যবস্থার জন্ম চাই স্বেচ্ছাসেবিকা যারা মিশনারী মেয়েদের মত নারী সমাজের কল্যাণের বাণী

বহন করে নিয়ে যাবেন। গ্রামে গ্রামে এই কঠিন দায়িত্বের ভার রইল স্বাধীন দেশের বোনেদের উপর।

গ্রামের উন্নতির জন্ম কল্পনবা ফণ্ড থেকে কিছু চেষ্টা হচ্ছে বটে। কিন্তু ভারতবর্ষে গ্রাম যত আছে এবং গ্রামে গ্রামে নারীর সংখ্যা যত তার তুলনায় এ চেষ্টা অতি সামান্য। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে বা ছোট ছোট দল করে গাব শিক্ষিত মেয়েরা যদি নিজেদের নিজেদের পরিচিত গ্রামে কাজ আরম্ভ করেন তবেই গ্রামের উন্নতির কাজ এবং অশিক্ষিতা মেয়েদের জাগরণের কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে পারে।

পুস্তক সমালোচনা

শ্রীবেলা দে।

হিন্দুস্থানী উপকথা—প্রথিতযশা লেখিকা শ্রীশান্তা দেব ও সীতা দেবী কর্তৃক অনূদিত এবং শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কর্তৃক চিত্রিত। ক্লাসিক প্রেস থেকে শ্রীহরবন্ধু মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। ষষ্ঠ সংস্করণ মূল্য মাত্র তিন টাকা। এই পুস্তকখানি রায়বাহাদুর শ্রীচন্দ্র বসু, বি, এ. বিদ্যার্ণব প্রণীত *Folk Tales of Hindusthan* এর অতি সহজ সরল বঙ্গানুবাদ। আরব্য উপহাসের মত মনোহর ও চিত্তাকর্ষক এই বইখানি একদিকে যেমন শিশুমনে হাসি ও গল্পের খোরাক যোগাবে, তেমনি অপরদিকে গল্পচ্ছলে যে উপদেশগুলি প্রায় প্রত্যেক গল্পের মধ্যেই রয়েছে তাও অতি সহজেই শিশুমনে ছাপ একে দেবে। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপট এবং ভিতরের ছবিগুলি বাস্তবিক প্রশংসনীয়। সুন্দর আর্ট পেপারে ছাপা রঙ্গীন ছবিগুলি ছোটদের মনে নতুন ধরণের

কৌতুক সৃষ্টি করবে। বইখানির ভাবা, বাঁধাই ও ছাপা বিশেষ প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে ছোটদের এই ধরণের পুস্তক বর্তমানে খুবই কম! সস্তা ডিটেকটিভ ও ও অ্যাডভেনচারের গল্প অপেক্ষা এই ধরণের পুস্তক যে ছোটদের পক্ষে অনেকাংশে কাম্য এ কথা বলাই বোধকরি বাঞ্ছনীয়। এক কথায় বইখানি যে ছোটদের যথেষ্ট আনন্দ দেবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। পরিশেষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বাংলার অন্ততম মনীষী স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর জীবিতকালে বইখানি সম্পাদন করেছিলেন। বইখানির পক্ষে এটা একটি বিশেষ গৌরবের কথা। আশাকরি বইখানি যাদের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট আদৃত হবে।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

প্রবাসে বাঙ্গালী মহিলার সম্মান

ষাট বৎসর যাবৎ বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী নরনারীই আধুনিক শিক্ষা প্রচলন ও প্রসারের অগ্রণী। প্রাদেশিকতার মোহে অন্য প্রদেশের লোক স্বীকার করুক বা না করুক বাঙ্গালীরাই তাহাদের পাশ্চাত্য শিক্ষার বৃত্তিকাবাহক, বিশেষতঃ নারীর শিক্ষা ক্ষেত্রে।

বর্তমান বর্ষে শ্রীমতী সুহাসিনী সেন নাগপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোর্টের কার্য পরিচালনা সম্বন্ধে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৪৪ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই তিনি এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। ইনি ১৯৪৫ সাল হইতে নাগপুরের ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

তাহার কনিষ্ঠা কন্যা নাগপুরের এস বি, সিটি কলেজের ইংরাজির অধ্যাপিকা।

লগুনে নববর্ষ উৎসবে বঙ্গ মহিলা

ভারত স্বাধীন হইবার পর বর্তমান ১৩৫৫ সালের ১লা বৈশাখ লগুনে প্রথম নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে শ্রীতি সম্মেলনের ভার লইয়াছিলেন শ্রীমতী আশা ভট্টাচার্য। বাংলা গান বাংলা ভাষণ বাংলা কবিতা আবৃত্তি বাংলা চলনের খাদ্য প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হইয়াছিল। বাঙ্গালী ব্যতীত বিশ্বের নানা জাতির লোক শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া তৃপ্তি পাইয়াছিলেন।

সরোজনলিনী নারী মঞ্জল সমিতি।

নিখিল ভারত প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার লাভ।
নিখিল ভারত প্রদর্শনীতে সরোজনলিনী শিল্প বিভাগ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। কাশ্মীরি কাজ করা একটি ব্লাউজপিস সূচিশিল্পে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনোনীত হয়। তজ্জন্ত লেডী প্রতিমা মিত্র সমিতিতে রোপ্যপদক দ্বারা পুরস্কৃত করেন, ঢাকাই শাড়ীর কাজের জন্য সার্টফিকেট দেওয়া হয়। শ্রীমতী

সরমা বাগচী কাশ্মীরি ও শ্রীমতী উমারানী ঢাকাই শাড়ীর কাজ করিয়াছেন।
সরোজনলিনী শিল্প বিভাগের সূচি শিল্প বিভাগ পরিচালনা করেন মিস্ হেমললিনী মল্লিক। তাহার সুনিপুণ শিক্ষাপনার গুণে, ছাত্রীরা অত সহজেই পারদর্শি হইয়া উঠে এবং প্রতি বৎসর বহু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়া থাকে।

ভ্রম সংশোধন

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ।

গত চৈত্র মাসে 'লীলা দেবীর কাব্য' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাম ভ্রমক্রমে বাদ পড়িয়াছে।

গত ফাল্গুন সংখ্যায় আমার "মহাআজীর স্মৃতি" প্রবন্ধে মহাআজী ১৯০৬ সালে কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন লেখা হইয়াছিল। বস্তুতঃ তিনি সে সালে কলিকাতায় আগমন

করেন নাই, ১৯০১ সালে আসিয়াছিলেন। অনেক বৎসরের স্মৃতি হইতে লিখার ভ্রম এই ভুল হইয়াছে, তাহার জন্য আমি দুঃখিত। সত্যের অবতার সম্বন্ধে কোন অসত্য বাকা থাকা উচিত নয়। তাই এই ভ্রমটুকু সংশোধন করিয়া দিলাম।

সাময়িকী

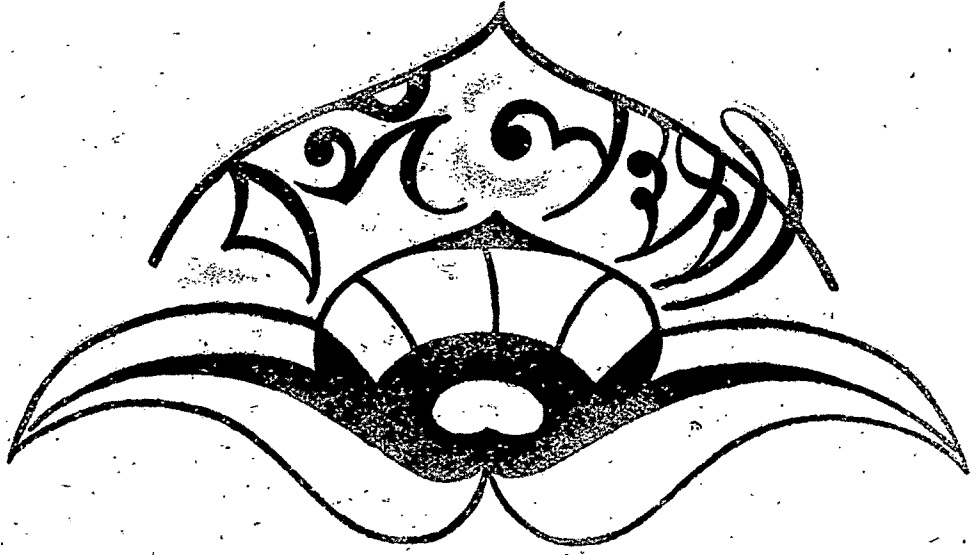
ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী

ভারত খণ্ডিত হইল, ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করিল, দ্বৈষিত স্বাধীনতাও আমরা লাভ করিলাম, কিন্তু কলঙ্ক মোচন হইল না। অপহৃত নারীদের ভাগ্য “যথা পূর্বম তথা পরম”। রাষ্ট্রের নায়কগণ যুক্তবৈঠকে যুক্ত বিবৃতি দিলেন, অপহৃত নারীদের মুক্তিকল্পে যুক্ত অভিযান শুরু করিলেন, কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীদের ভাগ্য পরিবর্তন হইল না, স্বামী পুত্র আত্মীয়স্বজনদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন নারীরা অদ্যাবধি দুর্ভাগ্যের কবলে কলঙ্কিত জীবন যাপন করিতেছে। সরকারী বিবরণে প্রকাশ (বেসরকারী হিসাবে অনেক বেশী) এক পশ্চিম পাঞ্জাবেই প্রায় ২০,০০০ নারী দুর্ভাগ্যের কবলে রহিয়াছে, তাহাদের মুক্তির আশা সূর্য পরাহত। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা নাকি সভ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে নব গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার নায়কগণ ইহাকে সভ্যতার কোন্ নজির হিসাবে ধরবেন? আমরা মনে করি যে, দেশের সরকার যদি এই বিষয়ে যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করিতেন, তাহা হইলে দুর্ভাগ্যগণ এই ভাবে নারীর মর্যাদা ও নারীর ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারিত না।

এই ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীদের ব্যথার ব্যথিত হইয়া মিস্ আমতুস সালাম তাহাদের মুক্তিকল্পে অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, এই মহিষমূর্তী নারীর উদ্দেশ্য সফলকাম হউক এই আন্তরিক কামনাই পরমেশ্বরের নিকট জ্ঞাপন করিতেছি। তৎসহ দেশের নারীসমাজকে এই মহিষমূর্তী নারীর আদর্শ গ্রহণে অরূপে জ্ঞানাইতেছি। আমরা আরও আশা করি যে, রাষ্ট্রনায়কগণ আমতুস সালাম যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাতে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন

এবং মানবোচিত কর্তব্য বিষয়ে অবহিত হইবেন। আমরা প্রতি সপ্তাহেই প্রায় এই বিষয়ে লিখি। প্রার্থনা করি আর বেশীদিন একথা লিখিতে যেন না হয়।

লোভ—যুদ্ধের আবহাওয়ায় স্বাভাবিক সব কিছু অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়; অনেক নতুন নতুন নামের ব্যাধি সমাজের বুকের উপর বাসা বাঁধতে আরম্ভ করে। তন্মধ্যে “Black Market” বা “চোরা বাজার” অন্যতম, ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিক লাভে সূখী হইতে না পারায়, অতি লোভের আশায় নতুন ফাঁদ পাতিয়া বসে। তাঁদের লাভের অঙ্ক বহুগুণে বৃদ্ধি হইতে থাকে, কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজ বিড়ম্বিত হয় ভতোষিক। ঐ অতিলোভের মোহ বর্তমানেও যে অব্যাহত রহিয়াছে ও রহিতে পারিয়াছে, ইহাতেই আমরা অবাক হইতেছি। পূর্বে “যত দোষ নন্দ ঘোষ” বলিয়া সব কিছু অনাচারের জন্ত বিদেশী শাষকদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া কর্তৃত্ব শেষ করা হইয়াছে। বিদেশী ভৃত্য যখন নাই, তখন বর্তমান দুর্নীতির জন্ত কাহারো দায়ী? উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাইতে পারে কাপড়ের কথা, কাপড়ের যতদিন কন্ট্রোল ছিল মধ্যবিত্ত সমাজ তিন খানার স্থলে অন্ততঃ ১৭খানা যোগাড় করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে কন্ট্রোল উঠিয়া গেল, সেই হইতে কাপড়ের মূল্য যেখানে গিয়া পৌছিয়াছে, মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে সেই মূল্য কাপড় ক্রয় করা অসম্ভব। অন্তান্ত বহুবিধ নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ সম্বন্ধেও একই ব্যবস্থা। দেশের নেতারা ঐ বিষয়ে মাঝে মাঝে বিবৃতি দিয়া থাকেন। কিন্তু বিবৃতিতে কোন কাজ হইবে না, যদি না অতিলোভের মূল উৎপাটিত হয়। মধ্যবিত্ত সমাজের নারীরা রক্ত থাকা পর্যন্ত এই রাক্ষসী “লাভ” দমিত হইবে কিনা, তাহাই আমাদের সন্দেহ।



২৩শ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ-১৩৫৫

৭ম সংখ্যা

চন্দ্রোদয়

শ্রীকালিদাস রায় ।

কৃষ্ণ পক্ষে আধখানা চাঁদ
উঠিছে গগন কোণে
তাহার আশায় রইনা ক' বসি
তার কথা নাই মনে ।
আমি সংসারী ভুলেও কখনো
চাহিনা গগন পানে
আমার জন্ম কোনদিন চাঁদ
উঠেনাক আশমানে ।
চাঁদ চারিদিকে চায়
সে জানে রয়েছে কতজন বসি
তাহারি প্রতীক্ষায় ।
কল্প সে উঠিয়া রে অভিযাত্রিকা
তোমার সময় হ'লো,
টুকোর কোথায় ? নাবিক ভয়ণী ।
কুমুদী বদন খোলো ।

রামানন্দ-জীবনী পাঠে ।

জনৈক প্রবাসী বাঙালী

আমাদের দেশের অগণিত দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় নানারূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়ে থাকে । সে সব মন্তব্য লোকে অনেক সময়ে পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়ার পরেই ভুলে যায়, মনের উপর বিশেষ কোনো ছাপ তারা ফেলে না । কিন্তু বহু বৎসর ধরে “প্রবাসী” এবং “মডার্ন রিভিউ” (M. R.) পত্রিকায় রামানন্দের লিখিত মন্তব্যগুলি পড়বার জন্য লোকে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং অতি শ্রদ্ধা ও মনোনিবেশপূর্বক তা পাঠ করেছে । বহুলোক এই মন্তব্যগুলি এবং রামানন্দের লেখা প্রবন্ধাদি পড়ে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাষিত হয়েছিল । দেশের লোকের হৃদয়ের অকথিত আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, নিরাশা, অভিযোগগুলি অকুতোভয়ে রামানন্দ মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর লিখে গেছেন । এ গুলি পড়ে লোকে উবুদ্ধ হয়েছে, নিরাশার মাঝে হৃদয়ে বল পেয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মন তাঁর প্রতি স্বতঃই কৃতজ্ঞতায় ও শ্রদ্ধায় ভরে গেছে । শুধু সরকারের শাসনে নয়, আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ—সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হোক, কিম্বা কর্পোরেশন হোক, কিম্বা কংগ্রেস, মুসলীমলীগ বা হিন্দুমহাসভা হোক—যেখানে তিনি কোন অত্যাচার, অবিচার বা স্থলন দেখেছেন, অমনি নির্ভীকভাবে, কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে, সে সকলের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী চালনা করেছেন । আবার যদি কোথাও কোন গুণ বা আদরের সামগ্রী দেখেছেন, তার প্রতি অকৃত্রিম অমুরাগ এবং উল্লাস প্রকাশ করতে কাপণ্য করেন নি । এই সব লেখার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অপূর্ব চারিত্রশক্তি, নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা, অকৃত্রিম দেশহিতৈষা, জলন্ত সত্যনিষ্ঠা এবং বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি । মন আপনা-আপনি তাঁর চরণে প্রণত হয়েছে ।

রামানন্দের প্রতি এই শ্রদ্ধার কারণ কি ? বা কিছু

তিনি লিখতেন বা বলতেন, তার পিছনে ছিল তাঁর নিজের জীবনের আদর্শবাদ, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সর্বোপরি তাঁর নির্মল চারিত্রবল । জীবনে তিনি ঈশ্বরকে এবং ধর্মকে সর্বোপেক্ষা উচ্চস্থান দিয়েছিলেন বলেই তাঁর সমস্ত কাজকর্ম ও উক্তির পিছনে এত জোর ছিল । ১৩১২ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে তিনি লিখেছেন : “ধর্মই সারবস্তু । যাহা ধর্মসঙ্গত নয় তাহা আমরা চাই না । স্বদেশী প্রচেষ্টা ধর্মসঙ্গত না হইলে, তাহা হাজার লাভের কারণ হইলেও আমরা তাহা সমর্থন করিতাম না । স্বথের বিষয় ধর্ম ও স্বদেশী প্রচেষ্টায় কোন বিরোধ নাই । স্বতরাং ইহাতে কায়মনবাক্যে যোগ দিতে পারি ।” (২৩পৃঃ)

দেশের কাজে আজীবন তিনি কিরূপ কায়মনবাক্যে যোগ দিয়েছিলেন,—তাঁর কর্মময় জীবনে শক্তির উৎস কোথায়—এ সকলের পরিচয় পাওয়া গেল রামানন্দের উপযুক্ত কত্যা শ্রীশান্তা দেবী প্রণীত তাঁর অপূর্ব জীবনচরিত খানি পাঠ করে ।

জীবনচরিত যে এমন সুখপাঠ্য হতে পারে তা এই বই খানি পড়ার আগে বুঝতে পারি নি । তার কারণ শান্তা দেবী নিজে প্রণীতবশা লেখিকা, সেইজন্তে পিতার জীবনচরিতখানিকে অতি সহজেই সাহিত্যের সামগ্রী করে তুলেছেন ।

বইখানির শিরোনাম পড়েই আর একখানি বইয়ের নাম মনে পড়ল : “রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” । পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত এই বইখানি বাংলা সাহিত্যিক ও সামাজিক ইতিহাসের একটি অমূল্য সম্পদ । বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা তখন সবে সুরু হয়েছে । বাংলার সামাজিক জীবনে এই পাশ্চাত্য শিক্ষা যে পটভূমি রচনা করেছিল, তারই উপরে শাস্ত্রীমহাশয় এঁকেছিলেন একজন পূতচরিত ব্রাহ্ম

শিক্ষকের জীবনের ঘটনাবলী। শান্তাদেবীও সেই রকম বাংলাদেশের গত পঞ্চাশ বছরের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের পটভূমিতে একেছেন এক দেবচরিত ব্রাহ্ম অধ্যাপক ও জ্ঞানদেবতার নিখুঁত জীবন কাহিনী। লেখিকা লিখেছেন :—

“এই ধর্মশতাব্দী ধরিয়া রামানন্দ জাতির চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করিতে, তাহাকে গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া আত্মশক্তি ও স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি সাধারণ মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতেন এবং অসাধারণ মানুষকেও মানুষমাত্র বলিয়া বুঝিতেন বলিয়া জাতির হৃদয়ে এই আশা জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ছোট বড় সকল জাতির সকল মানুষের উচ্চতম সকল জাতির সকল মানুষের স্থানে উত্তীর্ণ সম্ভাবনা বিধাতা তাহাদের মধ্যে দিয়াছেন, এবং শ্রেষ্ঠতম কোনো মানুষকেই তিনি অপ্রাপ্ত ও সকল দুর্বলতামুক্ত করিয়া গড়েন নাই। তিনি তাঁহার নিজের উত্তির ও কার্যের দ্বারা ত দেখাইয়াছেনই, উপরন্তু বাঙালী জাতি যে রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, আর্থিক, আধ্যাত্মিক সকল দিকে উন্নতির পরিচয় দিয়াছে তাহার পরিচয় তিনি তাঁহার পত্রিকাগুলির ভিতর দিয়া দিয়াছেন।” [পৃঃ (৩)]

কোন শক্তির বলে, চরিত্রের কোন মাধুর্যে, জীবনে কোন আদর্শ ধারণ করে, রামানন্দ তাঁর দীর্ঘ জীবনে দেশের সেবা করে গেছেন, তা জানতে হলে এই উপাদেয় জীবনচরিতখানি আদ্যন্ত মনোযোগসহকারে পাঠ করা উচিত।

সাধারণতঃ জীবনচরিত হয় শুধু ঘটনার সমাবেশ। কিন্তু লেখার গুণে এই জীবনচরিতখানি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। নানা রসের সংমিশ্রণে বইখানি বিশেষ পঠনীয় হয়েছে—‘কর্মী’ এবং ‘মানুষ’ রামানন্দের অপূর্ব মিলন ঘটেছে বইখানির পাতায় পাতায়। গুরুগম্ভীর বিষয়ের বর্ণনার সঙ্গে মাঝে মাঝে বিস্কৃত হাস্যরসের অবতারণা করাতে বইটি বিশেষ মনোজ্ঞ হয়েছে। যেমন

“রামানন্দের বয়স এখন মাত্র দশ বৎসর তখন বোধহয় এই বাংলা স্কুলে কবিতা-রচনার একটা পরীক্ষা হয়।

কবিতার বিষয় “বাকুড়ার স্বাভাবিক সৌন্দর্য।” শাল-পলাশ-শোভিত প্রিয় জন্মভূমির এই সব বন-পথ ও গিরিপৃষ্ঠের বিষয়ে কবিতা লিখিয়া তিনি প্রথম হইলেন এবং দশ টাকা পুরস্কার পাইলেন।.....শিশু বয়সের এই কবি-কীর্তির কথা তিনি কতকটা ঠাট্টার ছলে কতকটা শৈশবস্মৃতির আনন্দে রবীন্দ্রনাথের কাছে গল্প করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গল্প শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “মশায়, আপনি দশ বছরেই পুরস্কার পেয়ে গেলেন বলেই ত আপনার আর জীবনে কবিতা লেখা হল না। আমি ৫০ বছরের আগে কোনোই পুরস্কার পাইনি বলে আজীবন কবিতাই লিখে গেলাম।” (পৃঃ ৬-৭)

তরুণ বয়স থেকেই রামানন্দের মনে আদর্শবাদ উজ্জ্বল হয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। দেশের জন্তে মঙ্গলত্বতে জীবন উৎসর্গ করার জন্যে তিনি অল্পবয়স থেকেই মনে মনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কলকাতায় পড়তে এসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ আদর্শবাদী সর্বভাগী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মগণের সংস্পর্শে রামানন্দের মনে আদর্শবাদের প্রতি আকর্ষণ আরো প্রবলতর হয়। লেখিকার ভাষায় :

“সংস্কারমুখী তরুণ উৎসাহী মন লইয়া রামানন্দ যে সময় কলিকাতায় পড়িতে আসেন তখন নানাদিক দিয়া কলিকাতায় অর্থাৎ বাংলাদেশে একটা নূতন যুগের সাড়া পড়িয়াছে। স্বাভাবিক বহুমুখী প্রতিভা আর মননশীলতা শুধু পরীক্ষার পড়ার ভিতর তাঁকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। দেশের নানা আন্দোলনে তিনি গভীর উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা লইয়া যোগ দিবার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। দেশের নানা আদর্শবাদ ও ব্রাহ্মসমাজের আরও নিকটে তিনি আসিলেন। রাজা রামমোহনের সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার এবং একেশ্বর-বাদের আদর্শ, পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিকতা, কেশবচন্দ্রের ‘স্বলভ সমাচারে’ জ্ঞানবিতরণ তাঁকে বাংলার নিভৃতকোণেই নানাদিকে সজাগ ও অগ্রসর করিয়াছিল। এখন ছাত্রসমাজের সাহায্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুপম চরিত্রের প্রভাবে তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য উজ্জলতর হইয়া উঠিতে লাগিল।”

উচ্চ আদর্শ জীবনে গ্রহণ করেছিলেন বলেই এই

আদর্শকে জীবনে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্তে তিনি জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

“বি-এ-তে সর্বোত্তম প্রথম হওয়াতে রামানন্দ State Scholarship (সরকারী বৃত্তি) পাইলেন এবং তাঁহার বিলাতে পড়িতে যাইবার কথা উঠিল। বাড়ীতে সকলেই এই ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন যে, এইবার সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিবে। কিন্তু অর্থ, খ্যাতি ও বিলাসের মোহ সেই স্বদেশভক্ত ও স্বাধীনচিত্ত যুবকের মনের ত্রিসীমানায় ছিল না। তিনি তখন আদর্শবাদিতায় তন্ময়। স্থির করিয়াছিলেন কখনও গভর্ণমেন্টের চাকরী করিবেন না, কাজেই গভর্ণমেন্টের বৃত্তিও প্রত্যাখ্যান করিলেন।” (পৃ: ২১)

“তাঁর মনে ভগবদ্ভক্তি জন সেবা ও উন্নত চরিত্রের যে উজ্জল আদর্শ অঙ্কিত ছিল তাঁর থেকে বিন্দুমাত্র চ্যুতিও তাঁর মনকে পীড়া দিত। এই জন্ত নিজেই তিনি নিয়ত নিজেই কঠোর শাসনে রাখিতেন, যেন সত্যাচরণ হইতে এক বিন্দু স্থলন না হয়, যেন কর্তব্য পালনে বিরক্তি না আসে, যেন প্রশংসা পাইবার লালসা মন হইতে সমূলে তুলিয়া ফেলিতে পারেন, যেন জিহ্বাকে সংযত রাখিতে পারেন, যেন জীবনটা পরের জন্তই উৎসর্গীকৃত হয়।” (পৃ: ২৬)

“যিনি সরকারী বৃত্তি লইয়া আই-সি-এস্ হইয়া আসিতে পারিতেন, দেশেও অন্তত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারিতেন, এমন কি সরকারী কাজ না করিলেও যে কোন ভাল কলেজে তাঁর কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের জন্য ভাল চাকরী পাইতে পারিতেন, তিনি যে এমন করিয়া আদর্শের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, আজকালকার সুখায়েষী যুবকেরা কি তা ভাবিতে পারেন?” (পৃ: ২৮) বিশেষত তিনি দরিদ্র ছিলেন, তাঁর কোনো পৈত্রিক জমিদারী বা বড় বকম সম্পত্তি ছিল না, বা কোনো ধনী আত্মীয় বন্ধু ছিলেন না যারা অভাবের সময়ে সাহায্য করবেন।

জীবনে আদর্শভ্রষ্ট হবেন না বলেই তিনি বে-সরকারী কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছিলেন। এই কাজের সঙ্গে বরাবর তিনি কোনো-না কোনো পত্রিকা

পরিচালনা করে এসেছেন—কারণ তিনি পত্রিকার ভিতর দিয়ে দেশের লোকের চিন্তের জড়তা মোচন করবার আশা আজীবন পোষণ করতেন।

এলাহাবাদে কায়স্থ-পাঠশালার অধ্যক্ষতাকালে ‘প্রবাসী’ প্রকাশিত হয়। তারই ৩৭ বছর পরে “মডার্ন রিভিউ” নামে তাঁর জগৎ-বিখ্যাত ইংরেজি কাগজ প্রকাশ করার ইচ্ছা জাগে। কারণ কেবল মাত্র বাংলা দেশের লোকের মনকে স্পর্শ করে তাঁর মন তৃপ্ত হচ্ছিল না। দেশের কথা অ-বাঙালীকে জানানো প্রয়োজন, বিশেষত বিদেশে এদেশের ঐতিক তথ্য সরবরাহ করাও বিশেষ কর্তব্য। এই সব কারণে তিনি ইংরেজি পত্রিকা ‘মডার্ন রিভিউ’ প্রকাশ করার সংকল্প করেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কায়স্থ-পাঠশালার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি কাজে ইস্তফা দিলেন। তখন “প্রবাসী” স্বাবলম্বী হলেও, তার থেকে কিছুই আয় ছিল না। এই অবস্থায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে তিনি খুবই অর্থকষ্টের মধ্যে পড়লেন। কিন্তু তিনি অল্প কোনো চাকরী গ্রহণ না করে “মডার্ন রিভিউ” প্রকাশে যত্নবান হন। এ সম্বন্ধে জীবনীতে আছে :—“চাকরী তিনি কেবল নিজের ভরসায় ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গুণগ্রাহী ও মঙ্গলাকাজী বন্ধুরা নানা কাজে তাঁহাকে পাইবার জন্ত এবং তাঁহার মঙ্গলের জন্তও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ৬নংপাল বাবু বলিয়াছেন, ‘রামানন্দ বাবু যখন এলাহাবাদের বর্ষ পরিত্যাগ করিলেন, তখন ৬চিন্তামণি ঘোষ তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান প্রেসের কার্যাদ্যক্ষরূপে পাইবার জন্ত একান্ত আগ্রহশীল ছিলেন। রামানন্দ বাবুর কর্ম কুশলতার উপর চিন্তামণি বাবুর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন ১০০০ মাসিক পারিশ্রমিক ভিন্ন এলাহাবাদে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ২৫ টাকা কমিশন প্রাপ্ত হইবেন। চিন্তামণি বাবু আমার দ্বারাই তাঁহার প্রস্তাব রামানন্দ বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন।……’ কিন্তু স্বাধীনচিত্ত তেজস্বী পুরুষ অর্থের লোভে স্বাধীনতা বলি দিতে রাজি হইলেন না। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার উপযুক্ত অর্থ তিনি ভগবান্নর আশীর্বাদে স্বীয় স্বাধীন চেষ্টায় সংগ্রহ

করিতে পারিবেন এবং মন প্রাণ সিয়া দেশের সেবা করিয়া ধন্ত হইবেন এই বিশ্বাস ও ইচ্ছা তাঁহার ছিল।” (পৃ: ১২৩)

দেশের লোক সকলেই জানে রামানন্দের এই বিশ্বাস ও ইচ্ছা কেমন স্বন্দর ভাবে সফলতা লাভ করেছিল। তিনি দেশের সেবা করে নিজে যদি ধন্ত হয়ে থাকেন, তবে দেশও তাঁকে পেয়ে ধন্ত হয়েছে—জননী কৃতার্থা এবং কুল পবিত্র হয়েছে।

এই জীবনীখনিতে ধারাবাহিকভাবে ঘটনার পর ঘটনা একটানা না লিখে এক একটি বিষয় নিয়ে এক একটি পরিচ্ছেদ লেখাতে অনেক দিক থেকে সুবিধা হয়েছে। যদিও তার জন্তে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি আছে, তবু মোটের উপর একটি বিশেষ বিষয়ের অনেক কথা একই জায়গায় বিশদভাবে পাওয়া যায়। “নারী হিতৈষী” পরিচ্ছেদ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে দিলে পাঠিকারা রামানন্দ চরিত্রের একটি বিশেষত্ব সম্যক বুঝতে পারবেন:

“রামানন্দ নারীকে কেবল নারী বলিয়া সম্মান করিতেন না, আত্মা বলিয়াই করিতেন। তিনি মনে করিতেন পুরুষ যেমন আত্মা, নারীও তেমনি আত্মা। নারীর মাতৃত্ব তাঁহার একটি প্রধান বৃত্তি, ধর্ম ও স্বরূপ, কিন্তু তাহাই তাঁহার একমাত্র বৃত্তি, ধর্ম ও স্বরূপ নহে।” তিনি চাহিতেন যে, “নারী নারী-প্রকৃতির সমুদয় সদগুণে ভূষিত হউন।” কিন্তু এই আশাও করিতেন যে, নারী মহৎ মাহুয হইবেন, শ্রেষ্ঠ মাহুয হইবেন, সেই সব গুণ ও শক্তির বিকাশ নারীতে করিতে হইবে যাহা নারী ও পুরুষ উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি, সেই সব কাজ নারী করিবেন যাহা লোকশ্রেয়সাধনার্থ ও জগতের স্বাণ পরিশোধনার্থ পুরুষ ও নারী উভয়েই করিতে পারেন এবং উভয়েরই কর্তব্য। সেই-সব আধ্যাত্মিক সাধনা ও শিক্ষা তাঁহার হইবে যাহা মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই হয় ও হইতে পারে। নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ভাবে বিচার তিনি করিতেন না; কিন্তু নারীরা বহুকাল তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত বলিয়া তাহাদের ছোট বড় কৃতিত্ব সাফল্য ও দাবী-দাওয়া

সকল বিষয়ের জন্তই তিনি যত দীর্ঘ দিন ধরিয়া যত চেষ্টা করিয়াছেন পুরুষের জন্য হয়ত তত করেন নাই। (পৃ: ২০০)

পরমুখাপেক্ষিতায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মনুষ্যত্ব খর্ব হয় ইহা রামানন্দ মনে করিতেন। তাই তিনি বলিতেন:

‘স্বাবলম্বন নারীদের পক্ষেও মঙ্গলজনক। শৈশব হইতে বার্লুকো মৃত্যু পর্যন্ত নারীর পরমুখাপেক্ষী থাকা ভাল নয়। কোন প্রকৃতিস্থ পিতা, স্বামী, ভ্রাতা বা পুত্র মনে করেন না যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া কন্যা, পত্নী, ভগিনী বা মাতার ভরণ পোষণ করিতেছেন; ইহা সত্য। কিন্তু সকল পিতা, স্বামী, ভ্রাতা বা পুত্র প্রকৃতিস্থ বা আদর্শস্থানীয় নহে।...সুতরাং নারীর স্বাবলম্বিনী হইবার জন্ত তাঁহার উপার্জনের ক্ষেত্র বিস্তৃত-তর হওয়া ভাল। পরিবারের সহিত যুক্ত থাকিয়া উপার্জন করিতে পারা নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর।...ভরণ পোষণের জন্ত যাহাদের উপার্জনের প্রয়োজন নাই, তাহারাও অর্থকর কোন কাজ করিলে তাহাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সম্মান বাড়ে এবং তাহাদের সম্বন্ধে অন্তদেরও ধারণা উচ্চতর হয়?’ (পৃ: ২০১-২)

“জগতে নারী ও পুরুষের সৃষ্টিতে বিধাতা কম বেশী করেন না এ কথা রামানন্দ কখনও ভুলিতেন না। তিনি বলিতেন:

‘পুরুষ যেমন দেশের লোক, নারীও তেমনি দেশের লোক; এবং নারীরা সমুদয় অধিবাসীর অঙ্গিক।... (আমাদের) দেশের নারীদের মধ্যে শতকরা একজনকেও শিক্ষিতা বলা যায় কিনা সন্দেহ। গৃহস্থালীর বাহিরের খবর নারীদের কাছে পুস্তকও খবরের কাগজের সাহায্যে পৌছিতে পারে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর বলিয়া, এই উপায়ে দেশ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান জন্মে না।...যে জাতি স্বাধীন হইতে ও থাকিতে চায়, তাহাকে সামাজিক প্রথার পরিবর্তন করিয়া এবং শিক্ষার দ্বারা নারীর কার্যক্ষেত্র ও কর্মদক্ষতা বাড়াইয়া, নারী শক্তিরও সম্পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে।’ (পৃ: ২০৩)

“বিধবা নারীর দুঃখ ও দুর্গতি তাঁহার মনকে

যৌবনকাল হইতেই স্পর্শ করিয়াছিল। বিজ্ঞানসাগরের সহিত তাঁহার অল্প কতকগুলি দিকের মত এদিকেও সাদৃশ্য ছিল। এই জ্ঞান বিজ্ঞানসাগর-স্মৃতি-দিবসে প্রতি বৎসর তিনি বিজ্ঞানসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও মহানুভবতার পরিচায়ক এই বিধবা-বিবাহ-প্রচলন আইনকে সার্থক করিতে দেশকে অল্লরোধ করিতেন। একমাত্র তিনিই Statistics এর সাহায্যে প্রতি বৎসর নানা সময়ে আমাদের দেশের শিশু ও বালিকা বিধবাদের সংখ্যা জানাইয়া ও তাহাদের বৈধব্যের কলে নারী জাতি ও সমগ্র দেশের এবং হিন্দু জাতির ক্ষতি বিশেষ করিয়া জানাইয়া দেশকে এ বিষয়ে সচেতন করিতে চেষ্টা করিতেন। দেশের অনেক মাসিক ও দৈনিক পত্রই বিজ্ঞানসাগর মৃত্যুবার্ষিকী সম্বন্ধে উদাসীন, কিন্তু রামানন্দ কোন বৎসর এই দিনটিকে ভুলিতেন না।” (পৃঃ ২০৪)

এই জীবনচরিতখানি নানা চিত্রশোভিত হয়ে অতি পরিপাটি হয়েছে। সাধারণত বাংলা বইয়ে যেমন ছাপার ভুল থাকে, এ বইটিতেও তেমনি ছাপার ভুল আছে—তবে মারাত্মক কিছু চোখে পড়েনি।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করে পারছিলাম। সেটি হচ্ছে খৃষ্টাব্দ ও বাংলা সালের যথেষ্ট ব্যবহার। পর পর ঘটনা বিবৃত করতে একবার খৃষ্টাব্দ তার পরেই বাংলা সাল লিখলে পাঠকের পক্ষে হিসাবের একটু গোল ঠেকে।

বাংলা কোন সালে রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার উল্লেখ নেই—যদিও খৃষ্টাব্দ ও শকাব্দ আছে (পৃঃ ৩)। ২২ পৃষ্ঠায় ১৮৭২৮০ খৃষ্টাব্দকে বাংলা ১২৮৮ সাল ধরা হয়েছে। তাহলে ১২৯৬ সাল ইংরেজী ১৮৮৭, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু ১২৯৬ সালের ‘ধর্মবন্ধু’ থেকে উদ্ধৃত চিঠিপত্রে আছে : “দেখ সেদিন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে দেখিয়া একটা কথা মনে পড়িল।” ইত্যাদি। তারপরেই লেখিকা লিখেছেন : “১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের বাড়িতে রামানন্দ প্রথম রাজনারায়ণ বসুকে দেখেন” ইত্যাদি।

হিসাবে কোথাও একটা গোল আছে মনে হয়।

বাংলা সাল ও খৃষ্টাব্দ নিয়ে গোল পাকান কেবলমাত্র

এই জীবনীতে দেখছি, তা নয়, আরো একখানি বিখ্যাত জীবনীতে এই গোলযোগ বারম্বার দেখেছি।

রামানন্দ কোন সালে এম, এ, পাশ করলেন সে খবরটুকু এই বৃহৎ বই থেকে আবিষ্কার করতে পারা গেল না। তেমনি কোন খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর রামানন্দ ইহলোক ত্যাগ করেন সেটিও অনেক গবেষণার পর নির্ধারণ করতে পারা গেল।

আর একটি কথা—বইটির কোথাও রামানন্দের পুত্র কন্যাদের জন্মতারিখ দেওয়া হয় নি। রামানন্দ-চরিত্র বৃত্তান্তে এ সব তারিখের প্রয়োজন নেই মনে করে লেখিকা এসব বাদ দিয়াছেন, কিন্তু পাঠকের মনে কৌতুহল থেকে যায়।

আর একটি জিনিষের অভাব এই বইটিতে বরাবর অল্পভব করেছে—একটি সুবিস্তৃত নির্ঘণ্ট এই বইটিতে পিছনে থাকলে পাঠকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হত।

এ সকল এমন কিছু মারাত্মক ত্রুটি নয়। শ্রীশান্তা দেবী দু তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে অমূল্য জীবনী বাংলাদেশের অধিবাসীকে উপহার দিলেন, দেশের লোক যেন তার যথার্থ মর্যাদা বুঝতে পারে এই কামনা। দেশরাসীর পক্ষ থেকে শান্তা দেবী কৃতজ্ঞতা পাবার উপযুক্ত।

পরিশেষে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করব।

আগে বারে বারে মনে হয়েছে এবং জীবনীখানি পড়তে পড়তে মনে প্রশ্ন জেগেছে : রামানন্দ কেন কংগ্রেসের সভাপতি হন নি! তাঁর মত ভারতমুক্তিকামী, পুতচরিত্র, দেশভক্ত ভারতবর্ষে বিরল। তাঁকে তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনো সময়ে কেন কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করার জ্ঞান আহ্বান করা হয় নি? তিনি কোনো বিশেষ এক দলের লোক ছিলেন না বলে কি তিনি এই সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন? কিন্তু তাঁর মত কংগ্রেসের অল্পগত স্বদেশসেবক আর কয়জন ছিলেন বা আছেন কিনা জানি না। এই সূত্রে একটা অনেক দিনের পুরানো শোনা কথা মনে পড়ে গেল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন কলিকাতায় হয়—তখন আমরা কলেজের ছাত্র।

সেই অধিবেশনের সময় একটা কথা ছাত্রমহলে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছিল—সত্যমিথ্যা জানিনে। কথাটা হচ্ছে, রামানন্দকে কংগ্রেস মণ্ডপে সমাসীন দেখে কোন এক অবাঙালী সদস্য লাল লাজপৎ রায়কে জিজ্ঞাসা করেন, “ঐ লোকটি কে?” লালাজী নাকি তৎক্ষণাৎ বলেন, “তুমি ঠেকে চেন না? যিনি এই দেশে একমাত্র নিজের চিন্তা নিয়েই করে থাকেন। (He is the only man who thinks independently for himself.)—উনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক।”

হয়ত এই জন্তই রামানন্দকে কংগ্রেসের সভাপতি করার কথা কখনও ওঠেনি—তিনি অতিশয় স্বাধীনচেতা নিজের চিন্তা নিয়েই করতেন—অন্য কোন দেশনেতার মুখপাত্র ছিলেন না।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্পর্কে। এই জীবনচরিতখানির তিনটি সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদে লেখিকা অতি সুন্দর ও বিশদভাবে রবীন্দ্র-রামানন্দ-প্রসঙ্গ বিবৃত

করেছেন। তার থেকে বেশ বোঝা যায় রামানন্দের মত অকৃত্রিম স্বহৃৎ রবীন্দ্রনাথের এবং বিশ্বভারতীর আর কেউ ছিলেন না। “তিনি মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও বলিয়াছেন, আমার motto Rabindranath for ever.” (পৃঃ ২৪৬)

রবীন্দ্রনাথ যখন ধরাদ্যম ত্যাগ করে চলে গেলেন, তখন স্বদূর প্রবাসে বসে আমরা নিঃসংশয় ছিলাম যে, রামানন্দ “বিশ্বভারতীর” আচার্য্যপদে বৃত্ত হবেন। কিন্তু তা না হওয়াতে আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল বিশ্বভারতী কিঞ্চিৎ ঋণ শোধের স্ববর্ণ-স্বযোগ নষ্ট করলেন।

যাক, রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ দুই বন্ধুই এই মর্ত্যলোক ত্যাগ করে চলে গেছেন। আজ তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে পাঠকপাঠিকাকে অনুরোধ করি তাঁরা যেন এই অপূর্ণ জীবনকাহিনীখানি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে যত্নপূর্বক পাঠ করেন। তাঁরা জীবনে প্রভূত উপকার পাবেন তা রলাই বাঙ্ল্যা।*

* ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা—শ্রীশান্তা দেবী প্রণীত।

অসমাপ্ত

শ্রীআরতি মুখোপাধ্যায়

(২)

দিন কয়েক পরের কথা। অমিতা সন্ধ্যার দিকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন শান্তিদের গলিটা আবিষ্কার করল, তখন রাস্তায় গ্যাস জলে উঠেছে।

সে দেখল ল্যাম্প পোস্টের নীচে, ঠিক গলির মুখে একটা রিক্সা নামানো রয়েছে, একটা লোক তাতে বসে আছে, রিক্সাওয়ালার মাটিতে উবু হয়ে বসে খৈনী টিপছে। অমিতা গলির ভিতরে খানিকটা বেয়ে শান্তির বাড়ীতে উপস্থিত

হ'ল। ভিতরে অসহ্য ভাপসা গন্ধ, একপাশে নর্দমা বেয়ে যাচ্ছে, সরু প্রবেশ পথ, বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে ডান হাতেই শান্তির ঘর পড়ে। ভিতরের বারান্দাটাতে দরজা।

এই বাড়ীটার মধ্যে আরও অনেক গৃহস্থ পরিবার রয়েছেন। মাঝে একটা স্বল্প পরিসর উঠোন, তার এক পাশে স্যাওলা ধরা একটা চৌবাচ্চা আর কল। ভিতরে এসেই তার মনে হোল এখনি বোধহয় দম বন্ধ হয়ে যাবে। উঠোনটাতে প্রায় গোটা সাতেক সস্তা ধরানো তোলা

উলুনে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। একসঙ্গে ছেলে বড়ো মেয়ের কলরবে বাড়ীটি মুখর। অমিতা নীরবে শান্তির দরজা গোড়ায় দাঁড়াল। শান্তিকে দেখল দরজার দিকে পিঠ করে বসে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে একটা চীনের স্ট্রাকেশ গোছাচ্ছে। ঘরের মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা, এখানে ওখানে দড়ি টাঙ্গানো; তাতে কয়েকখানা অপরিচ্ছন্ন জীর্ণ ছোট খাট ফ্রক আর শাড়ী ঝুলছে, একপাশে একটা বিছানা গুটোন রয়েছে, তার উপর একটা বছর দশের আর একটা বছর চার পাঁচের ছেলে স্নান মুখে বসে আছে। জানালার ধারে বসে একটা মেয়ে ক্ষীণস্বরে কেঁদে চলেছে। একটা স্যাঁতশ্বেতে দেওয়াল তাকে খান কয়েক এ্যালুমিনিয়ামের বাসন ও চটাওঠা কলাইকরা থালা, নীচের তাকে সরাসরি মাটির হাঁড়ি। এককোণে একটা কেরোসিন কাঠের সেল্ফ তাতে কিছু বই, পূরণ মাসিক পত্রিকা, কালি কলম, মরচে পড়া ব্লেন্ড রয়েছে।

লণ্ঠনটার বোধহয় বহুকাল পলতে কাটাও হয়নি আর চিমণীতে ফাট ধরার দরুণ পরিষ্কার করাও সম্ভব হয়নি; আলোর দীপ্তি তাই এ গৃহের বাসিন্দাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাকরে চলেছে। অমিতা যে দাঁড়িয়ে আছে, এরা কেউ তা লক্ষ্য করে নি। এ বাড়ীতে কারণে অকারণে একে অস্ত্রের দরজায় দাঁড়ায় এসে, তাই এদেরও অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

শান্তি বাক্সে চাবী দিতে দিতে বলল, “বাবা অমু, আমার তো আর দেবী করা চলেনা, ভদ্রলোকটা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রয়েছেন, তোমাদের যাকে যেমন বলে গেলাম, তাই কোর, বুঝলে বাবা?” নীলার ফোঁপানী বেড়ে গেল। সে নাকী স্তরে একটানা বলতে শুরু করল, “আমি তোমার সঙ্গে যাব—” শান্তি এক ঝটকায় উঠে তার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে দাঁত মুখ খিচিয়ে বলে উঠল, “আমি যাব আমি যাব, তুমি যাবে কোথায় শুনি? আমি কি হাওয়া খেতে যাচ্ছি? চুপ করে শোন বলছি, তপুকে দেখবে ঠিক করে, বুঝলে?”

শান্তির চোখে মুখে কেমন যেন একটা শূণ্য দৃষ্টি, সে যেন বুঝতে পারছেননা, সে কি করছে বা বলছে। অমিতা ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, “তারপর কোথায় যাওয়া হচ্ছে?” শান্তি চমকে মুখ ফিরিয়ে অমিতাকে দেখে কেমন যেন

অনাবশ্যক রুচুতা প্রকাশ করে বলল, “আমাকে যেতে হচ্ছে অফিসের কাজে, আজ দুপুর বেলা অফিসে যেতে ওরা জানাল, আজ রাত্রে ট্রেনেই খুলনা যেতে হবে। দু-এক দিনের কাজ, আবার চলে আসব।”

অমিতা বলল, “নূতন লোক তারা, তাদের তুমি ভাল করে চেননা, তাদের সঙ্গে তুমি হট করে বাইরে চলে যাবে?” শান্তির মুখের ভাব শক্ত হয়ে উঠল, সে বলল, “আমাকে তারা বলে দিয়েছে না যেতে পারলে আমার কাজ থাকবেনা। খুলনাতে ওদের কোম্পানীর অনেক শেয়ার বিক্রী হবে, তাই না গেলে খুব লোকসান হবে।” অমিতা আবার জিজ্ঞাসা করল, “ছেলে মেয়েদের দেখবে কে?” শান্তি নিলিপ্ত কণ্ঠে বলল, “ওরা নিজেরা নিজেদের দেখবে। আমায় যদি ওদের দেখার জন্ত থাকতে হয় তাহলে কাল বিষ খাইয়ে মারতে হবে।” শান্তির সময় সংক্ষিপ্ত, তাই অস্বাভাবিক্য অপ্রয়োজন ভেবে সে একপাশ থেকে ছেঁড়া চটিটা দরজার বাইরে ফেলে, তপুকে বুকে চেপে অস্ত্র সংরক্ষণ করতে করতে বলল, “বাবা শান্ত হয়ে থেক, দাদা দিদির কথা শুনো, বাইরে বাইরে ঘুরো না, এই নাও তোমাকে আমি পয়সা দিয়ে যাচ্ছি।”

অমিতা আর কোন কথা না বলে সোজা গলির মোড়ে চলে এল। রিক্সাওয়ালাকে বলল, “তোমার বাবুকে নামতে বলোত।” অমিতার গলা শুনে যে লোকটা হুড় হুড় করে নেমে দাঁড়াল, সে আর কেউ নয়, স্বয়ং ‘অভিনব জীবন বীমার’ বিপিন বাবু।

অমিতা তীক্ষ্ণস্বরে বলল, “শান্তি দেবীকে আপনি কোথায় নিয়ে যেতে চান?” তার প্রশ্নের ধরণে বিপিন খতমত থেয়ে বলল—“এ্যাই আজ্ঞে দেখুন, কোম্পানীর একটা কাজে ভাগলপুর যেতে হবে।” অমিতা এক ধমক দিয়ে বলল, “বলেছিলেন না খুলনা?” বিপিন মাথা চুলকে বলল, “দেখুন, কোম্পানীর কাজে কত অদল বদল হয়, তা নইলে আমারই বা ছোট্ট কেন?” অমিতা আবার ধমকে উঠল, “চালাকী পেয়েছ, না? বদমায়েস কোথাকার, এমনি ভাবে অসহায় মেয়েদের জুলিয়ে নিয়ে যেয়ে ব্যবসা করেচ, ভাল চাওতো এক মিনিটের মধ্যে এখান থেকে চলে যাও, নাহলে—” বিপিন সরোষে বলল, “হ্যাঁ বলুন, থামলেন কেন,

নাহলে কি? আপনি যদি মেয়ে মাছ না হতেন তাহলে বুঝতেন।”

অমিতা ধীর অকম্পিত কণ্ঠে বলে, “এক মুহূর্তের মধ্যে এখান হতে দূর হয়ে যাও, নাহলে ঘাড় খাঁকা দিয়ে বার করে দেব, পাড়ার লোক জড়ো করে; তোমার কী ব্যবসা সে আমরা খোঁজ করেছি আর পুলিশকেও জানিয়েছি।”

বিপিনের হাব ভাব নিমেষে অন্তরকম হয়ে গেল। গলায় কথা আটকে যেতে লাগল, বল, “আমার টাকা? যে টাকা ওকে দিয়েছি তার কি হবে?” অমিতা বল, “কত টাকা দিয়েছ?” বিপিন বলে, “তা প্রায় পঞ্চাশ টাকার কাছে।” হাত ব্যাগ খুলে অমিতা পাঁচখানা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বল, “ছুড়িয়ে নিয়ে দূর হয়ে যাও।”

লোকটা আর বিরক্তি করলনা, রিস্কায় উঠে বসে টানতে হুকুম করলে।

অমিতা বখন ফিরে যাচ্ছে, মাঝামাঝি পথে দেখল শান্তি হাতে স্ট্রটকেশটা খুলিয়ে আসছে, পিছনে ছেলে মেয়েরা।

অমিতা বল, “চলো ঘরের ভিতর, সে লোকটা চলে গেছে।” শান্তি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, “চলে গেছে?” অমিতা নীলাকে কাছে টেনে বলে, “তোমার আর কীদতে হবে না, তোমার মা যাচ্ছেন না।”

শান্তি তার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বল, “তুমি কী বলছে ওদের?” অমিতা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বল, “চলে যেতে বলেছি।”

ঘরের মধ্যে এসে শান্তি স্ট্রটকেশটা একটানে ফেলে দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে বল, “তুমি কেন এমন করছ অমিতা, সেদিন থেকে? তুমি জাননা আমি কত কষ্টে এ কাজটা পেয়েছিলাম। আজ এক বছর হতে চল কেবল পথে পথে ঘুরেছি, কোথাও কিছু হয়নি; এ তুমি কী করলে অমিতা?” সে আর বলতে পারল না, ক্রন্দন আবেগে তার স্বর রুদ্ধ হয়ে যেতে লাগল। অমিতা শান্তির পাশে বসে তার শিঠে হাত দিয়ে বল, “আমি তোমার কাছে সবই শুনেছি, কিন্তু তুমি ওদের সঙ্গে গেলে বিপদে পড়তে, শান্তিদি। তাদের জন্ত তোমার সব কিছু, হয়ত তাদের কাছে আর ফিরতে পারতে না।”

শান্তি বেন আর্কনাদ করে উঠল, “টাকা পেতাম তো.

টাকা?” ছেলে মেয়ে শুল্লো না ধরে মরত না তো, আমার বা হবার তা হোত না হয়।” অমিতা বল, “শান্তিদি, আমি তোমার অপরিচিতা বা একেবারেই অনাখ্যায় নয়; তোমার কাছে সব কথা শুনে, নিজের চোখে তোমার অবস্থা দেখেও কি আমি না বোঝার ভাণ করে থাকতে পারি? আমি কি উপলব্ধি করতে পারছি না তুমি কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছ? শব্দর বাড়ী রটায় দিয়েছে যে তুমি কুলত্যাগ করেছ, স্বামী তার প্রাথমিক কর্তব্য পালনেও বিমূখ হয়েছ, একটা ছেলেকে কাকার কাছে রাখবার জন্ত করুণ মিনতি জানিয়েছিলে, তারাও জানিয়েছে তুমি তাদের কাছে মৃত। সবই আমি জানি। দিনের পর দিন ধরে, তুমি মনের জোরে সত্যকে শাশনে রেখে এগিয়ে চলেছ, আমাদের সে কথা নতুন করে আর বলতে হবে না।”

শান্তি অমিতার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে বল, “তোমাকে আমি এক মুহূর্তও অবিস্থানের চোখে দেখছি না অমিতা। তবে কি জানো, আমার চরম দারিদ্র্য আর উৎকট অভাব আমার আর কিছু ভাবতে দেয়না। কেবল গোটাকতক কথা আমার অসহ মনে হয়। তুমি ছেলেমাছ তুমি বুঝবে না ভাই, সংসারের দুঃখ নিপীড়ন। আমি এই কলকাতা সহরটাকে চষে ফেলেছি, কিন্তু কি পেয়েছি? খেখানে একটুও সম্ভাবনা আছে শুনেছি অমনি ছুটে গেছি। লোকের বাড়ী, অফিস, হাসপাতাল, মেয়েদের নানা রকম সভা সমিতিতে। কিন্তু পাইনি কিছুই। বড় লোকের দ্বারে দ্বারে সমাজ সেবিকা মহিলাদের কাছে ঘুরেছি ব্যর্থ মনোরথ হয়ে। পরে ভেবেছি আপনার মনে গুরা করবেই বা কি? আমি কি একলাই গোটা দেশটাতে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে রয়েছি?”

অমিতা দেখল ছেলে মেয়েগুলির চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে, সে বল, “শান্তিদি, এদের খেতে দেবে না?” শান্তি বল, “হ্যাঁ ভাই দিচ্ছি খেতে। অম, নীলু এস জল গড়িয়ে নাও।”

ওরা যেন এই কথাটির জগুই অপেক্ষা করেছিল। সাগ্রহে হেঁড়া চটের আসন পেতে। ছোটো গেলাসে জল

গড়িয়ে তারা মার মুখের দিকে চেয়ে রইল। শান্তি ওদের পাতে ওবেলার দুটী দুটী ভিজে ভাত আর একটু তরকারী ফেলে দিল। তারপর তপুকে খাওয়াতে বসল।

অমিতার দিকে চেয়ে হেসে বলল, “শোন অমিতা, তোমাকে একটা ছোট মজার গল্প বলি। মাস কয়েক আগে এখানের একটা সমিতির চেঠায় আমি একটা মেয়েকে পড়াবার কাজ পেলাম। আট টাকা মাইনে ঠিক হ'ল। কদিন পড়লামও, তারপর এক দিন মেয়ের মা এসে বলেন যে তাঁদের আর শিক্ষয়িত্রীর দরকার নেই। আমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আমার কোন ক্রটি বিচ্যুতি হয়নি তো?’ তিনি আমার হাতে একটা টাকা দিয়ে বলেন—

‘না সে সব কিছু নয়।’

এক সময় সমিতিতে খোঁজ করতে গেলাম কেন তারা আমাকে হঠাৎ ছাড়িয়ে দিলে। উত্তর শুনে হেসে বাঁচিনা, আর বাড়ী এসে ঘন ঘন আয়নাতে মুখ দেখতে লাগলাম।” অমিতাও হেসে জিজ্ঞাসা করলে, “কেন, তোমার গোপ বেরিয়েছিল নাকি?”

শান্তি উত্তর দিলে, “তা বেরুলেও তো বাঁচতাম, মেয়ের বাড়ীর লোক জানিয়ে দিল, আমার চোখে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক দৃষ্টি! তারপর শেষ এখনো নয়। আবার এক জায়গায় খোঁজ পেলাম, একজন দেশসেবিকা একটা অশ্রমমত খুলেছেন, সেখানে নিরাশ্রয়া মেয়েরা স্থান পায়। অমনি গেলাম সেখানে, ওমা কথা শোন তাদের, বলে কি না স্বামীর কাছ থেকে চিঠি আনতে হবে। অমিতা, আমি কি ভাই সাধে আর কে ভাল কে মন্দ দেখতে বাই না? যদিও বা দুটো একটার খোঁজ পেলুম অমনি চিন্তা এ গুলোকে রাখব কোথায়?”

তপুকে শেষ গ্রাসটা খাইয়ে শান্তি থালা ওঠাতে ওঠাতে বলল, “অমিতা, আমার মোহ কেটে গেছে ভাই, আগে দূর থেকে যাদের কথা শুনতাম মনে হ'ত তারা সার্থকজন্মা, তারা অসম্ভব-সম্ভব করতে পারে। এখন আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে ভাতে বুঝি এই যে সব নারী স্বাধীনতা, আর আন্দোলনের জন্ত সভা-সমিতি করা, সবই নিষ্ফল। তোমাকে বলেই বলছি, এত মেয়েদের সমিতিতে

ঘুরলাম ফিরলাম, কিন্তু একজনও কি ভরসা করে আমাকে নিতে পারল না? সবাই আমার কথা শুনে গিছিয়ে যায়, স্বামীর ঘর ছেড়ে এসেছে, নিশ্চয়ই কোন গলদ আছে। তাই মনে হয় এরা চিরকালের ছাঁচেই গড়া; নিজেদের নতুন করে পুরুষের চোখে গড়ে কেবল নতুন একটু উপরি বং দিয়ে। যদি দেখে সমাজে মিশ খাচ্ছে না এমন কোনও কাজ সামনে এসে গেল, তখনি ওরা নানা ব্যাখ্যায় আপনাদের ভোলায়; মনে হয় যেন সোনার খাঁচায় বসে পাখী স্বপ্ন দেখছে শিকলী কাটবে।”

অমিতা শান্তিকে বাধা দিল না। সে ভাবল, যে দুঃখ কাতরতা অহ'নিশি শান্তি বহন করে চলেছে, তার প্রকাশ হওয়াই ভাল। সেই মেয়েটার মা হয়ত সত্যি কথাই বলেছিলেন। ওর চোখে কী যেন একটা জ্বলে। একদিনেই শান্তিকে দেখে তার মনে হচ্ছিল, চাপা আগ্নেয় গিরির কণা। উপরে শান্ত ভাব, মাঝে মাঝে তপ্ত নিঃশ্বাস জানিয়ে দেয় ভিতরে তরল অগ্নিশ্রোত বইছে—একদিন হয়ত এমনি করে বহু মেয়ের স্বপ্নতা ভেঙ্গে যাবে, যারা নিজেদের আত্মাকে গুমরে গুমরে মারছে, জনন্ত লাভা-শ্রোত বহুদিনের অবিচারের বনীয়াদ ধ্বসিয়ে দেবে। অমিতাকে নাড়া দিয়ে শান্তি বলল, “অমিতা, বলো না ভাই একটা কথা, আমি কি সত্যিই চলে এসে এদের উপর অন্ডায় ফরেছি? এক একবার ভাবি, না চলে এলেই হ'ত, কিন্তু সেখানে স্বামীর ঘর করলে, ব্যথিত কুংসিত স্পর্শে ছেলে মেয়েদের কি মঙ্গল কামনা করা হ'ত?”

অমিতা কি উত্তর দেবে, কতটুকুই বা তার অভিজ্ঞতা? অল্পভাদির কথা মনে পড়ে, বলতেন, “ওসব ছেড়েদে, কার্পেটে ফুল তোলা, মেয়ে দেখার সময়ে ‘সঙ্কোচের বিহীনতায় নিজেই অপমান’—এ গান ছেড়ে, চেষ্ঠা করিস সমাজ নামে কুয়োর মধ্যে যে দৈত্যটা আছে, তাকে এক পেঘণে মেরে ফেলতে, রাফসীর প্রাণের ভোমরার মত! যতদিন ও বেঁচে থাকবে ততদিন তোদের ফুলতোলা আসনে বসে থাকবে। তোরা ভাববি, খুব স্বাধীনতা পেলি।” অমিতাকে নিরুত্তর দেখে শান্তি আবার বলে, “এই কাজটা পেয়ে, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম, কিন্তু তুমি সব উলটে দিলে।”

অমিতা এবার বল্ল, “শান্তিদি, আমি বিশেষ ভাবে খোঁজ নিয়েছিলাম, ওরা মেয়ে-ধরা দালাল, ওটাই ওদের ব্যবসা। তোমার নাড়ীনক্ষত্র জেনে, অসহায় অবস্থা দেখে তোমাকে নিয়েছিল।” শান্তি বল্ল, “কিন্তু ওরা যে আমাকে টাকা দিয়েছে।” অমিতা বল্ল, “আমি সে টাকা ফেরত দিয়েছি।” তারপর হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বল্ল, “আজ অনেক রাত হয়ে গেল, আমি কয়েক দিনের মধ্যেই আসব, আর এর মাঝে একটা নামকরা মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তাঁরা তোমাকে তাঁদের একটা গ্রাম-কেন্দ্রে পাঠাবেন; ছেলে মেয়েদের কাছে রাখতে পারবে, আর ৩৫ টি করে টাকা মাইনে দেবেন।”

শান্তি হুহাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ছেলে মানুষের মত বলতে লাগল, “অমিতা, সত্যি বল আমি কাজ পাব, আমি কাজ পাব?” অমিতার চোখে জল এসেছিল, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্ল, “হ্যাঁ শান্তিদি, তুমি কাজ পাবে। ওরা আমাকে জানাবেন কবে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।”

তারপর ব্যাগ থেকে, খুচরো একশটা টাকা, শান্তির হাতে দিয়ে বল্ল, “এটা রেখে দাও, তোমার দরকার হবে। আমি আবার আসব, তুমি কদিন বিশ্রাম করো, আর কোথাও বেরিওনা।”

শান্তি ওকে মোড় পর্যন্ত পৌছিয়ে এল। স্বল্পালোকিত গ্যাস পোষ্টের নীচে শান্তি দাঁড়িয়ে— অমিতা ধীরে ধীরে জনারণ্যে মিলিয়ে গেল। সে তখনও দাঁড়িয়ে, তপ্ত অশ্রু অব্যাহত ধারে গাল বেয়ে পড়তে লাগল।

(ক্রমশঃ)

গান্ধী স্মরণে

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী

আদিদেব সূর্যদেব থাকি গগন পরে
ঢেলে দেন আলোক ধারা ধরণীর পরে ॥

সে আলোকে দূরে সরে
আঁধার কালিমা
ফুটে উঠে দিকে দিকে
ধরার গরিমা ॥

পৃথিবী ঘুরিয়া চলে সূর্যদেবে ঘিরি।
এক মাত্র লক্ষ্য পথে বর্ষ বর্ষ ধরি ॥

হে মহাত্মা! তব আত্মা
দিয়াছে যে আলো
ভারত জেগেছে তাতে
কেটে গেছে কালো।
তাই সে তোমারে ঘিরি
চলিবারে চায়
তোমার নির্দেশ পথে
বারবার ধায় ॥

আজ তুমি নাই এই ধরণীর পরে
কে বল দেখাবে পথ অন্ধ পথিকেরে?

কে বল শুনাবে আর
অহিংসার বাণী,
“ভাই ভাই এক হও
ভেদাভেদ হানি?”

তবু জানি, মনে মানি, নাহি ভয় আর।
পড়িবে পড়িবে বারি আশীষ তোমার ॥

ভারতের পথ রেখা
তুমি গেছ একে
সে পথে চলিবে পাষ
পথ রেখা দেখে।

আমি শুধু স্মরি ঐ চরণ তোমার
অবনত হয়ে দিই প্রণতি আমার ॥

একটি সাক্ষ্য-বিনোদন পর্ব

শ্রীহিন্দ্রা দেবী চৌধুরাণী ।

কাল এক জায়গায় গানবাজনা শুনতে ও 'ভাঁড়ামী' দেখতে গিয়েছিলুম। দুটোই ভাল লাগল। আমি কি একটু বেশি সহজে সন্তুষ্ট হই? এটুকু নিশ্চিত যে, নিন্দার চেয়ে প্রশংসাটাই বেশি করি, এটা আমার এক নিন্দার কথা বলেই চলে আসছে। অথচ সমালোচনাও কম করিনে।

কাল একটা কথা মনে হচ্ছিল যে, এই 'সহরে' আবেষ্টন আমাদের গান বাজনা মন দিয়ে শোনার পক্ষে অস্বকূল নয়। ওদিকে মোটর শিঙে ফু'কছে, এদিকে বিজলী বাতি প্যাঁট প্যাঁট করে জ্বলছে। মঞ্চের চারিদিকে নীরস নেওয়াল, হাড়-বেয়করা কড়িকাঠ ও আধময়লা খন্দরপরা লোকের সমাবেশ, দর্শকবৃন্দের কথার ফিস্‌ফিস্ ও জুতোর খসখস, এর মধ্যে রাগের সূক্ষ্মতা বা ভাবের অভিব্যক্তি ধরা ছোঁওয়া যায় না। আধাআধিরও বেশি নষ্ট হয়। ধর্মভাব উল্লেখ করবার জগ্রে, পোষণ করবার জগ্রে যদি সব দেশেকালে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য নিবেদন করে দিয়ে থাকেন ত, তারই জাতভাই সৌন্দর্য্যবোধ উল্লেখ ও পোষণ করবার জগ্রে কি কোন চেষ্টারই আবশ্যক নেই? মানুষের মন এমন স্বভাব-অধ্যাত্মিক নয় যে বিনা সাহায্যে সে প্রত্যক্ষ ভুলে অপ্রত্যক্ষে মনোনিবেশ করতে পারে। অবশ্য ভৈরোতে ভজন গাইবার সময় একতারা নিয়ে যোগী সেজে বসলে হয়ত একটু বেশি নাটুকে হয়ে পড়ে। কিন্তু মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ইচ্ছে করলে উদ্ভাবন করা যায়। জাতিস্ উডরক সাহেব ভাল গানবাজনার মজলিসে

তাঁর ঘরের আলো নিবিয়ে দিভেন; সেটা পারিশার্খিক অনেক দোষ ঢাকবার এবং মনঃসংযোগ করবার একটা সহজ উপায় বটে। আর একটা হচ্ছে নির্জন স্থানের স্থান ও রসজ্ঞ শ্রোতা বেছে নেওয়া—কিন্তু টিকিট বিক্রি করতে হলে সে নির্বাচন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। লক্ষ্মী সরস্বতীর বিরোধই যত নষ্টের গোড়া।

বকুল ও জুই নামক দুটি ছোট মেয়ের গলা বাস্তবিক আশ্চর্য্য পরিষ্কার, জ্বোরেলা এবং সুরেলা। শেখালে তারা বয়সকালে জুই ওস্তাদিনী হয়ে উঠবে। কিন্তু বাদালী সমাজ তাদের সে বয়স পর্য্যন্ত চড়তে দেবে কি? কাজী নজরুলের গলা ভাল হলেও ভাবে ভাষায় ভেজ ও গানে সুর আছে। চিত্তরঞ্জনর ভাঁড়ামী খুব সুন্দর হলেও যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচায়ক। কতরকম অপ্রত্যাশিত মুখভঙ্গী ও ঘটনাচক্র উদ্ভাবন করেন, তার ঠিক নেই। সব মালমসলাই ত জীবনের চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে, কেবল বেছে নিয়ে যে যথাযথ যোগযোগ করতে পারে, রাই কুড়িয়ে বেল করতে পারে, ফুল তুলে মালা গাঁথতে পারে, সেইত প্রকৃত শিল্পী।

নলিনী সরকারের হাসির গানও প্রশংসারযোগ্য। বাড়াবাড়ি না করে, অল্পস্বল্প মুখের ভাব ও গলার সুর বিভ্রালে দিঙ্কু বাবুর হাসির গান বেশ ফুটিয়ে তুলেছিলেন; গলাও ভাল। কি অমূল্য দান, এই হাসির দান। ছেলে-বুড়ো, মেয়েপুরুষ, সকলকেই একভাবে অল্পপ্রাণিত করতে এমন জিনিষ আর নেই।

[পুরাতন দৈনিক লিপি হইতে। এপ্রিল ১৩৩২]

বুদ্ধ পূর্ণিমা

শ্রীমুজাতা রায়

বৈশাখের পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং ঐ একই দিনে তাঁর পরিনির্বাণ ঘটে, সেই জন্ম বৌদ্ধ জগতে বৈশাখী পূর্ণিমা মহোৎসবের দিন বলিয়া গণ্য হয়। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতার মহাবোধি সঙ্ঘে বুদ্ধ মহিলা সমিতির সভাতে শ্রীমুক্তা হেমলতা দেবী একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে সাধারণের মধ্যে একটি ধারণা আছে যে, বুদ্ধদেব নিজের জীবন থেকে নারীকে বিসর্জন করেছিলেন। এই ধারণা একেবারেই ভুল। তিনি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে অনেকগুলি বই পড়েছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব যে নারীকে অবহেলা করেছেন, তেমন প্রমাণ তিনি কোথাও পাননি। বরং যশোধরার সহিত বুদ্ধদেবের সাক্ষাতের বিবরণে দেখা যায় যে ভগবান বুদ্ধ যশোধরার একনিষ্ঠ প্রেমকে নিজের সাধনার ক্ষেত্রে সহায়ক বলে স্বীকার করেছেন। বিবরণটি এই :—

দিক্জিলাভের পরে বুদ্ধদেব যখন পিতার রাজ্যে ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে প্রায় বার শত ভিক্ষু। পিতা তাঁকে সামরে অভ্যর্থনা করলেন আর বললেন, “বৎস, তোমার ভিক্ষায় কি প্রয়োজন? তুমি বিপুল ঐশ্ব্যের মালিক, ভিক্ষা করা কি তোমাকে সাজে?”

বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, “পিতা, এ ঐশ্ব্যের মালিক আপনি; আমার জন্ম বুদ্ধবংশে, ভিক্ষাই আমার উপজীবিকা, আমার এই সহচরদের সঙ্গে আমার কোনও প্রভেদ নাই। জনসাধারণ সহায়ভূতি করে আমাকে যা দান করবে তার থেকে বেশী আমি গ্রহণ করতে পারি না। আপনি সভা আহ্বান করুন, রাজ্যের সমস্ত লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হোক।”

সভা আহত হ'ল। সভাস্থলে লোক আর ধরে না, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, নারী পুরুষ সকলেই সমাগত হয়েছে। বুদ্ধদেব সেখানে উপস্থিত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন।

দেখলেন যে সকলেই সেখানে এসেছে কিন্তু একজন আসেননি, তিনি হচ্ছেন যশোধরা।

বুদ্ধদেব তখন রাজা শুক্লোদনকে জিজ্ঞাসা করলেন, “পিতা, সকলেই এখানে উপস্থিত, কিন্তু রাজকুমারী যশোধরা কেন আসেননি?”

মহারাজ শুক্লোদন উত্তর করলেন, “পুত্র রাজকুমারী যশোধরা বলেছেন যে, তিনি এখানে আসবেন না, তিনি আরও বলেছেন যে সিদ্ধার্থে তাঁর প্রেম যদি সত্য হয় তা'হলে সিদ্ধার্থ নিজেই তাঁর কাছে আসবেন।”

“তুমি যতদিন সাধনায় রত ছিলে তিনি সমানে তোমার পথ অনুসরণ করেছেন, গৃহে বসে তোমার কৃচ্ছ সাধনের সংবাদে তিনিও কৃচ্ছ সাধন করেছেন, তুমি মৃৎপাত্রে ভোজন কর শুনে তিনিও মৃৎপাত্রে ভোজন করেছেন। তুমি অনাহারে থাক শুনে তিনিও আহার ত্যাগ অভ্যাস করেছেন। কিন্তু আজকের এই সভাতে যোগদান করতে তিনি একেবারেই রাজী হলেন না।”

মহারাজ শুক্লোদনের কথা শুনে বুদ্ধদেব তখনই উঠে দাঁড়ালেন। সারিপুত্র এবং মোগ্গলান শিষ্যদ্বয়কে নিয়ে তিনি যশোধরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চললেন। পথে তিনি শিষ্যদ্বয়কে বললেন, “তথাগত কামনামুক্ত। আমি বিগতরাগ হয়েছি কিন্তু রাজকুমারী হন নাই। আমাকে চোখে দেখলে তাঁর শোক উদ্বেলিত হয়ে উঠবে এবং আমার দেহকে স্পর্শ না করে তিনি থাকতে পারবেন না। তখন তোমরা তাঁকে বাধা দিও না।”

যশোধরার কাছে তাঁরা উপস্থিত হলেন। রাজকুমারীর ঐশ্ব্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কঁাদতে কঁাদতে বুদ্ধদেবের পদযুগল জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর শোক আর শাস্ত হতে চায় না। তখন বুদ্ধদেব তাঁকে বললেন, “যশোধরা, তুমি স্থির হও। তুমি নিজেই তো জন্মে জন্মে তপস্বী করেছ যাতে বুদ্ধকে তোমার স্বামীরূপে লাভ করতে পার। তোমার সেই প্রার্থনা আজ পূর্ণ হয়েছে, আজ তুমি

উভলা হচ্ছে কেন? আমার সাধনার ঘোর অন্ধকার দিনে যখন মার আমাকে কামি, ক্রোধ, মদ, মাৎস্য দিয়ে কঠিনতম পরীক্ষা করেছে তখন তোমার প্রেমই বর্ষরূপে আমাকে কামের হাত থেকে রক্ষা করেছে। আমার জীবনে তোমার প্রেম শ্রেষ্ঠ দান। আমার সিদ্ধিলাভে তুমিই সব থেকে বড় সহায়। আজ তুমি চঞ্চল হবে কেন? সাত বৎসর আমার অদর্শনে তুমি যে অসহ্য ক্লেশ পেয়েছ, তোমার সেই বেদনাঙ্কত হৃদয় এখন অমৃতে পরিণত হবে।”

আধ্যাত্মিক জীবনে নারীর দানের মহত্ব বুদ্ধদেব স্বীকার করেছেন। আবার মরজগতের মধ্যেও যে নারীর দানের

অধিকার রয়েছে, সে কথাও তিনি স্বীকার করেছেন সুদীর্ঘ অনশনের পরে সরল প্রকৃতি পল্লীহিতা স্বজাতার হাত থেকে পরমাম গ্রহণ করে।

বুদ্ধদেব নারীকে অস্বীকার করেননি, তাঁর সহস্র শিষ্য তাঁদের জনহিতকর ব্রতের ভেতর দিয়ে সে পরিচয় জগৎকে দিয়ে গেছেন।

পৃথিবীর বর্তমান হৃদ্বিনের সময়ে ঘেঘ, হিংসা বিদূরিত করবার প্রচেষ্টা করা সম্ভ্রদায়নির্বিশেষে প্রাত্যেক নারীর কর্তব্য। সাধনার ভিতর দিয়ে বিশ্বমৈত্রীর সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বুদ্ধদেব, সেই সাধনাই আজ নারীদের গ্রহণ করতে হবে।

নালন্দা ও রাজগৃহ

ত্রিশান্তিত্রী নাগ, বি-এ।

একবার এক গণ্ডিত জ্যোতিষী আমার হাতের রেখার পাঠোদ্ধার করবার জন্ত হাতটি তুলে ধরেই বলেছিলেন, “এর হাতে এ যে অসংখ্য ভ্রমণ।” কথাটি শুনে আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল। চিরকালই আমার সব চেয়ে বড় সখ দেশ-ভ্রমণ। আমার মত এইরকম পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় যারা মাহুস, আমার বয়সে তাঁদের তুলনায় হয়ত ভ্রমণ করার সুযোগ সুবিধা আমি এতদিন অবধি বেশী পেয়েওছি। আশাকরি শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষী মহাশয়ের কথা দিন দিন আরও সফল হবে।

আজ আমার ছোটখাটো ভ্রমণের মধ্যে একটির কথা বলব। গত পূজার ছুটিতে আমরা কয়েকজন মিলে বিহার অঞ্চলে স্বাস্থ্য উন্নতির চেষ্টায় গিয়ে পৌঁছলাম। এটাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য, মনে মনে সুপ্ত ইচ্ছা ছিল কাছাকাছি কয়েকটি ঐতিহাসিক পীঠস্থান দর্শন। কার্যতঃ প্রথমটির

চেয়ে দ্বিতীয়টিই সফল হয়েছিল বেশী। নতুন পাটনা সহরকে কেন্দ্র করে আমাদের এই ভ্রমণগুলি আশেপাশের নানা ঐতিহাসিক তীর্থে ছড়িয়ে পড়েছিল। পূজার ছুটি হলেও তখনও বিহারে শীত পড়ার সময় নয়। ভোরের দিকে পাংলা কুরাশার জাল সারা সহরটাকে ঘিরে থাকত—মাঝে মাঝে একটু শিরশিরে হাওয়া যা বইত, সেটা ঠিক শীতের বাতাস নয়। এমনি একদিন, ভোর চারটায় উঠে সবাই তাড়াহুড়ো করে তৈরী হয়ে চা খেয়ে সামান্য কিছু জিনিষপত্র নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। বাইরে অল্প ঠাণ্ডা মনে হ’ল—কিন্তু যেই পুরনো সহরে গিয়ে পড়লাম তখন বেশ গরমই মনে হতে লাগল। পঁয়তাল্লিশ মিনিট আন্দাজ লাগল শুধু পাটনার সহর (নতুন ও পুরাতন) পার হ’তে। অতি নোংরা ও দক্ষ রাস্তা, দু’পাশে ঘোঁসাঘোঁসা করে অজস্র দোকান। জরী, শাড়ী, চুলের জরীর ফিতা, পান, মসলা ও নানুখাটাইয়ের দোকান। মাঝে মাঝে একফালি করে

জমির পরে কালো কাঠের রেলিং শোভিত, ঝোলানো বারান্দা বের করা, কালো কালো বাড়ী—অর্ধেক কুয়াসা ও অর্ধেক অন্ধকারে মিশিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষ মানুষরা কেউ কেউ মুখ ধুচ্ছে, কেউ আপামমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে তখনও নিজামগ, কেউ কবল ও চাঁদর মুড়ি দিয়ে স্তম্ভ ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। মেয়েরা কেউ জল তুলছে, কেউ বাসন মাজছে, কেউ ছেলে কোলে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে। এই সব ছাড়িয়ে গিয়ে পড়লাম বেহারী বস্তির মধ্যে। মাঝে মাঝে শুধু মাঠ, খোলা মাঠে দূরে দূরে একটা বা এক সারি ভালগাছ। রাস্তার দু'পাশে বহু প্রাচীন বটের সারি—পাতার আড়ালে ডালে ডালে কত রকম পাখীর বাসা। আমাদের রাস্তার উপর বটের পাতার ভিতর দিয়ে সকালের আলো কত জালিকাজ একে রেখেছিল—পাতার ভিতর থেকে পাখীর গান শুনতে শুনতে—সেই উদিত সূর্য্যের রঙের খেলা দেখলাম। এর পর অড়হর ও বাজরার ক্ষেত, আমের বন ও তালের বন।

ক্রমশঃ ফসল ও গাছের পাতায় পাতায় ভোরের আলো বিকস্মিক করে উঠল। আরও এগিয়ে কচি সবুজ ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আমরা চললাম। আকাশ ও ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ব্যয়ে চলেছে গঙ্গানদী। গেরুয়া আকাশ; খেত-শুভ্র নদীর জলধারা ও সবুজ ধানের ক্ষেত, কেবলই মনে হচ্ছিল ঠিক যেন আমাদের জিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। গঙ্গার বুকে চড়া পড়েছে অনেক জায়গায়। শান্ত নদীর জলরাশির উপর দুই স্তর শুভ্র পাল তুলে ভোরের আলোর মস্ত বড় বড় নৌকা ধীর মন্থর গতিতে তুলে তুলে চলেছে। পথের পাশ দিয়ে কখনও লাঙল কাঁধে চাষী চলেছে—পিছনে পিছনে গরু, মহিষ ও তাদের বাছুর।

এমনি করে অনেক দূর চললাম, গিয়ে পড়লাম বেহার শরীফে। মুসলমান বাসিন্দা যা—কিছু বেহারে আছে, অনেকেই এখানে থাকে—সবাই সেদিন দল বেঁধে চলেছে জৈদের নমাজ পড়তে। বেহার শরীফ যখন ছাড়লাম তখন রোদ গাছের মাথায়। আমাদের রাস্তা মাটিন রেলওয়ের খেলনার মত রেলপথের পাশ দিয়ে অনেকগুলি পুল পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত ভাঙা রাস্তায় এসে পড়ল। গাড়ী অল্প

অল্প বাঁকানি দিতে লাগল। এক সময় পথের পাশে কাঠের ফলকে নালন্দার পথের, পথ-প্রদর্শক মানচিত্র দেখে একেবারে একটা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়লাম। এর পর সেকি ঝাঁকুনি—গাড়ীটা রীতিমত নাচতে আরম্ভ করল। কেউ ভিতরে সোজা বসে থাকতে পারছিলাম না। একবার লাফিয়ে উঠে ছাদে মাথা ঠুকছে, একবার নৌকার মত দোলা লাগছে, পরক্ষণেই পরম্পরের গায়ে গড়িয়ে পড়ছি। এই অবস্থায় নালন্দা মিউজিয়ামে এসে পৌছন গেল। ছোট্ট একটি বাংলো ধরণের বাড়ী কিন্তু ভিতরের জিনিসগুলি দেখবার মত। আমাদেরই মত আর এক দল দর্শনপ্রার্থী তখন সামনের জমিতে বসে কিঞ্চিৎ জলযোগ করছিলেন। আমাদের সন্নিবিধাই হ'ল। নিজেরা ঘুরে ঘুরে সব ঘরগুলি দেখতে লাগলাম। ঢুকবার দরজার পাশেই ৬ ফিট লম্বা এক বিরাট মাটির জালা—বোধ হয় চাল রাখবার, জিনিসটি নালন্দারই। ভিতরে ঢুকে নালন্দার ভাঁড়ার ঘরের পোড়া চাল কিছু দেখলাম, কিছু হুন্দর পুঁথি ও গহনার টুকরো, মাটি ও ব্রঞ্জের খেলনা, মাটির হাঁড়ি, কলসী, বাসন, সরাসি কিছু ছিল। একটি আলাদা কাঁচের আলমারীতে বুদ্ধমূর্তি, মঞ্জুশ্রী, শক্তি ও প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি সাজানো। কি নিখুঁত কাজ ও কি সরল, ঋজু ভঙ্গী। মূর্তিগুলি দেখে অবাক হয়েছি। আজকালকার আধুনিক ভাস্কর্য্য ও শিল্প এগুলি অপেক্ষা যে কত অংশে স্থূল ও নিকৃষ্ট তাই শুধু ভাবি। একটি পাথরে খোদা কীর্তিমুখ অতি উৎকট মুখভঙ্গী করে আমার দিকে তাকিয়েছিল, ফোলা দুটি গালের মধ্যে দুটি হাত পোরা উদ্ভট মুখভঙ্গী!

রাজাদের শিরস্ত্রাণের গহনার মাটির ছাঁচ দেখলাম—এই ধরণের গহনা এর আগে কখনও দেখিনি। প্রজ্ঞাপারমিতার বারটি হাত, সবগুলি বিশিষ্ট মূর্তির গঠিত। মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের কোনওটিতে ঋজু সরল ভঙ্গী, কোনওটিতে বিশাল ভূড়ি—বোধধরির কারিগরদের ঝাঁক রকম দেহবৈশিষ্ট্যের প্রতি অতুরাগ দেবতারও সেইরূপ নিয়ে তাঁদের হাতে এসে ধরা দিতেন! বজ্রপাণির মূর্তি দেখলাম একটিই। যেমন তেজোদ্বন্দ্ব ভঙ্গিমা, তেমনি হুন্দর ও নিপুণ কারুকার্য্যবচিত এই মূর্তিটি, প্রকৃত বজ্রপাণিরই যেন অতিসূক্ষ্ম একটি রূপ। নালন্দার আবিস্কৃত

পুঁথি, কিছু মূর্ত্তা ও শিলমোহরও দেখলাম কয়েকটি। ছবি আঁকবার উপযুক্ত অনেক জিনিসই ছিল। খুব তাড়াতাড়ি করে অল্প কিছুই রেখা অঙ্কন মাত্র করতে সক্ষম হলাম। অতি অতৃপ্ত মন নিয়েই ফিরতে হ'ল সময়াভাবে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার জন্ত প্রত্যেককে দুই আনার টিকিট এই থানেই করতে হ'ল। লাল কাঁচা রাস্তা বেয়ে এসে দাঁড়ালাম সেই সাংস্কৃতিক পীঠ স্থানে। আজকালকার আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়—যেন আর একটু বড় সড় এক একটি বিদ্যালয়, কিন্তু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যে রকম দেখলাম মনে হ'ল এই সত্যি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলাম। আধুনিক যুগের ইতিহাসের ছাত্রী আমি সেই ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলাম একটি গভীর বিশ্বয়, কোতুহল ও আশ্চর্য ভাব নিয়ে। ঘাস পাতায় ঢাকা কত হাজার বছরের পুরনো ইটের খিলান করা তোরণটির মধ্যে দিয়ে লম্বা রাস্তা চলে গেছে, দুই পাশ অনেক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পৃথিবী ব্যাপী যশ বাদে, তাঁরা এই তোরণের মধ্যে দিয়ে কম্পিত বক্ষে প্রবেশ করেছেন—অনেককেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। অত্যন্ত বিদ্বান ও কষ্টসহিষ্ণু অল্প কয়েক জনকে নির্বাচন করা হ'ত। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা ধর্মের নানা সংস্কৃতির, নানা জাতীয় পণ্ডিতরা আসতেন ভারতবর্ষের এই কোণটিতে পূর্ণজ্ঞান লাভ করার জন্য। পুঁথি ছিল সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প, বেশীর ভাগ পুঁথি তাই মুখস্থ করতে হ'ত, অল্প সংখ্যক কিছু নকলও করতে হ'ত। আধুনিক যুগে দেখি একই বিষয়ে হাজার বই, তারপর হজ্রদশাব্দীর আকারে সব জোঁগাড় করা বা এক সঙ্গে খিচুড়ীর আকারে লিখিত 'notes'। কেউ শেগুন্নি মুখস্থ করছেন, কেউ নকল করছেন; কেউ পরীক্ষা অবধি তাকে কোনও মতে হৃদয়ে স্থান দিচ্ছেন, বেশীর ভাগই পরীক্ষার পর সে বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হচ্ছেন! দীপঙ্কর ত্রিজন (অতীশ), হিউয়েন সাং, শীলভদ্র প্রভৃতি কত অমর পুরুষ যে গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন করেছেন, যে ঘর গুলিতে শয়ন করেছেন, যে ঘরে আমাদেরই মত ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করেছেন, যে ঘরে নিত্য স্নানাদি সমাপন করেছেন, যে স্থানে বসে আপনার হৃদয়স্থিত দেবতাকে স্মরণ করেছেন ও

সর্বশেষে যে নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন স্বপ্নে বসে তপস্যা করেছেন সবই বিশ্বয়বিহ্বল মনে ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

চারতলা থেকে নয়, দশ তলা পর্যন্ত বাড়ী। অনেক খানিই এখনও মাটির তলায়। দশ হাজার ছাত্রের থাকবার ও অধ্যয়ন করবার ব্যবস্থা এখানে ছিল; তাছাড়া অধ্যাপকরা ত ছিলেনই। গ্রন্থাগার, বক্তৃতা ও বিতর্ক সভার জন্য বিরাট হল ঘর, কারুকার্যখচিত খিলান ও স্তম্ভগোল খাম দিয়ে ঘেরা। মাটির নীচে পয়ঃপ্রণালী, উপরে পাথরের ঢাকুনী দিয়ে বন্ধ, ছপাশে ছুটি লোহার আংটা। দেখেই বোঝা যায় আধুনিক কালের মত প্রায়ই খুলে পরিষ্কার করা হ'ত। খাবার ঘর ও স্নানের ঘরেও খাঁজ কাটা তাক আর কুলুঙ্গী (বোধ হয় আলোর জন্য), এবং জল বাবার নর্দমা। শোবার ঘরেও নর্দমা। শয়ন উপবেশন ও অধ্যয়নের উপযুক্ত বাঁধানো ইটের বেদী প্রত্যেকটি শোবার ঘরেই একটি করে গাঁথা আছে। গ্রন্থাগারের ছাদ খুব উঁচু। ভাঁড়ার ঘরটি অভিনেব গোল, নীচ ছাদ, জানলার কোনও চিহ্ন নেই, একটি দরজা। ঘরের মাঝখানে একটি সুরু ও বেশ লম্বা উন্নত কাটা। পথপ্রদর্শক বজেন, মাটির শিলমোহর প্রভৃতি ঐ উন্নত পোড়ানো হ'ত।

শোবার ঘরগুলি একটি প্রকাণ্ড বাঁধানো প্রাঙ্গণ ঘিরে সাজানো। প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে একটি স্তম্ভভীর কূপ, তার মুখ ও ভিতর বাঁধানো। কত মহাপুরুষ ঐ জলপান করেছেন তার ইয়ত্তা নেই, কেউ গেলেই ওখানের রক্ষকরা জলপান করতে বলেন। ১৫০০ বছরের আগের জল আমরাও খেলাম; পরিষ্কার, মিষ্টি জল। হিউয়েন সাং শীলভদ্র প্রভৃতি ঐ চত্বরে বসে কতদিন ভোরবেলা দাঁত মেঝেছেন মুখ ধুয়েছেন ভেবে হাসি পাচ্ছিল। চিরকাল ইতিহাসে তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও উপদেশাদি পড়েছি, অত্যান্য মানুষদের মত দৈনন্দিন জীবন যে তাঁদেরও ছিল সেটা কখনও কল্পনায় আসেনি।

তখনকার দিনের মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ দেখে নিজেদের মনে হচ্ছিল সুলবুদ্ধি, মোটা রকম কৃত্রিম জীবন বাপন করেই আমরা খুসী। আর প্রায় ২০০ বছর আগে যারা ছিলেন তাঁরা যা ব্যবহার করেছেন সবই স্নকৃতির পরিচয় দিচ্ছে আজও। বোধ হয় তাঁদের মন, তাঁদের জীবন ছিল অনেক স্নন্দর ও পবিত্র, তাই তাঁরা যা স্পর্শ করতেন সব

কিছুকেই আরও স্মরণ করে তুলতেন, আর আমাদের জীবন প্রাণ সবই ক্রমশঃ কৃত্রিম অথচ স্থূল হয়ে আসছে, তাই আশ পাশের যা কিছু আমরা গড়ছি সবই সেইরকমই হয়ে যাচ্ছে। নালন্দার প্রতিটি ছাদে কাণিশে, খিলানে দেওয়ালে থামে, কুলুঙ্গীতে সর্বত্র কারুকার্য করা, প্রতিটি জায়গায় স্বকৃতি ও স্মরণ শিল্পের ছাপ।

চৈত্য বিভাগে প্রবেশ করলাম। কত কিম্বদন্তি, কিম্বদন্তীর মূর্তি, কিছু হিন্দু মূর্তি, বেশীর ভাগই বৌদ্ধ মূর্তি। বুদ্ধেরই অজস্র মূর্তির মূর্তি। ধর্ম চক্র মূর্তি, ভূমিস্পর্শ মূর্তি, ললিতাসনা বজ্রপাণি বরদমূর্তি। প্রভৃতি আরও অনেক রকম বুদ্ধের মূর্তি ছিল এই বিভাগটি ঘিরে।

প্রতিটি ঘরের ভিত্তি মাটির উপর থেকে খানিকটা করে বেরিয়ে আছে। এর উপর নানারকম কিংবদন্তীর ছবি পাথরের উপরে খোদাই করা। নানা রকম হাঁস, ময়ূর, কচ্ছপ ও মাছের ছবি।

প্রধান মন্দিরের ভিতরে বিরাট এক বুদ্ধ মূর্তি বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের বাইরে এবং চৈত্যের চারিদিকে বুদ্ধ দেবের অগণিত শিষ্যদের নির্ঝালনের পর সমাধি রচনা করা। কেউ পণ্ডিত, কেউ অধ্যাপক, কেউ ছাত্র, কেউ বা শুধুই দূরদেশাগত দর্শনপ্রার্থী। এই অজস্র স্তূপ যে অনন্ত শয়নের উপর রচিত সেগুলি খুঁড়লে এখনও কিছু ভস্ম পাওয়া যায়। প্রাঙ্গণগুলি ঘিরে একটি স্তূপ গাভীর্ঘ্য বিরাজ করছিল। তারপর যখন আমরা আস্তে আস্তে একটি স্তূপ বেয়ে মাটির কিছু নীচে নেমে এলাম। কি নিষ্কণ কালো ঘন অন্ধকার এই দুপুরের রোদেও! এই নিবিড় ঘন আঁধারে বসে মনোমিমাংসা ধ্যান করতেন। এই অতলম্পর্শী তিমিরের কোল থেকে কত গভীর ও গভীর দর্শন শাস্ত্রের জন্ম হয়েছে তার ঠিকানা কেউ রাখেনা। তমসো মা জ্যোতির্গময়—এই অমৃতবাণীর সঙ্গে এই ধ্যানকক্ষগুলির কি নিবিড় সম্পর্ক তা আজ কেউ বলতে পারে না। আমরা দেশলাই জ্বলেও গভীর অন্ধকারের সীমা দেখতে পেলাম না।

সাত, আট মাইল বিস্তৃত এই জ্ঞানের ভাণ্ডার, তাই সব দেখা সম্ভব হ'ল না। শুনলাম সব গুলিই এক ছাঁচে ঢালা; বসবাস করার ঘর, গ্রন্থাগার, রান্না ও তৈয়ারি, চৈত্য ও মাঝে

মাঝে বিতর্ক সভার জন্য ও বক্তৃতাতির জন্য বিরাট হল ঘর। মনে গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে আমরা ১টা ২টার মধ্যে রওনা হয়ে গেলাম রাজগৃহের উদ্দেশ্যে।

মৌর্য রাজাদের বিরাট রাজধানীর পাথরে গাঁথা ভূগর্ভের ধ্বংসাবশেষ কিছু দেখলাম। পথে যেতে নানা জায়গার প্রাসাদের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষও দেখা গেল। রাজগৃহের দৃশ্যাবলীর বেশ একটা বিশেষত্ব আছে। রক্ষ, ধানগভীর পাহাড় ঘেরা এই জায়গাটির সঙ্গে স্বয়ং তথাগত বুদ্ধের তপস্যারত মূর্তির একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। মাঝে মাঝে পাথুরে জমির বুক চিরে কোমল শ্যামলতা শোভা পাচ্ছে, কঠিন শুষ্কির অন্তরালে নুকোনো নিটোল মুক্তার মত। নির্মল আকাশ প্রথর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। বহুদূরে শুকনো বালির চড়ার তলা দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ, শীতল ঝরঝরে একফালি নদী। যেন সারা প্রকৃতিই এখানে এক কঠিন তপস্যায় রত। অন্তঃস্থিত প্রাণের সাড়া শুধু যেন এই অল্প কয়েকটি গাছপালা আর ক্ষীণ জলধারার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। ডাক বাংলায় খিচুড়ীর ব্যবস্থা করে আমরা কয়েকজন গেলাম উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে। বহু দেশের লোক শুনেছি এই উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করে রোগ মুক্ত হয়েছেন। মেয়েদের ও পুরুষদের স্নানের ঘর আলাদা, এত বেলায় কেউই প্রায় ছিলেন না, কিন্তু হঠাৎ এক বেহারী যুবক অত্যন্ত কৌতূহল বশতঃ ঠিক আমাদের স্নানের ঘরের সামনে এসে এক বিষং মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। স্নান পরে অগত্যা অত্যন্ত সংক্ষেপে সেরে আমরা চলে এলাম। ডাক বাংলায় খাওয়া দাওয়া করেই রওনা হ'তে হল, রাজগৃহে ভাল করে কিছু দেখা হ'ল না।

আমাদের সঙ্গেই চারীরা পথ বেয়ে চলেছিল লাঙ্গল কাঁধে মহিষ ও গরু তাড়িয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত মন্থর গতিতে। ছোট রাখাল ছেলেরা অনেকে মহিষের পিঠে চড়ে বাঁশী বাজিয়ে গান গেয়ে চলছিল। অন্তিমিত রবির শেষ রাস্তা আলোর আভাষ সেদিন সত্যি একটি গোপুলি দেখলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চাঁদের আলোয় সারাদিক ঝলমল করে উঠল। গঙ্গার সোনালী জলস্রোতে তখন গলানো রূপার স্রোতের মত জ্যোৎস্নার আলো বয়ে চলেছে। নদীর বুকের উপর দিয়ে নক্ষত্র স্নিগ্ধ বাতাস ভেসে এসে নিমেষে আমাদের সারাদিনের ক্লান্তি ও পথশ্রম মুছে নিয়ে গেল।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

[স্বাস্থ্য সমাচার হইতে উদ্ধৃত]

মুখ থাকিতে হইলে প্রকৃতির উপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সভ্যতার খাতিরে আমরা কতগুলি অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছি, যাহা বর্তমানে অপরিহার্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহার মধ্যেও যতগুলি স্বাভাবিক উপায় আছে তাহা কেবল পালন করা নয়, উহা যাহাতে স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

নিম্নে আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়া হইল। আপনার উত্তরগুলি সত্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক উত্তরে অর্থাৎ আপনি তাহা পালন করিতেছেন এরূপ হইলে, পাঁচ নম্বর পাইবেন। ৮, ১০, ১৮ প্রশ্নের প্রত্যেক অংশ যদি পালিত হয়, তাহা হইলে ১ নম্বর করিয়া প্রতি অংশে পাইবেন।

পূর্ণ সংখ্যা এক শত। যদি আপনি ৮৫ পান, তাহা হইলে আপনার অভ্যাসের জন্য আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। তাহার পর ৭৫ হইতে ৮৫ পাইলে বুঝিতে হইবে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনি “চলন মই” অর্থাৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত জীবনযাপন করিতেছেন। তাহারও নিম্নে অর্থাৎ ৬০-এর কম হইলে আপনার সমুহ বিপদ। যদি মঙ্গল চান শীঘ্রই আপনার অভ্যাসের পরিবর্তন করিবেন।

প্রশ্ন পত্র

১। প্রত্যুষে স্বাস্থ্যচর্চামূলক কাজে যথা, ব্যায়াম, দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ, দ্রুত ভ্রমণ, ইত্যাদি কাজে আপনি অভ্যস্ত কি না? ✓

২। প্রত্যহ দুইবার, যদি না হয় অন্ততঃ একবার দাঁত মাজা এবং মুখ ধুইবার অভ্যাস আছে কি না? ✓

৩। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে আপনার দেহের ওজন গ্রহণ করেন কিনা এবং আপনার দৈর্ঘ্য ও ওজনের অনুপাতে ওহন যত হওয়া উচিত তাহা হইতে যাহাতে উহা ১৫ পাউণ্ডের নিম্নে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন কি না? ✓

৫। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টা নিদ্রা যান কিনা? ✓

৬। দিনের মধ্যে অন্ততঃ ২০ মিনিট ব্যায়াম, তন্মধ্যে দ্রুত ভ্রমণে কিছু সময় ফেপ করেন কি না? ✓

৭। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ বার ঘণ্টা মুক্ত বায়ুতে কাজ কর্ম, খেলাধুলাতে ফেপ করেন কি না? ✓

৮। দৈনন্দিন খাওয়ার মধ্যে (ক) একটি লেবু জাতীর ফল এবং আর একটি অন্য ফল, (খ) এক পোয়া দুধ, (গ) কিছু সবুজ শাকপাতা, (ঘ) কিছু শাকসব্জির বোল এবং সবুজ পাতার চাটনি, (ঙ) কিছু ষাঁতাভাঙ্গা আটার কটী বা বিস্কুট-খান কি না? ✓

৯। প্রত্যহ ঠাণ্ডা জলে স্নান করেন কি না? ✓

১০। শয়ন, বিশ্রাম এবং দৈনন্দিন কাজ কর্মের ঘরে সর্বদা জানালা খোলা থাকে কি না? ✓

১১। প্রতিদিন দেহের অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা আপনার পায়ের যত্ন গ্রহণ করেন কি না? ✓

১২। পাতৃকা নির্বাচনে মনোরম কষ্টদায়ক পাতৃকা অমনোনীত করিয়া, আপনার পায়ের স্বস্তি কামনা করেন কি না? ✓

১৩। সর্বস্বত্বতে আপনার অনাবৃত দেহে প্রতিদিন প্রচুর আলো বাতাস লাগাইবার জন্য কতক সময় নিয়োগ করেন কি না? ✓

১৪। পরিচ্ছন্ন নির্বাচনে আপনি হাক্কা, বাতাস চলাচলের উপযোগী এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহজ গতির উপযোগী বস্ত্রের দিকে লক্ষ্য রাখেন কি না? ✓

১৫। আপনি কি সাধারণতঃ (ক) প্রতিদিন তামাক, সিগারেট প্রভৃতি, (খ) মদ্য, (গ) একাধিকবার মাংসাদি ভক্ষণ, (ঘ) নশ্ত গ্রহণ এবং (ঙ) রাত্রি জাগরণ হইতে বিরত থাকেন? ✓

১৬। বৎসরে অন্ততঃ দুইবার কি আপনার দস্ত-চিকিৎসককে দিয়া দস্ত পরীক্ষা করান? ✓

১৭। বৎসরে কি অন্ততঃ একবার আপনার চিকিৎসক পারিবেন “পাশ বা ফেল” অর্থাৎ কৃতকার্য বা অকৃতকার্য দ্বারা সর্ধপ্রকার রোগের অনুসন্ধান করান? হইলেন। নিজের কাছে নিজের পরীক্ষায় “ফেল”

১৮। আপনি কি নিত্যনৈমিত্তিক রোগ (ক) হওয়ার গ্লানি সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি। মানুষ যত অকাজই করুক, সে সর্বদা আপনার কাজের সমর্থক যুক্তি আবিষ্কারের জগ্ন্য সচেষ্ট থাকে। যখন কোনও যুক্তি পায় না, তখন সাধারণতঃ, যদি তখনও কোন মনুষ্য অঅবশিষ্ট থাকে, সে আপনাকে সংশোধনের চেষ্টা করে; তাহা না হইলে তাহার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে সকল দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া সর্বনাশের পথে আপনাকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। এ অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। মানুষ যদি আপনার সর্বনাশ আপনি-সাধন করে, তাহা হইলে অপরে তাহা হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হইয়া থাকে। কিন্তু অপরে রক্ষা করিবে সে কথা আশা করিয়া থাকা ভুল। স্বাস্থ্য যদি বিকল হয়, তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হয় তাহার বাহাকে মানুষ সবার অপেক্ষা বেশী ভালবাসে, অর্থাৎ অহং, অর্থাৎ আমি, বা আমাকে। ভোগে অরুচি বা শক্তিহীন, কর্মে বীতশ্পৃহ, নিম্নের বা অপরের মঙ্গল চেষ্টায় পরাভূত যে জীবন তাহা বহন করিয়া লাভ নাই। অথচ কত সহজে মানুষ হুস্থ থাকিতে পারে। যে চেষ্টায় বা উপেক্ষায় মানুষ অস্থস্থ হয়, হুস্থ থাকিতে হইলে তাহা অপেক্ষা বেশী শ্রম অথবা ব্যয় লাগে না।

১৯। আপনি কি কর্মপটুতা, কর্মে রুচি এবং সুগঠিত দেহের অধিকারী? প্রতিদিন, প্রতি মাসে উপরে প্রদত্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখিয়া উত্তর তৈয়ারী করিলেই সকল গোলমাল চুকিয়া যায়।

২০। আপনার মন কি সদাই প্রফুল্ল ও শান্ত, অর্থাৎ অকারণে আপনার কাজ কর্মের এবং সঙ্গীদের উপর হঠাৎ বিরক্ত হন না বা সামান্য বিপর্যয়ে বিচলিত হন না? এই সকল প্রশ্নের মধ্যে (৫ সংখ্যক প্রশ্ন) বিশ্রাম, (১, ৬ ও ৭) ব্যায়াম, (৮) পথ্য, (১১ ও ১২) পায়ের যত্ন, (৯ ও ১৩) স্বকের যত্ন এবং (২০) মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি আপনার মঙ্গলের সহিত অধিক মাত্রায় জড়িত। প্রকৃতপক্ষে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে হইলে এই কয় বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইতে হইবে।

এই পরীক্ষা এমনই চমৎকার যে আপনার উত্তর সকল একত্র করিয়া যোগ দিয়া নিজেই বুঝিতে পারিয়া রূপান্তরিত।)

বর্তমানে আপনার পরীক্ষার ফল বাহাই হউক, সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, ইহার শেষ নাই; যখন বাহা আছে, তাহার উপর উন্নতি সাধন করা সম্ভব। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি হুস্থ ও সবল থাকা। সেই বৃত্তিকে উৎসাহ দিয়া চলিলে, তাহাই সকল ক্রটি দূর করিবার প্রেরণা জোগাইবে।

এই পরীক্ষা এমনই চমৎকার যে আপনার উত্তর সকল একত্র করিয়া যোগ দিয়া নিজেই বুঝিতে পারিয়া রূপান্তরিত।)

(নিউ হেল্থ পত্রিকা হইলে আমাদের উপযোগী করিয়া রূপান্তরিত।)

শিক্ষক ।

(চেকভ হইতে)

শ্রী অরুণা বসু ।

কুলিকিন ফ্যাক্টরীর স্কুলের মাষ্টার মশাই ফিয়োডোর স্কুলের বার্ষিক ভোজের জন্ত প্রস্তুত হইছিলেন। প্রত্যেক বৎসরেই পরীক্ষার পরে, নিয়ম মত এই ভোজটী হয়। যে ইন্সপেক্টর সাহেব পরীক্ষা নিতে আসেন, তিনি, অন্ত্য পক্ষিকেরা এবং ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তারা সকলেই ম্যানেজারের বাড়ীতে এই ভোজে উপস্থিত থাকেন। ভোজের সময় একটি আনন্দের হিলোল বয়ে যায়। সকলে নিজের পদ ও মান ভুলে গিয়ে থাওয়ার পরে অতিভোজন ও পানীয়ের প্রভাবে অনেকগুণ ধরে গল্প ও আমোদ করতে থাকেন, তাঁদের কথাবার্তা এবং গীতধ্বনি উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকে এবং পল্লীর স্তূরতম অংশেও তাঁদের আনন্দোন্মাদের প্রতিধ্বনি বহুত হতে থাকে। এ পর্যন্ত এ রকম তেরটি ভোজে ফিয়োডোর বোগদান করেছে অর্থাৎ তের বছর সে এই স্কুলে রয়েছে।

আজ সে চতুর্দশ ভোজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আগমনার সামনে দাঁড়িয়ে তার চুল জাঁচড়ানো আর শেষ হতে চায়না। তার পোষাক আশাকে যথেষ্ট চাকচিক্য দেখা যাচ্ছে। নিজের চেষ্ঠা যথেষ্ট নয় মনে করে সে তার স্ত্রীকে চীৎকার করে ডাকা ডাকি করছে। অবশেষে হয়রান হয়ে গিয়ে সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। নিজের বুট জুতো জোড়া পায়ে পরবারও শক্তি তার ছিল না। তার স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, “তোমার শরীর দেখছি একেবারেই দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আজকের ভোজে তোমার না যাওয়াই উচিত।” ফিয়োডোর চিৎকার করে উঠলো, “থাক, আর পরামর্শ দিতে হবে না।”

ফিয়োডোরের মেজাজ আজ অত্যন্ত খারাপ, পরীক্ষাতে একটা গোল মাল হয়ে গিয়েছে। সাধারণ ভাবে পরীক্ষার কল খুব ভালই হয়েছে। কিন্তু ব্যাব্কিন নামে একটি ছেলে যে কোন দিন ভুল করে না—শ্রুতলিপিতে তার তিনটে ভুল হয়ে গিয়েছে; অল্প আর একটি ভাল ছেলে ১৭র ঘরের

নামতা ভুলে গিয়েছিল। এই জন্যই ফিয়োডোরের এত উত্তেজনা হয়েছে।

স্ত্রীর সাহায্যে অতি কষ্টে বুট জোড়া পায়ে টেনে তুলে, আগমনার আরেকবার মুখ দেখে ফিওডোর মোটা লাঠিটি হাতে করে ভোজের জন্য রওনা হল। ম্যানেজারের বাড়ীর সামনে পৌঁছে একটি ছোট ছুঁটনা ঘটে গেল। হঠাৎ তার এমন কাশি উঠল যে কাশতে কাশতে তার মাথার থেকে টুপি এবং হাতের থেকে লাঠি পড়ে গেল। যে অতিথিরা ভোজের জন্য সম্মিলিত হয়েছিল সবাই বাড়ী থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল ততক্ষণে ফিওডোর দরজার সামনের সিঁড়িতে বসে পড়েছে। তার সমস্ত শরীর থেকে ঘামের বন্যা নেমেছে।

ইন্সপেক্টর আশ্চর্য হয়ে বললেন, “ফিয়োডোর তুমি এসে পড়েছ?”

“কেন আসব না?”

“তোমার বার হওয়া উচিত হয়নি হে। শরীর তোমার তো আজ ভাল ছিল না।”

“আমার শরীর কালও যা ছিল আজও তাই আছে। যদি আমাকে না চাও তো ফিরে যাচ্ছি।”

“কি আবল তাবল বকছ? আজকের ভোজতো তোমারই ভোজ। তুমি যে আসতে পেরেছ তাতে আমরা সকলেই কত খুসী।”

ভোজের জন্য সব তৈরী হয়ে গিয়েছে। ভোজনাগারের বড় টেবিলের ওপরে জিরেনিয়াম ফুল সাজানো রয়েছে। চারিদিকের জানালা বন্ধ। খড়খড়িগুলি তোলা আছে, তার ভেতর দিয়ে ক্ষীণ আলো প্রবেশ করাতে ঘরের মধ্যে সন্ধ্যাবেলার রমণীয়তা বিরাজ করছে। টেবিলের ওপরে ঝকঝকে কাঁচের বাসনে সুসজ্জিত আহাৰ্য্য। গৃহস্থানী চারিদিকে ছুটোছুটি করে আরও খাবার পরিবেশন করছেন, পানীয় বিতরণ করছেন এবং অতিথিদের পিঠ চাপড়ে করমর্দন করে সকলকে তাঁর আশ্রয়তা জানাচ্ছেন।

ফিওডোরকে দেখে বলে উঠলেন, “আরে ফিওডোর, এত অস্থখ সঙ্গেও এসে পাড়েছ? তুমিকে দেখে বড় খুসী হলাম। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তুমি আসতে পেরেছ।” অন্যত্র অতিথিরা টেবিলের চারিদিকে জড় হয়ে হাতে হাতে খাবার নিয়ে খাওয়ার প্রথম পর্ব স্বক করে দিয়েছে। এই দলের মধ্যে ফিওডোরের স্কুলের অনেক শিক্ষকও ছিল। তার জন্য অপেক্ষা না করে তারা খেতে আরম্ভ করেছে দেখে ফিওডোরের বিরক্তি বোধ হল। দলের মধ্যে সে লিগাপুনভকে দেখতে পেল; এই লোকই শ্রুতলিপি পরীক্ষা নিয়েছিল। ফিওডোর তার কাছে গিয়ে বললো, “তুমি যদি ও রকম হড়বড় ভড়বড় করে শ্রুতলিপি পাঠ না দিতে তাহলে আমার ব্যবসিনের কখনই ভুল হত না। এ রকম অশোভন কাজ কেন তুমি করলে?”

লিগাপুনভ বললো, “তুমি এখনও সেই কথা নিয়ে অস্থির হচ্ছে? এতক্ষণ পরেও সে কথা ভুলতে পারছ না?”

“এটা কি ভোলবার কথা? ব্যবসিন কোনওদিন একটা ভুলও করে না, তোমার স্কুলের ফল যাতে আমার স্কুলের থেকে ভাল হয় সেজন্যই তুমি ও রকম করেছিলে।”

“বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়া করছ কেন?”

“আমাকে জালাতন করাই কি তোমার উদ্দেশ্য?”

ইন্সপেক্টর এগিয়ে এসে বললেন, “ছি, ছি, তোমরা করছ কি? ছোট জিনিষ নিয়ে কথা কাটাকাটি করা তোমাদের মান্য না।”

“এটা মোটেই ছোট জিনিষ নয়। ব্যবসিন কোনও দিন ভুল করে না।”

লিগাপুনভ বললো, “না, ও ছাড়বে না। অস্থখের সুযোগ নিয়ে ও সকলের ওপরেই অত্যাচার করতে চায়।”

“তোমার অস্থখ মেনে নিয়ে গালাগালি সহ্য আমি করব না।”

ফিওডোর খুব ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, “অস্থখের কথা তুমি রাখ। আমার অস্থখে তোমাদের কি? কেবল অস্থখ আর অস্থখ! তোমাদের কৃপা কে চায়? তাছাড়া কে বললো যে অস্থখ? পরীক্ষার আগে আমার অস্থখ ছিল তা ঠিক। কিন্তু এখনতো আমার কোনও অস্থখ নেই, কেবলমাত্র একটু দুর্বলতা আছে।”

ধর্মশিক্ষক ফাদার নিকোলে এগিয়ে এসে বললেন, “ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তোমার অস্থখ সেরে গেছে। এখন তোমার খুব খুসী মেজাজে থাকা উচিত। এত মেজাজ খারাপ করছ কেন?”

ফিওডোর তাঁকে দেখে আরও ক্ষেপে গেল, বলল, “আপনিও কম ঝান না। ছোট ছেলেদের প্রশ্ন হবে কোথায় সরল সহজ, আর আপনি কিনা হৈয়ালীতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন।”

সকলে এক সঙ্গে হয়ে কোনও রকমে তার মাথা ঠাণ্ডা করে তাকে খেতে বসিয়ে দিল। কিন্তু কোন খাবারই তার পছন্দ হয় না। অবশেষে একটা সাজানো খাবার মুখে দিয়ে মনে হল তাতে ছুন কম; তাতে খানিকটা ছুন দিয়ে খেতে গিয়ে তার মনে হল যে খাবারের বাকী অংশ টাতে ছুন বেশী দেওয়া ছিল। অতএব খাবার আর তার কিছুতেই খাওয়া হল না।

ভোজের সময় সকলেই একে একে বক্তৃতা দিতে উঠলেন এবং তাঁরা উপস্থিত নানা লোকের প্রশংসা করতে লাগলেন।

ফিওডোরের পালা এলে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করলো যে তার বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস নেই এবং সে কিছুই বলতে পারবে না। তারপরে সে জানালো যে আজ ১৪ বৎসর সে এখানে শিক্ষকতা করেছে, ইতিমধ্যে বহু লোকে নানানভাবে তার বিরুদ্ধতা ও শত্রুতা করেছে; তাদের মধ্যে অনেকেই আজ এখানে উপস্থিত কিন্তু ফিওডোর তাদের নাম উল্লেখ করতে চায় না। এ রকম ষড়যন্ত্র সঙ্গেও কুলিকিন স্কুল এই প্রদেশের মধ্যে সব থেকে ভাল স্কুল বলে খ্যাত হয়েছে। এটা কেবল মাত্র শিক্ষকদের কৃতিত্বেই ঘটেনি, ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তারা এই সুনামের মূলে বিশেষ ভাবে রয়েছেন। এখানকার শিক্ষকদের মাইনে এই প্রদেশের অন্যান্য শিক্ষকের মাইনের থেকে প্রায় দ্বিগুণ এবং এখানকার ছাত্রদের খাতা পত্র বই যে ভাবে দেওয়া হয় অন্য কোনও স্কুলই তা দিতে পারে না।

এই রকম ভাবে স্কুলের কর্তৃপক্ষের বিশেষ করে ক্রনি নামে উপস্থিত যে কর্মধ্যক্ষ ছিলেন তাঁর প্রশংসা করে এবং নিজের শত্রুদের অনেক নিন্দা করে ফিওডোর এক লম্বা বক্তৃতা দিল। বক্তৃতা শুনে শুনে শ্রোতারা সব অধৈর্য হয়ে উঠতে

লাগল; অবশেষে ফিওডোর নিজেই অত্যন্ত হয়রান হয়ে বসে পড়ল।

ফিওডোর বসলে সকলেই স্বস্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। কেবল মাত্র ফ্যাক্টরীর কস্মাধ্যক্ষ ক্রাণি কোনও রকম বিরক্তির ভাব না দেখিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পক্ষের থেকে অনেক বিনয় প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের স্কুলটার যে অনেক রকম বিশেষত্ব আছে তা বললেন। এই স্কুলের ছেলেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং কর্মপটু, তাদের ব্যবহার খুবই সহজ ও সরল, তা জানানলেন। তিনি আরও বললেন যে প্রত্যেকটি ছেলেই ফিওডোরকে খুব বেশী ভালবাসে। তাদের সঙ্গ ফিওডোরের স্কুলের শিক্ষকতাকে শিল্পীর কাজে রূপান্তরিত করেছে।

এই বক্তৃতার পরে সকলেই ফিওডোরের মেজাজ ও কর্কশতা ভুলে গিয়ে তার গুণগান আরম্ভ করে দিল। এরকম প্রশংসা শুনে ফিওডোর অভ্যস্ত। সে সব কথাই যেন উদাসীন ভাবে শুনতে লাগল।

কিন্তু ক্রাণি এই প্রশংসা শুনতে শুনতে অত্যন্ত খুসী হয়ে উঠলো। সে মধ্যে মধ্যে বলতে লাগল “বা, বা, খুব ঠিক!”

অবশেষে সে আর থাকতে পারলো না। লাফিয়ে উঠে বললো আপনারা একটা কথা শুনে রাখুন, আমাদের ফ্যাক্টরী ফিওডোরের কাছে কতদূর কৃতজ্ঞ সে কথা কখনই ভুলবে না। গত মাসেই ফিওডোরের পরিবারের জন্য ব্যাঙ্কে একটি মোটা অঙ্ক জমা রাখা হয়েছে।”

ফিওডোর ক্রাণীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

টাকাটা তার জন্য না রেখে তার পরিবারের জন্য কেন রাখা হয়েছে তা সে বুঝতে পারল না। শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল প্রত্যেকেই যেন একটা বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চকিতে সে ভয়ঙ্কর সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করল। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার মন বিষম নৈরাশ্য এবং শরীর একান্ত অবসাদে পূর্ণ হয়ে গেল। তার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল।

সকলে তাকে শুইয়ে ফেলে, বাতাস দিয়ে জল খাইয়ে কোনও রকমে সুস্থ করল।

নিরানন্দের ছায়া সভাগৃহে নেমে এল, সকলেই একে একে বিদায় হয়ে গেল।

ফিওডোর বাড়ীতে এসে আয়না নিয়ে নিজের মুখ দেখতে বসলো। গাল-ভ্রুটো বসে গেছে, চোখের তলায় কালি। কিন্তু ফিওডোরের মনে হল তার চেহারার অনেক উন্নতি হয়েছে। তার অস্থখ কিছুই না, অকারণে সভায় একটা গোলমাল করে এসেছে মনে করে সে লজ্জিত বোধ করল। ধীরে ধীরে সে তার পোষাক খুলে বস্ত্র করে তুলে রাখল। তারপরে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। সেখানে ছাত্রদের খাতা এক রাশ জমা রয়েছে। অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে সে লেখা গুলি সংশোধন করতে লাগল। ব্যাবকিনের হাতের লেখা কি সুন্দর। তার মন কাজের মধ্যে ডুবে গেল।

পাশের ঘরে তার স্ত্রী তাদের গৃহ চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলছিল। চিকিৎসক নীচু গলায় বললেন, “যে লোক আর এক সপ্তাহও বাঁচবে কিনা সন্দেহ তার আজকের ভোজ্যে যাওয়া কোনও রকমেই উচিত হয়নি।”

গার্ড সায়েবের মেয়ে

(গল্প)

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক বাক পাখী যেমন করে নেমে আসে, সরকারি আপিস থেকে তেমনি উড়ে বেরিয়ে পড়লো মেয়ের দল প্রকাণ্ড ফটকের ভেতর দিয়ে। পায়ে চিত্রবিচিত্র করা বাটার না হয় শান্তিনিকেতনের জুতো, চুলগুলি কার বা ছোট করে ছাঁটা, জুতোর ফটফটের সঙ্গে তুলকি চালে নেচে ওঠে। সস্তা দরের শাড়ী ব্লাউসের প্রতিযোগিতা চাপা পড়ে যায় দিনের মেহনতের ভেতর। দিনের শেষে রুজ ক্রিমের চটকও মিশিয়ে আসে।

ফুটপাথের ওপর ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল সবিতা সবার থেকে একটু দূরে; সে যেন তাদের গোত্রেরই কেউ নয়। সঙ্কোচ ত হবারই কথা। মা কালীর মত চেহারা, তারপর সোণার সোহাগা, বেশভূষারও পারিপাট্য নেই। কালো কস্তা পেড়ে শাড়ীখানা বুঝি বা দিদিমার কাছ থেকেই চেয়ে নিয়ে পরেছে। সহকর্ষিনীরা মুচকি হাসে আর টিপে টিপে বলাবলি করে, যা অতাব একটি টুপি। মাথায় চড়ালেই, ক্লোরেন্স নাইটিংগেল। উচিত ছিল ওর নাস হওয়া। কলমের ও নাকি জাত আছে। নাসের ব্যাণ্ডেজ ছেড়ে কেয়ানীর কলম ধরা কার পক্ষে হয় বেয়াদপি। নিয়ম ভঙ্গকে বরদাস্ত করা যায়, যায় না নিয়ম ভঙ্গকারিণীকে।

অদ্ভুত যেয়ে আনসোসিয়াল। সে দিন কি একটা অভিযোগ নিয়ে সবাই করলে গোপ্পো ষ্ট্রাইক। ঘাড় গুঁজে দ্বিগুণ উদ্যমে ও তিন জনার কাজ একাই করে গেল। আভা সেন উঠে এসে কানে কানে বললে, আজ গা ঢালা ধর্মঘট জানো না? বললে, ই্যা, জানি বৈ কি।—তবে কাজ করছো যে? জবাবে কি বললে জানো? কাজ বন্ধ করবো চাকরি ছাড়বো যেদিন। আপিসে এসে কাজ না করা অনায়াস।

প্রদ্যোত গলা বাড়িয়ে দেখে, কোথাকার ট্রাম। বলে, বাঃ বেশ ত বলেছে। মর্যাদা করেজ আছে মেয়েটির।

নীহারকণা চাইলে তার পাশে। কে জানে, হয়ত তাকে

জালাবার জন্যই ও-কথা বললে প্রদ্যোত। মুখ ফিরিয়ে বলে, না মর্যাদা করেজ নয়, কাওয়ার্ডিস। মাইনে কাটা যাবার ভয়। আচ্ছা সেদিনকার অপমানটা ভুলেই গেলেন প্রদ্যোতবাবু?

—ও, কফি হাউসে টিফিন করতে যাবার অনুরোধ করেছিলুম সেই কথা বলছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। কেউ ভেড়ে না ওর কাছে। আপনি বললেন নেহাৎ কার্টসির খাতিরে, রিফিউজ করাটা ভাল হয়েছে সবিতার? ইনসালটিং?

হেসে বলে প্রদ্যোত—না না, তা হবে কেন? উনি বললেন, আপনার সঙ্গে ত আমার কোন আত্মীয়তা নেই, চেনা শুনা যা কিছু আফিসে। ঠিকইত বলেছেন। অনুরোধ করাটা আমার উচিত হয় নি।

—আর আত্মীয়তা বুঝি সব আমার সঙ্গে? খোঁটা দিয়ে বলে নীহারকণা, আমি বাই কেন রোজই রেশুরায় আপনার সঙ্গে? আমার বুঝি মান সম্মান নেই? যান যান।

কানে কানে কি যেন বলে প্রদ্যোত। দু জনেই হাসতে থাকে।

সবিতার দৃষ্টি ছিল না তাদের এই অভিনয়ের ওপর। সে চেয়ে দেখে লোকের ভীড়; একটির পর একটি ট্রাম। যেমন থামলো, অমনি উঠবার যারা তারা গিয়ে ঢোকে, ঠিক ঢোকে না, হ্যাণ্ডেল ধরে বাহুড় ঝোলা ঝোলে। ঢং ঢং করে গাড়ী ছেড়ে দেয়, আবার একটা আসে। একটা কোণে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে সবিতার মনে জাগে এক দিবা স্বপ্ন। ডাকগাড়ী স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। লাল-রং-করা মেল ভ্যানের বাইরে সোনার হরফে বড় বড় করে লেখা—রয়েল মেল। ভিতরে টেবিলের ওপর নানা জায়গায় চিঠি, স্টারের অভ্যন্ত ক্ষিপ্ত হাততুটি চিঠিগুলিকে বেছে ব্যাগে ভর্তি করছে। একটা ভরল ত আর একটা, কতগুলো ঢুকলো ব্যাগের ভিতর, কতগুলো রইলো বাইরে পড়ে। বস্তা বস্তা

ডাক, গার্ড সায়েব উকি মেরে জিজ্ঞেস করে—রাইট? ঘণ্টা পড়ে, গার্ড সিটি দেয়, নীল ঝাণ্ডা ওড়ে। চললো গাড়ী হুস হুস স্বর স্বর।

হঠাৎ চমক ভাংলো তার। কে ডাকলে, দিদি—এ দিদি।

ফিরে দেখে, একজন রিক্সওয়ালো গাড়ীখানা ঠেলে এনে তারই পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোট্ট খাটো বঁটে মানুষ, গায়ে ময়লা ফতুয়া। রিক্সার ডাঁটু ছটির ভেতর থেকে স্রুখপানে গলা বাড়িয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি ঘোড়ার মত।

হিন্দী আর বাংলা দুটি ভাষারই পিত্ত রক্ষা করে বললে সে, আইয়ে দিদি। রিক্সমে বাড়ী নিয়ে যাবে।

চেনা চেনা মুখ। ছ একবার দেখেছে লোকটিকে পিসে মশায়ের বৈঠকখানা ধরে। কোন কোতুহলই জাগে নি ওর বিষয়ে—এমন কি সে যে রিক্স টানে তাও জানে না সবিভা।

সে ইতস্তত করছে ভেবে রিক্সওয়ালো বললে, আপ তো কিঙ্কর বাবুকে লেড়কি। ইয়ে উনহিকো রিক্স।

ভুল করেছে রিক্সওয়ালো। হরিকিঙ্কর বাবু তার বাবা নন, পিসেমশায়। তারই আশ্রয়ে থাকে সবিভা। দালালি, ফড়েগিরি করেন তিনি, মাছ তরকারির বাজারে সদ্য সদ্য কেনা বেচা করে বিনা মেহনতে ছ পয়সা কামান। তিনি আবার রিক্সর ব্যবসা ধরলেন কবে? আর বিচিত্রই বা কি এমন? ঝালে ঝালে অস্থলে তিনি সবচেয়েই আছেন। কলের বাঁধা মজুরদের থাকতির দিনে হঠাৎ যখন সরাপের টাকার দরকার হয়, তারী এসে তখন হরিকিঙ্করের কাছে হাত পাতে, পাঁচ টাকা নিয়ে দশ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখে দেয়। একবার হিসেবের খাতাখানা সবিভাকে দিয়েছিলেন তিনি স্রুদ কষতে। এডুকেটেড মেয়ের রেওয়াজ তাঁর ঘরে ত ছিলই না, বরঞ্চ লক্ষ্মীর পৈচাঁর ডাকে সরস্বতীর বীণার ঝঙ্কার বাড়ির ছেলেরাও তেমন শুনতে পায় নি। শিক্ষিতা মেয়ে সবিভা—মেয়েদের শিক্ষার সার্থকতাই হল হিসাব-করা আর স্রুদ কষা। তাই না যত মার্চেন্ট আপিসে, সরকারি একাউন্ট কি ডিসপোজালের দপ্তরখানায় মেয়ের এত অটেল আমদানি! পিসে মশায়ের কথা শুনে হাসি পায় সবিভার, খাতা টেনে নিয়ে বসে হিসাব কষতে। ছ ছ সেট হিসাব—এক সেট আইন আদালতের জন্য, অপরটি প্রকৃত লভের খতিয়ান। একটি খাতার ঋণ

দেখানো হয়েছে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে, তাই স্রুদের হার কম দেখানে। যে রকম কড়াকড়ী মহাজনী আইন, বেশি স্রুদ ধরা পড়লে কি আর রক্ষে আছে? আদালত দেবে একটি কলমের খোঁচায় নাকচ করে। দোষ কি বেচারীর? আইনইত ঠেলে নিয়ে যায় বেআইনের পথে। আইন দাঁও তুলে দেখবে বে-আইনও আর থাকবে না। অত শত কিঙ্কর সবিভা বোঝে না, লেখা পড়া লিখলে কি হয়? যত দেখে খাতাখানা উলটে পালটে তত লাগে চোখে ধাঁধাঁ। অঁয়া—পিসে মশায়ের এই কাজ? থতমত থেয়ে খাতা বন্দ করে বলে,—বড্ড গোল মেলে হিন্দেব।

নিজের কেরামতির কথা ভেবে তৃপ্ত স্বরেই বলেন পিসে মশায়, হিসেব আবার সোজা হয় কবে? দাঁড়াও, বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—না না, বুঝেছি সব। বলছিলাম, উপার্জনের উপায়টা ভাল নয়—বে-আইনি।

এবার পিসেমশায় হেসে উঠেন, আরে বলে কি গার্ড সায়েবের বেটি? তোর বাবা—সে শালাত মদ খেয়েই সব ফুঁকে দিলে। থাকতো যদি এমনি একটি উপার্জনের উপায়—হুঁ।

বাকি কথা রইল অ-বলা, আর সেই অ-বলা কথগুলিই বলে দিলে তাকে, বাবার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্তই তাঁর মৃত্যুর পর থেকে সে আছে পিসেমশায়ের গলগ্রহ হয়ে। মা মারা গিয়েছিলেন আগেই—মা-বাপ-মরা মেয়েটিকে যত্ন করে নিজের বাড়ীতে আনেন পিশীমা বে-ওয়ারিশ মালের মতই পরের জিনিষ আপনু ভেবে। স্বামীকে বললেন, সাত নয় পাঁচ নয়, একটি মাত্র ভাই। বিয়ে দিয়ে যেতে পারে নি মেয়েটার, অঁহা।

পিসে খাটো গলায় বলেন, ভোমার ভাই ঝিটি ভ আর ডানা কাটা পরী নয় যে বিনা টাকায় লোকে যেচে এসে লুফে নেবে।

আড়াল থেকে সবিভা শুনলে। মারা মনের ভিতরটার ছি-ছির তুফান বয়ে গেল।

পিশীমাকে এসে বললে, বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিলুম। চাকরী পেয়েছি একটা। তুনি যদি কিছু মনে না কর—আর কোথাও গিয়ে থাকবো ঠিক করেছি।

—কোন চুলোয় যাবি? তিন কুলে কে আছে শুনি?

—গেইং গেইং হয়ে থাকবো কোথাও, না হয় টুইসনি—

চটেমটে পিশীমা বলেন, বুঝি না বাপু, লেখা পড়া জানা মেয়ের আঞ্জে। পিশীর বাড়ীতে থাকতে মন সরে না, যাবেন কোন ইঞ্জিল মিণ্ডিলের দোরে ধরা দিতে। না বাছা, একটি মাত্র ভাই আমার—

চাকরীর খবর শুনে পিশেমশায় গুণগুণ করে উঠলেন, —বেশ বেশ, দ্যাখোত হু ছুটো ছেলে—ঠায় বাড়ীতে বসে। পাশ্‌টাশও করলে না, কাজও জোটাতে পারেনি। ইয়া, বেতন কত দেবে বলেছে?

—আশী টাকা।

—ভাল। তা ছাড়া, কোন না হু টাকা উপরিও আছে।

সবিতা হেসে বলে, সে রকম কোন সুবিধা হবে না বোধ করি।

—ও তাহলে উপরির টাকা বুঝি পুরুষদেরই পাওনা। এটা কিন্তু ভাল নয়। আজকাল সমান অধিকারের দিন। ওসব ভাগ বাটোয়ারাও সমান হওয়া ঠিক।

একটু কেসে আসল কথাটা বুঝি করে বলে ফেলেন পিসেমশায়, কীই বা এমন তোমার হাত খরচ? বাকি টাকাটা আমার কাছে দিও রাখতে।

রণরঞ্জিনীর মূর্তি নিয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন পিশীমা। বললেন, না—ও টাকা তুমি ছুঁতে পারবে না।

আহা ছোঁব কেন? রাখতে দেবে বৈ ত নয়।—গলায় দড়ি দেব বলচি, ওর টাকা যদি তুমি নাও।

—কি মুন্সিল। মেয়েমানুষের বলে, দশ হাত কাপড়ে কাছা নেই।—রাখবে কোথা শুনি?

—পোষ্টাপিস-ব্যাংক যেখানে খুশী রাখবে, তোমার কি? ভাই ওকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে বলেছিল, দিদি, বিয়ে দিও। বিয়ের টাকা তুমি দেবে না এক পয়সাও তা জানি।

এমনি কত কি গজ গজ করে বলে গেলেন পিশীমা।...

বড় রাস্তা ছেড়ে আঁকা বাঁকা গলির ভেতর দিয়ে চলেছিল রিকশ সবিতাকে নিয়ে। গাড়ীর ভিড় নেই, রিকশওয়াল লাকাত লাকাতে কদমে চলে খানিকদূর, আবার একটুখানি আস্তে আস্তে হাঁটে। গলদঘর্ষ, ফতুয়া, ভিজ উঠেছে আর নিবাসও পড়েছে জোরে, হাপরের মত ভোস ভোস

করে। তার পানে চেয়ে সবিতার কেমন একটু মাংস হল। মাছুষ হয়ে করছে গরু ঘোড়ার কাজ—পেটের দায়ে।

—তোমার নাম কি?

—বুধন।

—বাড়ী কোথা?

—আজমগড় জিলা।

—কত রোজগার কর রিকশ টেনে?

সবিতার গলার সুরে ছিল একটু কোমলতা। বুধন মুখ খুলে গেল। সারা পথ চললো সে বকতে বকতে একটি রিকশ ভাড়া খাটান কিছরবাবু হু দুজনর কাছে বেলা তিনটে পর্যন্ত খাটে বুলাকি, তারপর আসে তাং পালা। একটি করে টাকা ভাড়া দেয় সে আর বুলাকি তা ছাড়া পঁচিশ টাকা জমাও দিয়ে রেখেছে তারা। দিনের রোজগার পাঁচ ছ খেপে হু টাকা, বড় জোর আড়াই টাকা একবেলা ধায় হোটলে, একবেলা ভাঙ্গাভুজি। বাসস্থান নেই বলেই হয়—রাত্রে যখন ক্লান্তি আসে, চোখে পাতা দুটোতে ঘুমের ঘোর লাগে, ফুটপাথের ওপরই নেতিয়ে পড়ে সে তখন, মাথাটি রাখে রিকশের পাদানের ওপর।

মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে শুনতে সবিতার মদরদে ভরে উঠলো। এত ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি চারিদিকে প্রাসাদের মত দালান, চোখ ঝলসানো সারি সারি দোকান সবই যেন ধোঁয়ার মত উড়ে গিয়ে পড়ে রইলো শুধু এই রিকশওয়ালার রূপ-রস-হীন কঠিন জীবন। আহা—কত কষ্ট ওর। এত পরিশ্রম করে উপায় করে লোকটি। তাও ওপরও দাঁত বসাতে ছাড়েন না পিশেমশায়; কেমন মাছুষ।

ওস্তাগর গলির মোড় ঘুরে রিকশ থামলো পিশেমশায়ের বাড়ীর সামনে। হাতব্যাগটি খুলে সবিতা ভাড়া দিতে যাবে, বুধন জিব কাটলে, হাত ঘোড় করে বললে, মাপ কিজিয়ে। মালিককো লেড়কি, ভাড়া লিতে-কি পারি দিদি?

—না না, সে কি হয়? তুমি গরীব মাছুষ।

—মেহেরবান রাখবেন দিদি হামার ওপর। বাপ জানকে বলবেন—

রিকশ তুলে নিয়ে নে চলে গেল।

কাতর বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সবিতা। হরিকিছর তার বাবা, লোকটির এই ভুল ধারণা-ভাংতে গোড়ায় তার

আগ্রহ হয় নি। এখন হঠাৎ মনে হল চীৎকার করে ডেকে বলে তাকে,—ভুল বুধন, ভুল। কিছুরবাবুর সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ তার নেই। তার বাবা ছিলেন—অনিল রায়—রেপের গার্ড, বাবু নয় মিষ্টার। উলটপুরাণের বিধানে দেশী হাতীর সোজা গড়ানো শুঁড়টি আকাশ পানে ওঠে বিদেশী উটের বাঁকা গর্দানের মত—তেমনি অনিল রায় নামটি বদলে গিয়ে হল মিঃ আর ও নীল। সুফা বহু মানুষ, হেলে কাজ করে—এক গেলানের ইয়ার। রগড় করে বলে, তোফা যোগলাই নাম। ও এন্ ই আই এল—ও নীল। বেমানুম আইরিশ। তোর বাবা ছিলেন বুঝি একজন আইরিশম্যান ?

খাড়া নেড়ে গম্ভীরভাবে বলে সে, বাপ নয়—ধর্ম বাপ।

—একা রামে রক্ষে নেই, বাপের ওপর আবার ধর্ম বাপ। সে আবার কে ?

—বাবা কাজ করতেন পুলিশে। একবার এলেন একজন পুলিশ সায়েব—খাস আইরিশ, নাম মাইকেল ও নীল। আমায় দেখে ভারী খুশী হলেন। বললেন, লেট মি বি হিজ গড ফাদার—

টিপ্পনি কাটলে সুহৃদ,—এগু গড সেইড লেট দেয়ার বি লাইট এগু দেয়ার ওয়াজ লাইট। হাঃ হাঃ—

রেল কলোনীর দেশী পাড়ার ছোট্ট একটি কোয়ার্টার, সায়েবদের মত আদৌ নয়। কিন্তু সেই ঘুপটির দরজায় ঝোলে বাহারে পরদা, জানালায় আগড়। ঘরে সায়েবিয়ানার ফাষ্ট লাস্ট পর্যন্ত—বাইরে কাজকর্মের ফাঁকে ক্লাবে বসে অনিল মদ টানে, মুগী খায়। সেই অনাচারগুলিকে বাঁড়ী বয়ে আনতে দেয় না বো। বলে, ছেলেপুলের ঘর, চোখের আড়ালে যা খুশী কর কেউ দেখতে যাবে না। অনিল বোঝে, তার গুটি নিষ্ঠাকে, অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধাই করে। কোন মেম সায়েব পারবে অমন পায়রাঁর খোঁপের মত ছোট্ট রান্নাঘরটিতে বসে শাক চচ্চড়ী রাঁধতে। মন্দই বা কি শাক চচ্চড়ী, তবে ইয়া—মাঝে মাঝে মুখ বদলানো দরকার। রাত্তির বেলা গার্ড সায়েব ফেরেন খোস মেজাজে শিব দিতে—খোঁকা ঘুমিয়ে পড়েছে, সবিতা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। গার্ড সায়েব ক্রমাল বের করে মুখে ধরেন—ইউক্যালিপটাসের গন্ধ মাথানো ক্রমাল; সেই গন্ধে মদের গন্ধ ঢাকেন। সবিতা

বলে, সর্দি করেছে বুঝি ? রোজই তোমার সর্দি বাবা।— কথা বলতে সাহস পায় না অনিল, পাছে মেয়ে টের পায়। বারান্দায় বুট জুতো জোড়া খুলে ঘরে ঢোকে, সরমাকে বলে, 'আজ আর কিছু খাবো না।'

সবিতার মনে পড়ে একটি দিনের কথা যেদিন প্যাকেটের ভেতর নিয়ে এসেছিলেন বাবা, তার আর খোঁকার জন্য জামা ফ্রক চকলেট টফি, মার জন্য ঢাকাই শাড়ী আর ব্লাউস পিস, আর নিজের জন্য পাইপ টোবাকো পাউচ।

গালে হাত দিয়ে মা বলে ওঠেন, ওমা, কাণ্ড দেখেছ ? খেতে কুলোয় না, আর এই সব।

নতুন জামা কাপড় হাতে সবিতা আর খোঁকা কাড়াকাড়ি জুড়ে দিয়েছিল চকলেট টফি নিয়ে। আমি নেব টফি...না বাবা আমায় টফি দাও...বেশ ভাগ করে নাও চকলেট আর টফি...না না, গোটা প্যাকেট দাও...জিস্ গোটা প্যাকেট না হাতী, ছেলের আবদার দ্যাখো...

কৌতুক ভরা স্নেহের দৃষ্টিতে দুটি ভাই বোনের পানে চেয়ে বাবা বলেন, দ্যাখো ত টাকা খরচ সার্থক কিনা। আর আজ খরচ করবো না ত করবো কবে ? প্রমোশন হয়েছে—ডাক গাড়ির গার্ড, ইউরোপীয়ান স্কেলে মাইনে।

সেদিনই রাত্তির বেলা সবিতা মাকে শুনেছিল ফিস ফিস করে বলতে,—গাড়িতে চড়ে বেড়াও, আমোদ আহ্লাদ কর। যরের পানেও ত একবার চেয়ে দেখতে হয়।

—কেন ? কি হয়েছে ?

—মেয়ে বড় হয়েছে। বিশ্বের জোগাড় দেখ।

—আচ্ছা। নেব খোঁজ খবর। বলে বাবা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

তারপর একদিন মা সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন সবিতাকে বাইরের ঘরে। দুটি ভদ্রলোক বসে সেখানে, সবিতা চাইলে তাদের পানে ভয়ে ভয়ে। মনে হল, রাঁধুনী যেমন খুশি দিয়ে নেড়ে চেড়ে মাছ ভাজে, তাদের চোখের দৃষ্টিও তেমনি তার দেহখানিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উলটে পালটে দেখছে।

প্রশ্ন করলেন একজন, কোন ইস্কুলে পড়েছে ?

বাবা বললেন, বাডীতেই পড়ে।

ইস্কুলে পড়ে না—সে কি ! কি পড়ছ মা ?

সবিতা লজ্জা পেয়েছিল। অক্ষুট স্বরে বললে, তৃতীয় ভাগ।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, ইউরোপীয়ান স্কুলের গার্ড আপনি, মেথেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন না কেন? কী-ই বা এমন বিয়ের তাড়া?

বাড়ির ভেতর এসে আফালন করেই অনিল বলেছিল সেদিন সরমাকে—, দ্যাখোত, কি অপ্রস্তুতটাই হওয়া গেল। কালই সবিতাকে কনভেনটে ভর্তি করে দেব।

তা বটে। দিন কাল বদলেছে, বদলায় নি শুধু সরমার শোবার ঘরের কোনের ঠাকুরটি যাকে সে সকালে সন্ধ্যায় জ্বাল দিয়ে ভক্তিভরে পূজা করে। নোলক মাকড়ি মল গেছে, বার বছরে মেয়ের বিয়ে, তাও গেল। যাক, শুধু থাকে যেন একটু বিশ্বাস, ভগবানে বিশ্বাস। পিছনে দাঁড়িয়ে গার্ড সাহেব দেখেন তার সেই ভিন্নর আত্মবিশ্বস্ত-ভাব। কি সে ভাব তা বোঝেন না, মনটা তবু কেমন নান্দা দিয়ে ওঠে। হাত দুটি ষোড় করে বকে রাখেন, মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে যান পা টিপে টিপে।

তারপর একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে সবিতা যে দৃশ্য দেখেছিল তা সে জীবনে ভুলবে না কখনো। রক্তাক্ত কাপড় দিয়ে ঢাকা মাংস পিণ্ড—লোক জমেছে চার ধারে। তাদেরই মাঝে মৃতদেহের ওপর লুটিয়ে পড়ে সরমা কাঁদছে; চীৎকার করে নয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—থোকারে, ওরে আমার মানিক—

গার্ডের পোষাক পরা অনিল হাঁটু গেড়ে বসে দু হাতে চেপে ধরেছে সরমাকে। সাব্বনা দিয়ে বলছে, শান্ত হও কেঁদো না।

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামে, টস টস করে পড়ে সরমার আলু থালু চুলের ওপর। সরমার চোখের জলে মাটি ভিজে ওঠে, কিন্তু পৃথিবী ভেসে গেলেও থোকা আর ফিরবে না। রেলের লাইন পার হতে গিয়ে কাটা পড়েছে তাক গাড়িতে। আর সেই গাড়িরই গার্ড অনিল—নিজের চোখে দেখেছে সে, কি করবে? নিরুপায়।

এই শোক সরমা আর সামলাতে পারে নি। তাকে ধরলে যক্ষ্মা রোগে। তখন কী গুজবাই না তার করেছিলেন বাবা। নাসের ওপর ভরসা করেন নি, সারাটি রুগ রোগিণীর পাশে বসে পরিচর্যা করেছেন। কে জানতো, এই সায়েব মাহমুদটা

অমন করে ভালবাসতে পারে এক সাদাসিদে বাঙালী মেয়েকে। কোথা গেল তাঁর ইউরোপীয়ান ইনস্টিটিউট, হাই স্টেজ ব্রিজ, খানাপিনা, মাকে ক্ষেলে তিনি আর কোথাও নড়েন না। ক্লাবে গিয়ে মাতামাতি পছন্দ করে নি সরমা কোনদিন। আজ সে নিজে থেকেই বলে, যাও না, ঘুরে এস ক্লাবে একটু। ঘাড় নেড়ে বলেন বাবা, ভাল হয়ে ওঠ, তখন যাব।

মা ভালো হল না, মারা গেল। অমন কেতাদোরস্ত ফিটফাট হাসি খুশী মাহমুদ গার্ড সায়েব, এখন দেখলে তাকে যেন চেনাই যায় না। চুলগুলি উসকো খুসকো, সব সময় আনমনা, দু একদিন কামাতেও ভুলে যান। গভীর রাত্রে ইনস্টিটিউট থেকে বাড়ি ফেরেন। সকাল বেলা সবিতা তার ঘরে গিয়ে দেখে, জুতো না খুলেই শুয়ে পড়েছেন বিছানায়, নিখাসে প্রাণসে ভক ভক করে বেরোয় মনের গন্ধ। আজকাল বড্ড বেশী মদ খাচ্ছেন বাবা। জীবনটাকে এমনি করে নষ্ট করবেন না কি? সবিতার চোখ জলে ভরে ওঠে।

—তুমি কি ভাব বাবা?

—ভাবি? কৈ না, হ্যাঁ তোর বিয়ের ভাবনা। একটু ভাবতে হয় বৈ কি?

—না বাবা। ও সব তোমায় ভাবতে হবে না।

—তোমার বড় সাধ ছিল—বলতে বলতে তার দৃষ্টি স্নান হয়ে আসে।

একদিন কাঁকা মুটের মাথায় ফুলকপি বাঁধা কপি শাক সবজি, মুরগী মটর চাপিয়ে অনিল এসে দেখা দিল ঠিক যেন সেই আগের দিনের গার্ড সায়েব। এমন ফুর্তি তার অনেক দিন দেখে নি সবিতা।

হাসতে হাসতে বললে, সুহৃদকে মনে আছে সবিতা? সেই যে আমায় ক্ষেপাতো—বলতো, গড ফাদার নার্ম দিয়েছিল ও নীল, কিন্তু রংটা যে কালো। বিলেত থেকে ফিরতে পথে ব্র্যাক সি-তে ডুব গিয়েছিলে বুঝি? এইবার চিনলি ত? সুহৃদ এসেছে এখানে স্টেশন মাষ্টার হয়ে। দেখেই বলে, হ্যাঁরে তুই যে আর ও নীল নেই—একেবারে খ্যাচাটু। হাঃ হাঃ—

তারপর সবিতার পানে টিপি টিপি চেয়ে বলেন, সুহৃদকে খেতে বলেছি। একটু অর্থ আছে। তার ছেলোট-রেল

ভাল কাজ পেয়েছে, উপযুক্ত পাত্র। তার সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পেড়েছিলুম। মত আছে বলেই মনে হল।

উৎসাহ ভরে সবিতা রান্নার আয়োজন করলে। সন্ধ্যা বেলা পরলে ভাল একখানা শাড়ি রাউজ, ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মুখখানি দেখতে দেখতে প্রসাধনের কাজ শেষ করলো। পেগ টেনে দুই বন্ধু বসলো খেতে, যত্ন করে পরিবেশন করলে সবিতা, স্তিমিত দৃষ্টিতে স্নহদ চায় তার পানে, যেন কালোয়ানি গানের তারিফ করছে এমনি ভাবে থেকে থেকে বলে ওঠে, বাঃ। বেড়ে, খাসা!

—পছন্দ হয়েছে ত?

—খুব।

—তা হলে আর কি? একটি দিন দেখে—

—নিশ্চয়—নিশ্চয়—

খাবার পর উঠে গিয়ে ব্রহ্মই কমে বসলো তারা! হাসির গররা উঠলো, সবিতা শুনে অনিল বলছে, চার চারটে ওল্ড টম। কত খাবি খা। ঠুং ঠুং গেলাসের শব্দ। ঢল ঢল স্পিরিটের সঙ্গে ফুটিও ওঠে চাঙা হয়ে। অনিলের জড়ানো গলা শোনা যায়, কেয়াবাং। এমন নৈলে বেয়াই। আয়রণ কিং, কোল কিং, তুই হচ্চিস বেয়াই কিং।

গান ধরে ইংরেজিতে—Would you.

গানটা ইনস্টিটিউটে সায়েব মহলে শুনেছে সে, নেশার আয়েজে মকশও করেছে কয়েকবার।

বিছানার ওপর শুয়ে সবিতার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছিল, তন্দ্রা ভাংলো হঠাৎ বন্ বন্ শব্দ শুনে। উৎকণ্ঠায় কান পেতে রইলো সে। দুই বন্ধুর ফুটি তখন হাসির পালা শেষ করে ঝগড়ার পর্যায়ে উঠেছিল। টেবিল চাপড়ানো চলছে—গেলাস উড়ছে।

স্নহদের চড়া গলার আওয়াজ শোনা গেল,—শালাব খ্যাচাটু। হংকুচ্ছিৎ পেত্নীটাকে গছাতে চায় কার্তিকের মত ছেলেকে।—একটা কুংসিত গালাগালি দিল।

—কি বললি, রাস্কেল!—গর্জন করে উঠল অনিল।

দাঁড়া—দেখাচ্ছি—

—ওরে বাবারে—মেরে ফেললে রে—

সবিতার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। ধড়মড়িয়ে উঠে ঢুকলো সে বৈঠকখানা ঘরে। ড্রয়ার খুলে পিস্তল

বের করেছেন বাবা, হাত কাঁপছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছেন নিশানা করতে পারছেন না। ঘরের কোণে একটি টিপয়ের নীচে মাথা গুঁজে উত্থানশক্তিহীন স্নহদ ঘোষা কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করছে।

বাবাকে হুহাতে জড়িয়ে ধরলে সবিতা, পিস্তলটা সরিয়ে নিলে বললে, চল ওপরে—

অনিলের মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল। সটান গুঁয় পড়ে বললে, ভাগ্যিস এসে পড়েছিলে। হয়ত খুনই করে বসতুম গুয়ারটাকে।

চোখ বুঁজে রইলো সে, চোঁট দুটি কাঁপতে লাগলো। মাথায় কপালে অর্ডিকলোনের ছিটে দিলে সবিতা, নীচ হয়ে বুঁকে শুনে, বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছেন বাবা,—সরমা, সরমা, তোমার মেয়ের অপমান—উঃ;

অনেক দিন দেখা নেই বুধনের সঙ্গে। আজ ট্রাম থেকে নেমে বাড়ি ফেরার পথে সবিতা দেখলে, সে আসছে তারই দিকে এগিয়ে। সঙ্গে নেই রিকশা। মুখখানা শুকনো বিষন্ন।

—কি রে বুধন। অসুখ করেছে না কি?—জিজ্ঞেস করলে সবিতা।

কপালে করাঘাত করে সে বললে, সব পরমাল হয়ে গেছে। ভারি মুশ্কিল—হায় হায়।

—সে কি! কি হলো?

দুর্ঘটনার লম্বা বিবরণ দিলে বুধন। সে দিন চৌমাথা পার হবার সময় ভারি একখানা লরি জোরে এসে ধাক্কা দিলে রিকশাখানাকে। হালকা গাড়ি, ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। শুনে কিঙ্কর বাবুর কি রাগ, এই মারে ত এই মারে। বলে, রিকশাখানার পুরো দাম তিন শ টাকা কান মলে আদায় করবো। পুরোনো রিকশা কমে সমে রফা করার কথায় যে কটু কাটব্যটা করলেন তিনি, তা যদি শুনতেন দিদি—

একটু উদ্ভাভরেই সবিতা বললে, কেন দিবি টাকা? আর কোথাও একখানা রিকসা জোগাড় করে নে।

অবাক হয়ে তার পানে চায় বুধন। চাউনিতে ফুটে ওঠে প্রশংসা, সজ্জব। মেয়ের মুখে বাপের অন্যায়ের প্রতিবাদ আশ্চর্য বটে, মনোজ্ঞও বটে। কিন্তু লেখা চুক্তি

আছে, সেই চুক্তির খেলাপ কেমন করে করবে সে? আমতা আমতা করে বলে,—ধর্ম ত আছে দিদি। টাকা না দিলে অর্থ হয়বে য়ে।

ঘনসির মত করে বাঁধা ট্যাকের জালি থলে দেখিয়ে বলে, মাত্র দুশো টাকা আছে তার। অনেক দিন ধরে জমিয়েছে। এ টাকা গেলে তার আর বিয়ে হবে না। বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

ল্যাম্প পোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে সবিতা তার কথাগুলি শুনে গেল। বুধনদের জাতে মেয়ে কিনতে হয় টাকা দিয়ে। কেনা ঠিক নয়—এ টাকা দিয়ে মেয়ের বাবা দেয় গয়না গড়িয়ে, বিয়ের খরচ পত্রও করে। তাদেরই গাঁয়ের মেয়ে, বেশ পছন্দসই—লায়েক হতে চলেছে। কথাবার্তা সব ঠিক, চার শ টাকা দেবে সে বিয়ের সময়। দেড় বছর রিকশ ঠেলে এ কটি টাকা—হায় হায় সবই ধাবে বরবাদ। বাপজানকে বলে দিদি যদি দাবীর কিছু কমিয়ে দিতে পারেন—

সবিতার চোখের সামনে ঝড়ের মত বয়ে গেল—

তার নিজের জীবন, বাবার জীবন। তাকে বিয়ে দেবার কী চেষ্টাই না করেছিলেন তিনি, কত অপমান নিয়েছিলেন মাথা পেতে। মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল—তা হোক, দরদ ছিল, মমতা ভালবাসা ছিল। ছিল না, একসম্প্রদেয়—প্রফিট মোটিভ।

হঠাৎ বলে উঠলো সে, কিছু ভাবিস না বুধন। রিকশর দাম আমি দেব।

বুধন যেন হাতে চাঁদ পেল। হাত কচলালে, দিদি—

—দেখিস, কেউ যেন না জানে।

—নেহি দিদি। বাপজান কুছু জানবে না।

দপ করে জলে উঠলো সবিতা,—কে আমার বাবা? হরি কিঙ্কর বাবু? না। তিনি আমার মহাজন। আমি তাঁর ধাতক। এ টাকার হবে তাঁর স্বর্ণ শোধ।

চলে যাচ্ছিল সে, ফিরে দাঁড়িয়ে ডেকে বললে বুধনকে,—আথ, কতকাল আর রিকশ টানবি? বিয়ের টাকা আমি দেব। দেশে ফিরে যা তুই।

স্মরণীয় যঁারা—কবি প্রসন্নময়ী—

জীবলা দে।

আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে আমাদের বাংলা দেশের সমাজব্যবস্থা, আচার ব্যবহার, স্ত্রী স্বাধীনতা ও শিক্ষা সংস্কৃতি যে কতদূর সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ ছিল তা আজ সহজেই অনুমেয়। ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে সেই অন্ধকারময় যুগে সামান্য এক গৃহনারীর পক্ষে শিক্ষা দীক্ষার প্রতি একাগ্রতা থাকা, অন্তরের সহজাত অনুপ্রেরণার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শিক্ষার ধারাকে আঁকড়ে ধরে থাকা কত কঠিন কাজ ছিল। সে দিনকার সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে যখন সবেমাত্র নতুন ভাবের ছোঁয়াচ লেগেছে বাংলা দেশে সেই সময় ১৮৫৬ সালের ১৪ই আশ্বিন, পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে কবি প্রসন্নময়ী জন্মগ্রহণ করলেন। উত্তর বঙ্গের প্রসিদ্ধ চৌধুরী জমিদার বংশের খ্যাতনামা দুর্গাদাস চৌধুরীর তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক

৬প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ভগ্নী। কবি প্রসন্নময়ী অন্তরের সঙ্গে শিক্ষাকে গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের তীব্র প্রতিবাদ করতে বিন্দুমাত্র ভীতা হলেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের প্রভাবে আমাদের দেশের নারীরা যে স্বদেশীয় সমাজ ঐতিহ্য ও প্রাচীন সংস্কৃতি রক্ষা করে চলতে পারছেন না, সে বিষয় দুঃখ করে প্রসন্নময়ী লিখেছেন—“আমার জন্য সংসারে এক পৃথক ব্যবস্থা হলো। ইংরাজি শিক্ষা, শিল্পকলা প্রভৃতি শিখবার জন্য একজন ফিরিঙ্গী যেম নিযুক্ত হলেন। তবে দুঃখের বিষয় আমি তাঁর কাছে লেখাপড়া কতদূর শিখেছিলাম তা জানি না—কিন্তু তাঁর কাছ থেকে বিদেশী ক্যান্টনটা আয়ত্ত করবার জন্য যে পুরোদমে লেগেছিলাম সেটা তীক্ষ্ণ স্মরণ আছে। আর তা স্মরণ আছে বলেই আজও লজ্জা অনুভব করি।”

কবি প্রসন্নময়ীর প্রথম কবিতা পুস্তক হচ্ছে “আধভাষিণী।” বইখানি অপূর্ব অনবদ্য। তারপর ‘বনলতা’, ‘আর্য্যাবর্ত’, ‘নীহারিকা’, ‘ভারচরিত’, ‘পূর্বকথা’ ইত্যাদি। তাঁর ‘পূর্বকথা’ বইখানি পড়লে মনে হয় সেকালের জীবন্ত ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে—বইখানি সত্যি বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পদ।

কবি প্রসন্নময়ী যে শুধু কবিতা লিখেই সে যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তা নয়। তাঁর রসরচনাও অতীব সুন্দর। এখানে তাঁর অপ্রকাশিত রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি। “এখন হতে আমাদের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদের আর অন্নপ্রাশন করা বনা। প্রায়োপবেশন করা। আজ কাল দেশের অর্থ বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে; (মাস্তুরের) শক্তিশূন্য হাত পা, ঘোর দুর্ভিক্ষে কঙ্কালসার, আর শ্রীগৌরাজ ভাবে আড়ষ্ট, শুধু গলাবাজিতে পটু। হাওয়া খেয়ে আর কতকাল চলবে? তাই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বায়ু সেবন শিখলে অন্ন বা উদর চিন্তা থাকবে না এবং সকল জালাও শেষ হবে।”

বাংলার মহিলাদের মধ্যে অতি প্রাচীন যুগেও বিদুষীর

অভাব ছিল না। একশত দেড়শত বৎসর পূর্বে যখন বাংলার অন্ধকার যুগ তখনও অনেক শিক্ষিতা মহিলা এ দেশে ছিলেন। তাঁরা শুধু লেখাপড়া জানতেন না, অসাধারণ পণ্ডিত বলে খ্যাত ছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের সময় বিদুষী আনন্দময়ী দেবী জীবিত ছিলেন। হট্টা বিদ্যালঙ্কার, দ্রবময়ী, চন্দ্রাবতী ইহাঙ্গও শতাধিক বর্ষ পূর্বে বিদুষী বলে খ্যাত ছিলেন। স্বতরাং গত শতাব্দীতে প্রসন্নময়ী স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি যে সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় দেবেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। প্রসন্নময়ীর জীবনে স্বযোগ আরও অধিক পেলে তিনি সেই প্রতিভার দীপ্তির আরও বিকাশ দেখাতে পারতেন।

চৌধুরী বংশে আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে রসগ্রাহিতা ও সাহিত্য সৃষ্টির শক্তি বিকশিত হয়। প্রসন্নময়ীর কবিত্বশক্তি ক্ষুটতর ও পূর্ণতররূপে দেখা দেয় তাঁর কন্যা প্রিয়ষদা দেবীর মধ্যে। প্রিয়ষদা দেবীর কবি প্রতিভার নিজস্ব একটি বিশেষত্ব ছিল, যার জন্য তাঁকে মহিলা কবি নামক সন্মার্গ আখ্যা না দিয়ে শুধু কবি নাম দেওয়াই উচিত।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীবলা দে

গঙ্গাজলী

শ্রীশৈল মিত্র।

বিট্ পালংএর ফ।

শ্রীশৈল মিত্র

উপকরণ :—পোনা, ভাঙ্গন কিংবা ভেটকী যে কোন মাছ, বিট্ পালং, কড়াইগুটি, আদা বাটা, লঙ্কা বাটা, পেয়াজ বাটা, ফুল কপি, কিসমিস, (দই বেশী) তেজপাতা, গরম মশলা।

প্রণালী :—প্রথমে মাছ কুটে ধুয়ে রাখুন। এবার সরু সরু করে বিট্ পালং, ফুল কপি, কড়াই গুটি, মাছ, (দই বেশী লাগবে) দৈয়ে ভিজিয়ে বা মাখিয়ে রাখুন। অন্ততঃ ঘণ্টা দুই থাকবে। এবার কড়াতে ঘী দিয়ে, তেজপাতা, গরম মশলা, পেয়াজ বাটা, আদা বাটা, লবণ, চিনি দিয়ে নাড়ুন। বেশ লাল হলে ঐ দইয়ে ডোবান মাছ ইত্যাদি সাঁতলে দিন। সামান্য জলের কাপটা দেবেন। থকথকে হলে নামান।

একটা সুপক নারিকেল লইয়া খোসা ছাড়াইয়া ভাল করিয়া ধুইয়া কোরাইবে, দেখিবে উহাতে যেন কোন প্রকার ময়লা না পড়ে। এখন ঐ নারিকেলের দুধ পিষিয়া বাহির করিয়া নারিকেল উত্তমরূপে ধুইয়া ঝাঁকরিতে রোজে রাখ, যেন সব জল বারিয়া গিয়া নারিকেলগুলি শুকনা বস্তু বরে হয়। পরে একখানি কড়াতে মৃদুতাপে নারিকেলগুলি চড়াইয়া খুস্তি দ্বারা নাড়িতে থাক, যখন দেখিবে একটু মচমচে ধরণের হইয়াছে, তখন আধপোয়া চিনি উহাতে দিয়া নাড়িবে। চিনি ও নারিকেল মিশ্রিত হইয়া যখন বেশ মচমচে হইবে তখন কিছুক্ষণ নামাইয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিবে, পরে উহা উত্তমরূপে বাটিয়া খুব পাতলা নেকড়ায় ছাঁকিয়া লইবে। ছাঁকার পরে গুঁড়াগুলি বেশ পাউডারের মত নিখিল হইলে পরে ইচ্ছামত ছাঁচে

ফেলিতে পার, ছাঁচের উপরে একখানি খুব পাতলা নেকড়া আঁপে আঁপে তুলিয়া লইবে। ইহাই গম্বাজলী, ইচ্ছা দিয়া, তাহার উপরে গুঁড়ি বেশ শক্ত করিয়া টিপিয়া হইলে ইহাতে কর্পূর এলাচের গুঁড়া দেওয়া যাইতে দিতে হয়। এইরূপে টেপা হইলে নেকড়াখানি ধরিয়া পারে ॥

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ।

ষ্টকহল্‌মে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী

কলীয়াস্ব ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁহার কন্যা কুমারী তারা ও কুমারী চন্দ্রলেখা সহ এক কৃষি সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইয়া বিমানযোগে ষ্টকহল্‌মে গিয়াছেন। ভারত নারীর এই সম্মানে আমরা গৌরবান্বিত।

বুদ্ধ পূর্ণিমা মহিলা সম্মেলন

বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ, বুদ্ধজন্ম ও পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত দিবস ভারতবাসী ও জগতের বৌদ্ধগণের একটি পবিত্র স্মরণীয় দিবস। স্বাধীন ভারতে প্রথম বৌদ্ধ পূর্ণিমা দিবস মহাবোধি সোসাইটির উদ্যোগে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার স্থিত ধর্মরাজিক বিহারে সন্মারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। চীনা অধ্যাপক তানয়ুন সান পৌরোহিত্য করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার অহুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্রাষ্ট্রের যুবরাজ ধনীনিবাস বলেন—দেহ নীড়িত জগৎকে একতাস্থ্যে গ্রথিত করিবার নেতৃত্ব এবং বুদ্ধের অহিংসাবাদী প্রচারের ভার স্বাধীন ভারতকে পুনরায় গ্রহণ করিতে হইবে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মসিয়া জুরনো, শ্রীযুগল কিশোর বিড়লা, সিংহলের হেবাবিতারণ আদি আন্তর্জাতিক স্বধীগণ এই অহুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই অহুষ্ঠানের এক বিশেষ অঙ্গ মহিলা সম্মেলন। 'বঙ্গলক্ষ্মী' সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর এই সম্মেলনে সভানেত্রী করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রাণের আকুলতা প্রকাশ করিয়া বুদ্ধের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী ও তাঁহার শিশুকন্যা বুদ্ধ প্রগতি আয়ত্তি করিয়াছিলেন। শ্রীমতা ঘোষ বুদ্ধ বন্দনা সঙ্গীত করিয়াছিলেন।

এইরূপ সম্মেলন মহাবোধি সোসাইটিতে মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হইলে ভারতের গৌরবময় কৃষ্টির ও সঙ্কল্পের আলোচনা, পরিচয় ও প্রসার লাভ করিবার সুযোগ হইবে। জামসেদপুরে শ্রীমা প্রসাদ বিদ্যাভবনে পারিতোষিক বিতরণ

২রা জৈষ্ঠ জামসেদপুরে শ্রীমা প্রসাদ বিদ্যাভবনের পারিতোষিক বিতরণের অহুষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাইস-চেন্সেলার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে হইয়াছিল। ধলভূমের উন্মুক্ত পাহাড়ীয় পল্লী প্রাঙ্গণে পারিতোষিক বিতরণের সভায় যখন বালিকারা বঙ্গমাতা ও বঙ্গভাষার জয়গান করিতেছিল তখন বাংলার সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। পর পর বাঙ্গালী মেয়ের সহিত যখন আদিবাসীদের কন্যাগণ (সাঁওতাল) আয়ত্তি করিয়া পুরস্কার গ্রহণ করিতেছিল তখন বিদ্যালয়ের কাজে গৌরব অনুভব করিয়াছিলাম। এই 'শ্রীমা প্রসাদ' মধ্য ইংরাজী স্কুলের ভিত্তি জামসেদপুর শহরতলিতে ৪ বৎসর পূর্বে ডাঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং গত বৎসর মেজর জেনারেল এ, সি, চ্যাটার্জি ইহার ছাত্রী বিভাগের ভিত্তি স্থাপন করেন। এইরূপ বিদ্যালয়গুলির প্রসার বৃদ্ধি হইলে আদিবাসীদের সম্মানগণ বাংলা ভাষা শিখিবার সুযোগ পাইবে। বাঙ্গালী নরনারী মাত্রেই এই জামসেদপুর শিক্ষা সমিতিতে অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন।

নারী পুলিশ—বিদেশীয় শাসন ও শিক্ষার ফলে ভারতীয় নারীগণের মধ্যে অপরাধ করিবার মূহা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের সাংস্কৃতিক ও ধর্মজ্ঞানের প্রভাবে ভারতের নারীগণের মধ্যে জন ও সমাজের অকল্যাণকর অপরাধ খুবই অল্প সংঘটিত হইত। পশ্চিম বঙ্গ সরকার জ্বীলোকদের অপরাধমূলক কার্যকলাপ আবিষ্কার ও দমন করিবার করিবার জন্ত পুলিশবাহিনীতে এক শত নারী পুলিশ নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে নারী পুলিশের প্রয়োজন হইতে পারে এবং নারী পুলিশ থাকিলে মেয়ে অপরাধী ধরিবার এবং তাহাদের নারীহীন মর্ধ্যাদা রক্ষার সুবিধাও হইতে পারে। তবে আশঙ্কা হয় বিদেশী শাসনের অনুকরণে এই নারী পুলিশ বাহিনী গঠিত হইলে দুর্নীতির প্রশ্রয় বৃদ্ধি না পায়। নিয়োগের সময়ে ইহার প্রতি কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

পরলোকে কমলা দেবী

কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁহার নিকট আত্মীয় কমলা দেবীর মৃত্যুতে গাহিয়াছেন—

মাহুষ চলিয়া যায় রয় না ধরায় চিরদিন

জন্মে-মরে, ফোটে-ঝরে, মহাকাল চির উদাসীন।

রাখিতে পারেনি ভূপ সাজাহান মমতাজে বাধি
শৌর্যদীপ্ত মমতায়। আমি কবি তবু কেন কাদি?
কমলা দেবী ডাঃ গৌরীজ কুমার গুপ্ত, এম, এ, বি,

এল, পি-এইচ, ডি, ব্যাবিষ্টার মহাশয়ের পত্নী। ইনি
জনপ্রিয় সমাজ সেবিকা ও নানাজীড়ামোদাদির প্রতিষ্ঠানের
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সাময়িকী

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ

দুর্যোগ. বাংলার বুকে ক্রমশঃই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান দুর্যোগে বাংলাকে বাঁচাইবার প্রয়াস কাহারো নাই; বরং ষষ্ঠরোধ করিবার একটা ষড়যন্ত্রই যেন চতুর্দিকে চলিতেছে। প্রাণশক্তি খর্ব করিতে বৃটিশ সরকার বাংলার বুকে অনেক অত্যাচারের-প্লাবন আনিয়াছিল, কিন্তু আটগা উঠিতে পারে নাই। ভবিষ্যৎ কণ্টকিত হইতে হয় যে, বৃটিশ সরকার বাহা করিতে পারে নাই, স্বাধীন ভারতে বাংলার কি তাহাই হইবে? সেদিনের দুর্যোগে বাঙ্গালী অবনত মস্তকে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, কারণ মেরুদণ্ড তখন তাহার খর্ব হয় নাই। কিন্তু স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালী মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অশ্রুতম কারণ, বঙ্গবিভাগ এবং প্রাদেশিকতার জঘন্য মনোবৃত্তি।

পূর্ব বঙ্গবাসী অসহায় বস্তুত্যাগী দল বড় আশায় ভর করিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রভুক্ত আনামে গিয়াছিল। “বঙ্গাল” তাড়ানোর যে অভিনব অভিযান তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া গেল, মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সহিত তাহাকে তুলনা করিলে বোধ হয় অত্মায় বা অত্যাচার হয় না। এদিকে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া বিহার প্রদেশের সহিত মন কষাকষি চলিতেছে। ইহারও যে সহজে সমাধান হইতে পারিবে, সে প্রকার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইংরাজ নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষার্থে বাংলার যে যে অংশ ছিন্ন করিয়া নিয়াছিল, সেই সেই অংশই বাংলা ফিরিয়া পাইতে চাহিতেছে। বাংলার এই দাবী যেমন ত্যাগ তেমনি ত্যাগ সম্ভব, অধিকন্তু ঐ সকল অঞ্চল সমূহ পশ্চিম বাংলার একান্ত দরকার। পশ্চিম বাংলার আয়তন অতি সামান্য, বাংলার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে বিহারের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল সমূহ বাংলাকে পাইতেই

হইবে। পূর্ব বঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের স্থান কুলন পশ্চিম বাংলায় হইতেছে না। পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের প্রতি যদি যথাকর্তব্য পালন করিতে হয়, তাহা হইলে আগে বা পরে এখনই হউক না কেন, তথাকার হিন্দুদের ভারতীয় ইউনিয়নে স্থান দিতে হইবেই এবং সেই স্থান বাংলা ভিন্ন বাংলার বাহিরে হইতে পারে না। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বাংলার এই ত্যাগ দাবী স্বীকার করিয়া বাংলাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে কি বাংলার জীবনী-শক্তি খর্ব করিয়া ইহুদী জাতিতে পরিণত করিবে তাহাই দেখিবার জন্ত সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সংগ্রহ

শ্রীহিমাংশু বালা দেবী ভাটুড়ী

জয়ের উপায়

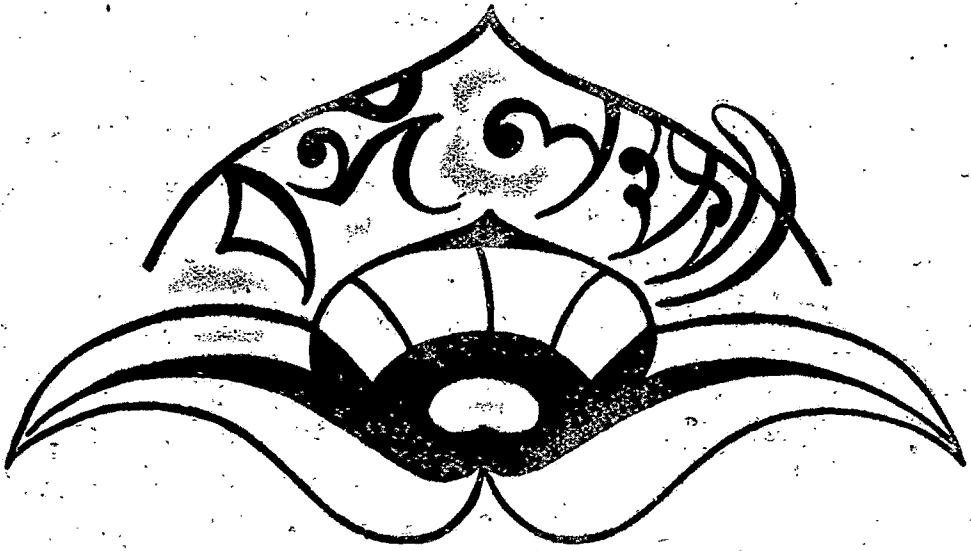
ধর্মপদ, বুদ্ধনীতি

ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করিবে, অসাদুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে; ক্রপণকে দান দ্বারা জয় করিবে; মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করিবে।

সংগ্রহ—ভূদেব মুখোপাধ্যায় হইতে

সঞ্চয়শীলতা বুদ্ধির নিমিত্ত গৃহস্থ লোকের পক্ষে নিম্নবর্তী কয়েকটি নিয়ম যত্নপূর্বক পালনীয়।

- ১। সকলেরই কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হয়।
- ২। সঞ্চয় করা খরচের পূর্বে কর্তব্য, খরচের পরে নয়।
- ৩। সঞ্চিত ধন হইতে সহজে খরচ করিতে নাই।
- ৪। যে দ্রব্য প্রয়োজন নাই, এমন কোন দ্রব্য ক্রয় করিবে না।
- ৫। যাহা ক্রয় করিবে, নগদ মূল্য দিয়া কিনিবে, ধারে কিনিবে না।
- ৬। আয় ব্যয়ের হিসাব নিজ হাতেই রাখিবে।



২৩শ বর্ষ

আষাঢ়-১৩৫৫

৮ম সংখ্যা

সোমনাথের সুপকার।

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

সোমনাথে আমি হেরিছ একটা লোক,
সুন্দর দেহ, পায়ে তার বাত রোগ।
রয় সে ভগ্ন ভূপের সন্মিকটে—
তবু আনন্দ অফুরন্তই রটে।
সন্ধ্যা সকালে খুব উচ্চৈশ্বরে
ডাকি সোমনাথে লুটায় প্রণাম করে।
পূর্ব পুরুষ রান্ধিত দেবের ভোগ,
হয়নি তাহার সে সৌভাগ্য যোগ।

২

আমি একদিন বিনয়ে সুখাচ্ছ তাকে
কেন দিন রাত অগ্নি সে জ্বলে রাখে?
জলে সর্বদা নিভিতে দেখিনে কই
হেরি ও কুণ্ড কুতূহলী হয়ে রই।
বলে ব্রাহ্মণ করিতে জানিনে হোম
প্রভাতে শুনাই ওরে শুধু 'বোম' 'বোম'।
দেবতার মোরা পাঁচক ছিলাম তাই
জিয়াইয়া এই আশুণ রেখেছি তাই।

৩

পালিয়া যেতেছি আদি পুরুষের কথা,
আগুণ জাগানো মোদের কুল প্রথা।
আসিবেন শিব ভোগ তো রাখিতে হবে
হেন বিগুহ আগুণ মিলে কি ভবে?
শিব নেত্রের ও বহ্নি বক্ষে
যজ্ঞ ও হোম চলে অলক্ষ্যে।
আসিবেন শিব যত বিলম্ব হোক
ওই হোমানলে রাখিতে হইবে ভোগ।

৪

বলিহ্ন বন্ধু পুরুষ পুরুষ ধরি
এই যে অনল রয়েছ বক্ষে করি,
জান না দেবতা আসিবেন ফিরে কবে?
তবুও আগুণ জালায়ে রাখিতে হবে?

ব্রাহ্মণ বলে বুদ্ধি তোমার নাই
আসিবেন তিনি এর বেশী কিবা চাই।
আসিবেন তিনি যখন স্তম্ভনশয়
তাহাতেই ঘুচে গেছে সব সংশয়।

৫

যুগে যুগে তিনি আসেন, দেখিতে তাঁকে,
গোটা এ বিশ্ব উদ্গ্রীব হয়ে থাকে।
শতাব্দী যুগ তাহার নিকটে পল—
তাহার হিসাব রাখিয়া কি আছে ফল?
নয় শতাব্দী নয় মুহূর্ত্ত নয়,
তিনি কালাতীত এই তাঁর পরিচয়।
তিনি আসিবেন এই আশ্বাসে বাঁচি
চৌদ্দ পুরুষ এই পথ চেয়ে আছি।

সন্তান পালন

শ্রীশান্তা দেবী

সন্তান পালন বিষয়ে পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের অনেক বই আছে। আমাদের ভারতবর্ষে এ বিষয়ে বই সম্ভবত বেশী নেই। কিন্তু সাময়িক পত্রাদিতে মাঝে মাঝে এ সকল বিষয়ে প্রবন্ধ দেখা যায়। সে সব প্রবন্ধ এতই কালে ভদ্রে বাহির হয় যে এই বিষয়টা আমাদের দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা খুব বেশী ভাবেন বলে মনে হয় না। অথচ আজ কাল আমাদের দেশের যে রকম অবস্থা তাতে এ যুগের শিশু ও বালক বালিকারা যদি প্রকৃত মানুষ না হয়ে ওঠে তবে দেশের ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়। বর্তমান যুগের বয়স্ক মানুষদের যতটুকু দেখি এবং যতটা তাদের বিষয় শুনি ও পড়ি তাতে মনে হয় দেশে স্বাস্থ্য নেই, শক্তি নেই, সততা নেই, শৃঙ্খলা নেই, দেশ হিতৈষী নেই, এমন কি নিজের মঙ্গল ইচ্ছাও নেই; কারণ তাঁদের

বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই বোঝে যে আত্মীয় প্রতিবেশী সকলের মঙ্গলের উপরই মানুষের নিজের মঙ্গল নির্ভর করে। দশ বাড়ীর লোক যদি, পরস্পরের দরজায় আবর্জনা ফেলার মত করে, পরস্পরে দশ বাড়ীর অমঙ্গল চেষ্টা করে তাতে কারুরই মঙ্গল হয় না, কিন্তু যদি প্রতিজ্ঞা করে উল্টা চেষ্টা করে তবে সকলেরই মঙ্গল হয়। কাপড়ের মালিক যদি মানুষকে কাপড় না দেয় তবে চালের মালিক তাকে চাল দেবে না, লোহার মালিক লোহা দেবে না। এতে লাভটা ততক্ষণই জনকয়েকের হবে যতক্ষণ এক এক জন বা এক এক দল হাঙরের মত চাল কাপড় লোহা সবই গিলে রাখতে পারবে। কিন্তু বড় বড় বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে বোঝা যায় যে এমনি ভাবে গিলে রাখা বেশী দিন চলে না। ছোট ছোট ক্ষমতাও ছোট খাট মানুষের হাতে থাকে।

তার ফলে লক্ষ লক্ষ পিপড়ার কামড়ে হাতীকেও যেমন টলতে হয়, তেমনি সর্কগ্রাসীদেরও একদিন ভেঙে পড়তে হবে।

বয়স্কদের বিষয় বলবার অনেক কথা থাকলেও শিশুও কিশোরদের কথায় ফিরে আসা যাক। মানুষের সর্ক প্রথম সম্বল তার শরীর যাতে সুস্থ ও সুগঠিত হয় তার জন্তে মায়ের শিক্ষা ও বাপের খাত জোগাবার ক্ষমতা থাকা চাই। ছেলে পিলেকে কি যে খেতে দিতে হবে তা আমাদের দেশের অনেক মা জানেনই না। মা হয়ত অষ্টাদ্দে অলঙ্কার পরে বসে আছেন এবং বাবা দুবেলা মোটর হাঁকাচ্ছেন, কিন্তু টাকায় একসেরের জায়গায় পাঁচ পোয়া পাঁওয়া যায় বলে, ছেলে মেয়েরা রাস্তা-ধোওয়া গঙ্গাজল মেশানো দুধ খেয়ে পেটরোগা হচ্ছে। সেই রোগ যদি কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখন হয়ত চিকিৎসাতেই মাসে হাজার দুহাজার খরচ হয়ে যেতে পারে। মেয়ের বিয়ের টাকা জমাতে হবে বলে, বাড়ন্ত মেয়ের মা বাবা হয়ত বাজার খরচ কমিয়ে, মেয়ের দুধ ঘি মাছ সব বন্ধ করে ডাল ভাত খাইয়েই তাকে রেখে দিলেন। বিয়ের পরে একটা ছেলে না হতেই সেই মেয়ে হয়ত টি, বি, বাধিয়ে মা বাপের ঘাড়ের এসে পড়ল। তখন যদি বাঁচে ত বিয়ের খরচ সব রসাতলে গেল, আর যদি বাঁচেও, যে টাকা বাঁচান হয়েছিল দুধ ঘি মাছে, তার দশগুণ বেরিয়ে গেল ইনজেকসন আর ডাক্তার টনিকে। ছেলে মেয়েকে সাধ্যমত সুখাণ্ড যেমন খেতে দিতে হবে, তেমনি সজাগ থাকতে হবে তাদের কুখাণ্ড না খাওয়া সম্বন্ধে। রাস্তায় ঘুঙনি দানা কি আলুকাবুলী কি ভাঙা ক্লাস্কে ভরা রঙীন জলের কাঠি বরফ চলেছে, ছেলে বললে, “মা চারটে পয়সা দাওনা।” মা অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে পয়সা দিলেন। ছেলে বিষ খেল কি খাবার খেল তা দেখলেনও না। অদৃষ্ট বেশী খারাপ হলে মায়ের ঐ চার পয়সা ছেলের মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।

স্বাস্থ্যরক্ষার অগাছ নিয়ম পালনের কথা বললাম না। সে বিষয়ে গত মাসেই আপনারা কিছু পড়েছেন। একটা বিষয় শুধু বলছি, সেটা ছোট ছেলেকে শোয়ানো বসানো দাঁড় করানো বিষয়ে। শিশু যতক্ষণ না নিজের

থেকে উপুড় হয়, ঘাড় তোলে, বসে, দাঁড়ায় ততক্ষণ তাকে জোর করে এগুলি করাতে নেই। কিন্তু আমাদের দেশের মা বাবারা চিং করে শুইয়ে নেওয়ার হাদ্দাম তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে চান বলে এবং বসানো কি দাঁড়ানো শিশুকে নিয়ে নানান রকম আমোদ পান বলে শিশুদের হাড় শক্ত হবার আগেই তাদের পোক্ত করে তুলে থাকেন।

শরীরের পর মন। শিশুর মানসিক বিকাশ বংশগতি অনুসারে হয় কি পরিবেষ্টনীর প্রভাবে হয় কি অভিভাবকের স্বেচ্ছাদত্ত শিক্ষায় হয় কি তার নিজের আভ্যন্তরীণ বিশেষত্ব অনুসারে হয় এ নিয়ে অনেক গবেষণা পাশ্চাত্য দেশে হয়েছে। অনেক রকম মতও খাড়া করেছেন অনেকে, কিন্তু একটা সাধারণ মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতায় যা বোঝা যায়, তাতে দেখি সবগুলিরই অল্প বিস্তার ক্ষমতা আছে মানুষকে গড়ে তোলবার। মানুষের বংশগতি ও জন্মগত নিজস্ব বিশেষত্বকে যদি বদলে দেবার বা ভাল মন্দ করবার ক্ষমতা কোনো কিছু না থাকত তাহলে নানা রকম কার্যকরী বৃত্তি ছাড়া চরিত্র গঠন পরিবার গঠন ও জাতি সমাজ প্রভৃতি গঠনের কোন শিক্ষাই মানুষকে দেবার কোন প্রয়োজন থাকত না। কিন্তু পৃথিবীতে সব দেশেই দেখা গিয়েছে যে শিক্ষার ফল সম্পূর্ণ না ফললেও অনেকটা ফলে। যে টুকু ফলে না, তার মধ্যেও অনেক খানি হচ্ছে পিতামাতা বা শিক্ষকের অগোচরে বা অজ্ঞাতে প্রাপ্ত উল্টা রকম কুশিক্ষার জন্ম।

শিশু জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে শেখে এবং যা তার ভাল লাগে তার অনুকরণ করতে থাকে। এই যে জ্ঞান হওয়া, এয়ে কত ছোট থেকে তা আমরা ধরতেও পারি না। মা বাবা ভাই বোন চাকর বাকর যাকেই সে কাছে দেখে তারই ব্যবহার শিশু তখন থেকে লক্ষ্য করে। এখন থেকেই বড়দের উচিত তাদের সামনে সাবধানে চলা। দেড় বছরের শিশুকেও লক্ষ্য করতে দেখা যায় যে তার মা মাসিরা নিজের ছেলে মেয়ে এবং পরের ছেলে মেয়েতে কতটা তফাৎ করেন। ঝি চাকরই হোক কি বাবা মাই হোন, লোকের

উপর রাগ করলে কার মুখে কি রকম ভৎসনা বা গালাগালি বেবোয় ছেলে মেয়েরা সেটা লক্ষ্য করে এবং নকল করে। সচরাচর দেখা যায় একটু বড় বয়সের ছেলে মেয়েরা মা কিম্বা বাবা বা আর কারুর মধ্যে যার প্রতি বেশী অহুর্জ্ঞ তারই নকল করে। ছেলেমেয়েদের মনে সব সময়ই একটা উচ্চ আদর্শ থাকে না। কোন কোন ছেলেমেয়ে শৈশব থেকেই ভেসে চলার স্বভাব নিয়ে চলে। কিন্তু কোন কোন ছেলেমেয়ে বাবা কি মাকে হুবহু অহুর্জ্ঞ করতে ভালবাসে। এরা বাবামাকে খুব মস্ত একটা কেউ মনে করে। মা বাবা যদি বুঝতে পারেন যে ছেলেমেয়ে তাঁদের একজনের মত হওয়াই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করে তাহলে তাঁদের সেই সময় থেকে নিজেদের সমস্ত ব্যবহার খুব ওজন করে করা উচিত। বাড়ীতে কেউ অবাস্তব লোক এসেছে, বাবা বলে পাঠালেন, বল গিয়ে তিনি এখন বাড়ী নেই, কিম্বা কেউ কিছু ধার চাইছে, বলে দিলেন, ও জিনিষটা আমার নেই। এরকম বলা কখনই উচিত নয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের রাগের ভয়ে অনেক সময় নিজেদের দোষত্রুটি ঢাকবার জন্য মিথ্যা কথা বলেন, কেউ বা আগে যে কথা বলেছেন, পরে সেটা অস্বীকার করেন। এই মিথ্যাচরণ বা মিথ্যাভাষণকে আজকাল অনেক মানুষই দোষ বলে ভাবে না। কিন্তু মিথ্যাচরণ যে মানুষের প্রায় সব দোষের মূল এবং মিথ্যাভাষণ প্রায় সব দোষের সঙ্গে জড়িত, এটা ভেবে দেখা প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকের উচিত। আমি যদি নিজে জ্ঞাতসারে কোন অজ্ঞায় না করি, তবে আমার মিথ্যাভাষণের কোন প্রয়োজন হয় না। যদি অজ্ঞাতে কোন ভুল করে থাকি তবে সেটা স্বীকার করলে যতখানি প্রলয়কাণ্ড হবে বলে ভীক লোকের ধারণা, বাস্তবিক তা হয় না। যদিও বা দুই একবার হয়, তবু মানুষটা বিশ্বাসের যোগ্য জানলে পরে তার ভুলকে অগ্রে সহজেই মার্জনা করে। মা বাবার অহুর্জ্ঞে ছেলেমেয়ে যদি সত্যচরণ ও সত্যভাষণে অভ্যস্ত হয় তবে তাদের নিয়ে সংসারে চলা অনেক সহজ হয়। কোন কাজটা তারা করবে এবং কোনটা করবে

না যদি মা বাবা জানেন তবে তাদের গড়েতোলা এবং বিপদ নিন্দা প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করা বুদ্ধিমান পিতামাতার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়।

কিন্তু ছেলেমেয়েকে একেবারে খাঁটি করে গড়তে চাইলে শুধু নিজেরা খাঁটি হলেই হয় না। তাদের এমন পরিবেষ্টনীর মধ্যে রাখতে হয় যাতে তারা অবাস্তব সদ্বেশী না পায়। এই জন্য দশ এগাবো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের যদি বাবা মা নিজে শিক্ষা দিতে পারেন, স্কুলে বিশেষত বোর্ডিং স্কুলে না দেন, তাহলে বোধ হয় শিশুদের চরিত্রের গোড়াটা শক্ত করে গড়ে দেওয়া হয়। এই বয়সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানোটাও ছেলেদের পক্ষে ভাল নয় বলেই আমার ধারণা। নিজের যদি দুই চারটা ভাই বোন থাকে তবে শিশু মনের মত সঙ্গী পায়। সে যদি মায়ের এক সন্তান হয়, তবে সে শিশুকে সদ্দেবার জন্য বাইরের ছেলে মেয়ের সঙ্গে মিশতে দিতেই হয়। সেই সময় মা বাবার দেখা উচিত বাইরের সঙ্গীগুলি কি রকম। আজকাল নাসূরি স্কুল মন্টেশোরি স্কুল প্রভৃতি নানা স্কুলে শিক্ষার জন্য ছেলেমেয়েদের দেওয়া নিয়ম হয়েছে। তাতে অশিক্ষিত বা অবসরহীন মায়ের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা এবং কিছু কিছু অল্প শিক্ষা হয়ত ভাল হয়। কিন্তু এই সব স্কুলের চেয়েও দরকারী একটা স্কুল থাকা প্রয়োজন যেটার কাজ মায়েরই শিক্ষা দেওয়া। প্রত্যেক শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মেয়েকে যদি বিবাহের পূর্বে শিশু পালন অর্থাৎ দশ বছর পর্যন্ত সন্তানের শরীর ও মন গঠনের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সন্তান জন্ম গ্রহণ করার পর যদি সংসারের কাজের চেয়ে ছেলেমানুষ করার কাজই মায়ের বড় কাজ বলে প্রতি গৃহে ধরা হয়, তবে সেই সব মায়ের শিশুরা ভবিষ্যৎ দেশকে অনেকখানি উন্নত করে দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব মেয়েরা আই-এ, বি-এ, এম্-এ, পড়তে যায় তাদের সকলের জন্য একটা সাধারণ ক্লাস থাকা উচিত রোগী পরিচর্যা ও শিশু পালন বিষয়ে। শিশুদের শরীর ও মন দুইই গঠন বিষয়ে সমান জোর দেওয়া দরকার। শৈশব থেকে তাদের চরিত্র গঠনে সত্যনিষ্ঠা অহিংসা প্রভৃতি মূলনীতিগুলির উপর জোর

দেওয়া উচিত। তবে ছেলেদের শৈশব থেকে “সত্যনিষ্ঠ হও, মিথ্যা বোলো না বা ঠকিও না,” এগুলি বলা ঠিক নয়। মিথ্যা বলে একটা জিনিষ যে জগতে চলে এইটাই শিশুকে জানতে দেওয়া উচিত নয়। সে যেন শৈশব থেকেই বোঝে যে সত্যই একমাত্র আছে এবং সত্যচরণ ও সত্যভাষণ ছাড়া আর কোনো স্বাভাবিক ব্যবহার মানুষের মধ্যে চলে না। বাস্তবিক জীবজগতে মিথ্যাচরণ বেশী নেই, মানুষ জগৎই এর প্রধান স্রষ্টা।

সত্যচরণ প্রভৃতি ছাড়া পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দেশের প্রতি মানুষের কি কর্তব্য সেটা উপদেশের ছলে নয়, কিন্তু নিজেদের স্বার্থের দিক থেকেই শিশুকে শেখানো উচিত। কোনো শিশু যদি ভাল খাবার বা খেলনা পায় তবে তার ভাগ সঙ্গী অগ্ন্যাত শিশুদের স্বাভাবিক ভাবেই দিতে হবে; অন্য শিশুদের পালা যখন আসবে তখন তারাও সবাইকে দেবে, তাহলে প্রতি শিশু

প্রত্যেকবারই আনন্দ পাবে। পথঘাট পরিষ্কার রাখতে হবে, কারণ প্রত্যেকে যদি নিজের ও প্রতিবেশীর ঘর দোরের আশপাশ পরিষ্কার রাখে তবে অল্প শ্রমে সমস্ত পাড়া পরিষ্কার থাকে এবং পরিচ্ছন্নতার আনন্দ ও উপকার সকলেই পায়। মা বাবা যদি সন্তানের জন্ত ত্যাগ ও শ্রমস্বীকার করেন তবে সন্তানকেও তাঁদের জন্ত তা করতে হবে, এটা হাতে কলমে ছেলে বেলা থেকে শেখানো দরকার। শিশুকে শৈশব থেকেই বুঝতে দিতে হবে যে প্রত্যেকেই মানুষ, প্রত্যেকেই বিধাতা একভাবে জীবন যাপন করবার জন্ত সৃষ্টি করেছেন। মা বাবার ক্ষমতা অসীম নয় এবং সন্তান ছোট বলেই অক্ষম নয়। সকলেই সমান শক্তিমান এবং সকলেই পরস্পরের জন্তে শ্রম ও ত্যাগস্বীকার করতে সৃষ্ট। তা না হলে সৃষ্টির ভার সাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

অসমাপ্ত

শ্রীআরতি মুখোপাধ্যায়

শান্তি আর কদিন পথে বেরোয়নি। মনের কোণে আশা প্রদীপ জ্বলছে, সে কাজ পাবে, অমিতার মত মেয়ে তাকে কথা দিয়ে গেছে, তার কাজ হবে। খরচ চলে যাবার মত সে টাকাও দিয়ে গেছে। শান্তির মুখে পরিতৃপ্ত হাসিটা ফুটে উঠেছে। ছেলে মেয়েগুলোর নিয়মমত স্নান খাওয়া হচ্ছে, তাদের কচি মুখগুলিও আসন্ন আনন্দের আভাষে টলটল করছে। মা বলেছেন তারা কলকাতা থেকে স্নান আর একটা জায়গায় যাবে, সেখানে তারা কত খেলা করবে পড়বে। অমু বোঝদার হলেও, মাকে একদিন বলে ফেল, “মা আমাকে একটা

ছোট্ট সাইকেল কিনে দেবে মা, কাঠের?” তার আনন্দ আর আগ্রহে ভরা মুখখানির দিকে চেয়ে শান্তি বলে, “হ্যাঁ, দেব রে দেব, সব এক এক করে হবে, একবার একটু কাজে গুছিয়ে বসতে পারলে, আর ওবি মধ্যে ভাল মন্দ খেলে—দেহে বলও পাব, তখন বাড়ী বসে বসেও কত টুকি টাকি করব, তাতেও কিছু টাকা আসবে।” অমু তাতেই খুসী, মা বলেছেন, তার উপর আর কথা নেই। এমনি ভাবে কয়েকটা দিন শান্তিতে আরামে তাঁদের কেটে গেল।

এমন কি একদিন শান্তি ছেলে মেয়েদের কলকাতার

এটা ওটা দেখিয়েও আনল। বাড়ীওয়ালা তিন মাসের রাকী ভাড়া পেয়ে খুসী হয়ে বলে, পূজোর সময় তাদের ঘরে কলি ফিরিয়ে দেবে। নীলা জানলার ধারে বসে বসে কতদিন যে গলির মধ্যে ছিট কাপড়ওয়ালাকে যেতে দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই, আজ তাকেও ডাকা হোল। তার সাত বছরের জীবনে—একদিনও রূপ কথার পরীরা তাকে একটি সুন্দর লাল রঙ্গের ফ্রক দিয়ে স্বপ্ন সার্থক করে তোলে নি।

শান্তির এই আকস্মিক পরিবর্তনের আনন্দে কয়েক দিন হোল সে অমিতার আসার তাগিদটা অনুভব করেনি; বলে ত গেছে সে আসবে কয়েকদিনের মধ্যেই।

ব্যস্ত হবার কিছু নেই, এখনও তার হাতে টাকা আছে, মাস শেষ হতেও দেবী রয়েছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এ মাস শেষ হোল, ভাবনা হ'ল অমিতা আসতে দেবী করছে কেন? তার কোন বিপদ আপদ হোলনা তো? অগ্রিয় সত্যকে যেমন মানুষ প্রাণপণে নাগাল না দেবার চেষ্টা করে, শান্তিও তেমন প্রথমটা আমল দিল না—কিন্তু তারপর? অমিতার দেওয়া টাকা তার এখনও শেষ হয়নি, এ মাসটাও চলে যাবে। কিন্তু তার কি হোল? সে যে তাকে মেয়েদের সেই প্রতিষ্ঠানটীতে নিয়ে যাবে সন্দেহ করে; দেবী হয়ে গেলে, সময় মত দেখা না করলে তাঁরা তো অল্প লোক নিয়ে নিতে পারেন।

এমন তার বুদ্ধি যে সে অমিতার ঠিকানাটা পর্যন্ত লিখে রাখেনি। এত বড় কলকাতা সহরে সে তাকে কোথায় খুঁজবে?

যদিও অমিতা তার ঠিকানাটা লিখে নিয়েছিল, তার নোট বুক।

আতঙ্কগ্রস্ত মাসটা শেষ হোল, হাতের টাকাও নিঃশেষ, গোটা চার পাঁচ টাকা অবশিষ্ট। শান্তি একবার গলির মোড়ে যায়, আবার আসে। কয়েকটা দিন এরকম করার পর সে ঠিক করলে বেরিয়ে এদিক ওদিক খোঁজ করবে। শান্তি আবার হাঁটা পথ ধরল, ঘুরে ফিরে সেই দো আনীটাই ভাগ্যচক্রে জড়িয়ে আছে আঁচলের খুঁটে বাঁধা। শান্তি আন্দাজে আন্দাজে অমিতার খোঁজ

করে। যে রেষ্টোরাঁতে বসে তাকে অমিতা সবৎ খাইয়েছিল সেখানে গিয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করল, “আপনারা সুন্দর মত একটি মেয়েকে এখানে আসতে দেখেছেন কি?” তারা আর কি বলবে? কত মেয়েই তো যায় আসে।

অনিশ্চিত ভাবে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে শান্তি ঘরে ফেরে, বার বার ফিরে তাকায়, কি জানি যদি অমিতা তাকে ডাকে—“শান্তিদি ও শান্তিদি, এত ডাকছি শুনতে পাচ্ছেনা?” বাড়ীতে এসেই ছেলে মেয়েকে ক্রক স্বরে জিজ্ঞাসা করে, “কিরে ঠিক বলছিস তো, অমিতা এসে ফিরে যায়নি, আমাকে না দেখে?” তার চোখটা সত্যিই ধক ধক করে জলে ওঠে। অমু ভয়ে ভয়ে বলে, “না মা, মাসীমা আসেনি।”

ধীরে ধীরে পূজা এসে পড়ল। বাড়ী ভাড়া আবার বাকী পড়েছে, ঘরে চুনকাম হয়নি, ইট বার করা দেওয়াল যেন মুখ ভেংচিয়ে আসছে। ষষ্ঠীর আর দেবী নেই, দীন দরিত্রের ঘরে ঘরেও, অবস্থামত চার আনা দু আনা দামেরও পেনী ক্রক এল, কিন্তু অমুদের সবই শূন্য।

হাতে যে দু একটি টাকা ছিল, তা কেবল চাল কিনেই শেষ হোল। ভাগ্যে তখন ছিল যুদ্ধ পূর্ব কাল, তখনও বাংলা দেশে গরীব লোকে ৩৪ টাকা মণে চাল কিনে খেত।

ঘরের মধ্যে নিবিড় স্তব্ধতা, বাইরে শরতের আলোর উজ্জ্বল। পঞ্চমীর সন্ধ্যাতে শান্তি শূন্য মনে বাইরের রকে বসেছিল। শারদীয় উৎসবের আসন্ন কোলাহল বড় রাস্তাটা থেকে ভেসে আসছে। বারোয়ারী পূজোর তোড়জোড় চলছে, অমু নীলা সেখানেই ঘুরছে। তপু কেবল চুপটা করে মায়ের পাশে বসে আছে।

কাল ষষ্ঠী। ঘরে চাল নেই, তেল নেই, কাপড় পরিষ্কার করবে এমন এক ফালিও সাবান নেই। যাক তার জন্তুও সে কাতর নয়। অনেক ছেলে মেয়েই পূজোর কাপড় পরবেনা, সে না হয় হোল। কিন্তু দিন চলবে কি করে?

পাড়ার সব ছেলে মেয়েরা কদিন পূজায় বারোয়ারী পূজা মণ্ডপে যাবে, সেও এক স্বস্তি, তারপর?

শান্তি মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়াল। তপুকে বলল, “তুই ঘরের মধ্যে যেয়ে বোস—অমু, নীলু, এসে ভাত খেয়ে নিস, আমি একবার বাইরে যাচ্ছি।”

শান্তি মাথার আঁচল টেনে খালিপায়ে গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছল। তার ঘেন বোধশক্তি রহিত হয়েছিল। উৎসব আলোকিত পথে, রম্য বিপণি সম্ভারের পাশ দিয়ে দিয়ে রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার ভীড় ঠেলে চলতে লাগল।

তার শরীর টগড়ে, বেশ কিছুদিন ধরেই একবেলা উপোস; থেকে থেকে মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাবে, যে রকম নিঃশ্বাসের কষ্ট। সে একবার একটা জল কলের কাছে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি ভরে জল খেল, শুদিকের ফুটপাথে মস্ত বড় একটা দোকান, শো কেসে শাড়ী বলমল করছে, ভিতরে স্ত্রীবেশা মেয়েরা এটা ওটা পছন্দ করছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলনা, লজ্জা কিনছে। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। তার মনে হোল, ছেলেমেয়েদের দাবীর কথা। অমুর কাঠের নাইকেল, নীলুর চওড়া লাল রিবন, তপু গেটুক মাছ, তার জন্ম মিষ্টি বিস্কুট! শান্তি আর দাঁড়াল না। একটানা চলে সে সেই ছমাস আগের আসা—চারতলা বাড়ীটার উপরে উঠল। এখন তো সে দম নিতেই পারছিল না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সে ভিতরে ঢুকল। ঘরে আলো জ্বলছে। জিজ্ঞাসা করল, “বিপিনবাবু আছেন?” একটা বছর ২৪।২৫ এর চণমা পরা ছেলে টেবিলে বসে একমনে লিখছিল, সে একটু বিস্মিত হয়ে বলল, “কে বিপিন বাবু?” শান্তি তিক্ত স্বরে বলল, “বিপিন বাবু—বিপিন মিত্র যার এই অফিস।” প্রশান্ত শান্তির দিকে এতক্ষণ ভাল করে চেয়েই দেখেনি, হঠাৎ যেন তার দৃষ্টি থমকে দাঁড়াল।

আধময়লা লালপেড়ে সাদী পরা, এই যে মেয়েটী সামনে দাঁড়িয়ে কী অভূত চোখের চাহনি, ওর চোখ যেন জ্বলছে, যেন কাল নাগিনী ছোবল দেবে। প্রশান্ত বলল, “আপনি বসুন।” শান্তি বসে পড়ল বলল, “বিপিন বাবু কী এখন নেই, কখন আসবেন?” প্রশান্ত বলল, “এটা আমার অফিস,—আমার মাসিক পত্রিকা স্বাক্ষরের অফিস। বিপিন বাবু বলে কাউকে আমি চিনি না।” শান্তি বিচ্যুত

গতিতে উঠে দাঁড়াল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, চুলগুলো দুপাশে ঝুলছে, পাংগু ঠোট খর খর করে কাঁপছে,—সে চীৎকার করে বলে উঠল, “আমি কী করব তাহলে, আমি কার কাছে যাব?” প্রশান্তর দিকে সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, “বলুন আপনি, আমি কী করব, অমিতাকেও জিজ্ঞাসা করেছি, গোটা কলকাতা মহরের লোককে জিজ্ঞাসা করেছি—আমি কী করব—আমি কী করব?”

তার দাঁড়বার ক্ষমতাও ছিলনা আর, মাটিতে বসে পড়ল টাল খেয়ে। প্রশান্ত উঠে এসে শান্তিকে উঠিয়ে চেয়ারে বসাল, তারপর কাকে যেন ডেকে বলল, “চট করে গরম দুধ একটা গেলাসে করে নিয়ে এসতো। নীচের দোকান হতে”; তারপর শান্তির মুখে জলের বাপটা দিয়ে বলল, “একটু স্থির হোনতো দিদি।” শান্তির চোখের জল আর বাধা মানল না,—এই দিদি ডাক, তার ধৈর্যের সব বাধ ভেঙ্গে দিল। মহাহুভূতি, দয়া! আজ অপরিচিতাকে দিদি ডেকে কাল কী এও অমিতার মত চলে যাবে না? গরম দুধটুকু খাওয়াবার পর প্রশান্ত শান্তির আজ এখানে আসার উদ্দেশ্য থেকে তার ২৬ বছর বয়সের সবটুকু মিষ্টতা তিক্ততা রিক্ততার ইতিহাস তার মনের খাতায় লিখে নিলে।

শান্তি কথার সূত্র টেনে বলল,—“তারপর? আর তারপর কিছু নেই ভাই,—বাকীটা নিশ্চয় বাস্তবের ঘোর অন্ধকার, এর বেশী কিছু দেখতে পাই না। আমাদের দাঁড়াতেই হবে, আমাদের কাজ পেতেই হবে, নাহলে আমি ওদের বাঁচাতে পারব না। আমি মরে গেলে, ওদের বাপ কি ওদের গ্রহণ করবে, কে জানে? মনে মনে গর্বি ছিল মনের জোরের। আমি অপরাধিতা, আমি অত্যাঘ্র অবিচারের বনীয়াদ ভেঙ্গে ফেলে, মাথা উচু করে দাঁড়াব। বেশী কিছু চাইনি,—আমার দাবী শুখব বেশী নয়, আগে ভাবতুম মাসে তিরিশটে টাকা যথেষ্ট, এখন দশটা টাকা পেলেও বর্ত্তে যাই!” প্রশান্ত বলল,—“তাহলে ঐ কথাই রইল—আপনি আপনার লেখাটি শেষ করে রাখবেন, পরশু সকালে আমি গিয়ে নিয়ে আসব, আর আপনার পারিশ্রমিকও দিয়ে আসব।”

শান্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, “তোমায় কি বলে আশীর্বাদ করব ভাই? আমার কপালে কিছুই নয় না। না হলে অমিতা কেন চলে যাবে?”—তার গলা আটকে গেল। আবার গলা ঝেড়ে বলল—“আমি কিন্তু কেবল নিজের কথাই লিখব, কেবল আমার কথা। মনে হচ্ছে যদি কলমটা কালিতে না ডুবিয়ে আগুণে ডুবিয়ে লিখতে পারতাম বোধহয় মনের সব কথা, হুঃখ ব্যাকুলতা আঘাত নিরাশা, আর প্রতিহিংসা,—ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠত!” প্রশান্ত আর কোন কথা বলল না, শান্তিকে নীচে এসে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে বলল, “দিদি, আজ এই গোটা পাঁচেক টাকা নিয়ে যান, আমি পরশু সকালেই যাব।”

শান্তি স্বপ্নে তুষ্ট। আবার তার মনে আশা জাগছে। সেতো বিদ্রোহ করে চলে এসেছিল। সে মরণ পণ করেছিল, কুংসিতকে তার অঙ্গ স্পর্শ করতে দেবে না। বাড়ী এসে, ঘুমন্ত ছেলের দিকে তুলে বলল—“অমু আজ তোব একজন মামা পেলুম রে! দেখ, এই টাকা দিয়ে—কাল তোদের সব হবে—চাল, তেল, বাড়ী ভাড়া, কাপড়!”

সপ্তমীর ভোর। শান্তি আগের রাত একটানা লিখেছে। ঐ টাকায় সে তিনটাকার জামা কিনে দিয়েছে ছেলের, গয়নার কাছে একপো দুধ কিনে জল মিশিয়ে তাতে দুটো সিদ্ধভাত ছেড়ে দিয়ে পায়স করে খাইয়েছে।

তার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা সে লড়বেই। রক্তাক্তরেই সে লিখেছে। এতো তার নিজের কথা, নাই বা রইল তার ভাবার স্বাচ্ছন্দ্য আর ষ্টাইল, সে আপন মনে তার সব কথা লিখেছে—স্বাক্ষরের জন্ত।

ভোরের দিকে ক্লান্ত হয়ে শান্তি ছেঁড়া মাছের মাথায় হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। পাশে লেখাটা রয়েছে, তার উপর বই চাপা দেওয়া। নিঃশ্বাসের কষ্টটা তার রাত হতেই বেড়েছিল, তাই আর বসে থাকতে পারছিল না। সকালে প্রশান্ত আসবে, লেখাটা সেরে, তাকে একপয়সা চাও সে খাওয়াবে।

অমু নীলু তপুর নিদ্রিত মুখগুলির উপর তার স্নেহ করুণ নয়নের দৃষ্টি বারে বারে ঘুরে ফিরতে লাগল।

সে নিজেই বুঝতে পারছিল, তার মুখের কঠিন রেখাগুলো কখন কোমল হয়ে এসেছে। আর বসতে পারল না, এমন কি লেখাটাতে একটা নামদই পর্য্যন্ত করতে পারল না, সে পরম ক্লান্তিতে লুটীয়ে পড়ল, নিঃশ্বাস যেন আর টানতে পারছে না।

বেলা হয়ে গেছে। অমুরা কখন উঠেছে, নতন জামা পরে ভাই বোনের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাকে এত বেলা পর্য্যন্ত তারা কখনও ঘুমোতে দেখেনি, ভাবলে হয়ত রাতে ঘুমোননি, পাছে মা রাগ করেন সেই ভয়ে তারা ডাকেনি।

প্রশান্ত ঠিক সময়েই এল। কড়া নেড়ে ডাকলে, “দিদি কোথায়?” অমু বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—“আপনি কি আমাদের নতন মামা?” তারপর ভাই বোন কটা একে একে প্রশ্নাম করল। প্রশান্ত হেসে তাদের সকলকে একবার করে কোলে নিয়ে, পকেটে কাগজে মোড়া প্যাকেট খুলতে খুলতে বলল, “মাকে ডাক, বলো যে মামা এসেছেন।” অমু আবার ডাকাডাকি করে শাড়া না পেয়ে, বাইরে এসে বিক্ষাণিত দৃষ্টি মেলে বলল, “মামা মা উঠছেন না।”

প্রশান্ত বলল, “হয়ত সারা রাত জেগেছেন তাই ঘুমোচ্ছেন।” ওরা এরকম কথাবার্তা বলছে এর মাঝে নীলু একবার ঘরে গেল, তারপরেই তার ভগ্নাঙ্গ চীৎকার শোনা গেল। প্রশান্ত আর দ্বিধা না করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শান্তি অন্ধক ছেঁড়া মাছের আর অন্ধক মাটিতে অর্দ্ধবৃত্তাকারে শায়িতা, চুলগুলি জটার মত চারিপাশে ছড়িয়ে আছে, একপাশে কতকগুলো কাগজ ছড়ানো, সেই লেখাটা বোধ হয়, প্রশান্ত ভাবল।

শরতের আলো গলির মধ্যে, চাপা দেওয়াল ভেদ করে উঠোনে পড়েছে, তারই একফালি রশ্মি ঘরের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। শান্তির শায়িতা জীর্ণশীর্ণ ক্লিষ্ট দেহ, জটার মত চুল, জীর্ণ বস্ত্র, ছেঁড়া মাছের দেহে মনে হোল যেন বঙ্গ জননীর মূর্ত্তরূপ ফুটে উঠেছে। প্রশান্ত, ধীরে ধীরে লেখাটা তুলে নিল, উল্টে পালটে দেখল, শেষের পৃষ্ঠায় লেখা আর বোঝা যাচ্ছে না, কতকগুলি অক্ষর এ-ওর গায়ে জড়িয়ে রয়েছে।

প্রশান্তর মনে হোল একবার সে ছুটে গিয়ে সবাইকে দেখায়—এই লোকান্তরিতা প্রতিমাটিকে।

মেঘদূত

শ্রীমতুল চন্দ্র মাহাত, সাহিত্যাবিনোদ ।

মনে হয় কালিদাস কুমারসম্ভব রচনা শেষ করিয়া মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন। কারণ, কুমারসম্ভবে যে সব বিষয় অস্পষ্ট মেঘদূতে তাহা স্পষ্ট, আবার মেঘদূতে যাহা অস্পষ্ট রঘুবংশে তাহা স্পষ্ট। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় কবি প্রথমে কুমারসম্ভব পরে মেঘদূত এবং সর্বশেষে রঘুবংশ রচনা করেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জিনসেন কৃত “পার্শ্বভূদ্যে” মেঘদূতের শ্লোকগুলি সমস্তা পূরণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে এবং কুমারসম্ভবের রচনার কাল হইতে অনুমান করা যায় মেঘদূত খৃঃ ৬ষ্ঠ হইতে ৭ম শতকের মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

সমালোচকদের মতে মেঘদূত খণ্ডকাব্য (Lyric)। মেঘদূতে ১১৮টি শ্লোক আছে। পরবর্তীকালে কোনও কবি স্বরচিত শ্লোক উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান টীকাকার মল্লিনাথ বাছিয়া বাছিয়া ১১৮টি শ্লোকেরই টীকা লিখিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন উহা ছাড়া অস্তিত্ব শ্লোকসমূহ কালিদাস রচিত নহে।

কালিদাসের মেঘদূত অনুসরণ করিয়া পরবর্তীকালের কবিগণ হংসদূত, পবনদূত প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত কাব্যসমূহ উৎকৃষ্ট হইলেও মেঘদূতের পর্যায়ভূক্ত হইতে পারে নাই।

যক্ষের বান্ধী বহন করিবার জন্য কালিদাস মেঘকে দূত করিয়াছিলেন। চারিপাশে দূতের উপযোগী বহু প্রাণী রহিয়াছে। প্রাণীদিগের নিকট অনেক কথা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতে পারে, তাহা হইলে বায়ু রহিয়াছে। উপরোক্ত সমস্ত দূত ছাড়িয়া কালিদাস মেঘকে দূত করিলেন কেন? মেঘদূতের মধ্যেই আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাইব। কালিদাস জানিতেন মেঘের আগমনে প্রকৃতিদেবী নিজেকে নবরূপে সজ্জিত করেন, প্রেমিকের মন প্রেমিকের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং কবিচিতে এক নূতন ভাবের উদয় হয়। কালিদাস দেখিলেন মেঘকে দূত করিলে যক্ষের স্বপ্নে

অধিকতর বিরহের সঞ্চার করিতে পারিবেন এবং সমস্ত ভারতের এক “সুজলা সুফলা শস্য শ্রামলা” রূপ চিত্রিত করিতে সক্ষম হইবেন।

পূর্বে বলিয়াছি কালিদাসের কাব্যের মধ্যে tragedy নাই। প্রথমে মেঘদূত পাঠ করিলে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

মেঘদূতের সাহায্যে কালিদাস যক্ষ ও যক্ষপত্নীর বিরহী হৃদয়ের এক জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিয়াছেন। যক্ষ এক বৎসরের জন্য শাপগ্রস্ত। বৎসরান্তে যক্ষপত্নীর সহিত তাহার মিলন স্থনিশ্চিত। সেইজন্য প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা উভয়ের বিরহ বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে মানসকর্ণে তাহাদের সেই মিলনের অপূর্ব বীণধ্বনি শ্রবণ করিতে পারে। সেইজন্য বলিতে ইচ্ছা করে কালিদাস যক্ষ ও যক্ষপত্নীর বিরহের ভিত্তির উপর স্বর্গীয় প্রেম ও ভালবাসার বিরাট সৌধ নির্মাণ করিবার মানসে মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন।

মেঘদূত দুই অংশে বিভক্ত, পূর্বমেঘ ও উত্তর মেঘ। কোন কোন সমালোচকের মতে “পূর্বমেঘ স্বর্গের সিঁড়ি। উত্তরমেঘই স্বর্গের সারবস্ত্র।” কিন্তু আমার মতে পূর্বমেঘ উত্তরমেঘ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে :—

“...পূর্বমেঘ কালিদাসের কবিত্বের একটি ভাবময় লহর। উহাতে জড় প্রকৃতিকে চৈতন্যময় করিয়া তোলা হইয়াছে। মেঘ নিজে জড় হইয়াও চৈতন্যময়। মেঘ উপর হইতে জড় প্রকৃতিকে বতদূর দেখিতেছে তখনই ততদূরই চৈতন্যময় হইয়া যাইতেছে। জড়কে এত স্বন্দরভাবে চৈতন্যময় করা আর কোথাও দেখা যায় না। কালিদাস আর কোথাও পারেন নাই। কুমারে রঘুতে বড় বড় বর্ণনা জড় জড়ই। কুমারের বর্ষে হিমালয়কে চৈতন্যও জড় দুই বলা হইয়াছে, কিন্তু সে দুটা দ্রুপ। পূর্বমেঘে যে জড় সেই চৈতন্যময়, ভাবময় ও প্রেমময়।” (মেঘদূত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

পূর্বমেঘ পাঠকালে প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার মন যক্ষের ন্যায় জড় ও চেতনের ভেদাভেদ ভুলিয়া যায়। মেঘদূতের কবিহিসাবে কালিদাসকে একজন পাশ্চাত্য কবির সহিত তুলনা করিলে মেঘদূতের অনেক অংশ সহজবোধ্য হইবে। সেই পাশ্চাত্য কবির নাম কোলরিজ (Coleridge)। কোলরিজ পাঠকে এক অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাইতেন এবং সেই স্থানে তাঁর কল্পনাশক্তি দ্বারা অতি প্রাকৃত (super-natural) ঘটনার অবতারণা করিতেন। কিন্তু কোলরিজ তাঁর কবিচিত্তের কল্পনাশ্রুত অতিপ্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর সাহায্যে স্বীয় বর্ণনাভঙ্গীতে পাঠক পাঠিকার হৃদয়ে ইচ্ছানুসারে নানা ভাবের আলোড়ন তুলিতেন। কালিদাসও ছিলেন সেইরূপ। কালিদাস যক্ষকে * রামগিরিতে নির্বাসন দিয়া পাঠক পাঠিকার মনকেও সেই স্থানে লইয়া গেলেন। পাঠক রামগিরিতে যাইয়া মেঘদূতের দোষগুণ বিচার করিতে পারিবে না। সেইজন্য কালিদাস রামগিরিকে অপ্ৰতিহত চিত্তে স্বীয় কল্পনারাজ্যের রাজধানী করিয়া তুলিলেন। রামগিরি কবির কল্পনারাজ্য। সেই স্থানের ঘটনাসমূহ আমাদের জাগতিক নিয়মাবলীর বশবর্তী নহে। একমাত্র কল্পনাবিলাসীই সেই স্থানে প্রবেশ করিতে সক্ষম। জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কেহ সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

ইহা ব্যতীত রামগিরিতে যক্ষকে নির্বাসন দিবার আরও কারণ আছে। যক্ষ প্রিয়ার বিরহে কাতর, কিন্তু তাহার নির্বাসন স্থল রামগিরি রাম ও সীতার পবিত্র দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি বহন করিয়া দণ্ডায়মান। রামগিরির জলশ্রোতটীতে জানকী স্নান সমাপন করিতেন। কাজেই রামসীতার মধুময় জীবন স্মরণ করিয়া বিরহী যক্ষ অধিকতর কাতর হইয়া পড়িল এবং কালিদাস সুকৌশলে তাহার সুপক লেখনী দ্বারা তাহার মনোভাব প্রকাশ করিলেন।

মেঘদূতের একমাত্র বর্ণনার বিষয়বস্তু শুধু কি যক্ষের বিরহীহৃদয়ের প্রতিকৃতি মাত্র? প্রকৃত গক্ষে তাহা নহে।

মেঘদূতের মধ্যে একাধারে আমরা মনঃস্তুত, ভৌগলিক ও

* কালিদাসের রামগিরি মল্লিনাথের মতে চিত্রকূট পর্বত (বুন্দেলখণ্ড)। উইলসন (Wilson) সাহেবের মতে রামটেক (নাগপুর) অন্য মতে রামগড় (মধ্যপ্রদেশ)।

প্রাকৃতিক বিষয়ের বর্ণনা পাইব। রামগিরির শোভা অতুলনীয়। চারিপাশ্বে পর্বত ও তাহার মধ্য দিয়া একটি জলশ্রোত প্রবাহিত। নানা প্রকার বন্য পুষ্পের দ্বারা স্থানটী সুরভিত। জলপূর্ণ মেঘের দল হস্তীর ন্যায় পর্বতগাত্রে আঘাত করিতে থাকে। কাজেই ঐ সময়ে বহু ভৌগলিক বিষয়ের (Geographical factors) পরিবর্তন সাধিত হয়। কালিদাস সুচারুরূপে ঐ সমস্ত বর্ণনা দিয়াছেন।

কালিদাসের মেঘদূত রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের মনোহর ও চিত্তাকর্ষক নগর সমূহের উপর দিয়া যক্ষ পত্নীর নিকট গমন করিতেছিল। সাধারণ মনুষ্যের নিকট যে সমস্ত গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিতে লজ্জা পাইতে হয় মেঘের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র লজ্জার উদয় হয় না। কাজেই কালিদাস মেঘের সাহায্যে সে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলেন। তাহাতে তৎকালীন সমাজের একটি জীবন্ত চিত্র আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

কালিদাস যক্ষকে করিয়াছেন গমিতমহিমা। মল্লিনাথ গমিত মহিমার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইচ্ছানুসারে গমনাগমনের ক্ষমতা হইতে বিচ্যুতি। দেবতা, যক্ষ প্রভৃতি সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অধিক ক্ষমতার অধিকারী। তাহারা ঐ ক্ষমতার বলে মুহূর্ত্ত মধ্যে যে কোন দৈর্ঘ্য ধারণ করিয়া যথেষ্ট বিচরণ করিতে পারিত। কিন্তু স্রষ্টার কালিদাস তাহাকে গমিত মহিমা করিয়া সাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন। কালিদাস জানিতেন মানুষ তাহার নিজের ন্যায় দোষগুণযুক্ত, মানুষকেই ভালবাসে। দেবদেবীর, দানবদানবীর কাহিনী সেই জন্যই মানবমনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মানব তাহাদের কীতি কাহিনীকে ভক্তি, ভয় ও শ্রদ্ধা করে, কিন্তু স্বগুণাবলম্বী ব্যক্তির কাণ্ড দ্বারা নিজকে অনুপ্রাণিত করে। বোধহয় এইসব বিচার করিয়াই কালিদাস “গমিত মহিমা” শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

কালিদাসের মেঘদূতের পূর্ণ সমালোচনা করা অসম্ভব। সেইজন্য মেঘদূতের দুইটি প্রধান চরিত্র যক্ষ ও যক্ষপত্নীর সমালোচনা করিয়া মেঘদূতের আলোচনা হইতে বিরত হইব।

মেঘদূতের যক্ষ ছিলেন কুবেরের কর্মচারী। যক্ষ নববিবাহিত। সেই জন্য সে নিজ কার্যে অমনোযোগী।

তাহাতে যক্ষ কুবের কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া এক বৎসরের জন্য বিরহী জীবন যাপন করিতে রামগিরিতে নির্বাসিত হইয়াছিল। ঐ এক বৎসর যক্ষের নিকট দুর্বিষহ হইয়া উঠিল। সে স্ত্রীর চিন্তায় এমন বিভোর হইয়া পড়িল যে, নিজের অজ্ঞাতেই শীর্ণ হাত হইতে কনকবলয় পড়িয়া গেল। ঠিক ঐ সময়ে নিকটের পর্বত শীর্ষে “বপ্রকীড়া পরিণত গজপ্রেক্ষনীর” মেঘের উদয় হইল। মেঘদর্শনে যক্ষের হৃদয় বিরহাগ্নিতে পুড়িতে লাগিল। ইহা যক্ষের যেন উন্মাদ অবস্থা। সে কুড়চির ফুল তুলিয়া মেঘ উদ্দেশে অর্পণ করিল এবং তাহাকে নিজ বার্তা বহিষা লইয়া যাইবার জন্য আবেদন করিল। মেঘের উদ্দেশে যক্ষ সে সমস্ত বার্তা প্রদান করিয়াছিল আপাত দৃষ্টিতে তাহা প্রলাপ বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। কারণ যক্ষের কথাগুলি অসংলগ্ন নহে। যক্ষ মেঘকে সহজ পথ বলিয়াছিল। কিন্তু সে জানিত পথে আকর্ষণীয় বস্তু না থাকিলে মেঘ সে পথে নাও যাইতে পারে। সেইজন্য যক্ষ সূচত্বর ভাবে পথের লোভনীয় বিষয় সমূহের বর্ণনা এবং ঐ পথে গমন করিলে মেঘের বক্তিগত লাভের বর্ণনা করিতে তুলিল না। যক্ষের বার্তার মধ্যে একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। যখন তাহার মনে স্ত্রীর কথা উদয় হয় তখন সে সমস্ত তুলিয়া যায়। কিন্তু আমরা ইহার জন্য যক্ষকে দোষ দিতে পারি না। কারণ কালিদাসই নির্দেশ করিয়াছেন :—

“মেঘালোকে ভবতি স্থখিনোহ প্যন্যথা বৃত্তি চেতঃ”

কণ্ঠাশ্লেষা প্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূর সংহে ॥

অর্থাৎ মেঘদর্শনে স্থখিজনের চিত্তও বিকারযুক্ত হয়। কণ্ঠাশ্লেষকামী জন দূরে থাকিলে ত কথায় নাই। ইহার পর আসে সমস্ত মেঘদূতের আকর্ষণীয় বস্তু যক্ষপত্নী, পাঠক কালিদাসের ভাষায় যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা জানিয়া রাখুন—

“তস্মৈ শ্রামা-শিখর দশনা পক্ষ বিধাধরোষ্ঠী

মধ্যে ক্ষমা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা নিয়নভিঃ।

উত্তর মেঘে কবি যক্ষপত্নীর সে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার অন্তরের অন্তরতম স্পন্দনটাও পূর্ণরূপ গ্রহণ করিয়া পাঠকের মানস চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। পূর্বমেঘে পাই যক্ষের বিরহ বর্ণনা এবং উত্তর মেঘে পাই যক্ষ প্রিয়ার বিরহ বর্ণনা। যক্ষের চিন্তায় যক্ষপত্নী শীর্ণা, নিঃশ্বাসে তার কিশলয় তুল্য অধর ক্লিষ্ট, বিনা তৈলে স্নানহেতু গণ্ডপর্ষান্ত লম্বিত কক্ষ অলক বিক্ষিপ্ত, খেদহেতু অশ্রুভারাক্রান্ত পক্ষে তার চক্ষু আবৃত হইতেছে, যেন মেঘাচ্ছন্ন দিনে অর্ধ বিকশিত অর্দ্ধ মুদ্রিত স্থলকমলিনী।

আমার সর্বশেষ বক্তব্য কালিদাসের মেঘদূত পাঠ করিলে যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার স্বর্গীয় দাম্পত্যপ্রেম ও ভালবাসার প্রবাহে প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার মন আগ্নত করিয়া ফেলে।

বাঙ্গলার ন্যায্য প্রাপ্য অঞ্চল

অধ্যাপক শ্রীবসুধানাত্ত ভট্টাচার্য্য এম-এ

বঙ্গ ভাষাভাষী অথচ বাঙ্গলা হইতে বিচ্ছিন্ন জিলাগুলিকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ হইতে যে দাবী উঠিয়াছে উহাকে লঘু ও দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী ও সুসংহত দলের নিরন্তর প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে ন্যায় ও যুক্তির দৃষ্টিতে এ দাবী যে অকাট্য তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন ও জনমনে মুদ্রিত করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে বাঙ্গলা দেশের সমক্ষে যে কয়টি জীবন মরণের সমস্যা ইহা তাহার মধ্যে প্রধানতম। ইহা এ প্রদেশের বিলাস বা

স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন নহে—ইহা বাঙালী জাতির নিছক অস্তিত্বের সহিত জড়িত। ব্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অংশে যে পরিমাণ ভূমি নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা জন সংখ্যার অনুপাতে এবং পূর্ব পাকিস্থানের তুলনায় অনান্য ও অনুচিতভাবে কম ইহা সর্বজনবিদিত। যে ভাবে এই অসঙ্গত বৈষম্যের প্রথমেই প্রতিরোধ করা উচিত ছিল তাহা আমাদের মুখপাত্রগণ করেন নাই। এখন জনসাধারণকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে—কিন্তু

যাহাদিগের নেতৃত্বে ইহা ঘটয়াছে—বোম্বেদাদের পরে উহার প্রতীকার করিবার চতুর্থাংশ তাহাদিগের যে কোনরূপ দায়িত্ব আছে তাহা তাহারা বোধ করেন না। বরং সে দুর্ভাগ্যের মাত্রা যাহাতে বাড়ে তাহাতেই তাহারা প্রশ্রয় দিতেছেন। যে বিষয় বিভাগের ফলে পশ্চিম বঙ্গের দুঃখ দুর্ভোগ বাড়িয়াছে তাহার কতক নিরাকরণ হইতে পারে বিহারের অন্তর্গত বাঙ্গালী বহুল এই অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্ত করিলে। অন্যথা বাঙ্গলার সংস্কৃতি ও সভ্যতা সাহিত্যের সম্পদ, জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি, জাতির স্বাস্থ্য ও জীবিকা এ সকলই বিপন্ন হইয়া পড়িবে—ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। সর্বোপরি উৎকর্ষ ও আশঙ্কার কারণ ইহাই যে এই ন্যায্য প্রাপ্য অঞ্চলগুলি ফিরিয়া না পাইলে পশ্চিমবঙ্গে অধিবাসী ও আগন্তুক লইয়া যে বিপুল লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে—তাহার বাঁচিবার জন্য স্থান সংকুলান হইবে না। ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী দুর্নীতির খেয়ালে অন্যায় ভাবে যাহারা এগুলি লাভ করিয়াছে তাহাদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালীর পক্ষে এ অঞ্চলগুলি প্রাণের দায়ের অধিক প্রয়োজন ইহা অবিসংবাদিত তথ্য। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বাঙ্গলার এ দাবী প্রথম ও সর্বপ্রাথমিক।

১৯১১ সালে দিল্লী দরবারে ব্রিটিশ সম্রাটের ঘোষণায় এই অঞ্চলগুলি তখন নব গঠিত বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন ঐ প্রদেশের দিক হইতে এগুলির উপর কোন দাবীর কথা কাহারও মনে বা কাণে উঠে নাই। ব্রিটিশ শাসন তন্ত্রের স্বৈরাচারই এ ব্যবস্থার মূলে ছিল। সে আজ ৩৭ বৎসরের কথা। তখনই বাঙ্গলা দেশ হইতে এ অত্যাচার ব্যবস্থার প্রতিবাদ উঠে এবং তদবধি সে প্রতিবাদ নানা ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ডাক্তার পট্টভী মীতারাশিয়া ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ সংগঠনের নীতি কংগ্রেসে উপস্থিত করিবার বহু পূর্বে বাঙ্গলার এই প্রতিবাদ আত্মপ্রকাশ করে। সে নীতি কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে অল্প প্রদেশের ক্ষেত্রে কার্যে পরিণত হইতেও চলিয়াছে। অথচ যে বাঙ্গলা দেশের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক এবং সর্বপ্রথমে উত্থাপিত দাবী তাহার সপক্ষতা করিবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠিত নেতাই ত্রায়বুদ্ধি বা বিবেক চঞ্চল হয় না। ইহাই অদৃষ্টের শোচনীয় পরিহাস।

বাঙ্গলার এই দাবী প্রতিহত করার জন্য অসদ্যুক্তি ও

অপকৌশল বিনা লজ্জা ও সঙ্কোচে প্রযুক্ত হইতেছে। বলা হইতেছে একুশ দাবী স্বীকার প্রাদেশিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক যাহার প্রাপ্য বা প্রত্যাশিত নহে, যাহার ন্যায্য স্বত্ত্ব নাই বৈদেশিক শাসকের হুজুর্ভিত্তিক খেয়ালে সে যাহা লাভ করিয়াছে তাহা শুধু অধিকার বলে সে যদি দখলে রাখিতে চেষ্টা করে তাহা প্রাদেশিকতা নহে—অন্যায়ও নহে, দুর্নীতিও নহে। কিন্তু যাহার অবিসংবাদিত স্বত্ত্ব ও ন্যায্য প্রাপ্য, সে যদি তাহা বাঁচিবার অবকাশের খাতিরে ফিরাইয়া পাইতে চাহে তাহা দুষণীয় প্রাদেশিকতা। অন্যায় অধিকার ও ন্যায্য দাবীর মধ্যে এই যে বিপর্যয় ইহা ভারতের রাষ্ট্রীয় বায়ুমণ্ডলকে দূষিত এবং নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করিতেছে এবং শুধু ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গলার পুনর্গঠনের বাপারে নহে—কিন্তু আরও কয়েকটি বিষয়ে ইহা লক্ষিত হইয়া থাকে। যে নীতি বা নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে বাঙ্গলার স্থলে তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে—ইহা দুর্কোষ্য। অথচ বর্তমান কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষ এই অতি সুস্পষ্ট অসঙ্গতি কালক্ষেপ ও কুটিল চক্রান্তের দ্বারা মানাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন এ ধারণা বাঙলার জনসাধারণের মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে।

অসদ্যুক্তি যেখানে কার্যকরী নহে—সেখানে অপকৌশল অবলম্বিত হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে পরিণত করিবার জন্য বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রকাশ্য ভাবে প্ররোচনা দিতেছেন। বাঙ্গালীদিগের সাহিত্যিক সম্মেলনের অস্থলানে নানারূপ বাধা দান ও আপত্তি করা হইতেছে। বাঙ্গলার সহিত পুনঃ সংযোগের যাহারা উদ্যোগী নানা ভাবে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। উদ্দেশ্য—নির্যাতনের ভয়ে যাহাতে এ সকল অঞ্চলে স্বাধীন মত অভিব্যক্ত না হয়।

এ সকল প্রতিকূল মনোভাব ও বিরোধী চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙ্গলার দাবী যাহাতে অনিবার্য ভাবে স্বীকৃত হয় সেজন্য নিরন্তর ও সংগঠিত আন্দোলন অবিলম্বে আরম্ভ হওয়া উচিত। অন্যান্য সকল প্রদেশেই মর্যাদা ও আত্মরক্ষার বুদ্ধি জাগিয়াছে। এবং তাহা নিন্দার বিষয়ও নহে এবং নিন্দিতও হয় না। কিন্তু বাঙ্গলার আত্ম সন্নিহিত উদ্ধুদ্ধ হওয়ার চিহ্নমাত্র দেখা দিলে, যাহারা এ প্রদেশের অধিবাসীদিগকে বঞ্চিত করিয়া লাভবান হইতেছে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং

প্রাদেশিকতার অপবাদ ঘোষণা করে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বসীমান্ত প্রদেশ বঙ্গভূমি। দুর্বল অসংহত অন্তর ও বহি-
দ্বন্দ্ব জর্জর এই সীমান্ত প্রদেশ ভারতের পক্ষে শুধু সমস্যা
নহে বিপদের আঁকর হইতে পারে। স্বাধীনতা লাভের ফলে
অন্য সকল প্রদেশের মত বঙ্গভূমি বাহাতে স্বস্থ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ
জীবন যাপন করিতে পারে তাহা ভারতের নেতৃপ্রধানগণের
লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত। তাহা যে হইতেছে না ইহাই
স্বাধীনতার পরিবেশের মাঝে বঙ্গবাসীর অল্পভূতি ও অভিযোগ।
বাঙ্গলার আয়তন তাহার ন্যায্য সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে এ
অল্পভূতির তিক্ততা ও অভিযোগের তীব্রতা অনেকখানি দূর
হইবে। বারংবার আবৃত্তির দ্বারা অসত্য যেমন সত্যে পরিণত

হয় না—অনেকদিন চলিয়া আসিতেছে বলিয়া সেইরূপ
কোন অন্যায় বা অন্যায় তাহার বিপরীতে দাঁড়াই না।
আমাদিগের জাতিগত সহিষ্ণুতা বহু অন্যায় ও অন্যায়
দীর্ঘবে মানিয়া লইয়াছে কিন্তু পূর্ববঙ্গের বিপুল ভূভাগ
হইতে অপস্থত হইয়া এবং বিহারের অন্তর্ভুক্ত মানভূম, সিংহ-
ভূম, পূর্ণিয়া, ও সাঁওতাল পরগণার বিপুল স্বজন সমষ্টি
অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে বঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালীর যে দশা হইবে
তাহা অচিরে নিশ্চয় হওয়ারই সমান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের
পশ্চাতে যে মর্শ্বপীড়া ছিল উপস্থিত দাবীর মূলে তাহার
বহুগুণ হুংখ হুঁদশার অল্পভব রহিয়াছে—ইহা জনমতের সুস্পষ্ট
অভিভাব্যক্তিতে প্রতিপন্ন হওয়ার সময় উপস্থিত হইরাছে।

বর্ষা নিশীথে

শ্রীকালিদাস রায়

—(প্রাচীন)

তুহঁরহ গরবিনি বাসক গেহ
সো ভিগি আওল শাউন মেহ।
তুহঁ শুতলি সুখময় পরিবন্ধ
সো তরি আওল পাতর পঙ্ক।
এ ধনি দূর কর অসময় মান।
পূর্ণফলে মীলল রসময় কান।
ঝলকত দামিনি যামিনি ঘোর
কামিনি কি তেজই কাস্তক কোর,
ঘন ঘন গরজন অম্বর মাহ
বরজত কোনে এ হেন বরনাহ।
এতহঁ কহত যব গতি মতি বাম।
না জানিয়ে কোই আরাধিল কাম।
গোবিন্দ দাস দেখব সব সাঁচ
কাকর অঙ্গণে কোপুন নাচ।

(অবর্তীত)

তুমি আছ গরবিনী নিজবাসে জেগে।
ভিজিয়া আসিল সে যে শাউনের মেঘে।
তুমি শুয়ে আছ বেশ সুখের পালঙ্কে
সে যে পার হয়ে এল প্রান্তর পক্ষে।
দূর কর মান একি মানের সময়
পুণ্যের ফলে দ্বারে এল রসময়।
ঝলকে দামিনী ঘোর যামিনী উতোল
কামিনী কি এ সময়ে ত্যজে পতি কোল।
অম্বর মাঝে হয় ঘন গরজন
নিজ নাথে একালে কে করে বরজন।
তোমার যেরূপ দেখি মতিগতি বাম
ভাগ্য ফলিল তার যে পূজিল কাম।
গোবিন্দদাস কহে অঙ্গনে কার
জানিনা সাধিতে যেতে হবে বারবার।

“স্মৃতি”

শ্রীমতী

আজ সকাল হতেই কাত্যায়নী দেবীর কী যে হইয়াছে, রাড়ীশুদ্ধ কেহ ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। পুত্র পুত্রবধূগণ প্রাণপণে তাঁহার তুষ্টি বিধান করিতে হিমসিম খাইয়া যাইতেছে, স্বয়ং কৰ্ত্তা দেবনারায়ণ মাঝে মাঝেই অন্তরে আসিয়া তাঁহাকে সাধিয়া যাইতেছেন,—ওঠ, কিছু অন্ততঃ মুখে দাও, বেলাও পড়ে এলো। কিন্তু কাহারো ব্যস্ততা, কারো সাধ্যসাধনায় আজ কাত্যায়নী বিচলিত হইতেছেন না। কাল সারাদিন কান্দালী ভোজন করাইয়া অপরিণীত আশ্রিতে সেই যে এলাইয়া পড়িয়াছেন, এখন পর্যন্ত উঠিতেছেন না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াও জবাব পাইতেছে না। নিবন্ধ দৃষ্টিতে কাত্যায়নী সকাল হইতে কি যে ভাবিতেছেন, ভাবিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোক অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

কাত্যায়নী ভাবিতেছেন—ভাবিতেছেন সেই ভিখারিটির কথা। “ভিক্ষা দেবে ছুটি” করিয়া ছয়ায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শীর্ণ দেহ, বার্কাকোর ভাবে একটু হুজু মুখে পাকা দাড়ি গৌড়। ভিখারীরের প্রতি এমানিতেই কাত্যায়নীর অপরিণীত মমতা। তাহার উপর বেচারী বুদ্ধ—ছিন্ন মলিন কাপড় একখানা পরিধান। কাত্যায়নী একখানা পুরাতন ধুতি ও একসের চাল ঢালিয়া দিলেন ভিখারীর আঁচলে। কোটরগত নয়নে ভিখারীর অশ্রু জমা হইল। “তুমি কি রাজরাণী মা?” বলিয়া সে লাঠিখানা কপালে ঠেকাইয়া বহুক্ষণ নত হইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর করিয়া চলিয়া গেল।

কাত্যায়নী তাহার সেই জলভরা চোখে কি যেন দেখিলেন। কেন যেন মনে হইল, এ চাহনি তাঁহার বহু পরিচিত। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিলেন, কোথায় ইহাকে দেখিয়াছেন। মনে পড়িল না। নিবিষ্টভাবে বহুক্ষণ চিন্তার পরে মনে করিতে পারিলেন। কিন্তু ভিখারী তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও

তাহাকে পাওয়া গেল না যখন, তখন কাত্যায়নী কান্দালী ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না, সে ভিখারী ধরা পড়িল না।

* * *

সে কি আজ? সে আজ কতকাল হইয়া গেল। কাত্যায়নী স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন তিনি সেই আট দশ বছরের ‘বুনি’ হইয়া গিয়াছেন। মহাকাল তাঁহাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া সেই চল্লিশ বছরের ওপারে নিয়া হাজির করিয়াছে। বুনি তাঁতের আটহাতি ডুরে শাড়ীখানা কোমরে জড়াইয়া জঙ্গলের মধ্যে কানাইলালকে বনবাটালির সন্ধান দিতেছে।

—এই কানু, ঐ দ্যাখ উ-ই খোপের মধ্যে একটা দ্যাখা যাচ্ছে। পারবি আনতে? দাঁড়া, আমি এই আনারস পাতাগুলো সরিয়ে ধরি। চলে যা এর মধ্যে দিয়ে।

একটি বনবাটালি পাওয়া গিয়াছে। উল্লাসে অধীর কানাইলাল সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া দিল কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিল, একটা আনারস ফুলের ওপরটিতে একটা সবুজ সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। বুনি তিন পা সরিয়া আসিল। আনারস পাতাগুলি ছাড়া পাইয়া কানাইকে জড়াইয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে বুনি চীৎকার করিয়া উঠিল—এই কানু সরে যা’ শীগগির, আস্তিক মুন, আস্তিক মুন। ওই যে তোর পাশে গেল, সর না!

কিন্তু কানাই তখন আনারস পাতার নাগপাশজালে পড়িয়াছে। কোন মতে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বুনির কাছে আসিয়া প্রথমেই সে দুই চড় বসাইল বুনির গালে। ক্রোধে ফুলিয়া ফুলিয়া বলিল—লক্ষ্মীছাড়ী, আর করবি ওরকম? দ্যাখ ত’ কি হয়েছে?

সত্যি তাহার সর্বাঙ্গে তখন লাল লাল ছড়ের মুখে রক্ত জমিয়া উঠিয়াছে, অল্পতপ্ত বুনি তাহার জানা একমাত্র মোক্ষম ঔষধের উল্লেখ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—গাঁদা পাতা লাগিয়ে দিলে একুনি সেরে যাবে দেখবি। চল আমি ক’রে দিচ্ছি।

প্রতিদিনের এমনি তুচ্ছ খুঁটিনাটি ঘটনার সমাবেশে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহাদের বাণ্যজীবন। অবশেষে একদিন কৈশোর আসিল, ছ'জনেরই মনে প্রবেশ করিল কল্পনার বীজ। নানান ভাবনা ভাবিতে শিখিল তাহারা। সন্ন্যাসীদের জীবন যাত্রা বুনির মনে এক কল্পলোকের মায়া বুলাইয়া দিয়াছিল। সে একদিন সোজাসুজি ঘাইয়া কানাইকে মনের কথাটা জানাইয়াই ফেলিল—কান্না, আমি না, সন্ন্যাসী হব' জানিস্ ?

প্রথমে কানাই কথাটা বিশ্বাসই করে নাই। কিন্তু বুনি যখন তাহার মনের মাধুরীতে রঙিন করিয়া সন্ন্যাসীদের বনবাসের, কংসমূল খাইয়া জীবন ধারণের এবং ভগবানের সাথে যথেষ্ট আলাপ সানাপের একটা বিশদ বর্ণনা দিয়া ফেলিল। তখন আর কানাই সংসারে থাকার কোন সার্থকতাই খুঁজিয়া পাইল না। ঠিক হইল, দুইজনে মিলিয়াই সন্ন্যাসী হইবে।

কিন্তু টাকা চাই যে! প্রথমতঃ আলখান্নার মত পোষাক একটা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বাড়ী হইতে দ্রুপে করিয়া পালাইবার সময় ভাড়া লাগিবে। তৃতীয়তঃ সন্ন্যাসী হবার আগে পর্য্যন্ত কয়েকদিন ত' ভাত-তরকারি মাছই খাইতে হইবে, তার জন্তেও পয়সা চাই। কাজেই, বহু টাকার প্রয়োজন। অন্ততঃ কুড়ি টাকা।

দুইজনে কায়মনোবাক্যে টাকা জমাইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বুনিই যেন অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার আজকাল বুদ্ধি খুলিয়াছে, কানাই এর মতো আজবাজে কথা বড় একটা বলে না।

একদিন কানাই অত্যন্ত চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, আমাদের কুড়ি টাকা ফুরিয়ে গেলে তখন কি করব রে ?

বুনি কিছুক্ষণ জ্ঞ কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া বলিল—কেন, ভিক্ষা করব। সন্ন্যাসীরা ত' তাই করে। দেখিস্ নি সেবার ঐ ঘে ছ'জন আমাদের হাটখোলার বটগাছের তলায় এসে বসেছিলেন। সবাই ফল টল দিত। কারো বাড়ীতে গেলেই তারা বেশী বেশী ক'রে চাল দিত'।

উক্ত সন্ন্যাসীদ্বয়ই ত বুনির কল্পনার বাহক, বলাই বাহুল্য।

কিন্তু বুনির প্রস্তাবটা কানাইলালের মনঃপূত হয় নাই। ও বলে—ভিক্ষা করব? দুর্! সেত' চাঁওয়া-হ'ল। মা যে বলেন, কারে কাছে কিছু চাইতে নেই।

বিজ্ঞের মত বুনি শিরঃ সঞ্চালন করিয়া বলে—আহা, সেত এমনি মানুষের বেলায়। সন্ন্যাসীরা চাইলে কিছু হয় না।

বুনি ও কানাই আরো বড় হইয়াছে। ছ' জনেরই বুদ্ধি আরেকটু পাকিয়াছে। সন্ন্যাসী হওয়া সম্বন্ধে তাহাদের আলোচনাটা আজকাল একটু উচ্চতাতে বহিতেছে এবং টাকাও ছ' জনেই জমাইতেছে।

এইরূপে যখন আঠারো টাকা সাড়ে বার আনা জমিয়াছে, তখন কানাই এক দিন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বুনিকে তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করিল—বুনি, ভোর নাকি বিয়ে?

বুনি মুখ টিপিয়া হাসিল একটু। কিন্তু কানাই একেবারে হিংস্র হইয়া উঠিল, দাঁত কড়মড় করিয়া কহিল—কে তোকে বিয়ে করতে বলেছে, বল শিগ'রি।

নিরুপায় বুনি বলিল—বাঃ কে আবার বলবে? বাবা বিয়ে দিচ্ছেন যে, আমি কি করবো বলো?

বুনির কথাবার্তা অনেক ভদ্র হইয়াছে আজকাল। কানাইকে আর নাম ধরিয়াও ডাকে না, তুইও বলে না।

তীব্র কণ্ঠে কানাই বলিল—তার মানে তুই সন্ন্যাসী হবি না? তার মানে তুই এ্যাড্‌মি মিছে কথা বলেছিস, তার-মানে-তুই জোচ্চোর, তুই নেমক হারাম, তুই.....

ক্ষিপ্ত কানাই আর কিছুই বলিতে পারিল না।

বিবাহের দিন বুনি কানাইকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। গোলমালে ভীড়ে সকলেই ব্যস্তভাবে যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু কানাই একবারও আসিল ও না, গেলও না। পরদিনই বুনিকে চলিয়া যাইতে হইবে স্বস্তর বাড়ী। বুনি ভাবে কান্না কি একবার দেখা করিতেও আসিবে না?

ভোর বেলা ঘুম ভাঙিতেই বুনি উঠিয়া দীঘির ঘাটে চলিয়া গেল। গতকাল হইতে সমস্ত বুক জুড়িয়া কেমন একটা বেদনা অন্তর্ভব করিতেছে সে। এই এতদিনের স্মৃতিমাখা বাড়ীঘর, পুকুরঘাট, বাগান, ঝোপঝাড় এবং সবার উপরে আত্মীয় স্বজন—ইহাদের সকলকে ছাড়িয়া চলিয়াছে সে আজ। বুকে বোধহয় তাহারি রেদনা।

বিরাট দীঘির পাড়ে বাঁধান প্রশস্ত ঘাট। আশেপাশে ঘন গাছের ছায়া, ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, তখনও গাছের ফাঁকে ফাঁকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। ঘাটে পা দিয়াই বুনি

চম্কাইয়া উঠিল। সিঁড়ির উপর কে যেন মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ভাল করিয়া দেখিল—কানাই। মুখ ফুলিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটি লাল টকটকে।

—একি কান্ধা কখন থেকে ব'সে আছ এখানে?

কানাই দূরে ভাল গাছের সারির দিকে চাহিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। বিষমভাবে বুনি বলিল—আমার ওপর রাগ করেছে কেন বলত? আমি কি করতে পারি? দাখ মেয়েরা বড় হলে তাদের বিয়ে দিতেই হয়, নয়ত লোকে কত কি বলে।

কানাই চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল—আর শোন। তুমিও ওসব পাগলামী ছাড় কান্ধা। সম্যাসী হ'তে অনেক কষ্ট করতে হয়। আমি ভেবে দেখেছি। সারা জীবন ভিক্ষে করে খাওয়াটা কি ভাল?

এবারে কানাই মুখ ঘুরাইয়া একটু তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—চুপ করো বুনি, উপদেশ দিও না আমার। ওসব শুনে ভাল লাগে না।

সেদিন সন্ধ্যায় যখন বুনি খালের ঘাটে নৌকায় উঠিতে নাইতেছে, কানাই তখন পুবদালানের খেজুর গাছটার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল সে

বুনির গতিপথের দিকে। বুনি একবার ঘোমটার ফাঁকে দেখিয়াই চোখ নামাইয়া লইল। চোখে তাহার অশ্রু ছাপাইয়া উঠিল।

তাহার পর যখন বুনি খন্ডুর বাড়ী হইতে আসিল, কানাইলাল তখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ বলিতে পারে নাই। গ্রামে সে আর ফিরিয়া আসে নাই।

সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ বছরের কথা।

কাত্যায়নী ভাবিতেছেন, এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর কি সে এমন ছন্নছাড়া জীবনই কাটাইয়াছে? কেন? কেন সে উন্মুখবৃত্তিকেই জীবন যাত্রার পরম বৃত্তি বলিয়া মানিয়া লইল? বাল্যকালে কোন্ এক বাল্যসঙ্গী তাহার অপরিণত বুদ্ধির প্রেরণায় এক অসম্ভব পরামর্শ দিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। সেই পরামর্শকে কেন সে জীবনের মূলমন্ত্র করিল? এই সুদীর্ঘ কালেও কি সে সেই অকালপক্ক বালিকার কল্পনা প্রবণতাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই?

কাত্যায়নী দেবী কাদিতে লাগিলেন। ভিখারীর সেই জলভরা হ'ট চোখ তাঁহাকে করুণকণ্ঠে যেন বলিয়াছে—ছি ছি চিনিতে পারিলে না? যে সমস্ত জীবন ধরিয়া তোমার স্বাতি বহন করিল, তাহাকে এত সহজেই বিস্মৃত হইলে? চিনিতে না?

ব্রতচারী আন্দোলন

(বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রচিত "The Bratachari Movement")

ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ—শ্রীআরতি দত্ত।

অগ্রাণ্ড স্বাধীন-সমৃদ্ধিশালী দেশের তুলনায় ভারতবাসীর জীবন যে কতখানি নিরানন্দ একথা তাহারা নিজেরাই উপলব্ধি করে না। কিন্তু যখন কোঁতুহলী পর্যটকেরা বিদেশ হইতে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসেন, তখন তাঁহারা এই পার্থক্য হজেই অনুভব করেন এবং অনেকেই একথা তাঁহাদের রচনায় স্লেষ করিয়াছেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে সর্জেন্ট সার্জন ডওয়ার্ডের প্রধান চিকিৎসক (Sergeant Surgeon) রি ফ্রেডরিক ট্রিভিস পৃথিবী পর্যটনকালে ভারতে আসেন বং তাঁহার ভ্রমণ ইতিহাস "The other side of the

lantern" নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ আছে।

"ভারতবর্ষে পর্যটকেরা অল্পকাল মধ্যেই অনুভব করেন যে এক বিষাদের ভাব এদেশ ও দেশবাসীর উপর ছড়াইয়া রহিয়াছে।" (পৃঃ ৩৮)

"দেশ অপেক্ষাও বিমর্ষ তাহার সাধারণ অধিবাসীগণ। তাহারা শীর্ণ ও শ্রান্ত, তাহাদের পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন ও সামান্য। তাহাদের সবাইকেই দরিদ্র বলিয়া মনে হয় এবং তাহারা পরিশ্রম করে কেবল যেন কোনক্রমে বাঁচিয়া থাকার জন্ত

তাহারা কম কথা বলে, হাসেও কদাচিৎ। বাস্তবিক শিশু ছাড়া কাহারও মুখে হাসি কদাচিৎ দেখা যায়। কেবল পথ অতিবাহিত করার জন্যই যেন তাহারা ধূলিসমাকীর্ণ পথে চলে। কোথায় যায় জিহ্বার জানেন, কারণ তাহাদের দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা শতাব্দী ধরিয়া ছন্নছাড়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রভাতের অরুণোদয়ের সঙ্গে তাহাদের ক্ষীণ দেহের প্রতিবিম্ব আলোক বক্ষে ভাসিয়া উঠে, দিবসের প্রথর রৌদ্রালোক হইতে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত তাহারা পথে চলে এবং মনে হয় কে জানে হয়তো সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই তাহারা চলিবে। (পৃ: ৪২) গনেরো বৎসর পূর্বে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের রিপোর্টে, স্ত্রীর মাইকেল স্কুলার একটা সমগ্র অধ্যায়ে বাংলাদেশের ছাত্রদের নিরানন্দ জীবনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

তাহা ইহার উৎপত্তি প্রসার এবং আদর্শ সম্বলিত এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশ হইবে।

আন্দোলনের উৎপত্তি

পুরাতন বাংলার খ্রীষ্ট জেলার একটা সুদূর পল্লী বীরশ্রীতে দত্ত মহাশয়ের বালাজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার বালাজীবনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার সহিত এই আন্দোলনের জন্ম ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। তাঁহার বালাকালে আধুনিক শিক্ষার এবং বর্তমান সভ্যতার অর্থ-নৈতিক সমস্তা এই গ্রামে প্রভাব বিস্তার করে নাই। তখনও গ্রামবাসীর জীবন প্রাচীন ভারতের সামাজিক জীবনাদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। বর্তমান দিনের মত মানুষের জীবন যাত্রায় এত ভেদাভেদের সৃষ্টি হয় নাই। কর্ম এবং আনন্দ, শিল্প এবং ধর্ম একটা সুদৃঢ় বন্ধনে



শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত ব্রতচারী আন্দোলন যদি এদেশের মানুষের জীবনে বিশেষ করিয়া যুবকদের মধ্যে আর কিছু না করিয়া শুধু আনন্দ দানই করিয়া থাকে তাহা হইলেও এ আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখার সার্থকতা আছে। কিন্তু ব্রতচারী আন্দোলন অনেক কিছু করিবার ভরণা রাখে এবং

যুক্ত ছিল। তখন একটা আনন্দপূর্ণ সামাজিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক সাহচর্যের ভাব এদেশের মানুষের জীবনে দৃষ্ট হইত।

দত্ত মহাশয়ের পিতা এবং জ্যেষ্ঠতাত গ্রামের জমিদার হইলেও সকলের সহিত দিনের বেলা নিজের হাতে ক্ষেত্রে

লাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করিতেন। সন্ধ্যায় সর্ব জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ মিলিত হইয়া প্রাচীন নৃত্য ও কীর্তন গানে যোগদান করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। কোন পূজা ও ব্রত উপলক্ষে তাঁহার মাতাও সর্ব জাতির মেয়েদের সহিত মিলিত হইয়া এই সব প্রাচীন জাতীয় নৃত্যগীতে যোগ দিতেন। গ্রামের এই নৃত্যগীতের বৈশিষ্ট্য ছিল ইহার সারল্য ও আধ্যাত্মিকতায়। দত্ত মহাশয় তাঁহার জীবনে অন্তরের বহু প্রেরণা এবং আত্মিক অনুভূতি সেই শৈশব জীবনে দৃষ্ট ও শ্রুত নৃত্যগীত হইতে পাইয়াছেন। যখন তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য সহরে

নাগরিক শিক্ষার প্রভাব সূদূর গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অভিজাত ঘরের নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা হীনমন্যতাবোধ জাগিয়া উঠিল; তাহার ক্রমে ক্রমে এই সব সুন্দর সুন্দর মূল্যবান প্রাচীন শিল্পগুলিকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিল, পরিণামে এই সব কলাসম্পদ কেবল পল্লীর অতি দরিদ্র অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে লুপ্তপ্রায় ভাবে বাচিয়া রহিল। বস্তুতঃ আধুনিক শিক্ষার দ্বারা সঞ্চারিত এই হীনমন্যতাবোধ দত্ত মহাশয়ের অবচেতন মনেও সংক্রমিত হইয়াছিল এবং ১৯০৫ সালে যখন তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবিষ্ট হন, তখন আমাদের দেশের



আসিলেন তখন তিনি দেখিলেন যে আধুনিক শিক্ষা এবং শিক্ষিতেরা এই সব প্রাচীন নৃত্যগীতগুলিকে বর্জ্য পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন মনে করিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখে; তাই সেযুগে যখন কোন ব্যক্তি তথাকথিত শিক্ষিত হইত তখন সে আর এই আড়ম্বরশূন্য সহজ গ্রামা শিল্পগুলির সহিত কোন সম্পর্ক রাখিত না। ক্রমে এক শ্রেণী গড়িয়া উঠিল যাহারা নিজেদের দেশের এই সুন্দর প্রাণবন্ত জাতীয় শিল্পধারাগুলির সহিত পরিচিত নয় অথবা যাহাদের ইহার কলাসৌন্দর্য বা মূল্য বুঝিবার শক্তি নাই। কিন্তু তখনও পল্লীর সাধারণ, অশিক্ষিত অধিবাসীদের মধ্যে এই জাতীয় নৃত্যগুলি জীবন্তভাবে বর্তমান ছিল। ক্রমে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে

কুষ্টির মধ্যে যে সকল সহজ গ্রাম্য সঙ্গীত ও নৃত্যগুলিতে বাল্যজীবনে তিনি পিতার সহিত সানন্দে যোগ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে ঐশ্বর্য আছে তাহা তিনি নিজেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে সেসময়ে নৃত্যকে ভাল জিনিষ বলিয়া কেহ মনে করিতেন না, বিশেষ করিয়া অভিজাত ঘরের মহিলাদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথকেও তাঁহার শিক্ষানিকেতনে মেয়েদের মধ্যে নৃত্যের প্রবর্তন করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। যদিও বর্তমান দিনে সম্ভ্রান্ত গৃহের বালিকাদের মধ্যে নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়, তবুও কবিকে এ বিষয়ে অনেক সমালোচনা সহ্য করিতে হয়। এই থানে মনে রাখা দরকার যে, ব্রতচারী নৃত্যের মত রবীন্দ্রনাথ

প্রবর্তিত নৃত্যগুলি লোকমুখ্য নয়। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করিবার চব্বিশ বৎসর পর ১৯২৯ সালে, জামুয়ারী মাসে যখন দত্ত মহাশয় চতুর্থবার ইউরোপ ভ্রমণে যান, তখন লণ্ডনে রয়েল এলবার্ট হল, ইংলণ্ডের লোকনৃত্য উৎসব দেখিবার তাঁহার সুযোগ হয়। তখন তিনি দেখেন যে, সেদিল সার্প প্রবর্তিত লুপ্তপ্রায় লোকসঙ্গীত ও নৃত্য পুনরুদ্ধার করিবার আন্দোলন কিভাবে সেদেশের সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের দ্বারা উৎসাহ ও সমাদর লাভ করিতেছে। লোকনৃত্য ও সঙ্গীতের এই উৎসবটী তাঁহার নিজের গ্রামের ও বাংলাদেশের অন্যান্য বহু এমনি সুন্দর, সহজ বীরত্ববাজক কিন্তু অধিকতর আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত পল্লী নৃত্য গীতের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। ইহা তাঁহার অন্তরে যেন বাহুমন্ত্রের কাজ করিল। যখন তিনি এই নৃত্য প্রদর্শনী দেখিতেছিলেন, তখন বর্তমান ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ফলে যে হীনমন্যতাবোধের শৃঙ্খল তাঁহার আত্মাকে দীর্ঘকাল আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই শৃঙ্খল যেন হঠাৎ কিসের স্পর্শে ভাঙিয়া গেল। তাঁহার নিজের দেশের জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি একটা নতুন সন্মম ও প্রকৃত ভাব জাগিয়া উঠিল। নিজের মনেও তিনি

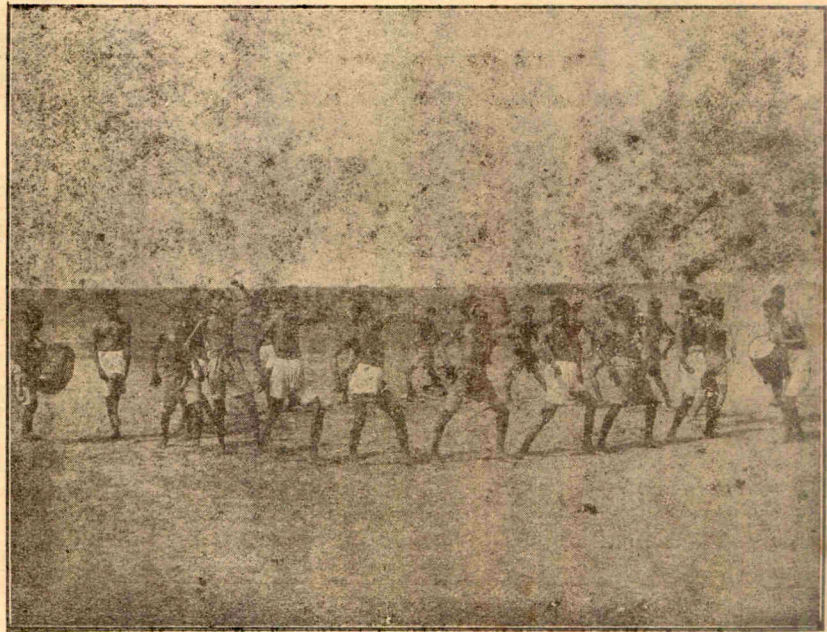
একটা আত্মমর্ধ্যাদাবোধ অনুভব করিলেন যাহা পূর্বে কখনও করেন নাই। তখন লণ্ডনের সেই জনসভাগৃহে বসিয়া তিনি মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাংলার প্রাচীন নৃত্যগীত পুনর্জাগরিত করিবার জন্য এমনি একটা আন্দোলনের তিনি উদ্বোধন করিবেন।

ইংলণ্ডের লোকনৃত্য সমিতি কর্তৃক সঞ্জীবিত সেদেশীয় পল্লী নৃত্যগীতগুলি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বাংলার লোকনৃত্য পল্লীগীতি আজও গ্রামে গ্রামে

পল্লীবাসীর মধ্যে প্রাণবন্ত জাতীয় প্রথাক্রমে বাঁচিয়া আছে।

আন্দোলনের প্রসার—

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ময়মনসিংহ জেলার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীরূপে নিয়োজিত হন। সেখানে সৌভাগ্যক্রমে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সুন্দর ও সজীব জারি নৃত্যের ধারা এবং হিন্দুদের মধ্যে বাউল নৃত্য আবিষ্কার করেন। সেই সময়ে ১৯১৯ সালে নভেম্বর মাসে তিনি ময়মনসিংহ লোকনৃত্যগীত সমিতির গঠন করেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহার বাসভবনে এই সব নৃত্যের উৎসব করেন। তিনি স্বয়ং এই সমবেত নৃত্যগীতে যোগদান করিতেন। এবং



জেলার সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রমহোদয়কে বিশেষ করিয়া যুবকদের ইহাতে যোগদান করিতে অনুপ্রাণিত করেন।

প্রথমে রাজসরকার এবং জনসাধারণ তাঁহার প্রকৃতস্বতা সম্বন্ধে গভীরভাবে সন্দেহান হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত একজন সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ প্রবীণ রাজকর্মচারীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত ও লজ্জাকর বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার আন্দোলনকে ছাড়িলেন না, চারিদিকের অজস্র সমালোচনা ও অনাস্থার কথা তাঁহাকে সঙ্কলিত করিতে

পারিলেন। তিনি এই জাতীয় সংস্কৃতি ধারার মধ্যেই তাঁহার দেশবাসীর মনের দৃঢ়নিবন্ধ হীনতাবোধ দূর করিবার মন্ত্র খুঁজিয়া পাইলেন। ইহার দ্বারা তাহাদের মনে একদিন দৃঢ়ভাবে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়া উঠিলে, কশ্মে ও সমাজ সেবার উৎসাহ আসিলে এবং সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা জাগিলে একথা তিনি উপলব্ধি করিলেন।

জাতিভেদ ছাড়াও ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে বর্তমান দিনে

প্রথম পল্লী উন্নয়নের চেষ্টার প্রবর্তন ও নেতৃত্ব করেন। তখন তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যখনই তিনি অন্য জেলায় বদলি হইতেন তখনই পূর্ববর্তী জেলার অধিবাসীদের মধ্যে পল্লী উন্নয়নের উৎসাহ ও উদ্যম নিস্তেজ হইয়া যাইত এবং কখনও সম্পূর্ণ ভাবে অন্তর্হিত হইত। কারণ গতানুগতিক ভাবে পল্লী সংগঠনের কাণ্ডাধারা অবলম্বন করিলে মানুষের মনে আন্তরিক কাণ্ডাধারা করিবার প্রেরণা বা উৎসাহ



জাগে না এবং তাহাদের মধ্যে একতারও সূত্রপাত হয় না। প্রাণবন্ত ও ছন্দপূর্ণ এই সমবেত নৃত্য গীতগুলিকে আবিষ্কার করিবার পর তিনি পল্লী সংগঠনের এবং সমাজ সংস্কারের উপযোগী গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার রচিত একটি গানের বিষয় হইল কচুরী পানির বিনাশ সাধন, একটির বিষয় হইল স্বাধীনতা আর একটি সাধারণের প্রার্থনার গান যাহা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলে সমবেত ভাবে নিঃসংশয় চিত্তে গাহিতে পারে। ইহা বাতীত সমাজসংস্কার চরিত্র গঠন, কায়িক পরিশ্রম এবং সমাজ সেবা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার রচিত বহু সঙ্গীত আছে। তখন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এই গানগুলি

আর একটা ভেদসৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং যাহারা নিরক্ষর বা মাতৃভাষায় শিক্ষিত এই দুই শিক্ষার মানুষ অজানিতভাবেই দুইটি শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রতচারী আন্দোলনের মধ্যে সমবেত নৃত্য গীত এবং সমাজ সেবার আদর্শ সর্ব জাতি, ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন একটি একতার বন্ধন আনিয়া দিল। ইহারও কয়েক বৎসর পূর্বে দত্ত মহাশয় বাংলা দেশের বিভিন্ন গ্রামে এবং জেলায় পল্লী সংগঠনের কাণ্ডাধারা করিয়াছিলেন। ১৯১৬-২০ সালে বীরভূম জেলায় এবং ১৯২১-২৩ সালে বাঁকুড়ায় তিনি ভারতে

শিক্ষিত এবং সহজ সুর ও অঙ্গচালনার সহিত এই গানগুলি করিত। এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের ব্যবধানে 'রাইবেশে' 'কাঠি' প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন লোক নৃত্য তিনি আবিষ্কার করেন। 'রাইবেশে' নৃত্য বাংলার হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের সময়কার সৈন্যদের প্রাণশক্তি পূর্ণ বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধের নৃত্য। এই সময়েই তিনি বাংলার প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন স্বরূপ বহু দারু, প্রস্তর ও মাটির মূর্তি কাঁথা পট প্রভৃতি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩২ সালে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা পল্লী নৃত্য

গীত শিক্ষার প্রচলন ও পল্লী শিল্পকলা সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের মানসে তিনি Rural heritage preservation Society of Bengal বা গ্রাম্য উত্তরাধিকার সংরক্ষণ সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। তদানীন্তন বাংলার Physical director শ্রীযুক্ত বুকানন তাঁহার পরিকল্পনার বিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী সমর্থক হন এবং বাংলার প্রতি বিদ্যালয়ে এই নব জাগরিত সমবেত লোকনৃত্য গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত বুকাননের চেঁচায় লোক-নৃত্যগীত দৈনিক শিক্ষার একটি বিশেষ অংশ বলিয়া বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগ হইতে পরিগণিত হয়।

১৯৩২ সালে এই সমিতি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রাদেশিক পল্লী নৃত্য, ক্রীড়া এবং সঙ্গীতাদি শিক্ষার জন্য একটি লোকনৃত্য শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন। এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিবিরের শিক্ষার্থীদের অন্তরে আত্মিক ও বাস্তব জীবনাদর্শের সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ় মহাশয় অনুভব করিলেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শবাদের একদিকে আছে বিশ্বমানবের ভাবনের পূর্ণ আদর্শ আর একদিকে আছে বাংলার মানুষের পূর্ণ বৈশিষ্ট্যময় আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্যময় ছন্দ ধারা। ইহার অনুসরণের অর্থ দেহ মন ও আত্মার পূর্ণ কৃষ্টি সাধন। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে রাখিয়া একটি পূর্ণ মানব চরিত্র গঠনের জন্য তিনি ছন্দযুক্ত কতগুলি ব্রত রচনা করেন। এই আদর্শকে তাহার সত্যরূপে ও পূর্ণতায় প্রকাশিত করিবার জন্য তিনি “ব্রতচারী” কথাটির প্রবর্তন করেন। “ব্রতচারী” তাঁকেই বলে যিনি সমস্ত জীবনকে এই রকম একটি পবিত্র ব্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং সমগ্র জীবনকে একটি উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছন্দোবদ্ধ প্রণালীতে তার অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকেন। তাঁহার আদর্শ হইল একটি পূর্ণতাময় জীবনের অনুসরণ। এখানে নিয়মানুষ্ঠিতার অর্থ হইল কৰ্ম্ম এবং আনন্দের সমন্বয়। তাঁহার রচিত ব্রতচারীর পণ্ডলি হইল—

জ্ঞানের সীমা প্রসারণ

জঙ্গল পানার নিরাসন

প্রণয়ের মধ্যমা বর্জন

সঙ্গী ফলের উৎপাদন

আলো হাওয়ার সকাল

গরুর পুষ্টি সম্পাদন

জলের শুদ্ধি সুরক্ষণ

পরিপাটিতা রচন

ব্যায়াম ক্রীড়ার প্রবর্তন

নারীর মুক্তি সংসাধন

বিয়ের আগে উপার্জন

শিল্প শক্তি প্রাক্করণ

সময় নিষ্ঠার প্রবর্তন

সেবায় আত্ম নিয়োজন

সংঘ দায়িত্ব সংস্থাপন

আন্দোলনসব সজীবন।

শেষ পণ নিজের জীবন ও বর্ষের মধ্যে সমবেত নৃত্য গীতের দ্বারা আনন্দের সৃষ্টি করা ব্রতচারীর অবশ্য কর্তব্য।

এর পর হইতে প্রতিবৎসর বার্ষিক শিবির আহ্বান করা হইত। ক্রমে এই আন্দোলন প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং ১৯৩৪ সালে ইহা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। বর্তমান রূপ অর্থাৎ ব্রতচারীর সমগ্র জীবনাদর্শ কতগুলি ছন্দ পূর্ণ সঙ্কলনের মধ্যে রূপ পায়। এই সমগ্র আন্দোলনটির ভিত্তি একটি স্বচ্ছন্দ রীতি নিয়মের অনুষ্ঠান।

১৯৩৩ সালে দত্ত মহাশয় যখন দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন তখন সেখানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলনে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেন এবং দিল্লী লোক নৃত্য সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ হইতে কয়েক দল লোকনৃত্যশিল্পীদের দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং কতগুলি নৃত্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে “নিখিল ভারত লোকনৃত্যসমিতি গঠিত হয়। দত্তমহাশয় ইহার সভাপতি ও পাঞ্জাবের স্যার সেব মহাশয় খান এম এল এ ইহার সহ সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ও পরিষদের কয়েকজন খ্যাতনামা সদস্য ইহাতে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে যে সঙ্কলন ও সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়া আন্দোলনটি রূপ পাইয়াছে তাহার ভিত্তি স্বরূপ বিশেষ ভাবে পাঁচটি ব্রত হইল জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য এবং

আনন্দ এই পাঁচটি ব্রতের অঙ্গদ্বয়ই ব্রতচারীর জীবনাদর্শের
ভিত্তি। আগে যে বোলটি পণ উল্লেখ করা হইয়াছে,
তাহা ব্যতীতও ব্রতচারীকে সন্তেরটি মানা পালন করিতে
হয়, যথা—

কৌচা ঝুলাইয়া চলিব না
খিচুড়ী ভাষায় বলিব না
জ্বলেও ভুড়ি বাড়াইব না
খিদে না থাকিলে খাইব না
অধিক ব্যয় করিব না
বিপদ বাধায় ডরিব না
বিলাসিতা ভাব পুষিব না
রাগ পাইলেও ক্রমিব না
হুঃখেও হাসিতে ভুলিব না
দেমােকতে মনে ফুলিব না
অসত্য ভাব পালিব না
দৈবে ভরসা রাখিব না
চেষ্টা না করে থাকিব না।
বিফল হলেও ভাগিব না
ভিক্ষা জীবিকা মাগিব না
কথা দিয়ে কথা ভাজিব না

নারী ব্রতচারীর জন্য পণ এবং মানা করেক ক্ষেত্রে
পুরুষদের হইতে বিভিন্ন, যথা—

বিনয় নম্র আচরণ এবং মানা

কোমল হয়েও গলিব না

ভুলি গৃহকাজ খাইব না

ছোট ব্রতচারী বালক এবং বালিকাদের জন্য বারটি
পণ আছে। যথা—

ছুটব খেলব হাসব

সবায় ভাল বাসব

গুরু জনকে মানব

লিখব পড়ব জানব

জীবে দরা দানব

সত্য কথা বলব

সত্য পথে চলব

তাতে জিনিষ গড়ব

শক্ত শরীর করব

দলের হয়ে লড়ব

গায়ে খেটে বাঁচব

আনন্দেতে নাচব।

ক্রমশঃ

সম্রাট আকবরের ধর্ম

শ্রীমতী অমিয়া বসু এম, এ, বি, টি,

সম্রাট আকবরের ধর্মমত সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের ভিতর
মতৈর্ষ আছে। কেহ কেহ বলেন, যে সম্রাট জীবনের
উত্তরকালে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া এক নূতন ধর্মের
প্রবর্তন করেন। আবার কেহ কেহ এই মন্তব্যের প্রতিবাদ

করিয়া বলেন যে সম্রাট ধর্মবিষয়ে চিরকালই উদারনীতি
অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নূতন ধর্ম ইসলাম
ধর্মেরই সংস্কৃতি। ছই দলের যুক্তি বিশ্লেষণ করিলে
আমরা দেখিতে পাই যে উভয় দলই স্বীকার করেন যে

ধর্মমতে সম্রাটের কোন গোঁড়ামি ছিল না। তিনি জন্মাবধি যুক্তিবাদী (Rationalist) ছিলেন। আকবরের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মুসলমান শাসকগণ মনে করিতেন যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করাই রাজার প্রধান কর্তব্য এবং রাষ্ট্র ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিংশশতাব্দীতে কায়েদে আজম জিন্না সাহেবও পাকিস্তানকে ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। মুসলমান রাজগণ ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের উপর স্বেচ্ছাচারিতা করেন এমন কি তাঁহাদের ধর্মমন্দির ধ্বংস করেন। সম্রাট আকবর শাসনকার্য্যে স্বহস্তে লইয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে অধিকাংশই হিন্দু অধিবাসী। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও কৃষ্টি ভারতের আকাশে বাতাসে বিচ্ছুরিত। অতএব হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করিলে মুসলমান শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। তিনি মনে করিতেন সে সর্বপ্রথমে তিনি ভারতবাসী, তৎপরে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তিনি ঘোষণা করিলেন যে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে শাসনকার্য্য চলিবে, কাহারও ব্যক্তিগত ধর্মমতে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না, সরকারী চাকুরীর মাপকাঠি হইবে ব্যক্তিগত গুণ, ধর্মমত নহে। এইখানেই আকবরের সহিত অসংখ্য মুসলমান রাজাদের পার্থক্য। তখন মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্মের নামে তাণ্ডবলীলা চলিতেছিল। ইংলণ্ডের এলিজাবেথ ও স্পেনের ফিলিপের যুদ্ধ সর্বজন বিদিত। ধর্মমতে স্বাধীনতা তখন ইউরোপে অজ্ঞাত ছিল কিন্তু আকবর ধর্মমতে স্বাধীনতা দান করেন।

আকবরের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল হিন্দু মুসলমানে ঐক্য স্থাপন করা। তজ্জন্দেশ্যে তিনি রাজপুত রমণী বিবাহ করিয়া রাজমহিষী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং পুত্র সেলিমকেও রাজপুত রমণীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তারপর হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর, মাথা প্রতি কর, (Poll tax) তীর্থযাত্রী কর প্রভৃতি রহিত করিলেন। ফলে তিনি হিন্দুসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন। বাস্তবিক হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমান আমলে এই প্রথম সমব্যবহার পাইয়াছিল।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ধর্মের তাঁহার কোন গোঁড়ামি ছিল না। এই গোঁড়ামি না থাকার কতকগুলি

কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ, আকবরের যুক্তিবাদ (Rationalism)। দ্বিতীয়তঃ আকবর বাল্যকালে মুসলমান সম্প্রদায়ের উদার ভাবাপন্ন সীদাগণ, যথা—বৈরাম খাঁ, সেখ মবারক, সেখ গদাই এবং হিন্দু বৈদান্তিকদের মত সুফি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তৃতীয়তঃ তাঁহার হিন্দু রাজমহিষীগণ অন্তঃপুরে নির্বিশেষে হিন্দুমতে পূজাপার্বণাদি করিতেন, ঘৃতান্নিহ হোম, ঝুলন যাত্রা, দশহরা রাসযাত্রা, হোলি উৎসব প্রভৃতি পালন করিতেন। এই সকল উৎসব উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসিয়া এবং তাঁহাদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের আলোচনা করিয়া সম্রাটের হিন্দুধর্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিল। হিন্দুদের মত তিনি অগ্নি ও সূর্য্যকে দেবতারূপে গণ্য করিতেন। যেমন খৃষ্ট জন্মের ১৪০০ শত বছর পূর্বে মিশরের তরুণ সম্রাট ইখনাটন প্রভাতের উদীয়মান সূর্য্যের উপাসক ছিলেন। চতুর্থতঃ, আকবর পারসীদের ধর্ম (Zoroastrianism) জানিবার জন্য গুজরাট হইতে পারসী গুরু মেহেরজী রাণাকে রাজদরবারে আমন্ত্রণ করেন। ইহার ফলে পারসীদের মত আকবর অগ্নিকে পবিত্রজ্ঞান করিতেন। পঞ্চম, জৈনধর্মের জ্ঞান জৈনগুরু হিরাবিজয়সুরী, বিজয় সেন সুরী ও ভাস্কচন্দ্র উপাধ্যায়কে দরবারে আমন্ত্রণ করেন। উক্ত গুরুদের প্রভাবে আকবর জীবে দয়া এই নীতি অনুসরণ করিলেন। তিনি ভোজনবিলাসী ছিলেন। পাকশালাতে বহু পশুপক্ষী নিত্য হত্যা হইত। জৈনদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি নিরামিষাবাদী হইলেন, পাকশালাতে পশুপক্ষী হত্যা বন্ধ হইল, এমন কি রাজ্যমধ্যে নির্দিষ্ট দিনে পশুপক্ষী হত্যা বে-মাইনী বলিয়া শোষিত হইল। আজও দিল্লী আগ্রাতে গুরুবারে মুসলমান কসাইখানাতে পশুপক্ষী হত্যা করা হয় না। সম্রাট তাঁহার চিরপ্রিয় মৃগয়া হইতে বিরত হইলেন। ষষ্ঠ, বর্দোনি বলেন, যে সম্রাট বৌদ্ধধর্ম জানিবার জন্য বৌদ্ধভিক্ষুদের আহ্বান করিয়াছিলেন। সপ্তম, সম্রাটের সহিত গোয়ানিবাসী খৃষ্টান পাণ্ডীদের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তিনি গোয়ার শাসনকর্তাদের খৃষ্ট ধর্মের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য উপযুক্ত পাণ্ডী আগ্রাতে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী পাণ্ডী মনসারেট, জেভিয়ার, একওয়াভিঙা পাণ্ডীগণ আগ্রাতে গমন করেন। সম্রাট তাঁহাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া খৃষ্টধর্ম বুঝাইতে

অল্পরোধ করেন এবং পাঙ্গীগণ তিনবার গোয়া হইতে আশ্রয় যাতায়াত করেন। সম্রাট তাঁহাদের গীর্জা নির্মাণ ও খৃষ্টধর্মপ্রচার করিবার অল্পমতি দেন। পাঙ্গীদের প্রদত্ত ভার্জিন মেরীর প্রতিকৃতি ও বাইবেল সম্রাট প্রকাশসহায়ে গ্রহণ করেন। পাঙ্গীগণ ভাবিয়াছিলেন যে অচিরেই তাঁহারা সম্রাটকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিবেন, কিন্তু আকবরের গুঢ় মনোভাব পাঙ্গীগণ বুঝিতে পারেন নাই,— “দেবাঃ ন জানন্তি কৃতো মহত্যাঃ।” আকবর চাহিয়াছিলেন খৃষ্টধর্মের তত্ত্ব জানিতে। খৃষ্টধর্ম আলোচনার ফলে আকবরের হৃদয়ে ‘মানবপ্রীতির’ ভাব জন্মাইল। তিনি অনতিবিলম্বেই চিরচলিত ক্রীতদাস প্রথা রহিত করিলেন।

আকবর সত্যাহুসন্ধিৎসু ছিলেন। তাই তিনি ধর্মালোচনার জন্য একটা অর্চনা গৃহ স্থাপন করেন। প্রথম তিনি মুসলমান ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের ধর্মালোচনা শুনিতেন। কিন্তু তিনি ক্রমশঃ দেখিতে পাইলেন যে আলোচনা শুধু বাক্যবিতণ্ডাতেই পরিণত হইত। তৎপর তিনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী প্রতিনিধিদের অর্চনাগৃহে আহ্বান করিতেন। তাঁহারাও যে যার সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন। আকবর নিরাশ হইয়া এই তর্কসভা বন্ধ করিয়া দিলেন।

আকবর নিরক্ষর ছিলেন। আরবী পারসী হরফের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। কিন্তু তিনি অশিক্ষিত ছিলেন না। যেমন মহারাজা রণজিৎ সিংহ, হায়দার আলি কি অধুনিক যুগের পরমহংসদেবও নিরক্ষর ছিলেন। পরমহংসদেবের ধর্মের তত্ত্বালোচনা তদানীন্তন স্ত্রী সমাজকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহাদের কাহাকেও অশিক্ষিত বলা যায় না। সম্রাট দেখিলেন, যে ধর্মালোচনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের মত লইয়া বিবাদ করিতে ব্যস্ত। এই মতদ্বন্দ্বিতার আন্দোলনে সকলেই ধর্মের সারাংশ হারাইয়া শুধু বাহিরের খোশা লইয়া বিবাদ করিতেছে। কিন্তু সকল ধর্মের মূল জিনিষ এক। দেশ কাল রুচিতেই যিনি যে উপায় অবলম্বন করুন সকলেরই এক গন্তব্যস্থান। বিভিন্ন বিবদমান সম্প্রদায়গুলিকে এক মহাধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিতে অল্পপ্রাণিত হইয়া তিনি এক নূতন ধর্মের প্রবর্তন করিতে মনস্থ করিলেন।

ইতিমধ্যে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের রাজত্বে এক ভীষণ অভ্যন্তরীণ গোলমালের সৃষ্টি হয়। গোঁড়া মুসলমানগণ সম্রাটের উদারতা বিশেষতঃ হিন্দুদের প্রতি সমব্যবহার লক্ষ্য করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। অন্যদিকে বাঙ্গালার স্বার্থান্ধ জায়গীরদারগণ সম্রাটের কড়াশাসন বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। এই সময় জৈনপুরের কাজী সম্রাটের বিরুদ্ধে এক ফতওয়া জারী করেন যে সম্রাট ইসলাম ধর্ম বিরোধী, তাঁহার বিরুদ্ধে ‘জিহাদ’ (ধর্মযুদ্ধ) করা ধর্মসম্মত হইবে। ‘জিহাদের’ অছিলাতে বাঙ্গালার জায়গীরদারগণ কাজীর ফতওয়া অহুযায়ী সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে কাবুলের শাসনকর্তা গোঁড়া মুসলমান সম্রাটের বৈমাত্রেয় তাই মহম্মদ হাকিমকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা। বিদ্রোহ দমন করিতে আকবরের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। রাজদ্রোহীগণকে সায়েস্তা করিয়া সম্রাট রাজ্যমধ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপন করেন। ইহার পর তিনি প্রকাশ্যে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নূতন ধর্ম ‘দীন-ইলাহি’ প্রচার করেন।

‘দীন-ইলাহি’ সার্বভৌম একেশ্বরবাদ। সকল ধর্মের সারাংশের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত। কোন জাতিবর্ণ ভেদ নাই। ভগবানের প্রতি একান্ত অল্পমতি প্রকৃত ভক্তি, ভগবানের আরাধনাতেই মুক্তি। সম্রাট পৃথিবীতে ভগবানের দূত। এই ধর্মপালনের জন্য সম্রাট কতকগুলি অভিনব বিধিব্যবস্থা করেন। তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে যে সম্রাট ইসলাম বিরোধী ছিলেন তাহা নিছক অমূলক নহে:—যথা, এই ধর্মাবলম্বী কেহ পেঁগাজ, রসুন ও আমিষ আহার করিতে পারিবে না; যদি কোন হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করা হয় তাহাকে হিন্দুধর্মে ফিরাইয়া আনিতে হইবে; যদি কোন হিন্দু নারী কোন মুসলমানের প্রেমাসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করে সেই নারীকে স্বধর্মে আনিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। প্রত্যহ পূর্বাকাশের দিকে ফিরিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে (মুসলমানদের মত পশ্চিম দিকে নহে); সমবেত প্রার্থনার সময় প্রধান উপাসক সিন্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে (ইহা মুসলমান ধর্ম বিরোধী); সম্রাটকে

সাষ্টাদ প্রণিপাত করিতে হইবে (সাষ্টাদে প্রণিপাত মুসলমান ধর্ম বিরোধী) ... ইত্যাদি। সম্রাট কিছুকাল নিজে হিন্দুদের মত কপালে তিলক কাটিয়া হোম এবং সূর্য্য বন্দনা করিতেন।

যদিও 'দীন ইলাহির' উদ্দেশ্য ছিল মহৎ কিন্তু এই ধর্ম জনসাধারণ দ্বারা গৃহীত হয় নাই। সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'দীন-ইলাহির' অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়।

ধর্মবিষয়ে সম্রাট উদারনৈতিক ছিলেন কিন্তু তিনি কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন অনাচার সহ্য করিতেন না। হিন্দুদের সতীদাহ, শিশুহত্যা ও বাল্য বিবাহ

প্রথা রহিত করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিধবা বিবাহতে উৎসাহ দিতেন। সত্য বটে, তাঁহার আমলে সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথা হিন্দু সমাজ হইতে দূরীভূত হয় নাই, কিন্তু সেই মধ্যযুগে প্রাচ্যদেশে বাহার মনোমধ্যে এই সব মৌলিক সংস্কারের কল্পনা জাগরিত হইয়াছে, তাহাকে সেই যুগের অগ্রদূত বলা বাইতে পারে। সম্রাট ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্দ্ধে। তিনি ধর্মে, রাষ্ট্রে ও সমাজে বিবিধ সংস্কার আনিয়াছিলেন, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের দেশের বর্তমান দৃষ্টিতে আমরা আজ সেই মহামতি আকবরকে স্মরণ করি।

স্মরণীয় য়ারা—কবি চন্দ্রাবতী

শ্রীবেলা দে

বনে কত ফুল ফোটে ; কিন্তু সেই বনফুলের সৌরভ কখন বা মানুষ উপলব্ধি করে আবার কখনও বা সে সৌন্দর্য্য কেহ ভোগ করিতে পারে না। তাই বনের ফুল বনেই শুকিয়ে যায়। চন্দ্রাবতী ছিলেন এমনি একটি ফুল ! বাস্তবিক সে দিনের কথা মৈমনসিংহের পক্ষে অতীব গৌরবের কথা। শুধু রামায়ণ নয়, কবি চন্দ্রাবতী নানারূপ মেয়েলী ছড়া গান প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। ছোট বড় নেই, স্থান অস্থান নেই, ঘাটে মাঠে, যেখানে সেখানে তাঁর সঙ্গীত সর্বদা-মানুষের মুখে মুখে শোনা যেতো। চন্দ্রাবতী সর্বসাধারণের কবি ছিলেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে, আজো চন্দ্রাবতীর গান ছড়া মানুষকে ভাবে বিভোর করে রেখেছে। তাই আজো ময়মন সিংহের বহু উৎসবে সকলে চন্দ্রাবতীর উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে থাকেন। চন্দ্রাবতী ছিলেন বিজ্ঞ বংশীদাসের একমাত্র কন্যা। প্রসিদ্ধ মনসা ভাসান রচকগণের মধ্যে চন্দ্রাবতীর পিতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশ এই প্রতিভাবান মহাপুরুষের অঙ্গ সংস্থান করে দিতে পারে নি, তাই চন্দ্রাবতী স্বীয় রামায়ণে তাঁদের বংশ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক দুঃখ কাহিনী অশ্রুর অক্ষরে লিখে

গিয়েছেন। বংশ পরিচয়ে চন্দ্রাবতী যা লিখেছেন তারই একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অল্পনা বড়নী

বাঁশের পালায় বড় ছনের ছাউনি

ঘট বসাইয়া সদা পুঞ্জ মনসায়

কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।

চন্দ্রাবতী তাঁর আত্মজীবনী প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের ইতিহাস কি এবং কি কারণে পিতা তরুণী কন্যাকে রামায়ণ রচনার উপদেশ দিয়েছিলেন সে কথা লিখে যান নি। নয়ানচাঁদ ঘোষ নামে এক প্রাচীন পল্লী কবির ভাষায় চন্দ্রাবতীর জীবনের এক বিয়োগান্ত কাব্য থেকে আমরা এই মহিলা কবির জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী জানতে পারি।

একদিন চন্দ্রাবতী পিতার জন্য ফুল তুলতে গিয়েছিলেন। বনে গাছে বহু চাঁপা ফুটে রয়েছে, কিন্তু অত দূরে হাত না বাঁওয়ায় তিনি ফুলগুলির পানে চেয়েছিলেন। এমন সময় সেই পথ দিয়ে প্রতিবেশী জয়ানন্দ আসছিলেন। চন্দ্রাবতী ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যাবার উপক্রম করছিলেন, জয়ানন্দ বুঝতে পেরে ফুল সমেত চাঁপার শাখাটা নত করলেন। আর চন্দ্রাবতী ফুল তুলতে লাগলেন ! ফুল তোলা শেষ হলো কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গে সেই তপস্বিনীর মধ্যে সাংসারিক প্রেমের স্বপ্ন ভ্রমের একটা আকস্মিক লহরী বিছাড়ের মত খেলে গেল। চন্দ্রাবতী ফুল তুলে নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন আর জয়ানন্দ ও ভিন্ন পথে চলে গেলেন; কেউ কারকে নিজের মনোভাব বুঝতে দিলেন না। কেবল তাদের উদাস দৃষ্টি কতক বুঝল ঐ আকাবাঁকা গ্রামের পথ আর কতক বুঝল তরুলতা।

কন্যা অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে দেখে পিতা বংশীদাস চিন্তিত। চন্দ্রাবতী পরমা সুন্দরী! বয়স অল্প হলেও কবি প্রসিদ্ধি লাভ করায় বহু সম্ভ্রান্ত যুবক তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু চন্দ্রা জানেন তাঁর প্রাণের দেবতা সেই জয়ানন্দ। তাই তাঁর সমস্ত জীবন ঘোবন উৎসর্গ করে বসেছিলেন সেই হৃদয় দেবতার পায়ে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিস্রব সেই মুখ জয়ানন্দ এক মুসলমান রমণীর প্রেমে আত্ম বিক্রয় করল। এই খবর পেয়ে কবি চন্দ্রাবতী একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন এবং স্নেহময় পিতার কাছে দুটি প্রার্থনা চেয়ে নিলেন—একটি শিব মন্দির স্থাপন আর অন্যটি চিরকুমারী থাকবার বাসনা। পিতা কন্যার কথায় রাজী হলেন এবং অবসর কালে রামায়ণ লিখতে আদেশ দিলেন। চন্দ্রাবতী কায়মনোবাক্যে শিবপূজা করতেন এবং অবসর কালে রামায়ণ লিখতেন।

ইতিমধ্যে এক দুর্ঘটনা ঘটল। চির অন্ততপ্ত চন্দ্রাবতীর সেই প্রাণী যুবক দুর্ভিক্ষ জীবনের ভার সহ করতে না পেয়ে একথানা পত্র চন্দ্রাবতীর কাছে লিখল এবং জানাল তার সাফাৎ কামনা। চন্দ্রাবতী পিতাকে সমস্ত জানাল। পিতা অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন, তুমি যে দেবতার পূজায় মন দিয়েছ তাঁরই পূজা কর। চন্দ্রাবতী একথানা পত্রে যুবককে সাঙ্গনা জানালেন। কিন্তু পত্র পাঠে যুবক স্থির থাকতে না পেয়ে চন্দ্রাবতীর স্থাপিত শিব মন্দিরের পানে ছুটে চলল, চন্দ্রা তখন শিব, আরাধনায় তন্ময়। মন্দিরের দ্বার ভিতর থেকে রুদ্ধ। হতভাগ্য যুবক এসেছিল চন্দ্রাবতীর কাছে দীক্ষা নিতে—কিন্তু চন্দ্রাবতীকে ডাকতেও সাহস হলো না। তাই সেইখানে বসে কয়েকটা সন্ধ্যা মালতী ফুল ফুটেছিল তাই দিয়ে কপাটের উপর চারিছত্র কবিতা লিখে চন্দ্রাবতীর কাছ থেকে শেষ বিদায় প্রার্থনা করল।

পূজা শেষে চন্দ্রাবতী বাইরে এসে কপাটের উপর লেখা কবিতা পাঠ করে বুঝলেন দেব-মন্দির কলঙ্কিত হয়েছে। চন্দ্রাবতী জল আনতে নদীতে গেলেন—গিয়ে

দেখলেন সেখানে সব শেষ হয়ে গেছে! অন্ততপ্ত যুবক জন্মের মত বিদায় নিয়ে চলে গেছে! তারপর একদিন শিব পূজার সময় হটাৎ চন্দ্রাবতীও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। যদি ও তিনি তাঁর জীবনীতে কোন কথা ব্যক্ত করেন নি, তথাপি কবি নয়ানচাঁদ চন্দ্রাবতীর জীবনকাব্যের সমর্থন করে লিখে গেছেন—

“বাড়াতে দরিদ্র জালা কষ্টের কাহিনী

তার ঘড়ে জন্ম নিল চন্দ্রা অভাগিনী।”

প্রথম ছত্রটীতে দেখা যায় চন্দ্রাবতী আজীবন পিতার গলগ্রহ হয়ে তাঁর দরিদ্র জীবন ভারাক্রান্ত করে তুলেছিলেন। শেষ ছত্রে ‘চন্দ্রা অভাগিনী’ এই একটি মাত্র কথায় সেই আত্ম হুঃখিনী মহিলা কবি যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখে বঞ্চিত ছিলেন আমরা তার আভাস পাই। অল্প বয়সে সেই যোগশাস্ত্র মনস্বিনী হৃদয়ের মর্ম্মস্থদ্র হুঃখভার চেপে রাখতে, অশ্রুকে নিরুদ্ধ করতে সুন্দর রূপে অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

চন্দ্রাবতীর সম্পূর্ণ রামায়ণের আলোচনা করা সম্ভব নয়, তাই সংক্ষেপে ছ’একটি ঘটনার উল্লেখ করছি মাত্র।

মিথিলা নগরে এক দরিদ্র জেলে দম্পতি বাস করত। অতি কষ্টে তাদের দিন কাটত। একদিন মাধব জেলে জাল ফেলে একটা রত্ন কোটা তুলে আনল। সত্য (জেলেদার) দেবতার দান ভেবে তাকে ধূপধূনা দিয়ে পূজা করলো এবং সেই দিন থেকে তাদের সকল হুঃখ দূর হলো। একদিন সত্য স্বপ্ন দেখল হটাৎ যেন তাঁদের আলোয় তার ঘরখানি ঝকঝক করছে আর সেই কোটা থেকে এক আশ্চর্য্য রূপসী মেয়ে বেরিয়ে একে সত্যকে জড়িয়ে ধরেছে আর বলছে—

“বাপ মোর জনক রাজা গো রাণী মোর মাও

কালুকা বিয়াণে লইয়া রাণীর কাছে যাও।

এই বলে সেই রূপসী কন্যা আবার কোটার মধ্যে প্রবেশ করল। পরদিন সেই রত্নকোটা নিয়ে সত্য মিথিলা রাজ-ভবনে গিয়ে দাঁড়াল—রাণীমা সত্যার কাছে সেই আশ্চর্য্য স্বপ্নের কথা শুনে রত্ন কোটা নিয়ে তার পরিবর্তে “গজমতি হার এক জইড়ায় সত্যার গলে”; কিন্তু সত্যা জোড় হাতে বলল, আমি জন্ম কাঙ্গালিনী এ সব ধন রত্ন আমার কি হবে? তবে এক মিনতি—

“স্বপ্ন যদি সত্য হয় কন্যা জন্ম হতে

আমার নামেতে কস্তার নাম রাইখ সীতে।”

তারপর সেদিন—“হইল লক্ষ্মীর জন্ম মিথিলা ভবনে—”

যথা সময়ে তখন—“সত্যার নামেতে কন্যার নাম রাখে সীতা

চন্দ্রাবতী কহে কস্তা ভুবন বন্দিতি।”

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীবেলা দে

সাঁগুর পঁাপর

শ্রীশৈল মিত্র

প্রথমে যে কোন সাগু আন্দাজ মতো নেবেন। জলে ধুয়ে, সাগুগুলি বেশ সিদ্ধ করে নেবেন। বেশী জলে দেবেন না। যেমন কাদা কাদা মতো থাকে। তার পর সাগুগুলি একটু জুড়োলে একটা পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নেবেন। যেমন করে বেল বা চিড়ে ইত্যাদি ছাঁকতে হয়, সেইরূপে সাগুগুলি ছেঁকে নেবেন। ছাঁকা হয়ে গেলে, কালজীরে, মরিচের গুঁড়ো ও পরিমাণ মতো ছুন দেবেন। এইবার যেমন করে বড়ীর ডাল ফেনার সেই রূপে একটু ফেনিয়ে নেবেন। একটা পাত্রে করে সাগু ছাঁকাটা নেবেন। একটা পরিষ্কার কাপড় রোদ্রে পাতবেন। একটা চামচে বা ছোট হাতা করে ঐ সাগু ছাঁকাটা কাপড়ের উপর যেমন করে বড়ী দেয় সেইরূপে দেবেন। দু তিন দিন খুব রোদ্রে শুকিয়ে গেলে, ঠিক পঁাপরের মতো কাপড়ে শুকিয়ে 'আটকে' থাকবে। কাপড়ের পিছন দিকে একটু একটু জল দিয়ে ভিজিয়ে দেবেন। তাহলে খুব তাড়াতাড়ি খুলে যাবে। তারপর যেমন করে পঁাপর ভাজে সেই রূপে ভেজে খেতে দেবেন। এটিও খুব মুখরোচক। এটি রোগীদের পক্ষেও খুব উপকারী।

যরের কথা

শাক্ সবজী শুকিয়ে রাখার প্রণালী—

শকুন্তলা।

প্রথমতঃ শুকনো করবার উপযোগী তরকারী বেছে নেওয়া উচিত। ফসলের শেষাংশে শুকোতে গেলে তরকারীর স্বাদ ভাল থাকে না। কাজেই সবজী যখন প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যাবে এমন সময় অর্থাৎ ফসলের মাঝামাঝি সময়ে তরকারী শুকোবার ব্যবস্থা করা উচিত। তবে এটিও লক্ষ্য

রাখতে হবে যে সমস্ত তরকারী শুকনো করা হবে সেগুলি যেন কচি থাকে না, অথচ পেকে শক্ত হবে না।

তরকারীগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কাটতে হবে। বাঁধাকপি হলে-সরু সরু করে কাটতে হয়, আবার তরকারী বিশেষে খোসা ছাড়তে হয়; যেমন ধরুন বিলাতী বেগুন এর খোসা ছাড়তে পারেন অবশ্য ইচ্ছে করলে। প্রথমে বিলাতী বেগুনকে খুব ফুটন্ত জলে কেলে তুক্নি তুলে নিয়ে আবার ঠাণ্ডা জলে ছাড়তে হবে এবং ঐ সঙ্গে ফুটন্ত জলে খানিকটা লবণও মিশিয়ে নেবেন। যদি তরকারীতে কোন রকম দুর্গন্ধ বা ময়লা থাকে তাহলে এই ভাবে লবণ মিশালে আর গন্ধ থাকবে না। লাউ ঝিঙ্গে কপি, মুলো ইত্যাদি তরকারীতে অনেকে এক রকম অস্বস্তিকর গন্ধ অল্প ভব করেন; কাজেই লবণ দিয়ে ফুটিয়ে নিলে আর সে গন্ধ থাকে না। এই ভাবে তরকারী কেটে ধুয়ে এক সের আন্দাজ তরকারীতে পাঁচ মিনিট গন্ধকের ধোয়া দিতে হবে। তারপর আবার একটা চাদরে তরকারীগুলি ঢেলে দিয়ে রোদে দিতে হবে। এই উপায়ে বীট শিম, ফুলকপি বাঁধাকপি ইত্যাদি অনায়াসে শুকিয়ে রাখা যায় এবং অসময়ে ব্যবহার করা যায়। কেবলমাত্র ব্যবহারের দু'ঘণ্টা আগে ঠাণ্ডা জলে ঐ শুকনো তরকারীগুলো ভিজিয়ে রাখতে হবে; তাহলেই একেবারে টাটকা সবজীর মতই হয়ে যাবে। মটর গুঁটি হলে ব্যবহারের আগে ২৪ ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে তারপর রান্না করতে হয়। তবে আলু শুকিয়ে রাখার প্রণালীটি অল্প রকম। প্রথমে কিছু আলু সিদ্ধ করে নিতে হবে; কিন্তু ১০ মিনিটের বেশী সিদ্ধ হবে না, নৈনিতাল আলুই সিদ্ধ করার পক্ষে ভালো সিদ্ধ হলে তাকে চাকা চাকা করে কেটে একখানি পরিষ্কার কাপড়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে, এবং পরে টিনে ভালভাবে টাইট করে ভরে রাখবেন। এই আলু বিশেষ করে ভাজা খেতে ভারী স্বাদ লাগে।

ইচ্ছে করলে কিছু লবণ ও লঙ্কার গুঁড়ো মাথিয়েও শুকোতে পারা যায়, খেতে আরো ভাল লাগবে।

মা হবেন কিছু স্বার্থপর

জীগীতা বসু, বি, এ।

আমাদের প্রতিদিনের পারিবারিক জীবন যাদের নিয়ে সেই মা বোন জ্বী এঁদের দেখি কেমন করে আপনার সন্তাকে অন্তরালে রেখে সংসার-তরীর হাল ধরে চলেছেন। প্রায়ই দেখি তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে হাসিমুখে স্বামী পুত্রের পরিচর্যা করেন। হতে পারেন তাঁরা মহীয়সী, স্বামী পুত্রকে কষ্টের আঁচটুকু গায়ে লাগাতে দেন না, তাই বলে কি তাঁদের আদর্শ মা আদর্শ জ্বী বলা চলে?

প্রথম মায়ের ক্ষেত্রেই ধরুন—ছেলের মানের ব্যবস্থা করে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে খাওয়া পরা শোওয়া কোনটিতে যাতে ছেলের এতটুকু অসুবিধে না হয় তার ব্যবস্থা একা নিজে হাতে মা সব করে দেন। ছেলেটি অনেক স্থলেই খুব সম্ভব বয়স হিসেবে সাবালক হয়েছে। কিন্তু মা তাকে সাবালক হতে দিচ্ছেন না। এমন ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় ছেলেটি ভীষণ স্বার্থপর হয়ে গেল। যে মা এত সেবা করেন ছেলে হয়ত সেই মায়ের অস্থখ বিষ্মখে কোন খোঁজই রাখে না। নিজের কিন্তু এতটুকু অসুবিধেও সহ্য করতে পারে না। চীৎকার করে বাড়ীর সকলকে গালাগালি করে অতিষ্ঠ করে তোলে এবং নিজেও অস্থখী হয়। এই যে নিঃস্বার্থভাবে মা ছেলের সেবা করেন এর ফলে ছেলেত মানুষ হয় না। হয়ে দাঁড়ায় ভয়ানক স্বার্থপর, এমন কি মায়ের প্রতিও মায়া মমতা অল্পভব করবার শক্তি তার থাকে না। মা হাঁড়ী হেঁসেল নিয়ে বসে রইলেন, ছেলে আঙড়া দিয়ে গল্প করে বাড়ী ফিরলেন বেশ কিছু রাত করে। মা অমানবদনে হাসিমুখে ছেলেকে খাওয়াতে বসলেন। জানি মা স্নেহময়ী—কিন্তু এতখানি আদের দিয়ে তিনিহঁত ছেলের ইহকাল পরকাল ঝরঝরে করে দেন এবং সংসারে আনন্দ দারুণ অশাস্তি।

এমন ছেলেকে নিয়ে মা'তে বাবাতে প্রায়ই ঝগড়া বাধে। সব চেয়ে অশাস্তি হয় যখন সেই ছেলের বিয়ে হয়। সেই

ছেলে স্বভাবতই স্বামী হিসেবে তার স্বার্থপর স্বভাব নিয়ে আশা করবে তার জ্বীও তার মায়ের মত সব সময় তার পরিচর্যার জন্য হাজির থাকবে। পান থেকে চুণ খসলেই চিৎকার। জ্বীটি যদি মায়ের মতই নিতান্ত ভালমানুষ স্বভাবের হয় তো ভাল। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিশেষ করে তারই মত আত্মরে মেয়ে হলে, এমন সেবাদাসী হতে রাজী হবে না। তাহলে দেখুন মা কতখানি ক্ষতি করলেন ছেলে বোনের জীবনের।

তাই মনে হয় মায়েরা যদি একটু স্বার্থপর হন তা হলে ছেলেরা স্বাবলম্বী হতে পারে সহজেই। জানি মা কখনো স্বার্থপর হতে পারেন না আপন সন্তান সম্বন্ধে—কিন্তু এমন অহিনিশি ছেলের সেবা করে ছেলেকে নষ্ট করা ঠিক নয়। এতে শুধু পারিবারিক জীবনে নয়, কর্মক্ষেত্রেও ছেলে অকর্মণ্য প্রমাণ হয়। পুরুষ মানুষ সে, তাকে বাইরে যেতে হবে, জীবন সংগ্রামে যুক্ত হতে হবে। কিন্তু মায়ের আঁচল চাপা এমন ছেলের কাছ থেকে কিছুতেই আশা করা চলে না যে সে কঠোর জীবন সংগ্রামে জয়ী হবে। সামান্য ঘরোয়া ব্যাপার নাওয়া খাওয়ার কষ্ট করতে যে শেখেনি সে কর্মক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হবে কেমন করে? এ ছেলে সংসার সমুদ্রে ছোট্ট ভেলাটির মত ভেসে ভেসে তলিয়ে যাবে। তাই মনে হয় যারা অনেকগুলি ভাইবোনের মধ্যে মানুষ যাদের মায়েরা বাড়াবাড়ি রকমের আদরযত্ন ছেলেকে দিতে পারেন না প্রায়ই তারাই হয় স্তম্ভ, স্বাবলম্বী পুরুষ। দেশ এবং জগৎ তাঁদেরই চায় যারা অবস্থাবিপর্ধ্যয়ে টলেন না এবং যে কোন অবস্থায় যে কোন লোকের সঙ্গে স্তম্ভ দেহ মনে মিলেমিশে কাজ করতে পারেন। তাঁদের সফলতার প্রধান কারণ আপন সুবিধাটুকুকেই তাঁরা বড় করে দেখেন না।

ঘরের কথা

কাপড় ও জামায় রং করার প্রণালী

(দেশী প্রণায়)

শকুন্তলা।

গতবারে আমি কয়েকটি রং করার প্রণালী বলেছিলাম, এবার আরো কয়েকটি বলে দিচ্ছি। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির আর উল্লেখ করলাম না, কারণ গত সংখ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলাম।

গোলাপী রং—প্রথমে ১/৫ সের (পাঁচ সের) আন্দাজ গরম জলে আড়াই ছটাক হরিতকী চূর্ণ করে সেই জলে সাদা কাপড়খানি অর্থাৎ (যে কাপড়খানিতে রং করা হবে) এক রাত্রি ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রেখে পরদিন ১/৫ সের জলে সিকি ছটাক পাথর চূর্ণ মিশিয়ে রাখতে হবে; এবারে ঐ কাপড়খানি নিংড়ে শুকিয়ে নিয়ে এই চূর্ণের জলে কিছুক্ষণের জন্য রাখবেন। তারপর তুলে নিয়ে কাপড়ের ওজনের অর্দ্ধেক পরিমাণ চেরুল বা (চেরুল বেনের দোকানে পাওয়া যায়) ও মজিষ্ঠা এবং ঐ কাপড়খানি ঠাণ্ডা জলে দিয়ে ১৫২০ মিনিট নাড়াচাড়া করতে হবে, পরে কাপড় সমেত ঐ জলকে এক ঘণ্টা আন্দাজ ফোটাবেন। তারপর জল থেকে তুলে নিংড়ে নিয়ে হাওয়ায় শুকিয়ে নেবেন, তাহলেই গোলাপী রং হয়ে যাবে। ওজন বেশী কমে অল্প কাপড়ের কোন ক্ষতি হয় না; তবে কোন কোন সময় জিনিষের ওজন বেশী কমে রং গাঢ় বা ফিকে হবার সম্ভাবনা।

খাকি রং—এই রং করতে হলে দুটি আলাদা জায়গায় আড়াই ছটাক করে হরিতকী চূর্ণ ও আড়াই ছটাক করে

ফটকিরি গুঁড়ো করে রাখতে হবে। তারপর দেড় ড্রাম বাইক্রোমেট ১/৬ সের জলে দিয়ে সেই জলে ঐ ৬ ভাগ হরিতকী ও ফটকিরি গুঁড়ো মিশিয়ে একটু ফুটিয়ে নিতে হবে। এইবার সেই জলে কাপড়খানি ২৪ বার ভিজিয়ে হাওয়ায় শুকিয়ে নিন তা হলেই খাকি রং হয়ে যাবে।

লটকান রং—টাটকা লটকান বীজ (বেনের দোকানে পাওয়া যায়) হলে গরম জলে ফুটিয়ে নিলেই রং হয়ে যায়। কিন্তু শুকনো বীজ হলে গরম জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। তবে সাধারণতঃ টাটকা বীজ পাওয়া সম্ভব নয়, কাজেই বাজারের কেনা বীজের প্রাণালীই জানিয়ে দিচ্ছি। লটকান বীজ তিন ছটাক নিয়ে ১/৬ জলে সামান্য পরিমাণ সোডা মিশিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর অল্প গরম থাকতে থাকতে কাপড়খানি ঐ জলে ছেড়ে দেবেন এবং প্রায় আধ ঘণ্টা এইভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে—পরে অপর একটা মাটির পাত্রে খানিকটা তৈতুল গুলে সেই জলে কাপড়খানি ভাল করে ধুয়ে নেবেন যেন সমস্ত কাপড়খানিতে এই জল লাগে তা হলেই লটকান রং হলো।

মহিলা সমাচার।

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ।

দেশবন্ধু বালিকা ভবন—বাল্যার মহামাত্র গভর্ণর শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ১০১ নং বেলতলা রোড “দেশবন্ধু বালিকা ভবনের” উদ্বোধন করেন। বাল্য ত্যাগী বালিকাগণের বসবাসের নিমিত্ত এই ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত স্বজাতা দেবী এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ, ডাঃ শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ ও ডাঃ অমরনাথ মুখার্জি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা। ভবন উদ্বোধন সময়ে রাজাজী বলেন—ভবনে আশ্রয়প্রাপ্তা বালিকারা সম্ভব ব্যবহার্য পাইবে। এইরূপ ভবনের পরিচালনার জন্য উক্তরূপ স্বায়ত্ত্ব অত্যাবশ্যক। বালিকাগণ সকলে

যেন একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাহাদিগকে লালন পালন করা হইবে।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলেন সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও তাহাদিগকে শুল্কবা ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষাদান করিয়া এক ব্যাপক ভিত্তির উপর গঠিত করা আবশ্যক বাহাতে আবশ্যক হইলে বা স্বযোগ পাইলে এই প্রতিষ্ঠানের কোন কোন বালিকা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিস্থর এবং প্রদেশের গবর্ণরের উচ্চপদে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে ভারত

মহিলার নেত্রী।

২৪শে জুন জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইবে। এই সম্মেলনে মাননীয় রাজ কুমারী

অমৃতকুমারী ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন। ইহারা ভারতে একটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার চেষ্টা করিবেন। আমরা ইহার শুভ কামনা করি।

মহিলা ব্যায়াম শিক্ষা শিবির

সম্প্রতি কলিকাতায় পশ্চিম বাংলা সরকারের শারীরিক শিক্ষক সমিতির পরিচালিত মহিলা ব্যায়াম শিক্ষা শিবিরের সমাপ্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতায় সেরিক শ্রীযুক্ত ধীরেন সেন পৌরোহিত্য করেন। এই শিক্ষা শিবিরে বহু ভদ্র ঘরের মহিলা ও বালিকা যোগদান করিয়া অপরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। শ্রীমতী স্বভদ্রা রায় শিবিরের একজন প্রধান পৃষ্ঠ পোষিকা। ব্যায়ামেব বিভিন্ন পদ্ধতির যে অভিজ্ঞদর্শনী হইয়াছিল তাহার ছায়াচিত্র—বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগে পরিচালক শ্রীমন্মথ রায় মহাশয় “অপেরা সিনেমা” ষ্টুডিওতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই ছায়াচিত্র পার্কে পার্কে, পল্লীতে পল্লীতে প্রদর্শিত হইলে এ দেশের মেয়েদের স্বঠাম দেহ গঠনে খুব সহায়তা করিবে।

মধ্য প্রদেশে মা ও মেয়ে এম, এল, এ।

শ্রীমতী স্বভদ্রা কুমারী চৌহান, জব্বলপুর পল্লী নির্বাচন কেন্দ্র হইতে মধ্য প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদে সভা ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহার কণ্ঠা শ্রীমতী স্বভদ্রা কুমারী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এম, এল, এ, নির্বাচিত হইয়াছেন। স্বভদ্রা দেবী একজন কবি ছিলেন।

সরকারী গবেষক শ্রীমতী ইভা মিত্র

শ্রীমতী ইভা মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের এম, এস-সি পাশ করা কৃতী ছাত্রী। পশ্চিম সরকার কর্তৃক ইনি বিশেষভাবে গবেষণার জন্ত নিযুক্ত হইয়াছেন। এই রূপ ভাবে কৃতবিদ্বদের তাঁহাদের ইচ্ছামত গবেষণা কার্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে দেশের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে। তাঁহারা অন্ন বা কণ্ট্রোলের দ্রব্য সংগ্রহের চাপ হইতে মুক্ত হইয়া নব নব জনকল্যাণকর তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তের সপ্তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির গুরুসদয় হলে এক প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হয়। ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র প্রার্থনা সভায় পৌরোহিত্য করেন, সরোজনলিনী বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ সময়োপযোগী সঙ্গীত করেন। স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত ও স্বর্গীয় সরোজনলিনী দত্তের প্রতিকৃতি পুষ্পসজ্জিত ও মালাভূষিত করা হয়, উভয়ের আত্মার শান্তি ও গুরুজি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কল্যাণ কামনা করিয়া প্রার্থনা করা হয়।

অপরূহ ৫ ঘটিকায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদারের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। ব্রতচারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দ ব্রতচারী নৃত্য ও ক্রীড়া কোণল

প্রদর্শন করে, শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ভাটুড়ী স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের স্বদেশ হিতৈষণা ও নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, অনেক বক্তা তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বক্তৃতা করেন, শ্রীযুক্ত মজুমদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে গুরুসদয় ছিলেন নির্ভীক প্রকৃত দেশপ্রেমিক, বিদেশী শাসনের ফলে যখন যুবশক্তির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল তখনই তিনি এক অভিনব ব্রতচারী আন্দোলন দ্বারা দেশের অন্তরে এক নৈতিক চেতনার প্রেরণা আনিয়াছিলেন। জীশিক্ষা বিষয়েও তাঁর দান অতুলনীয়, তাঁর নারী জাতির প্রতি যে কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল সরোজনলিনী শিক্ষা মন্দির তাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে।

১৯৪৭ সালের কার্য বিবরণী

পটুয়াখালী মহিলা সমিতি

দেশবাসী এক বিশৃঙ্খল আতঙ্ক, অর্ধেক অধিবাসী স্থান ত্যাগ করিয়াছেন, আর কেহ কেহও করিবেন। এ অবস্থায় মহিলা সমিতি কেন, যে কোন সম্ভাব্য কার্যধারাই ব্যাহত হয়, এ কথা বলাই বাহুল্য।

ভীষণ ৫০ সনের কবলপিষ্ট সমিতির পক্ষে বর্তমান স্বাধীনতা আরও ভয়ানক। তথাপি একথা বলা চলে যে, মুসলমান বহুল হইলেও ধর্মের নামে এখানে কোন অবিচার অত্যাচার ঘটে নাই। কিন্তু মনের অনাবিল প্রীতির প্রবাহ সংশয়াকুল। চারিদিকে বিভ্রান্ত অবস্থার মধ্যেও যে শান্তিপ্রয়াসী মানুষ আছে ইহাই সমিতির কর্মীদের, তথা পটুয়াখালীস্থ মহিলাদের গৌরব। বাহিরের খুঁটিনাটি লইয়া আভ্যন্তরীণ অবহেলায় যে দূষিত হয় নাই, তাহা স্থানীয় মুসলমান ভগ্নীবৃন্দের সহযোগিতা হইতেই প্রমাণিত হয়।

১৯৪৭ সনে আমরা তাঁতের জুতা লাইসেন্স পাই এপ্রিল মাস হইতে, কিন্তু অসাধু চোরাকারবারীদের বিরোধিতা বিঘ্ন ঘটায়। কন্ট্রোলার সাহেবের সহায়ত আনুকূল্যে ১২/৭/৪৭ হইতে সূতা পাইতে থাকি। আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল থাকায়ও সমিতির পক্ষে সূতা আনানো অসম্ভব হয়। এই সময় তদানীন্তন এস, ডি, ও সাহেব ১০০ টাকা প্রদান করেন ও স্থানীয় অধিবাসীদের দান ও মাসিক চাঁদা হইতে ৬০ টাকা সংস্থান হয়। আমরা মোট ৪২২৬/০ আনার সূতা পাই। বাকী টাকা নিজেদের দায়িত্বে কিছু কর্জ করিয়া সূতা ক্রয় করিলাম ও মাসিক ৬০ টাকা বেতনে স্থানীয় একজন কারিকর রাখিলাম। আমরা অর্থাৎ সমিতির কর্মীবৃন্দ তাহার নিকট কাজ শিক্ষা করিব এবং উক্ত কারিগর খরচ সংকুলনের জুতা দৈনিক ১ খানা ৪০ নং সূতা কাপড় প্রস্তুত করিবে। কিন্তু ১৫ই আগষ্ট আসায় অনেক উৎসাহী কর্মী স্থান ত্যাগ করিলেন। ফলে সমিতির কর্মী সংখ্যা ৮ হইতে ৩ টাড়াইল। একটা দুঃখ বিবধা সম্ভাবনবতী। অপরটি নিম্ন মধ্য শ্রেণী।

প্রত্যেকেরই সাহায্য প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের

ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট আয় সামান্য। মোস্তার বার এসোসিয়েশন বার্ষিক ২৪ টাকা ও মিউনিসিপ্যালিটি বার্ষিক ৪৮ টাকা সাহায্য করেন। পূর্বোক্তিতে সধবা মহিলা শ্রীকমলা গুপ্তাকে মাসিক ৫০ টাকা দিই। বালিকা বিদ্যালয়ের জলযোগের ব্যবস্থা না থাকায় সমিতিতে ১০০ মূলধন দিয়া জলযোগের ব্যবস্থা করাই। কমলা দাস সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও সমস্ত লভ্যাংশ তাঁহাকে দেওয়া হয়। বিধবা মহিলাটিকে ৫০ টাকা শিক্ষার্থিনীর হাতখরচ বাবদ দেওয়া হয়। অপরটিকে নির্দিষ্টভাবে দিয়া উঠিতে পারি নাই। কমলা দাসের মাসিক আয় ১৫ হইতে ২০ টাকার মধ্যে।

১৯৪৮ সনের জামুয়ারী মাস হইতে বিড়ি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইতেছে, ১০টি মহিলা উক্ত কাজে যোগ দিয়াছেন। অল্প দিন বলিয়া তাঁদের মাসিক আয় লেখা সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া অবসর সময়ে লেশ বুনিয়া ও জামা সেলাই করিয়া দুইটি মহিলা ৬৭ টাকা পাইতেন (মাসিক); কিন্তু লোক সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায়, তাঁহারা ২১০ টাকার বেশী পাইতেছেন না।

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য হইতেছে - হিন্দু মুসলমান মিলিয়া পাক্ষিকভাবে সাক্ষাৎ অধিবেশন। নির্দোষ আয়োদ, কোভুক, খেলা, সাহিত্যলোচনা হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা, সম্ভ্রান্ত মহিলারাও যোগ দিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। আনন্দ মেলার সভ্যদের লইয়া প্রত্যেক শনিবার, রবিবার সূতাকাটা হয়। সভ্যরা স্কুলের ছাত্রী।

দেশের ভাগ্যগগন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, মহিলা সংস্কৃতির ধারা যে গতি লাভ করিয়াছে তাহা যেন আবার রুদ্ধ না হইয়া পড়ে, শ্রীভগবানের চরণে ইহাই কামনা। আপনাদের সহায় আনুকূল্য, সুদূর পল্লী সহরের মহিলা সমাজকে অপাংক্তেয় বলিয়া কোন দিনই বর্জিত করে নাই। আমাদের কার্য অল্প হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের শুভেচ্ছার উপর বিশ্বাস রাখিয়া বর্তমান বিবরণী শেষ করিলাম।

সাময়িকী

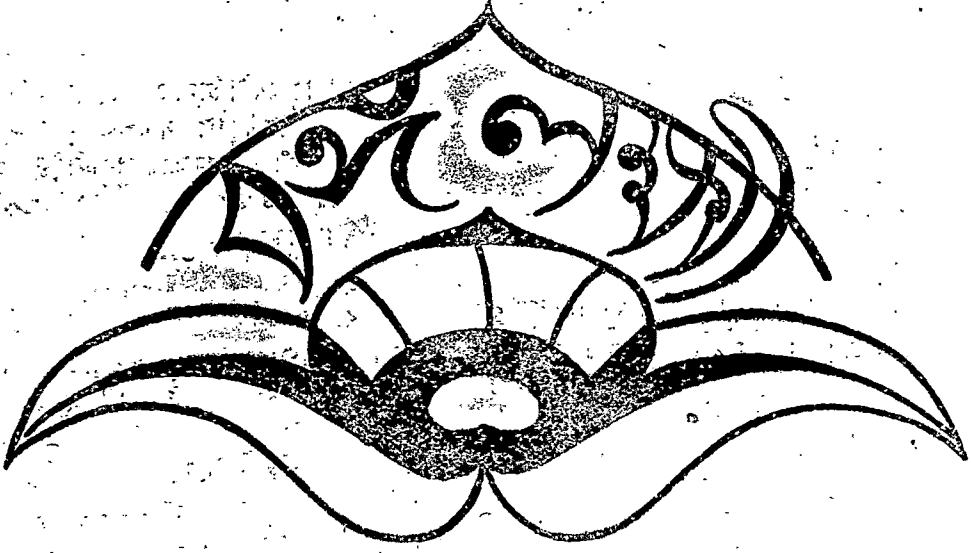
পতিতাবৃত্তি নিরোধের ব্যবস্থা

পতিতালয় সমূহ উচ্ছেদ করিতে বাংলা সরকার তৎপর হইয়াছেন, এই কারণে সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পতিতালয় সমূহ সমাজের পক্ষে কুষ্ঠব্যাধিস্বরূপ। বিধাক্ত ও মারাত্মক ব্যাধি এই সকল স্থান হইতে সমগ্র সমাজে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। এতদুদ্ভিন্ন দুর্বৃত্তগণের দ্বারা অপহৃত মেয়েদের ও অল্প বয়স্ক বালিকাদের পর্য্যন্ত এই সকল স্থানে রাখা হয় এবং বল প্রয়োগে জঘন্য বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হয়। পতিতালয় সমূহের উচ্ছেদ সাধন সম্ভব হইলে, মানব সমাজ এক কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

আইন ও বলপ্রয়োগের দ্বারা এই সমস্তার সমাধান করা সম্ভব হইবে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। ইহার ফলে পতিতাগণ কর্মচারীদের টাকা দ্বারা বসে আনিয়া

প্রচ্ছন্নভাবে ব্যবসা চালাইবে (যাহা বর্তমানে চলিতেছে), আর না হয় স্থান ত্যাগ করিবে, আসলে সমস্তার সমাধান হইবে না। পতিতাবৃত্তি একদিনে হঠাৎ গড়িয়া উঠে নাই। সমাজ ব্যবস্থার সহিত ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে; অর্থনীতির সহিতও এর যোগাযোগ আছে। সমাজে অত্যাচারিতা ও উপেক্ষিতা নারী অন্তত্ব স্থান না পাইয়া বিবেক ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জঘন্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, এই প্রকার বহু মর্শ্বভূত কাহিনী রহিয়াছে। অর্থনৈতিক কারণেও জঘন্য বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে, এই প্রকার নজিরও কম নাই। কাজেই আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি প্রকৃতই সমাজ হইতে পতিতাবৃত্তি দূর করিতে হয়, তাহা হইলে পতিতাদের ভিতরে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদিগকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং যে সমস্ত কারণে পতিতাবৃত্তি নারীরা গ্রহণ করে, সে সমস্ত কারণ সমাজ হইতে দূর করা দরকার। বীজ রাখিয়া কাণ্ড ছেদন করিয়া বৃক্ষের ধ্বংস করিতে যাওয়া বৃথা প্রয়াস।





২৩শ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৫

৯ম সংখ্যা

দুঃখের বরষা

শ্রীকালিদাস নাগ

বিজয়াদিত্যের সভাকবি কালিদাসের যুগে আর্ষাট মাস পড়তেই কবির কাব্য ও সঙ্গীত রচনায় বর্ষা-আবাহন করতেন। এ বছর আসন্ন বর্ষার মধ্যে দেখছি আকাশে দুঃখ রেদনার ঘন ঘটা। বলা বাহুল্য সেটা “কাব্যিক” দুঃখ বেদনা নয়, একান্ত বাস্তব ও নিষ্ঠুর সত্য। দেশ স্বাধীন হয়েছে অথচ তার মধ্যে বেথি লক্ষ লক্ষ নর-নারীর কাছে “দেশ” কথাটির কোনও অর্থই নেই; কারণ নিজ বাসভূমে তারা পরবাসী। স্বাধীনতার মূল্য দিয়ে যাচ্ছে কারা? যারা নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে ইতিহাসে অমর হয়েছেন তাঁদের কথা আলাদা; কিন্তু যারা এই রাজ-নৈতিক ভূমি-কম্পের ফলে সর্বস্ব হারা হয়ে পথে বেরিয়ে এসেছে তাদের কথাই বিশেষ করে আজ ভাবতে হবে। কোন সুদূর এক থানি গ্রামকে আশ্রয় করে যাদের পূর্বপুরুষ দিন কাটিয়ে এসেছে, তাদের ছেলে মেয়েরা হঠাৎ একদিন দেখল তাদের ঘর নেই, সমাজ নেই, স্বতরাং দেশও নেই! সম্পত্তি রক্ষা তো দূরের কথা সম্মানটুকুও বজায় রাখা দায়—বিশেষ করে নারীর পক্ষে। এই প্রচলিত বেদনার ইতিহাস বেশীর ভাগই অলিখিত থাকবে; তবুও সেই ইতিহাসটি অস্বীকার করা

জাতির পক্ষে চরম অকৃতজ্ঞতা। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ফলে শুনছি এক “মিলিয়নের” উপর নরনারী খাটালের পশুর মত মধ্য ইউরোপের নানান স্থানে ছড়িয়ে আছে; অথচ তিন বছরের উপায় যুদ্ধ থেমেছে—কিন্তু থামলো কোথায়? স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র মাতা ও শিশু কে কোথায় ছয় ছাড়া হয়ে রয়েছে তার হৃদয় নেই, অথচ বিজয়ী রাষ্ট্রশক্তির জয়ের মূল্য চাইছে। কত সংসার ধ্বংস করে সেই মূল্য জোগানো হচ্ছে তার কিছু অভাব পেলাম ইউরোপে উদ্বাস্তুদের বিবরণ থেকে।

সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল ভারতের স্বাধীনতার দাম দিতে হ'ল দুই প্রত্যন্ত প্রদেশ পাঞ্জাব ও বাঙ্গলাকে। পাঞ্জাবের দুর্গতি অবর্ণনীয়। কুরুক্ষেত্রের শিবিরে যে সব নারী কর্মী কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে এমন সব গল্প শুনেছি যা “ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে” শোনার মত নয়; অথচ এই আধুনিক দ্রোপদীদের চরম দুর্গতির মহাকাব্য লেখবার মত বেদব্যাস কোথায়?

সোনার বাঙ্গলাকেও নিষ্ঠুর পণ দিয়ে স্বাধীনতা কিনতে হয়েছে। বাঙ্গলার সোনার দেহে কালী পড়েছে। নোয়া-

খালীর নিদারুণ ইতিহাস তার নিদর্শন। বান্ধলার লাক্ষিত নারী-শক্তির চাপা কান্না শুনে যে মহাপ্রাণ পুরুষ ছুটে এসেছিলেন নিশ্চিত মৃত্যুকেও উপেক্ষা করে সে মাতৃভক্ত মহাত্মাজীও আজ পথ দেখাবার জন্য আমাদের সঙ্গে নেই। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে দেখছি ছোট বড় সব রকম নেতারা দাম কষছেন প্রত্যেকের আত্মোৎসর্গের কাঙ্ক্ষন মূল্য—হায় স্বাধীনতা! অথচ সাধারণ নর-নারীদের অন্ন বস্ত্রের সামান্য ব্যবস্থাও এখনও হ'ল না। তার উপর

উদাস্তদের মাথায় একটা চালাও নেই। পথের কুকুরের মত তাড়িত হয়ে এখানে সেখানে সাময়িক একটু আশ্রয় পেতে তারা চেষ্টা করছে। জীবনযাত্রায় যে পদ্ধিটুকু পশু ও মানুষে ভেদ রক্ষা করে তাও তাদের ঘুচে গেছে। হয়তো তাদের জন্যেই কবিগুরু কোনও এক বর্ষায় লিখেছিলেন—

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।”

হয়ত উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় উদাস্তরা প্রশ্ন করছে,
“কোথায় বন্ধু? কবে দেখা পাব?”

শ্রাবণ

(কবিতা)

শ্রীপিণাকীরঞ্জন কৰ্ম্মকার

টুপ্‌টাপ

ঝুপ্‌ঝাপ্‌

ঝরে জোরে ঝুটি ।

ঝিমঝিম

ঝিমঝিম

রব ভারি মিষ্টি ॥

কোলা ব্যাং

তুলে ঠ্যাং

গড়ে জলে ঝাঁপিয়ে ।

খাল বিল

হল মিল

ভরে যায় ছাপিয়ে ॥

কলকল

ছলছল

নদীভরে প্রাবনে ।

ভরা নদী

নিরবধি

ভাদরে ও শ্রাবণে ॥

শিশুদলে

ভিজে চলে

নাহি মানে মানাটা ।

পাখী শাখে

শুধু ডাকে

ঝড়ে ভেজা ডানাটা ॥

১৯৩৮ এর বিয়ে বাড়ী

শ্রীশান্তা দেবী

বড় লোকের প্রথম কন্যার বিবাহ। আজ গায়ে হলুদের রাত্রেই “মেয়ে যজ্ঞ”। কাজেই বাঙ্গালীর ঘরের ঐশ্বর্যের চরমতম প্রকাশ আজই দেখা যাইবে। চকমিলানো বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান এমোড় হইতে ওমোড় পর্যন্ত যথারীতি হোগলা পাতা দিয়া ঢাকিয়া তাহার তলার শাদা পদ্মকাটা লাল চাদোয়া। সবুজ হলুদ ও গোলাপী ছোপানো পাতলা কাপড়ের মালা চাদিপাশে স্তরে স্তরে ছলিতেছে। বড় রাস্তার উপরের ফটক হইতে সুরকি ঢালা পথ এবং তাহার পর ভিতর বাড়ীর মার্বেল পাথরের মঝে উঠান পর্যন্ত লাল শালুর আস্তরণ দিয়া মুড়িয়া ফেলা হইয়াছে। আজ ধনীর প্রাসাদের মর্ম্মর স্তম্ভতাও লজ্জায় লুকাইতে চাহিতেছে।

বাড়ীর মত তরুণ জামাই ও ছেলেরা কটকের পাশেই ঘাসের জমির উপর চেয়ার পাতিয়া সার দিয়া বসিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অভ্যর্থনায় ভার তাহাদেরই উপর। সেই স্বযোগে রূপসীদের রূপ ও প্রসাধনের দ্ব্যভিতে চোখেরও একটু লাভ হইয়া যায়।

কিশোরী মেয়েদেরও কাজে উৎসাহের অন্ত নাই। অতিথির গাড়ী হইতে নামিতেই একটি অষ্টালঙ্কারে সজ্জিতা বালি। তাঁহাদের একহাতে আটপেপারে ছাপা কবিতাশুচ্ছ ও অপর হাতে গাড়ীর নম্বর দিয়া যাইতেছে। দুই পা চলিতে না চলিতেই আর একটি তরুী কিশোরী আসিয়া হাতে একটি করিয়া আখফোটা গোলাপের কুঁড়ি দিয়া যাইতেছে। ছটি তিনটি ছোট ছোট বালিকা তাহাদের কচি কচি হাতে রূপার আতর দান গোলাপ পাশ ও ছোট একটি চন্দনের থালা লইয়া অতিথিদের মহাঘটা করিয়া অর্ঘ্য দিয়া ভিতরে লইয়া বসাইতেছে।

চাদোয়ার তলার শত চন্দ্রের শোভা শুধু যদি রূপসীদের রূপের মেলা হইত এমন চাঁদের হাট দেখিয়া সহজেই যাহ্নঘের চোখ জুড়াইত। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা বাঙ্গালীর মেয়েদের

মুক্তহস্তে ত রূপ বিলাইয়া দেন নাই। শ্যামা বাংলার একটা শ্যামশ্রী ও কমনীয়তা বাঙালীর মেয়ের অঙ্গে আছে বটে। কিন্তু তাহাও এক দিকে দারিদ্র্যের অত্যাচারে শুকাইয়া ও অপর দিকে প্রাচুর্যের অত্যাচারে চাপা পড়িয়া হারাইতে বসিয়াছে। অলঙ্কার আর প্রসাধনই তাহাদের আজ রূপ।

মেয়েদের লোহার সিন্দুকে ও বাজ্রে বাহার মত অলঙ্কার এতদিন বিনা প্রয়োজনে পড়িয়া পড়িয়া মরিচা ধরিবার উপক্রম করিতেছিল আজ তাহাদের সর্বাপেক্ষা সমাদর। সংখ্যায় সৌষ্টবে ও অর্থ গরিমায় তাহারা আজ কেন যে দশ বিশগুণ বাড়িয়া উঠিতে পারেন নাই এইটাই ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ।

প্রসাধন কুয়িঠাদের দেখিলে মনে হইবে বাংলা দেশের অলঙ্কারধারণ পদ্ধতি মোটামুটি তিন রকম। প্রথম নম্বর আপাদ মস্তক হীরা মুক্তা পাশা চুনির মোড়ক, দ্বিতীয় আংগা গোড়া সোনার মোড়ক, তৃতীয় বাছাই করা কয়েকটি হীরার গহনা। যে দুই চারিটি ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম আছে তাহারা সকলেই বাড়ীর লোক।

প্রকাণ্ড কালো একটা মোটর গাড়ী হইতে নীল জংলা বেণারসী ও মুক্তার গহনা পরা একটি মহিলা নামিলেন, তাহার সঙ্গেই নামিলেন প্রমীলা। কিন্তু দুইজনের বেশ ভূষায় কি আকাশ পাতাল প্রভেদ! কেবল মাত্র বেশের সাহায্যে বিচার করিতে হইলে প্রমীলাকে ধনী মহিলার দাসী বলিলেও কোন অন্যায্য হইত না। অভ্যর্থনা কমিটির সদস্তেরা মহিলাকে বটা করিয়া লইয়া গিয়া বসাইলেন, কিন্তু প্রমীলার দিকে চোখ তুলিয়াও কেহ চাহিল না।

নিমন্ত্রিতারা বেশীর ভাগই বিবাহের কনের মত আড়ষ্ট হইয়া নীরবে নিজের নিজের আসনে বসিয়া আছেন, কেবল তাঁহাদের চোখগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজ অঙ্গও

নবাগতাদের অঙ্গের অলঙ্কারে তুলনা বারবার করিয়া লইতেছে।

প্রমীলা বসিতেই সঙ্গিনী তাহাকে ফিস ফিস করিয়া বলিলেন, “দেখলি ত, তখনি বলেছিলি যে গুরুত্বপূর্ণ মত নেমন্ত্রণে বায় না, দুখানা গয়না কাপড় পর। তা আমার কথায় কান দেওয়া হোলনা। এখন হল ত? এমনি করলে মান সম্মান থাকবে লোকের কাছে? একখানা কাগজও ত কেউ হাতে দিল না।”

প্রমীলা বলিল “না দিল, না দিল, তাই বলে আমি কি পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করে বেড়াব গয়না কাপড়ের জন্যে? আমাকে না আনলেই ত পারতে! আমি একখানা ঠিকি গাড়ী ভাড়া করে আসতাম এখন।”

সঙ্গিনী বলিলেন, “হ্যাঁ, তাহলেই ষোল কলী পূর্ণ হত আর কি!”

প্রমীলা বলিলেন, “মন্দই বা কি হত? তোমার গাড়ীতে আমার বি মনে করছে, তাতে তবু ভাবত যে গাড়ীভাড়া দিয়ে অন্তত নিমন্ত্রণেই কেউ এসেছে।” সখী সিদ্ধুবালা লজ্জা পাইয়া বলিলেন, “আ মরি, কথার ছিরি দেখ না! আমার মত কাল পেছার যদি তোমার মত চাঁদবদনী বি হত তাহলে ঘরে ঘরে গিন্নির চেয়ে বিএর আদরেরই ধুম পড়ে যেত বেশী।”

প্রমীলা বলিল, “ও জিনিষটা সংসারে খুব ছলভ ভেবে না। ওইত তোমাদের বেণু ঘোষালর রাধুনী বামনী আজ সংসারের গিন্নি হয়ে কি সন্দারীটাই না করছে। স্ত্রী বেচারী বেঁচে থাকতে ওর সিকিও কোনো দিন কল্লত পারনি। তাই বলে ভাবিস নে যে তোর গিন্নিগিরি কেড়ে নেবার আমার কোন ইচ্ছা আছে।”

সিদ্ধুবালা মুক্তার তাবিজ দোলাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল “বালাই! অমন বার মহাদেবের মত স্বামী তার এমন পোড়া কপাল কেন হতে যাবে? তুই নিজের ঘরে রাজ রাজরাজেশ্বরী হয়ে থাক। কিন্তু তাই বলে মিলের কাপড়গুলো আর ওই বাড়ীর তৈরী জামাগুলো পরে লোকের বাড়ী বাসনে। একটা গরদের শাড়ীও কি কিনে রাখতে পারিস না! ছেলেদের জন্যে তিনটে মাটির রাখতে পারিস আর একটা শাড়ী জোটে না,

একথা বললে কে বিশ্বাস করবে শুনি?” প্রমীলা বলিল, “ছেলেদের মুখখু করে রেখে দিলে আর আমি গরদের শাড়ী পরে বেড়ালে বড় হলো ছেলেরা মাকে খুব ধন্য করবে ত?”

খাইবার ডাক পড়িল। যিনি ডাকিতে আসিয়াছিলেন তিনি যতক্ষণ না প্রত্যেকের গায়ে হাত দিয়া আসন হইতে তুলিলেন ততক্ষণ প্রত্যেকেই আহারে একান্ত অনাসক্তি দেখাইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের যেন ঠেলিয়াই গিয়া যাওয়া হইতেছে এমনি ভাবে সকলেরই পিঠে এক একবার মৃদু আঘাত করিয়া দুইপা অগ্রসর করিয়া দিয়া মহিলাটি সকলের পিছনের নিমন্ত্রিতার পিঠে হাত দিয়াই চলিলেন। পথ চলিতে চলিতে পরিচিতরা পরস্পরের নূতন শাড়ী গহনা পরখ করিতে কহিতে মৃদু আলাপ শুরু করিয়া দিল। একটি মেয়ে বলিল, “এত বড় লোকের বিয়েতে আমাদের ডাকা কেন? আমরা দিতে থুতে ত আর কিছু পারি না। দু টাকা চার টাকার জিনিষ হাতে করে এসে দেখি ঘরে হামিন্টনের দোকান বসে গেছে, আমাদের এত কষ্টে বার করা টাকার জিনিষ পায়ের তলায় তলিয়ে গিয়েছে।”

সুচতুরা আর একটি সুন্দরী মুখ নাড়িয়া বলিল, “আমি বাপু, অমন জায়গায় আধ পয়সাও বার করি না। আমাদের দু চার পয়সার জিনিষ তারা কড়ে আঙ্গুলে করেও কোনোদিন ছোঁবে না। মাঝের থেকে—লোকের চোখের সামনে আমার গরীবীমানার পরিচয় দিতে মার্কি মেরে টাঙিয়ে রেখে দেবে আর আমার পয়সাটাও জলে যাবে। আমি বাপু শুধু হাতেই আসি।”

পিছন হইতে পিঠে খোঁচা দিয়া তৃতীয়া একজন বলিল, “যাবার সময়ও শুধু হাতে বাস, আঁচলে বেঁধে যেন কিছু নিয়ে বাস নে।”

মেয়েটি বলিল, “হ্যাঁ, তা যাবার যো থাকলে গেলেই ভাল হত। বড় লোকের বাড়ী যাওয়া মানে ত দুটো আঙ্গুল নিয়ে পাতের উপর নাড়া? খাবার নিমন্ত্রণে খেতে এসেছি প্রমাণ হয়ে গেলেই সব চেয়ে লজ্জার বিষয়।”

সাদা কাপড় ঢাকা লম্বা টেবিলে সারি সারি মাটির মেটে সব খাবার এক সন্দেশেই সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মেয়েয়া আসিয়া বসিলেন। কাহারও হাতও নড়ে না, মুখও নড়ে না। একজন ভদ্রমহিলা জরিপেড়ে শান্তিপুরে শাড়ী পরিয়া তদারক করিতেছিলেন। তিনি সকলকে বিনীত ভাবে থাইতে অনুরোধ করিলেন। মহিলাদের হাত উঠিল, সামান্য দুই একটি জিনিষ নাড়া চাড়া করিয়া আবার থামিয়া গেল। আড় চোখে সকলে সকলের পাতের দিকে দেখিতে লাগিলেন। কাহার বেশী খাওয়া হইয়া গেল কে জানে? বাহাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে তাহারা দুই একজন লজ্জা ভুলিয়া

তিনচার গ্রাস খাইয়া ফেলিলেন।

নিমন্ত্রিতারা উঠিয়া গেলেন। সারি সারি থালা তেমনি সাজানো। কেহ যে এই পাতে থাইতে বসিয়াছিল বুঝিবার জো নাই। পাতা পরিষ্কার করিবার ধুম লাগিয়া গেল। বাসতির ভিতর মাছ দই সন্দেশ ঝাল টক সব এক সঙ্গে পড়িতে লাগিল। কত টাকর জিনিষ অপচয় হইল কেহ হিসাব করিল না, খাওয়া নষ্ট করার জন্য কাহারও শাস্তি হইল না। কিন্তু তখনও দেশেঅন্যাহারে লোক আজিকার মতই শুকাইত।

মাতৃভাষা ও নববিধান

শ্রীবিধনাথ ধর।

শিক্ষার মাধ্যম নির্ণয় কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত রিপোর্টে আনন্দজনক কোন সুশ্রুত বিধান নাই। গতানুগতিকের স্বর তাহাতে লাগিয়া আছে। দুই শত বৎসর ধরিয়া আমরা যে ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছিলাম এখনও তাহার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। পরীক্ষার মাধ্যম দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সেই গতানুগতিক ইংরাজীর মারফৎ হইবে। পরীক্ষার্থীগণ ইংরাজীর মাধ্যমে সকল বিষয় শিক্ষালাভ করিবেন, এবং ইংরাজীতেই তাঁহাদের সকল বিষয় পরীক্ষা দিতে হইবে। এই অভিমত শুনিয়া মনে হয় চিন্তাশীল ও প্রগতিবাদী শিক্ষাবিদগণ ইহাতে স্তব্ধ হইবেন না। স্তব্ধ হইবার কথাও নহে, কারণ শিক্ষা দিবার অজুহাতে আমাদের দীর্ঘকাল ভাষা শিক্ষার দিকে নজর দিতে হইয়াছে এবং ইহা আমরা পরাধীনতার গ্লানি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ হউক—ইহা কেহ চাহেন না, চাওয়া নিবুদ্ধিতার কাজ হইবে; কিন্তু ইহাও

কেহ চাহেন না যে বিভিন্ন বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞান অর্জন না করিয়া ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করা উচিত। এতাবৎকাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজীকেই শিক্ষার বাহন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা জিজ্ঞাস্য যে ইংরাজীকে যথাসম্ভব উচ্চ স্থান নির্দেশ করা সত্ত্বেও ছাত্রগণ কি ইংরাজীতে খুব পণ্ডিত হইয়া যাইতেছেন? পরন্তু বিভিন্ন শিক্ষকগণের নিকট হইতে প্রায়ই শোনা যায় ইংরাজীর জ্ঞানে ছাত্ররা দিন দিন দরিদ্র হইয়া যাইতেছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করি শিক্ষাবিদগণের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণের সাহায্যে ছাত্রগণের উপর ইংরাজীর বোঝা ত যথেষ্ট চাপান হইয়াছে কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের আশা কি ফলপ্রসূ হইয়াছে? বিভিন্ন নোট বইএর সাহায্যে পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়া নিত্য সাধ্যাতীত নহে, কিন্তু তাহাতে কি আসল শিক্ষা হইতেছে? বিষয়বস্তুকে যত সরল করিয়া বুঝান যায় ততই অধিকতর বোধগম্য হয় এবং মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা যে অধিকতর বোধগম্য হয়

তাহা সকলেই বুঝেন এবং উহা ছাত্রগণের যে কল্যাণকর তাহা সকলেই মানেন। কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করিতে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল দেবী করিবার কোন অর্থ হয় না। যদি ইংরাজীর পাশাপাশি মাতৃভাষাকেও পরীক্ষার বাহন করা হইত তাহা হইলে সব দিক্ দিয়া শোভন হইত। আশা করিয়াছিলাম মাতৃভাষার সাহায্যে আমরা আমাদের শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিব এবং উহা আশা করা অসম্ভব নহে। ১৯৪৮ সালের পরীক্ষায় মাত্র একমাস অপেক্ষা কম সময় পূর্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাত্রদিগকে মাতৃভাষায় পরীক্ষার উত্তর দিবার সুযোগ দান করায় স্বেচ্ছাশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এবং এই অভ্যন্তরীণ সময়ের মধ্যে বহু পরীক্ষার্থী মাতৃভাষায় উত্তর দিয়াছেন। ইহা খুব আনন্দের বিষয়। এই অভ্যন্তরীণ কালের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় লেখা যে কম প্রমসাদ্য বাণ্য নহে তাহা সকলেই বুঝেন।

বিশেষ সুবিধার অভাব সত্ত্বেও মাতৃভাষায় উত্তর দান নব-প্রচেষ্টা হিসাবে যথেষ্ট প্রশংসনীয়। এই একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যায় যে, ছাত্রগণকে সুযোগ দিলে তাহার সদ্যবহার হইবে এবং তাহাতে শিক্ষার ভিত্তিমূল দৃঢ় হইবে এবং না বুঝিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইবে।

পরিশেষে এই কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি যে, ছাত্রগণকে জ্ঞান সুযোগ সুবিধা অনতি-বিলম্বে দান করিলে শিক্ষার যথার্থ আদর্শ অনুসরণ করা হইবে এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীর পার্শ্বে অন্তর্ভুক্তিকালের (কথিত পাঁচ বৎসর) জন্ত রক্ষা করিয়া বিশেষ চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া শিক্ষার মূল ভিত্তিকে দৃঢ় করা যুক্তিযুক্ত হইবে। শিক্ষা সমস্তার এই দিকটির প্রতি সুবিবেচনা করিবার জন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবং জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

গুণী

শ্রীআশালতা গুণী

চট্টগ্রাম শহরের বাহিরে পার্শ্বত্যা বনানীর সন্নিকটে একটা হোটেল আছে। হোটেলের মালিক বংশী খুব স্বনামের সহিত এই হোটেল চালাইতেছে। প্রায় মাসখানিক হইল হীরক সেন নামক এক রেওলয়ে কর্মচারী বংশীর হোটেল বাস করিতেছেন। হীরক খুব আমোদপ্রিয় ভোজন বিলাসী লোক। তিনি প্রায়ই বংশীকে ভাল ভাল খাবার তৈয়ার করিতে টাকা দিতেন। বংশী ও খুব যত্নের সহিত তাহাদের মনোমত আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিয়া দিত।

একদিন আহারান্তে হীরক বংশীকে বলিলেন, “তোকে এত টাকা দিচ্ছি, তুই কেবল বাইস মাছ খাওয়াচ্ছিস কেন রে? আজকে অন্য এক মাছ আনি।” এই বলিয়া হীরক অফিসে চলিয়া গেলেন।

রাত্রিতেও বংশী সেই মৎস্যের কোল রান্না করায়

হীরকের খুব রাগ হইল। হীরক মনে মনে বলিলেন, “আজ লুকিয়ে থেকে বংশীকে অনুসরণ করব। এত টাকা দেই তবুও সে বোজ এক রকম মাছ খাওয়ায়।”

বংশী নিয়মিত সমস্ত বাজারে যাইবার জন্য বাহির হইল। অলক্ষ্যে থাকিয়া হীরক বংশীর পিছনে পিছনে চলিলেন। বংশী বাজার পথ ছাড়িয়া পাহাড়ে উঠিবার পথ ধরিল। পাহাড়ে উঠিয়া বংশী একটা হ্রদের নিকট উপস্থিত হইল। হীরকও তাহার অলক্ষ্যে আছেন। হীরকের মনে কেমন এক ভয়ের সঞ্চার হইল। এর মধ্যে বংশী হ্রদতটে বসিয়া একটা বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।

হীরক প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্নমধুর বংশীবাদনে এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে কখন যে বাঁশী থামিয়া গিয়াছে

বুঝিতে পারেন নাই। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া হীরক দেখিতে পাইলেন বংশীর স্বরে মোহিত হইয়া হ্রদ হইতে অনেক সাপ বংশীর নিকট আসিয়াছে। বংশী তাহাদের মধ্য হইতে অনেক সাপ বাছিয়া বাছিয়া মাথা কটিয়া ফেলিয়া থলিয়ার মধ্যে ভরিতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটু ব্যথা প্রাইলেই প্রতিশোধ না নিয়া ছাড়ে না যে সাপ সেই সাপ যেন বংশীর নিকট বশ হইয়া আছে। বংশীর এই অসাধারণ ক্ষমতায় হীরক স্তম্ভিত হইলেন।

নিয়মিত সময় বংশী অফিসারদের আহ্ব্য পরিবেশন করিল, হীরক মৎস্য খাইলেন না।

পরদিন হীরক বংশীকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুই সাংঘাতিক লোক। তুই আমাদের সাপ খেতে দিস, আমি তোঁর সঙ্গে যেয়ে সব দেখেছি। সব খুলে বল। সত্য করে সব না বললে তোকে পুলিশে দেব।”

বংশী বলিল, “বাবু আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করি নাই। আপনাদের শরীর খুব ভাল আছে। আপনারা শক্তিমান হয়েছেন। প্রবাদ আছে সাঁওতাল সাপ খায়। সব কথাই মিথ্যা প্রবাদ হয় না, সত্যও হয়।”

তখন সকলে বলিল, “তুই কোথায় এসব শিখেছিস বল।” বংশী করবোধে অল্পনয় করিতে লাগিল, “তাহলে নিশ্চয় আমি মারা যাব। আপনারা জানতে চাইবেন না। আমার এইটুকু ক্ষমতা আছে, আমি থাকতে কোন লোক সর্পাঘাতে মারা যাবে না, আমার ছেড়ে দিলে আমি চলে

যাব। বাবু আমার প্রাণে মারবেন না।” হীরক বলিলেন, “সব ঘটনা খুলে বল।

বংশী বলিল, “বাবু একছড়া পাঁকা সবরী কলা, এক কলসী দুধ, একটা পাঁঠা ও একখানা নুতন হাঁড়ী আনুন। একখানা পাখাও সঙ্গে করে আনবেন। তারপর এই স্থানে তিনটা মাচা বাঁধুন। বড় মাচার কলা রাখুন মেজমাচার পাঁঠা রাখুন ছোট মাচার দুধ রাখুন, পাঁঠা যদি মাচা হতে পড়ে যার তবে তুলে দিবেন, পাঁঠাটাই আমার প্রাণ জানবেন। পাঁঠা তুলে মাচার না দিলে আমার প্রাণ নিশ্চয় যাবে।

বংশীর কথামত সব কাজই করা হইল। তখন বংশী হাতের কবচটা খুলিয়া ফেলিল এবং খুব হুস্মাকৃতি একটা লেজের টুকর বাহির করিয়া নুতন পাতিল দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। তারপর সে পাখা দিয়া বাতাস আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে বাতাস করিবার পর সোঁ সোঁ শব্দ বাহির হইল। পাতিল সরিয়া গেল এবং একটি প্রকাণ্ড সাপ বাহির হইয়া মাচার উপরের সমস্ত কলাগুলি এক এক করিয়া খাইয়া ফেলিল। পাঁঠা ভয় পাইয়া নীচে পড়িয়া গেল। অতবড় সাপ কেউ কখনও জীবনে দেখে নাই। বংশীর কাছে যে সব লোক পাঁঠা মাচার তুলিয়া দিবার কথা দিয়াছিল তাহারা ভয়ে দূরে সরিয়া গেল। এদিকে সর্পরাজ পাঁঠা না পাইয়া বংশীকে মুখে করিয়া চলিয়া গেল। অতবড় শক্তিমান গুণী বংশী মাতৃষের কোতুহল মিটাইবার জন্য প্রাণ দিল।

যাত্রা

শ্রীরেখা মিত্র

অনন্ত জগৎ চলেছে কোথায় কোন্ অজানার পথে

যাত্রার উহল গানে উদ্দামের রথে।

জানিনা সে কোন্ অসীম গগনে সীমার পরশ লাগি

সৌর জগৎ ছুটিছে কোথায় কাহার আশীষ মাগি।

এই যাত্রার প্রান্ত কোথায় জানিনাকো কেউ মোরা

কোন প্রেরণার উদ্দীপনায় কোন স্রবের ধারায় হারা।

স্বপ্ন হলো কবে এ খেলার ওগো কোন্ খেলালীর মনে

ছুটিয়া চলেছে গভীর আবেগে কিসের অন্তঃকণে ?

কত যুগ ধরি লক্ষ প্রাণীর হাসি অশ্রুর ধারা

এই যাত্রার রথের তলায় নিতি নিতি হয় হারা

কত প্রাণ আসে কত ওঠে ভাসে বিরাটের খেলা ঘরে

বাজে কত বীণ হয়ে আসে ক্ষীণ এই যাত্রার পারে।

পাথের ধূলায়

শ্রীশ্রীতিময়ী কর ভারতী

উনিশশ' ছাব্বিশ সাল। একটা অগ্রশস্ত গলির মধ্যে জন কতক তরুণ অধ্যাপক ও কলেজের ছাত্র লইয়া একটা নূতন মেস। বাজারের সুন্দার থলির ভিতরের তরিতরকারীর মত ইহার ভিতর হইতে বিবিধ শ্রেণীর লোক বাহির হইতে দেখা যায় না। 'অগ্ন্যন্ত' মেসের লোকদের সহিত ইহাদের আচরণেরও কিছু পার্থক্য আছে। কখন যে ইহারা বাহিরে যায় কখন আসে, লক্ষ্য না করিলে চোখে পড়ে না। হাট বাজার খাওয়া দাওয়া কাজকর্ম সবই চলে একটু নিঃশব্দে ও স্বতন্ত্রভাবে। গভীর রাত্রি ভিন্ন ইহাদের সকলকে একত্র হইতেও বিশেষ দেখা যায় না।

এই মেসের বৃদ্ধ চাকর শ্রামাচরণও একটু অভ্যুত ধরণের লোক। কথার ঠিক নেই। পাড়ার লোকে বলে মাথা খারাপ। বাহির হইতে কেহ কাহাকেও ডাকিতে আসিলে ঠিক খবর পায় না। বাড়ীতে থাকিলে বলে নাই। না থাকিলে বলে, আছে অজুখ, দেখা হবে না। ভূতোর নিকট অনেক নাস্তানাবুদ হইয়া তবে কাহারও সহিত সাক্ষাতের সন্যোগ হয়। এই মেসে অগ্ন্যন্ত কয়েকজনের মত আইনকলেজের ছাত্র চিন্ময় বসু থাকে। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সকলের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। ব্যায়ামগঠিত স্ত্রী স বল দেহ চরিত্রবান চিন্ময় মেসের সতীশদার একান্ত প্রিয় পাত্র।

একটানা নিয়মের মধ্যে আজই একটু ব্যতিক্রম ঘটয়াছে। অগ্ন্যন্ত হইতে দুইজন বন্ধুর আসিবার কথা। তাহাদের আসা উপলক্ষ্যে আজ একটু খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ আয়োজন হইয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতে কয়েকজন একত্র হইয়া তাহাদের জন্ত অপেক্ষা করিতে করিতে গল্প গুজবের অবতারণা করিয়া ফেলিল।

একখানা সংবাদপত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই ব্রজেন কহিল, আজকের কাগজে ভবেশ বাবুর অভিভাষণটা দেখেছো, চিন্ময়দা?

চিন্ময় কি একটা লিখিতেছিল, সে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, দেখেছি।

—কেমন লাগলো?

—ভালই, যা বলেছে বুক ঠুকে বলেছে। দশটা কিন্তু বারটা যেহেতু দিয়ে বলেনি। একেই বলে কারেজ অব কন্ডিক্সন।

আরেক ধার হইতে উত্তর দিলে কালীপদ।—আমাদের দেশে কথার তো অভাব নেই, অভাব কাজের। এক এক সময় বসে বসে ভাবি স্বাধীনতা লাভের জন্তে মুষ্টিমেয় লোক করবে সংগ্রাম, আর সব থাকবে ঘুমিয়ে। তা না করে একটু সামাজিক কাজের দিকেও যদি নজর দিত, তাহলে পথ কত সোজা হইয়ে যেত।

চিন্ময় ঠাট্টা করিয়া কহিল, এ ভাবনা অব্যবহৃত এল কোথা থেকে?

—আছে বরাবরই। ভাবি, যারা যাবে তারা যাবে, যারা থাকবে তারা করবে কি?

চিন্ময় সহাস্যে কহিল, সেজন্য তোমার ভাবনা নেই; সরকারী পয়সা আছে; তাদের কাজ জুটে যাবে।

পূর্ব কথা ধরিয়া ব্রজেন কহিতে লাগিল।—কলেজের ছেলগুলোর কথাই ধর না, এই যে এত বড় ছুটা আসছে কি সম্ভাবনারটাই করবে তারা? আটটায় বিছানা ছেড়ে উঠে দেড়টায় খেয়ে বাড়ীর মেয়েদের কাজে বিশৃঙ্খলা আনবে, বাকী সময়টা হয় সিনেমা নয় সিগারেটে, নয় বাজে আড্ডা দিয়ে কখন কেটে যাবে তার ঠিকানা থাকবে না। আর কিছু না হোক গ্রামে গিয়ে চাষা ভূযোগুলোর নিরক্ষরতা দূর করবার চেষ্টাগুলোও যদি করে! উচ্ছৃঙ্খল ছেলগুলোকে দেখলে রাগ ধরে। মেয়েদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, সমাজ তাহাদের এখনও রান্নাঘর থেকেই ছাড়বে না।

কালীপদ কহিল, তুমি বড়োই এক চোখের মত কথা বললে, ব্রজেন দা।

—না বলে আর উপায় কি?

চিন্ময় কহিল, উপায় যদি না থাকে ত সে আলাদা কথা, কিন্তু দশটা লোক এক সঙ্গে করে যেখানে কথা বলবার উপায় নেই সেখানে একথা কি করে বলো? গায়ে বল মাথায় বুদ্ধি নিয়ে, হাত পা গুটিয়ে থাকতে থাকতে উচ্ছ্বলতা তো আসতে বাধ্য। দয়ার পাত্র ওরাই, যেমন ভবিষ্যৎ তেমনই বর্তমান। এক একটা ডিগ্রি নিয়ে কি করবে এরা? বেকার ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কি আছে আশা? অথচ স্বযোগ পেলে কোনটাই না পারে? প্রমাণ কি তার নেই মোটেই?

—এ দুই একটা আঙ্গুলে গোণা লোক আর দু একটা গ্রাম বা সহর নিয়ে আমরা গর্ব করে মরলুম। এখন সহর আর গ্রামের সঙ্গে তফাৎটা দেখলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। এই অসম্মান জায়গায় কাজ করতে গিয়ে হৌচট খেয়ে মরা ছাড়া ফসল ফলান যাবে না ক্মিন কালেও।

মুখ না তুলিয়াই চিন্ময় কহিল, তেমন চাষীর মত চাষী হলে দু দিনেই সমস্ত চষে সমান করে দোনা ফলিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু তা থাক, তুমি বলছো গর্ব করার কথা, আমি তা বলছি, আমি বলি মহান্নভূতির কথা। অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্তে যে ডাক দিয়ে যেতে হবে সে কি শুধু গাল পেড়ে?

আলোচনা আরো একটু গড়াইতে পারিত, বাধা পড়িল। অগস্ত্য দুইজনকে সঙ্গে লইয়া দরজার কাছে সতীশ দা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গভীর রাত্রিতে যে মন্ত্রণা সভা বসিল তাতে কোন হাঙ্গা কথার অবতারণাই হইল না। জীবন মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় লইয়া যে সব বীর শহিদ বিপ্লবাত্মক কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের পিছনে সমর্থন ও সাহায্য দিয়া আন্দোলন চালানো ইহাদের কাজ। তাহারই কতকগুলি কার্য তালিকা লইয়া আলোচনা চলিল। তারপর আগন্তুক একজন বিদায় লইলেন, একজন রহিয়া গেলেন সেদিনকার মত মেসেই। যিনি চলিয়া গেলেন তাঁহার সঙ্গে বাহিরের দরজা পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়া সতীশ দা কহিলেন, কেউ সঙ্গে যাবে একজন? অনেক রাত।

আগন্তুক কহিলেন, কিছু না। আমাদের রাতের সঙ্গীর কখনও অভাব হয় না।

দিন দুই তিন পরেই একদিন ভোর বেলা চিন্ময়দের মেসবাড়ীখানা মস্ত বড় এক লালপাগড়ী বাহিনীতে ঘেরাও হইয়া গেল। সতীশ দা অতি প্রত্যাশে গাত্রোথান করেন। তিনিই প্রথম দেখিতে পান। তিনি ডাকিয়া দিতে না দিতে পুলিশ কর্মচারী ও সিপাইতে ঘর ভর্তি হইয়া গেল। এক ঘণ্টা ধরিয়া চলিল সমস্ত ঘর দুয়ার বাস্তু বিছানা জিনিসপত্র তল্লাসী।

দেশব্যাপী বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ফলে গেরুপ নানা প্রকার জোর নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে এ ঘটনা কিছু আকস্মিক হইলেও কাহাকেও বিস্মিত করিল না। বে-আইনিভাবে বক্তৃতা দিবার ও ইস্তাহার বিলি করিবার চেষ্টায় কয়েকজন ধরা পড়িয়াছে গত রাতেই। যাহারা মেসে ছিল তাহাদের জন্ত পুলিশ হানা দিয়াছে।

গ্রেপ্তার পরোয়ানা দেখাইয়া পুলিশ অফিসার যথা বিধি গ্রেপ্তার করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে মেস জনশূন্য হইয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে শ্যামাচরণ উপরে আসিয়া দেখিল, বিশৃঙ্খল ঘর দুয়ারের ভিতর দিয়া আশ্রিত বিড়ালটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বিশিষ্ট দুইজন ব্যারিষ্টারের জামিনে মুক্তি পাইয়া চিন্ময় প্রমুখ মেসের কয়েকজন ফিরিয়া আসিল পরদিন। বাহিরে যাঁরা ধরা পড়িয়াছিল তাহারা রহিয়া গেল হাজতেই।

দুই দিনকার শারীরিক অনিয়ম ও মানসিক অস্বস্তির পর আজ তাহারা বিশ্রাম করিয়া বাঁচিল। আসিবামাত্র শ্যামাচরণ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বাবু তোমাদের পুলিশে কেন ধরে নিয়ে গেল? কোথায় নিয়ে গিছলো বাবু? সেই মুখে জল না দিয়ে চলে গেলে সারা দিন আমাদের হাঁড়ি চড়ে নি! ভেবে ভেবে সারা হয়ে গিইচি!

চিন্ময় বলিল, তোদের ভাবনা কিসের রে! এই ত চলে এসেছি! ও রকম কত হয়।

দোতলায় জিনিস পত্র নাড়িয়া চাড়িয়া ঠিক করিয়া রাখার নানাবিধ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। শ্যাম বলিল, কেন বাবু ওরকম হবে, তোমরা কি চোর না ছাচড় যে

তোমাদের পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। যাক বাবু, তোমাদের গায়ে টায়ে হাত দেয় নি তো? কত জনে কত কথা বলছে। শ্যাম ফোস ফোস করিয়া কাদিতে লাগিল।

শ্যামের মন্তব্য শুনিয়া চিন্ময় হাসিয়া অস্থির। ধমক দিয়া বলিল; যা যা শিগ্গীর রান্না বান্নার বোগাড় কর। ঠাকুর কোথা গেল?

চোখের জল মুছিয়া শ্যাম ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল; এই যাই বাবু! সর্বাঙ্গিক করে রেখে পথ চেয়ে বসে আছি, উলুনে আঁচটা দিলেই হয়। আগে একটু হালুয়া করতে বলি। জল থাকে না?

রাত্রে আহাঙ্গাদির পর বাহিরের রকে হাওয়ার অশ্রু-মনস্কভাবে একটু পায়চারী করিতে করিতে চিন্ময় বাক্সের ভিতর একটা চিঠি দেখিতে পাইল। বাহিঃ করিয়া উপরের লেখা দেখিয়া বুঝিল সেটা তাহাদের দেশের বাড়ীর।

অবিলম্বে চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিয়া পড়িয়া দেখিল তাহার মায়ের হাটের অস্থখ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাকে পত্র-পাঠ বাড়ী যাইতে লেখা আছে। সরকার মশাইএর হাতের লেখা। কি কারণে চিঠিখানা আসিতে আবার দুই-তিন দিন দেরীও হইয়া গিয়াছে।

চিন্ময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। রাত্রি তখন দশটা, ট্রেনের মাত্র মিনিট কুড়ি সময় আছে। সে উপরে গিয়া স্টকেসটা তাড়াতাড়ি কোন রকমে গুছাইয়া লইল, অনতি-বিলম্বে মেগের সকলকে জানাইয়া দিয়া স্টেশনের অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেল।

দুই

অশোকপুর স্টেশনে যখন ট্রেন থামিল তখন বেলা দুটা আড়াইটা হইবে। স্টেশনের বাহিরে বড় বট গাছের তলায় বনপুত্রের বসুদের বন্দোবস্ত করা গরুর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। সরকার মশাইও স্টেশনে আসিয়াছিলেন চিন্ময়ের আসিবার সন্ধানবায়। তাহার কাছে চিন্ময় মায়ের আরোগ্য সংবাদ শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। তিনি চিন্ময়কে সমস্ত গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বাজারে প্রয়োজন আছে বলিয়া বাজারের দিকে চলিয়া

গেলেন। বলিয়া গেলেন প্রয়োজন শেষ করিয়া সাইকেলে শীঘ্র ফিরিবেন।

মাঝে মাঝে অনিবিড় বনজঙ্গল ও বিশাল প্রান্তরের ভিতর দিয়া চার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ছায়া স্থনিবিড় বনপুর গ্রামে পৌঁছিতে হয়। চিন্ময় সঙ্গে-ছোট বিছানাটি এলাইয়া লইয়া তাহাতে পা ছড়াইয়া দিল। বন্ধিফু গ্রাম বা বেশী সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাস। এ অঞ্চলে খুব অল্পই। একমাত্র বনপুরের বসুরাই এ বিষয়ে যাহা একটু খ্যাতি অর্জন করিয়া আসিতেছে। গরুর গাড়ী, পালকী, ঘোড়া ও সাইকেল ভিন্ন অন্য কোন যান বাহন এখনও এ পথে প্রচলিত হইয়া উঠে নাই। তাই দুর্গম তীর্থস্থানের মত একটা অদমনীয় প্রশান্তির মোহ সাবেক কালের কাঁচা রাস্তাটির ধলায় মিশিয়া আছে।

চিন্ময় চারিদিকে চাহিয়া দেখিল চৈত্রের থরথরোজে দৃষ্টি ঠিকরাইয়া ফিরিয়া আসে। চারিদিকে বাতাসের মধ্যে যেন আগুণ মিশানো।

শব্দের প্রহরী বজ্রদণ্ড আগে আপন কর্তব্য শেষ করিয়া কপন বিমাইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতি আর তাহাকে যেন জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। মাঝে মাঝে গোয়ানের করুণ ক্যাঁচক্যাঁচ ধ্বনি, বা শুষ্ক বেতবনের ভিতর হইতে ডাছকের আর্দ্র কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে, তাহাও অতি ক্ষুদ্র। ধরিত্রীর বুঝি আজ বুক ফাটে তবু মুখ ফোটেনা।

যুগযুগান্ত ধরিয়া পৃথিবীর এই সহনশীলতার বুঝ শেষ নাই। আদিমকাল হইতে সবলের উপর প্রবলের নির্দয় প্রতিপত্তির সে-নীরব সাক্ষী হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বুক ফাটলেও মুখ ফোটেনা। মাটির কোলে জন্মিয়া একখণ্ড মাটির অভাবে দুমুঠা অন্নবীজ সংগ্রহ করিতে কেহ যখন অসমর্থ হয়, দেবতার প্রসাদে বাহুবলে যে লুণ্ঠন করিতে পারে তাহারই স্ববর্ণখলিতে গিয়া অন্ন যখন সঞ্চিত হয়, চক্ষু পাতিয়া চাহিয়া থাকিয়াও তখন কই ধরণীর বলিবার কিছুত থাকে না। শুধু নীরবে বুকই ফাটে। নীল বনাস্তের ধার ঘেসিয়া শুষ্ক কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া হৃদয়পৃষ্ঠে ঐ যে কৃষক চলিয়াছে, উহারই মত শত শত দৈনন্দিন শ্রমিক উদয়াস্ত রক্তক্ষরা চেষ্টা করিয়াও

নিজের ও পরিজনের বাঁচিয়া থাকিবার মত শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহাদের সকল শক্তির মিলিত সম্মত ভাগ্যবানের বিলাস সৌধে উদ্ধাম ভোগের উচ্ছল বজ্রা বহাইয়া প্রতিকারের কাতর আবেদনকে যখন পদতলে নিষ্পেষিত করে ধরিত্রী তখন শুধু নিথর দৃষ্টিতে চাহিয়াই দেখে, কথা ত কহে না। বিশ্ব-নিয়ন্তার অস্তিত্ব ও ইচ্ছাকে মৃত দাস্তিকতায় অস্বীকার করিয়া সৃষ্টির সমস্ত শক্তিকে করায়ত্ত করিবার জন্য মানুষ যখন আপন পাশব বৃত্তিকে জগৎসমাজে পরিচালিত করে, ধরিত্রীর তখন বেদনায় বক্ষঃস্থল। ~~বলি~~ হইতে চাহিলেও মুখ ফুটিয়া একটা প্রতিবাদও বাহির হয় না।

অশ্রুত জনরব ও কুচি আমের মুছ গন্ধে চিন্ময়ের চিন্তা স্তব্ধ ছিল হইয়া গেল। সূচকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া চাহিয়া দেখিল বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

নোনাতালির পল্লী, তন্নিকটবর্তী পুলিশ থানা, ডাক বাংলো ও হাই স্কুলের কাছেই সে আসিয়া পড়িয়াছে। এখান হইতে বনপুর মাত্র দেড় মাইল।

সেখানে আসিয়া সরকার মশাইয়ের দেখা মিলিল। তিনি কোন গ্রাম্য সংক্ষিপ্ত পথ দিয়া কিছু আগেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সরকার মশাই একটা বড় আম গাছের তলায় চিন্ময়ের গাড়ী দাঁড় করাইয়া তাহাকে একটা ডাব খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ছোট ছোট খেজুর গাছে সোনালি রঙের থোকা থোকা পাকা খেজুর ফলিয়াছে। গরম বাতাসের দোলায় তাল গাছের খড়খড় শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাবুয়ের বাসা ঢুলিতেছে। তাহারই পাশ দিয়া আবার চিন্ময়ের গাড়ী চলিতে লাগিল।

দীর্ঘদিন সহরবাসের অভ্যস্ততার ফলে আজ এই রাস্তা টুকু কতই না দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ছেলেবেলায় একদিন গ্রামের সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া নিত্য এই স্কুলে আসিয়া সে পড়াশুনা করিয়াছে। তখনকার একটি দিনের কথা আজ চিন্ময়ের বিশেষ করিয়া মনে পড়িয়া গেল।

সেদিন ছিল ঘন বর্ষার দিন। শ্রাবণ ধারার স্রবের সঙ্গে কেয়াবনের অন্তঃপুরে একদিকে যেমন পুলক মাতন আরম্ভ

হইয়া গিয়াছিল, অগ্নি দিকে তেমনি নিরবচ্ছিন্ন জমাট মেঘের অবিরাম বর্ষণের পীড়ায় মৌন প্রকৃতি নিতান্তই ক্লান্ত ও বিষন্ন হইয়া উঠিতেছিল। সেদিন চিন্ময় একা। স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে কিছু দূর যাইতে না যাইতে বৃষ্টিটা এত প্রবল হইয়া উঠে যে অনন্তোপায় হইয়া পার্শ্বস্থিত ডাক-বাংলোয় গিয়া উঠিয়া পড়ে।

বনপুরের নিকটবর্তী মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে এ অঞ্চলের বহুদূর বিস্তৃত এক জঙ্গল ছিল। এই জঙ্গল বিভাগের স্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মাঝে মাঝে তাহার বন্ধু বান্ধব ও কর্মচারী পরিবৃত হইয়া জঙ্গল পরিদর্শন করিতে আসিয়া এই সরকারী বাংলোয় বাস করিত। সেই সময়ে বুনো শূয়ার ও খরগোস শিকারের প্রমোদ বিলাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার না করিত এমন দুর্কার্য ছিল না। রাস্তা ঘাটে চলাফেরায় মেয়ে মহল ত রীতিমত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত।

বাংলোর চারিপাশ ঘিরিয়া অনেকগুলি তাঁবু পড়িয়াছে। তাহার ভিতর কত লোক লঙ্কর, জুডিগাড়ী সসজ্জিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। বালক চিন্ময় দেখিতে পাইল, বাংলোর সম্মুখে সসজ্জিত ঘেরা বারান্দায় কতকগুলি গেরা আগন্তুক বসিয়া আছে। নিবিড় বর্ষায় হর্ষোন্মাসের সহিত তাহাদের পানাহারের উদ্যোগ চলিতেছে। তাহাদের সুন্দর রূপ ও বেশভূষার পারিপাট্য ও স্তম্ভক চিন্ময়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে নিজে এ অঞ্চলে সকলের চেয়ে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের ছেলে; কিন্তু এমন আড়ম্বরপূর্ণ জীবন তাহার ধারণার অতীত। বিশেষতঃ সাহেব দেখা তাহাদের কখনো ঘটে না। দেখিলে এত নূতন লাগে, মনে হয় বাহিরে যাহাদের এত রূপ ভিতর না জানি তাহারা কত সুন্দর।

বিশ্ববিমুগ্ধ চিন্ময় বাংলোর বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইবামাত্র একটা আরদালি ছুটিয়া আসিয়া 'নিকালো হিয়াসে' বলিয়া তাহাকে সেখানে দাঁড়াইতে দিতে আপত্তি করে। চিন্ময় সরলভাবে জানায় এত বৃষ্টিতে সে কোথায় যাইবে, বৃষ্টি থামিলে সে তো চলিয়া যাইবেই। ইহার উত্তরে সে ঘোড়া ও সহসিবের ছোট তাঁবু দেখাইয়া দিয়া 'হিয়া ঠ্যারো' বলিয়া ঠেলিয়া তাহাকে নামাইয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে

সমবেত গোরামণ্ডলী হাঙ্গ কলরব করিয়া ওঠে। বর্ধাধারায় আপাদমস্তক স্নান করিয়া চিন্ময় বাড়ী পৌছিয়া যত্নে রক্ষিত আধ ভিজা বইগুলি স্বেলে ঘরের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলে। আনলা হইতে একখানি কাপড় টানিয়া লইতে লইতে বিকৃত কণ্ঠে ডাকে, মা।

চিন্ময়ের মা স্বর্ণময়ী ছুটিয়া আসিয়া তাহার অপমানাহত আরক্ত মুখের দিকে তাকাইয়া চমকিয়া উঠেন। চিন্ময়কে বৃকের কাছে টানিয়া লইয়া বহু অল্পনয় করিয়া আদ্যোপান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার ক্ষোভের কারণ জানিতে পারেন। চিন্ময় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, আমাকে একলা পেয়ে এমন অপমান কেন করে, তুমি জ্যোষ্ঠা-মহাশয়কে বল মা, আমাদের কয়েকজন চাকর ও প্রজারা গিয়ে তাই তাদের বুঝিয়ে দিয়ে আসুক।

ছেলের কথা শুনিয়া স্বর্ণময়ী মতাই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। চিন্ময়ের জ্যোষ্ঠামহাশয়কে ডাকিয়া আনিয়া আড়াল হইতে বলিলেন, বহু বংশের কাউকে কখনও অপমানিত হতে শোনা যায় নি। এর একটা ব্যবস্থা করা নিশ্চয় দরকার।

চিন্ময়ের বাবার খুড়তুত ভাই এই জ্যোষ্ঠামহাশয় নেহাৎ ভালমানুষ। চিন্ময়ের বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার নাবালক পুত্র ও বিষয় আশয়ের কল্যাণ সাধনই তাঁহার একমাত্র কাম্য। তথাপি সমস্ত কথা শুনিয়া সাহেবদের বিরুদ্ধে কিরূপে অভিযোগ আনা যাইতে পারে, তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইলেন না। চিন্ময়কে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, তা বাবা তুমিও ভাল করনি ওই সাহেব স্বর্ষোর কাছে দাঁড়াতে গিয়ে। ও বরাবরই ওখানে আসে, যে ক'দিন থাকে, চারিধারের গ্রাম তছনছ করে দিয়ে যায়। কি দরকার আমাদের ওদের সঙ্গে?

চিন্ময় জেদ করিয়া বলে, কেন, কি অগ্রায় করেছে আমি? বিষ্টির সময় কারো ঘরে গিয়ে কেউ কি দাঁড়ায় না? আমাদের ওই বাইরের আটচালায় সেবার জঙ্গলের কাজে কোন সাহেব এসে বিষ্টির সময় বসেছিলো, আমরা কত যত্ন করেছিলুম। ওরা যখন আসে আমাদের বাড়ী থেকে কত জিনিস পত্র পাঠানো হয়, আমি বুঝি জানিনে?

আর ওরা আমাদের সঙ্গে এমনি ব্যবহার করে? ওরা মানুষ আর আমরা মানুষ না?

চিন্ময়ের মুখ ক্ষোভে রাঙা হইয়া উঠিল। শান্তবরে জ্যোষ্ঠামহাশয় কহিলেন, পৃথিবীতে সবাই কি এক মানুষ, বাবা? হাজার চলেও ওরা হলো গিয়ে রাজার জাত। ওদের কাছে আমরা?

চিন্ময় জ্যোষ্ঠামহাশয়ের উত্তর শুনিয়া রাগে দুঃখে কাঁদোকাঁদো হইয়া বলিয়াছিল, তাই বলে ওরা আমার গায়ে হাত দিয়ে অপমান করবে, আর আমরা চুপ করে থাকবো? সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে স্বর্ণময়ী বলেন, এ অগ্রায়ই বটে, অন্ততঃ একবার জানানো উচিত।

মাকে ছেলের কথার সমর্থন করিতে শুনিয়া সেদিন জ্যোষ্ঠামহাশয় একটু মুস্থলই গণিয়াছিলেন। সংঘত কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমিও কি ছেলের সঙ্গে পাগল হলে বোমা! বলতে গেলেই কি তারা আমার কথা মানবে? সাহেব স্বর্ষোর সঙ্গে হাঙ্গামা বাধাবার এই কি সময়? নাবালকের সংসার। চারদিকেই শত্রুতার ভয়।

চিন্ময়ের খুব মনে আছে তাঁহার সকল আবেদন ব্যর্থ করিয়া দিয়া সে প্রসঙ্গ ঐ পর্য্যন্তই চাপা পড়িয়া যায়। আর কোন কথা না বলিয়া মনের তলায় রুদ্ধ অভিমান চাপা দিয়া সে সটান বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়ে।

ঝম ঝম করিয়া আবার জোরে বৃষ্টি আসে। চিন্ময়ের চোখেও ঝর ঝর করিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে। জ্যোষ্ঠামহাশয়ের একটি কথার সঙ্গতর তাহার কিশোর প্রাণের ভিতর হইতে সে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় নাই যে পৃথিবীতে সব মানুষই কেন এক নয়। রাজা ও প্রজার মধ্যে এত তফাৎটা কিসের? তাহার আরও মনে হইয়াছিল, সে যদি কোন-দিন বড় হয় তবে এই কথাটার মীমাংসা তাহাকে আগে করিতে হইবে।

অনেক ভাকাডাকি সাধাসাধি করিয়াও সেদিন স্বর্ণময়ী চিন্ময়কে কিছু ঝগড়াইতে পারেন নাই। অবশেষে তাহার একরোখা স্বভাবের জন্ত বিরক্ত হইয়া 'ছেলের আমার সব তাতেই একটু বাড়াবাড়ি' বলিতে বলিতে কাৰ্য্যান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

সেদিনের তাহার সেই সঙ্কল্পের মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া আজ চিন্ময়ের হাসি পাইল। সে অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর আজও কেহ পায় নাই, কোনও দিন পাইবে কিনা চিন্ময় তাহা ভাবিয়া পাইল না।

বিকালের জুড়ান বাতাসে আবার কখন তাহার চোখের পাতা মুদিয়া আসিয়াছিল, গাড়োয়ানের গভীর ডাকে যখন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া রসিল, তখন তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গরুগুলি একেবারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

তিন

পড়ন্ত বোজ্র হইতে শুকনো আমের মোরক্কা ভাঙে তুলিতে তুলিতে অলকার মা কর্তার কর্তব্যর শুনিতে পাইলেন।—ওগো অলি কোথায় বলতে পারো, আমার দোস্তাটা আজ ছুদিনের ভেতর করতে পারলে না। আজ দু দিন দোস্তা না খেয়ে দাঁতের গোড়াটা যা কন কন করছে।

অলকার মা মুখ না তুলিয়াই জবাব দিলেন, যাবে আর কোথায়? ঘরেই আছে। পড়ছে বুঝি।

সংসারের কাজ কর্ম ফেলে রাতদিন তোমার মেয়ের পড়া? কি পড়ে? অত বই বা কোথায় পায়?

অলকার মা পূর্ববৎ সহজভাবে জবাব দিলেন, সংসারের কাজ শিখতে ওর কিছু বাকী নেই। অত বড় মেয়ের বিয়ে থা হল না। বসে বসে কি করবে, তাই পড়ে। বইত চিন্ময়ই নেয়।

অলকার বাবার গলার স্বর রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বলিলেন, আচ্ছা তুমি যে সব সময় অলিকে অত চিন্ময়ের কাছে যেতে দাও, তোমার কি একটা বিবেচনা নেই?

—সব সময় আবার কি করে যাবে, চিহ্ন কি বাড়ীতে থাকে?

থাকে না, এলেই তো তোমার মেয়ের সেখানে আনাগোনা আরম্ভ হয়। মেয়ে ত আর খুকিটি নেই। না চিন্ময়ই এখন ছেলেমানুষটি আছে? গ্রহের দোষে আজও আমি অলিকে বিয়ে দিতে পারিনি। এখন কি ওর ওরকম পাড়া বেড়ানো সাজে?

কর্তব্যের একটু জোর দিয়া অলকার মা কহিলেন—পাড়া বেড়াতে সে কখনো যায় না। একটু পড়াশুনা ভালবাসে তাই চিন্ময় বাড়ীতে এলে তার কাছে একটু

পড়ার কথা শুনতে যায়। চিন্ময় ওর ছেলেবেলায় সাথী। নিজের বোনের মতই ওকে ভালবাসে।

অলকার বাবা গলায় বেশ একটু ঝাঁজ দিয়া বলিয়া উঠিলেন, তা বোনের মতই ভালবাসুক বা যাই করুক আমি ওসব মোটেই পছন্দ করিনে তা জেন। পড়া দেব হয়েছে আর পড়ায় কাজ নেই। চাকরী ত আর করবে না। তুমি নাকি কত বিদ্যা শিখেছিলে তাতে আমার কোন লাভটাই হয়েছে? লাভের মধ্যে মেয়েকে যেন দিন দিন ধিঙি করে তুলছ?

অলকার মা কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু কর্তা তাতে বাধা দিয়া বলিলেন, আর একটা কথা তোমাকে বলি, সেদিন দেখছিলাম অলির হাতে আধুনিব সব বই যা আমি চুচক্ষে দেখতে পারিনে।

অলকার মা ব্যথিতভাবে স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, কি জানি? তবে সে সব বই লোবে অত আদর করে পড়ে কেন?

কর্তা উষ্ণভাবে বলিলেন—তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল এ ভুলে হবে না তা জানি। শুধু আমি পছন্দ করিনে তাই বলে দিচ্ছি। আমি বাড়ী থাকিনে বলেই মেয়েকে তুমি অত বাড় দিতে পেরেছ।

এর পর আর বেশী কথা বলা অলকার মার স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনি শুধু বলিলেন, আচ্ছা, আমি অলিকে আত বলে দেবো।

অলকার মা কার্যান্তরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পিছন হইতে কর্তা আবার ডাকিলেন—শোন, শোন, ঠাখ, যা বলতে এলাম তা না বলে বাঙে কথা বক্ছি।—যষ্টিপুরের ওই মিত্তিরদের ওখানেই কাজ করবো। সেই রকম কথা সেদিন দিয়ে এসেছি। এই ২রা বোশেখেই দিন ঠিক করেছি। আশীর্বাদটা ওর বলেছে সেই দিনই সেরে নেওয়া যাবে। ছেলেমেয়ের সামনে, বুঝলে কিনা আগে থেকে আর বেশী হৈ চৈ করতে চায় না। তুমি এদিকে একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নাও। আর কিন্তু বেশী সময় পাবে না।

বিস্মিত হইয়া অলকার মা কর্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—একটি যাত্র

মেয়েকে ওই চার ছেলের বাপ দোজবরের হাতে দেবে? কথা দেবার আগে আমার মতামতও জিজ্ঞেস করলে না? —তা ছাড়া আর পাত্র ত পাওয়া যায় না। আর টাকা পয়সার সংস্থানই বা করি কোথা থেকে? মেয়ে অনেক বড় হয়েছে, আর রাখা যায় না। তা' পাত্রই বা তোমার মন্দ কি হলো? দোজবরের মত তাকে দেখতে নয়। চারটি ছেলেমেয়ে আছে এই যা'। আর এদিকে যে কারবার প্রায় লাখ টাকার। একটি পয়সাও খরচ হবে না। দেনার দায়ে ডুবে যাচ্ছি, এর চেয়ে স্ববিধে আর পাওয়া যাবে না। তুমি আবার এর মধ্যে কোন অমত টমত তুলে শুভ কাজে গোল বাধিও না বোন।—একটু খামিয়া ঢোক গিলিয়া আবার কহিলেন, তুমিও ত দোজবরের হাতে পড়েছিলে গিন্নি, তা তুমি কি অস্বখীটাই হয়েছ বলোত।

গিন্নির মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। তাঁহার হাতে পড়ার ক্ষতিবৃদ্ধির খাতা উলটিয়া পালটিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না। তাঁহার মন বলিতে লাগিল, সে আমি সারা জীবন দিয়েই বুঝছি। মুখে বলিলেন, ঠ্যা, আমার মেয়েরও তার বেশী আর কত হবে?

কর্তা চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে অলকা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। ঘর হইতে বাবার

কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে এতক্ষণ নীরবে সব শুনিতেছিল, শুনিয়া তাহার মুখের চেহারা যাহা হইয়াছিল মার চোখে তাহা স্পষ্টই ধরা পড়িয়া গেল। বুকের ভিতরটা বেদনায় মুষড়িয়া উঠিল। তথাপি অলকার মা মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া কিছু বিরক্তির সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?... দেখ, অলি ও বাড়ীতে আর বেশী যাস্নি। বিয়ে ঠিক হচ্ছে; উনি কত রাগ করলেন।

অলকা নির্ঝাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অলকার মা আবার কহিলেন, চিন্ময়ের কাছ থেকে কোন বইটাই আর আনিস্নি। যেগুলো আছে ফিরিয়ে দিয়ে আসিস্ন।

একমাত্র কন্যাকে মনের মত পাত্রের হাতে দিতে পারিবেন না। সারা বেলা অলকার মার অন্তর একটা নিরেট ব্যথায় ভারী হইয়া রহিল। রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া অনেক স্থখ দুঃখের কথাবার্তার পর সহসা অলকা মাকে জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে বুকের সঙ্গে লাগিয়া রহিল। দুজনেরই চোখে অবিরল ধারায় অশ্রু বহিয়া যাইতে লাগিল। নিবিড় স্পর্শের ভিতর সেদিন মা ও মেয়ের কি কথা যে শেষ হইয়া গেল তা শুধু জানিলেন অন্তর্যামী।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্বেদে শিশু-চিকিৎসা

শ্রীশান্তা দেবী।

নারীজাতির শ্রেষ্ঠ অধিকার ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সন্তান-পালন। সন্তান বখন শিশু থাকে তখনই সে সর্বাপেক্ষা অধিক অসহায়। সে মুখ ফুটিয়া আপনার দুঃখ কি কষ্টের কথা বলিতে পারে না, তাহার কান্নাই একমাত্র ভরসা। এই কান্না কখনও ক্ষুধার জ্ঞাপক, কখনও পীড়ার জ্ঞাপক। যদি

পেট ভরিয়া খাইয়াও শিশু কঁাদে তবে বুঝিতে হইবে তাহার কিছু একটা পীড়া হইয়াছে।

আয়ুর্বেদ বলে শিশুর ক্রন্দনের আধিক্য অল্পসারে তাহার রোগের আধিক্য কি অল্পতা বুঝা যায়। শিশুর যোগ কেন হয় তাহার কারণও আয়ুর্বেদ নির্দেশ

করিয়েছেন। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবতী মাতার সন্তান মাতৃশুভ পান করিয়াই বাঁচে। আয়ুর্বেদে তাই বলেন, মাতার শরীরের অরস্বার উপর তাহার শিশুর শরীরের অবস্থা নির্ভর করে। বাতহুষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে শিশু কুশল হয়, মলমূত্র পরিষ্কার হয় না; কফহুষ্ণ গোদুগ্ধ পান করিলে শিশুর চোখ ফোলে, শিশু দুধ ভোলে, তাহার সন্ধি হয়। মাতার যদি আবার সন্তান-সন্তাবনা হয় তবে তাহার দুগ্ধ পান করিলে শিশুর অরুচি, বমি, কুশতা পেটফাঁপা ইত্যাদি হয়।

এই সকল কারণে মাতার কোলে যতদিন শিশু থাকে ততদিন নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার অতিরিক্ত সাবধান হওয়া উচিত। যে খাদ্য মায়ের শরীর নষ্ট করে, মা লোভে পড়িয়াও যেন তাহা না খান, যে খাদ্যে বা ঔষধ পথ্যে তাঁহার শরীর ভাল হয়, কাপড় গহনার লোভ ছাড়িয়া সাধ্যমত সেই সব খাদ্যাদির পিছনে তাঁর খরচ করা উচিত। একটি শিশু পূর্ণ এক বৎসর না হইলে মার যেন আর সন্তান-সন্তাবনা না হয় এদিকেও দৃষ্টি থাকা উচিত। না হইলে আগত ও অনাগত দুটি শিশুর স্বাস্থ্যই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

দুগ্ধজীবী শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে আয়ুর্বেদে শিশুর মাকে ঔষধ খাওয়ানো বিধি। শিশু মায়ের দুধের সহিত তার ফল লাভ করে। অনেক সময় চিকিৎসক মাকে

উপবাস করান, কিন্তু শিশুকে কখনও উপবাস করান না। শিশুকে শুভ্র কখনও বারণ করিতে পারা যায় না।

আয়ুর্বেদের কয়েকটি সহজ ঔষধের কথা আজ লিখিতেছি। অকালজাত শিশু যদি শুভ্রপান করিতে না পারে তবে আমলকী ও হরিতকী চূর্ণ ঘি ও মধুতে মিশাইয়া শিশুর জিহ্বায় ঘষিলে শিশু শুভ্র পান করিতে পারে। ঘি যে খাঁটি গাওয়া ঘি হওয়া চাই এবং মধুও উৎকৃষ্ট চাই তাহা ত না বলিলেও মা বুঝিবেন। একমাস পর্যন্ত শিশুর ঔষধের ওজন বা মাত্রা এক রতি মাত্র।

মায়ের দুধ না থাকিলে শিশুকে ছাগলের দুধ দিতে আয়ুর্বেদ বলেন। অথবা গরুর দুধ জাল দিয়া খাওয়াইতে পারা যায়।

দাঁত উঠিবার সময় শিশুদের নানা রকম রোগ হয়। সে সময় তাহাদের আহাৰাদি বিষয়ে কোন রকম যত্ন দিতে কবিরাজগণ বারণ করেন। তাহাদের মতে দাঁত উঠিলেই এসব রোগ সারিয়া যায়।

বেলশুঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপ্ললীর ক্বথ মধুর সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে শিশুদের অতিসার উপশমিত হয়। ঔষধের পরিমাণ বা মাত্রা ১ মাসে ১ রতি ২ মাসে ২ রতি এইরূপে বাড়িবে। তরুণী মাতারা নিজে শিশুর চিকিৎসা না করিয়া অভিজ্ঞ লোকের মত লইয়া করিলেই ভাল। না হইলে হিসাবে ভুল করিয়া ভালর চেয়ে মন্দ করিতে পারেন।

জাতির অভিশাপ

ত্রিবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

যে বেদ অর্থ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ এবং আদি নিদর্শন তাতে আমরা কোথাও খুঁজে পাই না—মাহুষ মানুষের কাছে অস্পৃশ্য হতে পারে তার কোন নির্দেশ বা প্রমাণ। বর্ণ-ভেদ-প্রথাই তখন ছিল না। ছিল দু'টো মাত্র শ্রেণী—

সভ্য অর্থাৎ আর্থ আর বর্বর অর্থাৎ অনার্থ। বেদের কোন কোন অংশে তাদের স্বেত ও কৃষ্ণ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। তাই বলে এমন কোন প্রমাণ তার থেকে পাওয়া যায় না, বিংশশতকের অতি সভ্য স্বেতজাতিরা যেমন বর্ণ

বিদ্বেষের পরিচয় দিচ্ছে, তেমন বা সামান্যতরও বর্ণ-বিদ্বেষ ছিল তাদের মধ্যে। কৃষ্ণজাতির বর্বরতা যখন এসে শ্বেতদের সভ্যতায় আঘাত হানলো তখন দু'দলে সংঘর্ষ লাগলো ঠিক—কিন্তু আর্থরা তাদের বশে নিয়ে এল। আধুনিক জ্ঞানভাষ্যে দাস জাতিদের যেকোনো পশুর অধম করে বেধে ব্যবসা চালাতো প্রাচীন আর্থসভ্যতায় তা ছিল না, আর্থরা তাদের শিক্ষা দিয়ে স্ব-সমাজভুক্ত করে নিতো।

পরবর্তী যুগের তথ্য খুঁজে দেখলেও জাতিভেদের কোন নজির চোখে পড়ে না। মূল বেদ থেকে যখন শাখা বেদের সৃষ্টি হয় তখন দেখা যায় মাত্র চারটি বর্ণের উল্লেখ—জাতির নয়। জাতি ঠিক একই আর্থ।

প্রথমচিন্তাশীল এবং দীপ্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিক বগে বলীয়ান লোকদের বেছে ব্রাহ্মণ্যপদে রাখা হলো। বাহুবলে বলীয়ান ষাঁড় রাষ্ট্ররক্ষার কাজে তাঁরা নিয়োজিত হলেন, ব্যবসা আর কৃষিবিদ্যায় পারদর্শীদের রাখা হলো সে সব কাজে। যারা এসবের কোন কাজেরই যোগ্য নয় তারা ঐ তিন শ্রেণীর চাকরি করেই জীবিকা চালাতো। এমন স্বন্দর নিয়মতান্ত্রিক প্রথার মধ্যে ভেদবুদ্ধি বা অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন যে-কী করে জাগতে পারে ভেবে পাওয়া বড় শক্ত।

“শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারে। আবার ব্রাহ্মণও শূদ্র হতে নেমে যেতে পারে। কারণ গুণ এবং কর্মই পদমর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি, জন্ম নয়”—মহু ১০।৬৭। মহুর একথা থেকেই প্রমাণিত হয় না কি আজকালকার মতো জন্মগত অধিকার নিয়ে নিষ্ঠুর হলেও অধিকার দাবী করা চলতো না সেকালে? মহুর আরও একটি কথা এ প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর সংহিতার ২।২৪০ শ্লোকে বলেছেন—“স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম, শৌচ, হিতকথা ও শিল্পকলা প্রভৃতি সকলের কাছ থেকে গ্রহণ করবে।” শুধু এখানেই শেষ নয়, আর্থ সভ্যতায় কোন কালে যে জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার বানাই ছিল না তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখি দেবর্ষি নারদ একজন দাসীপুত্র। ভাগবতের প্রারম্ভে তিনি নিজের মুখে এ কথা ব্যক্ত করেছেন। অথচ তাঁর জন্ম নিয়ে কোন প্রশ্নতো ওঠেনি—তিনি ছিলেন ত্রিজগৎপূজ্য। ব্রহ্মবিদ ঋষিদের অন্যতম সত্যকাম কে? তাঁরও পিতার পরিচয় নেই, মাতা দাসী (ছাঃ ৪।৪।১)। মহামুনি বেদবাসের মাতা

ছিলেন ধীবর-কন্তা। মহামতি বিদুর—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে যিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের সমানার্য, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিও যার পাদস্পর্শ করে সম্মান জানাতেন, শ্রীকৃষ্ণ যাকে সখ্যরূপে বুকে তুলে নিতেন—তাঁর পরিচয়ও দাসীপুত্র ছাড়া আর কিছু নয়। যযাতির বহু সন্তানের মধ্যে শূদ্র-কন্তা শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্রই একমাত্র যোগ্য ছিলেন পৈত্রিক রাজ্য-লাভের। তাপস সিন্ধু—যুগভ্রমে দশরথ যাকে বাণবিন্দু করেন তিনি কি ব্রাহ্মণ ছিলেন জন্মগত? তাঁর পিতা মুনি হলেও জন্মে বৈশ্য, মা শূদ্রা। মহাভারতের আদি পর্বের ৮ম অধ্যায়ে দেখা যায়—ঋষি স্থলকেশ জ্ঞানে যাওয়ার সময় পথে এক কন্তাসন্তান কুড়িয়ে পান, তাকে তিনি ব্রাহ্মণ্য-আদর্শে মানুষ করলেন আর রুরু নামক এক মুনিপুত্র তাকে করলেন বিয়ে। এজন্ত সমাজ তাঁর দণ্ডমুণ্ডের কোনো বিধান করেছিল বলেতো জানা যায় না। মহারাজ ক্রপদ পাঞ্চালীর বিয়ের পর জামাতাদের নেমন্তন্ন করেন। স্ববেশধারী দাস-দাসীরাই অন্ন পরিবেশন করলে তাঁদের এবং অন্যান্য সকলকে (মহাভারত, আঃ, ১২৪ অঃ)। শান্তনু পঞ্চিমধ্যে অসহায় রূপ ও রূপী নামক দু'টো শিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে যখন নিয়ে আসেন তখন একমাত্র মানুষের বাচ্চা ছাড়া এদের গায়ে অন্য কোন কৌলীন্তের ছাপ থাকা সম্ভব ছিল না। (মঃ, আঃ, ১৩০ অঃ)। কৌলীন্তের মাপকাঠিই যদি সব হতো তাহলে যাজ্ঞবল্ক্যের মতো একজন ব্রহ্মবিদ ঋষি ক্ষত্রিয় জনকের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে যেতেন না। শতপথ ব্রাহ্মণে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেখা যায় রাজর্ষি প্রবহণের কাছে শ্বেতকেতু আর তাঁর পিতা মুনি উদালক ব্রহ্মবিদ্যা শিখেছিলেন। মহাভারতের বনপর্বের ২০৮ অধ্যায়ে দেখা যায় কৌশিক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এক ব্যাধের কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

পরবর্তী জেলের মেয়ে হয়েও কুলীনশ্রেষ্ঠ শান্তনুর মহিষীদের মর্যাদা পেয়েছিলেন। বশিষ্ঠ এক শূদ্রাকে তার ধৃতরাষ্ট্র এক বৈশ্যকে পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ধরে অনার্য বুনোদের মধ্যেই বাস করেছিলেন। রাক্ষস, বানর, চণ্ডাল সকলকে তিনি সখ্যস্বত্বে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজস্বয়ং যজে

সব জাতি-সম্বন্ধে যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন তা' আমাদের ভুললে চলবে না। এর পরও যারা বলবার সাহস পান জাতিভেদ ভারতীয় সভ্যতার মূলগত বিষয়—তারা অজ্ঞ, তারা ভারতীয় সভ্যতার কেনে খবরই রাখেন না। রাজা হরিশ্চন্দ্রের দীর্ঘদিন চণ্ডালের গৃহে বাস করার অপরাধে ঘোর নরকে যাওয়াইতো ছিল উচিত। কিন্তু তা' না হয়ে ফল হলো উল্টো—তিনি গেলেন স্বর্গে।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বিভিন্ন বর্ণে বিয়ে করেছিলেন। মহারাজ পাণ্ডু আশ্রমে যুত অবস্থায় ছিলেন ১৭ দিন। শেষে ঋষিরা তাঁর শব বয়ে নিয়ে আসেন রাজধানীতে (মঃ আঃ ১২৬ অঃ)। অথচ এখনকার শাস্ত্রে ব্রাহ্মণেরও শবাহুগমনে বা স্পর্শে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ তো দূরের কথা, বর্ণবিদ্বেষ যে ছিল না তা' মনুষ্য বিয়ের প্রচলিত ব্যবস্থা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি বলেছেন—“শূদ্রশূদ্রকে, বৈশ্য বৈশ্য ও শূদ্রকে, আর ব্রাহ্মণ সকল বর্ণ থেকেই বিয়ে করতে পারেন।” (মহু ৩।১৩)।

জাতি বা বর্ণবিদ্বেষ জাতির পক্ষে একটা সর্বনাশা পাপ। এ কথা তখনকার সমাজপতিরা খুব ভালো করেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাঁরা জানতেন লোকসংখ্যা যতই বেশি হবে, যতই তারা একতাবদ্ধ হয়ে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে থাকবে ততই জাতির কল্যাণ। নইলে আট প্রকার বিয়ের প্রচলন করার কোন্ প্রয়োজন ছিল? আজকাল আমরা উচু গলায় বলে বেড়াই—আমরা সভ্য প্রগতিশীল। অথচ অগণিত অপহৃত যুবতীদের বিয়ে করবার জন্তে তথাকথিত স্তন্যভা যুবকেরা এগোতে সাহস পায় না। নিগৃহীতা মেয়ে, বোঁ, মাকে সমাজে গ্রহণ করবার নৈতিক বল তাদের নাই।

এমন কি বৈশ্য কায়স্থকে, কায়স্থ ব্রাহ্মণকে বিয়ে করতে গেলে প্রগতিশীল মা বাপ দণ্ড উচিয়ে ধরেন। অনেক ছেলে মেয়েকে এই জন্তে পিতামাতার স্নেহ থেকে চির বঞ্চিত হতে দেখা যায়।

কম্মুনির মতো মেয়ের এত বড় অপরাধকে আজকের সমাজের কোন্ উদারহৃদয় ব্যক্তি ক্ষমা ও স্নেহের চক্ষে দেখতে পারেন?

যদিও স্থনিয়ন্ত্রিত আইন কাহ্নন রাষ্ট্র ও সমাজের জন্তে ছিল তা' হলেও ব্যতিক্রম যে হতে পারে না বা হবে না এ কথা কেউ বলতে পারে না। তাই দেখা গেলো কালে কালে আট প্রকার বিয়ের বিধান সত্ত্বেও সাংকর্য-ধর্মের প্রচার বহুল পরিমাণে দেখা দিতে লাগলো।

আইন মানুষ্যের জন্তে, মানুষ্য আইনের জন্তে নয়। এ কথা ভেবেই তখনকার দিনের সমাজপতিরা কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিধিবিধানের পরিবর্তন সাধন করে চলেছিলেন। এ সাংকর্য-প্রথাকে তাঁরা পায়ে ঠেলে আস্তাকুড়ে ফেলে দিলেন না, সুদূরে তুলে নিয়ে এসে স্থান দিলেন সমাজের মধ্যখানে। প্রতিভা এবং যোগ্যতা বিচার করে বিভিন্ন শিল্পে তাদের নিযুক্ত করে জীবিকা নির্দেশ করে দিলেন।

তারা অস্পৃশ্য ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। যা কিছু হয়েছে যুগান্তকারের সময়েই।

তা' যদি না হতো উপনিষদের যুগে সাম্যবাদী ঋষিরা উদাত্ত স্বরে ডেকে বলতেন না সকলকে—“এসো আমরা একসঙ্গে আহ্বার করি, চল একসাথে শত্রুর বিরুদ্ধে বীর্য প্রকাশ করি, এসো পরস্পর স্ব স্ব তেজোবলে পরস্পরকে বিপন্ন্যুক্ত করি।” আর বেদের যুগেও উদারমতবাদ-প্রচারকারী ঋষিরা সাম্য, মৈত্রী আর অহিংসার বাণী প্রচার করে যেতেন না—“ইহাদের (আমার দেশবাসিগণের) মন্ত্র এক হোক, সমিতি এক হোক, মন ও চিত্ত এক হোক—আমি তোমাদের ঐক্য-মন্ত্রে দীক্ষিত করছি এবং হবিঃ দ্বারা হোম করছি। * * তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যলাভ কর।” (ঋক্ ১০।১২১)।

এভাবে যারা সকল শ্রেণীকে, সমগ্র মানবজাতিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক করবার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁরা কিনা শিথিলে গেলেন বিধান দিয়ে গেলেন—মানুষকে ঘৃণা করবার।

যারা প্রাণ দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে করে এলো সমাজের ও রাষ্ট্রের সেবা—সমৃদ্ধি বাড়িয়ে স্বত্ব-স্বাচ্ছন্দ্যের সৌধ নির্মাণ করে দিল যারা মানুষ্যের—তারা কিনা আজ অস্পৃশ্য? এত বড় পাপ যে সমাজে, যে রাষ্ট্রে স্থান পায় সে রাষ্ট্র বা

সমাজের ধ্বংস যে অবশ্যস্বার্থী সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না।

তপশীলী বলে আজও যাদের বৃহত্তর সমাজের অঙ্গ থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে—তাদের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বজ্রমুষ্টিতে পথ-রোধ করে দাঁড়ানো উচিত। তারাও বিশাল বিচ্ছিন্ন আর্থজাতির একটা প্রধান অংশ।

আজকের এ বিষম সংকটের দিনে জাতির মেরুদণ্ড সকল শ্রেণীর যুবকদের এক ভ্রাতৃত্বের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এ পাগকে ধ্বংস করে ফেলার জন্তে, আজ তাদের সংকল্প নিতে হবে—মাহুষের প্রতি যারা অমাহুষের মতো নিপীড়ন এবং ঘৃণা চালায় তাদের ঠেলে দিতে হবে মৃত্যুর মুখে। (উদ্বোধন হইতে সংকলিত)

“অচিন্ত্য”

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

চিন্তা আমার চলে তোমার দিকে
ভরসা আমি করি তোমার তাই
তোমার জালা পথের আলোটিকে
নিভিয়ে ফেলি সাধ্য এমন নাই।

আকাশ হ'তে আসছে আলো নামি
মাটির বুকে বাঁধছে আসি বাসা
চিন্তা আমার রয়না সেথা থামি
মাটির উর্দ্ধে উঠবে রাখে আশা।

চক্ষু মেলি চায় সে উর্দ্ধ পানে
সারাজগৎ সামনে আনি ধরে
লুকিয়ে এসে কয় সে আমার কাণে
“জগৎখানা জন্মেছে তোর তরে।”

বিশ্বয়ে মোর দৃষ্টি হল নত
আমার জগত! আমারই এই সব।
হায়রে চিন্তা উধাও স্বপ্ন মত
অচিন্ত্য প্রাণ অনন্ত নীরব।

জগত ছুনিছে জন্ম শ্রোতে
অচিন্ত্য প্রাণের চিন্তা হোতে।

ব্রতচারী আন্দোলন।

স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ —

শ্রীআরতি দত্ত

আদর্শ এবং পদ্ধতি—দক্ষিণ হস্ত এবং পদের সমবেত সহজ চলনার সহিত এই সংকল্পগুলি ছন্দোবদ্ধভাবে আবৃত্তি করা হয়। প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন যে, এইভাবে করে একটি মানুষ সমবেতভাবে একই পদ্ধতি অনুসারে সঙ্কল্প গ্রহণ করায়, একই সঙ্গীত সমবেতভাবে গাওয়ায় ও একই সহজ সমবেত নৃত্যে যোগদান করায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে ছন্দপূর্ণ অন্তঃইন্দ্রিতের দ্বারা মানুষের চিন্তা, বাক্য ও ব্যবহারের জগতে একটা আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-শুদ্ধিতার ভাব জাগিয়া উঠে। তাঁহার মতে অবিরত ও একাগ্রচিত্তে এই আদর্শপূর্ণ পদ্ধতির আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারের মধ্যে সংঘের সঙ্কল্প গ্রহণের ফলে, এই সঙ্কল্প ও সঙ্গীতের আদর্শবাদ মানুষের অন্তর্লোকে সত্যের রূপে রূপান্তরিত হয়। Ribot শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“To transmute the conscious into the unconscious and thus to establish harmony between the two states” (অর্থাৎ চেতনকে অবচেতনের মধ্যে সঞ্চারিত করা এবং এইভাবে এই দুই অবস্থার সমন্বয় করা।) ব্রতচারীর সঙ্কল্প গ্রহণের দ্বারাও Ribot এর অল্পভূত শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয়। প্রাচীন গ্রীসীয় অরফিক্ মতবাদ জীবন ও সর্ব-জীবের মধ্যে আনন্দ অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া মনে করিত। এই আনন্দ প্রকাশের একটি ধারা ছিল গ্রীসের পর্বতের সান্নিধ্যের অরণ্যের মধ্যে ঐশ্য নৃত্যে যোগদান করা। Euripides যখন বলিয়াছেন—

“Whoever shall know, That to live is happy
As the long days go, Hath found his heaven”

(অর্থাৎ যে জানিবে যে বাঁচিয়া থাকাই সুখ দীর্ঘ দিনগুলির শেষে সেই তাহার স্বর্গ খুঁজিয়া পাইবে।) তখন তিনি অরফিক্ মতবাদের জীবনের স্বরূপকেই রূপ দিয়াছেন।

এই ভাবানুসারেই সমবেত নৃত্য গীত শিক্ষা যে প্রত্যেক মানবের শিক্ষার ও সাধনার অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ, এই বিশ্বাস প্রাচীন গ্রীসীয় শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তি ছিল। এই ছন্দাত্মক সাধনাই ছিল গ্রীসের অভাবনীয় সর্বতোমুখী উন্নতির গুঢ় পন্থা। দৈহিক চর্চা সঙ্গীত কলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিলে, তাহার দ্বারা মানুষের স্বভাবে স্থলতার সৃষ্টি হয়। ইহা উপলব্ধি করিয়াই, ব্রতচারী আন্দোলন, প্রাচীন গ্রীসে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার জায় সহজ ও প্রাণবন্ত নৃত্য গীত ও উচ্চ নৈতিক মর্ম্ম ও আদর্শকে শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীক পদ্ধতির মত, এই আন্দোলনও দীর্ঘকাল প্রবহমান নৃত্য ও গীতের বিশেষ মূল্য দেয়, কারণ তাহা মানুষের মনে জাতীয় ও প্রাদেশিক ঐক্য ও অভিন্নতার সুস্থ মনোভাব জাগাইয়া তোলে। অথচ সঙ্গীত, প্রাদেশিক দেশপ্রেমের সৃষ্টি যাহাতে না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। বাংলার ব্রতচারীকে প্রথম যে প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হয়, তাহা যে কেবল বাংলাকে ভালবাসিব তাহা নয়, ভারতকে ভালবাসিব এবং সমগ্র বিশ্বভূবনকেও ভালবাসিব। কেবল যে বাংলার সেবা করিব তাহা নয় ভারতের সেবা করিব, বিশ্বভূবনের সেবা করিব। কেবল বাংলার ব্রতচারী বা পূর্ণ নাগরিক হওয়া নয়, ভারতের ব্রতচারী এবং বিশ্বভূবনের ব্রতচারী হওয়ার সঙ্কল্প। এইভাবে এ আন্দোলনের একটি আদর্শ যদিও মানুষের অন্তরে ভূমিপ্রেম জাগাইয়া

তোলার প্রচেষ্টা তবুও ইহা এমন সত্যকভাবে গঠিত হইয়াছে বাহাতে ইহা দ্বারা বর্তমান দিনের স্বকীয় দেশপ্রেমের ভ্রান্ত ধারণা মালুষের মনে সৃষ্টি হয় না। ইহা সকল প্রকার বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত। দেশের যে কোন রাজনৈতিক দলের, ধর্মের বা জগতের নারী ও পুরুষ এই আন্দোলনে যোগদান এবং ইহার গঠন কার্যের সহায়তায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ব্রিটিশ ভারত এবং ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের সব সম্প্রদায় ও দলের নেতারা এই আন্দোলনের প্রশংসা ও সাফল্যকামনা করিয়াছেন। বাংলাদেশে এ আন্দোলনে কেবল যে বহু সংখ্যক বাঙালী যোগদান করিয়াছেন তাহা নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা এবং ভারতের বাহিরের বিদেশীরা অনেকে ইহাতে অংশ নিয়াছেন। ইহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও জাতির কৃষ্টি বা সংস্কৃতির প্রতি কোন স্বকীয়তা বা বর্জননৈতিক অথবা বিরাগ ভাব পোষণ করে না। অপর পক্ষে এই আন্দোলন এই নীতির উপর স্থাপিত যে প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতি, সেই দেশের উপযোগী বিশ্ব-আত্মার একটি বিশিষ্ট ছন্দাত্মক প্রকাশ এবং সেই জন্যই প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য নিজের ও অন্যান্য দেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও পালনে সাহায্য করা, এবং তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা।

এই আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই, ইহা সকল শ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। বিগত সাত বৎসরের মধ্যে শিক্ষা বিভাগ, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও সমগ্র প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় ও খৃষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় ও অর্থ সাহায্যে পুরুষদের জন্ম প্রায় তিরিশটি শিক্ষাশিবির পরিচালিত হইয়াছে এবং তাহাতে প্রায় এক হাজারের উপর নায়কদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার Y. W. C. A.র দেহচর্চা বিভাগের অধিনেত্রীর সহযোগিতায় মেয়েদের জন্ম ছয়টি শিক্ষাশিবির পরিচালিত হইয়াছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত দলনেত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের সংখ্যা প্রায় তিনশত হইয়াছিল। জাতীয়তাবাদী কলিকাতা করপোরেশনও এই আন্দোলনকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেছে।

বাংলার ২৭টি জেলায়, “জেলা ব্রতচারী সমিতি” সংগঠিত

হইয়াছে। ইহার কোনটির সম্পাদক হিন্দু ও কোনটিতে মুসলমান ও খৃষ্টান সম্পাদক নিযুক্ত আছেন। ইতিমধ্যেই এই প্রদেশের ব্রতচারীর সংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক।

ইহার সভ্যদের দৈহিক উৎকর্ষসাধন, চরিত্র ও মেহের আদর্শ গঠনের জন্ত সহজ, অকৃত্রিম, আনন্দময় এবং ব্যয়শূন্য দৈহিক ও মানসিক শৃঙ্খলা শিক্ষাদান এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের যোগদানের উপযোগী এক সম্মিলিত আনন্দ-দায়ক কর্মসূচির নির্ধারণ—এ সবই যে এই আন্দোলনের অবদান তাহা সর্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। আর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কথায়—এই আন্দোলন সাধারণ ভারতীয়, পল্লী সত্ত্বাবাসী উভয়েরই মন, দেহ ও আত্মার পরিবর্তন সাধন করিতে এবং তাহাদের মধ্যে নির্ভীকতা, সাহস, শৃঙ্খলা, সত্য-বোধ, শক্তিবোধ এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণের স্বকীয় গভীর অতিক্রম করিয়া দেশের জন্ত আত্মদানের অল্পভূতি জাগাইতে চেষ্টা করে।

এই আন্দোলন দৈহিক শ্রম ও সমাজের সেবাকার্যের উপর বিশেষ জোর দেয় এবং পোরম্ব হইতেই এইগুলি এ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া ব্রতচারীরা কর্মশীল হইয়া সজীবগান করিতেছে, কচুরীপানা ধ্বংস করিতেছে, অদ্বৈতের ডোবা পরিষ্কার করিতেছে, জঙ্গল কাটিতেছে, রাস্তাঘাট সারাইতেছে, নতুন রাস্তা তৈরারী করিতেছে, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতেছে, পীড়িত ও দুঃস্থের সেবা করিতেছে। হাওড়া জেলায় ব্রতচারীরা অগ্রণী হইয়া সরস্বতী নদীর আগাছা পরিষ্কার করিয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই আন্দোলনের সমাবর্তন দিবস উপলক্ষে ব্রতচারীরা কলিকাতা শহরে জন আশ্ব্যের উল্লসিত জন্ম অপরিষ্কার বস্ত্রী নিজেদের হাতে পরিষ্কার করিয়া এবং শহরের অল্পমত অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া এক কার্যকরী অভিযান চালাইয়াছিল।

জীবনযাত্রার ধারাকে নানা অংশে বিভক্ত না থাকিতে দিয়া আনন্দের মধ্য দিয়া সম্মিলিত সংগঠনের জন্ম ছন্দপূর্ণ ঐক্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া এ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহা কর্ম ও ধর্ম, কর্তব্য ও ক্রীড়া সবার মধ্যে ছন্দায়িত ঐক্য আনিয়া সকলের মধ্যে আনন্দের ধারা সঞ্চারিত করিয়া

জীবনের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিকগুলিকে একটি অখণ্ডরূপ দিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়।

ব্রতচারী নৃত্য ও গীতে যে ছন্দপূর্ণ ঐক্যের শৃঙ্খলা আছে তাহা ব্যক্তি, দল এবং জাতিকে সমন্বিত ঐক্যবন্ধনে বাঁধে; ইহা আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার মধ্যে পাওয়া যায় না। কারণ সেগুলি মনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ভাব জাগাইয়া তোলে।

কোন জাতির যৌবনের পরিচয় পাওয়া যায় তখন, যখন দেখা যায় যে তাহার ষাট বৎসরের বৃদ্ধ পিতামহের দলও সানন্দে খেলাধুলায় মতিয়াছে। ব্রতচারী আন্দোলন মাল্লখের দেহ, মনে নবযৌবন জাগাইয়া অকাল বার্ককের ভাবটা দূর করিতে চাহিতেছে। যাহারা এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের সকল শ্রেণীর মধ্যে আত্মসম্মানবোধ, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ঐক্য, সমন্বয় ও আনন্দের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। আধ্যাত্মিক ও ঐহিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবন ও আচরণের একটি সুসম্পন্ন আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া যুবক ও বৃদ্ধ সকলের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিতে ইহা অত্যন্ত কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ভারতের এবং বিদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ও শিক্ষা-ব্রতীগণ এই আন্দোলনের শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "Wherever the movement is adopted, it will conduce to the development of joy of spirit, capacity for work, strength of character and enthusiasm for social service." অর্থাৎ "যেখানেই এই পরিচেষ্টা গৃহীত হইবে, সেখানেই ইহা চিন্তের আনন্দ, কর্মক্ষমতা, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং সমাজসেবার উত্তম বুদ্ধি করার সাহায্য করিবে।" ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন যে ব্রতচারী আন্দোলনের আদর্শ হইল স্নানুর দেহ গঠন করা ও দেশের সেবা করা। তিনি এবং ভূতপূর্ব বিহার কংগ্রেসের মন্ত্রীমণ্ডলীর অক্লান্ত কর্মী, শিক্ষাসচিব ডাঃ মৈয়দ মাহমুদ উভয়েই জাতীয় শিক্ষার প্রসারের জন্ত বিহার প্রদেশে এই আন্দোলনের প্রবর্তনের জন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছেন।

১৯৩৭ সালে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের প্রয়োদশ

অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে ব্রতচারী আন্দোলন প্রজাতীয়তার পটভূমিকায় দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সংযোগ সাধন করিয়াছে এবং সকল প্রকার শিক্ষায়তনের পক্ষে ইহা উপযোগী বলিয়া দেখা গিয়াছে। সুতরাং যতদূর বিস্তৃত ভাবে সম্ভব এই আন্দোলন প্রবর্তন জন্ত ব্যবস্থা করা দরকার। সমগ্র ভারতে এই আন্দোলন প্রসারের জন্ত উক্ত সম্মেলন এই মর্মে নিবেদন জানান।

এই আন্দোলন এমন ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে ভারতের যে কোন প্রদেশে ইহা গৃহীত হইতে পারে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে ইহার পণগুলির সামান্য পরিবর্তন করিয়া অন্যান্য দেশেও এই আন্দোলন পরিচালিত হইতে পারে। প্রত্যেক স্থানে সেখানকার স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়া পণগুলি প্রচার করাই ইহার লক্ষ্য। বিহার প্রদেশে ইতিপূর্বেই ব্রতচারী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং অন্যান্য বহু প্রদেশ, এমন কি সূদূর পূর্ব প্রদেশ হইতে শিক্ষা বজ্রের শিক্ষকগণ ইহার কর্মপ্রণালী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বরোদা, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি ভারতের শীর্ষস্থানীয় দেশীয় রাজ্যের ব্যবস্থায় ব্রতচারী প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও একমল ব্রতচারী সেখানে শিক্ষামূলক ভ্রমণে যান এবং তাঁহাদের দেশে এই আন্দোলনের প্রসা-দেশীয় রাজন্যবর্গ বিশেষ উৎসাহ দেখান।

পৃথিবীর অন্যান্য যুব আন্দোলনের সঙ্গে এই আন্দোলন পার্থক্য আছে। যে গতানুগতিক আন্তর্জাতিক মতবাদকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও রীতিনীতির পার্থক্যকে উপেক্ষা করিতে দেখা যায় এই আন্দোলন একদিকে তাহা বর্জন করিয়াছে, এবং অন্যদিকে বর্জ করিয়াছে সেই অপ্রতিহত সমরবাদ ও উন্নত, সর্ব জাতীয়তাবাদ যাহার প্রভাবে মানুষ পৃথিবীর অন্য জাতির আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অবদানে মধ্যে কোন কিছু ভাল দেখিবার দৃষ্টি হারাইয়া ফেলে। ই আদর্শের এই দুইটি আভিষেকের দিক বর্জন করিয়া, ছে মধ্যে বাহ্য শ্রেষ্ঠ উপাদান তাহা গ্রহণ করিয়াছে। জীব

ছন্দ ও আনন্দের মিলনই হইল ব্রতচারী আদর্শের ভিত্তি এবং ব্রতচারী জীবনের আধ্যাত্মিক ও স্থানীয় বিভিন্ন ঐতিহ্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে।

১৯৩৫ সালে দত্ত মহাশয় যখন ইউরোপ ভ্রমণে যান তখন তিনি ইংলণ্ড ও ডেনমার্ক কতকগুলি বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন, ফলে এই সব দেশে ব্রতচারী সম্বন্ধে প্রভূত উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশিত হয়। ইংরাজদের লইয়া লওনে একটি ব্রতচারী সমিতি স্থাপিত হয় এবং স্যার মাইকেল সাডসার প্রমুখ বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ব্রতচারীরূপে সমিতিতে যোগদান করেন। বিখ্যাত ইংরাজ কবি ও শিল্প সমালোচক লরেন্স বিনিয়ন জনসভায় একটি বক্তৃতাকালে বলেন যে—“ব্রতচারী আন্দোলন মানুষকে জীবনের অখণ্ডতাবোধ ও প্রকৃতির সহিত তাহার হারানো সম্পর্ককে ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করিবে।”

বর্তমান দিনে শুধু পৃথিবীর যুগসমাজ নহে, সমগ্র মানব জাতি জাতীয়তা ও বিশ্বজাতীয়তা এই দুইটি পরস্পর বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিরোধ ও অনৈক্যের কারণ জীবনের বাহিরের উপাদান

ও রীতিনীতির উপর মানুষের অকনির্ভরতা। জীবনের মূলদেশে যে সব উপাদান আছে তাহাদের কার্যকরী করিতে হইলে মানুষের অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দরকার। সর্ব জাতির মধ্যে মানবতা ও মৈত্রীর ঐক্যবন্ধন স্থাপিত করিতে হইলে খেলায় প্রতিযোগিতা বা দক্ষতা অর্জন বা একধরনের পোষাক পরা ও ব্যবহার অথবা আন্তর্জাতিক মৈত্রীর কথা বলার চেয়ে আরও কোন গভীরতর গোপন পথের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহার অনুসন্ধান করিতে হইবে জীবনের ভিত্তিস্বরূপ অন্তর্নিহিত মিলনের উপাদানের মধ্যে, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ছন্দপূর্ণ সমন্বয়ের মধ্যে এবং ছন্দময় বিশ্বসঙ্গীতের সহিত জীবনস্রবের মিলনের মধ্যে। যে ছন্দপূর্ণ ঐক্যের মিলন উপাদান এবং আনন্দের প্রকাশ অন্তরের এই স্রবকে মিলাইতে পারে তাহাই ব্যক্তিগত এবং সমষ্টির শিক্ষা পদ্ধতির জন্য ব্রতচারী কর্মপ্রণালীতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্রতচারী পরিচেষ্টা পৃথিবীর সর্বদেশে অবস্থানবাহী পরিবর্তন করিয়া এবং প্রতি দেশের তথাকার স্থানীয় ঐতিহ্যের বিশিষ্ট ভাষার ভিতর দিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। *

* প্রবন্ধটি আমেরিকার ‘Asia’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে পুস্তক আকারে বাহির হইয়াছে।

ভ্রম সংশোধন

গত আষাঢ় সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্যের নাম ভ্রমক্রমে বসুধানাথ ভট্টাচার্য ছাপা হইয়াছে। ইহার জন্য আমরা দুঃখিত।

নবীনাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

[১৬ বৎসরের নিম্ন বয়স্কদের-উৎসাহ দানের জন্য এই আসর পরিচালিত]

বৈদ্যনাথ দর্শনে

শ্রীমানসী দেবী

প্রতিবারই আমরা পূজোর সময়ে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাই। এবারেও অনেক তর্কাতর্কি এবং গলা ফাটা ফাটির পর দেওঘর অর্থাৎ বৈদ্যনাথ ধামে যাওয়াই স্থির হল। শুভদিনে শুভক্ষণে বাবা বৈদ্যনাথের নাম স্মরণ করে না বাবা এবং ভাই বোন সহকারে রওনা হলাম।

রাত নয়টায় ট্রেন। পূজোর ভীড়। যাত্রীদের সঙ্গে অনেক ধ্বস্তাধস্তি এবং বচসার পর গলদঘর্ম অবস্থায় একটুখানি বসবার মত যাবগা করে নেওয়া গেল। যথা সময়ে ট্রেন ছাড়লো। যাত্রীরা সকলেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যে যার জায়গায় ঠিক হয়ে বসলো। প্রতি স্টেশনে গাড়ী থামবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ছোট খাট যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সারা রাত বিনিময় অবস্থায় কাটিয়ে পরের দিন সকালে প্রায় আধমরা অবস্থায় যশিডি পৌছানো গেল। সেখানে গাড়ী বদল করে বৈদ্যনাথের গাড়ীতে চাপলাম। গাড়ীতে বৈদ্যনাথ দর্শনপ্রার্থী এবং চেঞ্জারের ভীড়ই বেশী। আশ্বিন-মাস থেকে ফাল্গুন মাস অবধি চেঞ্জের জন্যে লোকে ওখানে যায়।

এবারে দেওঘরে চলেছি। জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বাঙ্গলা দেশের সজীবতাকে পেছনে ফেলে এসেছি। এটা সাঁওতাল পরগণা। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু শস্যাবিহীন ফাঁকা মাঠ। চারিদিকে একটা রুক্ষতার ভাব। মাঝে মাঝে শ্রীহীন পলাশ গাছগুলো অঙ্গে রাঙ্গাফুল নিয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেওঘরে পৌঁছে গেলাম। ট্রেন ষাটফরমে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই—‘জয় বাবা বৈদ্যনাথ’ ‘বল

বোম’ ইত্যাদি ধ্বনিতে স্টেশনটা মুখরিত হয়ে উঠলো। দেওঘর স্টেশনটা ছোট হলেও স্ফূর্ত্য এবং পরিষ্কার।

বাইরে পাণ্ডাদের আক্রমণ থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে রাস্তায় এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কাছেই একটা বাসা ভাড়া নেওয়া হয়েছিলো। বাসাটির নাম ‘যোগমায়া স্থতি’। এখানে প্রত্যেক বাসারই এরকম এক একটা নাম আছে। চিঠিপত্র ইত্যাদিতে বাসার নাম লিখতে হয়।

আহারাদি এবং বিশ্রাম শেষ করে বিকেলে নন্দন পাহাড় বেড়াতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। বাইরে থেকে এই নন্দন পাহাড়ের খুব নাম শোনা যায়। কয়েকখানা একা ভাড়া করে আনা হল। দেওঘরের এই কুখ্যাত একায়ে চড়া একটা মন্ত শাস্তি। সেই স্বল্প পরিসর জায়গা বিশিষ্ট পক্ষীরাজ্যানে অতি কষ্টে চড়া হলো। সারা রাস্তা বাঁকির চোটে নিজেকে কিছুতেই ঠিক রাখা যাচ্ছিলো না। প্রতি মুহূর্তেই পড়ে যাবার আশঙ্কা হতে লাগলো। তার ওপর সেকি শব্দ! কোন কথা বলা এবং শোনার বুখা চেষ্টা না করে নীরব হয়ে থাকটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলাম।

রাস্তায় অনেক ইউকেলিপটাসের গাছ চোখে পড়লো। সাদা ধবধবে দেহ নিয়ে ওরা সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। সাঁওতাল ছেলে মেয়েরা এই মাত্র শিকার করে ফিরছে। মেয়েদের পরিপাটি চুলে লাল টুকটুকে পলাশ ফুল গোঁজা। ছেলেদের এক হাতে তীর ধরুক এবং আর এক হাতে বাঁশের বাঁশী। তারা বাঁশী বাজাচ্ছে। পিঠে তাদের শিকার বাঁধা রয়েছে।

সহরের পশ্চিম দিকের রাস্তা চলে গেছে নন্দন পাহাড়ের দিকে। সেই রাস্তা ধরে চলেছি। উচু রাস্তা থেকে নীচে ধানের জমির আলগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গুচ্ছ গুচ্ছ ধান গাছ মাথা নেড়ে যেন বাতাসকে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। দু'একটা খেজুর গাছ তাদের মাঝখানে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা জমিতে টিলার ওপরে দু'একটা বাড়ী। অদূরে ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে।

পাহাড়ের গোড়াতে আমাদের একা এসে থামলো। এখান থেকেই সিঁড়ি ওপরে চলে গেছে। এই সেই বিখ্যাত নন্দন পাহাড়। দূরে থেকে এর যতটা নাম শুনেছিলাম আসলে কিন্তু তা নয়। পাহাড় হিসাবে এর উচ্চতা একেবারেই কম। কাজেই ওপরে উঠতে বিশেষ কষ্ট হলো না। সেখানে সমতল জায়গায় কয়েকটি হিম্মানজীর মন্দির। এখনও পাণ্ডার অগ্নিচার সুরু হয়নি। কিছু দিনের মধ্যেই এই জায়গাটি একটি রীতিমত ব্যবসায়ের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে। এখান থেকে সহরের চারিদিকের দৃশ্য সত্যিই খুব সুন্দর। দূরে যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকে শুধু অস্পষ্ট পাহাড়ের শ্রেণী। আমরা বসবার জন্যে একটা ভালো জায়গা খুঁজতে লাগলাম কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর খণ্ডগুলি পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে বসানো রয়েছে। এই সব প্রস্তর খণ্ডে 'উৎপল' 'সুপ্রিয়া' ইত্যাদি অনেক নাম লেখা রয়েছে। বোধ হয় এরা এক সময়ে এখানে বসে জায়গাটিকে ধন্য করে গেছে। আমরাও একটা ঐ রকম প্রস্তর খণ্ডের ওপর বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করলাম কিছুক্ষণ। সহরের কেলোহল থেকে অনেক দূরে এই নির্জনতার মাঝখানে আমরাও যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম। মাঝে মাঝে ছরস্তু হাওয়া আমাদের বিব্রত করে তুলছিলো।

সূর্য্যদেব পশ্চিমে ডুব দেবার উপক্রম করছেন দেখে আমরাও ফিরবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। নন্দন পাহাড়কে পেছনে ফেলে আমাদের একা এগিয়ে যেতে লাগলো। রাস্তা মাটির পথ একে বেকে চলে গেছে। আকাশে সূর্য্যাস্তের লাল আভা। লাল মাটি আর লাল আকাশ; এই দুটোতে মিশে একটা লাগাচে রংএর সৃষ্টি করেছে। বাতাসে মন্থার মিষ্টি গন্ধে ভেসে আসছে। এত ভাল লাগছিলো সব।

পরের দিন বৈদ্যনাথ দর্শন। মন্দির খুব বেশী দূর নয় বলে হেঁটে যাওয়াই স্থির হল। মন্দিরে যেতে রাস্তার দুধারে খাবারের, কাপড়ের ও মনোহারী দোকান সাজানো রয়েছে। দেওঘরে লোহার জিনিষ বিখ্যাত। এই জন্যে এইখানেই ভীড় বেশী। কাঁচের চুড়ীর দোকানে মেয়েরা ভীড় করে রয়েছে।

মন্দিরের গোড়াতেই প্যাড়ার দোকান। এখান থেকে লোকে প্যাড়া কিনে পূজো দিয়ে আসে। ভোরের মঙ্গল আরতি এই মাত্র শেষ হল। এখনও সানাই বাজছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণটিকে ঘিরে কয়েকটি ছোট মন্দির। নানা রকম দেব দেবীর বিগ্রহ ওতে আছে। এর মধ্যেই প্রস্তর নির্মিত সব চেয়ে বড় মন্দিরটিতে বৈদ্যনাথ ঠাকুর থাকেন। এই মন্দিরের সামনে অনেক স্ত্রীলোক এবং পুরুষ হত্যা দিয়ে পড়ে আছে। ভেতরটা স্বপ্নের মত। বাইরের আলো সেখানে প্রবেশ করতে না পারায় ভেতরটা অন্ধকার। নাম হিসাবে মন্দিরের জাঁক জমক একেবারেই নেই। ভীড় বেশী হবে বলে আমরা খুব সকালেই গিয়েছিলাম। ঢুকতে বিশেষ অসুবিধে হল না। ফুল বেল পাতার স্তূপের মধ্যে শিবলিঙ্গের মাথার খানিকটা বার হয়ে আছে। প্রদীপের আলোতে স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। এই শিব লিঙ্গই বৈদ্যনাথ নামে প্রসিদ্ধ। কাছেই জয়দুর্গার মন্দির। কিম্বদন্তী আছে সতীর ছিন্ন দেহের একটা অংশ নাকি এখানে পড়ে জায়গাটি পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। এই মন্দিরের আগায় লাল সূতো বেঁধে বৈদ্যনাথের মন্দিরের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের বাইরে কতকগুলো লোক রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে দিতে মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে। এই রকম করাকে দণ্ডী দেওয়া বলে। এইভাবে ওরা দূর দূরান্তর থেকে অনাহারে অনিদ্রায় রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে দিতে মরণাপন্ন অবস্থায় মন্দিরে পৌঁছে বৈদ্যনাথকে পূজো দিয়ে ওদের মানত রক্ষা করে।

পরের দিন ত্রিকুট এবং তপোবন পাহাড় দেখতে যাওয়া হল। তপোবন চার মাইলের পথ এবং ত্রিকুট দশ বারো মাইল। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছিলো। সঙ্গে চা এবং কিছু খাবার নিয়ে খুব সকাল সকাল বেগিরে পড়লাম।

সহরের পূর্ব দিকের রাস্তায় এখানে চলেছি। তপোবন

একটি ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে এত গাছপালা যে দূর থেকে পাহাড় বলে বুঝতে পারা যায় না। স্বামী বালানন্দ এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন বলে এই পাহাড়ের নাম তপোবন হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এমন আলগা হয়ে রয়েছে যে দূর থেকে মনে হয় শূন্যে ঝুলছে। মনে হয় একটু ছুঁলেই বুঝি পড়ে যাবে। প্রকৃতির এই অদ্ভুত রহস্য দেখলে সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। পাহাড়ের গোড়ায় একটি বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাস। গ্রীষ্ম ছেলে মেয়েদের জন্তে বালানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে একটি শিব মন্দিরও আছে। এই মন্দিরের পাশ দিয়ে পাহাড়ের গা কেটে-কেটে সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে বালানন্দ তপস্যা করতেন। একটি প্রকাণ্ড গাছের নীচে যে প্রস্তর খণ্ডের উপর বসে তিনি ধ্যান করতেন সে জায়গাটি দেখলাম। কাছেই একটু জায়গা ঘিরে একটি ছোট ঘর নির্মাণ করে বালানন্দের ফটো এবং মূর্তি সাজিয়ে তাঁর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখা হয়েছে।

সেখান থেকে ত্রিকুট পাহাড়ে গেলাম। কোন কালে হয়ত এর তিনটা শৃঙ্গ ছিলো বলে একে ত্রিকুট নাম দেওয়া হয়েছিলো। এ পাহাড়টা এমন খাড়া এবং উঁচু যে ওঠা দুঃসাধ্য ব্যাপার। নীচে জমিতে সাঁওতালদের বসতি। ওখান থেকে একজন সাঁওতালকে গাইড নেওয়া হলো। প্রথমে কয়েকটা সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা শিব মন্দির এবং একটা অতিথিশালাও আছে। যাত্রীরা সেখানে বিশ্রাম এবং রান্না বাস্না করেও যেতে পারে। এর পরে আর সিঁড়ি নেই। পাহাড়ের গায়ে শক্ত শক্ত এক রকম গাছ আছে সেই গাছগুলির সাহায্যে ওপরে উঠতে লাগলাম। বলা বাহুল্য সাঁওতালটাই এ বুজি আমাদের দিয়েছিলো। কিন্তু সিকি ভাগ উঠতেই আমাদের অবসর হয়ে পড়লাম। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে হল। এইভাবে খানিক বিশ্রাম এবং খানিক ওঠা এই করে পাহাড়ের প্রায় অর্দ্ধেক উঠতেই আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। নীচে বসতিগুলো তখন আমাদের ঘরের মত ছোট্ট দেখাচ্ছিলো। ওখানে বসে

চা এবং জলবোগ করার পর একটু শ্রুত বোধ করতে লাগলাম। এবারে নামার পালা। ওঠার চেয়েও নামা যে কি কঠিন তা বুঝতে পারলাম। প্রতি মুহূর্তেই পদস্থান হওয়ার আশঙ্কা হতে লাগলো। একটু অসাবধান হলেই আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাঁওতালটি বলতে লাগলো এখানে নাকি বাঘ আছে। সন্ধ্যা হলেই সেইজন্তে বস্তির লোকেরা আর দরজা খোলে না। সে ছ'একটা বাঘের খোঁড়া গর্তও দেখালো। পাহাড়ের গায়ে যে রকম জঙ্গল এতে করে বাঘ থাকা বিচিত্র নয়। যাই হোক—বাঘের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই আমরা স্থানে পৌঁছে গেলাম।

একদিন বিছাপীঠে বেড়াতে গেলাম। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ছেলেদের স্কুল এবং বোডিং হাসপাতাল সব কিছুই এর ভেতরে আছে। সামনে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। সব রকম খেলারই ব্যবস্থা এখানে আছে। স্বামীজীরা এদের তদারক করেন। ছাত্রদের এখানে সাদাসিধে এবং কষ্টসহিষ্ণু করে গড়ে তোলা হয়।

সেখান থেকে করলীবাগে বালানন্দের আশ্রম এবং যুগল মন্দির দেখতে গেলাম। বালানন্দের আশ্রমের ভার এখন তাঁর প্রধান শিষ্য প্রেমানন্দের ওপর। এখানে নিত্য সংকীর্তন এবং বালানন্দের মূর্তিপূজা হয়। প্রতি বৎসর এখানে ঘটা করে দুর্গাপূজা হয়। সেই উপলক্ষ্যে কিছুদিন ধরে কাঙ্গালী ভোজন করানো হয়। কাছেই যুগল মন্দির। চাকশীলা নামে একজন মহিলা তাঁর মৃত পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বালানন্দের একজন শিষ্যা ছিলেন। এই প্রস্তর নির্মিত মন্দিরের গায়ে যে বিচিত্র কারুকার্য করা হয়েছে তা সত্যিই অতি সুন্দর। এরকম কারুকার্য এখনকার দিনে একেবারেই দেখা যায় না। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এই মন্দির তৈরী করতে। পুত্রের নাম যতীন্দ্র ছিল বলে মন্দিরের গায়ে 'যতীন্দ্র স্মৃতি' লেখা আছে। এখানেও বালানন্দের মূর্তি এবং বালকৃষ্ণের মূর্তি পূজা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা এখানে কৃষ্ণের ভজন গান হয়। বালানন্দের আশ্রমের ভেতরেই একটা সংস্কৃত কলেজ আছে।

স্মরণীয় য়াঁরা—কবি তরু দত্ত

শ্রীবেলা দে ।

য়াঁরা মনে করেন, স্কুলে বেশী দিন না পড়লে লেখাপড়া হয় না, তাঁরা দেখবেন দেশে স্কুলে না পড়েও তরু দত্ত যেরূপ লেখাপড়া শিখেছিলেন, অনেকে স্কুল কলেজ থেকে বি, এ, এম, এ, পাশ করেও তা পারেন না। যদি ইচ্ছা ও যত্ন থাকে তাহলে ঘরে বসেও অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। শ্রীমতী দত্ত মাত্র আট মাস ফ্রান্স দেশে একটা বালিকাবিদ্যালয়ে ও পরে কেম্ব্রিজে ও ইটালীতে পড়েছিলেন কিন্তু গৃহে আপনার পিতার যত্নে ও আপনার চেষ্টায় বহু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তদুপরি ছিল তাঁর স্বাভাবিক অসাধারণ প্রতিভা।

শ্রীমতী দত্তর পিতা শ্রীমুত গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত ১৮৬৯ সালে যুরোপে যান এবং সেই সময় অরু ও তরুকে সঙ্গে নিয়ে যান। শিক্ষা দেবার জগুই দুটা কন্যাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। এঁরা প্রথমে ফ্রান্সে যখন ছিলেন তখন তরুর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর! ফরাসী কব্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। কেবল যে তিনি পড়েই ক্ষান্ত হতেন তা নয়, ছোট বড় বহু কবির লেখাই তিনি ইংরাজিতে ভালরকম অনুবাদ করেছিলেন। আশ্চর্য্য রকম তাঁর মেধা শক্তি ছিল! এমন কি যে রাশি সকল কবিতা তিনি অনুবাদ করেছিলেন সে সবই তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। শ্রীমতী দত্ত অনেক পড়েছিলেন এবং যা পড়তেন তা খুব ভাল করেই পড়তেন, একটা শব্দ কথারও তাঁর কাছে এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না। ছোট বড় সকল অভিধান থেকে সেই কথার ঠিক অর্থ না জেনে তিনি মনে শাস্তি পেতেন না। এমন কি পিতার সঙ্গে তাঁর যদি কোন কথার প্রকৃত অর্থ নিয়ে তর্ক হোত তাহলে দশটীর মধ্যে অন্ততঃ সাত আটটা বিষয়ে কন্যাই জয়লাভ করতেন।

শ্রীমতী দত্ত প্রথমে অনেক ইংরাজি গ্রন্থ পড়েছিলেন কিন্তু শেষে প্রায় আর তিনি ইংরাজি পড়তেন না। বেশীর ভাগ সময় ফরাসী ও জার্মান পুস্তক নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। আলমারী ভর্তি ফরাসী ও জার্মান গ্রন্থ পাঠ করা একটা বালিকার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নয়! কেবল ফরাসী

সাহিত্য নয়, ফরাসীদের জাতীয় জীবন ও তাঁর আন্তরিক অনুরাগের বিষয় ছিল।

সংসারের কাজ কর্মে তরু অত্যন্ত সুনিপুণা ছিলেন কোন কাজকেই নীচ বলে তুচ্ছ করতেন না। শ্রীমতী দত্ত ভারী সুন্দর গানও গাইতেন এবং পিয়ানো বাজাতে ভালবাসতেন। শ্রীমতী দত্তর মৃত্যুর পর তাঁর পিতা লিখেছেন যে “আজিও যেন সেই মধুর শব্দ আমার কর্ণে বাজিতেছে।” অরু ও তরু দুই বোনের একান্ত ইচ্ছা ছিল একখানি উপন্যাস প্রকাশ করা—তরু লিখবেন আর অরু সেই পুস্তকে ছবি আঁকবেন। তরু সেই উপন্যাস লিখেছিলেন কিন্তু ১৮৭৪ সালে অরুর মৃত্যু হওয়ার তাঁদের উভয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। ১৮৭৯ সালে তরুর মৃত্যুর পর একজন ফরাসী মহিলা তাঁর জীবনীর সঙ্গে শ্রীমতী দত্তর লিখিত ঐ উপন্যাসখানি প্রকাশ করেন। একটা বাঙালী মেয়ের রচিত ফরাসী উপন্যাস দেখে যুরোপের লোক সেদিন সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন; এই পুস্তকে তাঁর মানসিক শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উপন্যাস অপেক্ষা পদ্য রচনায় তাঁর প্রতিভা বেশী ছিল এবং কবিত্বের জন্যই ভারতবর্ষে এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে তরু দত্তর এত বেশী সুনাম ও আদর ছিল। শ্রীমতী দত্তর জীবিতাবস্থায় তাঁর সকল রচনা প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৭৬ সালে তাঁর পিতা তাঁর রচিত অনেক কবিতা একত্র করে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের এত বেশী সখ্যাতি হয়েছিল যে খুব অল্প সময়েই মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল এবং ৬৭ টংকা দামে বিক্রি হয়েছিল। ১৮৮২ সালে ভারত গীতিমালা নামে তাঁর একখানি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই লেখাগুলিই তাঁর শেষ কীর্তি! এই থেকে তাঁর কবিত্বশক্তি বিশেষরূপে বোঝা যায় এবং তাঁর যশ চারিদিকে বিশেষরূপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২০ বছরের একটা বাঙালী বালিকার পক্ষে সত্যিই সে এক বিস্ময়কর কাজ মনে হয়। আজকাল

অনেক মহিলা কবিতা লিখেছেন, এবং কেউ কেউ ভাল কবিতা লিখে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছেন, কিন্তু বিদেশী ভাষায় (ইংরাজীতে) লিখে বিদেশীর কাছ থেকে প্রশংসা লাভ করা সেই যুগে কম কথা নয়। ১৮৭৩ সালে স্বদেশে ফিরে এসে পিতার সঙ্গে তরু সংস্কৃত পড়া আরম্ভ করেন। বোধহয় দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করবার জন্য ইচ্ছাও করেছিলেন, কিন্তু অকাল মৃত্যুতে সে আশা আর পূর্ণ হতে পারল না। বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি তিনি মনোযোগের সঙ্গে পড়ছিলেন এমন সময় তাঁর শরীর অসুস্থ হলো, কাজেই আর পড়াশুনা এগল না। তবুও বিষ্ণুপুরাণের দুটি গল্প এই সময়ের

মধ্যে ইংরাজীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। প্রাচীন ভারত রমণী নামে একখানি ফরাসী পুস্তক রচনার সাহায্য করতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু সে কাজ আর শেষ করতে পারলেন না। কঠিন রোগ তাঁর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে ছিন্ন করে দিলে! তাঁর অগভীর দেহখানি লুটিয়ে পড়ল ধরার বুকে—১৮৭৭ সালের ৩০শে আগষ্ট কীটসের মত একবিংশতি বছর বয়সে কুমারী তরু দত্ত চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন।

অল্প বয়সে শ্রীমতী দত্তর মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে মনীষা ও সদগুণের অলস্তু দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তাতে তাঁকে আমরা চিরদিনই স্মরণ করব।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীবেলা দে

গৃহসজ্জা

শকুন্তলা

আমরা সকলেই চাই যে আমাদের বাড়ীটি যেন যথাসম্ভব ভাল দেখায়। ঘর সুন্দর রাখতে হলে যে দামী জিনিষের চেয়ে বরং সৌখীন রুচিরই দরকার বেশী এটা আমরা সবাই জানি না। ঘরের কোথায় কি আসবাব-পত্র রাখবেন, সে আসবাব পত্র কেমন হবে, দেওয়ালে ক'খানা কি রকম ছবি টাঙ্গাবেন এই সব খুঁটিনাটি কাজের দিকে বাড়ীর মেয়েদের দৃষ্টি না থাকলে শুধু টাকায় সৌন্দর্য্য হয় না। বহু গৃহস্থের কিন্তু এদিকে রুচি বা সৌন্দর্য্যবোধ কিছুমাত্র নেই। তাই দেখা যায় বহু ধনীগৃহে দামী আসবাব পত্র থাকলেও সাজানোর মূঢ়তার সবই যেন জবড়জং দেখায় এবং ঐ সব আসবাব পত্রে ধুলার কারুকার্য্যও চলে বিচিত্র গতিতে।

অনেক জায়গায় দেওয়ালের ছবি, আলমারীর কাঁচগুলি পর্য্যন্ত দেখা যায় না! এই সব অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে মানুষের মন গৃহবাসে আকৃষ্ট হতে পারে না। বাড়ীর যে কোন একজনের উপর এইগুলি পরিষ্কার করার ভার দেওয়া উচিত। ছবি বা আলমারীর ময়লা কাঁচ নিয়মিত না হলেও মাসে অন্ততঃ একবার করে চক্খড়ি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। দেখবেন পুরণো ঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আবহাওয়া পর্য্যন্ত আপনার মনে এনেব দেবে নতুন আলোর সন্ধান। ঘরের মেঝে প্রতিদিন মোছার উপরেও যদি মাসে একদিন করে সোডা বা সাজিমাটি অথবা কয়লার গুঁড়ো দিয়ে ধুয়ে দেন তারও শ্রী ফুটবে! কোন কোন গৃহিণীকে দেখা যায় উদয় অস্ত পরিশ্রম করছেন অথচ সংসারের সবকিছুই চোখে ঠেকে বিশৃঙ্খল! কেন এমন হয়? জিজ্ঞেস করলে জানা যায় লোকজন নেই, অর্থাৎ বাব, একাই সব করতে হয়, কাজেই সময় থাকে না! কিন্তু আমি বলব

এর উত্তরে—অভাব সবটাই এ সবের নয়! অভাব হচ্ছে সময় জ্ঞানের ও রুচিজ্ঞানের! নাই বা রইল গৃহস্থের ঘরে লোকজন, দামী কোচ, শোফা প্রভৃতি আসবাব পত্র? মনে করুন আপনার ইচ্ছে রয়েছে আপনার ছোট বাড়ীখানি নিখুঁত করে সাজাবার, কিন্তু সৌখীন ও দামী জিনিষ স্নেহের সামর্থ্য নেই, অথচ আছে রুচিজ্ঞান। তাই আপনি ঐ ছোট বাড়ীখানিকে সাজিয়ে ফেললেন ঘরের তৈরী নানা রকম খুঁটিনাটি জিনিষের সাহায্যে; সকলে দেখে মনে করলেন যেন কোন নিপুণ শিল্পীর আঁকা ছবি! আপনারা হয় তো বলবেন কেমন করে আর কি দিয়ে শিল্পী তাঁর গৃহকে এমন করে সাজাবেন? তাহলে বলি—প্রথমে বসবার ঘরের কথা—অবশ্য বসবার ঘর বলতে একটি সম্পূর্ণ ঘর সব সময় ছেড়ে দিতে না পারলেও খানিকটা জায়গা রাখতে হবে বাইরের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এসে বসবার জন্য। সে ঘরে বেশী আসবাব থাকবে না; কয়েকখানা চেয়ার অথবা বেতের সোফা কোচ, মাঝখানে একটি ছোট টেবিল আর তার উপর একটি ফুলদানী। ঐ ফুলদানীতে কয়েক গুচ্ছ ফুল থাকলে তো কথাই নেই! ফুলদানি না থাকলে একটি লম্বা কাঁচের গেলাস বা একটি চক্চকে মাজা পিতলের ঘটতেও কাজ চলে। চেয়ার টেবিলের অভাব হলে একখানি তক্তাপোষ ঘরের একদিকে পেতে তার উপর হাতের কাজ করা একটি কভার বা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখবেন। তার উপর ২১টি রঙীন কুশান বা গোল তাকিয়া এবং দজ্জায় একটি বিচিত্র কারুকর্ষ্য করা পর্দা। চাদর ও পর্দা নিয়মিত সাবান দিয়ে কাচা দরকার। দেয়াল যথাসম্ভব খালি এবং পরিষ্কার রাখা উচিত। তাকিয়া চাদর পর্দাতে হাতের কাজ করবার জন্য প্রতিদিন আধঘণ্টা সময় নিয়মিত দিলে অনেক জিনিষ তৈরী হয়। অনেকে হয় তো বলবেন সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে এমন করে একটি ঘর ছেড়ে দিলে চলবে কেমন ক’রে? কিন্তু একটু বুদ্ধি খরচ ক’রে রাত্রে দিকে ঐ জিনিষপত্রগুলো একদিকে সরিয়ে রেখে তো অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়! এমন কি দিনের বেলাও ভাল চাদরটা সরিয়ে রাত্রে তক্তাপোষে বিছানা করে শোওয়াও চলে। শোবার ঘরে কিন্তু বেশী জিনিষপত্র থাকবে না; ছোট একটি খাট এবং খাটের নীচে (ঠিক সামনে) একখানা পাগোষ।

পুরাণো পাড় বা ছেঁড়া রেশম পশম দিয়ে বুনে বা সেলাই করে তা করা যায়। এতে পা পরিষ্কার করে বিছানায় উঠলে অনেকদিন পর্যন্ত বিছানা পরিষ্কার থাকে; শোবার ঘরের কোনে একটি কুঁজো থাকবে। তারপর রান্না, ভাঁড়ার ও খাবার ঘরের কথা—যদি একটি মাত্র বড় ঘর থাকে তাকে কাঠের পার্টিশন করে তিনটি আলাদা ঘর করবেন। প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির মধ্যে ভাঁড়ার ঘরে একটি তক্তাপোষ অথবা চৌকীর উপর চাল, ডাল, মসলা প্রভৃতির টিন থাকবে, তাতে গৃহিণীর স্তব্ধতার জন্য প্রত্যেকটি টিনের গায়ে ঐ জিনিষগুলির নাম লেখা থাকবে। খাবার ঘরে একটি জালের আলমারী থাকা ভালো, খাবার রাখার জন্য। আর তা ছাড়া ঝাঁদের যেমন স্তব্ধতা হবে সেই মত টেবিল চেয়ার বা আসনে বসে খাবার উপযোগী ব্যবস্থা করবেন। তারপর গৃহের আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা। সাধারণতঃ আমরা বাড়ীর বা কিছু ময়লা আবর্জনা সবই বাড়ীর সামনে ফেলে থাকি। সকলেরই এ অভ্যাস থাকলে, এতে সকলের আশপাশের বাড়ী হিসাব করে সারা সহরেরই ক্রমে স্বাস্থ্যহানি হয়, কাজেই এ অভ্যাসটা আগে দূর করতে হবে। প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে একটি করে টিনের বালতী বা টব বেধে তার মধ্যেই যত কিছু আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা করা ভালো; এবং জমা হবার পর ঐ আবর্জনা গুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এবিষয়ে বি চাকরদের শিক্ষা দেওয়া খুব শক্ত বুঝতে পারি, কিন্তু তবু চেষ্টা দরকার। তাছাড়া প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ ধূনা দেবার ব্যবস্থাটা করা উচিত। ঘর কন্নার খুঁটিনাটীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখলে অল্প খরচেও একটি গৃহস্থের সংসারকে সৌন্দর্য্য শ্রীতে ভরিয়ে তোলা যায়। অপর পক্ষে ধনীগৃহে লোক জনের অভাব না থাকলেও গৃহিণীর অব্যবস্থায় অনেক সময় চারদিক যেন শ্রীহীন হয়ে থাকে। কিন্তু এমন হওয়া উচিত নয়! এঁদের নিখুঁত করে ঘর সাজানো ছেলেবেলা থেকে শেখানো উচিত, তবেই তাঁরা পরিচয় দেবেন স্বকৃতির। সোফা, কোচ কিনে যারা সজ্জা সম্পাদন করবেন তাঁরা মনে রাখবেন, ঘরের সাইজ হিসাবে সোফা কোচের সাইজ ও সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। সোফার কভার, দেওয়ালের রং আর ঘরের পর্দার রং যেন এক রকমের হয়, তাতে বাহার থুলবে খুব বেশী। কারণ রংয়ের অসামঞ্জস্য সজ্জাশ্রী নষ্ট হয়।

আলুর ভাজা পুলি

শ্রীশৈল মিত্র।

উপকরণ—গোল আলু, চাউলের গুড়া, নারিকেল, সরিষার তৈল ও গুড় বা চিনি।

প্রণালী—আলুসিদ্ধ করিয়া ঐ চাউলের গুড়া দিয়া ময়দার মত মাখুন। তারপর কড়ায় নারিকেল ও গুড় দিয়া পাক করিয়া রাখুন। এবারে ঐ মাখা আলুর ভিতরে নারিকেল দিয়া পুলির আকারে তৈরী করে রাখুন, এখন কড়ায় তৈল দিয়া, তৈল বেশ তৈরী হইলে ঐ পুলি ছাড়িতে থাকুন, যখন ঐ পুলির রঙ ঈষৎ লালচে হইবে, তখন তুলিয়া লইবেন।

আলু মাখিবার সময় চাউলগুড়ি খুব বেশী বা কম দিবেন না, আন্দাজ করিয়া দিবেন। এই পুলি গরম গরম খাইতে বেশ লাগে।

ঘরের কথা

শকুন্তলা।

চুল উঠার প্রতিকার—চায়ের পাতা সিদ্ধ করে ও বেশ ঠাণ্ডা করে স্নানের আধ ঘণ্টা আগে মাথায় বেশ ভাল

করে মেখে রাখবেন; পরে অবশ্য ভাল জলে মাথাটা ধুয়ে নিতে হবে। এত চুল ওঠা বন্ধ হয়ে যায়।

দাঁত হলদে হয়ে গেলে—মধ্যে মধ্যে ঈষৎ জলে সোডা বাইকার্ব দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেললে দাঁতগুলি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

চোখের নীচে কালি পড়লে—রাত্রে শোবার আগে ঐ অংশে একটু হুখ লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলবেন।

দাদ বা আঁচিল হলে—পেঁপের আঠা ১২ গ্রেণ, সোহাগা ৫ গ্রেণ ও জল ১ ড্রাম এইগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে তুলির সাহায্যে ঠিক ঐ জায়গায় দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

মুখের কালো দাগ ও মেছেতা হলে—এক আনা ওজন সোহাগা পুড়িয়ে খই করে আর একটা পাতিলেবুর রসে সেই সোহাগা পোড়া ভাল করে খলে মেড়ে নিয়ে একটা পাথর বাটীতে রেখে, সেই থেকে রোজ রাত্রে শোবার সময় মাথলে মুখের ঐ কালো দাগ ও মেছেতা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবে।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

আই, এ, পরীক্ষায় ছাত্রীদের কৃতিত্ব

বর্তমান ১৯৪৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, পরীক্ষার প্রথম দশ জনের মধ্যে পাঁচটি ছাত্রী স্থান অধিকার করিয়াছেন।

আশুতোষ কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী গৌরী সেন প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

এই আশুতোষ কলেজেরই ছাত্রী শ্রীমতী শিপ্রা সরকার দ্বিতীয়, মীরা দাশগুপ্তা পঞ্চম ও নন্দিতা ভট্টাচার্য্য নবম স্থান অধিকার করিয়াছেন। গত ২৯শে জুন স্নার আশুতোষের

জন্মোৎসব সভায় বাংলার গভর্ণর ছাত্রী চারিটিকে আশীর্বাদ করেন এবং আশুতোষ কলেজের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

গোথেল মেমোরিয়াল কলেজের ছাত্রী শিপ্রা সেন চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই সব বিদ্যায়তন ও ছাত্রীদের আমরা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

গবেষণার জন্য সরকারী বৃত্তি প্রাপ্তা মহিলা

পশ্চিম বঙ্গের সরকার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য তিনটি বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে দুইটি বৃত্তি

মহিলারা পাইয়াছেন। অষ্টম বৈদ্য সম্পর্কে গবেষণার নিমিত্ত শ্রীমতী বাসনা সেন, এম, এ, এবং জীবকোষ গবেষণার জন্য শ্রীমতা ঈরা বসু সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজে ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে গবেষণা করিবেন।

নার্সিংএ উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে মহিলাদের গমন

পশ্চিম বাংলা সরকার নার্সিংএ উচ্চ শিক্ষা লাভের নিমিত্ত এক বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত মহিলাদের বিলাত প্রেরণ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রীমতী অরুণা গুহ ঠাকুরতা, সিটার গয়মতি বংগ (লেপচারমণী,) সিটার আম্রা ল্যাজার ও সিটার নেলী ডোরথী (ভারতীয় ঋণান রমণীদ্বয়) এই চারিটি মহিলা মনোনীত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই সরকারী হাসপাতালের নার্স।

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা পি, এইচ, ডি,

ডাঃ শ্রীমতী সুরমা দাশগুপ্তা (কেন্দ্রীয়) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে ডক্টারেট ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তিনি কেন্দ্রীয়ের নিউনহাম কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সিণ্ডিকেটে নূতন মহিলা সদস্য

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত কলেজ সমূহের অধ্যক্ষদের মধ্য হইতে নির্বাচিত সিণ্ডিকেটের সভ্যপদ খালি হওয়ায় নির্বাচন দ্বন্দ্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন স্কুল ইনসপেকট্রিস ও লেডি ত্রেবরণ কলেজের নূতন অধ্যক্ষ শ্রীমতী সুনীতি বাল্য গুপ্তা, এম, এ, এম, এড (লীডস) মহোদয়া সর্বাধিক ভোটে সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

সুনীতি দেবী সিণ্ডিকেটের সদস্য হওয়াতে ছাত্রীদের অভাব ও অভিযোগ বিশেষতঃ ছাত্রীদের আবাসের সমস্যার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবে।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা শাখা বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে মহিলাদের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্দ্যের ফলে

মহিলাদের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান দুর্গতি দেখা দিয়াছে, তাহা যোচনকালে সরকারী সাহায্যপুষ্ট এবং পূর্ণ সাংসদসমাজমুখক কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের অনুরোধ জানান হয়।

প্রস্তাবে উক্ত কেন্দ্রগুলির সংশ্লিষ্ট এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। ইহার ফলে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকদের চাকুরী সংস্থাপনের সুবিধা হইবে।

তৃতীয় প্রস্তাবে সভা মহিলাদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শিক্ষার দিক দিয়া ক্ষতিকর হইবে বলিয়া অভিমত জানানয়। হেষ্টিংস হাউসের বাড়ী ও উহার সংলগ্ন জমি স্ত্রী শিক্ষার জন্য ব্যবহার করার প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সভা উক্ত বাড়ী বিভিন্ন কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যে সব মহিলা সমাজসেবা, স্বাস্থ্যবিষয়ক ও অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত আছেন, তাহাদের সকলের জন্য একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানানয়। সভা উক্ত গৃহে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য গার্হস্থ্য, অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞানসম্বলিত একটি কলেজ খুলিবার প্রস্তাব করে এবং ঐ গৃহে একটি শরীর চর্চাবিষয়ক কলেজ ও হাতেকলমে কাজ শিক্ষাদানের জন্য একটি মহিলা বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জ্ঞাত অনুরোধ জানানয়।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের উদ্যোগে কলেজের ছাত্রীদের জন্য একটি মহিলা নিবাস খুলিবার জন্য প্রস্তাবে সরকার অর্থ-স্বীকৃতির যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সভা এই অভিমত জ্ঞাপন করে যে, কলিকাতায় স্থান সঙ্কুলানের অসুবিধা হওয়ায় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলির অবিলম্বে চারি শ্রেণী যথা, কলেজের ছাত্রী, ডাক্তারী এবং পোষ্টগ্রাজুয়েট ছাত্রী, চাকুরীতে নিযুক্তা এবং স্কুলের ছাত্রীদের জন্য একটি মহিলা নিবাস খোলা একান্ত প্রয়োজন।

মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা শাখার সম্পাদিকা শ্রীমতী সুধা মজুমদার বার্ষিক কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করিয়া বলেন যে, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সাহায্য ও পুনর্বাসিত শাখার সহযোগে উত্তর কলিকাতা শিল্পকেন্দ্রে পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত ৫০ জন মহিলা বাস্তব্যাগীকে শিল্প কাজের শিক্ষা দেওয়া হয়। উহাদের মধ্যে ৩৫ জন আবলম্বী হইয়াছে। সম্মেলনের উদ্যোগে কলেজের ছাত্রীদের জন্য একটি হোষ্টেল খোলা হইয়াছে। হোষ্টেলে ৮৫টি সিট আছে। একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। জৈখানে ৫৮ জন ছাত্রী বর্তমানে পড়াশুনা করে। বর্তমানে সম্মেলনের কলিকাতা শাখায় সদস্য সংখ্যা হইতেছে ৬৫০।

স্বদেশ ও বিদেশ

শ্রীমুখাকান্ত দে।

১। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বালক বালিকার জন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করিবার জন্য সরকার একটি সমিতি নিয়োগ করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর ইহার উচ্চ শিক্ষার কথাও বিবেচনা করিবেন। আমাদের সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা স্নাত্তা রায় ও অন্য তিনজন মহিলা উপরি উক্ত সমিতির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী উহার সভাপতি। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বর্তমানে এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমুখ্য মত পোষণ করেন। তাহা হইতেছে, শিক্ষা বাহারা দিবেন তাঁহাদের অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ মহিলা হওয়া প্রয়োজন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ হইবে। এবং প্রতি ৩০ জনে একজন শিক্ষক ধরিলে প্রায় ১ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। তন্মধ্যে ৫০,০০০ নারী হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এ দেশে যত লোকের প্রয়োজন, তত লোক নাই, মেয়েদের সংখ্যা ত আরও কম। সুতরাং নিদ্বিষ্ট সংখ্যক শিক্ষাদাত্রী তৈরী করিতে হইলে আমাদেরকে জ্বী-শিক্ষাকে আর কত দ্রুতবেগে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে, তাহা সহজেই অস্বপ্ন।

১১ বৎসর পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েরা একত্রে পড়িবে ইহাই সমিতির অভিপত।

২। স্বাস্থ্য ও খাদ্যের কথা

কিছুদিন আগে কলিকাতা সহরে হঠাৎ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সহরে কিরূপ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় অনেকের মনে আছে। সেই সময়ে কলেরার কবলেও কম লোক পড়ে নাই।

বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতা ও রোগপ্রবণতার কথা সর্বজনবিদিত। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা ঢের বেশী সুগঠিত ও শ্রমসহিষ্ণু। আমাদের জল বাতাস এই অবস্থার জন্য কতক পরিমাণে দায়ী হইলেও, আমাদের উদাসীনতা এবং স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব কম দায়ী নহে। বর্তমানে আমাদের যে সকল দ্রব্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিবার অভ্যাস আছে, তাহাতে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটাইলে আমাদের ভারতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিতে পারে, ইহা অনেক ডাক্তারের অভিপত। বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত খাদ্য তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের গৃহ-লক্ষ্যগণ সেগুলি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

৩। কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ

বর্তমানে ভারত সরকার যে সকল সমস্যা লইয়া বিব্রত

তন্মধ্যে কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী সেখ আবদুল্লা বাহিরের আক্রমণে উপদ্রুত হইয়া ভারতের সাহায্য চাহিলে, ভারতবর্ষ সৈন্য ও অস্ত্র পাঠাইয়া সাহায্য করে। যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াও তারপর ভারত ও আক্রমণকারীদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ হইয়া যায়।

ভারতবর্ষ এই ব্যাপারটি বিচার করিবার জন্য যুক্ত জাতি-সম্মে নিবেদন করে। এ বিষয়ে অনেক আলোচনা ও অনেক উত্থান পতনের পর অবশেষে উক্ত প্রতিষ্ঠান একটি কমিশন বসাইয়াছেন কাশ্মীর সম্বন্ধে সরঞ্জামিন তদন্ত ও সিদ্ধান্ত করিতে। ইহার শীঘ্রই কাশ্মীর আসিবেন। এই কমিশনে ৫টি দেশের প্রতিনিধি আছেন—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, কঙ্গিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও বেলজিয়াম। ইহার যে সকল বিষয় লইয়া অনুসন্ধান করিবেন, তন্মধ্যে এই কটি প্রধান—কাশ্মীর গণভোট গ্রহণ দ্বারা স্থিরকরণ কাশ্মীর ভারত ও পাকিস্থান কাহার সহিত যুক্ত হইবে, কাশ্মীরের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ হইবে ইত্যাদি।

কাশ্মীর মুসলমান প্রধান দেশ, কিন্তু উহার মহারাজা হিন্দু। সেখ আবদুল্লা মুসলমানগণের প্রতিনিধিরূপে ভারত ইউনিয়নে যোগ করিয়াছেন। ইহা লইয়াই নাড়াচাড়া। পাকিস্থান বাল, কাশ্মীর পাকিস্থানে যোগ দিবে—আবদুল্লা মুসলমানগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নহেন, সুতরাং কাশ্মীরকে ভারতের সহিত যুক্ত করিবার কোন অধিকার তাঁহার নাই। আবদুল্লা সে কথা স্বীকার করেন না। বিশেষতঃ ভারত আক্রমণকারীদের হাত হইতে কাশ্মীরকে রক্ষা করায় তিনি ভারতের প্রতি অভ্যন্তরীণ কৃতজ্ঞ। অথচ মুসলমান হইয়া কাশ্মীর ভারতের অঙ্গীভূত হইবে, ইহা পাকিস্থান সহ্য করিতে পারিতেছে না।

হায়দ্রাবাদ সমস্যাটি অল্পরূপ। উহা হিন্দু প্রধান রাজ্য, কিন্তু উহার অধিপতি মুসলমান। বাহারা খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক, তাঁহারা জানেন বহুদিন ধরিয়া ভারতের সহিত হায়দ্রাবাদের বোকা পড়া হইতেছে। ভারতের দাবী প্রধানঃ—জটী—হায়দ্রাবাদ ভারতে যোগ দিবে এবং অভ্যন্তরে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবহার প্রবর্তন করিবে। ইতিমধ্যে কাশিম রাজভিত্ত নেতৃত্বে রজাকর বলিয়া এক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার হায়দ্রাবাদের সহিত ভারতের মিলনের ঘোর বিরোধী। গণহস্ত সম্মত উপায়ে ভারত জানিতে প্রস্তুত আছে, হায়দ্রাবাদ অধিবাসীরা কি চায়। কিন্তু রাজভিত্ত তাহা মনঃপূত নহে।

নিজাম এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌছান নাই

কথাবার্তার মধ্য দিয়া কালহরণ করিতেছেন। কিন্তু ভারত সরকার এবার চরম সর্ব দিয়াছেন, ইহার পর আর নিজামের কোন কথা শোনা হইবে না।

৩। ব্রহ্মদেশে ও শ্রামে লাল পতাকা

উত্তর ও মধ্য ব্রহ্ম কমিউনিষ্টদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট নহে। রুশিয়া ব্রহ্ম ও শ্রামে ক্রমাগত আপনাদের প্রভাব বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছে। ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন হু শেষ পর্যন্ত এই ডেউকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। শেষ যে খবর আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায় শ্যামের রুশ দূতাবাস সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ায় খুব জোরের সহিত প্রচার কার্য চালাইতেছে এবং থাকিন হু কাস্তে ও হাতুড়ি মার্কী লাল পতাকা রেডুনের সরকারী দপ্তরখানার মাথায় উড়াইয়াছেন। ইহার অর্থ অতি স্পষ্ট। মালয়েও ইতিমধ্যে ঘোর ইংরেজবিরোধী আন্দোলন চলিতেছে। অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার অনেক থানি স্থান জুড়িয়া রুশিয়ার প্রভাব বাড়িয়া চলিয়াছে।

ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে বেক্রম মনকষাকবি এখনও বর্তমান রহিয়াছে, তাহাতে রুশিয়া ঐ ব্যৱস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে না, এটা বলা চলে না।

৪। ইউরোপ ও এসিয়ায় রুশিয়া

ইয়োরোপ বালিনে পৃথিবীর জাতিগুলির ভাগ্য নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ সমগ্র ইয়োরোপ তথা পৃথিবীতে রুশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যে ভীষণ নীরব বিরোধ চলিতেছে, বাহা কোন দিন সরব হইয়া উঠিতে পারে, তাহার

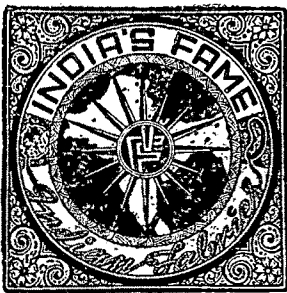
তীব্র প্রকাশ বালিনে ঘটতেছে। বস্তুতঃ, রুশিয়া, ইংরেজ-আমেরিকা-ফ্রান্সকে কোন প্রকারেই আমল দিতে চায় না। আরও রুশিয়ার চটিবার কারণ ক্রমাগতই ঘটতেছে। অল্পদিন আগে ইতালিতে যে নির্বাচন হইয়া গেল, তাহাতে কমিউনিষ্টদের বড় রকম পরাজয় ঘটিয়াছে। ইহার জন্য আমেরিকা অর্থব্যয় ও প্রচারের চূড়ান্ত করিয়াছিল। তেমনি আবার চেকোস্লোভাকিয়ার নির্বাচনে রুশিয়া তাহার শোধ তুলিয়াছে। সেখানে কমিউনিষ্ট ছাড়া আর কাহাকেও পালামেন্ট গঠিত করিতে দেওয়া হয় নাই। পূর্ব ইয়োরোপ রুশিয়ার কঠিন হস্তের নিষ্পেষণে পিষ্ট, আর বাকী ইয়োরোপ এখনও মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না কি করিবে।

এসিয়ায় অবস্থাও তাই—তুমুল প্রতিযোগিতা চলিতেছে। শ্যাম, ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া ত আছেই, উপরন্তু চীন ও কোরিয়া প্রভৃতির গায়েও আগুনের হুকা ভীষণভাবে লাগিতেছে। উত্তর ও মধ্য চীনে রুশিয়ার প্রভাব সুবিদিত। বর্তমানে যে গৃহ-যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার ফলে দক্ষিণ চীনের অবস্থা কি হইবে ঠিক করিয়া বলা কঠিন।

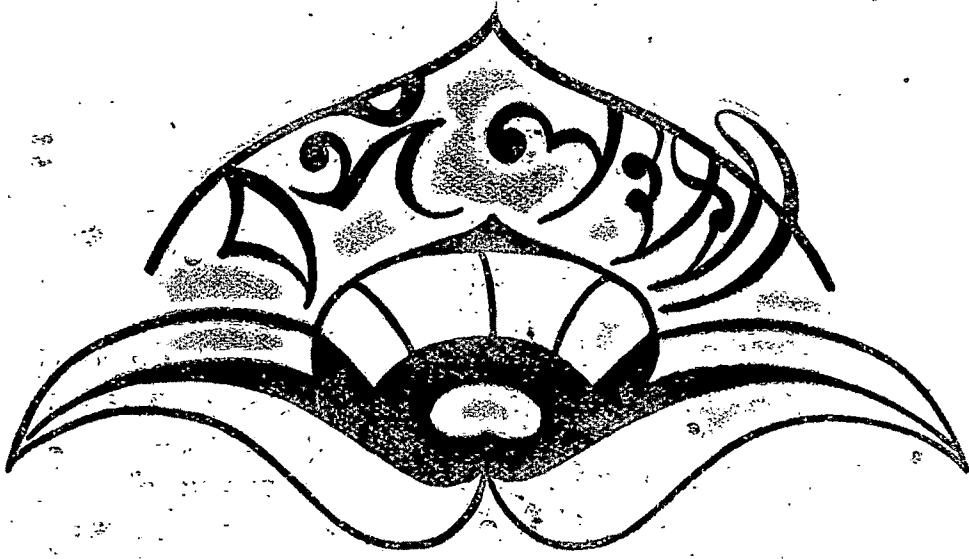
২৬/৩/৪৮

মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি—পারস্য, প্যালেষ্টাইন, প্রভৃতি—

যে অত্যন্ত কঠিন প্রতিযোগিতা অহরহ সহ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য কোন পক্ষই চূপ করিয়া নাই। পৃথিবীর সর্বত্র এখন সামাল সামাল রব উঠিয়াছে। কিন্তু সামলাবে কে?



Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
BHOWANIPUR · CALCUTTA ·



২৩শ বর্ষ

ভাদ্র—১৩৫৫

১০ম সংখ্যা।

আমি

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

ক্ষুদ্র লৌহ কণিকার মত

ছড়ানো আমার মন,

অল্পভব করি মহাচুঞ্চক

করিছে আকর্ষণ।

টান পাই আমি টান যে প্রবল,—

শরীর শিহরে, চোখে আসে জল,

হেথা ধরে রাখে—কিধে ধরে রাখে ?

হয় নাকো নিরুপণ।

২

সুখা সিদ্ধুর গুনি কল্লোল

কি যে উল্লাস জাগে,

অলক্ষ্যে আসি সুখার শীকর

বক্ষে আমার লাগে।

আমি কোন দূরে ধূ ধূ বালুচরে,

গুজির মত একা আছি পড়ে,

মুক্তার কথা শুনায় আমারে

কে গভীর অনুরাগে।

৩

গহন কানন ফুটে আছি আমি

অনামা ক্ষুদ্র ফুল।

জানিনা কি মোর প্রয়োজন আছে

জীবনই হয় তো তুল।

কত পুঙ্কের জাগে শিহরণ,

মনে হয় এ যে মধুর ভুবন,

পূজা আরতির সংবাদ আনে

কত বায়ু অহকুল।

৪

আমি পড়ে আছি—শুকাইয়া যাব

ক্ষুদ্র শিশির কণা

কে যেন বলিছে—আছে তোর ও আছে

বিরিচি সম্ভাবনা।

পড়ে রয়েছিস পাস নাই টের

পাষণ চরণে দেবাদিদেবের

অজ্ঞাতে তুই করে চলেছিস্

টারি পূজা উপাসনা।

অ্যানি বেসান্ট

(স্মৃতি কথা)

অমল হোম

১৯১১ কি ১৯১২ ঠিক মনে পড়ছে না। কলেজে পড়ি তখন। ধর্মতলা দ্বীটে একজন যুরোপীয়ান মহিলা জগদগুরু আবির্ভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন শুনে, জন কয়েক সহপাঠীর সঙ্গে এসে ঢুকেছি কোরিথিয়ান থিয়েটারে। প্রেক্ষাগৃহ জনাকীর্ণ। “তিল ঠাই কোথা নাহি রে।” আমরা ছেলেরা ঠেলাঠেলি করে গ্যালারির প্রায় শেষ বেকিতে একটু স্থান সংগ্রহ করেছি—কোনো রকমে। মঞ্চের উপর সব বসে আছেন কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি;—চোগা চাপকান শামলা পাল্লা দিচ্ছে কোট প্যান্ট টাই কলারের সঙ্গে; তারি মাঝে মাঝে মাথা জাগিয়ে রয়েছে,—যেন বর্ষার জলজোড়া মাঠে পূর্ববঙ্গের পল্লীর মতো,—কয়েক জোড়া ধুতি চাদর পাঞ্জাবী! কলঙঙনে নাট্যালা মুখরিত। সহসা সব স্তব্ধ হয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম,—চাপকান-পরিহিত দীর্ঘ ঝুঁ-দেহ সোমামূর্তি একজন প্রোট বাঙালীকে পুরোভাগে রেখে, ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন এসে, খেতলকদমশোভা, খেতাবারা খেতাবিনী,—দিব্য মহিমাময়ী মূর্তি, সেনাক্যার বক্তা। সকলে উঠে দাঁড়ালেন। সন্মিত-হাস্যে, করজোড়ে জীবৎ অবনমিত মস্তকে সকলকে অভিবাदन জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন—অ্যানি বেসান্ট। তাঁর বাম পাশে বসলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ডান পাশে পূর্বেই বসেছিলেন অধুনালুপ্ত “ইণ্ডিয়ান মিরর”-পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধ নরেন্দ্রনাথ সেন মশাই। তিনি দু'টার কথা লেবার পর মিসেস বেসান্ট উঠলেন। ধীর মুহূর্তে স্তব্ধ হোলো তাঁর ভাষণ,—এত মূহ ও মধুর, যেন মনে হোলো দূর মন্দিরের সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি। ক্রমে যেন কাছে এলো তা। কখনো মনে হোলো যেন অরুণোদয়ে ক্ষীণ নিঝর-উৎস থেকে মধ্যাহ্নদিনে প্রকলপাবী ধরনদীপ্তোত বেয়ে শান্তসমাহিত সন্ধ্যার মহাসাগরসঙ্গমে এসে পৌছবে সে ভাষণের অবিরাম ধারা। আবার কখনো মনে হোলো যেন রণদামা বাজিয়ে তালে তালে পা ফেলে ফেলে

চলেছে বহুবর্ণলাঙ্ঘিত পতাকার নীচে ঘনসম্বন্ধ সৈন্তদল; তাদের কাঁধের বন্দুকের সঙ্গীনফলকে এসে আঘাত করছে দ্বিপ্রহরের সূর্য্যরশ্মি—তারা চলেছে মহা-আহবের আহবানে। ছন্দে স্বরে গমকে মীঢ়ে মুচ্ছনায়, ভাবে ভাষায় ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে সে ভাষণের মায়াজাল ছেয়ে ফেললো বিরাট রঙ্গশালা; মস্তমুগ্ধ আমরা শুনতে লাগলাম—কোমলে কড়িতে মধ্যমে, পর্দা থেকে পর্দায় উঠলো সৈ স্বরগ্রাগ; তারপর কোন এক সময় সমে এসে পৌঁছল। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম আমি; আমার সঙ্গীরা আমাকে ডাকতে যেন আমার সংজ্ঞা ফিরে এলো।

সেই আমার প্রথম পরিচয় অ্যানি বেসান্টের বক্তৃতায় সঙ্গে। কিন্তু সেই একটি বক্তৃতা শুনেই আমি তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লাম। তাঁর বিষয়ে তখন বেশি কিছু জানতাম না। শুধু জানতাম তিনি থিয়সফিস্টদের গুরু-মা, আর কানীতে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপন করেছেন, যা শীঘ্রই রূপান্তরিত হতে চলেছে, মদনমোহন মালবীয়াজীর চেণ্টায়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি তাঁর চরিত-কাহিনী সংগ্রহ করে পড়ে জানলাম কী বহুমুখী মনীষা এই বিচিত্রকর্মী মহীয়সী মহিলার, কী অদ্ভুত সংগ্রাম তিনি যৌবনের প্রারম্ভকাল থেকে অক্লান্ত ভাবে চালিয়েছেন সকল অজ্ঞানতা, অন্ধ সংস্কার, সামাজিক দুর্গতি, অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য দূর করে মানবমনের ও মানব সমাজের সর্বাঙ্গীন মুক্তিসাধনার উদ্দেশ্যে। অ্যানি বেসান্টের জীবনকথা বলবার স্থান নেই এখানে। মোটামুটি তা হয়তো অনেকেরই জানা আছে। তাঁর আত্মজীবনী একটি অপূর্ব সামগ্রী, যদিও তাঁর জীবনের গোড়ার দিকের কথাই তাতে আছে বেশি।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মিসেস বেসান্টের জন্ম হয়। তাঁর পৈত্রিক পদবী উড। তাঁর প্রপিতামহ স্যার মাথু উড ছিলেন লণ্ডনের লর্ড মেয়র, আর

একাদিক্রমে ছাব্বিশ বছর ছিলেন পার্লামেন্টের সদস্য। অ্যানি বেসান্টের একজন পিতৃব্য ছিলেন এভেলিন উড, যিনি পরে হন ইংল্যান্ডের লর্ড চ্যান্সেলর।

এ পরিচয়গুলো দিচ্ছি এই জন্ত, যে ভেবে ভারী অবাক হ'য়ে যেতে হয় যে, এত বড় ঘরে জন্মেও তিনি ছোটদের জন্ত লড়াই করেছেন চিরদিন। কৌলিগু রাখতে পারেনি তার মিথ্যে মর্যাদায় তাঁকে বেঁধে। প্রচলিত খৃষ্টধর্মের আস্থা হারিয়ে তিনি প্রথম যৌবনে ধর্মব্রাজক স্বামীর ঘর ছেড়ে এসে দাঁড়ালেন বিখ্যাত নাস্তিক্যবাদী, রাজনীতি ও সমাজনীতি ক্ষেত্রে অক্লান্ত যোদ্ধা চার্লস ব্রাডলার পাশে। নাস্তিক বলে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েও হোস অব কমন্সে তাঁর আসন গ্রহণ করতে পারেন নি; কেন না তখন ঈশ্বরের নাম নিয়ে, বাইবেলের আশ্রয়ত্ব স্বীকার ক'রে, সদস্য পদ গ্রহণ করতে হতো। সে শপথ না নিয়ে ব্র্যাডল তাঁর আসন গ্রহণ করতে গিয়ে বারবার বিজড়িত হন। এই নিয়ে ইংল্যান্ডে যে আন্দোলন শুরু হোলো, মিসেস বেসান্ট তার পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বাগ্মিতার জন্ম ও বিকাশ এই সূত্রেই। মৃতের স্বাধীনতা-স্থাপনে ব্র্যাডল ও বেসান্টের এই সংযোগ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের সামাজিক ইতিহাসের এক অরণীয় অধ্যায় বলেও কিছুমাত্র অতুক্তি হয় না। তার জন্ত বহু লোকনিন্দা ও উৎপীড়ন তাঁদের সহ্য করতে হয়েছিল। রাজদ্বারে অভিযোগও বাদ যায় নি। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশের জন্ত তাঁদের দু'জনের জেল ও জরিমানা হয়। (১) তার পর মিসেস বেসান্ট ধীরে ধীরে কেমন করে সোস্যালিস্ট মতে আকৃষ্ট হলেন ও ইংল্যান্ডের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগদান ক'রে দারিদ্র্যানিপীড়িত শ্রমজীবীদের সপ্তাহে পাঁচ দিন ও দিনে আট ঘণ্টা কাজের জন্ত সংগ্রাম শুরু করলেন; তাঁর নতুন রাজনৈতিক মতের জন্ত বহু ব্র্যাডলর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলো; তিনি তাঁর মত প্রচারের জন্ত ব্র্যাডলর "National Reformer" ছেড়ে "Our Corner" নামে নতুন সাপ্তাহিক বের করলেন, তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন বার্নার্ড শ' (২) এডওয়ার্ড কার্পেন্টার ও জন

বার্ণস, গিডনী আর বিয়েট্টিস ওয়েব—এ সব কথাও অনেকই হয়তো জানেন।

কিন্তু মিসেস বেসান্ট কোনো মতবাদেই বেশীদিন বাঁধা থাকবার মাহুষ ছিলেন না।

তিনি শ্রমিক আন্দোলন, সোস্যালিসম্ ছেড়ে আশ্রয় নিলেন থিয়সফির। এই থিয়সফিই তাঁকে নিয়ে এলো আমাদের দেশে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। সেই দিন থেকে ১৯৩৩এ তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁর নিবাস ছিল ভারতবর্ষ। এই দেশকেই তিনি স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের হিন্দুর অশন বসন সংযম শাসন সবই গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এক সিষ্টার নিবেদিতা চাঁড়া আর কোন বিদেশিনীকে এমন ভাবে এদেশকে আপন বলে ভাবতে ও আপন ক'রে নিতে দেখিনি। যাকে "হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান" বলা হয়, সেই আন্দোলনে মিসেস বেসান্টের স্থান কোথায় তা বিচার করবার স্থান এ নয়; তবু এ কথা বললে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তার আপন ঐতিহ্যে হিন্দুর মর্যাদাবোধ, প্রাচীন হিন্দু সাধনার আধুনিক হিন্দুর আস্থা ফিরিয়ে আনতে থিয়সফি সত্যিই যথার্থ সাহায্য করেছে। হিন্দুর স্বাভাৱ্য-বোধের প্রচারকল্পে মিসেস বেসান্টের দান অনস্বীকার্য। কিন্তু এখানে তার ব্যাখ্যা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেন আমি অ্যানি বেসান্টকে আমার জানা নারীদের মধ্যে সব চেয়ে বড় আসন দিই, এখানে সেই কথাই বলবো।

সেই কোরিছিয়ান্ থিয়েটারের বক্তৃতার পর আমি তাঁর লেখা বই কয়েকখানি পড়ি, কিন্তু থিয়সফি আমাকে টানলে না, আমি মুগ্ধ হ'য়ে পড়লাম তাঁর একখানি ছোট political pamphlet প'ড়ে। আমি সেটি পেয়েছিলাম হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশাইয়ের কাছে। যখন বিলেতে ডিজ'রেলী ও ভারতে লিটন রুটিশ দিম্পীরিয়ালিজমের ধারক ও বাহক রূপে আফগানিস্থানে চালিয়েছেন তাঁদের অভিযান; যখন তাঁরা সংবাদ পত্রের কণ্ঠ রোধ করেছেন এখানে, তখন, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, সেই pamphlet খানি লেখেন মিসেস্ বেসান্ট। তার নাম "The Story of Afganistan or Why the Tory Government gags the Indian Press. A plea

(১) পরে সে দণ্ডদেশ রহিত হয়—লেখক।

(২) তাঁর প্রথম উপন্যাস দু'খানি "The Irrational knot ও "Love Among Artists" মিসেস বেসান্টের এই কাগজেই বের হয়। আর বের হয় টুর্নেলীভের "Poems in Prose"—লেখক

for the weak against the strong” এতে ভারত-শাসনে তাঁর স্বদেশবাসীর কলঙ্ককথা, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের কাহিনী, তিনি তীব্র বিকারে করেছিলেন লাহিত।

এর কিছু দিন পরেই আমি তাঁকে একটু কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রতি বৎসরই তিনি তখন দু একবার কলকাতায় আসতেন, আর বেশির ভাগই থাকতেন কলেজ স্কোয়ারের থিয়সফিক্যাল সোসাইটির বাড়ীতে। সেখানে তাঁর পরিচর্যার ভার যে যুবকটির উপর থাকতো, সে আমার মামার বাড়ীর দেশের ছেলে। তাকে আমি জানতাম। সেই আমাকে নিয়ে যায় প্রথম মিসেস বেসান্টের কাছে। খুব ভয়ে ভয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য্য সৌজন্তে ও স্নেহে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন, আমার পরিচয় নিলেন,— সামান্য একটু কলেজের ছেলের। আমি তাঁর লেখা পড়েছি জেনে, বিশেষতঃ ঐ Afganistan pamphlet এর কথা শুনে খুব খুসী হয়ে আমাকে তাঁর কয়েকখানি বই উপহার দিলেন। আজও তা আমার কাছে রয়েছে সম্বল রাখা। সেই থেকে তাঁর কাছে আমার যাওয়া-আসা শুরু হোলো। তখন দেখেছি কী অসামান্য কর্মনিষ্ঠা, কী অসাধারণ শ্রমশক্তি, কী দৃঢ় সঙ্কল্প ও তারি সঙ্গে কী সর্ববাহল্যবিবর্জিত বিরল সংঘমে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল নিয়মিত। শ্রদ্ধার মাথা মুয়ে আসতো। আর দেখেছি মানুষের প্রতি তাঁর অসীম মমতাবোধ। ১৯২৫এ ঝাঁকুড়ায় দারুণ দুর্ভিক্ষ। ডাক্তার রিজেন্সনাথ মৈত্র-মংশীর সহপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় হিতসাহনমণ্ডলী নিরন্নদের অন্নদান সংকল্পে নেয়েছেন কর্মক্ষেত্রে—সঞ্চল স্বল্প, উদ্দীপনা প্রচুর। ডাক্তার মৈত্র,—আমি-তখন তাঁর অল্পতম-সহকারী—আবেদন জানালেন, কেন জানি না, মিসেস বেসান্টের কাছে। তিনি তখন এদেশের নির্বীণ রাজনীতির পুরানো বোতলে তীব্র নতুন সুরা ঢালতে ব্যস্ত—মডারেট কংগ্রেসকে ঢেলে মাজতে চান। হোমরুল লীগ গড়ে মাক্রাজে, বোম্বাইয়ে চার ধারে ছোট্টাছুটি করে, বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাই আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল তখন তিনি বাংলা দেশের এক প্রান্তে মনস্তরে হুর্গতদের দিকে চোখ ফেরাবার অবসর পাবেন কিনা। ডাক্তার মৈত্রের আশা পূর্ণ হোলো। তাঁর আবেদন পাবা মাত্র মিসেস বেসান্ট পাঠিয়ে দিলেন কিছু টাকা। তার পর প্রতি সপ্তাহেই আসতে লাগলো অর্থ তাঁর কাছ থেকে—প্রচুর

অর্থ। টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা টেলিগ্রাম করে জানাতাম তাঁকে। কিন্তু সে অল্প টাকা রসিদ পাঠানোতে একটি দিনও দেরী হলে আর রক্ষা ছিল না। বোম্বাই থেকে মাক্রাজ আসবার পথে ট্রেনে বসে ছোট্ট এক টুকরো একখানি কাগজে পেলিলে লেখা একটি লাইন তাঁর আজও আছে আমার কাছে :—

“Dear Friend,

Do you know that you have not yet sent me the formal receipt for the last remittance.?”

Annie Besant.

এর কিছুদিন পরে, লক্ষ্মী কংগ্রেসে ১৯১৬র ডিসেম্বরে আমি গিয়েছি খবরের কাগজের প্রতিনিধি হয়ে। সেখানে মিসেস বেসান্টকে প্রথম দেখলাম রাষ্ট্রিক আন্দোলনের নেত্রীমুর্তিতে। ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে তখন তিনি দৃঢ়সংকল্পা অনন্তকর্মী। তখন তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি। তাঁর হোমরুল লীগকে তিনি দিয়েছেন বিপুল মধ্যাদা। তিলক যোগদান করেছেন তাতে। জিন্না আগেই করেছিলেন। মাক্রাজ তখন তিনি তোলপাড় করে তুলেছেন। তাঁর “New India “আর” Commonweal “কাগজে তিনি হোমরুলের জুড়ি হাঁকিয়ে চলেছেন। তিনি ইন্টার্ড হলেন। সারা দেশে দেখা দিল তুমুল বিক্ষোভ। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন,—আবার নামলেন পলিটিক্‌সে “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” প্রবন্ধ নিয়ে। ছাড়া পেলেন মিসেস বেসান্ট। কংগ্রেসে—১৯১৭র কলকাতা কংগ্রেসে—তাঁকে সভাপতির আসন দেওয়া নিয়ে বাংলাদেশের নৈম গরম দলে বাধলো বিরোধ। রবীন্দ্রনাথ সমাধা করে দিলেন তা—আবার এগিয়ে এসে। মনে পড়ছে, কংগ্রেস বসবার আগের দিন মিসেস বেসান্ট যখন কলকাতায় এসে পৌঁছলেন, সেদিন প্রত্যুষে তাঁর প্রত্যুদগমনে হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ট্রেন আসতে বহু বিলম্ব থাকায় তিনি বাড়ী চলে আসেন। এই খবর পেয়েই মিসেস বেসান্ট, তাঁর কলকাতা পৌঁছবার অল্পক্ষণ পরেই, জোড়াসাঁকোয় এসে উপস্থিত। সেদিন সেখানে বীদের উপস্থিতির সৌভাগ্য

ঘটেছিলো তাঁদের মন থেকে সে স্বাধীনতা কোনদিন মুছে যাবে না,—আর যাবে না ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সেই কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রথম দিনে কবি যখন বিপুল জয়ধ্বনির শেষে তাঁর উদ্বোধনী কবিতা দুটি “Thou hast given us to live” এবং “Captain oh Captain, our voyage has begun” পড়ে নেমে এলেন rostrum থেকে, আর মিসেস বেসান্টের আগমন ভ্যাগ করে এগিয়ে এসে কবির হাত ছুঁলি, তাঁর অঙ্কলিপুটে গ্রহণ করে নীরব অভিবাदन। এতদিন পরেও ভাসছে তা চোখের সামনে। আর ভাসছে, বলতে আজও লজ্জা হয়, ঐ ওয়েলিংটন স্কোয়ারেই, তিন বছর পরে, ১৯২০র স্পেশাল কংগ্রেসে, মিসেস বেসান্টের বিপরীত সংবর্দ্ধনা। রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্বের পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর-পন্থায় সেদিন তিনি জনমানস থেকে গেছেন সরে, পড়েছেন পিছিয়ে। প্রমত্ত জনবিক্ষোভভরঙ্গ এসে অসহিষ্ণু আঘাত করলো তাঁকে, যেই তিনি উঠলেন বক্তৃতা করতে গান্ধিজীর নন-কো-অপারেশন-নীতির সমালোচনায়। দেখতে

পাচ্ছি আজও—অবিরাম ধিকারধ্বনির মধ্যে অবিচল দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই পলিতকেশা অগ্নিহোত্রী;—মুখমণ্ডল রক্তাভ, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ, দৃষ্টি জ্বালাময়ী, কিন্তু ওষ্ঠাধরে হাস্যরেখা। অম্লকম্পাই বলে মনে হয়েছিলো, —অবজ্ঞা নয়।

সেদিন সন্ধ্যায়, অল্পতপ্ত চিত্তে, দেখা করেছিলাম মিসেস বেসান্টের সঙ্গে। তিনি জানতেন আমি তখন কোন্ পক্ষে, আমার আকর্ষণ কোন দিকে। কিন্তু তাঁর মুখে সেদিনের সেই লজ্জাকর ব্যাপারের উল্লেখও শুনি নি—যদিও তাঁর কাছে যারা তখন বসেছিলেন, তাঁদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না। মিসেস বেসান্ট পরম স্নেহে ও অসীম ধৈর্যে শুনেছিলেন আমার কয়েকটি কথা। ক্ষমা ছাড়া আর কিছু দেখিনি আমি তাঁর সেই চোখে—যে-চোখ মহুয্যত্বের প্রকাশে মাধুর্যে ভরে উঠতো, আর জলে উঠতো মহুয্যত্বের অবমাননায়, লোভ ও অহঙ্কারের কুৎসিৎ রূপে খরস্ফোরিত মতো।

পথের ধূলায়

শ্রীপ্রীতিময়ী কর, ভারতী

বাড়ী আসিয়া চিন্ময় শুনিল, মার অস্থখ সত্যই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছিল, সম্প্রতি অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। ঘরে তখন সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে। তক্তপোষের একপ্রান্তে স্বর্ণময়ী বসিয়াছিলেন। মেজের এক ধারে কার্পেটের আসন পাতিয়া তাঁহার আছিকের বায়গা করা রহিয়াছে। চিন্ময় ঘরে ঢুকিয়া মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিছানার পাশে বসিয়া পড়িল। কহিল, মা কেমন আছো? বুকের কষ্ট বুঝি খুব বেড়েছিল!

চিন্ময়ের হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্বর্ণময়ী বাপ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, আর কেমন কি বাবা,

এখন যেতে পারলেই মঙ্গল। এবার অস্থখ যে রকম বেড়েছিল, তাতে তোকে আর দেখবো বলে আশা ছিল না। মায়ের মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চিন্ময় বলিল, মা, ও কথা কেন বলছো? তোমার অস্থখ ত মাঝে মাঝে ও রকম বেড়ে থাকে, আবার ভালো হয়ে যাও। কাঁ ওষুধ খাচ্ছো?

—ওষুধ ওই উমেশ কবিরাজই দিচ্ছে। ওই ত বরাবর আমাকে ভালো করে। আর অল্প ওষুধ কি হবে?

—তোমাকে কতবার বলেছি আমার সঙ্গে কলকাতা চलो। সেখানে তোমাকে ইন্ডেকসানের চিকিৎসা করা—

বেশী উপকার হতে পারে। জাঁ তুমি শোন না। এবার তোমাকে কিন্তু যেতে হবে।

—না বাবা, ওসব গা ফোঁড়াফুড়ি আমার সহ্য হবে না। আর এ খশুর শাস্ত্রীর ভিটে ছেড়ে এ বয়সে আর কোথায় যাবো, আর কিসে কি হবে? কর্তার মত শেষ নিঃশ্বেষ্টা আমার এখানেই যেন পড়ে। উমেশ কবিরাজ আমার খশুরের কালের লোক। আমাকে দেখেও যেমন, আমাদের বংশের নাতীও বোঝে তেমন। ওর ঐশ্বর্যে থেয়ে এখানেই পড়ে থাকবো।

চিন্ময় কুণ্ঠিতভাবে আবদারের সঙ্গে কহিল, ওই ত — তোমার দোষ।

স্বর্ণময়ী ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে তাহার মাথার চুল কক্ষ, চোখ মুখ শুষ্ক। চিন্ময়কে গা ধুইয়া জামা কাপড় ছাড়িতে বলিয়া ভূত্যা হরি ও রাধুনীকে ডাকিয়া তাহার আহারের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া দিলেন। তারপর তাহাকে স্নানের ঘরে পাঠাইয়া দিয়া নিজে আস্তে আস্তে নামিয়া মেজের আসনে আস্থিক করিতে বসিলেন। আহা! তাহার পর আবার চিন্ময় মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। মা তাহার গায়ে মাথায় হাত দিতে দিতে বলিলেন, আজ সকাল সকাল গিয়ে ঘুমো। কাল সব শুনবো এখন। স্বর্ণময়ী বেশীক্ষণ চিন্ময়কে সেখানে বসিতে দিলেন না। শয়ন কক্ষে পাঠাইয়া দিয়া প্রদীপ নিবাইয়া নিজেও শুইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রভাতে চিন্ময় পাড়ায় একটু বেড়াইয়া আসিল। তাহার মাতা তাহাদের বড় ঘরের বারান্দায় জলযোগের আয়োজন করিয়া তাহার জন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। চিন্ময় প্রফুল্ল চিত্তে সেখানে আসিয়া মাকে কহিল, মা তুমি বাইরে এসে বসতে পারলে? —

স্বর্ণময়ী হাসিয়া কহিলেন, এ ক’দিন তো আর আসিনি; আজ তো আসতে পারলুম দেখছি।

চিন্ময় হৃষ্টচিত্তে জলযোগ আরম্ভ করিলে স্বর্ণময়ী কহিলেন, হাঁরে চিল্ল, তোর কলেজ বন্ধ হলো?

—কলেজ তো বন্ধ হয়নি মা; সামনে এগ’জামিন, সেইটে হ’য়ে গেলেই ছুটি হবে। তোমার জন্তেই ছুটে আসতে হলো। আমাকে আবার যে যেতে হবে।

—তুই তো বাছা সেখানে থাকতে পারলেই যেন বাঁচিস। এদিকে আমি যে কি করে থাকি তাই বল তো।

চিন্ময় স্থির করিয়া আসিয়াছে কলিকাতার কোন ঘটনা মাকে জানানো হইবে না। সে নিরুত্তরে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল; তারপর কহিল, কি আর করা যায় বলো, কাজের জন্তে থাকতে হয়।

—তাতো বুঝলুম, এদিকে আমারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়, আমি কি নিয়ে থাকবো?

—কি করতে হবে বলো।

—কি আর করবি? একটা বিয়ে থা ক’রে আমাকে দে।

চিন্ময় এ অনুরোধ অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছে। সে কোনই উত্তর করিল না। নীরবে ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দিতে লাগিল।

মুহ হাসিয়া স্বর্ণময়ী বলিলেন, চুপ করে রইলি যে! শুনিস নি কি আমার কথা?

—ও সব আমি এখন বলতে পারিনে। ও কথা আমার মনেই আসে না।

—মনে আসে না বলেই তো মনে করিয়ে দিচ্ছি, বিয়ের ব্যয় কি আর হয়নি? কবে বলতে পারবি তবে?

—সে কথা ত আমি বলতে পারিনে। তবে আমি নিজে যতদিন না ভাবি ততদিন তুমিও আমাকে জোর করে ভাবাবার চেষ্টা করো না।

ঈশ্বর দৃষ্টভাবে স্বর্ণময়ী কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, পরীক্ষাটা আগে হয়ে যাক, তখন চেষ্টা করি কি না করি দেখিস।

—এই বুজিই তো ভালো মা, সবুরে মেওয়া ফলে জানো না?

হাসিয়া চিন্ময় কথার মোড় ফিরাইয়া নিল। সে বাড়ীর যত খবর পাড়ার যত খবর একটি একটি করিয়া শুনিতে চাহিল।

স্বর্ণময়ী মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও নিরর্থক প্রশ্ন তুলিবার সুযোগ না পাইয়া চিন্ময়ের সহিত কথান্তরে যোগ দিলেন। সহসা চিন্ময় বলিল, মা পাড়ায় শুনলুম, অলির নাকি বিয়ে ঠিক হ’চ্ছে। কই তুমি তো আমাকে বলনি।

স্বর্ণময়ী কহিলেন, হচ্ছে কি হয়েছেই তো! তোকে তো বলবো বলবো করছিলুম, এই ২রা বোশেখেই দিন করেছে।

—কোথায় ঠিক হ'ল। পাত্র কেমন?

—ষষ্ঠীপুরে। পাত্রের বয়েস বেশী। ছেলে মেয়ে আছে। কিন্তু অবস্থা খুব ভালো। মস্ত বড় ব্যবসা আছে। অলি খেয়ে প'রে সুখে থাকবে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চিন্ময় কহিল, এর চেয়ে ভাল পাত্র পাওয়া গেল না?

—ভাল পাত্র খুঁজতে গেলে টাকা পরসা লাগে। পুলিশের চাকুরী করে ওর বাপ রোজগার ত কম করেনি। সব উড়িয়েছে। তাছাড়া ওদের বংশটাও বড় নীচু। ওদের পূর্ব পুরুষেরা অল্প ষায়গা থেকে এখানে এসে বসতি করেছিল। আমাদের সমাজের নয়। ও বাড়ীর ললিতের সঙ্গে একবার কথা হয়েছিল, তা ঐ জুড়েই তো হল না। আমাদেরই জাতি।

চিন্ময় চুপ করিয়া রহিল। স্বর্ণময়ী কহিলেন, তা এ কাজও কিছু মন্দ হবে না। খেয়ে পরে অলি রাজার হালে থাকবে।

চিন্ময় তথাপি কোন উত্তর দিল না। স্বর্ণময়ী আপন মনে কহিলেন, মেয়ে অত বড় ডাগর হ'য়েছে, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, বিয়েটা এখন ভালয় ভালয় হয়ে গেলেই বাঁচা যায়।

চিন্ময়ের জলযোগ অনেকক্ষণ শেষ হইয়াছে। কথায় কথায় বেলাও কম হয় নাই। হরি আসিয়া উচ্ছিষ্ট পাত্র লইয়া গেল। বলিয়া গেল, আনের জল দেওয়া হইয়াছে।

চিন্ময় কহিল, আমি আশ্র পুকুরে নাইতে যাবো। অনেক দিন ডুব দিয়ে চান করা হয়নি।

স্বর্ণময়ী সানন্দে সম্মতি দিলেন। তেল মাখিয়া তোয়ালে লইয়া পুকুর ঘাটে যাইতে যাইতে চিন্ময় ভাবিতে লাগিল, এ কেমন হইল? যাহাকে দশজনের চেয়ে শত গুণে ভাল মেয়ে বলিয়া জানিত তাহার বিবাহ হওয়াটাই এমন বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া গেল? এ বিবাহে অলকা কি সুখী হইতে পারিবে?

—পাঁচ—

স্বর্ণময়ী হুহু হইয়া গিয়াছেন।

দিনকয়েক পরে একদিন সকালে চিন্ময় তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, “কাল আমাকে বাড়ী থেকে যেতে হবে, আমার কাপড়গুলো ধোপা-বাড়ী থেকে এসেছে তো?”

স্বর্ণময়ী বলিলেন, “না, আসে নি। হরি খবর দিতে গেছে। এসে পড়বে। তা আর দিনকয়েক থাকবিনে বাছা? কলকাতায় যা গরম এ সময়।” একটু থামিয়া আবার বলিলেন, —“গাছের আমগুলো ভালো করে পাকলনা। ছোটো আমও তোর পাতে দিতে পারলুম না।.....তোর সেই বেল-সরবতি.....”

“না মা, আমার আর থাকবার ঘো নেই। থাকলেই পড়ার ক্ষতি। তুমি বোঝ না। আমি তুমি সরকার কাকাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।”

“অলির বিয়েটা দেখে ঘাবি নে? এইত এসে পড়েছে। পরশু ত গায়ে হলুদ। ওর মা বলছিল,.....”

“এইবার তুমি আমায় হাসালে মা।”

চিন্ময় মুহূ হাসিতে হাসিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল। স্বর্ণময়ী আর কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার জানা ছিল ছেলেবেলা হইতেই চিন্ময় যাহা একবার করিবে বলে তাহার উপর আর কোন কথা বলা নিষ্ফল।

নিমন্তক দ্বিপ্রহর। চিন্ময় তাহার নিজের ঘরে বসিয়া কলিকাতা যাত্রার জন্ত জিনিসপত্র গুছাইতেছে। সামনে স্ট্রটকেশ খোলা। একটা বইয়ের আলমারীরও পাল্লা খোলা। আজ তাহার মুখ কিছু গভীর। কোনও এক অন্ধকারময় অদূর ভবিষ্যতের ছায়া যেন তাহার চোখে মুখে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে।

কি একটু শব্দ শুনিয়া পিছনে চাহিয়া দেখে তত্তপোষের একধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে অলকা।

—অলি যে, কি খবর? কখন এলে? ব্যাপার কি? অমন চুপচাপ যে?

অলকা তথাপি কোন কথা কহিল না। চিন্ময় কহিল, ভালোই হ'ল, দাঁও তো আমার এগুলো একটু গুছিয়ে টুছিয়ে। আলমারীর বইগুলো ময়লা জমে যাচ্ছেতাই হয়ে

গেছে। আমি কাল যাচ্ছি কিনা! একটু পরিস্কার করে রেখে যাবো। —চিন্ময় তক্তপোষের আর একধারে গিয়া সটান শুইয়া পড়িল।

অলকার মুখে তবু কোনো কথা নাই। কোতুহলী হইয়া চিন্ময় আবার কহিল, অলি, তুমি এলে, কিন্তু মুখে কথা নেই কেন?

—কি আর বলবো? এই বইগুলো ফিরিয়ে দিতে এলাম। ক'দিন থেকে ভাবছি, তা' আসতেই পারছি।

—কি বই, ইংরিজি? পড়া হয়েছে?

—না, ইংরিজি সব দাগানো দাগানো পড়ে রয়েছে, ভাল করে বুঝতে পারিনি বলে পড়তে পারিনি।

—সত্যি নাকি? তা একদিন এলে তো অনেক কিছু জেনে নিতে পারতে। তা এবার তো তোমাকে প্রায় দেখতেই পাইনে।

অলকা একথারও কোন উত্তর দিল না। হাতের বই ক'খানা চিন্ময়ের সম্মুখে রাখিয়া দিল। চাহিয়া দেখিয়া চিন্ময় কহিল, তা আর কি চাই এই বাবে নিয়ে নাও।

—আর চাইনে। বাবা বারণ করেছেন ওসব বই পড়তে।

—বারণ করেছেন কেন? কি বলেছেন?

—বলেছেন, এসব বই পড়ে নাকি আজকালকার ছেলে মেয়েদের মাথা বিগড়ে যাচ্ছে।

চিন্ময় হাসিয়া উঠিল। বলিল—এই কথা? আমি আরো ভেবেছিলাম আমার এই বইয়ের আলমারীটা এবার তোমাকেই দিয়ে যাবো। ওর মধ্যে অনেক বই আছে। শরৎ বাবুর বইও আছে। যাও, তোমার কপালে নেই দেখছি।

—এই কি তোমার হাসির কথা হল চিন্ময়?

হাসিতে হাসিতে চিন্ময় কহিল,—হাসির কথা নয় তো কি? তোমার বুঝি খুব ভয় হয়েছে, মাথাটা বুঝি বিগড়েই গেল? তা একটা ডাক্তার কবরেজ দেখাও না, ঠিক আছে কি না?

—যাও, তোমার কেবল হাসি আর ঠাট্টা। সব সময় ভাল লাগে না।

—কেন? তোমার সময়টা আজ এত খারাপ হল কিসে? আমি ত দেখছি চমৎকার ছপু'র বেলা। একটু যা গরম। চুরি

করে আটার আমসত্ত্ব খাওয়ার বয়স তো আর নেই। না হলে তেমনি একটা কাজে ছুঁতনে লেগে যাওয়া যেত। কি বলো?

অলকা কোন কথা বলিল না। মুখ ভারী করিয়া বসিয়া রহিল। চিন্ময় কহিল, সত্যিই তুমি রাগ করছো নাকি? আচ্ছা, এইবার খুব গভীর ভাবে কথা বলবো, কি বলবো বলো? বই পড়ে মাথা বিগড়ে যায় একথা লোকে বলে কেন, এই ত? জানো অলি! স্বাধীন চিন্তা বলে একটা কথা আমাদের দেশের লোকে প্রায় তুলেই গেছে। প্রথমে অশিক্ষিত বাপ মা, তার পরে অন্ধ সমাজ, তার উপরে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ধরে বেঁধে যা শেখায়, তাই শেখে। জঘন্ঠ পরাধীনতার পেষণকে ভগবানের দেওয়া হুংখ মনে করে নিয়ে সাতজন্মে মুক্তির পথকে কেউ খুঁজে বের করা দরকার মনে করে না। বিদ্রোহী কবি লেখক ছ'একটি তখনই আসে এই বজ্র আগল ভাঙতে, মানুষকে চোখে আঁজুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে, যে আত্মপ্রদর্শিত পথই এক মাত্র সত্য পথ, ধরে বেঁধে শেখানো পথ নয়। ভালয় মন্দয় গড়া জীবনে স্বাধীন চিন্তার দাবী সংসারে প্রত্যেকেরই থাকা চাই, আর সেটা আনতে হয় নিজের জোরেই।

কোন বিদ্রোহী লেখকের কথায় লোকের প্রাণে যদি সাড়া জাগে, অশুভ মনের জাঘা দাবী দাওয়া সজাগ হ'য়ে ওঠে, তাকেই প্রাচীনপন্থীরা বলে মাথা খারাপ হওয়া। আসলে বহুদিনকার কোন পুরান অনিষ্টকারী সংস্কারের অচলায়তনকে ভাঙতে হলে, এইরূপ বেপরোয়া অস্ত্র চালানো দরকার। এই কথাটাই আধুনিক লেখকদের কলমে ফুটে উঠেছে। কিন্তু অলি, তোমার এত ভয় কিসের! তুমিত খুব লক্ষ্মী মেয়ে, সবার কথা শুনেই চল।

চিন্ময় আবার হাসিয়া উঠিল, এতগুলি কথার উত্তরে অলকা শুধু ছোট একটু উত্তর দিল, না আমার কি ভয়?

অলকা চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চিন্ময় কহিল, তাহলে বইগুলো তুমি নেবেনা বল।

—কেন, তোমার বই তুমি পড়বে না? আমাকে নিতে হবে তার মানে কি?

—মানে আর কি? আমি কাল চলে যাচ্ছি। তাছাড়া বাড়িতে ত প্রায় থাকিইনে। পোকার কেটে নষ্ট করবে, তার চেয়ে তুমি রাখতে।

অলকা ঘাড় ফিরাইয়া অগ্র দিকে চাহিয়া আশ্চর্যভাবে বলিল, চলে ত আমিও যাচ্ছি। তারপর চিন্ময়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, যাচ্ছো তাতে কি, আর কি আসবে না? একজামিন হয়ে গেলে ত একেবারেই আসবে।

অশ্রুমনস্কভাবে অনুচ্চ স্বরে চিন্ময় বলিল, তাইবা ঠিক কি? এতক্ষণে চিরকৌতুকপ্রিয় অলকার মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সে বলিল, কেন বিবাগী টিবাগী হবে নাকি? তেমনই উদাসভাবে চিন্ময় জবাব দিল, সে ত খুব সুখের কথা অলি; কেননা সে মাল্লুষের স্বাধীনতার একটা চরম অবস্থা। আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থাও আছে যাতে বাধ্য হয়ে বিবাগী হতে হয়।

—ও আবার কি কথা হ'ল? আমি ত কিছুই বুঝলুম না।

চিন্ময় কথাটি ফিরাইয়া কহিল, কিছু না, বাজে কথা থাক; তার পর অলি, তোমার নাকি বিয়ে হবে?

মুহুর্তের মধ্যে অলকার মুখের উপর এক বলক রক্ত উঠিয়া পরিক্ষণেই পাংশু বর্ণ হইয়া গেল। সে থানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যে কথা-সে বলিতে আসিয়া এতক্ষণ বলিতে পারে নাই, চিন্ময় তাহাই তুলিয়া তাহার বলার পথ সহজ করিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে তাহাকে ধন্যবাদ দিল। ধীরে

ধীরে কহিল, তুমি শুনেছো সব?

—শুনিনি আবার? একি না শুনবার কথা?

—শুনে তুমি খুব সুখী হয়েছ নিশ্চয়?

—হয়নি ত' কি? তোমার বিয়ে হবে, শ্বশুর বাড়ী যাবে, বরকন্না করবে, সুখের কথা নয়? আমি তো মনে করেছি ভাল করে একটা পইটি লিখবো।

চিন্ময় হাসিয়া উঠিল। অলকা কহিল, তা লিখো। কেমন সুন্দর বর হবে আমার, না? অলকা সহসা দাঁত দিয়া ওষ্ঠ চাপিয়া গুম হইয়া রহিল।

চিন্ময়ের অন্তর যদিও এই কথার সায় দিল না, তবু অলকাকে উৎসাহিত করিবার জন্তই সে কহিল, কেন মন্দ কিসে? বয়স বেশী? তা মনে করে নাও ঠিক শিবের মত। তুমি তো ছেলেবেলায় খুব শিবপূজো করত। একটু খামিয়া আবার কহিল, তা ছাড়া দেবতা যেমন দেবতাই, তার ভাল ছাড়া মন্দ হয় না; হিন্দুর মেয়ের বর ভেমন বরই, তার ভাল মন্দ বিচার করতে নেই।

সহসা অলকা উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, তবে যে এই মাত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিলে যে আশুপ্রদর্শিত পথই সব চেয়ে বড় এবং সত্য, ধরে বেঁধে শেখানো বস্তু বড় নয়। সে বুঝি কেবল পরকে বক্তৃতা দেবার বেলায়?

অলকা আজ প্রহেলিকার মত বলে কি? চিন্ময় অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। একি? অলকার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সে কাদিতেছে?

আশাস্বরূপ পাত্র না পাওয়ায় অলকা যে সুখী হইবে না এ সন্দেহ তাহার ছিল, একটু যে ব্যথার খোঁচা মনে লাগে নাই তাহাও নহে। কিন্তু এ বিয়ে যে অলকার একটা হৃৎকের কারণ হইবে তাহাও সে ভাবে নাই। অলকার নিজের বাপ মা বর্তমান থাকিতে—সংসারানভিজ চিন্ময়ের সেকথা ভাবিবার কিছু প্রয়োজন আছে বলিয়াও সে মনে করে নাই। কিন্তু আজ অলকার কথাবার্তা শুনিয়া তাহার অন্তর বিষয়ে দুঃখে ও করুণায় অভিভূত হইয়া পড়িল। সে-ভাবিয়া পাইল না কি বলিয়া তাহাকে শাস্তনা দিবে। তবু কিছু একটা বলিতে তো হইবে। সন্দেহে তাহার একখানি হাত ধরিয়া সে কহিল, অলি তুমি কঁাদছ? তোমার হয়েছে কি বল দেখি? একটু বুদ্ধি নেই! এত বড় হয়েছ তবু!

চিন্ময়ের সঙ্গের তিরস্কারে অলকার মনের ও অশ্রুর বাঁধ যেটুকু ছিল তাহাও ভাঙিয়া গেল। সে একেবারে তার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া চোখের জলে পা ভিজাইয়া দিতে দিতে কহিল, তুমি ছোটবেলা থেকে কেবল খেলা আর হাসি গল্পের সাথী করবে বলেই এত স্নেহ করেছিলে? আর কিছুর জেনোই না?

বজ্রাহতের মতই চিন্ময় স্তব্ধ ও নির্বাক হইয়া রহিল।

তাহার হাতের মুঠার মধ্যে অলকার হাত পড়িয়া রহিল শিথিল ভাবে।

অলকার মনের চিত্র চিন্ময়ের চোখে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু সে কি করিবে কি বলিবে কিছু মাত্র বুঝিতে না পারিয়া অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। নিজের অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়া সে খুঁজিয়া দেখিল, বাল্যাবধি অলকার প্রতি তাহার স্নেহ কিছু অত্যধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইলেও আদরের ছোট্ট বোনটি ছাড়া আর কোন ভাবেই তো সে তাহাকে দেখে নাই। সেখানে তো কেবল দেখিতে পায় শূন্যভারপূর্ণতা

মুক্তি পিয়াসী ক্রন্দনরত্না দেশেরই ছবি, শুনিতে পায় তাহারই জন্য কত ত্যাগ তিতিক্ষা আর কঠোর সঙ্কল্পের প্রেরণা, জাগিয়া উঠে কত গুরু দায়িত্বের চিন্তা। কিন্তু অলকা তাহাকে মনের তলায় সন্ধ্যাপনে—এমনি আসন দিয়া আসিয়াছে, একথা তো তাহার কল্পনাভীত। স্তব্ধ হইয়া চিন্ময় উপায় খুঁজিতে লাগিল।

একটা দমকা বাতাসে বাহিরের ছাতিশ গাছের একটা ডাল নড়িয়া উঠিয়া জানালায় গোটা দুই ঘা দিয়া ফিরিয়া গেল। ধ্যান ভাঙ্গার মত চিন্ময় ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, আকাশে কাল বৈশাখীর ঝড়ের সূচনা দেখা দিয়াছে। সমস্ত বনানী একটু একটু হুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। চিল শকুন প্রভৃতি বড় বড় পাখীগুলো স্বচ্ছর আকাশে সেই ঝড়ো হাওয়ায় ডানা বিস্তার করিয়া অদৃষ্টবাদীর মতই গা ভাসাইয়া বেড়াইতেছে। অলকার দিকে চাহিয়া দেখিল সেই এক ভাবেই সে মাথা নীচু করিয়া অশ্রুপাত করিতেছে।

চিন্ময় তাহার চোখের জল মুছিয়া দিতে দিতে স্নেহ করুণ অথচ দৃঢ় স্বরেই কহিল, অলি ওঠ, ওরকম অবস্থার মত কথা বলো না। দায়ে পড়ে যে কোন উপায়কে আঁকড়ে ধরা কি ভাল? জীবন নিয়ে কি খেলা চলে? তি ভাল করে বুঝে মনকে সাবুনা দাও।

আহত স্বরে অলকা কহিল, দায়ে তো আমি পড়েছিই। অবসরের অভাবে যে কথা এত দিন প্রকাশ করতে পারি নি, দায়ে না পড়লে সে কথা হয়ত কোন দিনই প্রকাশ হ'তো না। জানিনে ভগবান বাঙ্গালীর মেয়ের এই দায়ের পথ কবে থেকে মুক্ত করে দেবেন। বাবা মার দীর্ঘ্বাসে ভরা এ অভিশপ্ত জীবন আর বইতে ইচ্ছে হয় না। কেবলই মনে হয় জলে কিষা আশুনে ঝাঁপ দিয়ে এর সোজা মীমাংসা করে ফেলি। কিন্তু যার কাছে শিক্ষা পেয়ে যার আদর্শ নিয়ে এত বড় হয়ে উঠলাম, বিদায়ের আগে তার কাছে সব কথা খুলে বলে যাওয়া দরকার বলে মনে হয়েছে, তাই তোমাকে একবার আমার শেষ কথা জানিয়ে দিতে এসেছি।

চিন্ময় স্বপ্নাবিষ্টের মত অলকার সব কথা শুনি। এমন কত সদ্য প্রস্তুতি বনপুষ্পকে অকালে জলের তলায়

আগুণের কোলে আত্মসমর্পণ করিতে শুনিয়াছে। মনে মনে সে শিহরিয়া উঠিল। সমবেদনায় তাহার মন তরল হইয়া ছুটিল, তাহাকে আসন্ন দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করিতে। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিবে ভাবিয়া পাইল না। শুধু অকৃত্রিম সহন্যতার অভয় বাণী শুনাইতে গিয়া আবেগ ভরে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু অলি, এ তোমার অসদ্ব্যবহার অভিমান। আমাকে তুমি কতটুকু জানো?

অলকা চিন্ময়ের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। দেখিল মৌন করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতি অকাতরে তাহাকে সিক্ত করিতেছে! সলজ্জ দৃষ্টি চকিতে ফিরাইয়া লইয়া সে কহিল, আজন্ম তোমাকে দেখছি, আর তোমাকে জানিনে?

—আজন্ম দেখে আমার যেটুকু জেনেছো সে যদি আমার সব টুকু না হয়?

বাধা দিয়া অলকা কহিল, তার বেশী আমি আর কিছু জানতে চাইনে।

—তাই কি হয়? ও অসম্ভব কল্পনা মন থেকে মুছে ফেল অলকা! আমি তোমার বাবা মাকে ব'লে চেষ্টা করবো যাতে এ বিয়ে তোমার না হয়। আমি খুব চেষ্টা ক'রবো তুমি যাতে সংপাত্রেই—

ভীষণ ঝড়ের ঝাপটা আসিয়া ঘরে ছুয়ারে গাছ পালায় ছলছল লাগাইয়া দিল। বাহির হইতে মা চেঁচাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, চিল্ল কি এখনও ঘুমোচ্ছিস! ঝড় উঠেছে যে। জানলাগুলো বন্ধ কর।

তাড়াতাড়ি অলকাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া চিন্ময় কহিল, অলি, অলি, শীগগির বাড়ী যাও।

সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিমানীহত দীপ্ত স্বরে অলকা কহিল, তা যাচ্ছি চিল্লদা, কিন্তু এ যাওয়া আমার শুধু ভোমার কাছ থেকেই নয়; সবার কাছ থেকেই যেন শেষ যাওয়া হয়। তোমার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলতে হ'লে এ সংসার থেকে নিজেকে আগে মুছে ফেলা দরকার। অলকা ছুটিয়া খিড়কির পথে বাহির হইয়া গেল। চিন্ময় দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া অনেকটা বিভ্রান্তের মত খাটের প্রান্তে বসিয়া পড়িল।

মাসীমার পত্রালাপ

শ্রীহিমাংশু বাল্য ভাড়াড়ী

ছেলে মেয়েরা আমার,—

তোমাদের অহুযোগ, অভিযোগ ও অভিমানপূর্ণ পত্রাদি পাচ্ছি। পত্রালাপ চালাবার মত উৎসাহ আমার ভেতর কমে এসেছে, কিন্তু তোমাদের জন্ত চিন্তা আজও আমার থাকেনি। “পরাদীনতা ও স্বাধীনতা” লইয়া তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়া তোমরা এমন একটা বাকবিতণ্ডায় আসিয়া পৌঁছিয়াছ যে আমার ভালই লাগে না। তোমাদের কথা-মতই “পরাদীনতা” দিয়া পত্রারম্ভ করিয়া “স্বাধীনতা” পৌঁছিতে চেষ্টা করিব।

শিশুকাল হ’তে মানুষ যে আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক বেটনীর ভিতর বদ্ধিত হইয়া উঠে, যে সব কথা শুনিয়া বা যে সব কার্য কলাপ দেখিয়া তাহার কান ও মন অভ্যস্ত হইয়া থাকে তাহার প্রভাব এতই মজাগত হইয়া পড়ে যে বড় হইয়াও অনেকে নিজ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিয়া অত ভাবে ভাবিতে শেখে না।

পরাদীনতার যুগের কথা—আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা, সাধারণতঃ নিজ বাড়ীর সকলের আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়া ও তাহাদের দৈনিক খবরের কাগজ পাঠের মধ্য দিয়া বুঝিতে শেখে যে তাহারা “পরাদীন।” বৈঠকখানা ঘরে অথবা বাড়ীর বাহিরের বারান্দায় বসিয়া গুরুজনদের সহিত প্রতিবেশীদের যখন জোর তর্ক চলে তাহার ফাঁকে শিশুদের বেশী করিয়া শুনিবার সুযোগ হয় যে তাহারা শুধুই যে পরাদীন তাহা নয়, তাহারা জাতি হিসাবেও অতি অপদার্থ।

সাগর পারের যে খেতাব বিদেশী দ্বারা আমাদের দেশ শাসিত হয়, সে বিদেশীর সহিত আমাদের ভাষাগত, ধর্মগত এতটুকু সামঞ্জস্য নাই। তথাপি তাহাদের স্বত্ব স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা যোল আনা পূর্ণ করিবার জন্ত আমরা নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছি, ব্যবসা বাণিজ্য পরের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজেরা চাকুরীজীবী হইতে শিখিয়াছি। বিদেশী দ্বারা

পরিচালিত হইয়া জগৎ সমক্ষে আমরা অমানুষ হইয়া বাঁচিয়া আছি—কারণ আমরা যে পরাদীন।

এই সব ধরণের বাক্যালাপ শুনিয়াই ছোট শিশুটা নিজ পরিবারের গভীর ভিতরেই বদ্ধিত হইয়া কৈশোর কাল উত্তীর্ণ করিয়া-দিবার মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তারপর হঠাৎ কোন এক অদৃশ্য শক্তির মায়ী কাঠির স্পর্শে শিশু কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে পৌঁছিয়া জানিতে চায় এই বিরাট বিস্তীর্ণ পৃথিবীর বুকে ভারতের স্থান কোথায়? বিশ্বের দরবারে তাহার নিজ জাতির আসনটুকু কোথায় পড়িয়াছে? ঘরের গভীর শিশু বাহিরে আসিয়া বুদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করে—“আমরা কাহারা? আমরা কি সেই আৰ্য জাতি? আমরা কি হিন্দু বলিয়া গর্ব করিবার উপযুক্ত?”

তারপর দেখি যুবোচিত প্রেরণায় কিছুদিন খুব ছুটাছুটি বকাবকি, দেশ উদ্ধারের জন্ত সে কি উন্মাদনা! সে কয়টা বৎসর একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় কল্লনার জালে বক্তৃতার চীৎকারে কলমের জাঁচড়ে অথবা বিপ্লববাদীদের চিন্তায় ও গোপন কার্য কলাপে দেশ আমাদের উদ্ধারও হইয়া যায়। কিন্তু কলেজের গভী পাঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই উৎসাহ-দীপ্ত কর্মী যুবককে দেখিতে পাই অন্তরূপে। সেই প্রাণের সজীবতায় ভরা ছেলেটাই—পরিবারের ও দেশের অর্থদমস্যার চাপে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া, উৎকট প্রতিযোগিতায় টিকিয়া চাকুরী বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে উদয়াস্ত খাটিয়া—প্রোঢ় হইবার বহু পূর্বেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া জীবন সাংগ্ৰহে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অতীতের স্মৃতিতে জমিয়া থাকে তাহার দেশোদ্ধারের চিন্তা, আর বংশপরম্পরা শোনে ঐ একই কথা—আমরা পরাদীন।

এত সব প্রতিকূল অবস্থার ভিতর প্রতিপালিত হইয়া ও নানা ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও যে সব দেশ-নেতা

স্বাধীনতার উৎসাহ বাণী প্রচার করেন, এবং আমাদের মনের সুপ্ত তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া আমাদের মন স্বাধীনতার চিন্তায় জাগ্রত করিয়া তোলেন তাঁহারা আমার নমস্কার।

তোমাদের তরুণ দলের সহিত মিশিয়াই যে জানিলাম আমরা স্বাধীনতাহীন তাহা নয়। নিজ জীবনস্বত্বিতে দৃষ্টি ফিরাইলে দেখিতে পাই তোমাদের মত, আমিও শিশু বয়স হইতে শুনিয়া আসিয়াছি—“আমরা পরাধীন”। আমি আমার কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার পৌছিয়াও এ নিরাশ মনে মনে যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছি, দেশ হইতে দেশান্তরে গিয়াছি, মনকে কত প্রকারে প্রশ্রয় করিয়াছি, কিন্তু পরাধীনতা বিষয়ে সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যাহা হইতে বিচ্যুত হইবার কারণ আজও ঘটে নাই।

গগনচুম্বী সৌধমালা পরিবৃত জনকোলাহল মুখর কলিকাতা নগরীতে ছাতে কত সন্ধ্যা একাকী বসিয়া ভাবিয়াছি “আমরা বড় পরাধীন” উপরে অগণ্য নক্ষত্র খচিত চন্দ্র বিভূষিত অসীম নীলাকাশের তলে তাঁবুতে বাস করিয়া কত বিনিম্র রজনী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কাটাইয়াছি, আর সেই সন্ধ্যে নিজ মনেই বহুবার প্রশ্ন করিয়াছি, “বিদেশী দ্বারা শাসিত বলিয়াই কি আমরা সত্য করিয়া পরাধীন?”

পুরী গিয়াছি, পাঁবনা রাজসাহী বাস করিয়াছি—সেখানে গর্জনকারী বিরাট সিন্ধুর প্রতি চাহিয়া হুকুলপাবনী পদ্মার প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া কত প্রাতঃ সন্ধ্যা, কত গভীর রজনী নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়াছি—আর পরাধীনতার বিষয়ে ভাবিয়াছি।

আমার শিশুবয়সের বাধাহীন স্বাধীনতার রাজ্য দার্জিলিঙে গেলাম। সেখানে গিয়া কতদিন একাকী বসিয়া থাকিয়া শুভ্র কিরীট শোভিত তুহার মণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া বিরাট হিমালয়কে উদ্দেশ্য করিয়া পরাধীনতা স্বাধীনতা লইয়া পুনঃ পুনঃ একই প্রশ্ন করিয়াছি ও নিজ মনের নিকট হইতে সেই একই উত্তর পাইতেছি।

দিনের পর দিন ফিরাইয়া ফিরাইয়া নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি—“পরাধীন বলিতে আমরা কি বুঝি, ও আমাদের সত্যকার পরাধীনতা কোথায়? পরাধীন আমরা বিদেশীর কাছে, না নিজের মনের নিকটে? আমরা যদি পরাধীন, তবে স্বাধীন কাহার? নিজ মনের নিকট যে উত্তর পাইলাম,

তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে স্বাধীন আমরা কেহই নই। আমিও নই, তোমরাও নও, তোমাদের দুঃস্বপ্ন পরাক্রমশালী শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাও নন। স্বাধীন তোমরা কাহাকে বল? শ্বেচ্ছাচারিতাই কি স্বাধীনতা? তোমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়া বিদেশী রাজ্য শাসন করিতেছে। তোমাদের সুখের জন্য নয়, তাহাদের সুবিধার জন্য। ইহা সত্য কথা—কিন্তু দেশীয় শাসকের দিকে মুখ ফিরাইলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেশের রাজা, মহারাজা, ধনী জমিদার দ্বারা শাসিত প্রজারা কি আরো বেশী পরাধীন নয়? ইহা সত্য সব ধনী জমিদারই কিছু প্রদাপীড়ক নন, প্রজারঙ্গক মুষ্টিমেয় ধনী জমিদারও আছেন—তাঁহারা আজও আদর্শ-স্থানীয়, কিন্তু অধিকাংশ দেশীয় শাসকদের আমরা কিভাবে পাই? শাসনদণ্ড হাতে নিয়া প্রজাপালন করিতে কৃষ্ণাঙ্গ দেশীয় জমিদার—ও শ্বেতাঙ্গ বিদেশীয় ইংরাজে খুব বেশী প্রভেদ আছে কি?

আমার জীবনের অনেকগুলি বৎসরই ইউরোপের নানা দেশে কাটিয়াছে ও সে সময়ের ভিতর আমার দেশের, আমার ভারতবর্ষের অনেক মহারাজা, ধনী জমিদারের ইয়োরোপে যাতায়াত দেখিবার সুযোগ সুবিধা আমার হইয়াছিল। সে সময় তাহাদের সহিত বিদেশী শাসকের তুলনা করিয়া সত্যই চোখে আমার জল আসিয়াছে। দরিদ্র প্রজাকে শোষণ করিয়া দেশীয় রাজা বিদেশে অর্থের যে কি প্রকার অপব্যবহার করেন তাহা যে নিজে না দেখিয়াছে সে অল্পমানও করিতে পারিবে না।

এমনও রাজা জমিদার আছেন, যাহারা অন্যায়ভাবে প্রজার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা নিঃশেষে শেষ করিবার জন্য যান ইয়োরোপের জোলা হাওয়ায় হারাইয়া যাইতে। স্বাধীন দেশে গিয়া পরাধীনতার জাত টাকার ছিনিমিমি খেলিয়া আসে। অর্থ সম্পদে পুষ্ট বণিক জাতির ধন ভাণ্ডার বেশী করিয়া পূর্ণ করিয়া দেয়—বোধহয় মনে কখনও উদয় হয় না অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষায় হীন নিম্ন দরিদ্র প্রজার উন্নতি কিভাবে হইতে পারে। ধনী যদি তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল খেয়াল চরিতার্থ করিয়াও প্রজা শোষণ হইতে প্রাপ্ত অর্থের কিয়ৎ অংশও দেশের ভিতর ব্যয় করিতেন, তবে আজ অর্থ সমস্যা এমন প্রকটভাবে

ভারতে প্রভাব বিস্তার করিত না। তাঁহারা যদি দেশীয় কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান গঠিত করিতে সচেষ্ট হইতেন, তবে তথায় তাঁহারাষ্ট প্রজা নিজেদের শ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারা ধনী হইতে পারিত, চাষ আবাদ উৎসাহ প্রাপ্ত হইত; ধনী রাজা জমীদার ততোধিক ধনী হইতেন—দেশের অন্ন বস্ত্র সমস্যার সমাধান কিছুটা ত হইত। বিদেশী শাসক ভারত শোষণ করিয়া লণ্ডন, লিভারপুল, মাল্কেষ্টার গড়িয়াছে; আর দেশীয় শাসক দরিদ্র প্রজা পেষণ করিয়া—নিজ দেশের জন্য ভাবেন না, নিজেদের লণ্ডন, মাল্কেষ্টার করেন না—বিদেশী শাসকের দেশকেই ধনী করিয়া দিয়া আসেন। স্বদেশবাসী রাজা প্রজাতেই যদি আন্তরিক অহুত্বের এতখানি ব্যবধান, তবে বিদেশবাসী বিধর্মী রাজার নিকট হইতে স্বাধীনতা পাইবার আশা করা সম্ভব হইবে কি?

এখন প্রসঙ্গান্তরে ফিরিয়া যাই—স্বাধীনতার কথা বলা যাক। তোমরা শৈশব কৈশোর উত্তীর্ণ করিয়া, সবে মাত্র তরুণ জীবনের উৎসাহ, উদ্বীপনাময় নূতন জীবনের উষ্ম পাইয়াছ। রক্ত তোমাদের চকল, চিস্তার স্রষ্টাঙ্গল ধারা এখনও অনায়াস। ভবিষ্যৎ তোমাদের কল্পনার উজ্জ্বল শিখায় দীপ্ত। যে দিকেই দৃষ্টি ফিরাও সবেতেই দেখিতে পাওয়া উচিত স্মরণ আলো। তবে পরাধীনতা বোধ যাইতেছে না কেন? এখন তোমরা স্বাধীন হইয়াছ; বিদেশী রাজ সত্যই তাহার প্রভুত্ব তাগ করিয়া রাজ্য শাসনভার ভারতীয়দের হস্তে প্রদান করিয়া, বানপ্রস্থ অবলম্বনে বনে না গিয়া সম্পূর্ণ ভোগ বাসনা লইয়া লণ্ডনের বাকিংহাম প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখ—সত্যই কি স্বাধীন হইতে পারিয়াছ?

আমিও দেখিতেছি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্য্য সমস্ত রিপুগুণিহ আজও প্রবলভাবে তোমাদের স্বন্ধে চাপিয়া আছে। স্বাধীন হইতে পারিলে কৈ? প্রবল পরাক্রমশালী প্রভুর দাসত্ব করিয়াও বলিতেছ তোমরা স্বাধীন?

কাম—তোমাদের অধর্ম্মের পথে টানিয়া লইতেছে।

ক্রোধ—তোমাদের কর্তব্যাকর্তব্য লোপ করিতেছে।

লোভ—তোমাদের দেশজ্রোহী, স্বজাতিজ্রোহী, জাভুজ্রোহী করিতেছে।

মোহ—তোমাদের বিবেক বুদ্ধি লোপ করিতেছে।

মাৎস্যর্য্য—তোমাদের এমনই পশুর অধম হেয় করিয়া তুলিতেছে যে তোমরা কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পার না। প্রতিবেশীর স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতা দেখিলে তীব্র জালা অহুভব করিয়া নিজ মনের শান্তি নষ্ট করিয়া ফেল। এই এতগুলি প্রভুর একটীরও বিরুদ্ধে চলিয়া কি নিজমত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে? অথচ তোমরা স্বাধীন, কথায় কথায় স্বাধীনতার বড়াই কর।

উপরোক্ত প্রভুগুণি ব্যতীতও অসংখ্য অনেকগুলি প্রভুর সহিত আমাদের পরিচয় আছে। তাহাদের ভিতর হইতে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি। “পোষাক পরিচ্ছদ” “যানবাহন” এই প্রকারের কত নাম করিব? ইহার ভিতর কোনটা তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার না করিতেছে? কাপাকে অমাত্র করিয়া, কোন প্রভুর শাসন না মানিয়া চলিতে পার? পোষাক পরিচ্ছদের গোলামী করিয়া তোমরা এমন নিঃস্বতা হারাইয়াছ যে বিদেশী পরিচ্ছদের একটা দুর্ব্বহ বোকা পরিধান করিতে আজও ভালবাস। অফিস, কাছারীতে প্রয়োজনের জন্য যে পোষাক পরিধান করিতে হয় তাহা ধর্ম্মবোধ্য মধ্যে নহে; কিন্তু নিজের বাড়ীতে, অথবা রাস্তা ঘাটে যাতায়াতে শোভন নিজস্ব কোন বস্ত্রাদি অনেকেই ত ব্যবহার কর না। বাঙ্গালী ছেলে তোমরা স্বাধীনতা পাইয়াছ, নিম্প্রয়োজনে তোমাদের অনেকেই ত দেখিতেছি আজও সাহেবের হাট, প্যান্ট, কোট, টাই অঙ্গের আভরণ করিয়াছ। মেয়েরা অনেকে বাঙ্গালী মেয়ের স্রী ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন শাড়ী ছাড়িয়া পাঞ্জাবী মেয়ের সালোয়ার কামিজ ধরিয়াছ, অথচ দেহটা আবরণ করিতে উড়ানী নিতে তুলিয়াছ।

ফ্যাশিনারী বা মাঠের কাজে প্যান্ট কোট কাছোপযোগী করিয়া ব্যবহার করিলে তাহার আবশ্যকতা আছে। বস্ত্র সমস্যার দিনে ধূতির তুলনায় প্যান্ট টেকসই, কাজেরও সুবিধা হয়। কিন্তু নেহাৎ ফ্যাশানের জন্য স্বাধীনতার প্রারম্ভে বিদেশী পোষাক দৃষ্টিকটু এবং গরমের দিনে কষ্টকর বোঝা নহে কি?

বাংলার সমতল ভূমিতে বাঙ্গালী মেয়ের শাড়ী ছাড়িয়া পাঞ্জামা পরিবার দিন আসিয়াছে কিনা ভাবিবার কথা। ঘরে ও বাহিরে স্কুল ও কলেজে বাংলা দেশে শাড়ী পরিয়া সব কাজই করা যায়। পাশ্চাত্য দেশে যাহারা ঘুরিয়া

আসিয়াছেন তাঁহারই জানেন সে দেশে শাড়ীর কত আদর—
শাড়ীপরিহিতা দেশী মেয়েকে কত বেশী সৌষ্ঠবযুক্ত দেখায়।
যুদ্ধক্ষেত্রে, অথবা অস্বাভাবিক শাড়ী ছাড়িয়া সালাওয়ার যে
প্রয়োজনীয় তাহা অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু দৈনন্দিন জীবন যাত্রায়
শাড়ীপরিহিতা বাঙ্গালী কন্যাকে যত সুশ্রী দেখায় অন্য
প্রদেশীয় পরিচ্ছদে তাহাকে ত তেমন লাগাময়ী কৈ মনে
হয় না। এ সব দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা এখন
স্বাধীন হইয়াছ, না ক্রমশঃ পরাধীনতায় বেশী জড়াইয়া
পড়িয়াছ ?

অপর দিকে, যান বাহনকে মুনিব বানাইয়া তোমরা
ক্রমশঃই যে তাহাদের গোলাম হইতে চলিয়াছ। জগদীশ্বর
পদদ্বয় দিয়াছেন অক্লেশে বাতায়ত করিবার জন্য; কিন্তু
পায়ের যথার্থ ব্যবহারে যে স্বচ্ছন্দ গতিবিধি তাহা নাগরিক
জীবনে সবাই ভুলিতে বসিয়াছে। গমনাগমনে তোমরা
ট্রাম বাসের অধীন; ট্রাম, বাস, গাড়ীকে অধীন রাখিতে পার
নাই; বরং যান বাহনকে প্রভু বানাইয়া নিজেদের স্বাধীনতা
হারাইয়াছ। এমন যে শত প্রকারে শত দিকে পরাধীন
তোমরা, সে তোমরা স্বাধীন হইয়াছ বলিয়া চীৎকার করিবে
কি ?

তোমরা লাভের ইচ্ছাতে চল, লোভের বশে অকাঙ্ক্ষার
অনুষ্ঠান কর, মানের আশায় সুহৃদের মনে দাগ দাও।
শাভের আশা, লোভের কুহক, মানের আশঙ্কা তোমাদের
শত্ৰুকার স্বাধীন হইতে দেয় কৈ ? যশ বল, খ্যাতি বল,
প্রতিপত্তি বল, সবাই তোমাদের প্রভু, সবাই তোমাদের কার্ধ্যের
নিয়ন্তা। তোমাদের সঞ্চিত যশ পাছে মলিন হয়, এই ভয়ে
তোমরা সতত চিন্তিত। ভবিষ্যতে বাহাতে যশ বৃদ্ধি পায় সে
জন্য তোমরা সংকার্ধ্যের অনুষ্ঠান কর। সাধ্যমত কর্তব্য কাজ
করিয়া যাইব, যশ, অযশ কিছুই দেখিব না, এই ভাবের চিন্তা
হইয়া তোমাদের ভিতর কয়জন আন্তরিক ভাবে কাজ করিয়া
থাকে ?

শশকে সংকার্ধ্যের অনুষ্ঠান না হইতে দিয়া প্রভু করিয়া তোল।
তোমরা দান কর মানের জন্য। ষাগ কর যশের জন্য।
পরোপকার কর সুখ্যাতির জন্য। দান, ষাগ, পরোপকার
তাহা কিছু কর, ধর্ম রক্ষা, বা ধর্ম সংস্থাপনের জন্য নয়।
তোমাদের প্রত্যেক কার্ধ্যই একটা না একটা দাসত্ব ঘোষণা
করিতেছে। দাসের মুখে প্রভুত্বের বড়াই ভাল শোনায় না।

তোমরা অল্পের জন্য কৃষকের অধীন, বস্ত্রের জন্য তাঁতীর
অধীন, ধর্মের জন্য পুরোহিতের অধীন। আহা, বিহারে
পোষাকপরিচ্ছদে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, তোমরা সম্পূর্ণ
পরাধীন। এত সব পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাহারা বাধা,
তাহাদের মুখে স্বাধীনতার অহঙ্কার নিতান্তই অশোভন।

পূর্বে কেবলই শূন্যতাম, বিদেশী দ্বারা ভারতবর্ষ শাসিত
শোষিত হয়, তাই ভারতবাসীর বড়ই দুঃখ, তাহারা বড়ই
পরাধীন। সে সময় আমি বলিয়াছিলাম জগতের প্রায় কেহই
স্বাধীন নন। তোমরাও নও, তোমাদের পরাক্রমশালী
শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাও নন। তখন তোমরা অসন্তুষ্ট হইয়া
বলিয়াছিলে বিদেশী শাসক চলিয়া গেলেই তোমরা সত্যকার
স্বাধীন হইবে; কিন্তু জিজ্ঞাস্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুকে তাড়াইয়া
নিজেরা কি নিজ রিপু ও অভ্যাস সমূহের উপর প্রভুত্ব করিয়া
স্বাধীন হইতে পারিয়াছ ?

সিকি শতাব্দীর পূর্বে বিশ্বব্যাপী এক ঘটনায় ফিরিয়া
যাই। তোমরা অনেকেই হয়ত তখন এ পৃথিবীর রক্ষমকে
আবির্ভূত হও নাই। এমন সময় প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়।
আজ বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় যুদ্ধ খামিয়াছে, হয়ত তৃতীয় মহাযুদ্ধের
সূচনা করিবার জন্যই। এ বিরাট সংগ্রাম ক্ষুধা কবে যে মানব
মন হইতে অন্তহিত হইয়া, যুদ্ধ সমাপ্তির দাঁড়ি টানিয়া পৃথিবী-
বাসীকেশান্তিতে থাকিতে দিবে, তাহা আজও ভবিষ্যতের
গর্ভে নিহিত আছে। আমার বালিকা বয়সে যে প্রথম
মহাযুদ্ধটা হইয়া গেল তাহা নাকি মানবজাতির স্বাধীনতা রক্ষার
জন্যই। স্বাধীনতার নাম নিয়া, ছদ্মবেশে ইহা যে কত বড়
অধীনতার সময় ছিল শিক্ষিত তোমরা একটু স্থির চিত্তে
ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে।

তখনকার জার্মানী অমিত বলের গৌরবে, উন্নতির উৎকর্ষ
অভিলাষে, লোভের দারুণ প্রলোভনে ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ
করিয়াছিল। অন্যান্য জাতি স্বার্থরক্ষা, ভবিষ্যতে স্বার্থবৃদ্ধি
ও আংশিক স্বাধীনতার প্রয়োচনায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।
জাতির দেশ ও স্বাধীনতা বজায় রাখাই যদি যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য
হইত, তবে সন্ধি সভায় অতগুলি জটিল প্রশ্ন আবির্ভূত হইবার
সুযোগ ঘটত না। নিরপেক্ষভাবে সমস্ত বিষয়টা পর্যালোচনা
করিলে সংক্ষিপ্তসার এই—একদিকে জার্মানীও স্বাধীন নহে,
তাহার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত জাতিগণও স্বাধীন নহে।

সকলেই বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তির দাস, এবং সেই দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই দাসেরা সব পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল। স্বাধীনতা রক্ষার উচ্চ নিনাদ কেবল স্বাধীনতা নাশ, স্বাধীনতা হ্রাস, বঞ্চনা, প্রতারণা ও অসত্যবাদিতার জয় ঘোষণা।

মুখে আমরা যাহাই বলি না কেন, একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি, সাম্যাদিক সামাজিক আমরা কেহই স্বাধীন হইতে পারি না। অনন্ত প্রবৃত্তির দাস, অসংখ্য অভাবের দাস মানব সংসার সমাজে বাস করিয়া স্বাধীন হইবে কি প্রকারে?

যাঁহার মনকে স্বাধীনতা লাভের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা প্রবল ভাবে পৌড়ন করে, তিনি নানা বাধা বিপত্তির ভিতরেও স্বাধীনতা লাভের জন্য দৃঢ়চিত্তে সাধনা করেন ও যথা সময়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। যাঁহার অন্য সব অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া পরমাত্মার অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত স্বাধীন। সত্যকার স্বাধীনতা ভারতের এক শ্রেণীর মানব অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কতিপয় সাধক আজও আছেন। এই সে দিনও হরিদ্বার গিয়া বদরিকাশ্রমের পথে তাঁহাদের কয়েকজনের দর্শন পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এ স্বাধীন শ্রেণী ত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। অবশ্য শুধু গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিলেই কেহ কিছু সন্ন্যাসী হইতে পারে না। অল্পপুঙ্ক্ত ব্যক্তির গৈরিক বস্ত্র ব্যবহারে গেকুয়া ও সন্ন্যাসী উভয়েকেই অবনত করা হয়। সত্যকার স্বাধীনতা যাঁহার অর্জন করিয়াছেন তাঁহারা কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত নন। কোনও প্রকার আসক্তির দাস নহেন। তাঁহারা পৃথিবীর কাম্য সর্ব প্রকার ভোগ বিলাস হইতে মুক্ত। দৈহিক কোনও প্রকার প্রবৃত্তি তাঁহাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয় না। শোক, তাপ, দুঃখ, ভয় দুর্দমনীয় ত্রিগু সমূহ কেহই তাঁহাদের প্রভু নহে, বরং তাঁহারা সমস্ত প্রবৃত্তি নিচয়ের প্রভু। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এ সব কিছুই তাঁহাদের মুগ্ধও করিতে পারেনা, ক্ষুব্ধও করেনা। তাঁহারা সমস্ত বন্ধন সমস্ত অধীনতার অতীত। পরাধীনতা যে অনন্ত দুঃখের মূল এ তত্ত্ব সত্যকার সন্ন্যাসী সম্প্রদায় যেমন বুঝিয়াছেন এমন আর কেহই অনুভব

করেন নাই। স্বাধীনতার কথা বলিতে গেলে সন্ন্যাসীদের কাণ্ডে স্বাধীনতা দেখিতে ও শিখিতে হয়।

এ সব সাধকদের খুঁজিবার জন্য লোটা কল্ল মঞ্চল করিয়া হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে কনখলের পথে বা বদরিকাশ্রমের দিকে পা বাড়াইতে হইবে না। অথবা পড়াশোনা সংসারাত্মক ত্যাগ করিয়া পথে বিপথে বিচরণ করিতে হইবে না, এবং গুহা গহ্বরে গিয়া বাস করিবারও প্রয়োজন নাই। স্বাধীন, অষ্টকর্মী সাধু আজিও আছেন, যাহারা সত্যকার স্বাধীনতা শিক্ষা দিবার জন্য, সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবার কথা বলিবার জন্য কোন না কোন সময়ে আমাদের নিকটে বিভিন্ন রূপে আসেন। আমরা নিজেদের মনের নিকট পরাধীন ও অাবদ্ধ থাকায় তাঁহাদের চিনিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিতে পারি না। আমরা গ্রহণোপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারাও অবাচিত ভাবে স্বাধীনতার আনন্দ আমাদের দিতে পারেন না। সাধনায় সিদ্ধ হইলে সত্যই স্বাধীনতা মিলিবে। সে স্বাধীনতায় চরম ভোগের ভিতরেও একান্ত ত্যাগ, গভীর শোকেও পরম সুখ, বাহিরের সর্বপ্রকার অধীনতার আবদ্ধ থাকিয়াও ভিতরে নিবিড় আনন্দ সবই পাওয়া যায়। কৰ্ম জগৎ ছাড়িতে হইবে না, শুধু পরাধীন জগৎকে স্বাধীন করিবার মন্ত্রও পছটুকু শিখিতে হইবে।

সত্যকার স্বাধীনতা একমাত্র ভারতবাসীই পৃথিবীকে দান করিতে পারে। ভারতবাসীর অস্থি মজ্জার সহিত স্বাধীনতার মন্ত্র ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। পাশ্চাত্যের অনেক চিন্তাশীল মনীষীরা ভারতের নিকট হইতে সাম্যবাদ ও স্বাধীনতার বাণী শুনিবার জন্য ভিতরে ভিতরে উৎসুক প্রতীক্ষায় আছেন। সাম্যবাদ শিখিবার জন্য আমাদের রাশিয়ার দিকে মুখ ফিরাইবার প্রয়োজন নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও মহাভারত রামায়ণের মধ্য দিয়া যে তত্ত্ব শিখিতে পারিবে, সে সাম্যবাদ, সে স্বাধীনতার তত্ত্ব পৃথিবীর আর কোনও জাতি আজও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—তাই পাশ্চাত্য আজ প্রকাশ্যে নয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রাচ্যের নিকট হইতে স্বাধীনতার বাণী শুনিতে ব্যাকুল।

তোমরা কর্মীর দল প্রকৃত সাধক হও, প্রকৃত স্বাধীনতা সম্পদ অশান্ত পৃথিবীতে বটন করিয়া মল্লম্বা জাতিতে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে চেষ্টিত হও।

তোমাদের জন্য আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাইয়া “পরাধীনতা স্বাধীনতা” গ্রন্থে অন্য সমাপ্তির দাঁড়ি টানিয়া দিলাম।

মাসীমা।

শ্রীমতী সুভদ্রাকুমারী চৌহানের রাষ্ট্রীয় কবিতা

প্রোফেসার কমলা দেবী গার্গ

“বুঢ়ে ভারতমে ভী আই ফির সে নই জওয়ানী থী”
(বুঢ় ভারতেও আবার নূতন যৌবনের সঞ্চার হল)। রাষ্ট্রীয়তার
রঙে ভারতও রঞ্জিত হল। স্বাধীনতা পাবার জন্ত জীবনের
খোঁজকা জলে উঠল। শ্রীমতী সুভদ্রা প্রাণ করলেন,

ভূষণ অথবা চন্দ নহী
বিজলী ভর দে ওরাহ ছন্দ নহী
হয় কলম বঁধী স্বচ্ছ দন্দ নহী
ফির হামে বতাওয়ে কোঁন হস্ত
বীরোঁ কা কইনা হো বসন্ত ?
(বীরোঁ কা বসন্ত)

(ভূষণ কবি শিবাজীর রাজকবি ছিলেন এবং চন্দ বরদাই
পৃথ্বীরাজ চৌহানের রাজকবি ছিলেন। কবিত্রী বলছেন
যে ভূষণ এবং চন্দ কবি আর নাই, এমন ছন্দও নাই যে মনে
বিদ্রোহের মত উৎসাহ সঞ্চার করে, লেখনী যেন বন্ধনে বেঁধে
গেছে, স্বচ্ছন্দ গতি তার নাই। তবে হায় আমাদের কে
বলে দেবে যে বীরদের বসন্ত ঋতু কেমন করে হয় ?

তিনি কৃষ্ণকে রাথী (শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাকে রক্ষা
বন্ধন বলে। সেদিন বোন ভাইএর হাতে রেশমের কঙ্কণ বেঁধে
দেয় এবং ভাই নিজের বোনকে রক্ষা করার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
হয়) পাঠাচ্ছেন—

“ভইয়া কৃষ্ণ ! ভেজন্তী হুঁ মৈ
রাথী অপনী, য়হ লো আজ
কই বার মিসকো ভেজা হয়
সজা সজা কর নূতন সাজ।
লো লাও ভুজদণ্ড উঠাও
ইস রাথী মে বঁধ যাও
ভারতভূমি কী রজভূমি কো
একবার ফির দিখলাও

দেখো ভইয়া ভেজ রহী হুঁ
তুমকো তুমকো রাথী আজ
সাথী রাজসীহান বনাকর
রথ লেনা রাথী কী লাজ।

* * *
বোলো সচ্ সমঝ কর বোলো,
ক্যা রাথী বাঁধওয়াওগে ?
* * *
যদি হাঁ তো য়হ লো মেরী
ইস রাথী কো স্বীকার করো

দাদা কৃষ্ণ ! আমার রাথী পাঠাচ্ছি, এটি নাও আজ।
একে কতবার নূতন করে সাজিয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছি। এস
নিজের ভুজদণ্ড তোলো, এই রাথীর বন্ধনে বদ্ধ হও, ভারত-
ভূমির ধূলির শক্তি একবার আবার দেখিয়ে দাও * * * দেখ
দাদা, আজ তোমার রাথী পাঠাচ্ছি, তুমি রাজসীহান
(রাজপুতনাকে) সাক্ষী করে রাথীর মান রেখো। * * * বল
সব বুঝে বল। রাথী কী তুমি বাঁধবে ? * * * যদি বল হাঁ,
তা হলে এই নাও আমার এই রাথীটা স্বীকার কর।

আর সত্যিই যেন কৃষ্ণ স্বীকার করে নিলেন। যদা যদা হি
ধর্মস্য গানির্ভবতি ভারত.....এর প্রণেতা বাপুকে প্রেরিত
করলেন। গীতার কর্তব্যের পালক, কর্মযোগী, রামের সেই
ভক্ত বিজয়া দশমীর পূর্বসূচনা দিয়ে গেলেন ১৫ই আগষ্ট আর
তখন—

“বিজয়ে ! হম তুম মিলকর লেগী
অপনী মী কা প্যার সখী ॥ (বিজয়া দশমী)

(বিজয়া ! সখী ! আমি আর তুমি তখন মাসের আদির
দইব—অর্থাৎ যখন ভারত স্বাধীন হবে তখন আমি এবং
বিজয়া অর্থাৎ বিজয়া দশমীর অত্যাচারের উপর সত্যের

বিজয়, দুইজনে ভারতমাতার ভালবাসা লইব) বলে শ্রীমতী সুভদ্রা মায়ের আদর সভাই নিয়ে নিলেন।

লোকে বলে ভগবানের এবং মাতা পিতার সর্বাধিক প্রিয় সন্তান অধিক দিন জীবিত থাকে না; মৃত্যু কৃষ্ণের সেই রূপটিকে ৩০শে জ্যৈষ্ঠার দিন আচ্ছাদিত করে ফেলল। সংসার কাতর হয়ে উঠল, এবং আকুল হয়ে উঠলেন সুভদ্রা। দাদার বিয়োগ মনে যেন অসহ্য হয়ে লাগল এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী যখন ভারত শোকে সন্তপ্তই ছিলাম দাদার অন্তঃসরণ করে সুভদ্রাও চলে গেলেন। এটা অনন্ত বজ্রপাত।

“গুমী হই আজাদী কী কীমত সবনে পছানী থী
দূর ফিরদী কো করনে কী সবনে মন মে ঠানী থী”

ঝালী কী রাণী।

“হারান স্বাধীনতার মূল্য সবাই বুঝতে পেরেছিল—
ফিরদীকে দূর করবার জন্ত সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিল।”
স্বর্গীয়া সুভদ্রাজীর কাব্যপ্রবাহ অত্যন্ত বেগপূর্ণ ছিল।
ছোটবেলা থেকেই রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ায় তাঁর মানসিক বিকাশ
হয়েছিল—

“গিরফতার হোনে ওয়ালৈ ইয়ার
অনতা হৈ ওয়ারট আভী
ধকসা হতা হুদয় মৈ সহী।
হয়ে বিকল শশক সভী।

* * *

রুকে নহী আখো সে আঁহ
সহসা টপকে বড়ে বড়ে
পগলী! এয়ো! হী দূর করগী
মাতাকা রোরব কষ্ট

রুকা বেগ ভাবো কা দীখা
অহা! যুঝে রহ গোরব স্পষ্ট।

* * *

ফির জী ধড়কা ক্যা ভইয়া কী
সচমুচ তৈয়ারী হোগী?”

“দাদা প্রেস্তার হবেন, ওয়ারেন্ট এই আসছে বলে।
ওনে বুক ধড়াস করে উঠল, আমি ভীত হলাম, এবং সবাই
শঙ্কিত হয়ে উঠল। চোখের জল থামলো না, আর হটাৎ বড়
বড় ফোঁটা পড়ে গেল। ‘পাগলী কোথাকার। এই ভাবে
মায়ের রোরব যাতনা দূর করবি?’ ভাবাবেশের বেগ থেমে গেল
এবং আমি এই গোরবকে স্পষ্ট দেখলাম * * * কিন্তু আবার
বুক ধড়াস করে উঠল এবং ভাবলাম সত্যি নাকি দাদাকে
প্রস্তুত হতে হবে?”

শ্রীমতী সুভদ্রার দাদা আগে থেকেই প্রস্তুত হবার শিক্ষা
দিয়েছিলেন। বিয়ের পর তাঁর রাষ্ট্রীয় আবহাওয়া যেন আরও
ঘন হয়ে উঠল। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এবার তিনি নিজেই সক্রিয়

ভাব মিতে আরম্ভ করবেন। ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা ত ছিলই।
ভাবধারা লেখনীবদ্ধ হয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। ভারত
ভারতী রচয়িতা শ্রীমৈথিলীশরণ গুপ্ত, শ্রীধর পাঠক, গয়া প্রসাদ
শুক্র, সনৎক, মাধব শুক্র ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় কবিতার পথ প্রশস্ত
করে দিয়েছিলেন। শ্রীমাখনলাল চতুর্বেদী ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়
কবি এবং কর্মীদের নিকটও প্রেরণা পেলেন।

‘বন্দেমাতরমের’ সহিত যেমন প্রত্যেক ভারতীয় পরিচিত,
ভারত ভারতীর পংক্তিগুলি যেমন লোকের মধ্যে রাষ্ট্রীয়
চেতনা জাগ্রত করেছে তেমনি শ্রীমতী সুভদ্রার ‘বন্দেলের
হরবোলো কে মুখ হামনে শুনি কহাপি খুব লড়ী মরদানী
ওয়াহ তো ঝাঁসি ওয়ালি রাণী থী’—(বন্দেল চারণদের মুখে
আমরা কাহিনী শুনেছি যে সেই ঝাঁসীর রাণী ভীষণ যুদ্ধ
করেছিলেন) অসংখ্য আবাল বৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে শঙ্খনাদ
করেছে। কবির হৃদয় রাষ্ট্রীয় চিন্তায় ভরপুর ছিল। তিনি
অশ্রান্ত কবিতা রচনা করেছেন—সেগুলি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট
শ্রেণীর। কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রীয় কবিতার দ্বারা তিনি
সুস্থপ্ত ভারতীয়দের হৃদয় স্পর্শ করে নব জাগরণের বার্তা
শুনিয়েছেন। তিনি চন্দ এবং ভূষণের অভাব অনুভব
করতেন, কিন্তু কস্তুরী যুগের ছায় তিনি নিজের শক্তির সহিত
যেন অপরিচিত ছিলেন। তাঁর অন্তর ও বাহির রাষ্ট্রীয়তার
রঙে রঞ্জিত ছিল। তিনি অনেকটা তুলসীদাসের মত ছিলেন,
তিনি রামের যে কোনও ভক্তের ভক্ত ছিলেন। একবার
কবিত্রী স্বয়ং এই প্রবন্ধের লেখিকাকে তার খন্দরের শাড়ী
দেখে বলেছিলেন, ‘যে খন্দর পরে তাকে আমার খুব ভাল
লাগে।’ এতেই রোঁকা যায় তাঁর লেখনীর উপর
রাষ্ট্রীয়তার প্রভাব থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কবিতা রচনায় তিনি কোনও প্রকারের বিশেষ ছন্দের
ব্যবহার করতেন না। তবুও তিনি আখ্যায়িকা গীতিতে
ঝাঁসী কী রাণী এত সফলতার সহিত লিখেছেন যে
উক্ত কবিতাটি কাব্যের ক্ষেত্রে নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান
করে ফেলেছে।

রাষ্ট্রীয় চেতনার সুরণ বলিষ্ঠ লেখনীর দ্বারাই সম্ভব হয়।
নেতা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন ইত্যাদির কথা কাল প্রবাহে
ইতিহাসের ছই একটি পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু,
কবি নিজের অমর লেখনী দ্বারা চিরকালের জন্ত মানুষের মনে
সেই ওজ, সেই উল্লাস ভরে দেন যা চন্দ পৃথ্বীরাজের ভিতর
এবং ভূষণ শিবাজীর ভিতর ভরে ছিলেন; বর্তমানে
‘ঝাঙা উঁচা রহে হমারা’ ও বন্দেমাতরম উচ্চারণ করে কত
হাজার হাজার মায়ের সন্তান চলে গেছে। শ্রীমতী সুভদ্রার
কতকগুলি কবিতা চিরকাল মানুষকে রাষ্ট্রীয় প্রেরণা দিতে
থাকবে; তাঁর অমর পংক্তিগুলি রাষ্ট্রীয় আকাশে মধুর
আলোক বিকীর্ণ করতে থাকবে।

পরিণাম

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কলেজী জীবনে 'মানসী' কথাটি নিয়ে বহু গবেষণা করেছি। কিন্তু তাকে পাওয়া যে এত কষ্টসাধ্য তখন সে খেয়াল হয়নি। বার বার তিনবার নানা ভাবে, নানা পাকে প্রকারে চেষ্টা করেও যখন একটি মনের মতন মানসী যোগাড় করতে পারলাম না, তখন বিধাতা পুরুষের অস্তিত্ব এবং নিজের ভাগ্য ও চেহারা সম্বন্ধে নিতান্ত সন্ধিহান হয়ে পড়লাম। তবে হতাশ হ'বার পাত্র আমি নই—মানসী আমার পেতেই হবে! বোধ হয় তাই রোদে গুড়ে জলে ভিজে পচা গরমে ছপুর বেলা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বাড়ী ঢুকে নিজের শয়ন কক্ষের অত্যন্ত আধুনিক পরিবেশনও কারাগারের মত মনে হচ্ছিল। কিন্তু তার শরণ নেওয়া ছাড়া এখন আর উপায় নেই।

জামাটাকে টান মেরে খুলে মেঝের উপর ফেলে দিলাম; পাখাটাকে চরম জোরে চালিয়েও মনে হোল বোম্বাই মেলের গতিটা যদি ঐ পাখার মধ্যে এনে ফেলা যেত তাহলে শারীরিক ও মানসিক দহন কিছুটা হয়তো ক্রমত। হাত পা মেলে শুয়েই প্রথম চোখ পড়ল এলোমেলো ঘরটার দিকে। এই কি একটা ঘর হোল? নীরস, শুষ্ক কাঠং।

দেয়ালে কতকগুলি কলেজ জীবনেরই ছবি; একটা জি, সি, লাহার ক্যালেণ্ডার। টেবিলে ছোটো সাযাবাদের প্রচারপত্ৰ বই, একটা "নেতাজী স্মৃতি" নামক ক্ষুদ্র চিঠি বই, ছোটো একটা ব্যর্থ প্রেমের উপন্যাস, অফিসের সঙ্গী দাম্পত্য চামড়ায় মোড়া অফিস ফাইলটা, আমার শেকার ও পার্কার কলম পেন্সিলগুলি ও সোনার রিষ্টওয়াচটা। চেয়ারটা টেবিল থেকে আধ মাইল দূরে টানা। আলনায় গাঢ় সবুজ মখমলের প্যাটালুনটা টেপা হাঙ্গারে ঝুলছে। খাকি শার্ট, নীল শার্ট, চীনা কোট, চূড়িদার পাঞ্জাবী প্রত্যেকে নিজের অস্তিত্ব ও আভিজাত্য দেখাবার জন্য মারামারি লাগিয়েছে। শান্তিপুরী ধুতিটার এক প্রান্ত মাটিতে লুটোচ্ছে। এক কোণে মস্ত একটা

আইরিশ লিনেনের রুমাল। আধ ময়লা বিছানার পাশে ক্ষুদ্র টেবিলে রবীন্দ্রকাব্য, ছেঁড়া চিঠি, একটা কাঁচের গেলান্ডা একটা টাইমপিস বড়ি। আলমারীর আয়নাটা এই সারা ঘরটার প্রতিবিম্বই বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

সব কটা জিনিষেই আমার মত একটা ছন্নছাড়া ভাব। কোনও দরিদ্র বন্ধুকে এ ঘরে এনে বসালে সে তৃপ্তির সঙ্গে তাকিয়ে দেখে, তখন মনের কোনে একটা আনন্দ যে হয়না তা বলতে পারি না। কিন্তু আর্থিক মূল্য যতই হোক, মনের সুখ এরা কিছুতেই পরিবেষণ করতে পারছে না, কি যেন একটা নেই। অসমাপ্ত একটা গানের মত স্বর আছে, তাল আছে, কথা আছে, কিন্তু ভাবের গভীরতাটুকু যেন একেবারে বাদ পড়েছে। এ গান শোনার চেয়ে একেবারে কোনও গান শুনতে না পাওয়াও ভালো।

কল্পনার আশ্রয় আর কত নেব? এই যে শান্ত মনে, ক্লান্ত দেহে এসে শুয়েছি, ইচ্ছা করে একটা ঠাণ্ডা নরম হাত কপালে চেপে চোখ বুজি, কপালের সংঘাতে এসে হাতের আভরণ গ্রিন বিন করে বেজে উঠুক! এই অল্পভূতির কি মূল্য আছে? ঐ এলোমেলো টেবিলে কয়েকটি মাথার কাঁটা, একটা চিরুণী, ছোট্ট একটা সিন্দুর কোঁটো,—বলতে লজ্জা নেই—আমার স্নো, পাউডার ও সেভিংএর সরঞ্জামের পাশে, তার স্নো, পাউডার, সেন্ট, ক্রম লিপস্টিক। আলমারীতে ধুতি শার্ট পাঞ্জাবীর পাশে রঙীন শাড়ী জামা। আলনায় কোঁটানো ধুতির পাশে কোঁটানো ডুরে শাড়ী! দেয়ালে আমাদের হৃদয়ের.....

কঃ কঃ, কা, কা, কওয়া কওয়া, ক্যা ক্যা,...আঃ বিরক্ত করলে এই কাকটা। নাঃ, একপক্ষে ভালই হোলো, আবার বাস্তবে ফিরে এলাম। বিকেলে চা খেয়ে একবার ক্লাবে যাব ভাবছি, এইবার দু'একটা বন্ধুর শরণাপন্ন হতে হবে; একলা একলা আর পারি না।

সন্ধ্যার মেঘে রুষ্টি ধৌত গোধূলির রঙীন আলো পড়ে

নানা রংএর বিচিত্র চিত্র সৃষ্টি করেছে। লেকের ঠাণ্ডা জলে ধীরে নৌকা বেয়ে চলেছি—শ্রবণের ছায়াগুলির দিকে তাকিয়ে ভাবছি আজ সারারাত নৌকা বাইতে বসেও বোধ হয় আমি পারি। আজ শুক্রা একাদশী, বোর বর্ষায় পর আকাশ আজ মেঘমুক্ত। কেবল চাঁদের আশে পাশে পালতোলা নৌকার মত জলহারী শাদা মেঘ ভেসে বেড়াবে। আজ যদি পাশে থাকত আমার মানসী আমিও আমার নৌকা নিয়ে ভেসে বেড়াতাম এই লেকের ঠাণ্ডা জলে। অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশীক্ষণ কাটিয়ে দিলাম নৌকা বেয়ে। মনে পড়ছিল—

“আজ শুক্রা একাদশী, হের নিজা হাথা শশী

স্বপ্ন পারাবারের থেয়া একলা চালায় বসি।”

আজকে আমিও আমার থেয়া একলাই চালাই।

জ্ঞান সেরে ক্লাবের ঘরে এসে দেখি সহপাঠী শচীন, অফিসের ও ক্লাবের বন্ধু শরৎ বাবু ও তাঁর পত্নী নলিনী দেবী বসে আছেন।

শচীন বল্ল : “কি হে! এত দ্রুত যে আজ—আমরা ত ভাবলাম জলে ডুবেই মরলে এ যাত্রা!”

আমি বললাম : “সেই আশ্চর্য্যই যদি করব তবে জলে ডুবে কষ্ট পেয়ে কি লাভ? Nitric acid ত হাতের কাছেই থাকেন—তিনিই একেবারে ওপারে পৌঁছে দেবেন।” নলিনী দেবী অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয়া, তাঁর স্বভাবটিও ভারী মনোরম। তিনি বলেন, “তিনবার বার্থ হয়েই যদি আশা ছেড়ে দাও, তবে বাকি মেয়েগুলো যে কোনও chanceই পায় না! আর তোমার চরিত্রের দৃঢ়তাও নেই বলতে হবে। সেই বিদেশী যোদ্ধা রাজা রিচার্ডের মত বার বার চেষ্টা করো—গোকুলে যিনি বাঁড়ছেন তিনি ধরা দেবেনই।”

আমি বললাম : “নাঃ, আমার কোনও আশা নেই—হয় আমার কাউকে পছন্দ হয় না, নয় বাঁদের পছন্দ হয়, তাঁরা অন্য কাউকে পছন্দ করে বসেন। আচ্ছা, আমার মধ্যে কি কিছুই attractive নেই?”

নলিনী দেবী বলেন, “বালাই, যাট, তা’ কেন থাকবে না? তবে আজকাল একটা স্বদেশ প্রেমের হাওয়া বইছে। তুমি তোমার ঐ বিদেশী ধড়াছড়া ছাড়ো।”

শরৎ বাবু এতক্ষণ নীরবে হাসছিলেন, তিনি বলে

উঠলেন—“হ্যাঃ, ঐ চেহারায় ধৃতি পাঞ্জাবী বা মানাবে। একেবারে ভাল পাতার সেপাই!”

আমি চটে উঠে বললাম—“আচ্ছা আপনারা আমাকে কখনও পাঞ্জাবী পরে দেখেছেন? না দেখেই একটা বাজে কথা বলে দিলেন।”

শরৎ বাবু আমার চটিয়ে মনে মনে একটা আশ্চর্য্য আনন্দ পান, বলেন, “আমার ভালো লাগল কি মন্দ লাগল, তা দিয়ে তোমার কি হবে? মানসীকে দিয়েই প্রমাণ করিও।” আমি পণ করে বসলাম—“আচ্ছা প্রমাণ করে জানাব।”

শচীনকে একটু কাছে টেনে আস্তে বললাম, “চিত্রা রায়কে মনে আছে? মেয়েটির মধ্যে কি যে একটা ‘আলগাশ্রী’ আছে আমার ভারী ভালো লাগে।”

হয়ত ভুল শুনেই শচীন জবাব দেবার আগেই নলিনী দেবী বলে উঠলেন : “কী বলে ‘আলগাশ্রী’? দোহাই বাবা, অমন বৌ এন না। আজকালকার ছেলেদের পছন্দ যে-কি? বৌ কোথায় ছোট খাট হবে...”

আমি একটু গরম হয়েই ছিলাম, বললাম “আমি বললাম ‘আলগাশ্রী’ শুনলেন ‘আলগাশ্রী’—আপনাদের সব তাতেই ঠাট্টা।”

নলিনী দেবী দমে বাবার পাত্রী ন’ন, বলেন : “আলগাশ্রী’ সে যে আরও খারাপ—এখন মনে হবে ভাল, শেষে কাজে কমে, আপদে বিপদে এমন আলগা দেবে যে তোমারই প্রাণ অতিষ্ঠ হবে।” আমি দেখলাম বিরক্ত হয়ে লাভ নেই, বললাম, “আপনারা জিনিষটাকে বড় হালকা ভাবে নিচ্ছেন, এর গুরুত্ব যে আমার জীবনে কতখানি সেটা স্বীকারই করছেন না। At my cost খানিকটা হেসে নিচ্ছেন, আপত্তি নেই; নিজের থেকে যেটুকু পরকে আনন্দ দান করা যায় করা উচিত। কিন্তু আপনাদেরও কি উচিত নয় আমার একটু সাহায্য করা?”

শচীন ও শরৎ বাবু সম্বন্ধে—“আরে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই”—করে উঠলেন।

শচীন বল্ল : “এবার ওঠা যাক, অনেক রাত হোল, কাল থেকে আমার সারাদিনের কাজের মধ্যে তোমার মানসী খোঁজাটাকেও একটু স্থান দেব। কাল অফিসের পর আমার ওখানে আসিস—কিছু পরামর্শ করা যাবে।”

শরৎ বাবু আবার পুরণো ঘায়ে আঘাত দিয়ে বলে উঠলেন : “কিন্তু বাই কর, Stalin এর প্রভাবটা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করো, এদেশে গান্ধীর প্রভাবান্বিত হ’লে তবু মনের মতন মানসী পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।”

আমি নম্রতা ভুলে গেলাম—বড় বিরক্ত লাগল—শরৎবাবুর সমানে পিছনে লাগাটা। মুখ থেকে অতর্কিতেই বেরিয়ে এল, “Hang your Gaudhism!” নলিনী দেবীকে নমস্কার পর্যন্ত না করে শচীন এর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। ট্রাম রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছি, শচীন বলল,—“কাল আমার ছোট বোনটাকে আশুতোষ কলেজ থেকে বাড়ী নিয়ে আসব আমি, তুইও আমার সঙ্গে জুটে যাস—যত মেয়ে চাস্ দেখে নিস্। খবরাখবর একটু আধটু ওই দিতে পারবে।” আমি খুব উৎসাহিত বোধ করলাম না; তবে একেবারে নাও বলতে ইচ্ছা করল না, যদি অতগুলির মধ্যে তাকে খুঁজে পাই! বললাম, “অনেকবার চেষ্টা করেছি, বিশেষ লাভ নেই, তবে দেখি শেষবার চেষ্টা করে।”

শুক্রা একাদশীর চাঁদ নীরবে তার জ্যোৎস্নায় সারা শহরটাকে রহস্যময় করে তুলেছে। মা বাবা ভাই বোনরা ড্রিং রুমে বসে গল্প করছেন, রেডিওতে সূচিন্দ্রা মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রাণভোলানো কণ্ঠ মাধুর্য্য ঢেলে দিয়ে গাইছেন ‘মরণ রে তুঁহ মম শ্যাম সমান!’ আমার মানসী, স্বন্দরী ও শিক্ষিতা হ’বন ধরাই ছিল, এখন যোগ করলাম তাঁর রবীন্দ্র সংগীত পটুও হওয়া চাই। নিজের ঘরে ঢুকে বৃথা অফিসের কাগজপত্র নিয়ে একটু কাজ করবার চেষ্টা করছি, মা এসে পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন, “দিন দিন যা চেহারা করছিস বাবা, কোনদিন একটা শক্ত অস্থি পড়বি। তোর কিসের অভাব? ঐ কাগজগুলো নিয়ে রাত দিন কি মাথা না কুটলেই নয়? সখের চাকরী সখেরই রাখ—শরীর পাত করে কি হবে? ওঠ, চল, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।” জানতে পেরেছিলাম মাও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সংসার পাতিয়ে দেবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা করছেন। কিন্তু ছেলে আধুনিক বলে সে কথা তার কাছে আর বলতেন না, কথা বার্তায় পুত্রবধূর অভাবটা কেবল জানিয়ে দিতেন ছলে বলে কৌশলে।

বললাম, “কোথায় আবার রোগা দেখলে আমার? মনোজ, সরোজের মত ঢাকাই জালা না হলেই বুঝি রোগা হোল?” সরোজ ও মনোজ আমার ছোট ছই ভাই।

মা অমঙ্গল আশঙ্কায় জিভ কেটে বলেন, “ছিঃ বাবা! অমন বলতে নেই, বাড়বার মুখে ছোট ছেলে পিলে অমন ত হয়ই। আজকালকার ছেলেদের ঐ চিমড়েপোড়া চেহারা কাজ নেই আমার।”

চিমড়ে পোড়া থেকে ঢাকাই জালায় পরিণত করবার মত সরঞ্জাম খাবার টেবিলে প্রচুর ছিল। কিন্তু সেগুলির সদ্যবহার করবার মত মানসিক অবস্থাটা ছিল না। এটা সেটা নাড়া চাড়া করে কারুর জন্য অপেক্ষা না করেই উঠে পড়লাম।

সরোজ বলে উঠল “দাদা, আমার সেই আমেরিকান সান-গ্রাসটার কি হোল?”

রত্না বলল, “আমার সেতারের তারগুলো আজও দিলে না, কতদিন আর অন্যের সেতার ধার করে চালাই?”

সারাদিনই মেজাজটা ছিল খিঁচড়ে, চীৎকার করে উঠলাম, “আঃ জালাতন করিস না, আমি এখনও মরিনি, ধীরে স্বস্থে সবই এনে দেব।”

হাত মুখ ধুতে বারান্দা পেরিয়ে বেসিনটার কাছে যাচ্ছি, শুনলাম মা বলছেন, “শীগগিরি তোমার ছেলের একটি বো আন বাপু, আমি বড় ভাবনায় পড়েছি। খায়না দায়না, টে টে করে ঘোরে, বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এ কেমন?” বাবা উত্তর দিলেন, “ছেলে তেমনি কি না—আধুনিক পছন্দ! এটা মেলে ত সেটা মেলে না, আমি কি সারা কলকাতার মেয়ে ধরে এনে মেলা বসাব?”

মনে মনে ভাবলাম, বসাতে পারলে মন্দ হোত না!

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় আশুতোষ কলেজে এসে হাজির দিলাম, দেখলাম শচীন এখনও পৌছয় নি। বারান্দা গুলোতে তরুণী ছাত্রীদের ভীড়, গেটের সামনেও কয়েকটি বিদ্যারগ্রহণেছু বালিকা হাসি ও গল্পে মেতে উঠেছেন। ট্রাম ও বাস stop এর কাছে এক বাঁক প্রজাপতির মত নানা রংএর শাড়ী জামায় সজ্জিতা নারীবাহিনী। সামনের পুরনো বইএর দোকানে এবং দেবদারু গাছের তলায় ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তরী তরুণী মূর্তি। আমার মত উদ্দেশ্য নিয়ে আমারই দলভুক্ত কয়েকটি অতৃপ্ত নয়ন ও হৃদয়বান্ এখার ওখার জটলা পাঁকাছেন। শাটের কলার যে যত উচু করতে পেরেছে সে তত স্বস্তি বোধ করছে।—বেশীর ভাগের চোখে সানুয়াস, এটার আড়ালে দৃষ্টির গতিকে সীমাবদ্ধ না

রাখলেও চলে। এঁরা কেউ ধুতি পাঞ্জাবী ও ছুঁড় তোলা নাগরায়ী শোভিত, কেউ টিলা পায়জামা চীনা কোট ও লাহোরী কাবুলী জুতা পরিহিত। অধিকাংশই শার্ট, আঁধ ময়লা ধুতি ও ছেঁড়া চটি পরিহিত। মাঝে মাঝে কতকগুলি দুঃসাহসিক যুবক কোনোও তরুণীর একেবারে কান ঘেসে আজ্ঞে বাজ্ঞে কবিতা, গানের সুর ও বাক্য বাণ বর্ষণ করে ঘন ঘন রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অন্যরা কেউ কেউ, নানা ছাঁদে, ইংরাজী ভাষায় তাঁদের দখল কি দুর্দান্ত তাই জানাবার চেষ্টা সজোরে গলা খুলে করছেন; কেউ কেউ নানা রকম অদ্ভুত ও বিকট মুখভঙ্গী করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়বার চেষ্টা করছেন। কেউ সহজ সরল কোতুহল ও বিস্ময় চোখে মুখে ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ আবার অকারণেই একটু বেশী উদাস নেজে জুগল নানাভাবে সংকুচিত ও বিকৃত করছেন।

একটা লাল রংয়ের racing car সাতটি সুরে হর্ণ বাজিয়ে জনতাকে সচকিত করে গেটে এসে থামল। রিম-লেস চশমাশোভিত কিন্ফিনে আদ্বির পাঞ্জাবী পরিহিত, স্নো পাউডারের প্রলেপের উপর সুপরিপুষ্ট একটি Clark Gable মার্কী গুন্ফ সুশোভিত মুখ একবার দরজা দিয়ে উঁকি মেয়ে বারান্দার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র হর্ণটি সপ্ত সুরে বেজে উঠল। তানসেনের সপ্তস্বরও বৃষ্টি এমন করে প্রাণ মনে শিহরণ আগায়নি।

সবাই উদগ্রীব, কে যাবে এই গাড়ীতে? দশ মিনিট পরে একটি অত্যাধুনিক তরুণী মূর্তি দেখা দিলেন। তাঁর বয়স পনেরও হতে পারে, পঁচিশও হতে পারে। রং শ্যামবর্ণও হতে পারে, গৌরবর্ণও হতে পারে। মাথা একেবারে কেশ বিরল হতে পারে, আবার কেশ বহুলও হতে পারে। দামী হাল্কা নীল জর্জেটের শাড়ী জামার বাইরে যতটুকু দেহের আভাস পাওয়া যায় সবটাই জ্বিক, পাউডার, স্নো, সেন্ট ও রজ লিপস্টিকের অভেদ্য বর্ষে আবৃত। দুটি কান ঢেকে প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি দুটি দোদুল্যমান বেণী, গোড়ালী উঁচু নীল সোয়েডের জুতার আবৃত পদযুগলের কৃত্রিম ছন্দে ছন্দে নেচে উঠছে। হাতের কিউটেক্স আচ্ছাদিত ভীষ্ম দুই ইঞ্চি লম্বা নখর শোভিত অঙ্গুলীতে একটি খাতা ও নীল পুঁথির ব্যাগ

সজোরে টিপে ধরা। সে স্তম্ভিত স্রু গলায় বলে উঠল, “চলি ভাই ডলি—Sunday দুপুরে “Lindsay”তে আমার meet করিস্।”

এরা মনের উপর যেন কোনও ছাপই রাখে না। বাইরের দেহটাকে নানা উপকরণে সাজানোই যাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ, তারা আর মনোজগতে কি প্রভাব বিস্তার করবে? বাইরের চাকচিক্য দিয়ে চোখ দুটোকে কিচ্ছকর্ণের জন্ত ধাঁধিয়ে দেওয়া পর্যন্ত ওদের দৌড়। গাড়ীটা সরবে তার সপ্ত সুর লহরী নিয়ে উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন থেকে ওর চেহারাটা মিলিয়ে গেল।

শচীনের গলার শব্দে চমকে ফিরে তাকানাম, দেখি সে ট্রাম থেকে নেমে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে বল, “কাউকে পছন্দ হোলো?”

বল্লাম, “কয়েকটিকে দেখলাম, মন্দ লাগল না, তবে সবাই যে আমার খুঁতখুঁতে পছন্দ অল্পযায়ী তা ভেবো না। যাক্—আমার Standard অনেক কমিয়ে ফেলেছি, এখন খুব বেশী অল্পবিধা হবে না বোধ হয়।”

শচীন বল, “এক্ষণি তাকাস না, কিন্তু একটু পরে দেখে বলিস, ওই বাদিকের ছোট গেটের পাশে সাদা শাড়ী পরা, মেয়েটিকে কেমন লাগল।”

বারণ না করলেই আমি হয়ত একটু ফিরতে সময় নিতাম, কিন্তু বারণ করবামাত্র একটা অদৃশ্য টানে আমার মাথাটা বাঁ করে পিছনে ঘুরে গেল। মেয়েটি কলেজী হালচালের বিশেষ ধার ধারে না বলেই মনে হোল। বেশীর ভাগের হাতে একটি করে খাতা, এর হাতে ছোট, বড়ো, মোটা, স্রু অনেকগুলি; বইগুলি বুকের কাছে চেপে ধরে সে দাঁড়িয়েছিল। কোঁকড়ানো ছোট ছোট চুলগুলি মুখে এসে পড়েছে। ঘন পশ্মপল্লব শাস্ত চোখের দৃষ্টিকে অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছে, যেমন তেমন ভাবে ঘাড়ের কাছে একটি খোলা চুলের খোঁপা করা, উজ্জল গৌরবর্ণ স্রুগঠিত তন্ন বিরে শুভ বসন নানা ছন্দে খুলী মতো ঘুরেছে, অলঙ্কার এক হাতে একটি স্রু চুড়ি ও বাম মণিবন্ধে একটি কালো ফিতার বাঁধা ক্ষুদ্র ঘড়ি ছাড়া চোখে পড়ে না। অন্ত সকলের চেয়ে মুখে হাসি অল্প, কিন্তু বেশীর ভাগের চেয়েই হাসিটি সুন্দর। যৌবনমূলভ চাকল্যের একান্ত অভাব বলে মনে হোল, অথচ

বয়স কুড়ির বেশী কোনও মতেই নয়। কালিদাসের যুগের “মালবিকার” উদাস্য যেন একে ঘিরে রেখেছে। শচীনকে মুগ্ধ দৃষ্টি অনুসরণ করে বার বার দেখলাম—কিন্তু বড় করুণ বড় গম্ভীর মেয়েটা; সুন্দরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু গান্ধীধ্বের পক্ষপাতী আমি নই। বললাম, “দেখতে বেশ, তবে অত বিষণ্ণ ও হাঁড়ি মুখ নভেলেই মানায়—একটু হাস্যমুখী না হলে কি লাভ?” শচীন উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিল, “তোমার পছন্দকে নমস্কার।... দাখ দাখ ঐ পেরাজী শাড়ী পরাটি কেমন? আঃ, ঐ যে রে lamp post-এর নীচে—দূর হাঁদা, চলেই গেল।” শেষ মুহূর্তে চোখে পড়ল একটা গৌরবর্ণ বাহুলতা, বক্ষি, গ্রীবা, সর্পিলা বর্ণী, অলঙ্কৃত চরণকমল ও বাতাসে উড্ডীয়মান অঞ্চলের এক প্রান্ত। অতি কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ফেললাম। চোখের সামনে দিয়ে ছায়া ছবির মত আরও কত জনকেই না যেতে দেখলাম। বাঃ পিছন ফিরে ঐ মেয়েটি ত বেণ। পথে চলার মধ্যে বেশ একটা আভিজাত্য আছে, যেন অজন্তার চিত্রে রাখা বন্ধ সাত্রাজী প্রাণ পেয়েছেন—হুঁটা একটু ময়লা। নাকটা আর একটু উঁচু হলে ভালো হোত। উচ্ছল প্রাণের ফোয়ারার মত ওটা কে? বেশ ছোটখাট চঞ্চল হরিণীর মত—প্রতি কথায় হেসে কুটিপাটি হবার ষোগাড়, ওর ডাকনাম নিশ্চয় হাসি—একটু বেশী রোগা! আর ঐ মেয়েটি যেন বধু বেশে এসেছে পৃথিবীতে, মাথায় কাপড় দিলে ওকে খুব মানাবে! এঃ গলাটা বড় নাকি! রাত্রি ঘুমের ঘোরে আঁচমকা পেছার খোনা গলা বলে ভুল হবে শেষে!—আর ওর মুখটা আর গড়নটা ভাল, তবে ফিরিঙ্গী হাবভাবে কেমন যেন আচ্ছন্ন!—এটি, বাঃ চমৎকার! যেন রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি; চিকণ শ্রামল ২২এ বাঙ্গালী শাড়ীটা কেমন মানিয়েছে, কালো ভ্রমর চোখে যেন বাংলা মায়ের শান্ত কোমল নিবিড় ছায়া। ইস্ “আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে, আমিই জানি আর জানে সেই মেয়ে”। কিন্তু মুন্সিল, মার কি অত কালো বৌ পছন্দ হবে? কানের কাছে শুলাম “Austinটা বাবা অফিসে নিয়ে যান, দাদা Morris টা, ব্লু মল্ল আর থোকা Studebaker এ স্কুলে যায়, মার আর আমার Dodgeটা নিয়ে বড় গোলমাল হয়, আমার কলেজ শেষ হবার আগেই মা বাজারে বেরোন, ফিংগে দেবী হলেই বাধ্য হয়ে আমাকে বাসে করে বাড়ী যেতে হয়।” সব চেয়ে

আধুনিক শাড়ী, জামা জুতায় সজ্জিতা একটি ১৯১৬ বছরের মেয়ে, অলঙ্কারের আধিক্য দেখে হঠাৎ মনে হোল বুদ্ধি বিয়ে বাড়ীতেই দাঁড়িয়ে আছি। চোখ মুখে বিশেষ আভিজাত্যের ছাপ নেই, মনে হয় বাংলার ছুঁতফে যে একদল বিশেষ লাভবান হয়েছিলেন, সেই ‘হঠাৎ বড় লোকের’ কোনও গর্বিতা ছুঁতফা। যাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হোল সে বহুক্ষণ বাসে চড়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও অগ্রসৃত হওয়ার লক্ষণ নেই, কেউ না কেউ কথাগুলি শুনেই হোল।

ইতিমধ্যে শচীনের বোন মালু এসে পড়ায় কোঁতুহলী দৃষ্টিটাকে উদাস করে তুললাম—যেন এই বেড়াতে বেড়াতে এম্মুণি এসে দাঁড়িয়েছি। মালু চীৎকার করে উঠল, “ওমা! রতনদা, আপনি এখানে যে? কী উদ্দেশ্য?” শচীন তার বিহীন ধরে একটান মারল ও আমি একটু জোর গলায় বললাম, “হাজরা রোডে একটা কাজে এসেছিলাম, শচীনের সঙ্গে পথে দেখা, তাই একটু দাঁড়িয়ে গেলাম।”

শচীন কোঁশলে খোঁজ নিয়ে নিল, শুভ্রবসনাটি একটি ব্রাহ্মণ কন্যা, বাল বিধবা.....আহা!

কৃষ্ণকলিটির বিষয়ে হুঁজুনেই একটু বেশী উৎসাহ প্রকাশ করলাম, মালু বলে উঠল, “ও বাঁশরীদি, কি সুন্দর দেখতে না? ও ত একজন College beauty ছিল। জাননী, ঐ ত Dr. Sarkar-এর মেয়ে, আজ এসেছিল বন্ধুদের নেমন্তন্ন করতে, পরশু ওর গায়ে হলুদ কিনা। কে এক বড় লোকের I. M. S. ছেলের সঙ্গে love-marriage!” মনে মনে ভাবলাম যদিও গণ্যকার বলেছেন এই ইংরাজী বছরের মধ্যেই আমার বিয়ে, কিন্তু বিয়ে আমার কপালে নেই।

গল্প করতে করতে এক বাঁক মেয়েদের পাশ কাটিয়ে ট্রামে উঠতে যাব, অগাধে একবার কয়েকটির উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম, দীর্ঘাজী, খন্দর পরিহিতা একটি তব্বীর মুখের উপর চোখ দুটো বোধ হয় বেশীক্ষণ আটকে পড়েছিল,—ধূসর চোখে স্বর্ষ্যকরতপ্ত বালুর তেজ ঝলসে উঠছে—রক্তাধরে গর্বিতা রাজপুতানীর দৃপ্ততার আভাস পড়েছে, সুগঠিত উন্নত নাসিকা, সাধারণ মেয়েদের কপালের চেয়ে কপালটি প্রসারিত, চুলগুলি বিহীন খোঁপায় বাধা—ভাবছিলাম এর ধমনীতে নিশ্চয়ই কোনও যোদ্ধার রক্ত প্রবাহিত—খন্দরে বেশ মানিয়েছে; হঠাৎ বীণাবদ্ধত স্বর

কানে এল; “আজকালকার ছেলেগুলোর খেয়ে কষ্টে কাজ নেই—কেবল রাস্তার রাস্তার ঘুরে মেয়ে দেখে বেড়ায়! কি অসভ্যের মত তাকাচ্ছে দেখে রেণু।” মামু আগেই ট্রামে উঠে পড়েছিল ভাগিস, এক লাফে শচীনকে পাশে উঠে পড়ে বসল; “আজকালকার মেয়েগুলো কি conscious.....।” উড়ন্ত চিলের ডানার মত আর নীচে মেয়েটির ঘুর চোখে একবার আঙুলের মত একটা নীল আলো বাল্‌সে উঠল, অকারণেই খুসী হয়ে উঠলাম,— অন্ততঃ কাকুর বিদ্রোহের কারণ হয়েছি মনে করলেও নিজের নির্গিপ্ত হতাশ ভাবটা খানিকটা কেটে যায়।

শচীনের পাশে কোনও মতে জায়গা করে নিয়ে বসলাম; “সেদিন Communist Partyর একটি অধিবেশনে গিয়েছিলাম, অনেকগুলি নেতাকে চাক্ষুস দেখতে পেলাম। প্রণতা হালদার কতগুলি পুরানো স্বদেশীভাবাপন্ন লোক-সংগীত গেয়ে শোনালো—তারী চমৎকার লাগল।”

মামু উদগ্রীব হয়ে বলল: “কি গান রতনদা, বল না, হয়ত আমি জানতেও পারি—আমি আবার স্বদেশী গানের মত্ত একজন ভক্ত।”

আমি আমতা আমতা করে উঠলাম—“ঐ রে, আরে, একেবারে ভুলে যাচ্ছি—পদগুলো ঠিক মনে পড়ছে না।”

মামু বিস্মিত হয়ে বলল: “একটাও না?”

মহা অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম।

শচীন কোতুক মিশ্রিত কণ্ঠ বলে উঠল—“আরে তুইও যেমন,—ও কি আর গান শুনেতে গিয়েছিল? হাঁরে রতন, তোর তাহলে কম্যুনিষ্ট প্রিয়ান্তেও আপত্তি নেই?”

এক ট্রাম পুরুষ ও নারীর মধ্যে শচীনটা আরম্ভ করেছে কি? মামু ও তার পার্শ্ববর্তিনী সহপাঠিনীটিও রীতিমত মুখ টিপে হাসতে আরম্ভ করেছে। আমার দিবাহটা কি এমন হাস্যকর ব্যাপার আজও বুঝে উঠতে পারলাম না।

কাজের ছুতো দেখিয়ে একটা ষ্টপ আগেই নেমে পড়লাম।

* * *

ইতিমধ্যে হালভাঙ্গা নৌকার মত মানসী অধ্বসে কত বিচিত্রভাবে, কত বিচিত্র স্থানেই যে ভেসে বেড়লাম তার ঠিকানা নেই! একটি বন্ধুর কাছে কোনও এক গুজরাট নন্দিনীর সৌন্দর্য ও গুণাবলীর বর্ণনা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ

হয়ে পড়েছিলাম—ভাবলাম ক্ষতি কি, সবই যখন মিলে যাচ্ছে তখন ভিন্ন দেশীয়া হোলোই বা। কিছুদিন চিন্তা করে বন্ধুকে লিখে দিলাম আমার মতামত। অত্যন্ত শীঘ্র উত্তর পেয়ে বহুদিন পরে বেশ একটা চাক্ষুস অনুভব করলাম। খামটি ছিঁড়ে চিঠি খুলে দেখি লেখা আছে:—

ভাই রতন,

যার কথা তুমি লিখেছ তার অল্প কিছুদিন হোল—পুরের জমিদারের ছেলের সঙ্গে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। আমি জানি তুমি এই অত্যন্ত সামান্য ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ করবে না—মামুষের জীবনে অনেক সময় অনেক হতাশাই আসে, কিন্তু সেটা জয় করতে পারাই প্রকৃতপক্ষে পুরুষজনোচিত ইত্যাদি ইত্যাদি.....

হায় বিধাতা! আর কতদিন এমন ত্রিশঙ্কর মত ঝুলে থাকব?

এই ঘটনাটির পর আমার পিতার সুপুত্রের মত কত টেঁপী, খেঁদী, ডলি, রিনি, বেলা, নীলিমাকে দেখে বেড়লাম, কিন্তু “খাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশ পাথর”, পরশ পাথরটি আর পেলাম না। কোথাও বহু চেঁচায়—ঈশং নাকি ও চাপা গলায় শুনেতে পেলাম, “যদি ভুল ভেঙে যায় কোন দিন”—আমি রবীন্দ্র সংগীতভক্ত জানতে পারায় তাড়াতাড়ি সচকিতা, কম্পিতা সলজ্জ নারীমূর্তি ভুল স্বরে, ভুল কথা মিশিয়ে মৃত্যুর গান গেয়ে বসলেন, “কেন রে এই দ্ব্যধটুকু পার হতে সংশয়।”

কোথাও কল্যাণকে দেখতে কোনও মতেই সফল হলাম না, কেবল দেখলাম অলঙ্কার, শাড়ী, জামা পাউডার ও ক্রীমের অভিনব একটি চলন্ত বিজ্ঞাপন।

কাউকে বহু চেঁচায়ও তার কছপের মত মোটা খোলস থেকে টেনে বের করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে চলে এলাম। আবার কাকুর নিজেকে প্রকাশ করবার উৎকট চেঁচায় সচকিত ও লজ্জিত হয়ে পালিয়ে এলাম।

সেদিন বরষাত্রী হাঙ্গ গিয়েছি এক সহপাঠীর বিয়েতে। সানাইএর স্বরে, ফুল ও লুচি ভাজার পক্ষে, একটা উদাস ভাব এসে গেছে মনে, চুপচাপ নব-বধূকে দেখে এসে চেঁচিয়ে বসে আছি, শচীন গিছন থেকে সজোরে পিঠে এক চড় মেরে বলে উঠল: “কিরে—একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে

গিয়েছিল যে, শীগ্গিরি তোকেও এমনি টোপের পরে বসে মানাই শুনতে শুনতে মস্ত পাঠ করতে হবে।”

হাতটা সরিয়ে দিয়ে বল্লাম, “যা যাঃ, ভাল লাগে না। ঐ এক কথা শুনতে শুনতে পাগল হবার জোগাড়।” শচীন কৃত্রিম ভয়ের অভিনয় করে বল্লো: “বাবা, এ যে উল্টো চাপ, তুইই ত চাইছিলি বিয়ে করতে। আমরা কি কেউ মাথার দিবা দিয়ে বলেছিলাম বিয়ে কর? সে যাক্ আসচে রবিবার “Ferrazini”তে চা খেতে আসিস্ আমার সঙ্গে, তখন সব কথা হবে। একে তুই কোনও মতেই অপছন্দ করতে পারবি না।”

মনে মনে ভাবলাম—আর কাউকেই “না” বলার মত মানসিক বা শারীরিক শক্তি নেই। এবার একেবারে সাক্ষাৎ ছাড়া গছের অধিষ্ঠাত্রী না হলে কোনও মতেই “না” বলব না প্রতিজ্ঞা করে বেরোব। অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে দেখি তুমুল তর্ক ও আলোচনায় মা, বাবা, ভাই, বোনেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। ব্যাপার কি দেখবার জন্ম ঘরে ঢুকছি, হঠাৎ রক্তা ঝড়ের বেগে দৌড়ে এসে আমার মুখের পাশে কার একটা ছবি ধরে উঠেঃঃঃ বলে উঠল, —“বাঃ বেশ, দেখ, কি রকম মানিয়েছে। দাদাও বেশ বর সেজে আছে। কোনখানে বেশানানটা দেখছ?”

মা, বাবা নীরবে হাততে লাগলেন, মনোজ্ঞ ও সরোজ উচ্ছ্বসিত হয়ে হাত তালি দিয়ে উঠল।

আমি—“দেখি দেখি”—করে রক্তার হাত থেকে ছবিটা নেবার চেষ্টা করলাম—সে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। বহু সাধ্য-সাধনার পর সেটা উদ্ধার করলাম—সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে মেপে দেখলে চোখে মুখে নাকে কোনও মাপের ভুল হবে না। পাঁচানো খোঁপা নীচু করে বাঁধা। দামী ঢাকাই শাড়ী ও আধুনিকতম জামা পরিহিতা কানে ও গলায় মুক্তার হাঙ্কা গহনা। ঠোঁটের কোনে হাসির আভাস। ফোটোর তলায় Edna Lorenzটি খুব পরিষ্কার করে লেখা। শুনলাম মেয়েটি Matric পরীক্ষায় কয়েকটি letter পেয়েছিল, অল্প কয়েকটি সংখ্যার জন্ম star পায়নি, সম্প্রতি আশুতোষ কলেজে I. A. পড়ছে। বাড়ীতে মাষ্টার রেখে রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষা করে। সেতার ভাইই বাজায়।

মনে মনে হিসাব করে দেখলাম—সুন্দরী, শিক্ষিতা, রবীন্দ্র সংগীত পটু—সবই মিলে যাচ্ছে। বল্লাম, আচ্ছা কাল বলব।

৫টার সময় Ferraziniতে হাজির হোলাম—দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি এখনও শচীন পৌছায়নি। পুরনো বিলিভী পত্রিকার ভীড় বসেছে ফুটপাথে—এটা টা নাড়ছি—একটা মার্কিন পত্রিকার উপর রূপসী অভিনেত্রীর মুখ ঝলসে উঠল—দাম দিয়ে সেটা তুলে নিচ্ছি—হঠাৎ একটা সবুজ রং এর ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। শচীন এক লাফে নেমে দরজা খুলে দিল—পিছন থেকে মাল্ল ও একটি জরীপাড় শাড়ী সূশোভিতা অপরিচিতা সুন্দরী নেমে পড়লেন। মুখ তুলে তাকাতাই দৃষ্টি বিনিময় ঘটল—আরে! এ যে সেই “Edna Lorenz” এর সুন্দরী, শিক্ষিতা, রবীন্দ্র সংগীতপটু—ফটো—গ্রাণ পেয়েছেন।

হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা চোখের নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল। মা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন এইভাবে কনে-দেখাটা সারলে আমার বিশেষ আপত্তিও ঘটবে না বা মাকেও বিশেষ সাধা সাধি করতে হবে না।

মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হোলাম, একটু জানাতে কি দোষ ছিল? আনন্দের উপর মথমলের প্যান্টটা টাঙানো ছিল, হাঙ্কা বাদামী সিল্কের সার্টটাও বের করা ছিল। অথচ এই জুদিন পরা নীল সার্ট ও সাদা প্যান্ট পরে কিনা এর সামনে আসতে হোল। সান গ্লাসটাও ভুলে ফেলে এসেছি। অকারণেই একবার আঙ্গিনটা তুলে সোনার ঘড়িতে সময়টা দেখে নিই বল্লাম, “তোমার একটু দেবী হয়ে গেল শচীন, আমি সন্ধ্যায় একটু ক্লাবে যাব ভাবছিলাম আজ।”

শচীন বল্ল, “আরে এখনও ঢের সময় আছে—চল, চা খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক্। আর শোন্ ইনি হচ্ছেন শ্রীমতি তুলিকা হোম, মাল্লর বন্ধু। তুলিকা দেবী ইনি আমার এক বন্ধু শ্রী প্রতাপ রায়।

মেয়েটি গোলাপী কিউটেজ পরা, ঘড়ি, চুড়ি ও কঙ্কন শোভিত হাত-ছুটি তুলে বল্ল, “নমস্কার।” আমি প্রতি নমস্কার করে বল্লাম, “আপনি বুঝি মাল্লর সঙ্গে আশুতোষে পড়েন?”

তুলিকা বল্লেন, “হ্যাঁ।”

জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার subjects কি?”

তুলিকা বল্লেন, Civics, Logic, Botany, Botany টা

বিশেষ ভালো পড়ানো হয় না। তাই আমি আর মান্ন একজন Professor এর কাছে special coaching এর ব্যবস্থা করেছি।”

কথায় কথায় সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল প্রভৃতি নানা জিনিষের কথা উঠল; কথায় বার্তায় বুঝলাম মেয়েটির সব বিষয়েই জ্ঞান আছে অল্প বিস্তর।

ধরণ ধারণ বাস্তবে কল্পনায় মিলে বেশ রহস্যময়। হাসিটি খুব সপ্রতিভ, কথাবার্তারই মত, কিন্তু চোখ দুটিতে কোথায় যেন অল্প লজ্জা ও গাঙ্গীর্ধ্য লুকিয়ে আছে। হাসিটুকু সেখানে সব সময় পৌছায় না। ডান দিকের মস্তক চিকণ কপোলে নিটোল কালো একটি তিল। মনে মনে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক ইচ্ছা হোল এফুনি শচীনকে টান মেয়ে, বাইরে এনে বলি ‘কালই বিয়েটা লাগিয়ে দে।’

তুলিকাকে বাড়ী পৌছে ফিরতি পথে আমার মনোভাব ব্যক্ত করলাম শচীনের কাছে। বন্ধুর মতো সে যথাসম্ভব শীঘ্র শুভ কাজ আরম্ভ করে দেবে বলে আশ্বাস দিল। দিন তিনেক অধৈর্য্য ভাবে অপেক্ষা করেও কোনও সাড়া না পেয়ে অভ্যস্ত উচ্চমনে শচীনের বাড়ী উপস্থিত হলাম। কিছুক্ষণ অস্থির অপেক্ষার পর বিমর্ষ মুখে প্রচুর ইতস্ততঃ করে শচীন এসে যা বল, তার সার মর্ম্ম এই :—মামাকে পছন্দ হয় কিনা জিজ্ঞেস করায় মামাকে কলেজে তুলিকা বলেছে, “ওমা, ঐ ছাত্রী ন্যাকা অদ্ভুত দেখতে ফুলবাবু ভদ্রলোক? ওঁকে ভাই আয়নার ভালো করে নিজেই দেখতে বলিস্—ওঁকে অবশ্য ঠিক ওই কথাগুলো বলিস্ না, বলিস্ এখনই আমার ঘিয়ে করার ইচ্ছা নেই।”

ভারতবর্ষ

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা।

প্রণমি আমার ধ্যানের ভারতবর্ষে,
অনাদি যুগের গৌরব গাথা, চিহ্নিত যার শীর্ষে
প্রথম দিনের উদয় তীর্থে কীর্তি যার,
প্রথম দিনের সাম ওঙ্কারে মৈত্রী যার,
প্রথম দিনের সাধন যজ্ঞে মুক্তি যার,
প্রথম দিনের সূর্য মঞ্জে শুদ্ধি যার, বিশ্বতন্ত্রে বাঙ্কত।
নমি সে পূজ্য ভারতবর্ষে, নিখিল মানব বন্দিত।
প্রণমি আমার প্রাচীন ভারতবর্ষে,
ইতিবৃত্তে নহ তুমি স্থির শুদ্ধ কঠিন ভাষ্যে।
আর্য্যাবর্তে একদিন যবে, পঞ্চ নদীর তীরে মিলি সবে;
উড়াল পতাকা জয় গৌরবে পূর্বপুরুষগণ।
হে প্রাচীন তব বক্ষে ধ্বনিছে, সে যুগের স্পন্দন।

প্রণমি তোমায় স্বাধীন ভারতবর্ষ
একি চাপলা রক্তে জাগায় তোমার স্মরণ স্পর্শ।
অশোক, প্রতাপ, শিবাজী সেদিন প্রতাপাদিত্য রঞ্জিসিং
বীর বিক্রমে রেখেছে স্বাধীন তোমার চরণ তীর্থ।
শত্রু নাশিতে রক্ত দিয়াছে লক্ষ তরুণ চিত্ত।
প্রণমি তোমায় সোনার ভারতবর্ষ
রত্নপ্রসবা বক্ষে নিত্য অমৃত নির্য্যর বর্ষ।
মস্তকে শোভে গৌরী শৃঙ্গ নয়নে সূর্য্য রাকা
শ্যাম অরণ্য অঞ্চলে দোলে, কুন্তলে নৌহারিকা।
কণ্ঠ মাণ্ডো উলসে গঙ্গা নিঃশ্বাস ফুল গন্ধে;
চরণ ধোত করিছে সিদ্ধ উর্দা ছপূর ছন্দে।
বিপুল প্রকৃতি অর্থ দানিছে স্বর্ণ শস্য ভারে।
চির নমস্য ভারতবর্ষ বন্দনা করি তারে।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীবেলা দে

নারীর গৃহে বসে অর্থোপার্জন

শ্রীবেলা দে

আধুনিক যুগে নারী জাগরণ, নারীসমস্যা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি পুরাণো কথাগুলির সঙ্গে আর একটা নতুন কথা উঠেছে নারীর আর্থিক স্বাধীনতা। এই সমস্যাটি কি উপায়ে সমাধান করা যায়? আমার মনে হয় আজকের নানা সমস্যার মধ্যে এই সমস্যাটি প্রথম ও প্রধান বললে অত্যন্ত বলা হবে না। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে সকল মেয়েরাই তো শিক্ষিত নন যে উপার্জন করবেন। গৃহকর্ম ও গৃহকর্তব্যগুলিকে তুচ্ছ করে যদি প্রতি ঘরের মেয়েরা আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে বাইরে আসেন, তবে গৃহের ভার কার হাতে থাকবে? বাইরে গিয়ে পুরুষের মত কাজ করার কথা বলব না, আমি বলছি ঘরে বসেই নারী তার আর্থিক সমস্যার কিছুটা সমাধান করুন! আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত ঘরে দেখা যায় স্নান, খাওয়া প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য কর্তব্যগুলি ও গৃহস্থালীর সামান্য কাজকর্ম ছাড়া মেয়েদের আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। এমন কি কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে যেটুকু অবসর মেলে তাও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অপব্যবহারই হয়ে থাকে। কিন্তু এ ভাবে সময় নষ্ট না করে বর্তমানে জটিলতার সমাজ ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রার দিনে সংসারকে নানারূপে আর্থিক সাহায্য করবার জন্য প্রত্যেক বাড়ীর মা বোনদের অবসরটুকুর সদ্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। পুরুষেরাই সাধারণতঃ আমাদের দেশে অর্থ-উপার্জন করে থাকেন এবং মেয়েরা সেই অর্থের উপরই সব কিছুই জ্ঞান নির্ভর করে থাকেন। কিন্তু এর ফলে মেয়েদের নিজস্ব কোন অবলম্বন বা আশ্রয় থাকে না। অভিভাবকের জীবনকালে প্রত্যেক খুঁটিনাটির জন্য তাঁর মুখ চেয়ে থাকতে হয় এবং সেই অভিভাবক পুরুষের অভাবে অনেক সময় সংসার সম্পূর্ণ অচল

হতেও দেখা যায়! তাই স্বামীর কি পিতার মৃত্যুতে সম্পূর্ণ অসহায় ও নিরাশ্রয় নারীর দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে খুব বেশীই চোখে পড়ে! এই কারণে স্বল্পশিক্ষিতা নারীদের গৃহে বসে নানারকম উপায়ে উপার্জন করতে শেখা প্রয়োজন। সীবন বয়ন প্রভৃতি অর্থকরী ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সহায়ক কোন না কোনও শিল্পবিদ্যায় মেয়েদের তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অর্থকরী শিল্পগুলির মধ্যে বুনন—গেঞ্জি সোয়েটার, পুলওভার, নানা রকম লেস বোনা প্রভৃতি বুনন শিক্ষা। খেলনা তৈরী :—মাটি, রং, কাগজ, তালপাতা, শোলা, বিড়ক, কাপড় ও তুলোর সাহায্যে খেলনা তৈরী করা।

বেতের কাজ—চুপড়ী, চেঙ্গারী, ডালা, হাত পাখা, নানারূপ সাজি ইত্যাদি।

চামড়ার কাজ—ভ্যানিটি ব্যাগ, মানি ব্যাগ, কুশান কভার, রাইটিং প্যাড ইত্যাদি তৈরী করা।

সুচি কাজ—জামা কাপড় সেলাই করা, জামায় ফুল তোলা, কাশ্মীরী কাজ, জামদানী কাজ, কাঁথা ইত্যাদি।

চরকা কাটা বা তাঁত বোনা—গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি তাঁতে বোনা।

মাটির জিনিষ তৈরী ও চিত্রিত করা—মাটির হাঁড়ী সরি ফুলদানী ইত্যাদি।

ছবি আঁকা—বিজ্ঞাপনের জন্য বা শাড়ীর পাড় ইত্যাদির জন্য।

শাড়ী রং করা ও ছাপা—বাটিক, জয়পুরী ইত্যাদি।

কাট হাঁট সেলাই শিক্ষা করা।

এ ছাড়া নানা রকম আচার, চাটনী, জ্যাম, জেলী, আমসবু, বড়ি, নানা রকমের মিষ্টি ও নোনতা খাবার, মুড়ি, চিড়ে, খৈ, চানাচুর, প্রভৃতি ছোট খাটো খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ করা ইত্যাদি কাজগুলি গৃহে বসে করতে পারলে আর্থিক সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। বাড়ীর সংলগ্ন

জমীতে শাক সবজী বা ক্ষেত করলে তার চাষ ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা ও সংসারের আয় বৃদ্ধি হতে পারে।

এই সব নানা রকম কুটীর শিল্প ও ছোট খাটো কাজের সাহায্যে অর্থাগম হলে কেবলমাত্র যে গৃহের স্বচ্ছলতা বাড়বে তা নয়, এ থেকে নারী কিছুটা আত্মনির্ভরশীলও হতে পারবেন, পরমুখাপেক্ষিতা অনেকটা দূর হয়ে যাবে। এই ভাবে ঘরে বসে অর্থ উপার্জন করে সংসার যাত্রা নির্বাহ করায় বা সংসারের সাহায্য করায় অগৌরব বা অসম্মান কিছু নেই, বরং নারীর আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস আরো স্পষ্ট আরো মূর্ত হয়ে উঠবে! অপরপক্ষে, অপরের অর্থে চিরকাল কাটাতে হলে নারীর মন ক্রমশঃ হ্রবল হয়ে যায়, আত্মবিশ্বাস দূর হয়। আত্মনির্ভরশীল হতে পারলে সমাজে সে নারীর স্থান ঠিক পুরুষেরই পাশে একথা কথা মনে করে সে পায় সব চেয়ে আনন্দ ও সান্ত্বনা।

উলের টিপট ঢাকা

শকুন্তলা

প্রয়োজনীয় জিনিস :—যে কোন রংয়ের উল ৪ আউন্স,

৮ নম্বরের কাঁটা ১ জোড়া, আধ ইঞ্চি চওড়া রিবন ১ গজ।

প্রথমে কাঁটায় ৬৪ ঘর তুলে তার উপর ১৬ লাইন ২ সোজা ২ উল্টো বুনতে হবে।

১৭ লাইন—* ১ সোজা, সামনে স্বতা, ১ জোড়া* পুনরাবৃত্তি কর। সব শেষে ১ সোজা।

১৮ লাইন—সব উল্টো।

১৯ লাইন—সব সোজা। শেষের ছ' লাইনের বুনন পর পর আরো ছ'বার পুনরাবৃত্তি কর।

২৪ লাইন—সব উল্টো।

২৫ লাইন—* ২ উল্টো, ২ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। ২৫ লাইনের বুনন আরো ৩ লাইন বুন যাও—তারপর আবার ১৮ লাইন থেকে ২৪ লাইন পর্যন্ত বুননের একবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

৩৬ লাইন—* সোজা, ২ উল্টো * পুনরাবৃত্তি কর।

৩৬ লাইনের বুনন আরো ৩ সারি বুন যাও।

এবার ১৮ লাইন থেকে ৩৯ লাইন পর্যন্ত পর পর আরো ছ'বার পুনরাবৃত্তি কর। এইবার আবার ৩ লাইন শুধু বিছা বুন বুন যাও।

তারপর—

১ম লাইন—* ৮ সোজা ১ জোড়া * পুনরাবৃত্তি কর।

সব শেষে ৪ সোজা। এখন ৫৮ ঘর অবশিষ্ট রইল—এই ঘরগুলোর উপর ৬৪ লাইন শুধু সোজা 'গোট' বুনতে হবে। তারপর সমস্ত ঘর বন্ধ করে দাও। এবার শেষ নমুনার পর থেকে ভাঁজ দিয়ে গোট বোনা এই অংশটিকে রিবন পরাবার জাল ঘরের নীচ অবধি নিয়ে গিয়ে জুড়ে দাও। ভাঁজ যা হবে তা বুননের উল্টো দিকেই থাকবে। অপর একটা অংশ ঠিক এই নিয়মে ঘর তুলে বুন জুড়ে দাও। এই ভাবে বোনার সোজা দিক সামনে রেখে তলা থেকে ছ' পাশেই ছ' ইঞ্চি করে সেলাই করে জুড়তে হবে। তারপর ছ' পাশেই তিন ইঞ্চি করে জায়গা বাদ দিয়ে রাখ এবং বাকী যে অংশটি রইল তাকে শেষ পর্যন্ত জুড়ে দাও। রিবন পরাবার ঘরে রিবন পরিষে ফাঁস বেঁধে দাও তা হলে উলের টিপট ঢাকা প্রস্তুত হবে।

রান্নাঘর—ময়দার রসপুরী

শোভা দাস

উপকরণ :—এক পোয়া সাদা ময়দা, নেড় পোয়া চিনি, এক পোয়া ছুধ, চার পাঁচটি ছোট এলাচ, ও এক পোয়া ঘি।

প্রণালী :—প্রথমে ঐ চিনির রস করে নেবেন বেশ ঘন করে। ময়দা ও ছুধ একটা পাত্রে ঢেলে নাড়তে থাকবেন চামচ দিয়ে। ছুধ বা ময়দা কোনটায়ই একদম জল দেবেন না। ছুধ দিয়ে ময়দা গুলবেন এমন করে যে, ময়দার যেন একদম ডেলা না থাকে। ছোট এলাচ গুঁড়িয়ে ওর সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। এবার উনানে ঘি চাপিয়ে দ্বিগুণ একটা পিতলের বা এলুমিনিয়ামের পাত্রে করে ৮ ঘি গরম হয়ে গেলে ঐ ময়দার কাই একটু একটু করে ছেড়ে দেবেন, একটা ছোট হাতায় করে। এমন ভাবে দেবেন যে, যেন একটা আর একটির গায়ে লেগে না যায়। বেশ লালচে হয়ে এলে ঐ ভাজাপুরী চিনির রস দিয়ে দেবেন। তারপর ঘটা দুই পরে সদ্যবহার করবেন। ঘি এমন ভাবে পাত্রে দেবেন যে, ঐ পুরী যেন ঘিয়ে ডুবে যায়।

দ্রষ্টব্য—* এই তারকা চিহ্নটির মানে হচ্ছে পুনরাবৃত্তির চিহ্ন অর্থাৎ এই দুটা তারকা চিহ্নিতের মধ্যের লেখাটা একবার বোনা হয়ে গেলে, আবার প্রথম তারকা চিহ্ন থেকে আরম্ভ করে ২য় তারকা চিহ্ন পর্যন্ত কাজ শেষ করবে।

কাঁঠাল বীচির পুলী

উপকরণ—কাঁঠাল বীচি ১১, চিনি তিন পোয়া, আধপোয়া ময়দা, দুটী নারিকেল ও এক পোয়া গুড়।

প্রণালী—প্রথমে কাঁঠাল বীচিগুলিকে খোসা ছাড়াইয়া গরম জলে গসিক করিতে হইবে। পরে ঐ বীচিগুলিকে বাটিয়া ময়দা সহ চটকাইয়া নিন, ভিতরে পুর দিয়া ছোট ছোট পুলি তৈয়ারী করুন। এবার পাতে ঘি চড়াইয়া দিন। যখন দেখিবেন যে ঘি হইয়াছে তখন ঐ সকল পুলিকে ঘিয়ে ভাজিবেন। ভাজা হইবার পর ঐগুলি চিনির রসে ফেলিবেন।

কলাইয়ের ডালের পুরী

প্রথমে আন্দাজ মতো কলাইয়ের ডাল ভিজিয়ে রাখবেন। ডাল বেশ ভালভাবে ভিজলে, শিলে বেশ মিহি করে বেটে নিন। তারপর দু তিন খানা তেজপাতা, মৌরী, জিরে,

মরিচ, আদা ও লঙ্কা এইগুলিও বেশ মিহি করে বেটে নিন। এইবার উত্তনে চাটু চাপান, তেলের পলা বা চামচে করে চার পাঁচ ফোঁটা তেল চাটুতে দিন, তেলটা বেশ গরম হয়ে গেলে, ঐ ডালবাটাতে একটু খাবার সোডা ও কালো জীরে, পরিমাণ মতো ছুন দিন। ঐ মশলা বাটা ডাল বাটার সঙ্গে একত্রে মিশিয়ে সামান্য জল দিয়ে বেশ করে ফেটিয়ে নিন। একটা বেগুনের বোঁটা কেটে রাখবেন। যেমন ডালের বড়া তৈরী হয়—এরূপে বড়ার মতো চাটুতে ছাড়বেন। তারপর ঐ বেগুনের বোঁটাটি দিয়ে ঐ বড়াটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লুচী সাইজ করবেন। যেমনভাবে সরু চাকলী ভাজে সেইরূপে ভাজতে হয়। এইবার খুস্তী দিয়ে উন্টে দিন, আবার চার পাঁচ ফোঁটা তেল দিন। বেশ ভাল ভাজা হলে, নামাবেন। এটি খুব মুখরোচক খাবার। গরম গরম খেতে খুব ভাল লাগে।

উপার্জননী

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

গড়িয়া তুলিতে হবে দেশ

গাঁথিয়া তুলিতে হবে কাজ

গঠন লক্ষ্মীরে ঘরে আনি

পর্যাইতে হবে নব সাজ।

ঘরে ঘরে নগরে নগরে

বিছাইয়া লক্ষ্মীর আসন

বিসর্জিতে হবে অলক্ষ্মীর

দুর্বিনীত অনর্থ ভাষণ।

মিথ্যার কুটিল কুজাটকা

দুর্নীতির দুঃস্বপ্ন বিচার

নির্লজ্জের চটুল চাতুরী

প্রতি পদে করি পরিহার।

চলিতে হইবে রাজপথে

দলিত করিয়া দুঃখরেশ

আপনারে বাঁচাইয়া তুলি

বাঁচাইতে হবে সর্বদেশ।

অন্ন দিয়া জল দিয়া মুখে

শুক বৃক হবে ভিজাইতে

লক্ষ্মীভাণ্ড হতে স্নান নিয়া

জনে জনে হবে জিয়াইতে।

আবাহন গঠন লক্ষ্মীর

বিসর্জন ভাঙ্গনের ভেলা

শ্রোত মুখে ভেলা ভেসে যায়

জেগে রয় গঠনের মেলা।

“উপার্জননী” “আপায়নী” দৌছে

দুল দুল পাশাপাশি দৌলে

তার মাঝে লক্ষ্মীপাত্রখানি

অচঞ্চল সততার কোলে।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

শারীরিক শিক্ষা শিবির

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে। আশা করা যায় গতানুগতিকের পথ ছেড়ে ভারতবর্ষ শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে পারবে—যে শিক্ষা দেশের ও কালের উপযোগী হবে।

শারীরিক শিক্ষা বাদ দিলে শিক্ষার অঙ্গহানি হবে এবং সে শিক্ষা পঙ্গু প্রাপ্ত হবে। সুখের বিষয়, যে এই সম্বন্ধে দেশ সচেতন হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে। বাঙ্গালা দেশে গত কয়েক মাসের মধ্যে নানা ভাবে, নানা সমিতি ও সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষার প্রতি আগ্রহের অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছে। সব থেকে বড় কথা এই যে এই শিক্ষা বাংলার মেয়েদের মনকে আকর্ষণ করেছে। মেয়েদের শরীর সবল না হলে জাতি গড়ে উঠবে না একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে বলার দিক দিয়ে বাহুল্য হলেও কাজের দিক দিয়ে এতদিন এর জ্ঞান আমরা কিছুই করিনি। সম্প্রতি এই বিষয়ে দেশে একটু সাড়া দেখা দিয়েছে এবং পশ্চিম বঙ্গ শারীরিক শিক্ষক সমিতি তাঁহাদের প্রথম কর্তব্য হিসেবে মেয়েদের জ্ঞান এক মাসের মত একটি শারীরিক শিক্ষা শিবিরের পরিচালনা করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই শিক্ষা শিবিরটিতে ২০টি মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। শারীরিক শিক্ষকেরা অনেকে বহু পরিশ্রম করে নানা বিষয়ে যেমন—ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ পতাকা সঙ্কেত, ব্রতচারী, সঁতার, সাইকেল চালনা, আত্মরক্ষা মূলক কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং অন্যান্য সুখী ব্যক্তিদের দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং নানা বিষয়ে শিক্ষা দান ও আলোচনা করা হয়। শিক্ষার্থিনীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এবং বিশেষ পরিশ্রম করে এই শিক্ষা গ্রহণ করেন। গত ১৩ই জুন শিক্ষা দিবসে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মোহন সেনের সভাপতিত্বে সূচকরূপে শিবিরের সমাপ্তি সভা হয়।

সমস্ত প্রকার চাকরীতে স্ত্রীলোকের

প্রবেশাধিকার

নয়াদিল্লী, ১৭ই জুলাই—ভারতে যে কোনও সরকারী চাকরীতে স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশাধিকার থাকিবে। ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসও নারীদের জন্য খোলা থাকিবে। অল্প অপরাধে প্রাদেশিক

প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গেল।

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে বঙ্গ মহিলা

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভা ৮০ জন সভ্য লইয়া গঠিত, তাহার মধ্যে ৪৪ জন নির্বাচিত সভ্য। এই বৎসর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা প্রাজুয়েট নির্বাচক মণ্ডলী হইতে শ্রীমতী বেলা মুখোপাধ্যায় সিনেট সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীরাই নানা উদার মনোভাব লইয়া নানা প্রদেশে শিক্ষা বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করিয়া আসিতেছেন আজ এক শতাব্দীর অধিক। তথাপি প্রাদেশিকতা মোহভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ বাঙ্গালীবিদ্বেষ অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীদের জীবন দুঃখময় করিয়াছে। বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে। এখন প্রতি বাঙ্গালীর সম্মানবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব চরিত্র ও মেধা দ্বারা দেশ বিদেশে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

বিনাশী সাংবাদিক বিদ্যায় বাঙ্গালীর মেয়ে

শ্রীমতী কল্যাণী গুপ্ত, বি, এ, (কলিকাতা) ইংলণ্ডে ছুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া “লণ্ডন স্কুল অব জার্নালিজম” হইতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই সাংবাদিক শিক্ষা বিদ্যালয় হইতে তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা ডিপ্লোমা পাইলেন। পাশ করার পর কুমারী কল্যাণী ছয় মাস বিখ্যাত সংবাদপত্র “ইলফোর্ড রেকর্ডার” ছাপা খানায় ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই প্রকার হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি এক পররাষ্ট্র দূতের আফিসে যুক্ত হইয়াছেন।

মহিলাদের রাইফেল চালনা শিক্ষা

জুলাগড়ে ৮০ জন রাইফেল চালনায় শিক্ষিতা মহিলা লইয়া একটি সমস্ত মহিলাবাহিনী গঠিত হইয়াছে। জুলাগড় টেট পিপলস্ কাউন্সিলের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী পুষ্প বেন এই সম্বন্ধে প্রধান নেত্রী। তিনি একটি জন সভায় নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্ত আরো অধিক সংখ্যক মহিলাকে

সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিয়া রাইফেল চালান শিখিতে অনুরোধ করেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনীর অন্তর্গত বাঙ্গালীর রাণীর বিগ্রেড গঠন করিয়াছিলেন। তাহাতে কয়েকটা বাঙ্গালী রমণীও রণদক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন।

সে বাহিনীর আর কোন অস্তিত্ব নাই। স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের লইয়া এখন রণদক্ষ সৈন্যবাহিনী গড়িয়া উঠে নাই। স্বাধীন জাতির প্রধান কর্তব্য স্বদেশের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা। আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া না থাকিয়া অবিলম্বে সৈন্যদল গঠন করা কর্তব্য।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে অন্তর্কলেজ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা (ইংরাজী ভাষায়) অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাশের ছাত্রী শ্রীমতী দীপ্তি আচার্য্য সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইয়াছেন।

গভর্নমেন্ট হাউস মহিলা চরকা কমিটি কেন্দ্র

শ্রীমতী সাবিত্রী কাটজুর উদ্যোগে কলিকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে একটা চরকা কাটার কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। প্রতি বৃহস্পতিবার ১০টা হইতে ১২টা মধ্যাহ্নে চরকা কাটার ক্লাশ বসিবে। বাহারী এই ক্লাশে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারী শ্রীমতী সাবিত্রী কাটজুর নিকট নাম পাঠাইতে পারেন।

এই ক্লাশ ব্যতীত উইমোন্স ইমার্জেন্সী রিলিফ কমিটি আরো কতকগুলি কেন্দ্র খুলিয়াছেন, যথা—

শ্রীমতী স্বজাতা দাসের অধীনে ১০১ বেলভলা রোডে, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা সেনের অধীনে ১ ডোভার লেনে, কোশলাবাই হস্তার পরিচালনায় ১৬ পদ্মপুকুর রোডে, শ্রীমতী মায়াকুমারী সার পরিচালনায় গভর্নমেন্ট হাউসে, অশুভ্রাণী মিত্রের অধীনে ১১, শান্তি ঘোষ ষ্ট্রীটে, শ্রীমতী অঞ্জলি সেনের পরিচালনায় ১৩৪, শিবপুর রোডে কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

অনুসূয়া বাঈএর কলিকাতা সম্বর্দ্ধনা

নিঃ ভাঃ মহিলা সম্মেলনের বর্তমান সভানেত্রী কলিকাতায় আগমন করায় তাঁহাকে পালিত ষ্ট্রীটে সম্মেলনের কলিকাতা

শাখা কেন্দ্রে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী, ও শ্রীযুক্তা এস, সি, মুখার্জীর পরিচালনায় শ্রীমতী কালেকে অভিনন্দিত করা হয়। শ্রীমতী অনুসূয়া বাঈ মেয়েদের বিবাহ সমস্যা এবং সম্পত্তি অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীমতী হেণ্ডকা রায়কে এই প্রয়োজনীয় আইন প্রবর্তনের জন্য গণপরিষদে ও ভারত ব্যবস্থাপক সভায় কথা তুলিতে তিনি অনুরোধ করেন।

প্রথম নারী ভাইস্‌চ্যান্সেলার

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এইবার সর্বপ্রথম একজন মহিলা ভাইস্‌চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এঁর নাম লিলিয়ান পেন্সন, বয়স ৫১ বৎসর। তিনি ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ‘ডিন’ ছিলেন।

অলিম্পিক রেকর্ডে এ মহিলা

বর্তমান বর্ষে লণ্ডন সহরে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই অনুষ্ঠান ক্রীড়া জগতে অতি বিখ্যাত অনুষ্ঠান। বহু প্রাচীন যুগে গ্রীস দেশে ইহা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। তদবধি যুগে যুগে নানা দেশের ক্রীড়া কৌশলী নরনারী নানা প্রকার ক্রীড়া কৌশল ইহাতে প্রদর্শন করিয়া থাকে।

বর্তমান বর্ষে স্বাধীন ভারতবর্ষ হইতে ফুটবল, হকি ওয়াটার পোলা খেলোয়াড়দের দল এবং দৌড়, সাঁতার, লম্ফ আদি ক্রীড়া কৌশলী উক্ত প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। পৃথিবীর প্রায় ৮০টা দেশের খেলোয়াড়গণ উপস্থিত ছিলেন। ছুঃখের বিষয় ভারতের কোন দল বা কোন ব্যক্তি কোন ক্রীড়ায় শেষ পর্যন্ত জয়ী হইতে পারেন নাই।

বর্তমান বর্ষে কয়েকটা ক্রীড়া কৌশলী মহিলা জগতের পূর্ব প্রাপ্ত জয়ের মান অতিক্রম করিয়া মান সংস্থাপন করিয়াছেন।

৮০ মিটার হাউল রেসে মিসেস ব্রাহ্মসর্গ কোরেন ও মিস মুরান গার্ডনার (ইংলণ্ড) পৃথিবীর রেকর্ড অতিক্রম করিয়াছেন। সময় ১২.২ সেকেন্ড।

২০০ মিটার মহিলাদের বুক সাঁতারে ডাচ বালিকা ড্যানলীট ২ মিঃ ৫৭.৭ সেকেন্ডে ও অস্ট্রেলিয়ান বালিকা লায়ন্স নুতন অলিম্পিক রেকর্ড করিয়াছেন। ১৯৩৬ সালে জাপানের মহিলা সাঁতারু ৩ মিঃ ১.৯ সেকেন্ডে অতিক্রম করিয়া রেকর্ড

করিয়াছিলেন। গ্রীষ্ম প্রধান নদী বহুল বাংলাদেশের অন্ধ মেয়ের বাসনা

সাঁতারুরা কি করিতেছেন?

ইভ হার্ডিয়ান মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে অন্ধ হন, তখন

বর্তমান বর্ষে কলিকাতা হইতে যে খেলোয়াড় দল থেকেই তাঁর বাসনা ছিল যে তিনি বৃটেনের প্রথম অন্ধ নারী অলিম্পিক অলুষ্ঠানে গিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে ব্রতচারী ও সলিসিটর হইবেন। তিনি সম্প্রতি বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় গুরুসদয় দত্তজীর প্রিয় ফটোগ্রাফার নিলু দাস গিয়াছেন। —থেকে অনাস' সহ আইন পরীক্ষায় ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন।

রবীন্দ্র সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের দিনে কলিকাতায় বাংলাদেশে এবং বাংলার বাহিরেও নানা স্থানে তাঁহাকে স্মরণ করা হইয়াছে। ইহা বাঙালীর ও ভারতবাসীর কর্তব্য। কিন্তু যত স্কুল কলেজ ও সভা সমিতিতে তাঁহাকে স্মরণ করা হয়, তাহার মধ্যে অনেক স্থলেই যদি খোঁজ করা যায়, দেখা যাইবে নবীন ও প্রাচীন শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্র সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত নহেন। রেডিও এবং গ্রামোফোনের কল্যাণে রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেকে শোনেন, তাই তাঁর গানগুলির কিয়দংশের সহিত মানুষের পরিচয় হইয়া গিয়াছে। যাহাদের রেডিও বা গ্রামোফোন নাই তাঁহারাও অনেকে সভা সমিতি থিয়েটার সিনেমাতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের কিছু আশ্বাদ পান। কিন্তু পাঠ্য পুস্তক হিসাবে যে সব ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্র রচনা পড়ান হয় তাঁহারা ছাড়া শতকরা কয়জন বাঙালী বই কিনিয়া বা লাইব্রেরী হইতে আনিয়া রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করেন আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে। এই জন্য বঙ্গলক্ষ্মীর পাঠক তত্ত্ব হিসাব করিবার সুবিধা হয়। তাহারাও নাম প্রকাশ করা

মাঝে কয়টি তাহারা পড়িয়াছেন এবং কতদিন আগে পড়িয়াছেন যদি পোষ্টকার্ডে লিখিয়া দিয়া করিয়া জানান তবে মোটামুটি একটা হিসাব বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশ করা যায়।

তালিকা:—বোঁঠাকুরাণীর হাট, নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরু, শেষের কবিতা, চতুর্দশ, মালঞ্চ, যোগাযোগ, গল্পগুচ্ছ, গোড়ায় গলদ, চিরকুমার সভা, বিসর্জন, রাজা ও রাণী, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, রাজা ও প্রজা, সমাজ, স্বদেশ, সমুদ্র, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য, বিচিত্র প্রবন্ধ, রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, ফাল্গুনী।

বাহুল্য ভয়ে কাঁব্যগুলির এবং অত্যাশ্চর্য আরও অনেক রচনার নাম দিলাম না। পাঠক পাঠিকারা যিনি যতগুলি পড়িয়াছেন যদি সম্পাদিকার নামে পোষ্টকার্ডে লিখিয়া পাঠান তবে হিসাব করিবার সুবিধা হয়। তাহারাও নাম প্রকাশ করা হইবে না।

ভ্রম সংশোধন

বঙ্গলক্ষ্মীর প্রাথম সংখ্যায় ছাত্রীদের কৃতিত্বের সংবাদে একটি ভুল থাকিয়া গিয়াছে। ভ্রমক্রমে শ্রীমতী ক্রান্তি ঘোষের নাম বাদ পড়িয়াছে। ইনি চন্দ্রনগর কলেজ হইতে আই, এ, পরীক্ষা দিয়া ৭ম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

বাঁধনহারী—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী রচিত উপন্যাস। বাঙ্গালার নূতন ভাবধারা ও সাহিত্য ঐশ্বর্য ফরাসী বিদ্য প্রকাশক সিটি বুক কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, মঙলীতে পরিবেশন করিয়া বাঙ্গালা দেশের পরম উপকার মূল্য ২১০ টাকা। ডাঃ ক্রাঃ ১৬ পেজী ১৮১ পৃঃ। করিতেছেন।

লেখিকা এই উপন্যাসে আধুনিক যুবক যুবতীদের মনের কথা, চিন্তার ধারা অতি সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীমতী ইন্দিরা ১৭৫৭ খ্রীঃ হইতে ১৯৩৫ সাল দেড় শতাব্দীর অধিক কালের বাংলা ও ফরাসী সাহিত্যিকদের নামের ও তাঁহাদের সাহিত্য সাধনায় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

উপন্যাসের মোক্ষ উদ্যোগ আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি ও সাহিত্য রস সৃষ্টি। লেখিকা বাঙ্গালার সমাজের নরনারীর সঠিক বর্ণনা যেরূপ সরল সহজভাবে করিয়াছেন তেমনই বর্তমান যুগের উপযোগী পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করিয়া উপন্যাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

লেখিকার পূর্ব উপন্যাসের যে সব ক্রটি আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা এই পুস্তকে আর তেমন না থাকায় মনে হয় লেখিকা শীঘ্রই বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন।

Socio-Literary Movements in Bengali and French—কুমারী ইন্দিরা সরকার, এম, এ, প্রণীত। প্রকাশক কলিকাতা ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি, ৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন। মূল্য ২১০ টাকা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লেখিকা ফরাসী ও বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে ফরাসী সুধীজনের মধ্যে প্রচারিত করিয়া ধন্য হইয়াছেন। লেখিকা নিজে ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফরাসী ভাষায় এম, এ, পাশ করিয়া প্যারিসে গবেষণা করিতেছেন। তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের কন্যা। সেই জন্য

বাংলা পুস্তক প্রকাশক ও লেখক এবং লেখিকাগণ ফরাসী দেশে এই সংগ্রহটি পুষ্ঠ করিলে বাংলা ভাষার উপকার হইবে।

স্বাধীনতার একবৎসর

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর একটি বছর কাটিয়া গেল, স্বাধীন ভারতের একটি বছরের ইতিহাস ঘটনাবলি ও বঙ্গোপর্ণ। ঠিক এক বৎসর পূর্বে ইংরেজ ষে-ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহা সেই সোনার ভারত নহে। তাহারা ত্যাগ করিয়াছে ছুভিক্ষক্লিষ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত ও সাম্প্রদায়িকতার হলহল পূর্ণ ভারতবর্ষ। সাম্প্রদায়িকতার বিষ উৎপাতন করিতে যাইয়া বিশ্বের মহামানব, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধী আত্মবলিদান করিলেন। এই ক্ষত ভারতের বক্ষ হইতে কোন কালেই অপসারিত হইবে না। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িকতার জটিল সমস্যা যেভাবে সমাধান করিতেছেন, তজ্জন্ত সারা বিশ্বের দৃষ্টি তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের ঘটনাবলী বিবাক্ত ক্ষতের ন্যায় ভারতের সমগ্র অংশে প্রসার লাভ করিবার যে অপচেষ্টা করিতেছে, তাহাতেও নেতৃবৃন্দ যে নীতি ও ধৈর্যের পরিচয় দিতেছেন, তাহাও ভারতের মহান আদর্শের পরিচায়ক। আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যাও জাতীয় সরকারকে বিশেষ বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এই শ্রেণীর প্রতিকূল ঘটনাবলী দেশের অবস্থা অনেকটা জটিল করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণের একটি অংশ এই এক বৎসরে যে আচরণ ও মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে অবস্থা অধিকতর জটিল হইয়াছে, এবং নবলব্ধ স্বাধীনতার প্রতি জনসাধারণের বৃহত্তর অংশে নিপীড়িত সমাজের বিরক্তি ভাব আনিয়াছে। বিদেশী শাসনের আমলে সরকারের কার্যাবলী বিষয়ে জনসাধারণ অনেকটা উদাসীনই ছিল; কারণ তাহারা জানিত, তাহাদের কার্যাবলী সরকারের স্বার্থের জন্যই, জনসাধারণের স্বার্থের জন্য নহে। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও যে সেই ধারা অপরিবর্তিত থাকিতে পারে, ইহা বিশ্বাসেরই কারণ। কিন্তু কার্যতঃ বহু ক্ষেত্রে তাহাই হইতেছে। প্রসঙ্গতঃ দুর্নীতির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংরেজ শাসনের সময় দুর্নীতি বর্ধমান ছিল, বর্তমানে তাহা কি অনেক গুণে বাড়িয়া যায় নাই? গুণিতেছি।

জাতীয় সরকারের আমলে তাহা কি করিয়া সম্ভব হইল, ইহাই ভাবিবার বিষয়। স্বার্থান্বেষণ যে ভাবে দুর্নীতির পসরা লইয়া দেশবাসীর এক বৃহত্তর অংশকে বিব্রত ও নাজেহাল করিতেছে, সরকার যদি সত্যি তৎপর হইতেন, তাহা হইলে তাহারা অতটা সুযোগ নিশ্চয় পাইতে পারিত না। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দেশরক্ষা ও দেশশাসন করিবার ভার বাহাদের হাতে ছিল, স্বাধীনতা লাভের পরে তাহার আমূল না হউক অন্ততঃ কতকটা সংস্কার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাহা করা হয় নাই। আমলাতান্ত্রিক সরকারের আমলে বাহারা বিদেশীদের মনস্তত্ত্ব দ্বারা নিজেদের খেতাব ও পসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্কল্পই যেন বর্তমানে সরকার করিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা দেশবাসী যে প্রকৃতপাণ্ডনা হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করিতে বাহারা অশেষ লালুনা ও অত্যাচার সহ করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাঁহাদের অনেকেই অবহেলিত। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে সেই সকল নিঃস্বার্থ বীর কন্দিদের আজ একান্ত প্রয়োজন। তাঁহাদের কর্মক্ষমতা ও চারিত্রিক গুণে বর্তমান বিবাক্ত হাওয়া সত্ত্বর পরিবর্তন সম্ভব হইবে, এই আশা নিশ্চয় করা যায়। স্বাধীনতা লাভ করিতে বাহারা তিলে তিলে রক্ত দান করিয়াছিল, স্বাধীনতার মধ্যাদা রক্ষা কল্পে তাহাদের দান সার্থক হইবে, সে ধারণা সরকারের আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

দেশ বলিতে দেশের সাধারণ মানুষকেই আমরা বুঝি। তাহারা, চাষা, ভূষা, কামার কুমোঁস, কারিগর, কেবানী, জুল মাষ্টার, অধ্যাপক বাহাই হোক না কেন, তাহারা দরিদ্র, বড় জোর মধ্যবিত্ত। এই যে সাধারণ মানুষগুলি গত এক বৎসরে ইহাদের জীবনে অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতির যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহাতে তাহাদের দুর্ব্বল জীবনের অস্তিত্ব কতদিন থাকিবে জানি না। স্বাধীন ভারতের কর্তব্যধারণ কবে ইহাদের মুখে অন্ন, অঙ্গে বস্ত্র, দেহে স্বাস্থ্য ও মনে শিক্ষার সহজ উপায় করিয়া দিবেন আমরা সেই আশায় স্থির গুণিতেছি।

কোন এই ক্রীম দু'টি আপনার মুখশ্রী আরও রমণীয় করে তুলবে



মেয়েদের ত্বকের জন্য দুটি প্রসাধন ক্রীমের দরকার। প্রথমটি হ'ল—পণ্ডস কোল্ড ক্রীম—পরিচ্ছন্নতাই সৌন্দর্যের প্রথম সোপান বলে আপনার ত্বক পরিষ্কার ও কোমল রাখার জন্যে স্নিগ্ধ তৈল-মিশ্রিত এই ক্রীম ব্যবহার করার প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়টি হ'ল—পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম,—হালকা তৈল-বিহীন এই ক্রীম অদৃশ্যভাবে ত্বকে লেগে থেকে তাপ ও মুলোর হাত থেকে মুখখানাকে বাঁচিয়ে রাখে।



মনে রাখবেন—গ্রীষ্মের দাবদাহ বা কর্কশ শীতকৃত্ত—এ দুটি সময়েই আপনার ত্বকের বাতাবিক স্নিগ্ধপদার্থ শুকিয়ে গিয়ে তা কালো ও কুৎসিত হয়ে ওঠে।

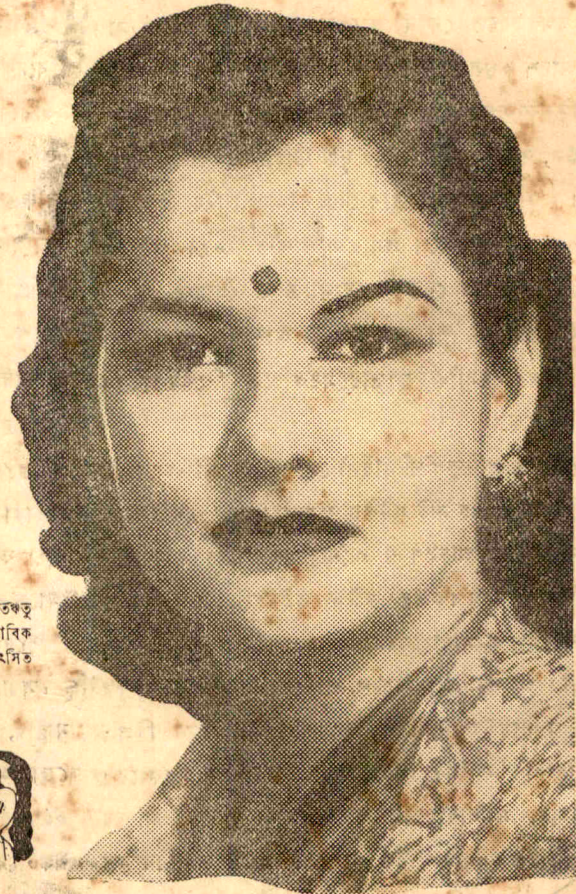
আর, একথাও মনে রাখবেন—লোমকূপের ভিতর মুলোময়লা জমার দরুণই ত্বকে নানারকম বিশ্রী দাগ ধরে।



প্রতিদিন নিয়মিতভাবে দু'রকমের পণ্ডস ক্রীম ব্যবহারে ত্বক উজ্জ্বল, মসৃণ ও নিখুঁত হয়—আর সর্বদাই তরুণ দেখায়। পণ্ডসের দু'টি ক্রীম মুখে মাধা আপনার 'প্রসাধনের অবস্থা করণীয়' কাজ বলে ধরে নিন—এবং বোজ এগুলি নাগুন।

পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মেখে আপনার ত্বক পরিষ্কার রাখুন। প্রতি রাতে স্নিগ্ধ তৈল-মিশ্রিত এই ক্রীমটি মুখে ও গলায় মাখবেন, ত্বকের ভিতরে প্রবেশ করে লোমকূপের ময়লা ও ঘামের দরুণ যে রেন্দ জমে তা টেনে বার করে আনবে। তারপর মুখখানা মুছে আরশি দিয়ে দেখুন,—দেখবেন কেমন উজ্জ্বল ও কোমল হয়ে উঠেছে আপনার মুখশ্রী।

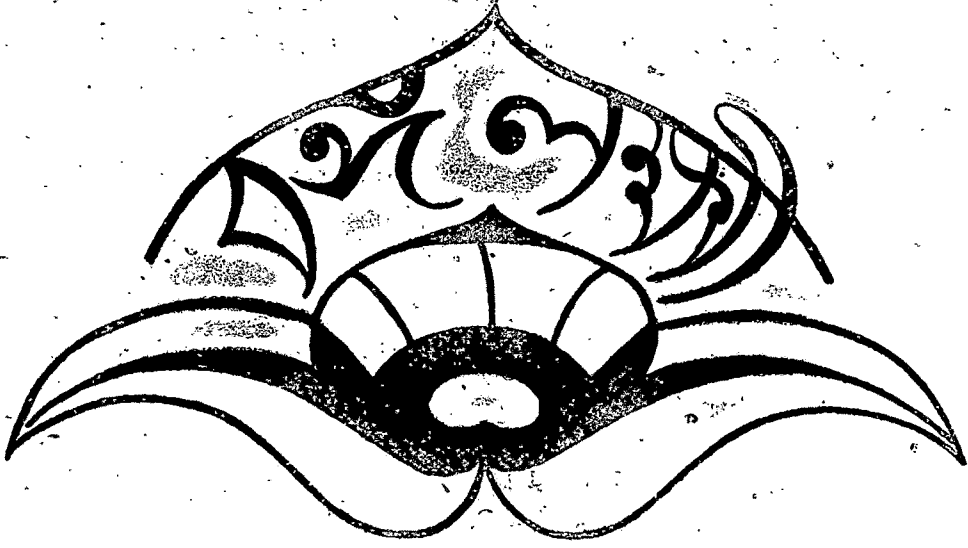
প্রতিদিন সকালে পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে আপনার ত্বক সুস্বিক্ত রাখুন। এই ক্রীম তৈল-বিহীন, ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, কোন রকম চকচকে ভাব থাকে না,—কিন্তু মুখখানা হয়ে উঠে ফুলের মত সুন্দর। আর সারাদিন অদৃশ্য একটি আবরণের মত এই ক্রীম রৌদ্র ও ময়লার হাত থেকে মুখখানাকে বাঁচিয়ে রাখবে, ফলে আপনার মুখের লাবণ্য আরও বেড়ে যাবে।



পণ্ডস

বাবাসংক্রান্ত অসুস্থতাব্যবস্থার জন্য—এল ডি সিমুর এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ
বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, নভাগোয়া, করাচী, কলম্বো, রেঙ্গুন

বঙ্গলক্ষ্মী, ভাদ্র, ১৩৫৫



২৩শ বর্ষ

আশ্বিন—১৩৫৫

১১শ সংখ্যা

অমর-গ্রন্থি

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

যেখানে পেয়েছে মিল সেইখানে ভালবাসা
আসিয়া বেঁধেছে ঘর মিটায়ে দিয়েছে আশা।
যদিও সে ক্ষণিকের তবুও সে মোহ নয়
অন্তরে সে অনন্তের চির সত্য পরিচয়।
বলকিছে পথে পথে মিলনের ক্ষণ ছাতি
রচিতোছে দেবতার আরাধনা স্তব্ধতি।
দেবতা আসেন কাছে ভরিয়া তোলেন প্রাণ
ক্ষণিকের আলোকে সে বিরাটের আশ্রয়দান।
হে দেবতা, হে বিরাট, ক্ষণিকের আলো আলি
জগতে অনন্ত প্রাণ নিয়ত দিতেছ ঢালি।

পেয়েছে যে কাছে তারে হঃছে তাহার সাথী
মিলনে নিখিল সনে আপনি গিয়েছে গাঁথি।
দেবতা বৃহৎ, তবু ছোট হয়ে কাছে আসি,
বাঁধেন অমর গ্রন্থি এ জগতে ভালবাসি।
মহান পুরুষ যারা বন্ধন হয়েছে ক্ষয়,
ভালবেসে জগতের জগতে অমর হয়।
অন্তরের স্বর্গ তাঁরা পথে দেন নামাইয়া
স্বর্গে মর্ত্তে গ্রন্থি বাঁধি মিলনের সূত্র দিয়া।
জগতে এত যে ছুঃখ এত দ্বন্দ্ব হানাহানি
অন্তরে জাগিছে তবু মিলনের মহাবাণী।

লেখকের বিপদ

শ্রীমতী দেবী

“ওগো শুনছ ?”

হীরেন কাগজ পড়িতে বাস্ত, শুনিয়াও উত্তর দিলনা। বিবাহ প্রায় চার বৎসর হইয়াছে, শ্রী অঞ্জলির খাতিরও কমিয়া আসিতেছে। কথা বলিলেই—অত সব সময় উত্তর দেওয়া যায় না, বাজে কথাও সে যথেষ্ট বলে।

অঞ্জলি কিন্তু আজ নাছোড়বান্দা। বলিল, “কোন কি কাল হ’য়ে গেল নাকি? বলি, কালকের কাগজের এই বিজ্ঞাপনটা দেখেছ ?”

ইহার পর উত্তর না দিলে ঝগড়া বাধিয়া যাইবে। গভীর কণ্ঠে হীরেন বলিল, “যত বাজে বিজ্ঞাপন পড়বার আমার অত সময় নেই।”

অঞ্জলির জোড়া ভুরু মথ্যে কলহের ক্রকুটী ঘনাইয়া আসিল। বলিল, “তা থাকবে কেন? ঘরে ছোটো পরমা বেশী এলে তোমার ভয়ানক ক্ষতি কিনা তাতে? এক বেলা হাঁড়ি চড়ে ত, আর একবেলা চড়ে না; এইতেই তুমি বেশ আছ।”

কি জ্বালা! হীরেন হাত-বাড়াইয়া বলিল, “দাও দেখি কি অত্যাশ্চর্য্য বিজ্ঞাপন। সাত সকালেই কোমর বেঁধে ঝগড়া বাধাতে বসলে কেন?”

“ঝগড়া বাধিয়ে আমার লাভ ত কত!” বলিয়া কাল কার কাগজখানা অঞ্জলি তাহার হাতে তুলিয়া দিল।

এক জায়গায় সে মোটা করিয়া লাল পেন্সিল দিয়া দাগ দিয়া রাখিয়াছে। ছোট গল্প লেখা শিখাইবার জন্য এক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। মাসে এক টাকা মাত্র টান্দা, দুই মাস ক্লাশে যোগ দিলেই পাকা গল্প লিখিয়ে বানাইয়া দিবার ভার প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিতেছেন। আর আজকাল ছোট গল্প লিখিতে জানিলে যে রাতারাতি ধনকুবের হইয়া যাওয়া যায়, একথা কে বা না জানে?

অঞ্জলি বলিল, “ছোটো টাকার ত মামলা, দিয়ে ভর্তি হয়ে যাওয়া গেল। সত্যি, এমন করে ত আর চালান যায় না।”

হীরেন বলিল, “ছোটো টাকাই শুধু শুধু পণ্ড করি কেন? তারা যাহোক কিছু কতগুলো বক্তৃতা দিয়ে যাবে, আমি হয়ত তার থেকে কিছুই শিখতে পারবোনা।”

“নিশ্চয় পারবে তুমি শিখতে। তোমার রীতিমত লিখিবার হাত। চিঠিপত্র কি রকম সুন্দর লেখো। একটু নিয়ম কাগজ শিখিয়ে দিলেই তুমি বেশ ভাল লিখতে পারবে।”

তাহার চিঠিপত্র লেখার এত তারিফ করাতে হীরেন খুসি হইয়া আর তর্ক করিলনা। বলিল, “আচ্ছা, দেখছি। টাকা কিন্তু এখন আমার হাতে বেশী নেই।”

শ্রী বলিল, “পরশু না হয় সিনেমায় নাই যাব। তুমি তার জন্যে যে টাকা রেখেছ, তাই দিয়েই ক্লাসে ভর্তি হয়ে এস।” বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। হীরেনের লেখক হইবার সখ বহুদিনের। স্কুল কলেজের পত্রিকায় সে অনেক লেখা বাসো ও যৌবনে দিয়াছে। কিন্তু তখন লোকে ভাল বলিত বলিয়াই যে পেশাদার লেখক হিসাবেও সে কৃতকার্য হইবে এমন কথা বলা যায় না। সে ছিল বলিতে গেলে টাকা দিয়া লেখা ছাপান, আর এখন চাহিবে সে টাকা পাইতে। কাজেই জিনিষের ঔৎকর্য্য বেশী হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ কি? যদি উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে কিছু সাহায্যও পাওয়া যায় ত লইতে ক্ষতি নাই। প্রথম যৌবনের সখটাকে আবার ঝালাইয়া লওয়া যায়।

অফিস-ফেরৎ সে ক্লাশে ভর্তি হইয়াই আসিল। তা ইহারই ভিতর জন-কুড়ি ছাত্র ছাত্রী জুটিয়া গিয়াছে। চেনা শোনাও ছ চারজন আছে। ছাত্রী দুইটির চেহারা একটু নৈরাশ্যজনক। একজন প্রায় প্রৌঢ়বয়স্ক, শ্যামবর্ণা, মোটা মোটা, অতিশয় গভীর। আর একটি যুবতী, দারুণ ক্ষীণাঙ্গী, চোখে চশমা, দাঁতগুলি অস্বাভাবিক রকমের উচু, সকলের সঙ্গে ভাব করিতে খুব তৎপর। হীরেন ভাবিল “সহপাঠীদের দেখে কেউ বিশেষ inspiration পাব বলে ত মনে হচ্ছে না।”

ক্লাশে বিদ্যালয় তাহাদের কতটা হইল বলা যায় না, তবে গল্প গাছা করিয়া সময়টা মন্দ কাটিল না। লেখা দু'চারটা বাহা সে প্রস্তুত করিল, তাহা দেখিয়া শিক্ষকেরা ভালই বলিলেন, খানিক-খানিক সংশোধনও করিয়া দিলেন।

অন্যান্য নেশার ন্যায় লেখার নেশাও বড় নেশা। এক বার পাইয়া বসিলে আর রক্ষা থাকে না। হীরেনের কলম হইতে অতঃপর ধারণা ধারার মত গল্পস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। নাওয়া, খাওয়া, ঘুমানো সব প্রায় ঘুরিয়া যাইবার জোগাড়। অঞ্জলি ত দেখিয়া শুনিয়া ভড়কাইয়া গেল। কিন্তু নিজেই খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছে, এখন বিলাপ করিয়া আর হইবে কি?

একদিন বলিল, “লেখা ত চের জমল, ছুচারটে কাগজে পাঠিয়ে দেখ না, নেম্ব কিনা।”

হীরেন বিনয় করিয়া বলিল, “কাগজে ছাপাবার উপযুক্ত কি আর হয়েছে?”

“ওমা, তা নাকি আবার হয়নি। ঐ যে ‘বত্রিশগড়ের রাজকন্যা’, ঐ গল্পটা ত চমৎকার হয়েছে। আর ‘চিতাভক্ষ’ টাও মন্দ হয়নি। ওর চেয়ে কত খারাপ গল্প আজকাল ছাপা হয়। তুমি ত মাসিক পত্র মোটে পড় না তাই বলছ। যাদের গল্প বেরোয়, সবাই কি আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত লেখে নাকি?”

ইংরাজীতে বলে যে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারা নিজের ঘরে কোনো সম্মান পান না। সুতরাং ঘরের ভিতর এত বড় একটা সার্টফিকেট পাইয়া হীরেন রীতিমত খুসি হইয়া উঠিল। বলিল, “আচ্ছা ‘বত্রিশগড়ের রাজকন্যাটা’ দিই না হয় পাঠিয়ে। একটা ভাল খাতা আনিয়া রেখো ত, কপি করে দেব, বড় কাটাকুটি হয়ে আছে। ‘চিতাভক্ষ’ থাক এখন, ওটা সত্যি তত ভাল হয়নি।”

অঞ্জলি বলিল, “কি যে তুমি বল তার ঠিক নেই। ওটার ভাষাটা কেমন সুন্দর। গল্পটা অবশ্য ‘বত্রিশগড়ের রাজকন্যা’রই ভাল।”

“একটাই পাঠিয়ে দেখি না আগে” বলিয়া হীরেন ঘীচে কে ডাকিতেছে দেখিতে উঠিয়া পড়িল। ‘চিতাভক্ষ’ গল্পটা এখনই কোনো কাগজে পাঠান যায় না। সহপাঠিনী তনিমা সেটা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার লেখা কোনো গল্পই শিক্ষকেরা মঞ্জুর করেন না। বেচারীর অত্যন্ত ইচ্ছা যে একটা

গল্প অন্ততঃ তাঁহারা চলনসই বসেন। হঠাৎ ক্লাশের শেষে একদিন সে হীরেনকে পাকড়াও করিল। বলিল, “হীরেনবাবু আমার একটা উপকার করবেন?”

হীরেন বলিল, “নিশ্চয়”। না হয় দেখিতে শাড়ীপর ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত, তা বলিয়া তরুণী রমণী ত বটে? অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় কি করিয়া?

তনিমা বলিল, “আপনার একটা লেখা আমায় দেবেন? খুব ভালগুলো বলছি না, এই মাঝারি গোছের একটা?”

হীরেন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হবে লেখা দিয়ে?”

“আমি সেইটাকে মডেল করে একটা গল্প লিখব। ঠিক ওঁরা যে কি চান, আমি বুঝতে পারিনা। কেউ বুঝতে পারবেনা, এমন করে বদলে দেব।”

ইহার পর আর লেখা না দিয়া কোন যুবক পারে? “চিতাভক্ষ” গল্পটি বাছিয়া হীরেন তাহাকে দিয়া আসিল। অঞ্জলিকে অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলিলনা। যা ছোট মন মেয়েদের এসব বিষয়ে, কি ভাবিতে কি ভাবিয়া বসিবে। খাতা কেনা হইল। “বত্রিশগড়ের রাজকন্যা” কপি করা হইল এবং জানাশোনা একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার ঠিকানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

পরদিন হইতেই পোষ্ট পিওনের পথ চাহিয়া চাহিয়া হীরেন এবং অঞ্জলি, দুই চোখ প্রায় ফরাইয়া ফেলিল। এই বুঝি চিঠি আসে গল্প মনোনীত হইয়াছে বলিয়া। লেখা ছাপা হইলে অন্ততঃ পনেরোটা টাকা ত দিবে? আজ কাল যেনো সতেরো টাকায় সুন্দর সুন্দর মান্ডাজী শাড়ী পাওয়া যায়, অঞ্জলি দোকানে দেখিয়া আসিয়াছে। প্রথম গল্পের পারিশ্রমিক টাকা দিয়া সে সবুজ রংএর একখানি শাড়ী কিনিবে। হীরেন ইহাতে না বলিতে পারিবেনা। বিয়ের সময় বাপের বাড়ী হইতে যে শাড়ীগুলি পাইয়াছিল তাহা ত পরিয়া পরিয়া পচিয়া যাইবার জোগাড় হইয়াছে। এতদিনের মধ্যে একখানা নূতন শাড়ীও হীরেন তাহাকে কিনিয়া দেয় নাই। আর দিবেই বা কোথা হইতে? যা করিয়া সংসার চলে!

কিন্তু হায়, দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, কোনো চিঠি আসেনা। আশার ছলনায় মজিয়া হীরেন আরো দুইটা গল্প কপি করিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাইয়া দিল।

দিন দশ পরে পোষ্টম্যান আসিয়া বালি কাগজে মোড়া একটি পুলিন্দা রাখিয়া গেল। হীরেনের ইচ্ছা করিতে লাগিল বপাল চাপড়াইয়া কাদে। খুলিতে ইচ্ছা করেনা, তবু খুলিতে হইল। “বত্রিশগড়ের রাজকন্তা” আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অঞ্জলি বলিল, “আর যে দুটো পাঠিয়েছ, তার ভিতর একটা নিশ্চয় ছাপা হবে। কাগজের সম্পাদকদের বুদ্ধি ত কত! ভাল ভাল সব লেখা ফিরিয়ে দিয়ে যত রাবিশ্ দিয়ে কাগজ ভর্তি করে রাখে।”

হীরেন ক্রিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, “তুমিও যেমন। ভাল মন্দ তারা খুবই বোঝে। কিন্তু নিজেদের একটি বাঁধা দল আছে লেখকের, তার বাইরে তারা যেতেই চায়না। অনেকে আছে যারা টাকাকড়ি চায়না, তাদের লেখাগুলোই আগে ছাপে আর কি? এই লেখাটাই সব চেয়ে ভাল ছিল, এইটেই যখন ফিরে এল, তখন অল্প গুলোর কপালে কি আছে তা ত বোঝাই যাচ্ছে।”

অঞ্জলি বলিল, “আহা, তা কেন? সব মানুষে কি আর এক রকম জিনিষ গছন্দ করে? হয়ত ঐগুলোর ভিতরই একটা মনোনীত হয়ে যাবে। একবার লেখা ফিরে এসেছে বলেই হাল ছেড়ে বসে পোড়োনা। এটাও আবার অল্প কাগজে পাঠাও। অভাব ত নেই কাগজের কিছু? নতুন নতুন পত্রিকা ত রোজ বেরচ্ছে।”

স্ত্রীর কথায় ভরসা কতটা হীরেন পাইল তাহা বলা যায়না; তবে “বত্রিশ গড়ের রাজকন্তা” আবার নতুন খরিদারের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সপ্তাহ খানিক পরে আর একটা লেখা ফেরৎ আসিল। এবার অঞ্জলিরও বুক দমিয়া গেল। তাইত, সব লেখা গুলিই ফেরৎ আসিবে নাকি? তাহা হইলে ত বিষম বিপদ। একেই টানাটানির সংসার, তাহার উপর খাতা, কলম, কালিতেও এতদিন হীরেন মন্দ খরচ করে নাই। স্বামীকে বলিল, “নিজে গিয়ে একটু খোঁজ খবর কর, শুধু চিঠি লিখে কিছু হবেনা।”

হীরেন নৈরাশ্রব্যাক্ষর স্বরে বলিল, “তাতেই বা কি হবে? আমার সঙ্গে কারো চেনা শোনা নেই।”

“চেনা করে নাও। জন্মেই ত আর সবাই সবাইকে

চিনে বসে থাকেনা? সুজিৎ ঠাকুরপো কবি মানুষ, অনেক লেখক, সম্পাদকের সঙ্গে তার আলাপ আছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওনা দু’চার জায়গায়?”

খুব যে কিছু ইহাতে লাভ হইবে, এ আশা হীরেনের ছিলনা, তবু স্ত্রীর কথায় সুজিতের সন্ধানে বাহির হইল, এবং মাসিক পত্রের অফিসগুলিতে আনাগোনা শুরু করিল। সব জায়গায়ই প্রথম গিয়া শুনিল যে তাহার লেখা এখনও পড়াই হয় নাই, পরে পত্রমারফৎ সে খবর পাইবে।

* * *
সেদিন সকালে তখনও সে খাট ছাড়িয়া ওঠেই নাই। ছুটির দিন একটু ভাল করিয়া ঘুমাইয়া লইতেছিল। হঠাৎ স্ত্রীর তীব্র চীৎকারে ঘুম যেন তাহার দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, “হয়েছে কি? বাবাঃ, এমন চৈচিয়েছ যে বুকটা আমার এখনও টিপ্‌টিপ্‌ করছে।”

অঞ্জলি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, “মাগো কি কাণ্ড! এ যে দিনে দুপুরে ডাকাতি! ভজ সব নায়েই, একেবারে জোচোর সব। নাশিশ কর তুমি এদের নামে।” হাতে তাহার একখানি মাসিক পত্রিকা। হীরেন কাগজখানা তাহার হাত হইতে টানিয়া লইয়া বলিল, “কে কি চুরি করল? কার নামে নাশিশ করতে হবে?”

“তোমার ‘চিতাভক্ষ’ গল্পটা চুরি করেছে গো, কোন্‌ এক মাগী। একেবারে হুবহু নকল, খালি নামটা বদলে দিয়েছে। এত সহজ নাকি চুরি করা? কে এই তনিমা দেবী? নাক কেটে দেব আমি তার। তোমার লেখা সে পেলে কেমন করে?”

উপর্য নাহি, ইহার পর সব কথা খুলিয়াই বলিতে হইল অঞ্জলিকে। শুনিয়া অঞ্জলি গালে হাত দিয়া বলিল, “ওমা, এই সব হচ্ছে বুঝি আজকাল? ক্লাশে শুধু গল্প লিখতেই শেখায়না, আরো অনেক কিছু শেখায় দেখি।”

হীরেন বলিল, “বলে নাও, বলে নাও, এমন একটা সুযোগ পেয়েছ, ছাড়বে কেন তুমি?”

অঞ্জলি হঠাৎ চুপ হইয়া গেল। হীরেনও যদি চড়া গলায় কিছু বলিত, তাহা হইলে বগড়া তাহাদের আজ আর সারাদিনের ভিতর শেষ হইত না। কিন্তু হীরেন রাগিল না

দেখিয়া তাহার রাগটাও পড়িয়া গেল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “তা বেশ। তুমি এর কোন প্রতিকার করবে না? তোমার লেখা আর একজন ছাপিয়ে দিয়া বাহা বা নেবে আর পরস্যা নেবে?”

হীরেন বলিল, “কি করতে পারি বল? আমার লেখা বলে প্রমাণ করতে পারব আমি? ছাপাও হয়নি, কিছু না।”

অঞ্জলি বলিল, “কি বজ্জাং মেয়ে বাবা। ভদ্রঘরে জন্ম, এমন প্রবৃত্তি কেন? আমি গিয়ে বেশ করে তাকে শুনিবে আসব দাঁড়াও।”

হীরেন বলিল, “শুধু শুধু একটা কেলেকারী হবে। কি দরকার? অতরা আমাদেরই পাগল ভাববে। যাক, একটা ভ্রম আমার গেল, নাম আমার হল না বটে, অত কেউ জানলও না, কিন্তু আমার লেখা যে ছাপাবার অযোগ্য নয়, তা প্রমাণ হয়ে গেল।”

অঞ্জলি নিজের মনে গজ গজ করিতে লাগিল। হীরেন তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া আবার খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

ছি, ছি, মেয়েটা এত খেলো চরিত্রের। ভগবান সাধে কি আর তাহার এমন চেহারা দিয়াছেন। কি করিয়া এমন কাণ্ড করিল? ইহার পর কোন্ মুখে আর সে হীরেনের সামনে দাঁড়াইবে? আর কাহারও কাছে প্রমাণ করা অবশ্য হীরেনের সাধ্যে নাই, কিন্তু তিনি কি তাহার চোখের দিকে চাহিয়া অস্বীকার করিতে পারিবে যে সে হীরেনের গল্প বেমালুম চুরি করিয়াছে?

পরদিনই তাহাদের ক্লাশ ছিল, কিন্তু পাছে ঐ হাড়-পাজি কুৎসিত মেয়েটার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়, এই ভয়ে সে আর ক্লাশেই গেল না। দিন দুই পরে একবার গেল, দেখিল তিনি আসে নাই। সহপাঠিনী হেমপ্রভা বলিলেন, তুমি শরীরটা তেমন ভাল নেই, দিন কয়েক এখন আসতে পারবেই না বোধ হয়। হীরেন ভাবিল, বাঁচাই গেল বাবা, ওর পেঙ্গুর মত চেহারাটা না দেখতে হলেই ভাল।

গল্প লেখার উৎসাহটা তাহার হঠাৎ কমিয়া গেল। অত লেখাগুলো সম্বন্ধেও আর কোনো আশা সে রাখিল না, তাহাদের খবরের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকার পাটও তুলিয়া দিল। সন্ধ্যার সময় একটা ট্যুশনি যোগাড় করিল, গোটা ত্রিশ টাকা

ইহাতেই ঘরে আসিবে এখন, অঞ্জলির ছোটখাট আবদারগুলি ইহাতেই রক্ষা করা যাইবে।

যতদিন তাহার উৎসাহের সীমা ছিল না, ততদিন ভাগ্যদেবী তাহার প্রতি একেবারেই বিরূপ ছিলেন। এখন সে হাল ছাড়িয়া দেওয়াতে তিনি হাল ধরিলেন বোধ হয়। সকাল বেলা স্নান করিতে যাইবার যোগাড় করিতেছে, এমন সময় একখানা পোষ্টকার্ড আসিয়া পৌঁছিল। সামান্য একটু স্থবির আছে। “ব্রিটিশ গডের রাজকন্যা” গল্পটা এক সম্পাদক মনোনীত করিয়াছেন, তবে পারিশ্রমিক কিছু দিতে পারিবেন না। বাজার চড়িয়া যাওয়ায় কাগজ বাহির করিতে তাহাদের এমন পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে হইতেছে যে পারিশ্রমিক দেওয়া তাঁহারা বন্ধই করিয়া দিয়াছেন। এখন লেখকবর্গের সঙ্কল্পতাই তাঁহাদের একমাত্র ভরসা। হীরেন দুঃখের হাসি হাসিয়া ভাবিল, “যাক, জাত রইল বটে, তবে পেট ভরল না।”

এমন সময় হাসিয়া প্রায় লুটাপুটি খাইতে খাইতে অঞ্জলি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, “ওগো, ভারি একটা মজার কাণ্ড হয়েছে, জান?”

হীরেন বলিল, “কি কাণ্ড?”

“এই, মেয়েদের একটা কাগজ আছে না “বিজয়িনী” বলে তারা একটা গল্পের প্রতিযোগিতা করেছে। ছোটো পুরস্কার একটা ত্রিশ টাকা, একটা কুড়ি টাকা। আমি দ্বিতীয় পুরস্কারটা পেয়েছি। কি মজা! বলিয়া আবার হাসি গড়াইয়া পড়িল।

হীরেন ত আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, “সে কি তুমি আবার গল্প লিখতে শিখলে কবে? কই, কখনও তোমায় লিখতে দেখি নি?”

“আগে কোন দিন লিখেছি যে দেখবে? বাস্তবিক যেমন ক্রৌঞ্চ পাখী মারা দেখে কবি হয়ে গেলেন, আমি তেমনি তোমার তনিমার চৌর্য্যবৃত্তি দেখে লেখিকা হ

গেলাম। তাঁর কীর্তিকাহিনীটা বেশ শুছিয়ে লিখে 'মহাবিদ্যা' নাম দিয়ে দিলাম পাঠিয়ে। কল্যাণীদি ওদের কমিটিতে আছেন, তাঁর হাত দিয়েই পাঠিয়েছিলাম। বেশ কুড়িটা টাকা পেয়ে গেলাম। শাড়ীও হবে, জামাও হবে।" বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল।

হীরেন বলিল, "নামধাম সত্যিকারের লিখে দাওনি আশা করি?"

"লিখলেই বা কি হত? ও কিছু করতে চাইলেই ত নিজে

আগে ধরা পড়ত? ভেবেছিলাম প্রথম তনিমা নাম দিয়েই লিখি। তারপর ভাবলাম, থাকগে মেয়েমানুষ, বিনা অপরাধে তাদের শাস্তি ত-সারাক্ষণই হচ্ছে, একটা মেয়ে না হয় পারই পেল। নাম দিলাম তার চলিমা, চেহারাখানির বর্ণনা অবিকল দিয়েছি কিন্তু, বরং চোখ একটা খুব ট্যারা বলে রূপ আরো একটু বাড়িয়ে দিয়েছি।"

হীরেন বলিল, "তা বেশ।" কিন্তু খুসি হইল না।

প্রাচীন বাঙ্গালার ব্রতকথা।*

ডাঃ তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ, পি এইচ ডি,

প্রাচীন বাঙ্গালার ব্রতকথাসমূহ বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগের এক বিশেষ অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কথা সাহিত্যের অন্তর্গত এই ধর্মমূলক কাহিনীগুলি বহু প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালার হিন্দুনারীসমাজের ধর্মজীবনের একটি দিক উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। এই ব্রত কথাগুলি পাঠ করিলে প্রাচীন কালের বঙ্গনারীর ধর্ম ও সামাজিক বুদ্ধি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এতদেশীয় অনেক দেব-দেবীর পূজা প্রচারের মূলে এই ব্রতকথাগুলি রহিয়াছে। ইহা ছাড়া মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের এক শাখার যে এই ব্রতকথাসমূহ হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে সমাজ যত প্রাচীন তাহার ভিতরে প্রচলিত ব্রতকথাও তত প্রাচীন। এই বাঙ্গালা দেশে মানব গোষ্ঠীর নানা শাখা বিভিন্ন সময়ে আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং ক্রমে অনেকাংশে মিলিয়া মিশিয়া এক অভিনব সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন ব্রতকথাগুলির সাহায্যে এই সমন্বয়প্রাপ্ত সংস্কৃতি ও সভ্যতার

অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রতকথাগুলির মধ্যে কোন্টি অষ্টিক কোন্টি পামিরিয়, কোন্টি দ্রাবিড়, কোন্টি মঙ্গোলিয় এবং কোন্টি আর্য্যজাতির মধ্যে প্রথম প্রচলিত ছিল তাহা এখন এই মিশ্রিত ও রূপান্তরিত বাঙ্গালী সমাজের ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা খুব কঠিন কার্য।

ডাঃ ইভাস ক্রিট দ্বীপে প্রায় তিন হাজার বৎসরের পুরাতন যে সমস্ত মৃন্ময় মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন বাঙ্গালায় প্রচলিত ব্রতকথার অন্তর্গত মৃন্ময়মূর্তিগুলির কোন কোনটির সহিত তাহাদের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই দেশের মৃন্ময় মূর্তিগুলি যত পুরাতনই হউক না কেন, ইহাদের সম্পর্কিত ব্রতকথাগুলির মধ্যে যে প্রাচীন ভাষার পরিচয় স্থানে স্থানে এখনও রহিয়াছে তাহাতে এবং আনুষঙ্গিক ও আভ্যন্তরীণ অঙ্কন প্রমাণের ফলে, অন্ততঃ খৃঃ চমাত্রম শতাব্দীতে প্রচলিত ব্রতকথাগুলির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব ব্রত ও তৎসংক্রান্ত কাহিনীগুলি বহু

*Folk Literature of Bengal (D. C. Sen), "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (দীনেশচন্দ্র সেন) ও "লোক সাহিত্য" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন হইলেও উল্লিখিত সময়ের পূর্বে বাংলা ভাষা গঠিত হয় নাই বলিয়া এরূপ অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রতকথাগুলি বাংলা সাহিত্য ও সমাজের আদিযুগের স্মৃতি বহন করিতেছে।

ব্রতকথাগুলি ধর্মের দিকে যাহাই হউক, সাহিত্যের দিকে কথাসাহিত্যের অন্তর্গত। কথাসাহিত্যের অবলম্বন অবশ্য গল্প। এই গল্প সত্যও হইতে পারে, কাল্পনিক হইতে পারে অথবা উভয় মিশ্রিতও হইতে পারে। এইরূপ ইহা গভ্য, পদ্য অথবা মিশ্রিত ভাবেও রচিত হইতে পারে। এমন কি কোন কোন কাহিনী গীত পধ্যস্ত হইত। কথা-সাহিত্যের বিভাগে বহু শাখা প্রশাখা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্রতকথা কোন শাখা বা প্রশাখার অন্তর্গত? “গোপীচন্দ্রের গান” অথবা “মহীপালের গান” ও কথা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। আবার “শিবায়ন” ও “মঙ্গল কাব্যগুলিকেও” এক হিসাবে কথা-সাহিত্য ভিন্ন আর কি বলিব? এইরূপ “ময়মনসিংহ গীতিকা,” “পূর্ববঙ্গ গীতিকা” এবং ভাট-ব্রাহ্মণগণের রচিত গানগুলিও কতকাংশে কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত ধরা যাইতে পারে। কথা বা কাহিনী এই সকল শ্রেণীর সাহিত্যের মূল উপাদান হইলেও, এমন কি এই সমস্ত কাহিনী গীত হইলেও, ইহাদের প্রধান ভাগ কাব্যধর্মী এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাব, আদর্শ ও প্রকাশ ভঙ্গীর তারতম্য এইগুলিকে পরস্পর হইতে বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

“মহীপালের গান” ও “গোপীচন্দ্রের গান” জাতীয় গানগুলি কোন রাজার সম্বন্ধে রচিত। আবার বঙ্গ সাহিত্যের অন্তর্গত ব্রতকথাগুলি কোন দেবদেবীর স্তুতি উপলক্ষ্যে রচিত। সুতরাং উভয় শ্রেণীর গীতে উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিকে বিশেষ প্রভেদ রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্য সমূহও কোন দেবতা বিশেষের পূজা প্রচারের জন্য রচিত, কিন্তু ব্রতকথা ও মঙ্গল-

কাব্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে ব্রতকথা নারীসমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ এবং একান্তই তাহাদের ব্যাপার। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে পূজিত হয় এবং ব্রাহ্মণগণ এই সমস্ত পূজার পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। অথচ মূলে কোন ব্রত বিশেষের উপাখ্যান হইতেই ক্রমে মঙ্গলকাব্যের দেবতা বিশেষের পূজা ও স্তুতিবাচক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ মঙ্গলচণ্ডীদেবী ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের নাম করা যাইতে পারে। ব্রতকথাগুলির ভিতরে মঙ্গলকাব্যসাহিত্যের বীজ নিহিত ছিল বলা যায়। কথা বা কাহিনী অবলম্বনে ব্রতকথাগুলি রচিত হইলেও ইহাদেরই একভাগ দেবতার খ্যাতি বৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে কাব্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়া অন্ততঃ কতকগুলি মঙ্গলকাব্যের জন্মদান করিয়াছিল।

ময়মনসিংহ তথা পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলি কোন দেবতা সম্বন্ধে রচিত নহে। ইহা সম্পূর্ণ মানব সমাজের কথা এবং নরনারীর অপূর্ণ প্রেমের অমর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই গীতিকাগুলি প্রেমের বেদীতে আত্মবলিদানের অসামান্য কাহিনীর মধ্য দিয়া একটি পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করিলেও পারিবারিক জীবনের আদর্শ স্থাপনে গল্পগুলির লক্ষ্য নাই। কিন্তু ব্রতকথাগুলির মধ্যে স্ত্রীপুরুষের প্রেমের কাহিনী ভিন্ন আরও অনেক বিষয় রহিয়াছে। পারিবারিক জীবনের একটি উচ্চ ও শাস্তিপূর্ণ আদর্শ এই ব্রতকথা সমূহের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অবস্থাপন্ন ও অভিজাত শ্রেণীর গুণ বর্ণনায় দক্ষ ভাটগণের গানের সহিত “মহীপালের গান” ও “গোপীচন্দ্রের গান”-র বিষয়গত প্রচুর সাদৃশ্য অথবা ঐক্য থাকিলেও ব্রতকথার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহিত ভাট ব্রাহ্মণগণের গানের কোন মিল দেখা যায় না। এইরূপ চর্যাপদ ও ‘শিবের গাজন’ গান এবং ‘শিবায়ন’ গানের সহিতও ব্রতকথাগুলির ব্যবহারগত ও আদর্শগত বিশেষ মিল নাই। শুধু কাহিনী ও গীত এই

দুই বিষয় অবলম্বনে নানা শ্রেণীর এই সাহিত্য রচিত হইয়াছে বলিয়া এই দিক দিয়া সকল প্রকার সাহিত্যেরই মিল রহিয়াছে ; নতুবা আদর্শগত ব্যবহারগত ও কাব্যগত নানা বিষয়ে এই সাহিত্যগুলি পরস্পর হইতে বিশেষ বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।

কথা-সাহিত্য গদ্যে লিখিত হইয়া অধুনা গল্প ও উপন্যাসের আকার প্রাপ্ত হইরাছে। কিন্তু আদর্শ, উদ্দেশ্য ও প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিলে এক দিকে গল্প ও উপন্যাস এবং অপরদিকে প্রাচীন কথা সাহিত্য তথা ব্রতকথার মধ্যে কত প্রভেদ। অথচ ইহারা সমস্তই কাহিনীমূলক সাহিত্য। তবে গল্প ও ব্রত কথায় বরং কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে। আধুনিক কথা সাহিত্য গল্প ও উপন্যাস, কিন্তু মঙ্গল কাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতি বাদ দিলে প্রাচীন কথা-সাহিত্য প্রধানতঃ চারি প্রকার, যথা—

ব্রতকথা, রূপকথা, গীতিকথা ও ব্যঙ্গ কথা। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হিসাবে ব্রতকথাগুলিকে গ্রহণ করা সম্ভব। ইহা ছাড়া যে সব প্রাচীন ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে কিছু গল্প মিশ্রিত আছে তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালার হিন্দুনারীগণ অনেক প্রকার ব্রত পালন করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে খুব প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক এই উভয় প্রকার ব্রতেরই প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্রত যত প্রাচীন তাহার প্রকাশভঙ্গী, ভাষা এবং ভাবও তত প্রাচীন। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সম্রাট অশোক পর্য্যন্ত তাঁহার কোন অল্পশাসনে এতদ্দেশে প্রচলিত প্রাচীন ‘মঙ্গল ব্রতের’ অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ব্রতকথা উপলক্ষে নির্মিত মৃন্ময় মূর্তিগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তো ইতঃপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

এই সব ব্রতকথা কোন একটি দেবতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইত। দেবতার মূর্তি মাটি ও চালের গুঁড়ার সাহায্যে নির্মাণ করিয়া কুলবধূগণ নিজেদের পারিবারিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এই সব ব্রত পালন করিত। ব্রত সমূহের কতিপয় দেবতাকে খুব প্রাচীন মনে হয়। এই ব্রত কথাগুলির ভাষাও কতকটা দুর্বোধ্য ও প্রাচীনতামিশ্রিত।

এই সব প্রাচীন দেবতাদের নাম থুয়া, লাউল, ভাছলি ও সেজুতি। ইহা ছাড়া সূর্য্য ঠাকুর ও শিব ঠাকুরের নামও

এই উপলক্ষে কিছু পরিমাণে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এই দেবতাদের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

(ক) থুয়া—

‘থুয়া’ নামটি অসংস্কৃত এবং অনাধ্য-গন্ধী। ‘থুয়া’ নামে পাঁচটি দেবতার পূজা এদেশের নারী সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। সম্মান-সম্মতি কামনায় ও সাংসারিক অভাব-অনটনের হস্ত হইতে মুক্তি বাসনায় নারীগণ অগ্রহাষণ মাসে থুয়া দেবতার পূজা করিতেন। এই থুয়া পূজার ভাষা অতি প্রাচীন। ইহার উদাহরণ এইরূপ :—

“থু থু মুমুতি।

আঘন মাসের জয়াতি ॥” ইত্যাদি।

(খ) লাউল—

আর একটি দেবতার নাম এই উপলক্ষে করা যাইতে পারে। এই দেবতার নাম “লাউল”।

এই “থুয়া” ও “লাউল” নাম দুইটি এই দেশের নারীগণ কোথা হইতে পাইলেন তাহা বলা কঠিন। উভয়ের মূর্তিই মৃত্তিকা ও চালের গুঁড়ার সাহায্যে নির্মিত হইত। মূর্তি গুলির আকৃতি অনেকটা পিরামিডের অনুরূপ এবং পূজাবিধিও সংস্কৃত পুরাণাদি শাস্ত্র সম্মত নহে। এই দুই দেবতার পূজায় প্রাচীন বঙ্গের কৃষি সম্পদের প্রতি এই দেশের অধিবাসীগণের নির্ভরশীলতা ও আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

(গ) ভাছলি—

নৌ যাত্রার ও নৌ বাণিজ্যের চিত্র হিসাবে আমরা আর একটি দেবতার পরিচয় পাই। এই দেবতার নাম “ভাছলি”। নৌ-যাত্রার আপদ বিপদের কথা স্মরণ করিয়া ভাছলি দেবতার অল্পগ্রহ কামনা করা হইত। নারীগণ তাহাদের স্বামী পুত্রের জলপথে নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা জানাইয়া এই দেবতাকে ভক্তিভাবে পূজা করিতেন। স্ত্রী-দেবতা ভাছলির পূজোপলক্ষে নারীগণ সাত-সমুদ্র তের নদীর চিত্র অঙ্কিত করিত। এই ব্রত প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর জলপথে নানা দেশে গমনের ইঙ্গিত করে। এই দেবতার পূজা ভাদ্র মাসে করা হইত এবং সে জনাই বোধ হয় ইহার নাম “ভাছলি”। বর্ষা কালে জল পথে যাতায়াত সুবিধাজনক বোধে এই কালে নৌ যাত্রার প্রথা ও তৎসংক্রান্ত পূজা প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

(ঘ) সেজুতি—

আর একটি ব্রত প্রচলিত ছিল, তাহার নাম “সেজুতি। কুমারী কন্যাগণ বিবাহের পূর্বে সেজুতি ব্রত পালন করিত। সেজুতি সম্ভবতঃ কোন দেবী। এই দেবীর পূজায় অবিবাহিতা কন্যাগণ প্রার্থনার ভিতর দিয়া মনের যে আশা আকাঙ্ক্ষা জানাইত তাহাতে মনে হয়, তাহারা ভবিষ্যতে সপত্নীরূপ বিপদ নিবারণের জন্য এবং স্বামীপ্রেম কামনায় এই ব্রত পালন করিত।

প্রাচীন ব্রতকথাগুলির ভাষা এখন খুব দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত মনে হইলেও কোন এক সময় বোধ হয় এরূপ ছিল না। এইগুলির জটিল ভাষা ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া এখন অনেক পরিমাণে সহজবোধ্য হইলেও প্রাচীন ভাষার কিছু চিহ্ন এখনও ইহাদের গম্ভীরতায় হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রাচীন ব্রতসমূহের অল্পাংশের ভিতর অনেক অপৌরাণিক উপাদানের অস্তিত্ব, দুর্বোধ্য ভাষার প্রয়োগ, অপৌরাণিক দেবতার উল্লেখ, জলপথে বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ, কৃষিসম্পদের প্রতি অল্পরক্তি, নারীগণের বাল্য ও যৌবনের আদর্শ, আশা আকাঙ্ক্ষা এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি একান্ত অল্পরক্তি প্রভৃতির যে অল্পাংশ পরিচয় পাওয়া যায় তাহার তুলনা নাই। এই ব্রতসমূহ অল্পাংশ উপলক্ষে আলিপনা ও চিত্রাঙ্কনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা খুব উচ্চ শ্রেণীর বলা যাইতে পারে। এই ব্রতগুলির কোন কোনটির ভিতরে দেখা যায় প্রথমে সমাজে উহা প্রচলিত হইতে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। প্রধানতঃ গৃহকর্তার আপত্তিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বণিকসমাজের সহিত কতগুলি ব্রতের বিশেষ সম্বন্ধও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার কারণ সঠিক বলা যায় না। ইহা আর্থ্যের সমাজ হইতে আর্থ্য সমাজে প্রচলনের ইচ্ছিত করে কিনা তাহার অনুসন্ধান অবশ্যক। মঙ্গলচণ্ডী ও মনসাদেবীর পূজা প্রচলনের মধ্যে ইহার কিছু আভাষ পাওয়া যায়। এই দুই দেবী আর্থ্যসমাজের বাহির হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবেন। প্রথমে ব্রতকথার আকারে এই দুই দেবীর কাহিনী রচিত হইতেও পরবর্তী কালে ইহা “মঙ্গলকাব্য” নামে এক বিশেষ শ্রেণীর বাঙ্গালী সাহিত্যের জন্মদান করিয়াছে।

পরবর্তী সময়ের আর্থ্যসংস্কৃতির স্পর্শ কতগুলি ব্রতকথার

মধ্যে এক নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছে। বোধহয় ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন ব্রতগুলিকে একেবারে তুলিয়া না দিয়া বরং রূপান্তরিত অবস্থায় ব্রাহ্মণ্য মতবাদ প্রচারের কাণ্ডে এইগুলিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইহাতে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও বাঙ্গালী সাহিত্য এতদুভয়ের পরম উপকার সাধিত হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী ও মনসাদেবী ভিন্ন লাউল ও ভাঁহুলি দেবতার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যগণ কর্তৃক এই পৌরাণিক রূপান্তরের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে লাউল দেবতাকে শিবের জ্যেষ্ঠ স্ত্রী এবং ভাঁহুলীদেবীকে দেবরাজ ইন্দ্রের শাশুড়ি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। শিব ও সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যেও কতগুলি ব্রত ও প্রাচীন ছড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। উহাও কালক্রমে পুরাণগুলির প্রভাবে নবরূপ লাভ করিয়াছে।

ব্রতকথার ছায় গীতিকথা এবং রূপকথা সমূহের অনেক গুলেও প্রাচীনত্বের আভাষ রহিয়াছে। গীতিকথার অন্তর্গত “নালকামালার গল্পটি” ইহার অগুতম উদাহরণ। রূপকথাগুলির মধ্যে জাতিবিশেষের আদিযুগে অস্তিত্ব রক্ষার জন্ত কঠোর জীবন সংগ্রামের, নারী প্রেমলাভের জন্ত দুঃস্বাদ্য কর্ম সম্পাদনের ও অত্যধিক কল্পনা প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় সংস্কৃতির একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের অমূল্য উপাদান ইহাতে নিবদ্ধ আছে। রূপকথার কাহিনীগুলি শুধু শিশু-মনেই খোরাক ষোণায় না, পরিণত বয়স্কদেরও চিন্তনীয় অনেক মূল্যবান বিষয়-বস্তু ইহাদের মধ্যে নিহিত আছে। বাঙ্গালার আদিযুগ অংশের সাহিত্যে ব্রতকথার ছায় রূপকথা এবং গীতিকথাগুলিরও সূচক পরিচয় লাভের প্রয়োজন আছে। প্রাচীন কথাসাহিত্যের অন্তর্গত ব্রতকথার বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে নানা কথার অবতারণা করা গেল। ব্রতকথা, রূপকথা বা সমধর্মী সাহিত্যের অন্তর্গত না হইলেও এক শ্রেণীর ছড়া রচনার কথা এইস্থানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ‘ইহা ছেলে ভুলানো ছড়া’। এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক ছড়ার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্রতকথা, রূপকথা ও গীতিকথার ছায় এই জাতীয় ছড়াগুলি অল্প সাহায্য করে নাই। ব্রতকথার গল্পগুলির অন্তর্গত বালকবালিকার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয়জাপক এবং

রূপকথার বরনাপ্রবণ মনোভাবমূলক কিছু সাদৃশ্য এই ছড়াগুলিতেও রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত “লোক-সাহিত্য” নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা রহিয়াছে। কবিশঙ্কর অনবদ্য ভাষায় “.....ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে;—এই ছড়ার মধ্যে

আমাদের মাতৃমাতামহীদের স্নেহ-সংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশব নৃত্যের নৃপুর নিকণ বঙ্কিত হইতেছে।” ইত্যাদি।

যাহা হউক নানাবিধ প্রাচীন কাহিনীও ছড়ার মধ্যে কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত ব্রতকথার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক মূল্য যে সর্বাধিক এই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

—সামনের বাড়ী—

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

সামনের বাড়ীর ফিকে নীলরঙের পর্দা ঝোলানো জানলা দুটোর পানে চোখ পড়লেই অবজায় ঠোঁট উন্টে আসে উমারানীর। এসব ‘ফ্যাশান ম্যাশান’ দেখলে নাকি গা জলে যায় তার। সুর্যোগ পেলেই তাই জগতের যতো ফ্যাশানের বিরুদ্ধে ধারালো ধারালো যুক্তি নিক্ষেপ করতে ছাড়ে না সে।

অবশ্য সারা জগৎটা কিছু আর সর্বদা চোখে পড়েনা মাল্লবের; চোখে যা পড়ে—সেটা হয় পাশের বাড়ী, নয় সামনের বাড়ী। আপাততঃ উমারানীর প্রধান লক্ষ্যস্থল সামনের বাড়ী।

—পর্দা! হুঃ! জানলার আবার পর্দা ঝোলানো! আরে বাপু, ‘আটেকাটে বন্ধ’ করে ঘরটা যদি অন্ধকার করে রাখাই নিয়ম হ’তো, তা’হলে—আর দেওয়াল-কেটে কেটে জানলা রাখতো না লোকে।...মাথার একটু ঘোমটা দিতেই তো প্রাণ হাঁকিয়ে আসে, মুখের সামনে ঘোমটা ঝুলিয়ে রাখা—সহ্য বা হয়! আর তো কিছু নয়—ফ্যাশান! ফ্যাশানের খাতিরে সবই পোষায়। নইলে মেমসাহেবরা—নিজেরা—পথে ঘাটে সর্বত্র বিহুনি ঝুলিয়ে পিঠে আঁচল ছুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর যতো লজ্জা ঘরের [...সে বেচারী মরছে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে।

কেবল মাত্র পর্দা সম্বন্ধে নয়—এটা সামান্য একটু উদাহরণ মাত্র বলা চলে—প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি আচার আচরণ সম্বন্ধেই এই ধরনের তীক্ষ্ণ আর জোরালো মন্তব্য গোছানো আছে উমারানীর।

কিন্তু মুন্সিল এই—উমারানীর এই সব সারালো যুক্তির সারবত্তা অগ্রাহ্য করে বিমলেন্দু ওদের সপক্ষেই রায় দেয়। ছুতোয় নাতায় ওদের গুণ গায়। আচ্ছা এটা উমারানীর কেমন লাগে?

এইতো ধরো না—উমারানীর সংসারে কাজের কি শেষ আছে? সারা দিন খেটে খেটে হাড় কালি হয়ে গেলো বেচারার, এর ওপর আবার ঘর বাড়ী ফিটফাট রাখবে কখন?...আর রাখবেই বা কেন?...সাহেব বাড়ী তো নয়?

কিন্তু বিমলেন্দু কিনা অনাধাসে বলে—হ্যাঁ বাড়ী রাখতে হয় তো আমাদের চৌধুরী সাহেবের মতো। এই তো এ বাড়ীর সঙ্গে একই প্লানের বাড়ী, কিন্তু কিসে আর কিসে? এই যে বাড়ী ঢুকলাম—রাস্তার দরজা থেকে শুরু—ঘুঁটে কয়লা, গুল, ছেঁড়া জুতো, খাবারের শালপাতা—

কি না ছড়ানো? সৌন্দর্য্য জ্ঞান তো দূরের কথা, সাধারণ সভ্যতার বালাই পর্যন্ত নেই আমাদের।

উমারানী চটে উঠে বলে—বেশ তো ওদের বাড়ী গিয়ে থাকলেই পারো, এ অসভ্য বাড়ীতে থাকবার দরকার কি?

বিমলেন্দু বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যাবার আগে বলে যায়—হ্যাঁ কথা শুণ্ডো ও বাড়ীর অবস্থার সঙ্গে মানানসই হলো।...

এতে উমারানী রেগে আগুন হয় আর না হয়?

‘চৌধুরী সাহেবের বাড়ী’ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ অবশ্য বেশী দিনের নয়।

বিমলেন্দুর সঙ্গে সৌহার্দ্য সম্বন্ধটা নিতান্তই আকস্মিক।...

প্রায় একই সঙ্গে একই প্লটের দুটো বাড়ী ভাড়া নিয়ে এ পাড়ায় এলেও অনেক দিন ধরে দু’পক্ষই ছিলেন নীরব। অথচ ব্যবধান সামান্যই, বড়ো রাস্তাটা পড়েছে পাশের দিকে—হাত চারেক চওড়া একটা গলিপথের সাহায্যে বাড়ী দুটোর সদর দরজার কিনারা করা যায়।... এই চার হাত চওড়া লাল ইট বাঁধানো পলিটাকে দুটো বাড়ীর উঠোন বললেও বলা চলে। কিন্তু চার হাত জমিই অগাধ সমুদ্রের দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে এতোদিন।

দুটো বাড়ীর জানলাই যদি পর্দাহীন উদার উন্মুক্ত বক্ষে আমন্ত্রণ জানাতো সামনের কোতুহলী দৃষ্টিকে, অথবা দু’জনেই পর্দার আবরণে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে গাভীর্ষ্য বজায় রেখে চলতো—তা’হলে হয়তো ব্যবধানটা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে দেবী হতো না। যেরে হোক পথে হোক চোখোচোখি হলেই আলাপটা সহজ হ’তো।

কিন্তু এবে দু’টো ছ’রকম। কোথায় যেন রয়েছে সন্দেহের অবকাশ।

ওদের সব চুপচাপ, উমারানীর আগাগোড়াই সমারোহ।

উমারানী বামুনকে বকছে, চাকরকে ধমকাচ্ছে, কাপড়ওলা ডাকছে, দোরে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে ঘুঁটে গুণিয়ে তুলছে, হুখে জল মিশোনো হয়েছে না কি জলে হুখ মিশোনো হয়েছে—হু’বেলা এই নিয়ে কাইজার মার্কী গৌকওয়াল একাণ্ডে মাপের গোয়ালটার সঙ্গে তুমুল তর্ক চালাচ্ছে। বেচারী স্বর্গ-সরস্বতীর আর এক তিল বিশ্রাম নেই উমারানীর কাছে।

অথচ ওদের একটি মাত্র চাকরের সাহায্যেই সংসার চক্র নিঃশব্দে চলে। বামুন ঠাকুর পর্যন্ত নেই। অথচ সত্যি কিছু আর “তেল ছুন লকড়ি” বাদ দিয়ে সংসার চলে না? আস্ত একটা গেরস্থকে খেয়ে পরে থাকতে হলে সবই চাই।

বিমলেন্দু বলে—চক্রের যথাস্থানে এবং যথা সময়ে তৈল প্রদান করতে জানাটাও একটা আর্ট, বুঝলে? তবেই সেটা নিঃশব্দে চলে। ওটা শিখে নিতে পারলে বরং—

উমারানী স্বাক্ষর দিয়ে বলে ওঠে—বাড়ী স্বদ্ধ লোকের পায়ে তেল দিতে দিতেই হাড় ভাজা ভাজা, নতুন করে আর আর্ট শিখতে চাই না। ওদের সঙ্গে ভাব হয়ে অবধি তুমি যেন বিভোর হয়ে যাচ্ছে। দিন দিন।

বিভোর হোক না হোক, ভাব হওয়ার একটা ইতিহাস আছে।

একদা অফিস টাইমে ট্রামের ভীড়ের মধ্যে পায়ের উপর কার একখানি ‘ভারী সারি’ জুতোর চাপ অনুভব করে বিরক্ত বিমলেন্দু—কি ‘মশাই’ বলে তেড়ে উঠতে গিয়ে থমকে যায়।

কারণ জুতোটা না হোক জুতোর মালিকের মুখটা নিতান্তই চেনা।

আর কেউ নয়—‘সামনের বাড়ী’।

চৌধুরী সাহেব নিজের কুকীর্তিতে যেন মরমে মরে যান, এতোবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন যে বিমলেন্দু শেষ পর্যন্ত তাঁহার সাগ্রহ নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করতে পারে না। ক্ষমা করার প্রমাণস্বরূপই চৌধুরীসাহেবের বাড়ী গিয়ে হাজির হলো সন্ধ্যাবেলা।

ভাবের ইতিহাস, অর্থাৎ গোড়াপত্তন এই।

অতঃপর প্রায় ছুতোয় নাটায় চায়ের নিমন্ত্রণ হয় বিমলেন্দুর। বোঝা গেল চৌধুরী সাহেব ভাব ভালোবাসাটা বজায় রাখতেই ইচ্ছুক। চৌধুরীজায়াও স্বামীর নিমন্ত্রিত অতিথিকে হেলা করেন না। আদর আপ্যায়নের ক্রটি খুঁজে পাওয়া যায় না তাঁর ব্যবহারে।

উমারানী নাক সিকয়ে তুলে বলে—বাবা, ফ্যাশনকে ধন্যবাদ দিই। পাড়ার ভক্তলোককে ডেকে বোয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া। আরো কতো গুনবো! আদিখ্যেতা! গুনলে হাড় জলে যায়।

আবার মজা এই—বিমলেন্দু যদি উমারানীর রাগের ভয়ে ‘ও বাড়ীর’ কথা উত্থাপন না করে ছটফটানি ধরে

উমারানীর। পাকে চক্রে জেরা করে করে আঁর ওদের কথাই এনে ফেলে।

বিমলেন্দুর বোন প্রতিভা যে পনের পেরিয়ে যোঁলোয় পা দিয়েছে মাস দুই হলো, আর ক্লাশ নাইনে উঠেই স্কুল ছেড়ে দিয়েছে বড়ো হওয়ার অজুহাতে, সেই হলো উমারানীর নিজস্ব সংবাদ দাতা।

যথা সময়ে এবং যথা নিয়মে সংবাদ পরিবেশন করে থাকে সে এই ভাবে—

—বৌদি দেখলে—

ছাদ থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে নেমে আসে প্রতিভা। বলা বাহুল্য উপর তলার ছাদটাই তার সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্র—

—বৌদি দেখলে? মিস আর মিসেস দুই ননদ ভাগ ফ্যাগ হাতে করে বেরিয়ে গেলেন প্রভাত ফেরি করতে।

—তা আর বেরোবেন না? বড়ো যে আঁক ওঁদের। তোর দাদা বলে শুনি না—আমরা অসভ্য, আমরা চাঁচাই, আমরা সব সময় রাউজ গেমিজ এঁটে থাকি না, আরো কতো কি!

—আমার নামে কি বলা হচ্ছে শুনি?—হাসতে হাসতে বিমলেন্দু এসে দাঁড়ায়—স্বাধীনতার দিন কি তোদের জিভের স্বাধীনতাটাই যোলো আনা ছাপিয়ে আঠারো আনা হয়ে উঠলো প্রতিভা?

—তা আর কি করা যাবে—উমারানী মুচকি হেসে বলে—আর কোনো স্বাধীনতাই যখন নেই। হ্যাঁ, বিহুনি ঝুলিয়ে পিঠে আঁচল ছুলিয়ে ক্লাগ হাতে পুখে বেরিয়ে পড়তে পারতাম তো আলাদা কথা।

—বারণ করেছে কে? গেলেই হয়।

—তাই তো, সংসারের কাজগুলো আপনি আপনি হবে। মনে করো—ঠাকুর রাঁধছে, তবে আর কি, বসে আছি হাত পা গুটিয়ে।

—মিসেস চৌধুরীর কিন্তু ঠাকুর নেই, নিজেই রাঁধেন।

—আহা সে রান্নার কথা আর বোলোনা, চটি পায়ে দিয়ে চেয়ারে বসে বসে কুকারে রান্না। সকলেই পারে।

—তা তোমাকেই বা মানা করছে কে? হাইহীল পরেই রাঁধোনা তুমি?

—তা নয়? সেই রকম ফ্যাশনই দেখছো যে আমার?

—কিন্তু উমা, বাইরের জগতের আনন্দের ভাগ পেতে তোমাদেরই বা এতো আপত্তি কেন? স্বাধীনতার দিনকে উপলক্ষ করে কিছু বৈচিত্র্যই না হয় এলো একটা দিনের চেহারায়। চলোনা বেরিয়ে পড়া যাক!

—বোকোনা বাপু—

বলে বিমলেন্দুর প্রস্তাবিত সমস্ত আলোচনায় যবনিকা টেনে দেয় উমারানী।

বিমলেন্দুর যেন মাথা খারাপ হয়েছে।

হ্যাঁ উমারানীর এখন ওদের দেখাদেখি পতাকা হাতে করে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে না বেড়ালে চলবে কেন? মান মর্যাদা বলে কিছু নেই যেন? উমারানীরই না হয় তেমন অবস্থা নয়, ওর প্রত্যেক ভগ্নীপতির এক একখানা মোটর নেই? পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে?

বাইরের জগতের আনন্দে মেয়েদের কী দরকার রে বাবা? ফ্যাশান করে বাইরে গিয়ে হল্লোড করে আনন্দ পাবে এমন মেয়ে উমারানী নয়। দেখতে শুনেই ইচ্ছে হয় ভদ্র লোকের বৌয়ের মতো গাড়ী চড়ে বেরোবে।

আবার একদিন—

—বৌদি শুনছো?

—কিরে?

—ওরা পাকিস্থানে গেলো!

—পাকিস্থানে! সে আবার কি? গেলো মানে?

—রিলিফের কাজে গেলো, ওই যে কোথায় যেন বন্যাস ভেসে গেছে। দেশের নামটা মনে নেই আমার, তবে পাকিস্থান এটা ঠিক। দাদা বললো না শেদিন?

—কে জানে? দিন রাত্তিরই তো বড় বন্যা, হুভিক্ষ মহামারী লেগেই আছে দেশে, কতো আর মনে রাখা যায়? কিন্তু ওরা গেলো তুই জানলি কি করে?

—ওমা! একরাশ ছেলেমেয়ে এসেছিল যে ওদের তুলে নিতে। তাদের কথাবার্তাভেই বুঝলাম। দেখো কাণ্ড, সংসারের হুজুন মানুষ হুজুনই চলে গেলো, কি করে চলবে? চৌধুরী সাহেবের তো কোর্ট খোলা আছে।

—ওদের কথা বাক দে, চাকরের রান্না খাবে, জাত যাবার ভয় তো নেই? ঘেরা পিতিও নেই। সেবারে দাঙ্গার সময় দেখলি না—আমরা ঘরে দরজা বন্ধ করে ভয়ে কেঁপে মরছি আর ওরা গুণাপাড়ায় ছুটছেন উদ্ধার কার্য করতে। কতো ঢং?

সাঁমনের বাড়ী নিয়ে আলোচনার খারাটা প্রায় এই ভাবেই বইতে থাকে।

ওদের সবটাই ‘আদিখ্যেতা’ ‘ফাশান’ “ঢং বেয়াকার, দেখানোপনা” ওপরের পালিশ।

বিমলেন্দু বলে—পালিশতো ওপরেরই জিনিশ, ওপরে থাকবে তাতে আর বিচিত্র কি? একেবারে আনপলিশড হওয়াই কি ভালো?

—অতো ভালো হতে যাইও না।

প্রতিভার বয়েস ছোটো হলেও বাচন ভঙ্গীটা ছোটোর মতো নয়, কাজেই শেষ পর্যন্ত কোনঠাসা হতে হয় বিমলেন্দুকেই।...

আশ্চর্য্য এই—ওদের এরা হুচক্ষে দেখতেও পারে না, ছ’ দণ্ড ভুলতেও পারে না।... ওদের দেখার প্রতিক্রিয়ায় হাড়পিতি যতোই জ্বলতে থাকে, দেখার আকর্ষণ ততোই তীব্র হতে থাকে।

অথচ মুখোমুখি আলাপ আর হলো না আজ পর্যন্ত।

এজ্ঞা চৌধুরী জায়া বিমলেন্দুর কাছে অল্পযোগ করলেও এবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না বিমলেন্দুর। বোধকরি উমারানীর ওপর আস্থার অভাবই তার এই অভদ্রতার কারণ।

কিন্তু ভাগ্যদেবতার বোগার্যোগ, যেচে গিয়ে আলাপ একদিন করতে হলো এ তরফ থেকেই।... এক ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ যে বিমলেন্দু জল খেতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে এটাতো আর জানা ছিল না উমারানীর? জানা থাকলে অবিশ্রিই ব্যবস্থা একটা করে রাখতো সে। ডাক্তারকে খবর দিতে পারুক আর না পারুক ‘কেষ্ট বিষ্ট’ ভগ্নিপতিদের ওতো খবর দিয়ে রাখিতে পারতো? তিনজনের তিনখানা গাড়ি, দুপুর রাতেও কলকাতার সহর তোলপাড় করে বেড়াতে পারে।

কিন্তু আগে থেকে জেনে রাখবার কথাতো নয়? তবে?

অথচ দেখো একশো ডাকের পরও বিমলেন্দুর দিক থেকে সাড়াশব্দ না পেলে উমারানী যদি মাটিতে নিজের মাথাটা ঠুকতে শুরু করে, এমন আর কি দোষ দেওয়া চলে?

স্বামীহেন বস্তু চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে বসলে কার মাথার ঠিক থাকে? কোন্ নিষ্ঠাপরায়ণা হিন্দু নারীর?

প্রতিভাই অবশেষে বুদ্ধি বার করলে।

—সাঁমনের বাড়ীতে ওদের টেলিফোন আছে না বোদি? ...তোমার বোনদের খবর দিলে ডাক্তার টাক্তার—

সাঁমনের বাড়ী!

উমারানী কিছুটা জ্ঞান ফিরে পেয়ে যেন বলে—ওদের আছে তা’ আমার কি?

—বললেই তো হয়।

—বলবে কি বরে তুমি? দোর ঠাঙাবে? রাস্তায় নেমে গিয়ে?

—উহ! ওসব কিছু দরকার নেই, তুমি, দাদাকে দেখো, আমি ডাকছি।

প্রতিভা কিন্তু বুদ্ধি খেলানো চহৎকার! স্নেহ চারটা টিপ লোগাড় করে ছুঁতে লাগলো ও বাড়ীর জানলায়।

পদ্ধতিটা যাই হোক—কাজটা হয় ঠিকই।

প্রতিভার যে মৌলিকত্ব আছে সেটা অস্বীকার করা চলে না।...হু একটা টিপ ফেলতেই ও বাড়ীর ঘরে বারান্দায় আলো জ্বলে ওঠে, আর মিস চৌধুরীর মুখখানি ভেসে ওঠে পর্দাবিহীন জানালার গায়ে।

—কি হলো!...

প্রায় অক্ষুট এই শব্দটুকুকেই প্রাধান্য দিয়ে প্রতিভা বলে ওঠে—আমি ডাকছিলাম—একটা কথা শুনবেন?

—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার এই—দাদা হঠাৎ জল খেতে উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, ডাকলে সাড়া মিলছে না। আপনারা যদি একবার টেলিফোনে খবর দিয়ে দিতে পারেন এক জায়গায়—

—নিশ্চয়! নিশ্চয়!...দাদান...দাদা, ও দাদা, ওঠোতো একটু...ওঁরা বলছেন—

এক মিনিটের মধ্যেই চৌধুরী সাহেব এসে হাজির হন এ বাড়ীর সদরে।

—ফোন নম্বরটা বলে দেবেন কি ?

ফোন নম্বর ? সে জিনিষটা তো জানা নেই উমারানীর ।

—ফোন নম্বরটাই ভুলে গেছেন ? উপায় ?...আচ্ছা তার চাইতে আগে ডাক্তারকে খবর দেওয়াই দরকার বোধ হয় ।

—প্রতিভা বল আমাদের ডাক্তার বাবুর নাম হচ্ছে—
হরেশ গুপ্ত । বলা বাহুল্য কষ্ট করে আর বলতে হয় না প্রতিভাকে ।

চৌধুরী সাহেবের পিছন পিছন চৌধুরীজায়াও এসে হাজির হয়েছেন ততক্ষণে ।...

ছুথের বিষয় ডাক্তারের ফোন নম্বরও উমারানীর অজ্ঞাত । কেনই বা জানবে ? বাড়ীতে ফোন থাকলে তবে জানা সম্ভব হতো ?...অবশ্য ডাইরেক্টরী তোলপাড় করতে পারলে সবই বেরোয়, কিন্তু অতো সময় কোথা ? বিমলেন্দু যে চোখই খুলছে না ।

অতএব নিজের ডাক্তারকেই ফোন করে দেন চৌধুরী সাহেব ।

বাকী রাতটুকু কাটে হৈ চৈয়ের ওপর ।

এবাড়ী ওবাড়ী এক হয়ে ওঠে ।...তার হাত সেই জমিটুকু পার হয়ে চৌদ্দবার আনাগোনা করতে হয় মিসেস চৌধুরীকে । উমারানীর বাড়ী ঠেঙিয়েও খোঁজ মেলে না আইসব্যাগের, ফরসা তোয়ালের, জল গরম করার উপযুক্ত এনামেলের গামলার,—আরো কতো কি ।...

অথচ আছে সবই বাড়ীতে ।...থাকবেনা কেন ? বিমলেন্দুর তো সখের অভাব নেই । তবে কোথায় আছে সেটা অজ্ঞাত । উপায় কি ? উমারানীর কি এখন মাথার ঠিক আছে—তাই আইসব্যাগ আর ফরসা তোয়ালে খুঁজতে বসবে ?...কাজে কাজেই যাদের মাথা ঠিক আছে এবং থাকা উচিত তারা কিছু আর শুনে বসে থাকতে পারে না । করতেই হয় ছুটীছুটি ।

অনেক কাণ্ডের পর ভোরের দিকে বিদায় নিলেন ডাক্তার, কিন্তু যা রায় দিয়ে গেলেন সেটা বিমলেন্দুর মুখরক্ষার উপযুক্ত নয় ।

একটু শুধু হজমের গোলমাল ।

রাত্রির আহারের খিচুড়ী আর ইলিস মাছই এর জন্তে দায়ী ।

অবশ্য ইলিসমাছ বলে অবজ্ঞা করেন না চৌধুরী দম্পতি । যথেষ্ট উৎকর্ষা এবং যত্নের সঙ্গে দেখাশোনা করে জ্ঞান হওয়ার পর বিমলেন্দুকে শুধু কথা বলিয়ে নয়, হাসিয়ে পর্যন্ত, তবে বিদায় নেন তাঁরা ! ভবিষ্যতে ইলিসমাছ সম্পর্কে বারবার সতর্ক করে দিয়ে ।

ডাক্তার এবং চৌধুরী সাহেবের উপস্থিতির অস্ববিধের উমারানী সারারাত আকণ্ঠ ঘোমটা দিয়ে বসে বসে ঘেমেছে, এঁরা চলে যেতেই বিমলেন্দুর বিছানার ওপর আছড়ে এসে পড়ে ।

—উঃ কী বিরক্ত যে লাগছিল ।

—বিরক্ত ?

এর বেশী আর কিছু বলে না বিমলেন্দু । বলতে পারেই না ।—বিরক্ত নয় ? উমারানী সন্নেহে স্বামীর গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলে—হুই কত্তা গিন্নী যেন তোমাকে আগলে বসে রইলেন সারাক্ষণ । আমি বেচারা একটু কাছে আসতে পাই না । বসে বসে ঘেমেছি আর রেগে মরেছি ।

—ঘামার মানে হয়, কিন্তু রাগের কারণ কি ?

অবাক হয় বিমলেন্দু । হঠাৎ রাত ছুপুরে অসুখ বাধিয়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে রাগের কারণ নিজেই হলো নাকি বিমলেন্দু ?

উমারানী অবশ্য সন্দেহ ভঞ্জন করে দেয়—রাগ হবে না ? আমি বলে ছটফটিয়ে মরছি কাছে আসবার জন্তে, আপত্তেই পারছি না । আর ওঁরা হুই কত্তাগিন্নী যেন সাত কালের চেনার মতন সর্বত্র ঘটঘট করে বেড়াচ্ছেন । কি সপ্রতিভ বাবা !

বিমলেন্দু রাগ করে বলে—তা তুমি কাছে এলেই পারতে, ওঁরা তো তোমার ভাস্কর নয় ?

—আহা, ভাস্কর না হলে যেন মানুষকে লজ্জা করতে হয় না ? ওঁদের কিন্তু বোঝা উচিত ছিল ।

—তা ঠিক । তবে সকলের বোধশক্তি থাকে না এই যা । তবে আমি ভাবছি যাই ভাগ্যিস এসে পড়েছিলেন ওঁরা, নইলে এতোক্ষণে হয়তো—ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে হতো তোমায় ।

—জিস তাই বইকি ! মা কালীর কাছে কেঁদে পড়ে হাতের শাঁখা বাঁধা রেখে মানত করলাম না ? কাজ যা হবার ওতেই হয়েছে, বুঝলেন মশাই ?

—আন্তে আন্তে সবই পাচ্ছি বুঝতে। তবে সেই বাঁধা দেওয়া শাখা যে আবার আছড়ে ভাঙতে হলো না এই তের। ওঁরা—

—বারবার যা মুখে আসে বোলে না বলছি। সঙ্কট থেকে উদ্ধার হলে—মা সঙ্কটচণ্ডীর নাম করো তা নয়—ওঁরা, ওঁরা। ওরা কী এতো হাতী ঘোড়া করেছে জানি না।

—যা করেছেন—তুমি পারতে পরের বাড়ী গিয়ে ?

—আমি ? অতো ফ্যাশান নেই আমার।...গায়ে হাত বুলোচ্ছেন, মাথায় হাত বুলোচ্ছেন; যেন কত কালের আত্মীয়। ...আমরা শত বিপদেও যদি পড়ি—পরপুরুষের বিছানায় গিয়ে বসবো ? ছিঃ ছিঃ ! গলায় দড়ি।

মধু মালতী

শ্রীপারুল সেনগুপ্ত

অবশ্য ছোট বেল। হইতেই মাধবী ভাবুক প্রকৃতির। বর্ষার মেঘ, বসন্তের হাওয়া, চাঁদের আলো আর বউ কথা কও পাখীর এমন সমজদার আর দুটি মেলা ভার। তাই বয়সে ও জ্ঞানে একটু প্রবীণা হইতে না হইতেই ‘মাধবী’ নামটাকে সে মধুমালতীতে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছিল। বাবা মাঝে মাঝে হাসিয়া বলিতেন ‘মাধবী’ নামটাও তো বেশ রে ! তোদের পদ্য টম্যতেও তো ওটা থাকে দেখেছি।’

বলা বাহুল্য মাধবীর কবি ও কবিতার প্রতি আবালা অনুরাগ বাড়ীর কাহারও অজানা ছিল না। জবাব অবশ্য মাধবী খুঁজিয়া পায় নাই, তাই শুধু হাসিয়াছিল একটু। এবং আদরের কন্যাকে ব্যথা দিবার ভয়ে স্নেহান্বিত পিতা স্বপ্রদত্ত নামটি তুলিয়া লইয়া কন্যার নিজ নির্বাচিত নামটিই স্থায়ী করিয়া দিয়াছিলেন। সেই হইতে স্কুল কলেজে সে ‘মধুমালতী’, আর গৃহে মা বাবার মুখে ‘মধু’।

এ হেন মধুমালতীর যেদিন বিবাহ হইল হর্ষনাথের সঙ্গে সে দিন প্রিয়মিলনাবেগে মধুর মন কিন্তু হর্ষে ভরিয়া উঠিল না। যৌবনের বীণায় মিলন রাগিণী ফুটিয়া উঠে নাই এমন নহে; জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রিতে মধুমালতীর জীবনে প্রেম বল্লভের জন্য যথারীতি পথ চাওয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল তাহাও নিশ্চয়। পাত্র হিসাবেও হর্ষনাথ কি আর মন্দ ছিল ? যোগ্যতা ও গুণাবলীর বিচারে যে কোনও মেয়ের পক্ষেই

বাহিত্র জীবন সঙ্গী—মিলিটারী একাউন্টসের বড় চাকুরিয়া। কলিকাতায় কেবল বাড়ী গাড়াই নয়, ব্যাঙ্কের সঞ্চিত বিপুল অর্থের একমাত্র আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারী।

মধুমালতীর পিতামাতার আত্মীয় বন্ধুহলে যুক ফুলিয়া দশ হাত। আদরিণী কন্যার আজীবন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অনিশ্চিত ব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন; কিন্তু নিমজ্ঞ লিপি ছাপাখানা হইতে আসা অবধি মধুর মুখে আর হাসি নাই।

আসন্ন বিচ্ছেদশঙ্কিত কন্যার কাছ হইতে বাপ মা অবশ্য ঠিক একরূপ আচরণই আশা করিয়াছিলেন। কাজেই বিচ্ছেদ বেদনার ফাঁকে ফাঁকে কন্যার কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা আরও পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কার্য্য কারণের অবশ্যান্তাবী যোগাযোগ লইয়া মাথা ঘামাইবার আর কিই বা থাকিতে পারিত ! কিন্তু মধুমালতীর মাথা ঘামিবার কারণ যথেষ্ট ছিল। মধু মালতী ও হর্ষনাথ !! কিছুতেই নাম দুটির মধ্যে সে সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যত ভাবেই যুগ্মরূপ দিক না কেন, মিলিত নাম দুটি লইয়া কিছুতেই তাহার মন সন্তুষ্ট হইতেছিল না।

...হর্ষনাথ মধুমালতী, ‘মধু’ হর্ষ, হর্ষমালতী, উছঃ একটি সংযোগ ও তাহার আকৈশোর কল্পনার খাপ খানিতে সুন্দর হইয়া বসিয়া যাইতেছে না।

হর্ষনাথ! কি ভয়ঙ্কর নাম! ঐ নামের অধিকারী একটি মানুষকেও স্তম্ভর দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না মধু। তাহাদের কলোজের প্রিন্সিপাল হর্ষনাথ তালুকদারের মত হয় যদি? প্রকাণ্ড বাঁটার মত একগোছা গোঁফের ছায়ায় হলুদ-রংয়ের ছোপপড়া উঁচু নীচু বিস্তী দন্তপাটি! নিজের চুলের মুঠা ধরিয়া উত্তপ্ত মাথাটার সঙ্গে আরে বাঁকুনী দিয়া লয় মধুমালতী। জর্ভাবনার তাপে শিথায়িত মগজের চারি ধার ঘিরিয়া সরোজ মাসীমাদের বাগান বাড়ীর বড়ো মালীটা বার বার ভাসিয়া উঠে। মুণ্ডিত মস্তকে স্তম্ভী টিকি, ডান গাল জুড়িয়া বেলাকৃতি এক টিউমার! হর্ষবিলাস ওরফে 'হরিষবিলা' অনেকের মনেই বীতরাগ জন্মাইবার পক্ষে যথেষ্ট। সমস্ত দিন অস্থির পদে বারান্দায় পাইচারী করিয়া মাথাটা খানিক হাক্কা করিয়াছিল মধু; কিন্তু মনের কথা কাহাকেও বলিয়া স্বয়ং হাক্কা করিতে পারে নাই। কোথায় গেল কিশলয় আর কোথায় বা গেল রূপক অমিতাভ। মধুমালতীর কল্পনারঞ্জিত মানসপটে রজত ও দীপ্তেন্দুর সঙ্গে সব নামগুলি লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। মধুমালতী ভাবিল 'হ' সম্বলিত নামই যদি হইতে হয় তাহা হইলে হিমাঙ্গি শেখর হৈমন্ত অথবা হিমাংশুমৌলীতে আপত্তি ছিল কি? নিদেনপক্ষে হরগঙ্গা ও হরগৌরী হইলেও খানিক সান্তনা পাইত মধু। ধ্যানমগ্ন মহেশ্বরের জটাজালে উচ্ছলিত গঙ্গাশ্রোত, কিম্বা শিবক্ষলীনা ক্ষীণাক্ষী পার্বতীর মূর্তি কল্পনা করিয়া খণিকক্ষণ কবিত্ব করা যাইত অন্ততঃ। নিমন্ত্রণপত্রগুলি হইতে মধুমালতী নামটা মুছিয়া তাহার স্থানে বড় হরফে 'হিড়িম্বা' নামটা বসাইয়া দিবার লোভ অনেক কষ্টেই মধুমালতী দমন করিয়াছিল।

শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ রাত্রির প্রতীক্ষিত মধুর কল্পনা তাহার কুমারী জীবনের বিভীষিকারূপে উপস্থিত হইয়াছিল এমন কথা মধুমালতী বলিতে পারে না। শুভদৃষ্টির সময় নিরাশা মিশ্রিত প্রত্যাশায় চোখ তুলিতে হর্ষনাথ মধুর চোখে সত্যি ভীষণদর্শন বলিয়া বোধ হয় নাই। বরসজ্জার মুহূর্ত্ত কোমলতা, সমাগত উৎসবের বিলাস নাদকতা ভেদ করিয়া পুরুষোচিত সবল দেহাবয়ব মধুমালতীর নিরানন্দ মনে প্লক সঞ্চার করিয়াছিল। কুমারী হৃদয়ের অর্জবিকট পুষ্পকোরকটি নূতন আকর্ষণে পাণ্ডি মেলিয়া বিকশিত হইয়াছিল।

পরবর্তী জীবনে হর্ষনাথের চরিত্রের অপর বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গেও মধুমালতীর নিবিড় পরিচয় ঘটিল। আত্মবিশ্বাসে বলিষ্ঠ মনটি মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার অন্তত ক্ষমতাসম্পন্ন। ব্যবহারিক সংসারের মানুষ হর্ষনাথ। বাস্তবের চাঁচাছোলা বাস্তব জীবনে রোমান্স বা কাব্যকলার জন্ত কোনখানে এতটুকু ফাঁক নাই। সেজন্য দুঃখ নাই মধুমালতীর। কালের ঢাকা অসংগতির মধ্যেও সংগতি আনিয়া দিয়াছে। তবু বাসর রজনীর যে একটা অপ্রিয় স্মৃতি আজও তাহাকে অহরহ দংশন করে, তাহাকে ভুলিতে পারে নাই মধু। সে রাত্রে হর্ষনাথের জন্য তাহার সাথের নামখানির যে অপভ্রংশ জন্ম লইয়াছে মধুমালতীর বিশ্বাস তাহার মৃত্যুর আগে উদ্ধারও বিনাশ নাই।

গম্ভীর মোটা গলার 'মাধু' ডাকটা লালিত্যবিশীন একটা গুরু ধমকের মতই মনে হয় মধুমালতীর। বিবাহের রাত্রে মধুমালতী বলিয়াছিল, "মাধু ব'লো না। আমার নাম 'মধু' বহু বলতে পার।"

আশ্চর্য্য হইয়া হর্ষনাথ অল্প কথায় শুধু জবাব দিয়াছিল, "কেন, মাধুও তো মন্দ নয়।"

তাহার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে মধুমালতী হঠাৎ প্রথম দিনেই বুঝিয়া লইয়াছিল, কথার নড়চড় হয় যাহাদের, এ সে মানুষ নয়। তবু প্রথম কিছুদিন মধুর মনে আশা ছিল কালক্রমে হয়ত বা দীর্ঘে দীর্ঘে বিদ্যুটে অপভ্রংশটির বিলোপ সাধন সম্ভব হইতেও পারে। কিন্তু তখনও হর্ষনাথকে চিনিতে বাকি ছিল তাহার। মধুমালতীর বাপের মত নয় হর্ষনাথ, যে মধুর বাথাই তার কাছে বড় হইবে সব কিছুই চেয়ে। তাহার আত্মপ্রত্যয়ী মন যাহা ভাল বলিবে তাহা আজও ভাল, কালও ভাল, চিরদিনই ভাল। তাই হর্ষনাথের ঘরে মধুমালতী 'মাধু' নামেই প্রতিষ্ঠিত।

তবে কি মধুমালতী সুখী নয়? কেনই বা নয়! প্রাসাদময় অট্টালিকা, বহুমূল্য মটরগাড়ী, প্রাণপ্রতিম চুহিতা, কর্তব্যনিষ্ঠ স্বামী।

যাহা দিয়া জীবনে সুখ আসে, তাহার কোনটিরই অভাব নাই। তবে আর দুঃখের কি থাকিতে পারে মধুমালতীর জীবনে? তবুও কল্পনা বিলাস পুষ্ট মধুর মনটি

এত স্বৈখ্যের মধ্যেও নাকি আজও থাকিয়া থাকিয়া হা-হা করিয়া উঠে। ধনের অভাব নয়, জনের অভাব নয়, দৃষ্ট কোন কিছুর অভাবই নয়। মধুমালতী নিজেও হয়ত বলিতে পারে না কোথায় শূন্যতা, কিসের অভাব... হুং খুং কিসের, খেঁচাই বা কেন! অহুভূতি দিয়া, মনের দৃষ্টি দিয়া বুঝি কেবল সে অভাব বুঝিতে পারা যায়।

আকাশ জুড়িয়া ঘনঘটা করিয়া বর্ষা আসিয়াছে। রেলিং ধরিয়া ইট কাঠের ছিদ্র দিয়া আকাশের ফালিটুকু দেখিতে দেখিতে বৃষ্টিতে ভেজে মধুমালতী। মিহি জামদানীর আঁচল বাহিয়া জল ভাসিয়া যায়। বর্ষার বাতাসে খোলা চুল লুটোপুটি খায় মুখের ছপাশে। অপূর্ণ পুলক রোমাঞ্চে কদম্বকেশরের মত ফাপিয়া উঠে মধুর হৃদয়। সংসারের তীরে দিগন্তের সীমায় মেঘদূতের পিছন পিছন তাহার মন ছুটিয়া চলে বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার মত।

.....“মাধু, পাগল হ’লে তুমি? এই সেদিন উঠেছ জর থেকে।”

প্রেমপূর্ণ তিরস্কারের আঘাতে চকিতে মধু নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসে। স্নান হাসিয়া হর্ষনাথের সমস্ত প্রসারিত টার্কিশ তোয়ালের আড়ালে আঁত্র মুখ ঢাকিয়া ফেলে। আর কেহ তাহার মুখ দেখিতে পায় না।

চাঁদের আলোয় সমস্ত পৃথিবী সাদা হইয়া গিয়াছে। শিয়রের জানালা খুলিয়া দেয় মধুমালতী। চন্দ্রমল্লিকার রাশের মত শুভ্র জ্যোৎস্না বরিয়া পড়ে শয্যাতলে, ঘুমন্ত হর্ষনাথের সর্ব্বাঙ্গে। বলিষ্ঠ মাংসপেশীগুলি দেখিয়া মনে হয় ধাতুর তৈরী ছোট বড় কতকগুলি গোলক। রাত্রি গভীর। লোকালয় শান্ত। প্রকোষ্ঠের কক্ষণ চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় মধুমালতী। রূপের শিঞ্জিনীর ভয়ে চকিতা রাখা অভিসারে চলে যেন। ঘরছাড়ানো বাঁশী বাজিয়া উঠে মধুর মনে।

.....“এখনো ঘুমোওনি মাধু? দাঁড়াও জানালাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এত আলোয় আমারই ঘুম ভেঙ্গে যায়।...” চমকিয়া উঠে মধুমালতী। ছাড়া পাইয়া বন্দী চুড়ী কক্ষণ বাজিয়া উঠে নির্জন ঘরে। প্রেমের দৃষ্টি তাহার স্তনের দ্বারে অহনিশি জাগিয়া থাকে প্রহরীর মত। তবু

কি অসুখী মধুমালতী? কাল দিনের আলোয় প্রসন্ন করিও তাহাকে। - আজ শুধু অন্ধকার ঘরে হর্ষনাথের সতর্ক স্নেহে ঘেরা শয্যায় একবার চোখ মুছিয়াছে সে।

খোলা ছাদে, সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো আঁধারে জগদ্ধাত্রীকে আবৃত্তি শেখায় মধু। হ্যাঁ, মধুমালতীর মেয়ে জগদ্ধাত্রী! হর্ষনাথের দেওয়া নাম। বিপুল আড়ম্বরে মেয়ের নামকরণ উৎসব করিয়াছিল হর্ষনাথ। হিড়িম্বা নামটার প্রতি মধুমালতীর আকর্ষণ সেদিন আর একবার প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে বাহার জন্ম, ঐ নামই কি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত নয়?

.....“সন্ন্যাসী উপগুপ্ত

মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন স্পষ্ট...

নগরীর দীপ নিবেছে পবনে.....

“—ঘোল ঘরের নামতা বেশ ভাল করে শিখেছ, জগৎ?”

নিমেষ মধ্যে জগদ্ধাত্রী গণিতের খোঁজে অন্তর্হিত হইয়া যায়। স্থানবৎ উপবিষ্ট মধুমালতীর দিকে দ্বিতীয় প্রশ্নবাণ নিষ্ক্ষেপ করে হর্ষনাথ।

“মাধু, মেয়ের পরীক্ষা সামনে কণ্ঠে এই কি কবিত্ব করবার সময় হ’লো তোমার?.....

নত মস্তকে অপরাধ স্বীকার করিয়া চয়নিকা হাতে নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে মধুমালতী। উচ্চকণ্ঠে জগদ্ধাত্রী তখন আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে, ...“চার ঘোলায় চৌষটি, পাঁচ ঘোলায় আশী”।

সেদিন রাত্রে মধুমালতীর গোপনরক্ষিত কবিতার খাতার উনসপ্ততিতম পৃষ্ঠায় লেখা হইল,

আপন মনে বেড়াই যে গান গেয়ে

কেউ শোনে আর কেউ বা শোনে না।

হাসির ছলে পরিহাসের বাণ

দরদ খুঁজে পাই যে অপমান।

মনের কথা লুকায় মনের কোণে

কেউ বোঝে আর কেউ বা বোঝে না।

বীণার তারে যতন ভরে আমি

যে সুর দিয়ে সেখেছিছ তান

এতকালের মোর সে বীণা থানি

তোমার তরে ফেলি দিব টানি?

শোনার মানুষ নাই বা মেলে যদি

হিয়ার ভরি নিব তাহার গান ॥

নারীশিক্ষা সমিতি

শ্রীশোভা মহলানবিশ

মানবের কল্যাণের জন্ত, লোকহিতের জন্ত, নানা অনুষ্ঠান আয়োজন সকল যুগে হ'য়ে আসছে। কিসে মানবের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা যায় এ সমস্যার সমাধান সহজ নয়,—তবুও আত্মনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয় না থাকলে যে মানুষের উন্নতি হয় না, সেটা সহজেই বোঝা যায়। শিক্ষা মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে' তোলে—তাই প্রথমেই চাই শিক্ষা। দেশকে, প্রতি মানবকে শিক্ষাদীক্ষায় বড় করে তুলতে পারলেই বহু সমস্যার সমাধান আপনিই হ'য়ে যায়। দীর্ঘকাল দেশে নারীরাই শিক্ষাসম্পদ হতে বিশেষ করে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। তাই গত ২৯ বৎসর ধরে নারীশিক্ষাসমিতি বাংলার মেয়েদের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও পরনির্ভরতা দূর করার চেষ্টা করছেন,—তাঁদের আত্মনির্ভরশীল করে' তুলবার প্রয়াসে, নারীশিক্ষার নানা শাখা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

১৯১৪ সালে মাননীয়া শ্রীযুক্তা অবলা বসু তাঁহার স্বামী আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে জাপান পরিভ্রমণে যান। তিনি ইউরোপ প্রভৃতি নানা দেশও দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। দেশের স্বাশিক্ষাবিষয়ে চিরদিনই তাঁর উৎসাহ; ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তার সাফল্য দিচ্ছে। তাই যেখানেই তিনি গিয়াছেন সেখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে সাগ্রহে অনুসন্ধান করেছেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে চির অবজ্ঞাত জাপান কেমন করে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিল তা' জানবার জন্ত তাঁর মনে প্রবল বাসনা ছিল। জাপানে গিয়ে তিনি বুঝলেন জাপানের এই উন্নতির মূলে রয়েছে শিক্ষা; আমাদের দেশে যেমন স্কুল কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোনও সংশ্রব নেই—জাপানে তার বিপরীত। সেখানে পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সকল রকম গৃহকর্ম ও গৃহধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়—এমন কি, আত্মিক অভ্যাগতকে আরদ অভ্যর্থনা করা, গৃহসজ্জিত করা প্রভৃতিও সেখানে

শিক্ষার বিষয়। জাপানের এই শিক্ষাপ্রণালীর সুফল দেখে, মাননীয়া শ্রীযুক্তা বসুর মনে হ'ল—দেশব্যাপী শিক্ষার বিস্তার না হ'লে, শিক্ষার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যোগ না থাকলে, আমাদের দেশ বাঁচবে না। অনেকেই জানেন, জাপানে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা অত্যন্ত দেশের চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের দেশে, কেমন করে এই ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা যায়—বিশেষতঃ মেয়েদের মধ্যে,—এই চিন্তা বহুজ্ঞাধার মনকে অধিকার করে রইল। নারী ভবিষ্যৎ জাতির জননী। এইজন্ত দেশে নারীশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এই সময়ে ব্যাপকভাবে মেয়েদের শিক্ষার জন্ত বিশেষ কোন সজ্জাবদ্ধ চেষ্টা আরম্ভ হয়নি। উচ্চশিক্ষা বড় বড় সহরে মেয়েদের মধ্যে তখন অগ্রসর হচ্ছে; নাগরিক জীবনে তার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই—কিন্তু গ্রামের মেয়েদের অজ্ঞানতা আজও দূর হয়নি, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার আজও অতি কঠিন। শ্রীযুক্তা অবলা বসুর এই সাধুসংকল্পকে রূপদান করার জন্য পরলোকগত সতীশরঞ্জন দাস, স্যার বিনোদ মিত্র ও আরও হুঁচারজন বন্ধু আগ্রহের সঙ্গে নানাভাবে সাহায্য করেন। এমনই করে' নারীশিক্ষা সমিতির গোড়া পত্তন হয়। সমিতি কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য গভর্ণমেন্টের সাহায্যও গ্রহণ করেন। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ও পুরমহিলারাও গৃহপ্রাদর্শ, পূজার দালান প্রভৃতি বিদ্যালয়ের জন্য দিয়ে সে সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ১০১২টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল; কিন্তু তার জন্য কোথাও ঘর ভাড়া করতে হয়নি। বালিগঞ্জ, ভবানীপুর শ্রামবাজার, নারকেলডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে এখন যে সব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় দেখা যায়, তার অনেকগুলিই সমিতির প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ১৯১৯ সালে সমিতির প্রথম বিদ্যালয়—বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়টি খোলা হয়। এই বিদ্যালয়টি ও বেঙ্গল বালিকা বিদ্যালয় এখন স্থানীয়

প্রচেষ্টায় কলেজে পরিণত হয়েছে। সে দিনের ক্ষুদ্র বীজ বিবীট মহীরুহে রূপান্তরিত। কিন্তু শ্রীযুক্তা বসু ও নারী শিক্ষাসমিতির সহিত ইহাদের সম্পর্কের কথা সাধারণে জানে না। তারপর কলকাতার পৌরজনসভা যখন প্রাথমিক শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করলেন, তখন সমিতির কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হ'ল—বাংলার অবজ্ঞাত, অজ্ঞানাককারাচ্ছন্ন পল্লীগুলিতে, শিক্ষার আলো যেখানে তখনও পৌছায় নি, মেয়েদের শিক্ষা যেখানে তখনও অভাবনীয় ছিল, সেই সব গ্রামে গ্রামে বালিকাদের জন্ম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হ'তে লাগল। গ্রামের লোকে যখন তাদের মেয়েদের শিক্ষায় আগ্রহী হ'য়ে—বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার নিজেরা নিতেন, তখন সেখানে সমিতির কাজ শেষ হ'ত, অত্ৰ কোনও গ্রামে আবার নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করতে সমিতি তার শক্তি নিয়োগে সচেষ্ট হ'তেন। এইভাবে, এ পর্যন্ত সমিতি ৫৪টি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এর মধ্যে ১২টি নানাকারণে বন্ধ হ'য়ে গেছে, ২০টি স্থানীয় অধিবাসীরা পরিচালনা করছেন ও ২২টি সমিতি বঙ্গবিভাগের সময় পর্যন্ত পরিচালনা করেছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৯টি বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে, তার মধ্যে একটি মুসলমান মেয়েদের মক্ভব। এই বিদ্যালয়গুলিতে আজ পর্যন্ত প্রায় দশহাজার ছাত্রী শিক্ষালাভ করেছে—অন্ততঃ তারা 'নিরক্ষর' এই অপবাদ থেকে মুক্ত হয়েছে।

গ্রামে কাজ করতে গিয়ে শিক্ষয়িত্রীর অভাবের দিকে সমিতির দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ যে সব মেয়েরা স্কুল কলেজ থেকে পাস করে শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত হ'ন, তারা বাংলার পল্লীতে গিয়ে গ্রাম্যবালিকাদের শিক্ষার ভার নিতে চান না,—তাদের পল্লীগ্রামে গিয়ে বাস করার বহু বাধাও আছে। এই সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে নারীশিক্ষা সমিতি, বিশেষ করে শ্রীযুক্তা অবলা বসু ও তাঁর স্নযোগ্য সহকর্মী স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয়—বাংলার অসংখ্য বিধবা মেয়েদের এই কায়ের জন্ম গড়ে' তুলবার পরিকল্পনা করেন। তাঁদের মনে হয়, লক্ষ লক্ষ বিধবা পরের গলগ্রহ হ'য়ে, হীনতার প্লাবিত মধ্যে কায়ক্লেশে বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা জাগিয়ে তুলতে পারলে একদিকে যেমন তাদের দুঃখক্লিষ্ট

জীবনকে শিক্ষা ও আত্মমর্যাদা বোধের গৌরবে আনন্দময় করে' তোলা যায়, অত্ৰদিকে তাদের দিয়েই দেশব্যাপী অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টা করা যায়, এই প্রচুর প্রাণশক্তিকে সার্থক কাজে লাগিয়ে। নারীশিক্ষা সমিতির এই-ই হ'ল প্রধান কাজ।

একদিন দৃঢ়চেতা মনসী বিদ্যাসাগরের কোমল মন বাংলার বিধবার যন্ত্রণাময় জীবনের বার্থতা অনুভব করে' কারুণ্যে ভরে' উঠেছিল,—বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এদের দুঃখহ্রদশা দূর করতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে' গেছেন। সেই মহামানবের স্মরণীয় নাম নিয়ে বিদ্যাসাগর বাণীভবন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, ২টি মাত্র বিধবা মেয়েকে কেন্দ্র করে। এর পরে ৫০৬০টি বিধবাকে বিনাব্যয়ে আহার, বাসস্থান ও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিধবাদের অর্থনৈতিক পরাধীনতা। যাদের অবস্থা নিতান্ত অস্বচ্ছল নয়—তারাও বিধবা কল্যাণ বা বধুর জন্ম অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত। যে-বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তি বা স্বামীদত্ত সামান্য অর্থেরও অধিকারিণী, তারও সে অর্থব্যয়ের স্বাধীনতা নেই, বহুক্ষেত্রে সে রকম অর্থে তারা বঞ্চিতা, আত্মীয়স্বজন সে-অর্থ আত্মসাৎ করতে তৎপর। এই অভিজ্ঞতার ফলেই সমিতি বিধবা নারীদের স্বাবলম্বী হবার স্নযোগ দেবার জন্ম, বাণীভবনকে অধৈতনিক বিদ্যালয় করেন। মনে হয়, বিদ্যাসাগর বাণীভবন, আজও দেশের একটি বৃহৎ অভাব পূর্ণ করতে চেষ্টা করছে।

জীবনের স্বাভাবিক গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, সাধারণ শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা লাভ করে' বাতে মেয়েরা একান্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে, সমিতির শিক্ষাপ্রণালীতে সেই চেষ্টাও আছে। বিদ্যাসাগর বাণীভবনে M. E. Standard পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়—সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শিল্পকার্যও শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষালাভের পর যে-ছাত্রীরা উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তারা জুনিয়ার ভার্গাকুলার ট্রেনিং স্কুলে হ'বৎসর শিক্ষাদান বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে' ট্রেনিং পরীক্ষার জন্ম প্রাপ্ত হয়। ট্রেনিং পাস করার পর বাণীভবনের ছাত্রীদের গ্রামে গ্রামে সমিতি-পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষয়িত্রী করে পাঠানো হয়। এইভাবে, গ্রামে

উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব পূরণের চেষ্টাও সমিতি করছেন।

হুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত পরিবারের বধু, কন্যা ও গৃহিণীরা যদি অবসর সময়ে গৃহশিল্প শিক্ষা করে' পরিবারের আর্থিক অনটনের তীব্রতা কিছু পরিমাণেও লাঘব করতে পারে, যাতে, আর্থিক জীবনেও যে তারা কিছু কাজে লাগতে পারে, এই বিশ্বাস—তাদের মনেও উৎসাহ এবং আত্মনির্ভরশীলতা এনে দেয়—এই আদর্শেই মহিলা শিল্পভবন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সালে। ১৬ বছরের বেশী যাদের বয়স—এই রকম সধবা, বিধবা ও কুমারী মেয়েরা, বাঁড়ী থেকে এসে, নানা রকম, শিল্পশিক্ষা করার সুযোগ এখানে পায়। গভর্নমেন্টের সেলাই পরীক্ষা দেবার জন্ত এদের অনেককে প্রস্তুত করা হয়। সেই পরীক্ষাগুলি পাস করে' অনেকেই বহু বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষয়িত্রীর-কায় করে' নিজেদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছে। এ রকম প্রতিষ্ঠান এখন সহরে ও গ্রামে, বহু স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক বোধ হয় নারীশিক্ষা সমিতি ও সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি।

নারীশিক্ষা সমিতির আর একটি বিশেষ কায়—গ্রামে গ্রামে বয়স্ক নারীদের জন্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন। খুব বেশী দিন এ কায়টি আরম্ভ হয়নি; ১৯৩৮ সালে ২৪ পরগণার রাজপুর গ্রামে প্রথম বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর ১ লক্ষ টাকা দানের উপস্থত্থ থেকে এই কায়ের ব্যয়নির্বাহ হয়। ক্রীযুক্তা অবলা বসুর ইচ্ছানুসারে এই ট্রুস্ট ফাণ্ডের নামকরণ Sister Nivedita Women's Education Fund হয়েছে, যিনি ভারতবর্ষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন—সেই ভগিনী নিবেদিতার নাম চিরস্মরণীয় করবার জন্ত। গ্রামের বয়স্ক নারীরা সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে, ঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় সেলাই ও অত্যন্ত সুচীশিল্প শিক্ষা করার সুযোগ এই কেন্দ্রে পান। সঙ্গে সঙ্গে ধাত্তীবিদ্যা, শিশুপালন ও রোগীপরিচর্যাও একজন অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা দেন। গ্রামে, বতদূর সম্ভব, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ ইনি ছাত্রীদের দেন। এইভাবে, অনেক সময়ে, সূদূর পল্লীগ్రামবাসীরা

অভিজ্ঞ শুশ্রূষাকারিনী ও ধাত্তীর সাহায্য পান। বলা বাহুল্য শিক্ষাশেষে, স্বাস্থ্যবিদ্যা ও ধাত্তীবিদ্যায় পারদর্শিনী ছাত্রীরা গ্রামের বহু কল্যাণ সাধন করেন। গ্রামের রিলিফ হাসপাতালে ২৪ জন কায়ও পেয়েছেন। সাধারণতঃ একবছর বা দুবছর এক এক কেন্দ্রে এই ধাত্তীবিদ্যা শিক্ষয়িত্রী থাকেন, শিক্ষাদান শেষ হ'লে অন্য কেন্দ্রে কায় আরম্ভ করেন। সাধারণ শিক্ষয়িত্রী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে নতুন নতুন কেন্দ্রস্থাপন করে' এক এক জায়গায় এক বছর কায় করেন। পরে সেই সব কেন্দ্র স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (সমিতি প্রতিষ্ঠিত) শিক্ষয়িত্রীরা পরিচালনা করেন। এ পর্য্যন্ত এই রকম ৬টি কেন্দ্র সমিতি স্থাপন করেছেন। বয়স্ক ছাত্রীদের শিক্ষার আগ্রহ খুব বেশী। জীবনে শিক্ষার মূল্য কতখানি একথা তারা বোধ হয় বুঝতে শিখেছে। এই সব কেন্দ্রে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বোল থেকে ষাট বৎসর বয়স্কারাও শিক্ষা লাভ করেন। এই রকম বয়স্কশিক্ষাকেন্দ্র আরও বেশী সংখ্যায় স্থাপন করতে পারলে অনেক নিরক্ষরা জ্ঞানের আলোক পেতে পারে।

নারী সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ। অর্দ্ধাঙ্গ অবশ্য হ'লে মানুষ যেমন চলতে পারে না, সমাজ জীবনেও তেমনই অচল হয় যদি নারী ও পুরুষ, ধনী ও দরিদ্র সমভাবে উন্নত না হয়। সে রকম উন্নত সমাজ এখনও সূদূরে—কিন্তু যখন দেখি হুঃস্থ ভরাক্রান্ত মুঢ় ম্লান মুখগুলি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আশার আলোতে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে, তখন মনে হয়, বহু বাধা বিঘ্ন, ব্যর্থতা সত্ত্বেও সফল এই প্রচেষ্টা!

বাড়গ্রামে বাণীভবনের শাখা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী লেডি বসু বলেছিলেন—“যে দেশ নারী শক্তিকে দেশজীবনে কার্য্যকরী হ'য়ে উঠতে দেয় না—যে দেশ মেয়েদের শিক্ষাকে অবহেলা করে—সে দেশ কখনও বড় হ'য়ে উঠতে পারে না। নারীশিক্ষাসমিতি দেশের অবজ্ঞাত এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশকে এ বিষয়ে সজাগ করে' তুলতে চান।”

কপোত মিথুন

শ্রীকুম্ভদরঞ্জন মল্লিক

কপোত কপোতী ছুটি.
আনি আঁহা কাঠি মুঠি
রচে তাহাদের নীড়.
পালে শাবকের দল.
সুখে দুখে অবিরল
চঞ্চল অস্থির।
কোথা চলে যায় তারা
চলে সৃষ্টির ধারা
মুগুরিত লীলা ঘর।
কপোত কপোতী রূপে
পুনঃ আসে চুপে চুপে
অনাদি বধুও বর।
সেই আনন্দ ব্যাখ্যা।
সেই প্রেম ব্যাকুলতা
বিলাস লালস সেই।

চলিয়াছে যুগ ধরি
কুলায় শোভন করি
যারা ছিল তারা নেই।
নব নব রূপে নিতি
আসে পুরাতন প্রীতি
তারা অবিনশ্বর,
তারা পার্শ্বতী শিব
রাজে রাজিন্দ্রিব
অর্দ্ধ নারীশ্বর।
হয়তো সকলি মায়া
তবু ও কিসেব ছায়া
উহাতে আসিয়া পুড়ে
ও কণা প্রীতির মাঝে
স্বধা সিন্ধু যে বাজে
কাঁদি যে তাহারি তরে।

পথের ধূলায়

শ্রীপ্রীতিময়ী কর, ভারতী

হয়

উৎকট অস্বস্তিতে সেদিন চিন্ময় সারারাত্রি ভাল করিয়া
ঘুমাইতে পারিল না! অলংকার শেষ কথাগুলি মনে করিয়া
বারবার চমকিয়া উঠিতে লাগিল। আকস্মিক দুঃখের
উত্তেজনা বশেই কি অলংকা এরূপ কথা বলিয়া গেল? কিন্তু
তাহাকে চিন্ময় ছেলোবেলা হইতে দেখিতেছে, উত্তেজনা বশে
কোন কাজ করিতে সে তাহাকে তো দেখে নাই। যে
স্বপ্নে কথা বলিয়াছে সে তাহা তো সাময়িক উত্তেজনা!

অনেকদিন পরে আজ অলংকাকে চিন্ময় ভাল করিয়া
দেখিবার অবকাশ পাইয়াছে। কৈশোরের সীমা সে অতিক্রম
করিয়াছে; কিন্তু তাহার স্নেহময় স্বপ্ন এখনও নিঃশেষ হয়
নাই। যৌবনের লালিত্য নীরব সমারোহে ধীরে ধীরে সারা
দেহে মুগুরিত হইয়া উঠিয়াছে। অলংকার এই স্মৃতি
দেহলতা স্পর্শসম্পন্ন হৃদয় পরিবেশ এই অমার্জিত পল্লীর
সন্নির্গত আবর্জনা পড়িয়া একরূপ নিখল হইয়া বাইবে

ভাবিতে ভাবিতে সে অন্তরে তীব্র বেদনা বোধ করিতে লাগিল।

অধঃপতিত সমাজের কঠোর বাস্তবরূপ তাহার চোখে জীবন্ত হইয়া উঠিল। সহরের সংস্পর্শহীন নিভৃত পল্লীর সামাজিক আকাশ এমন নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন, ইহা ভাবিয়া বার বার সে যেন আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিল।

এ বিবাহ ভাদ্রিতেই হইবে। কিন্তু তারপর ? এ পল্লীর নিকৃষ্ট আবেষ্টনী হইতে অলকা আপনার পথ আপনি করিয়া লইতে পারিবে কি ? অলকার গত দিনের সেই অকুণ্ঠিত করণ আত্ম নিবেদন, সেই ভয়াবহ পরিণতির চিন্তা চিন্ময়ের মনের তন্ত্রে যতই আঘাত করিতে চাহিল ততই সে নিজের দিকের সকল রকম বাধার অর্গল দিয়া আপনার হৃদয় কপাট আঁটিয়া বন্ধ করিতে লাগিল।

কিন্তু তবু তাহার কর্তব্য সে করিবে। অকল্যাণের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিলে কল্যাণ হয়তো আপনিই আসিবে। কালই তো সে কলিকাতা যাইতেছে। বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে একটা সংপাত্রে সন্ধান করিতে এবার সে ভুলিবে না। অলকার জীবনের গতিপথ ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে আপনি হয়তো সে সান্ত্বনা পাইবে।

কিন্তু তবু চিন্ময়ের চিন্তার প্রবাহ থামিল না। অস্থির হইয়া সে উঠিয়া বসিল। অন্ধকারে দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। মনে হইল এখনি ছুটিয়া গিয়া অলকার বাবার দরজায় বা দিয়া ডাকিয়া তোলে, অলকার সম্বন্ধে প্রতিবিধান করিতে বলিয়া আসে।

নীরব নিশীথ রাত্রি। ঘরে ঘরে অর্গল পড়িয়াছে। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। আকাশের সহস্র তারার আলোর ঝিকিমিকি আর অন্ধকার বনের গায়ে গায়ে অজস্র জোনাকীর চিকিমিকি রাত্রির ঘন কালো রঙের সাড়ীখানাকে যেন রূপালী জরির চুমকিতে সাজাইয়াছে। চিন্ময় অপলক নেত্রে খানিক চাহিয়া দেখিল। সকলে ঘুমাইয়াছে, শুধু তাহাওই চোখে কেন ঘুম নাই ? ফিরিয়া আসিয়া আবার সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। মনে হইল বহুদিনের সঞ্চিত বেদনা কি অলকা আজ নিঃশেষে তাহারই মধ্যে নিউঁড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া আছে ?

পরদিন অনেক বেলায় গাত্ৰোত্থান করিয়া চিন্ময় যখন

ঘরের বাহিরে আসিল, তখন স্বর্ণময়ী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। বলিলেন, হ্যাঁয়ে চিহ্ন।
তোমার কিছু অসুখ টমুখ করেছে না কি ?

—কৈ না তো।

—তবে তোমার চোখ মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে যে !

চিন্ময় বলিল,—এমনি। রাত্রে ভাল ঘুমোতে পারিনি মা !

—কেন ? গরমে বুঝি ? কাল রাত্রে যা গুমোট পড়েছিল !

—তাই হবে।

—তা দক্ষিণের জানলাটা ভালো করে খুলে রাখিস নি বুঝি ? তোর তো বাছা কোন দিকেই হুঁস নেই। হরিকে ডাকলিনে কেন ? ব'সে ব'সে একটু হাওয়া করতো।

চিন্ময় কোন জবাব দিল না।

স্বর্ণময়ীর মনে হইল চিন্ময়ের কথার অন্তরালে কি যেন খানিকটা অপ্রকাশিত রহিয়া গেল। কিন্তু তাহার কারণ ধরিতে পারিলেন না।

বেলপুর হইতে মাইল চারেক দূরে সোনাপুর গ্রামে কিছুদিন পূর্বে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। একজন পুলিশ অফিসারের হত্যা প্রচেষ্টা সম্পর্কে দেশে তখন প্রবল চাঞ্চল্য চলিতেছিল। দোষী নির্দোষী নির্কিশেষে ধরপাকড়ের হিড়িক পড়িয়াছিল। সোনাপুরের একটি ছেলে ইহারই মধ্যে ধরা পড়িয়া যায়। একজন ইউরোপীয়ান পুলিশ কর্মচারী সদলবলে তাহার ভিটা বাড়ীতে তদন্ত করিতে গিয়া সারা গ্রামময় অমার্জ্বিক অত্যাচার করিয়া আসে। পুরুষদের মারধর, স্ত্রীলোকদের অপমান, ঘরদ্বার জালাইয়া দেওয়া কোনটাই বাদ পড়ে নাই। কাজেই গ্রামবাসীর ভয়ের অল্পপাতটাও সীমা ছাড়াইয়া যায়। কেহ জব্বলে, কেহ গাছের মাথায়, কেহ জলের মধ্যে আকর্ষ ডুবাঁইয়া পলাইয়া থাকিয়া সে অত্যাচারকে নীরবে নির্কিঞ্চে সমাধা করিতে দিয়াছে। এই গ্রাম একবার দেখিয়া আসার ইচ্ছা ছিল চিন্ময়ের। আজ স্বর্ণময়ীর সঙ্গে কথা হইবার পরেই চিন্ময় ভারাক্রান্ত মন লইয়া গেল সেখানে।

অনেক বেলায় ফিরিয়া আসিয়া চিন্ময় থাইতে বসিল, কিন্তু এটা ওটা সাধাসাধি করিয়াও স্বর্ণময়ী তাহাকে ভাল

করিয়া খাওয়াইতে পারিলেন না। ঘরে বাইরের সমস্ত কিছু যেন তাহার নিকট বিস্মাদ হইয়া গিয়াছে। প্রশ্ন করিয়াও বিশেষ কিছু জবাব পাইলেন না। চিন্ময়ের চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে কি একটা উদ্বেগের ছায়া ও সঙ্কল্পের দীপ্তি। উদ্বিগ্নভাবে বার বার তিনি তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

বিকালে ভাঁড়ার হইতে বড় বড় হাঁড়ী কড়াই গামলা জাগ্ প্রভৃতি দাসী চাকরের সাহায্যে বাহির করা হইতেছিল, অলকাদের বাড়ীতে যাইবে। স্বর্ণময়ী দাঁড়াইয়া দেখাইয়া দিতেছিলেন। চিন্ময় আসিয়া বলিল, “মা, আমি একটু ওবাড়ী যাচ্ছি।”

স্বর্ণময়ী সোৎসাহে উত্তর দিলেন, “যা, যা, বাছা, আমি তো কাল থেকেই বলছি। অলির বিয়ে, একবার না গেলে ভালোই বা দেখাবে কেন?”

চিন্ময় কহিল, “বেড়াতে যাচ্ছি নে মা, আমি একটা বিশেষ দরকারে যাচ্ছি। একটু পরেই তুমি জানতে পারবে।”

গভীর মুখে চিন্ময় চলিয়া গেল। চিন্ময়ের মা তাহার গমন পথের দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

খানিক বাদে রোয়াকের একধারে বসিয়া তুলনী তলার সন্ধ্যাপ্রদীপ সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে স্বর্ণময়ী উৎকর্ষ হইয়া কি যেন গুনিতে লাগিলেন। অলকাদের বাড়ী হইতে কেমন যেন একটা গুণ্ডগোল শোনা যাইতেছে। সারাদিনের জন-মজুরদের কাজকর্মের কোলাহল থামিয়া গিয়া তাহার পরিবর্তে কেমন যেন একটা চেষ্টামেচি ও অলকার বাবার উচ্চ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সেই সঙ্গে……ঐ না চিন্ময়ের গলার আওয়াজ?

স্বর্ণময়ী হাতের সলিতা রাখিয়া উৎস্রীব হইয়া রহিলেন। বাহিরের দিকে কিয়ৎকাল শঙ্কিত দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতে করিতে সহসা বিস্মিত হইয়া গেলেন। জোরে জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে পাড়ার কয়েকটি ছেলে, চিন্ময় ও যতীশ মায়ের সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উত্তেজনা ও বিরক্তিতে তাহাদের মুখ চোখ অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। অপ্রকাশ্য কোন ভাষা চিন্ময়ের ওষ্ঠ

প্রান্তে আসিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া রুদ্ধ হইয়া বাইতে দেখিয়া সহসা যতীশ স্বর্ণময়ীকে কহিল,

—মাসীমা, ওই অলি যদি তোমার ঘরের বোঁ হয়?

স্বর্ণময়ী অসম্ভব রকম চমকিয়া উঠিলেন। চিন্ময়ের দিকে ফিরিয়া ভীতিপূর্ণ চাপাশ্বরে কহিলেন, সে কি কথারে, চিহ্ন? কি করতে তুই ওবাড়ীতে গিয়েছিলি বল তো?

নেহাৎ বালকের মতই চিন্ময় মায়ের পাশে বসিয়া পড়িল,—কহিল, গিয়েছিলাম অলির বিয়ে বন্ধ করতে।

—কেন? ওর বাবা বেচারী কতাদায়ে ভেঙ্গে পড়েছে; তার মেয়ের বিয়ে বন্ধ করা তোর কি দরকার হলো? মার বিশ্বাসের মাত্রা ছাড়াইয়াছে।

চিন্ময় বলিল, দরকার হয়েছে’ বই কি মা!

—কি দরকার শুনি?

—এ বিয়েতে অলি স্ত্রী হবে না। ওকে বলি দেওয়া হবে।

উত্তেজিত হইয়া স্বর্ণময়ী কহিলেন,—তা তুই কি করে জানলি?

গভীর মুখে চিন্ময় কহিল,—আমি জানি।

স্বর্ণময়ী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। গত রাত্রিতে চিন্ময়ের ঘুমাইতে না পারার কারণ তাহার নিকট অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসিল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কহিলেন, “কাল মেয়ের গায়ে হলুদ, অতিথি কুটুম গুরু পুরুত সব এসে গেছে, আজ বিয়ে ভেঙ্গে দিবি? তা এখন ওর কি উপায় করবি কর। তা বলে ওসব যা তা কথা মুখে আনিস কেন? পাগল হলি নাকি?”

স্থির ভাবে চিন্ময় উত্তর দিল, “পাগল হবো কেন মা? একটা ব্যবস্থার কথা বলতেই তো গিয়েছিলাম। এ বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে একটা ভাল পাণ্ডের সন্ধান করা কি যেত না? তা ভাল কথা ওর বাবা কিছুতেই মানলেন না। কেবল চটে গিয়ে জিদ করতে লাগলেন যে ওখানে তিনি বিয়ে দেবেনই। আমি কি করতে পারি তিনি দেখবেন। আমিও জোর করলুম যে কিছুতেই এ বিয়ে হতে দেবনা, তিনি কি করে দেন আমি দেখবো। তখন আমাকে যাচ্ছেতাই গাল দিতে লাগলেন। আমার মতো এম, এ, বি-এ পাশের মুরোদ তিনি নাকি ঢের ঢের দেখেছেন।

মাত পুরুষের জমিদারী ব'সে ব'সে খাই, তাই নাকি আমার অন্ত তেজ।”

চিন্ময়ের কথার মধ্যেই তাহার মা বলিয়া উঠিলেন, “তা এ রাগ তার হ'বারই তো কথা। গায়ে জালা ধরলে লোকের মুখে কুকথা আসে।”

উত্তপ্ত হইয়া চিন্ময় কহিল, “শুধু কি তাই? আমার ও পাত্রটাত্ত দেখা নাকি সব ছিল। তার মেয়েকে নাকি আগে থেকেই ভুলিয়ে...”

ক্রোধে চিন্ময়ের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। একটু ঢোক গিলিয়া আবার কহিল, “মেয়ের বাপ হয়ে গাঁ শুদ্ধ লোক আর তোমার ওই গুরু পুরুতের সামনে আমাকে এমনি কথা বলে অপমান করলে যে বাধ্য হয়ে আমি কথা দিয়েছি যে ওর সমস্ত দায়িত্ব আমিই নেব। জিজ্ঞাসা কর ওই যতীশকে।”

আহতস্বর কণ্ঠে সংবরণ করিতে করিতে স্বর্ণময়ী বলিলেন, “কিন্তু সে যে কতদূর অসম্ভব সে কথা একবার ভেবে দেখলিনে?”

যতীনের মামাবাড়ী এই গ্রামে। সম্পর্কে সে অলকার পিসতুতো ভাই। চিন্ময়ের সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে। কলিকাতায় সে ডাক্তারি পড়ে, ছুটিতে বেড়াইতে আসিলেই হুজনে আলাপ জমিয়া যায়। সবাই জানে সে একটু বেশী সপ্রতিভ ও বেপরোয়া স্বভাবের লোক। অলকার মা তাহাকে খুব স্নেহ করেন। তাহারই সনির্বন্ধ অনুরোধে সে বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অলকার বাড়া আসিয়াছিল। ঘটনার আগা-গোড়াই সে জানে। চিন্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে এখানে আসিয়াছে।

স্বর্ণময়ীর কথা শুনিয়া যতীশ কহিল,—তা যত অসম্ভবই হোক মাসীমা, আমাদের মামাবাবুর সেই ইত্তরামিটা যদি একবার চোখে দেখতেন, তো বুঝতে পারতেন যে, এ ছাড়া চিন্দার আর উপায় ছিল না। আমি তো অবাধ হয়ে গিয়েছি যে বাপ হয়ে কখনও মানুষ এমন হয়? চিন্দা যখন জেদ করলে যে কিছুতেই এ বিয়ে হতে দেবে না তখন তিনি ওদের নামে কুৎসা আরোপ করে যাচ্ছেতাই গাল তো দিলেনই, তারপর কিনা এ কেলেকারীর চেয়ে ও-মেয়ের মরে যাওয়া ভাল এই

বলে ছুটে গেলেন মেয়েটাকে মারতে। ভয়ে ত অলি মুহুঁহা যায় আর কি। চিন্দা রীতিমত বাধা না দিলে একটা কাণ্ড করে বসতে আটিকাতো না। তখন শুধু রাগে গর্জাতে লাগলেন যে তিনি তাঁর মেয়েকে বাইছে তাই করবেন তাতে চিন্দার বাধা দেবার কি অধিকার? তখন না চিন্দা সত্যিকার অধিকারটা জানিয়ে দিলে।

যতীশের সাক্ষ্য ও সমর্থন শুনিয়া স্বর্ণময়ী দীপ্ত হইয়া কহিলেন,—কিন্তু, চিন্ময় কত বড় বংশের ছেলে! আর ওরা আমাদের না স্বঘর না কিছু, বিয়ে হলে যে ওর পূর্ব পুরুষের বংশহানি হবে সে কথা একবার ভাবলে না! ওর বাপই যেন নেই। আর সবাই তো আছে। আমি কি করে পাঁচজনকে মুখ দেখাবো? এ কখনো হয়, না হতে পারে?

শেষ কথাগুলির সঙ্গে স্বর্ণময়ীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। দুর্বল শরীরে তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন।

চিন্ময় মায়ের একটা হাত ধরিয়া বিনীত স্বরে কহিল, আমার সঙ্গে একবার কলকাতায় চলো মা, বাইরেটা একবার দেখে আসবে পৃথিবীটাকে ভেঙে চুরে নতুন করে গড়বার প্লান হচ্ছে, আর তোমরা কিনা যত সব বংশগৌরব নিয়ে হিসেব করছো! মুহূর্ত্ত খামিয়া কহিল,—তা ছাড়া দয়া ক্ষমা বিদ্যা বিনয় এই সব বড় গুণ থেকেই এক সময়ে বংশ গৌরবের সৃষ্টি হয়েছিল, সঙ্গীর্ণতা স্বার্থপরতা থেকে নয়।

কথা শেষ না হইতেই যতীশ বলিয়া উঠিল, অলকার মত একটা মেয়ের জীবনের মর্যাদা রক্ষা করলে বংশ মর্যাদার কখনো হানি হয় না, মেজ মাসীমা। আপনি না অলিকে কত ভালবাসেন? যা হয়েছে বেশ হয়েছে। খুসী হয়ে ওদের আশীর্বাদ করুন। আমি বিয়ের উৎসবটা এ বাড়ীতেও জোর মত লাগিয়ে দি।

স্বর্ণময়ী আর কোন উত্তর না পাইয়া চোখে ঝাঁচল চাপা দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, ছেলে বেলা থেকে তোর অনেক বাড়াবাড়ি সহ্য করেছে, এ আমি কিছুতেই পারবো না। চিন্ময়, তোর মনে এই ছিল? ও মেয়ে অলঙ্কন, রাঙ্গুনী নইলে,.....

বিত্রত কণ্ঠে চিন্ময় কহিল, আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি মা, আমার মনে কিছু ছিল না, কিন্তু...

—তবে তুই ও ইচ্ছে ছেড়ে দে। অলির বিয়ের অন্য ব্যবস্থা করে দে। আমি চৌধুরী পাড়ার ঘোষেদের ঘরে তোঁর কুটি মিলিয়ে রেখেছি। তার পায়ের কাছেও অলি লাগে না।

কথার স্বরে দ্বিগুণ দৃঢ়তা মিশাইয়া চিন্ময় কহিল, এক গাঁ লোকের সামনে যাকে গ্রহণ করবো বলে স্বীকার করেছি তাকে আবার অন্য কারো হাতে তুলে দিতে মা হয়ে তুমি বলতে পারো? একথা কিছুতেই নড়তে পারে না। তার চেয়ে তুমি বলো, আমি কথা দিচ্ছি আমি যেমন আছি চিরকাল তেমনিই থাকবো।

স্বর্ণময়ী এ কথার কোনই জবাব দিলেন না। সহসা স্তব্ধ রহিলেন। চিন্ময় উঠিয়া দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

—কই; বোমা পাজিখানা রাখে। অনেক দেখলুম, তোমার দেব সংক্রান্তির ব্রত নব্বার দিন এবারে পেলুম না। এবার বোশেখের পরেই ছ' মাস অকাল।

শশীনাথ বাড়ুয়ে প্রবীণ লোক। চিন্ময়দের শুভাকাঙ্ক্ষী কুল পুরোহিত। চিন্ময়ের মা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। বর্তমান ঘটনার খানিকটা হয়ত তিনি আগেই শুনিয়া আসিয়াছেন, বাকিটুকু শুনিলেন বাড়ীর ভিতরে আসিয়া। আগাইয়া আসিয়া চিন্ময়ের মাকে সাঙ্গনা দিতে দিতে কহিলেন, শোন মেজো গিন্নী, ওরা আজ কালকার ছেলে মেয়ে, ওদের সঙ্গে কখনো তুমি পারবে? যুগ যে বদলে গ্যাছে। তুল তো গোড়াতেই করেছো মা, ওই ছোট ঘরের মেয়েকে আঁসারা দিয়ে। ছেলের হাতে বংশের হানি হল সে তোমার কপালের দোষ। ও ফাঁপা আগুন চাপতে গেলে আরো সর্বনাশের ভয় থাকে। ভালোয় ভালোয় বিয়ে দিয়ে দেওয়াই এর ওষুধ।

নিরুপায় হইয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে স্বর্ণময়ী কহিলেন, এ স্বৈচ্ছাচারী কাণ্ড যদি আমার চোখের সামনে বসে হবে তো আমি দুচক্ষু যে দিকে যার চলে যাবো। যা করবে আমার সামনে থেকে সরে গিয়ে যেন করে।

বাহিরে যখন এই সব কথা চলিতেছিল, চিন্ময় তখন ঘরের মধ্যে তাহার স্তুটকেশ ওছাইতে ব্যস্ত। যতীশ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই গম্ভীর মুখে কহিল, যা হয় তুমি করো

যতীশ; আমি চল্লম এখনই। ওঁর ভাগো যা থাকে তাই হবে। এসব কখনো আমাকে পোষায়? ছিঃ ছিঃ, কি যাত্রায় এবার বাড়ীতে এসেছিলুম? বিরক্তিতে তাহার ক্রুদ্ধিত হইয়া উঠিল।

চিন্ময়ের কথা শেষ হইতে না হইতে যতীশ জবাব দিল; যা করবার সে আমি নিশ্চয়ই করবো। সে আমি এতক্ষণে ঠিক করেই ফেলেছি। আমিও অলিকে নিয়ে তোমার পিছু পিছু কলকাতায় গিয়ে উঠবো। ওকেও আর এ গাঁয়ে রাখা যায় না।

—কি বলো যতীশ! সে কি করে হয়? বিশ্বয় বিফারিত চোখে চিন্ময় যতীশের দিকে চাহিয়া রহিল। যতীশ কহিল,—কেন হয় না? সেখানে কানপুর থেকে আমার বড়দি এসেছেন। শীগগীরই চলে যাবেন। তাঁর কাছেই নিয়ে যাবো। সেখানেই সব হবে। এঁরা তো আমাকে বিয়ের কাজ করতেই ডেকে এনেছিলেন, আমি তাইই করবো।

চিন্ময়ের কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কাঁধে হাত দিয়া ঝাঁকানি দিয়া আবার যতীশ কহিল, কি ভাবছো চিন্মদা? ভারী শক্ত ব্যাপার? আর একজনকে বাকদান করে ভাগোর ঘাড়ে ফেলে চলে যাওয়াটা খুব সোজা কাজ, না? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

সাত

সেদিন প্রভাতে অলকাদের বাড়ী বাসি ঘরে ঝাঁট পড়িল না। রান্নার হাঁড়ি সময়ে চড়িল না। আজ অলকার গায়ে হলুদের দিন। কিন্তু কাশই যতীশ তাহাকে কলিকাতায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কাহারও কোন আপত্তি সে শোনে নাই। বাধা দিতে কেহ সাহসও করে নাই।

বাজিয়েদল আসিয়া ফিরিয়া গেল। সদর উঠানের অর্ধেকটা ঘাস আর টাছিয়া সাফ করা হইল না। ভিয়েনের গর্ত খুঁড়িতে খুঁড়িতে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। আত্মীয় স্বজনরা এদিকে ওদিকে সরিয়া গিয়া কাণাঘুমা করিতে লাগিলেন।

অলকার মা রান্নাঘরের দাঁওয়ার নতমুখে বসিয়া কি একটা কাজ করিতেছেন, আর তাহার বাবা উঠানের এক প্রান্তে একটি লাউ মাটার নীচে দাঁড়াইয়া অবিরাম তাঁহাকে কটুক্তি করিয়া চলিয়াছেন। অনেকক্ষণ নীররে

সহ করিবার পর অলকার মা জবাব দিলেন, আমার কি দোষটা হল বলে দেখি। আমি কি অলিকে শিখিয়ে দিয়েছি? চিহ্ন তো ভালো কথাই তোমাকে বলতে এসেছিলো, তুমিই তো যাচ্ছে তাই কথা বলে রাগিয়ে দিলে।

ক্রোধে গজিয়া অলকার বাবা বলিলেন, আরে রেখে দাও, রেখে দাও। ছেলে ভোলাতে এসেছো? আগে থেকে ষড়যন্ত্র না থাকলে কখনো এরকম হয়? অলির ইচ্ছে না থাকলে সাধ্য কি চিহ্ন এমন কথা বলে? সাধ্য কি যতীশ ওকে নিয়ে যায়?

একটু ঢোক গিলিয়া ক্রোধভরে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, মেয়েকে যখন নভেল পড়াতে বারণ করতুম, তখন কেন শোনা হতো না? আমি সেই কৈফিয়ৎ চাই।

এ কথায় উত্তরে অলকার মা কি বলিষেন ভাবিয়া পাইলেন না। হুঃখে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। অতি কষ্টে অশ্রু সঞ্চরণ করিতে করিতে তিনি কহিলেন,—“অত বড় মেয়ে আইবুড়ো থাকবে, আর নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখবে না, এ কখনও হয়। কেমন পাঞ্জের হাতে তাকে তুমি দিতে, সে তা সবই বুঝেছিল। তাই সে ইচ্ছে করে যদি করেই থাকে, তাতেই বা কি করা যায়? চিহ্নর মত বর পাওয়া অলির ভাগ্যের কথা।

মুখভঙ্গী সহকারে ব্যঙ্গ করিয়া অলকার বাবা বলিলেন,—তবে খুব ভাল কাজই করেছে তোমার মেয়ে। বলি, এ বুদ্ধি কোথা থেকে পেলো? তুমিও আবার একদিন এমনই করবে না কি? আমাকেও তো তুমি পছন্দ করনা কোন দিন।

লজ্জায় ঘুণায় অলকার মা কাণে হাত দিলেন। কহিলেন, কেন যাচ্ছে তাই বলে নিজের জিবটাকে ময়লা করছ? সত্যিই, সে নিজে কিছু করেনি। যা কয়বার যতীশই ত' করলে।

কোন কথা কানে না তুলিয়া কর্তা তেমনি ভাবেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর ঐ চিহ্ন ব্যাটা, পাজী নচ্ছার, এদিকে বস্তার মত মোটা ধুতি পরা হয়, মাথায় চিক্ননীটি পর্যন্ত পড়ে না, যেন সাধুবাবাজি। আমার মুখের উপর সেবার বস্ত্রে যে নেশা করা ছোট লোকের কাজ। তার ভিতরে ভিতরে কিনা এমনই বদমাইনী! শেষকালে কি না

আমারই মাথার উপর কাঁঠাল ভাঙ্গলে। মেয়ের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় আজ আমার দোনাগুলো শোধ হয়ে যাবে, না আমি আজ গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারব না। এমন পেটেও জন্মেছিলো সে! না হলে, আমার মেয়ে কখনও এমন হয়?

অলাবুকুঞ্জের ছায়ায় দণ্ডায়মান অলকার বাবার এমন সব অসঙ্গত ভাষা ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার অধিক ও হয়, ত কিছু ভাগ্যে জুটিতে পারে এই আশঙ্কায় অলকার মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়া একটা কঙ্গী তুলিয়া লইলেন। তারপর আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে পুকুরের ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন।

অলকার মার আর ঘাটে যাওয়া হইল না। সেখানে তখন পুরা মহিলা মজলিস চলিতেছে। একটি বাতাবিলেবু গাছের তলায় কলসীটি রাখিয়া, দিয়া চুপ করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মাতৃ হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে শুধু অলকার বিয়োগ ব্যথা ও ভবিষ্যতের চিন্তা।

এই সব মজলিসের সভানেত্রীর পদ বেশীর ভাগই গ্রহণ করিতেন গ্রামের বগলা ঠাকুরাণী। তিনি আজন্ম পিত্রালয় বাসিনী বাল-বিধবা। সন্তান সন্ততির মুখ দেখা ভাগ্যে জোটে নাই। তাই বৌবনকালে বাগ্মীতার গুণে মেয়ে মহল ও বয়সের গুণে অনেক পুরুষের চিত্ত জয় করা ছাড়া আর কোন আত্মপ্রসাদ তাঁহার ছিল না। নিরক্ষর্য্য দিন কাটাইবার একমাত্র উপায় ছিল পাড়ার বৌঝিদের দোষ গুণের হিসাব নিকাশ করা। স্নান শেষে পুকুর ঘাটের এক ধারে বসিয়া তিনি আঁজ জলে জলেই পূজা আফিকটা সারিয়া লইতেছিলেন। বিনি ঠাকুরাণী বুক জলে দাঁড়াইয়া স্নান করিতে করিতে বার দুই হরিনাম উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, কেমন কাণ্ডখানা দেখলে দিদি! এ গাঁয়ে এমন ব্যাপার আর কখনো হয়েছে?

পূজা করিতে করিতে বগলা ঠাকুরাণীর একনিষ্ঠ মন উসখুস করিতেছিল, এই প্রসঙ্গ তুলিবার জন্য। তাঁহার মনে একটা আক্রোশ ছিল বরাবর, চিন্ময় নাকি তাঁহাকে ছ চক্ষু দেখিতে পারে না। পথে ঘাটে দেখা হইলে অবজায় মুখ ফিরাইয়া যায়।

সেই চিন্ময়ের আজ এ হেন কীর্তিতে তাঁহার বলিয়ার ইচ্ছা তো শত মুখী হইয়া উঠিবেই।

নাকের উপর দ্রুত অঙ্গুলি চালনা করিয়া প্রাণায়াম ক্রিয়া সম্পাদন করিতে করিতে বগলা ঠাকুরাণী বলিলেন, এই বগলী বামনির কথা এখন বাসি হ'লে কাজে লাগবে। কতদিন না অলির মাকে বলেছি যে মেয়েকে অত লেখা পড়া করতে দিও না। এর ফল ভাল হবে না। তা বলত যে তাতে আর দোষ কি? দোষ হ'ল কি না হ'ল, এখন দেখলি ত, বিনি।

সমর্থনশূন্যক মাথা নাড়িয়া বিনি ঠাকুরাণী বলিলেন, পাঠশালায় পণ্ডিতের কাছে পাশ দিলে। তাতে হলো না, আবার পড়ানো হ'ত চিহ্নর কাছে। তখনই আমি বলেছিলাম যে অলি যদি একটা কেলেকারী না করে বসে ত আমি অমুক বামুনের মেয়েই নই।

সমর্থন পাইয়া বগলা ঠাকুরাণীর উৎসাহ আরও দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। কহিলেন, আমার বাবা লেখা পড়া শেখান নি কি আর অমনি। বলতেন, মেয়ে আমার খারাপ হয়ে যাবে। তাতেই শত্বে বলতে ছাড়ে কি।

বিনি ঠাকুরাণী সাগ্রহে ধোঁগ দিতে দিতে বলিলেন, সে কথা আর কেন তোলো দিদি। শত্বে কি না বলে! এত আর তা নয়। এ যে গাঁ শুক লোকে ছি, ছি, করছে। অলির মাকে বললে বলতো বর জুটেছে না। বর যদি না জুটে ছিল, ঘাটের মড়াও কি জোটে নি? এ কেলেকারির চেয়ে যে সেও ছিল ভালো।

—কি আর বলবো দিদি! অলক্ষণে কালের দোষ।

দ্রুত ফোঁত চাপিতে চাপিতে বগলা ঠাকুরাণী নীরব হইলেন। জবাব দিল নীলিমা। সে ইহাদের নাতনী সম্পর্কীয়া। স্নান করিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া

ইহাদের সব কথা সে অন্তর্দৃষ্টিতে শুনিতেছিল। কথার সুরে ঝাঁঝ মিশাইয়া সে কহিল, ভালই ত হয়েছে, বগলা দিদি। ওদেরও বিয়েটা হ'ল, তোমাদেরও কিছু দিনের মত ধোরাক জুটলো। এই কথা ভাবিয়ে চুরিয়ে অনেক দিন চলবে। এমন বিয়ে যে এত দিন দেখনি, সে তোমাদের ভাগ্যে ছিল না বলে। এ বিয়ে দেখতে হ'লে অনেক জন্ম তপস্যা করা দরকার।

মুখরা মেয়েটার প্রতি সকলের বক্র দৃষ্টি পড়িতে না পড়িতেই আবার সে কহিল, একালেরই যত দোষ না! রোজ রোজ এত যে পুঁথি পুরাণ শোন, কি দেখে? তোমাদের ঐ মুখপোড়া দেবতারাই ত' এসব পথ দেখিয়ে গেছে।

শূণ্য কলসী লইয়া অলকার মা ঘরে ফিরিয়া চলিলেন। বাতাবী ফুলের গন্ধে তখন চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। প্রভাত রৌদ্র চঞ্চল বাতাসে পাতায় পাতায় নাচিয়া ফিরিতেছে। বহুদূর অতীতের এক অস্পষ্ট স্মৃতি তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। রংপুরের একটি শিক্ষিত পরিবার হইতে যে দিন তিনি গ্রামের এই সংসারে আসিয়াছিলেন; সরকারী চাকুরী দেখিয়া তাঁহার পিতা এখানে তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। জামাইয়ের চরিত্র দেখিবার অবকাশ পান নাই; সন্দেহের তাঁহার অন্ত ছিল না। তারপর? তারপর ব্যর্থ জীবনের কত অসংবদ্ধ ঘটনা! ভাবিতে ভাবিতে স্মৃতি বাপসা হইয়া আসে।

অলকার মা অন্তমনা হইয়া এক পা এক পা করিয়া যখন বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন, কর্তার বিকৃত কণ্ঠস্বর তখন থামিয়া গিয়াছে।

পূজার-অর্ঘ্য

ত্রীপিণাকীরজন কর্মকার

(১)

শিশির সিক্ত শেফালি পুষ্পে গাঁথেছি পূজার মালা।

আজি শুভক্ষণে যতনে সাগরে এনেছি বরণ ডালা।

বিজয়মালা দিব গলে তুলে

রেখে তাতে তুমি হৃদয়ের কুলে

চরণের ধূলি শিরে লব তুলে ঘুচে যাবে ষত জ্বালা।

এনো এসো দেবী শরণ আলোকে ধরণী শেফালিমালা।

(২)

প্রভাত কিরণে চকলাকাশ এনেছি চয়ন করে।

তোমার পূজার ভরি ডালি আজ সাজাব গো থরে থরে।

কাশের গুচ্ছ দিব পাদদেশে

প্রীতি ও পুলকে যাব হেসে হেসে

পরানের গীতি গেয়ে অবশেষে আসিব চরণে ফিরে।

তোমার পূজার শেফালি কুহুম এনেছি চয়ন করে।

(৩)

তব পূজা তরে প্রভাত সমীর ফুল বাস ওই বহে।

হয়েছে গো তব পূজার সময় কানে কানে মোরে কহে,

তাই আজি মাগো এসেছি ছুটিয়া

চরণে তোমার পড়িতে লুটিয়া

পদধূলি পূত জল-কণা শুধু যাব আমি শেষে লয়ে।

ফোটে তারা দীপ হর্ষ হ্রাতিতে তোমার মহিমা গেয়ে।

মেয়েদের শিক্ষা

শ্রীশান্তা দেবী

পুরুষ যে সংসারে জন্মগ্রহণ করে সচরাচর সেই সংসারের মাপকাঠি অনুসারে সে খরচপত্র করিবে এবং আচার ব্যবহারেও সেই সংসারের মতই সে চলিবে ইহা লোকে ধরিয়া লয়। কার্যত অবশ্য তা ঠিক হয় না। পিতার সংসারের চেয়ে বেশী উপার্জন যদি পুত্র করে কিম্বা পিতার ব্যবসায়ের চেয়ে বড় দরের বা অন্যজাতের ব্যবসায় যদি পুত্র করে তবে তাহার হাল চাল অন্যরকম হইয়া যায়। অনেক সময় কেবল মাত্র ফ্যাসনেবল বাড়ীতে বিবাহ করার জন্যও পুরুষের চালচলন বদলাইতে দেখা যায়। কিন্তু তবুও মানুষ এগুলিকে গণনার মধ্যে আনে না। মানুষ ভাবে মেয়েদের কথা। তাই অনেক মাতাকেই বলিতে শোনা যায়, “মেয়ে সন্তান! কি জানি কেমন ঘরে পড়বে? ছেলে বেলা থেকে হাল চাল বাড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়।” আবার কোন কোন মা উল্টাও বলেন, “আহা মেয়ে সন্তান! কি জানি কার বাড়ী যাবে? সেখানে যা জুটবে তাই দিয়ে চালাতে হবে। যে ক’দিন আমার কাছে আছে খেয়ে পরে আনন্দ করে নিক। আমি কোনো কিছুর দুঃখ মনে রাখতে দেব না।”

ছুই ধরণের কথাই সত্য আছে। কিন্তু মেয়ে ভবিষ্যতে দুঃখ পাইবে কিনা ইহাই তাহার সম্বন্ধে একমাত্র ভবিষ্যার বিষয় নয়। মেয়ে ভবিষ্যতে যে সংসারে যাইবে যে সংসার রচনা করিবে তাহাতে অপরকে সুখ ও আনন্দ দিতে পারিবে কিনা ইহাও মনে রাখিয়া কন্যাকে মানুষ করা দরকার।

আজকাল শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের মানুষ এটুকু বুঝিয়াছে যে বিবাহের পূর্বে মেয়েকেও লেখা পড়া শেখানো দরকার। অনেকে বুঝিয়া এবং অনেকে নিরুপায় হইয়া তাই মেয়েদের লেখাপড়া শেখায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে লেখাপড়া শেখানোর মধ্যে কোনো পূর্বকল্পিত প্লান নাই। হাতের কাছে যে সস্তা স্কুল পাওয়া যায় তাহাতেই অনেক পিতা মাতা মেয়েদের ভর্তি করিয়া দেন। তাঁহাদের অর্থে ও সামর্থ্যে ইহার চেয়ে ভাল স্কুল জোটানো

যায় কিনা ভাবেন না, অথবা তাঁহাদের আদর্শ মত শিক্ষা এই স্কুলে দেওয়া হয় কিনা তাহাও ভাবেন না। একথা অবশ্য ঠিক যে মা বাবা শিক্ষিত ও অবসরযুক্ত মানুষ হইলে স্কুলের চেয়ে তাঁহারা ই গোড়াপত্তনে ভাল শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু মোটামুটি শিক্ষা যদি বা অনেক বাবা মারই থাকে, বড় বয়স পর্যন্ত সন্তানদের সর্ব বিষয়ে শিক্ষা দিবার মত বিদ্যা বা অবসর মা কিম্বা বাবা কাহারোই বেশী থাকে না। তাই পুত্রদের শিক্ষা অর্থাৎ উপার্জনী শিক্ষা ত প্রায় সম্পূর্ণই শিক্ষায়তনের হাতে দিতে হয়। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা বিদ্যালয়ের সঙ্গে বাড়ীতেও অনেক বিষয়েই চালানো বিশেষ দরকার। চব্বি গঠনের শিক্ষার কথা আজ বলিতেছি না; তাহা পুত্র কন্যা উভয়েরই গৃহে সর্বত্রই পাওয়া দরকার। আমি বলিতেছি ব্যবহারিক জগতের শিক্ষার কথা।

ব্যবহারিক জগতের শিক্ষা বলিতেই অনেকের মনে মেয়েদের বেলায় শুধু রন্ধনের কথা ওঠে। কিন্তু শুধু ভাল রাখিতে জানিলেই যদি সংসারে সুখ ও আনন্দ আনা যাইত তবে ভাল ভাল রাধুনী মহিলাদের স্বামী পুত্র কন্যারা সুখ ও আনন্দের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটাছুটি করিত না। মানুষের রসনাকে তৃপ্তি দিলে মানুষ, বিশেষত পুরুষ মানুষ, খুসী হয় বটে, কিন্তু সেই আনন্দের একটা রেশ জীবনকে এমন মধুময় করিয়া রাখে না যে অবচেতন মনটা সারাক্ষণ তাহারই মিষ্টে ভরপুর হইয়া থাকিবে।

ইহাও ঠিক যে আর যে সব জিনিষের পিছনে আনন্দের সন্ধানে মানুষ ঘোরে তাহার সব গুলির একত্রে ফল দেওয়া সম্ভব নয়; প্রথমত সব মানুষের রুচি এক রকম নয় বলিয়া সাধারণ একটা তালিকা করাই শক্ত; দ্বিতীয়ত গৃহের সীমার মধ্যে সব সুখই পাওয়া সম্ভব নয়। তৃতীয়ত গৃহের পক্ষে যতখানি আনন্দ ও সুখ দেওয়া সম্ভব সবও যদি কোনো গৃহিণী দিতে পারেন তবু গৃহের অভিজানা আবহাওয়াতে একদল নতনত-প্রিয় মানুষের খুব শীঘ্রই অকচিৎ ধরিয়া যায়। এই রকম আরও অনেক কারণ দেখাইবার আছে। তবু চিকিৎসক যেমন নিজের

অভিজ্ঞতার সাহায্যে চুরারোগ্য রোগেরও চিকিৎসার চেষ্টা করেন, ভেমনি বয়স্কা ও চিন্তাশীল গৃহিণীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে সংসারের অতৃপ্ত সুখাশ্রয়ী মানুষের মনে সুখ ও আনন্দ আনিবার চেষ্টা করিতে পারেন—নূতন যুগের মেয়েদের আনন্দদায়িনী করিয়া গড়িয়া তুলিয়া।

মনে করুন কন্যার পিতার গৃহে খুব সৌখীন আত্মীয় বন্ধুর আনাগোনা, কিন্তু যে গৃহে তাহাকে সংসার পাতিতে হইল সেখানে অন্ত ক্যাসানের চলন নাই। মেয়েকে যদি ছেলে বেলা হইতে শুধু ইঙ্গ বঙ্গ সঙ্গীদের সঙ্গে লোরেটো কনভেন্টে পড়াইয়া মানুষ করা যায় এবং সাধারণ বাদ্বালী গৃহস্থ সংসারের সহিত কোন যোগ রাখানো না হয়, তাহা হইলে একটা প্রাচীন একারবর্তী পরিবারে গিয়া বিধবা ননদের শুচিবায়ুর প্রাচুর্য্য কি গ্রাম হইতে আগত দেবর ভাস্করের সিভিলিটির অভাব দেখিয়া সে ত মুচ্ছাই যাইবে। দেশে একই ভদ্র সমাজের মধ্যে শিক্ষা রুচি ও অর্থভেদে নানা রকম চাল চলন আছে। যাহার স্বাভাবিক মার্জিত মন, সে সব রকম চালচলনের মধ্যেই একটা নিজস্ব শ্রী আনিতে পারে। কিন্তু সব মানুষ সহজাত উন্নত বা মার্জিত রুচি লইয়া জন্মায় না। কাজেই সাধারণ ঘরে এক পরিবারের শিক্ষা বা চালচলন আর এক পরিবারের নবাগত বা নবাগতাকে পীড়া দিতে পারে। সে পীড়া অনেক সময় চিরস্থায়ী হয় এবং তাহার ফলে সংসারে অশান্তিও বাসা বাধিয়া বসে। এই কারণে ছেলে মেয়েদের এবং প্রধানত মেয়েদের ভদ্রসমাজের সকল রকম চাল চলনের সম্পর্শে শৈশব হইতেই আনা উচিত। অবশ্য যাহা সত্যই অভদ্র বা অসভ্য রীতি তাহার সম্পর্শে আনিতে বলিতেছি না। কিন্তু যে মানুষ এক কাপড়ে গঙ্গায় স্নান দেখিয়া শিহরিয়া উঠে না তাহার সমুদ্রে সুইমিং কণ্ডিউম পরিয়া স্নান দেখিলেও যে মুচ্ছা যাওয়া উচিত নয়, যে তরুণী রমণীর ইভনিংড্রেসের মধ্যে শালীনতার অভাব বুঝিতে পারে না তাহার যে গ্রাম্য মাসিমা পিসিমার একখানা মাত্র শাড়ীর দোষ ধরা চলে না, এগুলি ছেলেবেলা হইতে সব রকমের মানুষের সঙ্গে মিশিলেই বোঝা যায়। পোষাক আসাকে গ্রাম্য এবং ক্যাসানেবল দুই রকমেরই ভিতর, অনেক বড় বড় ক্রটি আছে, কাগজে লিখিয়া বোঝানো

রুচিসঙ্গত নয়; আশল জিনিষ হইতেছে জানিয়া বুঝিয়া করা ক্রটিকে নিন্দা করা এবং না জানিয়া করা ক্রটিকে ক্ষমা করা। তবে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য দুই রকম ক্রটি সম্বন্ধেই মানুষের মনকে সজাগ করিয়া দেওয়া এবং পোষাক আসাকে দুই রকম ক্রটিই দূর করার চেষ্টা করা।

ইহার জন্ত গ্রামের স্কুলের মেয়েদের সহরে বেড়াইতে আনা এবং সহরের স্কুলের মেয়েদের (বিশেষত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন স্কুলের) গ্রামে বোড়াইতে লইয়া যাওয়া দরকার। অনেক জিনিষ তাহাদের মন ও রুচিকে আঘাত করিবে বটে, কিন্তু তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া দরকার কোনটা সত্যই মানুষের রুচির দোষ আর কোনটা শিক্ষা বা অর্থের অভাবে ঘটে; কোনটা উপেক্ষার অযোগ্য আর কোনটা অযোগ্য।

ভারতবর্ষ নানাভাষী লোকের দেশ; এখানে সমগ্র দেশের একতা রক্ষা করিতে হইলে এক প্রদেশের ভাষা আর এক প্রদেশের বোঝা দরকার। ইহা শুধু বাহিরে ব্যবসায় বা আপিসের ক্ষেত্রে নয়, গৃহে সামাজিকতার ক্ষেত্রেও বটে। স্বামী পুত্র যাহাদের সঙ্গলাভে আনন্দ পান এমন বিদেশী বন্ধুদের পরিবারের বন্ধু করিয়া তুলিবার ক্ষমতা মেয়েদের থাকা উচিত। কিন্তু মানুষ ত ভারতবর্ষের সব ভাষা শিখিয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং তাহাকে ইংরাজী বা হিন্দী অথবা সম্ভব হইলে এই দুইটি ভাষাই শিখিয়া রাখিতে হইবে। ইহার সাহায্যে ভারতের প্রায় সব প্রদেশবাসীর সঙ্গে মিশা যায়। কিন্তু আমরা কলিকাতা সহরের উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েদেরও অনেককে দেখি ইংরাজী বা হিন্দীতে কথোপকথনের তাঁরা কোনোই অভ্যাস করেন না। একদল মানুষ ইংরাজী কথাবার্তায় খুব অভ্যস্ত, কিন্তু তাহাদের একটা মস্ত দুর্বলতা আছে যে, তাহারা মনে করেন ইংরাজী বাক্যালাপে যে ঠিক তাহাদের মাপ-মত অতিপটু নয়, সে তাহাদের দলে অপাংক্তেয়। অথচ হয়ত সে তাহার মনের সমস্ত ভাবই ইংরেজীতে প্রকাশ করিতে মোটের উপর সক্ষম। তাহার ক্রটিগুলি নগণ্য।

যে সত্য-ইংরেজ সে কখনও ভাবেনা যে একজন জার্মান-ভাষাভিজ্ঞ ইংরেজের জার্মান না-জানা ইংরেজের কাছে এই কারণে সামাজিক সিঁড়িতে উচ্চে উঠিবার

কোন কারণ আছে। কিন্তু বাঙালীরা অল্প বাঙালীর ইংরেজীতে একটু খুঁৎ ধরিতে পারিলে নিজেকে তাহার চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর জীব ভাবে এবং ভুলিয়া যায় যে উচ্চ শ্রেণীর জীবটি স্বয়ং হয়ত বাংলা বা হিন্দীতে ঐ অবজ্ঞাত বাঙালীর চেয়ে অনেক বেশী ভুল করে। পরাধীনতার যুগে ভুল বাংলা বলাই একটা আভিজাত্যের লক্ষণ অনেকে মনে করিত; আশাকরি ক্রমে মানুষের সে ভ্রম কাটিয়া যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া বাংলা ছাড়া অল্প কোন ভাষা না বলিতে পারা আভিজাত্যের লক্ষণ এ ধারণা যেন বাঙালীর না হয়। নিজের ভাষা নিখুঁৎ বলার উপর যে যত বেশী ভাষা জানে, বাস্তবিক তার মর্যাদা তত বেশী হওয়া উচিত, অবশ্য কেবল ভাষাবিদ হিসাবে। আজকাল অল্পসঙ্কট, বহুসঙ্কট, বাসস্থান সঙ্কটের দিন। এমন দিনে কাহার বাড়ীতে বৈঠকখানা বা ড্রয়িংরুম আছে, কিনা, কাহার গাড়ী বা টেলিফোন আছে, কিনা, এগুলি মানুষের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া কল্পনা যেন শিক্ষা না পায়। বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র ও সাধুতা যাহার আছে তাহার শ্রেষ্ঠতাই প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা, বাহিরের গাড়ী বাড়ী নয়, এটা বিশেষ করিয়া এই চোরাবাজারী-অভিজাতদের যুগে মেয়েদের জানা দরকার। তাহারা যেন “ক্ষুদ কুঁড়াকেও সোনা-হেন মুখ করিয়া” গ্রহণ করিতে পারে, যদি বিদ্যা বুদ্ধি ও সততার দ্বারা সেটুকু অর্জিত হয়, ইহাই প্রকৃত শিক্ষা। এই অল্প ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর মেয়েদের বাল্যে ও ছাত্রাবস্থায় সাদাসিধা জীবনে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। কারণ বেশী টাকা খরচ করার অভ্যাস ছাড়া যত শক্ত, অল্প টাকা খরচ করার অভ্যাস ছাড়া তত শক্ত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া ধনীর বাড়ী বা রাজারাজড়ার সভায় সাদাসিধা চলনে অভ্যস্ত মেয়েরা যেন মাথা হেঁট করিয়া না ঢোকে। সেখানেও তাহাদের এমন উন্নত মস্তকে যাইতে হইবে যেন মানুষ বোঝে যে কয়েক টুকরা হীর বা সোনা সঙ্গে আছে বলিয়া একটা মানুষ আর একটা মানুষের চেয়ে বড় নয়। কোনো শিক্ষিত স্বল্পবিত্ত মেয়ের ধনীর বাড়ী নিজেকে ছোট মনে করিয়া ঢোকা আত্মার অসম্মান, কোনো অর্থবতীর গৃহস্থ বাড়ীতে নিজেকে বড় মনে করিয়া ঢোকা বর্বরতা।

নৈতিক দিকেও কতকগুলি শিক্ষা এখনও আমাদের দেশে মানুষের অন্তরে ভাল করিয়া ঢোকে নাই। একথা সত্য যে নারী দুর্নীতিপরায়াণ হইলে সমাজ ব্যবস্থায় যতখানি বিশৃঙ্খলা আসে, পুরুষ দুর্নীতিপরায়াণ হইলে ততখানি হয় না, কারণ সমাজ পিতৃতন্ত্রের (Patriarchy) উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া পুরুষের দুর্নীতি নয় স্ত্রীলোকের দুর্নীতিই দুর্নীতি এই ধারণা মানুষের অবচেতন মনেও থাকা উচিত নয়। দুর্নীতির কথা ছাড়িয়া দিয়া সমাজের আইনসম্মত বিবাহের বেলায়ও দেখা যায়—প্রথমা স্ত্রী মৃত বা দুর্নীতিপরায়াণ হইলে পুরুষ যদি আর একবার বিবাহ করে, লোকে তাহা খুব স্বাভাবিক বলিয়াই ধরে, বিশেষতঃ হুচরিত্রা স্ত্রীলোকের স্বামীর পুনরার বিবাহ একটা অবশ্য কর্তব্য বলিয়াও স্বীকৃত হয়। কিন্তু বিধবা কল্পার বিবাহে এখনও সমাজ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে; হুচরিত্র বা অত্যাচারী স্বামী বর্তমানে যদি কোন কল্পার আবার বিবাহ দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক শিক্ষিতা মহিলাও আকাশ হইতে পড়েন :—“একটা স্ত্রীলোকের করিয়া আবার কয়টা বিবাহ হইবে?” আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে তাহার ইহজন্মের একটা জীবনকেই পায় ও জানে। সে জীবনটা অপরের দোষে কোনো দিক্ দিয়াই ব্যর্থ করিয়া দিবার অধিকার কোনো মানুষের বা সমাজের থাকা উচিত নয়। আইনত যাহা চলে, এমন অনেক জিনিষ জন-মতের ভায়ে চলে না। সেই জনমতের সংস্কার দরকার এবং বিশেষ মানুষ নারী সমাজের মধ্যেই সংস্কারের প্রয়োজন। তাহারাই সমাজের ক্রটিতে হুঁথ ভোগ করে, কিন্তু আবার নির্দোষীর বিচারের বেলা তাহারাই কঠোরহস্ত।

আমাদের বাঙালীর সমাজে মেয়েমহলের আর একটা অভ্যাস বড় শ্রুতিকটু; ইহাও বর্বরতারই একটা লক্ষণ। পাঁচজন মেয়ে যদি এক জায়গায় জড় হয় তাহা হইলেই গুনিবেন আলোচনা হইতেছে, কোন মেয়ে কালো আর কোন মেয়ে কস্মী। ঘরে যাহাকে বউ করিয়া আনা হইয়াছে তাহার সম্মুখেই বাড়ী গুলু সকলে বলিতেছে, “বউ কালো হ'ল।” যাহারা বলিতেছে তাহারা নিজেরা যে ‘দুখে আলতা গোলা রং’ তাহা নয়, তবু এই অভ্যাস

মন্তব্যগুলো না করিয়া বাঙালীরা পারে না। অবশ্য নিজের রং দুধে আলতা-গোলা হইলেই যে তাহার অভদ্রতা করিবার অধিকার জন্মে তা আমি বলিতেছি না। সেটাও সমানই বর্ধরতা।

তাছাড়া মানুষ রূপ ভাল বাসিলেও জীবন-নংগ্রামে টিকিয়া থাকতে হইলে এবং আপনাকে ও পরকে আনন্দ দিতে হইলে গুণ স্বাস্থ্য ও শক্তিই আগে প্রয়োজন, রূপ নয়। স্বতরাং রূপের আগে স্বাস্থ্য গুণ ও শক্তিকে প্রশংসা করা দরকার; বিশেষত যখন জানি যে সেগুলি অর্জন করায় মানুষের কৃতিত্ব তবু কিছু থাকে, রূপ মানুষের স্বোপার্জিত নয়।

রূপ কহাকে বলে সেটাও আমাদের দেশের মানুষ জানে না। বাঙালীরা কটা রংকে সৌন্দর্য বলে, মানুষের

মুখশ্রী, সুগঠিত দেহ, বুদ্ধির দীপ্তি-অন্তরের সত্যতার আলো এইগুলিই যে প্রকৃত সৌন্দর্য ইহা বাঙালী মেয়েরা আজও বুঝিতে শিখে নাই।

স্ত্রীলোকের আর একটা বড় গুণ শৈশব হইতে অর্জন করিতে শেখা চাই, তাহা সব শ্রেণীর মানুষের সহিত একান্ত হইতে পারার ক্ষমতা। বি হোক, মেছুনী হোক, কি রাণী কিম্বা লাটপত্নী হোন সব স্ত্রীলোকই স্ত্রীলোক। সকলের সেই নারী-হৃদয়টিকে স্পর্শ করিতে পারা প্রকৃত নারীত্বের একটি লক্ষণ। সেইখানে সকলের সহিত মিলিত হইতে অনায়াসে যে নারী পারে সে সংসারে সকলকে সুখ দিতে পারে। ইহা যে পারে সে সংসারে ক্ষণে ক্ষণে নূতনত্বের আলো আনিয়া সংসারকে উজ্জ্বল করিতে পারে। সে শুধু নারীকে নয় মানুষ মাত্রকেই তাহার অন্তরের আন্তরিকতার গুণে আনন্দ দিতে পারে।

তুমি নারী মহীয়সী

শ্রীমল্লিকা ঘোষ

আনন্দবাই যোশী—

যে কয়জন মহীয়সী ভারতললনা নানারকম বাধাবিষের মুখেও কেবলমাত্র আত্মনির্ভরশীলতা, অদ্ভুত কর্মশক্তি এবং মানসিক বলের জোরে ভারতবর্ষে নারীপ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, নারীজাগরণের সেই অগ্রদূতদের মধ্যে আনন্দবাই নিঃসন্দেহে একজন।

আনন্দবাইয়ের পিতা গণপৎরাও যোশী মহারাষ্ট্রের একজন ধনী জমিদার ছিলেন। তাঁর স্ত্রী গঙ্গাবাইয়ের গর্ভে ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে পুনা সহরে পৈত্রিক বাসভবনে যমুনা অথবা আনন্দবাইয়ের জন্ম হয়। মহারাষ্ট্রজাতির চরিত্রের বিশেষত্বগুলি আনন্দবাই যোশী উত্তরাধিকারস্বত্রে লাভ করে এসেছিলেন। অতি শৈশবেই তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মনের দৃঢ়তা এবং সাহস আনন্দবাইয়ের পিতামাতা এবং পরিচিত সকলকে বিস্মিত করেছিল। সে যুগে নারীশিক্ষা এদেশে প্রসার লাভ করে নাই, কিন্তু তবুও যমুনার বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করে

তাঁর পিতা তাঁকে সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহিত করেন। যমুনার পাঁচ বছর বয়সে গোপাল বিনায়ক যোশী নামে স্বজাতীয় একটা যুবক তাঁদের পৈত্রিক গৃহে আশ্রয় নিলেন। ধনী জমিদারের গৃহে এই ধরণের আগন্তকের অভাব ছিল না। গোপাল বিনায়ক ডাকবিভাগে কেরানীর কাজ করতেন, কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষায় যমুনার এত উৎসাহ লক্ষ্য করে তিনি তাঁর অবসর সময়ে যমুনাকে বিদ্যাশিক্ষায় সাহায্য করতেন। কারণ সংস্কৃত ভাষায় গোপাল বিনায়ক নিজেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বছর চারেক পরে মাত্র নয় বছর বয়সে এই গোপাল বিনায়ক যোশীর সঙ্গে সাধারণ আরও পাঁচজন ভারতীয় মেয়ের মতই যমুনার পিতামাতা তাঁকে বিবাহ দেন। বিবাহের পরে মারাঠাধর্মী জমিদারী যমুনা কুমারী নাম পরিবর্তন করে আনন্দবাই নাম গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে, ১৩ বছর বয়সে আনন্দবাইয়ের একমাত্র সন্তানের জন্ম হয়; কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আনন্দবাই

শিশুটিকে হারান। এই ঘটনা আনন্দবাইয়ের হৃদয়ে এত গভীর ভাবে বেজেছিল যে এই ঘটনার পর থেকেই তিনি তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তন করতে দৃঢ় সংকল্প হ'লেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মালো যে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তাঁকে সান্ত্বনাদ্বারা হ'তে হ'লো এবং সেই দিন থেকে তিনি দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতি এবং বিশেষ করে মহিলা চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা একান্ত ভাবে উপলব্ধি করলেন। এবং এই সমস্তা সমাধানের প্রথম উপায় স্বরূপ তিনি নিজের আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষিত হতে কৃতসংকল্প হলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাশ্চাত্যের তথাকথিত প্রগতিশীল দেশগুলিতেও মহিলা চিকিৎসকের সংখ্যা বিরল ছিল, সেই সময়ে একটা ভারতীয় অপরিণতবয়স্কা হিন্দু মেয়ের পক্ষে এই সংকল্প যে কতবড় সাহসের পরিচায়ক সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। আর শুধু সংকল্প করেই আনন্দবাই ক্ষান্ত রইলেন না—প্রথমেই স্বামীকে তাঁর এই পরিকল্পনাতে রাজী করালেন। স্বামী সানন্দে সম্মতি দিলেন এবং তাঁর অনুরোধে আনন্দবাইকে এই উদ্দেশ্যে আমেরিকা নিয়ে যেতেও রাজী হ'লেন। আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্বর প্রবেশ লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করে গোপাল বিনায়ক একটা আমেরিকান পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্র লিখেছিলেন, কিন্তু তাতে শুধু ফল বিশেষ হয় নাই। কিন্তু কিছুকাল পরে এই পত্রালাপের একটা কপি ভারতহিতৈষী Mrs Carpenterয়ের হাতে পড়ে। Mrs. Carpenter তৎক্ষণাৎ আনন্দবাইয়ের কাছে পত্র লেখেন এবং তাঁর জ্ঞাত Philadelphia বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা করেন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে আনন্দবাই আমেরিকা অভিমুখে রওনা হন এবং সেখানে Mrs. Carpenterয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। গোপাল বিনায়ক বিশেষ কার্যবশতঃ জ্বর সঙ্গে যেতে সক্ষম হননি, কিন্তু আনন্দবাইয়ের দৃঢ় সংকল্প তাতে কিছুমাত্র টলে নাই। আমেরিকা যাত্রার পূর্বে মাত্র কয়েক মাস বোম্বাইয়ে ক্রীশ্চান মিশনারীদের তত্ত্বাবধানে ইংরিজি শিক্ষা করে আনন্দবাই একাই সেই অজানা দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। ষাঁদের সেই সময়কার ভারতের অবস্থার সম্বন্ধে সাগাথ জ্ঞান আছে, তাঁরাই এই

প্রচেষ্টার অসমসাহসিকতা উপলব্ধি করতে পারবেন। যে সময়ে সমাজের অত্যাচারের আশঙ্কায় এমন কি পুরুষরা পর্যন্ত কালাপানি পার হ'তে ভীত হয়ে পড়তো, সেই সময়ে সমাজের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে একজন হিন্দু কুলবধুর পক্ষে তাঁর আদর্শ উপলব্ধির উদ্দেশ্যে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সম্পূর্ণ একা যাত্রা করার কল্পনা যে কতখানি চরিত্রবলের পরিচয় দেয় তা ব্যাখ্যার অবসর রাখেনা। আমেরিকায় পৌঁছিয়ে আনন্দবাই Philadelphia বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করেন এবং কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে শিক্ষা আরম্ভ করেন।

কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম ও শীতে তাঁর স্বাস্থ্যও ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে লাগল। আমেরিকায় পৌঁছানর ১ বছর পরে আনন্দবাই সাংঘাতিক ডিপথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। এবং তার পর থেকে সর্দি কাশিতে তিনি প্রায়ই ভুগতে লাগলেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আনন্দবাই তাঁর আদর্শচ্যুত হলেন না এবং ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে Philadelphia বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি ডিগ্রী লাভ করলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম ভারতীয় হিন্দু নারী বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী ডিগ্রী লাভ করে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন। কিন্তু যে আদর্শ চরিতার্থ করার আশায় গণস্বাস্থ্যের উন্নতি করার আকাঙ্ক্ষায় দেশের আনন্দবাই তাঁর সারাজীবন ধরে কষ্ট সাধন করলেন বিধির বিধানে তাঁর নিজের জীবন দিয়ে শেষ পর্যন্ত সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করা আনন্দ বাইয়ের অদৃষ্টে ছিল না। ডিগ্রী লাভ করার পরেও তাঁর আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতালে হাতে কলমে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্যের জ্ঞাত এবং পারিবারিক কারণে অর্থ উপার্জনের তাগিদে আনন্দবাইকে অগত্যা দেশে ফিরে আসার সংকল্প করতে হলো। এই সময়ে কোলাপুরে New Albert Hospital এর মহিলা বিভাগের ভার গ্রহণ করার জন্য আনন্দবাইকে অনুরোধ করা হয়। দেশের মেয়েদের সাহায্য করতে পারার সুযোগের আগ্রহে এবং স্বদেশের উচ্চ আবহাওয়ায় নষ্ট স্বাস্থ্যও ফিরে পাওয়ার আশায় আনন্দবাই ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। আমেরিকা ত্যাগের পূর্বেই আনন্দবাই আবার সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিনি দাক্ষিণ

বক্ষারোগে আক্রান্ত বলে ডাক্তারেরা সন্দেহ করেন। অবশেষে ভারতবর্ষে পৌছাবার অল্প কয়েক মাসের মধ্যে পুণায় গৃহে তাঁর জন্ম হয় সেই একই গৃহে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে মাত্র ২২ বছর বয়সে কঠিন রোগ ভোগের পরে আনন্দবাই তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

যদিও আমেরিকান মিশনারীদের সাহায্য ছাড়া আনন্দবাইয়ের পক্ষে বিদেশে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভ করা সম্ভব হ'তো না, তবুও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অন্তরে বাহিরে ছিলেন খাঁটি হিন্দু রমণী। ক্রীশ্চান ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর ঈর্ষা ছিল, কিন্তু নিজের জাতীয় ধর্ম ও সংস্কার আচার ব্যবহার থেকে তিনি দেশে বা বিদেশে কখনো বিচ্যুত হন নাই। আমেরিকায় অবস্থান কালেও তিনি নিরাশ্রয় ছিলেন। আমেরিকায় যাত্রার পূর্বে তাঁর উক্তি, “আমি হিন্দুর মণীষ্মে আমেরিকায় যাচ্ছি, আমার হিন্দুনারীকেই ফিরে এসে আমার দেশবাসী ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাস করবো।”—আনন্দবাই অক্ষরে অক্ষরে নিজের ক্ষুদ্র জীবনে পালন করেছিলেন, এমন কি অবতড় উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তার হ'য়েও তিনি ভারতীয় বাণ্যবিবাহ প্রথা সমর্থন করে আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে সকলকে আশ্চর্য্য করে দিয়েছিলেন।

দেশে বিদেশে ষাঁরাই আনন্দবাইয়ের সংস্পর্শে আসা সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁর স্বভাবগুণে বিশেষ মুগ্ধ না হ'য়ে পারতেন না। Mrs. Chapmar তাঁর “Some Distinguished Indian Women” নামক গ্রন্থে আনন্দবাইয়ের সম্বন্ধে ব'লেছেন “২২ বছর পুরে না হ'তেই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হ'লো। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই কী বিরাট সাধনা তিনি জীবনে ক'রে গিয়েছেন। নিজের দেশের হতভাগ্য নারীদের হুৎ লাঘবের কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ ক'রে গেলেন এবং তাঁর ত্যাগ যে বৃথা হ'য়েছে যে সন্দেহ আজ কে করবে? আনন্দবাইয়ের অকালমৃত্যু যে বরঞ্চ ভাবীকালের মেয়েদের তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন বা ভবিষ্যতেও ক'রবে না এ কথাই বা কে অস্বীকার করবে? আনন্দবাই যে বীজ বপন ক'রে গেছেন তা থেকে যে প্রচুর ফল ফ'লবে না তাই বা কে জানে?”

আজ ভারতের নারী আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি এ আশা ভ্রাশা নয়—আনন্দবাইয়ের ক্ষুদ্র অথচ পরিপূর্ণ জীবন বৃথাই উৎসর্গীকৃত হয় নাই—তাঁর মহান আদর্শ যুগ যুগ ধ'রে ভারতের নারীজাতিতে আত্মবিশ্বাস, সাহস ও ত্যাগের পথে চালিত করতে সাহায্য ক'রবে।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীবেলা দে

ঘরের কথা

শকুন্তলা

১। শিশুর যখন এক বছর বয়স পূর্ণ হয়ে যায় তখন তাকে দুধ ছাড়া অল্প ভাল ভাল নানারকম খাবার দেওয়া উচিত। সেই সময়ে তার জন্তে আর খাবার জল গরম করে খাওয়াবার দরকার হবে না যদি তা বিশুদ্ধ জল হয়। কারণ

জলের যে একটা স্বাভাবিক স্বাদ থাকে গরম করলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়, যেতে ভাল লাগে না। অবশ্য কলকাতার জলের জলে নানারকম রোগ বীজাণু থাকে বলে একবার ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে নেওয়া দরকার হয়।

২। ছোট ছেলের যখন এক বছর বয়স হবে তখন একটা ডিম ও অল্প হালুকা চা খুব বেশী দুধ মিশিয়ে খাধ পেয়ানো

দিতে পারেন। বেশী চা খেলে ছোটদের ঘুম কম হয়।
অল্প শারীরিক ক্ষতিও হতে পারে।

৩। চৌটি বাঁদের কেবলি শুথিয়ে যায় তাঁরা রাজে
কপূরের সঙ্গে জল অথবা বরফ ব্যবহার করতে পারেন।

৪। অনেকের চোখ দেখলে মনে হয় যেন খুব দুর্বল।
রাজে বেশ করে চোখ ধুলে ভাল হয়। তা ছাড়া যদি
৩৪ মিনিট চোখের exercise করা যায় যেমন :—হাতের
চেটো দিয়ে চোখ ঢাকা, আবার আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে
দেখা, ভাঁবার তিনবার চোখের পাতা এদিক ওদিক করা,
তাহলে চোখের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়।

৫। নথকুনি হলে পানেশবার চূণ ও সামান্য একটু
লুন বেশ করে ফেটিয়ে নথকুনির উপর লাগিয়ে দিলে ব্যথা
ভাল হয়ে যাবে।

শিল্পকলা

শিশুদের কোর্ট সোয়েটার (ছ'বছরের শিশুর)

প্রয়োজনীয় জিনিষ :—১০ নম্বরের কাঁটা ২টি, ফিকে
গোলাপী রংয়ের উল ৪ আউন্স, সাদা উল ১ আউন্স, উলের
রংয়ের সঙ্গে মানায় এরূপ বোতাম ৪টি।

মাপ—কাঁধ থেকে তলার ঝুল ১১ ইঞ্চি। হাতের মাপ
বাহুমূল থেকে কফ পর্যন্ত ৯ ইঞ্চি।

পিঠের জন্য—প্রথমে ঐ গোলাপী উলের ৬০টি স্বর
তুলতে হবে। এবারে প্যাটার্ণ আরম্ভ করতে হবে।

১ম সারি—সব সোজা।

২য় ,, —সব সোজা। এইভাবে ২০ সারি গোট
বুনে গোলাপী উল ছিঁড়ে এবারে সাদা উল যোগ করতে
হবে। তারপর ২১ সারি থেকে আবার প্যাটার্ণ বুনে
হবে—

২১ম সারি—২ সোজা, * সামনে স্তূতা ১ জোড়া, ২
সোজা, * এইভাবে পুনরাবৃত্তি করা।

২২ম সারি—সব উল্টো।

২৩ম সারি—৩ সোজা, * সামনে স্তূতা ১ জোড়া, ২
সোজা * বুনে যাও।

২৪ম সারি—সব উল্টো। এবারে সাদা উল ছিঁড়ে
আবার গোলাপী উল যোগ করে ৪ সারি সোজা বুনে
হবে।

২৯ম সারি—* ৫ সোজা, ৫ উল্টো, * পুনরাবৃত্তি কর।

৩০ম সারি—* ৫ সোজা, ৫ উল্টো * এইভাবে বুনে,
শেষের দু'সারির মত পর পর ৩ বার বুনেতে হবে।

৩৪ম সারি—* ৫ উল্টো, ৫ সোজা * পুনরাবৃত্তি কর।

৩৫ম সারি—* ৫ উল্টো, ৫ সোজা * পুনরাবৃত্তি করে
শেষের দু'সারির মত ৩ বার বুনেতে হবে।

৩৯ম সারি—২৯ সারি থেকে ৩৮ সারি পর্যন্ত পর পর
যে পর্যন্ত না ৮ ইঞ্চি মাপ পুরো হয় বুনে যেতে হবে তারপর
বগলের কাট আরম্ভ হবে—
বগলের কাট—

১ম সারি—১ সোজা, ১ জোড়া বাকী—আগের বুনের
মত যে নমুনা ছিল সমস্ত ঘরে তাই করতে হবে।

২য় সারি—১ম সারির মত। তারপর আর ঘর না
কমিয়ে আগের নমুনা ঠিক রেখে দু'সারি বুনে যাও।

তারপর একটা কথা মনে রাখতে হবে—পূর্বের
'চকবন্দী' নমুনার ঘর সংস্থান যাতে ঠিক থাকে তার দিকে
বিশেষ খেয়াল রেখে বুনেতে হবে। অর্থাৎ শেষের এই চার
সারি পর পর বুনে যাও যে পর্যন্ত না মোট ৪৬টি ঘর
কাঁটায় বাকী থাকে। এখন আর ঘর না কমিয়ে (প্যাটার্ণ
যেন ঠিক থাকে) এই ৪৬ ঘর নিয়ে বুনে যাও, যতক্ষণ না
তলা থেকে কাঁধের মাপ ১১ ইঞ্চি পুরো হয়। শেষ
লাইনটা জামার সোজা দিকের বুনে দিয়ে শেষ কর।

এইবার কাঁধের ঘর এইভাবে ভাগ করতে হবে—উপরের
৪৬ ঘরের প্রথম ১৫ ঘরের যে নমুনা আছে তাই বুনেতে হবে
এবং পরের ১৬টি ঘর বন্ধ করে দাও। অবশিষ্ট ১৫ ঘরে
যে নমুনা আছে তাই নিয়ে (ডান দিকের বুকের জন্ত) এইভাবে
বোন—

১ম সারি—প্রথম ৮ ঘর সোজা, বাকী—অবশিষ্ট ঘরে
যে নমুনা আছে তাই বুনে যাও।

২য় সারি—প্রথম ৭ ঘরে যে নমুনা আছে তাই বুনেতে
হবে বাকী ৮ ঘর সোজা। এই দুই সারির মত পর পর ৬
সারি বুনেতে হবে।

১৩ম সারি—৮ সোজা, অন্য কয় ঘরে যে নমুনা আছে
তাই বুনে শেষে ১ ঘর (হাতের কাঁটের দিকে) বাড়িয়ে
নাও।

১৪শ সারি—এবার ৮ ঘরে যে নমুনা হয় তাই বুনতে হবে—বাকী ৮ ঘর সোজা। এখন বগলের দিকে বুননের সময় প্রতি একটা অন্তর সারিতে ১টা করে ঘর বাড়িয়ে নাও—এবং গলার দিকের ৮ ঘরে সোজা বোনা সমানে চলবে। কাঁধ থেকে গলার পটির বুননের মাপ যখন ৩ ইঞ্চি পুরো হবে তখন একটা বোতাম ঘর এইভাবে করতে হবে—গলার পটির দিকে—৩টা সোজা, ৩ ঘর বন্ধ, ২সোজা বাকী ঘরে যে নমুনা আছে তাই আগের মত বুনে যাও।

১৫শ সারি—এবারে ২ ঘর বাড়িয়ে আগের নমুনার মত বুনে যাও। শেষের বর্ডারের ৮ ঘর এইভাবে—২ সোজা, ৩ ঘর তোলা, ৩টা সোজা

২য় সারি—৮টা সোজা। বাকী ঘরে যে নমুনা আছে সব ঘরে তাই চলবে। শেষে ৩টা ঘর বাড়িয়ে নাও।

৩য় সারি—সমস্ত ঘরে যে নমুনা আছে তাই চলবে, কেবল শেষে ৮ ঘর সোজা।

৪র্থ সারি—৮ সোজা। বাকী ঘরে যে নমুনা আছে তাই বুনে যাও। সবশেষে ৩ ঘর বাড়িয়ে নাও। এবারে নমুনা ও বর্ডার ঠিক রেখে (হাতের দিকে আর ঘর বাড়িও না) কাঁধ থেকে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত মাপ যতক্ষণ না পুরো হয় সমানে বুনে যাও। তারপর এইখানে পূর্বের মত আবার একটা বোতাম ঘর করে নিতে হবে। এখন পিঠের দিকে যে বর্ডার আছে সেই পর্যন্ত একভাবে বুনে যাও। বোনা শেষ হলে তারপর এইভাবে :—

১ম সারি—৩ সোজা, ৩ ঘর বন্ধ, বাকী সব সোজা।

২য় সারি—প্রথমে সব সোজা, বর্ডারের ৮ ঘর—২ সোজা, ৩ ঘর তোলা, ৩ সোজা।

৩য় সারি—সব সোজা।

৪র্থ সারি—সব সোজা। এবারে গোলাপী উল ছিঁড়ে সাদা উল যোগ কর।

৫ম সারি—সব উল্টো।

৬ষ্ঠ সারি—২ সোজা, * সামনে খুঁতা, ২ জোড়া, ২ সোজা * পুনরাবৃত্তি কর।

৭ম সারি—সব উল্টো।

৮ম সারি—৩ সোজা, * সামনে খুঁতা, ১ জোড়া, ২ সোজা * পুনরাবৃত্তি কর। এখন সাদা উল ছিঁড়ে

গোলাপী যোগ করে ১ কাঠি উল্টো বুনতে হবে। তারপর ২০ কাঠি সোজা বুন সমস্ত ঘর বন্ধ করে নাও।

অপর দিকে যে ১৫ ঘর ছাড়া আছে তার গলার দিক থেকে উল যোগ করে ডান দিকের বুকের বুননের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাঁ দিকের অংশটাও বুন নাও। কেবলমাত্র বাঁ দিকের বুক বোনবার সময় বোতাম ঘর করতে হবে না। বর্ডারের ৮ ঘর সমানে সোজাই বোনা হবে।

হাতা করবার নিয়ম :—প্রথমে গোলাপী উল দিয়ে ৪০টা ঘর তুলে নাও।

১ম সারি—*২ সোজা, ২ উল্টো *পুনরাবৃত্তি কর। *২ সোজা ২ উল্টো *পুনরাবৃত্তি কর। প্রথম সারির মত আরো ৪ বুন নাও। তারপর গোলাপী উল ছিঁড়ে সাদা উল যোগ করে ৪ কাঠি সোজা বোন। এখন সাদা উল ছিঁড়ে গোলাপী যোগ করে ১ কাঠি সোজা।

১২শ সারি—* ২ সোজা, ২ উল্টো *পুনরাবৃত্তি কর। এই বুননই আবার ৪ কাঠি, তারপর বুন তারপর এইভাবে হাতের কাট আরম্ভ কর।

১ম সারি—১ ঘর বাড়িয়ে নাও। *৫ সোজা, ৫ উল্টো *পুনরাবৃত্তি কর।

২য় সারি—১ ঘর বাড়িয়ে নাও। *৫ সোজা, ৫ উল্টো পুনরাবৃত্তি কর। সবশেষে ১ সোজা। এইবার ঘর না বাড়িয়ে নমুনা ঠিক রেখে ২ সারি বুনে যাও।

লক্ষ্য রাখতে হবে ঘর বাড়ালেও চকবন্দী নমুনার ঘর সংস্থান যাতে ঠিক থাকে সেই ভাবে বুনতে হবে। শেষের চার সারি পর পর বুনে যাও যে পর্যন্ত না কাঁটার ৭০টা ঘর পুরো হয়। তারপর ২০ সারি আর ঘর না বাড়িয়ে নমুনা ঠিক রেখে বোন।

তারপর :—

১ম সারি—২ ঘর বন্ধ করে বাকী ঘরে যে নমুনা পাও বুনে যাও। ২য় সারি—২ ঘর বন্ধ করে বাকী ঘরে যে নমুনা পাও তাই বুনো। শেষের এই সারির বুনন পর পর আর ৩ ৯ বার বুনতে হবে।

২১ম সারি—৫ ঘর বন্ধ করে বাকী ঘরে যে নমুনা আছে তাই বুনো। ২২ম সারি—৫ ঘর বন্ধ করে বাকী ঘরে যে নমুনা আছে তাই বুনতে হবে। ২৩ম সারি—৪ ঘর বন্ধ করে

বাকী ঘরে যে নমুনা আছে তাই বুনো। ২৪ম সারি—৪ ঘর বন্ধ করে বাকী ঘরে যে নমুনা আছে তাই বুনো।

কলার—প্রথম পিঠের অংশে গলার জন্য যে ১৬ ঘর বন্ধ আছে তাই এই ভাবে তুলে নাও—জামার উল্টা পিট সামনে এনে ডান দিক থেকে উল যোগ করে ১৬ ঘর সোজা ভাবে বুন তুলে নাও। এখন আর একটি কাঁটা নিয়ে এবং কাঁধ থেকে বুকের বর্ডারের দিকে বুন ২০ ঘর তুলে নাও। তারপর আর একটি কাঁটা নিয়ে ২০ ঘর সোজা বুনো। এখন কাঁধ থেকে অপর দিকের বুকের বর্ডারের দিকে ২০ ঘর বুন

তুলে নাও। এবারে কটিতে মোট ৫৬ ঘর হলো। এই ৫৬ ঘরের উপর ৪০ কাঁটা সোজা বুনন দিয়ে সমস্ত ঘর বন্ধ করে দাও।

এবারে বোনা জিনিষটির উপর ভিজা কাপড় রেখে গরম ইঞ্জি করে নিলেই বেশ সমান হয়ে যাবে। তারপর হাতাকে কাঁধের সঙ্গে সেলাই করে নাও এবং হাতের সামনে থেকে তলা অবধি দুই পাশেই সেলাই করে নাও। এইবার যে ভাবে বোতাম ঘর তৈরী করতে হয় সেই ভাবে উল দিয়ে বোতাম ঘর করে বোতামগুলি যথাস্থানে বসিয়ে দাও। তাহলে কোট বোনা সম্পূর্ণ হবে।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠে বঙ্গললনা

এ পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার নানা বিভাগে বাঙ্গালীর মেয়ে কৃতিত্ব দেখাইলেও ইঞ্জিনীয়ার কোন বঙ্গ মহিলা হন নাই বা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা অধ্যয়ন করেন নাই। বর্তমানে শ্রীমতী ইলা মজুমদার ও শ্রীমতী অজানা গুহ শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বি, ই, ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহারা প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করা অতি শক্ত এবং জাতি গঠনে ও দেশরক্ষা কার্যে অত্যাবশ্যক বিষয়। নারীর এই বিদ্যা অর্জন করা পথম গৌরব।

সংস্কৃত উপাধি প্রাপ্তা মহিলা

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্ম শাস্ত্রের বাহন সংস্কৃত ভাষা। বেঙ্গল সংস্কৃত এসোসিয়েশন আজ বহু বৎসর সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলনের প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠান সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান উত্তর উত্তর জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ইহারা সে সব উপাধি পরীক্ষা গ্রহণ করেন তাহা যেমন দৃষ্টিতে মনই জ্ঞান উন্মেষকারী।

বর্তমান বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষায়—শ্রীমতী কণা দেবী (বাংলা; গইলা জিলা বরিশাল) এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাকরণ তীর্থ উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীমতী গীতা দত্ত (কলিকাতা) বেদতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছেন।

নির্যাতিত রাজ নৈতিক মহিলা কম্মীর রাজ সম্মান

স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের কংগ্রেসী রাষ্ট্রনায়কগণ ইংরাজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর ব্যক্তিগণকে সম্মান ও বৃত্তি দিতেছেন এবং কার্য সংস্থান করিয়া দিতেছেন।

সম্প্রতি বেনারসে স্বাধীনতা দিবস গান্ধি ময়দানে জন সভায় শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীকে একটি রৌপ্য পদক ও একটি সনদ প্রদান করা হইয়াছে। মৃণালিনী দেবী স্বর্গীয় রাসবিহারী ঘোষের আত্মীয়া, ১৯২৯ সালে বেনারস বোমার মামলায় সাত বৎসর কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বঙ্গ রমণীর কৃতিত্ব

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিচ্ছিন্ন ৩১৫৪৬টি ছাত্র-ছাত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়। তাহার মধ্যে ১৮২৫৩ উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম হইয়াছে মনসাচরণ দত্ত।

পুরাতন ঢাকা বোর্ডের পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম হইয়াছে ইভা রায় (ইডেন গার্ল'স) দ্বিতীয় গায়ত্রী চট্টো (ইডেন গার্ল'স) সপ্তম গীতাজলি ঘোষ।

মহিলা কৰ্মীর অভাব

কৃষিবিদ্যায় এবং উদ্যান-কৰ্ষণ-বিদ্যায় ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীধারী ব্রিটিশ মহিলাদের চাহিদা বর্তমানে খুবই বেশী। ইতিপূর্বে যে সমস্ত চাকুরীতে মহিলাদের লওয়া হইত না বর্তমানে সেখানে প্রয়োজনানুযায়ী মহিলাই পাওয়া যাইতেছে না। বর্তমানে কৃষি এবং উদ্যান-কৰ্ষণ-বিভাগে প্রয়োজনানুযায়ী মহিলা কৰ্মীর অভাব।

শিল্পে বর্ষীয়সী মহিলাদের প্রয়োজন

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ, ব্রিটিশ শ্রম-শিল্পে অধিক সংখ্যক বিবাহিতা মহিলাদের বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক এবং বয়স্ক মহিলাদের কার্যে লওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ব্রুটেনে এখন শ্রমিকের অভাব হওয়ায় অধিক সংখ্যক বয়স্ক মহিলা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ত কাজ করছেন। ৬০ বছর এবং তার বেশী বয়সের মহিলাদের সংখ্যা ১৯৩৯ সালে ছিল ৫'৩। ১৯৪৭ সালে হয়েছিল ৭'৯। এর অর্থ এই যে, এখন ব্রুটেন ১০৪,০০০ হাজার বয়স্ক মহিলা কাজ কচ্ছেন। যুদ্ধের পূর্বে এই সংখ্যা ছিল ৬৩,০০ হাজার অর্থাৎ শতকরা ৬৫ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

গৃহকর্তী প্রতিনিধি

মিসেস এডিথ রিচার্ডসন (৫৪ বছর) কোন এক অফিসে অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার কাজ করতেন। সম্প্রতি কাপড় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড অব ট্রেড যে নূতন ডিস্ট্রিবিউটাস' এডভাইসরী কমিটি নিয়োগ করেছেন সেই কমিটিতে তিনি গৃহকর্তীদের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারীভাবে নিযুক্ত হয়েছেন। গত মাসে মিসেস রিচার্ডসন এবং দুইটি মহিলা মিলিত হয়ে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করেছেন।

মহিলাদের রোটারী ক্লাব

রোটারী ক্লাবের দ্বারা লণ্ডনে মহিলাদের সোরোপটিমিষ্ট ক্লাব (Seroptimist) আছে। সম্প্রতি হারোগেটে এই প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১৭টি দেশের ১৫০০ মহিলা উপস্থিত হয়েছিলেন। “যে পৃথিবী আমরা চাই তাহার জন্ত কাজ কর” এই ছিল আলোচ্য বিষয়। সম্মেলনে চার বছরের জন্ত একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রতি তিন বছর অন্তর এই প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে থাকে।

১১৬ বছরেও স্বাস্থ্যবতী

মিস্ ইসাবেলা শেপহার্ড (ওয়েলস) তাঁর নিজের বয়স সঠিক বলতে পারেন না। তাঁর বয়স ১১৪, ১১৫ অথবা ১১৬ ও হতে পারে। মিস্ সেপহার্ড চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বকালে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৮ সালে পেনসন কমিটি তাঁর বয়স ৭৫ বছরের অধিক বিবেচনায় তাঁকে পেনসন মঞ্জুর করেন। মিস শেপহার্ড জীবনের অধিকাংশ সময়ই ম্যাক্কেঠারে কাটিয়েছেন। তিনি কানে শুনে পান না, কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য খুব চমৎকার।

শিশু বিদ্যালয়ের জন্ত নারী সহকারী

এ বছর ব্রুটেনে আনুমানিক ৬০০০ নারীকে শিক্ষকতার জন্য ট্রেনিং দেওয়া হবে। শিশুশ্রেণীর জন্য নারী শিক্ষয়িত্রীর অভাব হওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া ৫-৬ বছরের শিশুদের জন্য ৪০ জন “ওয়েলফেয়ার এসিষ্ট্যান্ট” ট্রেনিং এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। শিশুদের আদর যত্ন করবার পুঁহা যাদের আছে তাদেরই উপযুক্ত প্রার্থী বলে মনে করা হবে। এই সহকারীদের শিক্ষকতার কোন কাজ করতে হবেনা।

স্বাধীন ভারত ও শিক্ষা সংস্কার

শ্রীমুজাতা রায়, এম-এ, এম-এড (লীড্‌স্‌)

দুই শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গতি নিজস্ব ধারা হারিয়ে ফেলেছে—যে খাতে তারা চলতে বাধ্য হয়েছে তার সঙ্গে জীবনশ্রোতের সম্পর্ক না থাকাতে এমন একটা পটা জলার সৃষ্টি হয়েছে যার চারিদিকে রাশি রাশি আবর্জনা এসে জমেছে—বন্ধ জলের চলন্ত গতির অভাবে সে আবর্জনা ধুয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সেইজন্য আজ শিক্ষিত লোকের এই করাল মূর্তি; তাদের দেখে দেশের লোক মনে ভরসা পায় না, বরং ভয় পায়।

শিক্ষাকে আবার দেশের নাড়ীর সঙ্গে যুক্ত করে দেবার জন্যে মহাত্মাজী যে চেষ্টা করে গিয়েছেন দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই চেষ্টা সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে আমাদের মনে ভরসা হচ্ছে। মহাত্মাজীর চেষ্টার বিশেষত্ব এই :—(১) শিক্ষাকে মাত্র সৌভাগ্যবান কয়েক-জনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, (২) বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন না করে দেশের নিজস্ব ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রচার করা, (৩) শিক্ষাকে পোষাকী বাইরের আবরণ হিসাবে ব্যবহার না করে তাকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জনের উপায়স্বরূপ করে তোলবার চেষ্টা করা। তাই কেবলমাত্র মৌখিক ও পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা না দিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কোনও কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দান করা, (৪) পরবর্তী জীবনে যে অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করে বাঁচতে হবে ছাত্র জীবনে তার সঙ্গে যাতে যোগ থাকে সেইজন্য শিক্ষার সময়ে কিছু উপার্জন করতে অভ্যাস করা।

কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীন ভারতে মহাত্মাজীর নীতিগুলি শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রহণ করা স্থির করেছেন। প্রাদেশিক সরকারদের মধ্যেও বেশীর ভাগই উপরিউক্ত নীতিগুলি গ্রহণ করে আইন পাশ করবার চেষ্টা করছেন। শিক্ষা বিষয়ে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকাররা যাতে এক সঙ্গে কাজ করতে পারেন তার জন্য গত জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে একটা বৈঠক বসেছিল। শিক্ষা বিষয়ে অভীতে যে সময় অপব্যয় হয়েছে তা পূরণ করে নেওয়ার জন্যে এখন দিল্লীতে এবং বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে অসংখ্য কমিটির অধিবেশন সুরু

হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য অর্থাৎ ইউনিভারসিটিতে প্রবেশের আগে পর্যন্ত শিক্ষার জন্য ১২ বছর সময় নির্দেশ করা হবে। ভবিষ্যতের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি বর্তমানে চলিত পদ্ধতির থেকে একেবারেই অন্য রকম হবে। বর্তমানের শিক্ষায় কেবলমাত্র স্কুল পাঠ্য বই বোঝাবার বুদ্ধির ওপরে—অথবা স্থিতি শক্তির উপরেই—বেশী জোর দেওয়া হয়। ছাত্রের নানারকম কাজ করবার ক্ষমতা, সৌন্দর্যবোধ বা কল্পনাশক্তির কথা কিছুমাত্র মনে রাখা হয় না। মহাত্মাজীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে ছাত্রের স্বভাবের এই বিশেষত্বগুলির উপযুক্ত চর্চা হবে বলে আশা করা যায়। এই সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রকে কোনও একটি শিল্প কার্যে পারদর্শী করে দেওয়ার ফলে আমাদের দেশের বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যারও অনেকখানি সমাধান হয়ে যাবে।

শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে সর্বসাধারণের মধ্যে যে প্রচার করা হবে তা যদি বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা হত তাহলে সকলকে কেবলমাত্র “বাবু” অথবা “ভদ্রলোক” করে তোলা হত। তার ফলে দেশে দারিদ্র্য বেড়ে যেত এবং সত্যি কাজ যারা করে অর্থাৎ দেশের খাদ্যাদি জোগাড় করে তারা লোপ পেয়ে যেত। কিন্তু শিক্ষার যা সত্যি আদর্শ তা যদি মনে রেখে কার্যিক পরিশ্রমকে সম্মান দিয়ে উঠে করে তোলবার ব্যবস্থার সঙ্গে কার্যিক পরিশ্রমীদের অজ্ঞতার ও কুসংস্কারের আবরণের থেকে বাইরে আনতে পারা যায় তবেই নূতন পদ্ধতির শিক্ষা সার্থকতা লাভ করবে।

পরীক্ষার চাপ ছাত্রদের ওপর থেকে কমিয়ে দিয়ে শিক্ষার দিকটা যাতে বড় করে দেখা হয় সে বিষয়ে ভাবা হবে। এই উদ্দেশ্যে ১২ বৎসর বয়সের শেষে একটিমাত্র সরকারী পরীক্ষার ব্যবস্থা হবে। তার আগে পর্যন্ত ছাত্রদের কাজ পর্যবেক্ষণের ভার স্কুলের কর্তৃপক্ষের উপরেই স্থাপন থাকবে।

নীচের দিকে ইরাজী শিক্ষা একেবারেই বাদ দেওয়া হবে। মাধ্যমিক শিক্ষায় আপাততঃ ইংরাজী থাকবে, কারণ ইউনিভারসিটিগুলিতে এখনই ইংরাজী বর্জন করা হচ্ছে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে চেষ্টাও করা হবে, তখন মাধ্যমিক শিক্ষাতেও ইংরাজীকে আর বাধ্যতামূলক রাখা হবে না।

তবে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা যাতে একযোগে চলতে পারে, ভিন্নমুখী না হয়ে যায় সে বিষয়ে ভেবে স্থিতিরভাবে কাজ করা দরকার হবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জপরিষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করার জন্য জাতীয় সংস্কৃতি বৈঠকের উদ্বোধনকে একটি বিশেষ আশাপ্রদ ঘটনা বলে মনে করা যায়।

শিক্ষার আরেকটি অঙ্গ আমাদের বিশেষভাবে বিবেচ্য— তা হচ্ছে বয়স্কদের শিক্ষা। এ বিষয়েও দেশের লোকেরা ভাবতে আরম্ভ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনটি ভাগ করা হয়েছে (১) অক্ষর পরিচয়, (২) অক্ষর জ্ঞান বজায় রাখা (৩) সংস্কৃতির প্রচার। বয়স্ক শিক্ষার জন্য পৃথক কমিটি তৈরী হয়েছে, পৃথক ভাবে অর্থের ব্যবস্থা হয়েছে এবং কোনও কোনও প্রদেশে এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নেই, আশা করা যাচ্ছে যে খুব অল্পদিনের মধ্যেই বয়স্ক শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষক তৈরী কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং ১৯৪২ এর প্রথম থেকেই শিক্ষার কাজও আরম্ভ হবে। এ কাজের

জন্য সাধারণ স্কুল পাঠ্য বই ব্যবহার চলবে না কারণ সে বইগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয় অল্প বয়স্ক ছাত্রদের কথা ভেবে। সেই সব বিষয় সম্বন্ধে বয়স্কদের কোনও আগ্রহ থাকে না, সেই জন্য তাদের বই অল্প ভাবে লেখা প্রয়োজন। তারপরে যারা কোনদিনই লেখাপড়া শিখে উঠতে পারবে না তাদের কথাও ভুললে চলবে না। ম্যাজিক লঠন, বায়োস্কোপ, রেডিও, কথকতা, বক্তৃতা ইত্যাদির সাহায্যে দেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে স্বাস্থ্য তত্ত্ব, অর্থনৈতিক সমস্যা, সামাজিক কর্তব্য ও নাগরিক শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হবে।

শিক্ষার এই নতুন যাত্রাপথে সাহায্য করতে হবে দেশের সব লোককেই। সাধারণ শিক্ষকবর্গ, ছাত্র-ছাত্রী, বৈতনিক স সরকারী কর্মচারী, অবৈতনিক সমাজ-সংস্কারক—কোন লোকই বাদ গেলে চলবে না। দেশের সব শিক্ষিত লোক একযোগে কাজ আরম্ভ করলে তবেই শিক্ষাকে তার নিজস্ব পথে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে, তখনই তার আবর্জনার রাশি ও পঙ্কিলতা ধুয়ে গিয়ে স্বচ্ছ ধারার গতি দেখা যাবে।

স্বদেশ ও বিদেশ

শ্রীস্বধাকান্ত দে

মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্য-বৃদ্ধি

কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গেল। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার সভাপতিত্ব করেন। এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিৎ ও রাজনীতিবিৎরা আলোচনায় যোগদান করেন।

বাংলার প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মীই জানেন, আজকের দিনে গৃহের খরচে কিছুতেই কুলাইতেছে না—টাকা বাঁচা দূরে থাকুক, কষ্টে স্তম্ভে সংসার চালাইয়াও বহুক্ষেত্রে ধার হয়।

ইহার কারণও তাহারা জানেন। সমস্ত জিনিষপত্রের দাম অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। মাছ বল, আলু বল, তরিতরকারী বল, প্রত্যেক জিনিষ আগুন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংসার চালান দুর্ভাহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্যক্তিগত বাজেটে আয়-ব্যয়ের দুই মুখ কেন মিলিতেছে

না, তা গৃহলক্ষ্মীগণ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ১৯৩৯ সনের তুলনায় ১৯৪৮ সেপ্টেম্বর মাসে জিনিষের দর শতকরা ৪০০ গুণ বাড়িয়াছে। ১৯৩৯ সনে যে লোক ১০০ মাহিনা পাইত, আজ সে ৪১৩ টাকা না পাইলে তার পক্ষে ১৯৩৯ সনের ঠাইলে বাস করা অসম্ভব। যদিও অনেকের মাহিনা বাড়িয়াছে, কিন্তু ঐ অল্পপাতে কাহারও বাড়ে নাই। সুতরাং আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক যে অভ্যস্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

কিন্তু জিনিষপত্রের দাম ৩৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৯৩৯ সনের তুলনায়, ইহার কারণ কি? সাধারণত, নিয়ম এই যে জিনিষের জন্ম টান যদি বেশী হয়, অর্থাৎ জিনিষ কম, যাহারা উহা চাহিতেছে তাহারা সংখ্যায় বেশী—তাহা হইলে জিনিষের দাম বাড়ে। আর লোকসংখ্যার অল্পপাতে যদি

জিনিষের যোগান বেশী হয় তা হইলে জিনিষের দাম কম হয়। কিন্তু জিনিষের দামের হ্রাস-বৃদ্ধি খুব বেশী পরিমাণে হয় না—৩৪ গুণ হয় না। তার কারণ এই যে, যখনই কোন জিনিষের দাম চড়িতে থাকে, তখনই উহাতে বেশী লাভ হয় দেখিয়া লোকে ঐ ব্যবসাতে টাকা ঢালিতে আরম্ভ করে, এবং তখন জিনিষের যোগান বেশী হয় বলিয়া দাম কমিতে থাকে।

আপনার হাতে যদি ১ টাকার জায়গায় ৩ টাকা থাকে, আপনি কি করিবেন? মনে হইবে, আপনি ১ টাকা খরচ করিয়া ২ টাকা জমাইবেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা হয় না। আপনি ৩ টাকা পাইলে প্রায় ৩ টাকাই খরচ করিয়া ফেলিবেন। শুধু আপনি নন। দেশের প্রায় সব লোকই তাই করিবে। আমাদের দেশেও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। দেশে চলিত ক্রয় শক্তি (টাকা পয়সা, নোট, চেক ইত্যাদি যাহা কিছু দ্বারা জিনিষ কেনা যায়) অনেক বাড়িয়াছে। ফলে, আগে (১৯৩৯) জিনিষের জন্ম যে দাম দেওয়া হইত, এখন তদপেক্ষা অনেক বেশী দাম দেওয়া হয়। অথচ এই যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রয়-শক্তি ইহা দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হয় নাই। তাহারই ফলে এত লোক এত কষ্ট পাইতেছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাই মূদ্রাস্ফীতি। জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির ইহা একটি কারণ। আরও অত্যন্ত কারণ আছে। যেমন, ভারতীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের অথবা ব্যয় ও অপব্যয়, চোরা কারবারি, ইত্যাদি।

দেশের বর্তমান দুদিনে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সাংসারিক আয় বৃদ্ধির নানারকম ফিকির তাঁদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী তাঁরা আর্থিক জগতে একটা নৈতিক আবহাওয়া ফিরাইয়া আনুন। আজ সমস্ত সমাজ জীবন ছুট বাপ্পে ওঠাগত প্রাণ। সকল রকম অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁরা মাথা তুলিয়া দাঁড়ান।

বাংলার অল্প বস্ত্র সমস্যা

বাংলায় অল্প বস্ত্রের সমস্যা যে আকারে দেখা দিয়াছে, তাহাতে গবর্নমেন্ট উদাসীন থাকিতে পারেন না। বর্তমান

ইংরেজি বৎসর শেষ হইতে সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বর এই চারি মাস বাকী আছে। এই চারি মাসের জন্ম প্রয়োজনীয় যথেষ্ট চাউল সরকারের হাতে মজুত নাই। তবে গম আছে। সুতরাং এই চারি মাসে, আমাদের রেশনে যে চাউলের বরাদ্দ ছিল তাহা ৬ ছটাক কমিবে, অল্পদিকে আটা ও ময়দার বরাদ্দ ৬ ছটাক বাড়িবে। অনেকের ইহাতে অসুবিধা হইবে। কিন্তু আমরা পূর্বে বলিয়াছি, বাঙ্গালীর খাদ্য বস্ত্র লইয়া ডাক্তার রাসায়নিক ও অল্প বিশেষজ্ঞদের একত্রে বিশেষ বিবেচনার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। শরীর পুষ্টির জন্ম যে পরিমাণ ক্যালোরির বাঙ্গালী ছেলে মেয়ের দরকার তা নিরীক্ষ করিয়া আমাদের খাদ্য বস্ত্রের পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, খাদ্যবস্ত্র নির্ণয়ে অর্থশাস্ত্রীদের হাত থাকিবে, কারণ উহার দাম এমন হওয়া দরকার যে সকলে কিনিতে পারে। অনবরত এই অভিযোগ শুনিতে পাই যে, রেশনের চাউল ও আটা খাইতে খাইতে শরীর খারাপ হইয়া গেল। অথচ উপায় যে একেবারে নাই, তাহা বলা চলে না। সাধারণত, বাঙ্গালী তত্তক্ষণ তাহার আহার সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হয় না, যতক্ষণ না সে মনে করে তার পেট ভরিয়াছে। এই 'পেট ভরাবার' প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আমাদের পরিমাণে অল্প অথচ পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা জীবন ধারণের অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে হইবে। তাহাতে খাওয়ার পর অল্প বিশ্রামে বেশী কাজ করিতে পারিব।

বস্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিবার পর ভারতে ও বাংলাদেশে কাপড়ের ক্রয় অবস্থা ঘটয়াছিল, তাহা সকলে জানেন। কথা ছিল, নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিলে যদি বস্ত্র সংকট মোচন না হয়, তা হইলে আবার নিয়ন্ত্রণ বসিবে। ভারতের শিল্প-সচিব ডক্টর শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় হুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, মিলের মালিকগণের নিকট হইতে সরকার যে সহযোগিতা আশা করিয়াছেন, তাহা তাঁরা পান নাই। বস্ত্রত কাপড়ের দায় ক্রমাগতই চড়িয়া গিয়াছে, এবং কাপড়ের কলের কারবারীরা নানারকম অসাধু উপায়ে তাঁদের আয়-বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই সব কারবারীরা অত্যাচার নিয়ন্ত্রণের পর অদ্যাবধি ১০০ কোটি টাকা লাভ করিয়াছেন। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ম আবার বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ হইবে। তবে তাহা চালু হইবে ৩১শে অক্টোবরের পর।

বাংলার অসামরিক সরবরাহ সচিব বলিষ্ঠাছেন, বস্ত্র রেশনিং প্রবর্তন করিতে দেৱী হইবার কারণ আছে। গত জাহ্নয়ারী পর্যন্ত রেশনিং ছিল। এই সময়ে কলিকাতায় বস্ত্রের একমাত্র পাইকারী ব্যবসায়ী ছিল বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশন। ইহাদের নিকট হইতে বিভিন্ন দোকানও বস্ত্র লইয়া বিক্রয় করিত। এইরূপ লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের সংখ্যা ছিল, ৭০০। নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাইবার পর কয়েক হাজার ব্যবসায়ী কাপড়ের কারবার আরম্ভ করিয়াছে। ভারত সরকার নির্দেশ দিয়াছেন, ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে ইহাদিকে সমস্ত মাল বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। এই সময় না পাইলে বহু নতুন ব্যবসায়ী অভ্যস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইত। কিন্তু ৩১শে অক্টোবরের পর আর কোন লাইসেন্স নতুন করিয়া মঞ্জুর হইবে না।

বয়নশিল্প সংক্রান্ত কমিশনার কলিকাতায় বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির সহিত আলোচনার পর স্থির করেন (২১শে আগষ্ট, ১৯৪৮) যে কাপড়ের গাঁট খুলিয়া পুনরায়, মূল্যের ছাপ দিয়া তাহা দ্বিতীয়বার প্যাক করা হইবে। গত ৩০শে আগষ্ট হইতে নতুন প্যাক করা গাঁটসমূহের তালিকা তৈরী শেষ হইয়াছে। এই সব গাঁট ছাড়াইয়া লইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিল্প সমিতি (পরে West Bengal co-operative Procurement and Distribution society Ltd)র উপর ভার দেওয়া হইয়াছে।

বস্ত্র সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফল সুদূর প্রসারী হইবে। বর্তমানে আমরা এই ফলদর্শনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিব।

বাঙ্গালীর সৈন্তবাহিনী গঠন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে ভারত সরকার বাঙ্গালী সৈন্ত দ্বারা মিলিসিয়া ও ব্যাটালিয়ান গঠন করিবেন স্থির হইয়াছে। পূর্বে যারা সৈন্য ছিলেন, তাঁরা ছাড়া অন্যরাও ইহাতে যোগ দিতে পারিবেন। সকল শ্রেণীর লোককেই গ্রহণ করা হইবে। মোট সৈন্যের সংখ্যা তিন হাজার। ইহার মধ্যে ৮০০ প্রাক্তন সৈন্য-তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। ইহারা একটি ব্যাটেলিয়ান গঠন করিবে।

নাশনাল ক্যাডেট কোরের জন্যও লোক-সংগ্রহ আরম্ভ

হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রধানতঃ ইন্সুল কলেজের ছাত্রদের লওয়া হইবে। সিনিয়র বিভাগ কলেজের ছাত্রদের জন্য— তিন ব্যাটালিয়ান গঠন করা হইবে। আর ইন্সুলের ছাত্রদের লইয়া (জুনিয়র বিভাগ) ৩৩টি গ্রুপ গঠিত হইবে প্রত্যেক গপে ২০ জন থাকিবে। পূজার ছুটির আগেই ইহাদের শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ হইবে। ২৭জন কলেজের অধ্যাপক সিনিয়র বিভাগের জন্য শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহারা ষ্টাফ অফিসার হইবেন। জুনিয়র বিভাগের জন্য ৬৬ জন শিক্ষক শিক্ষালাভ করিতেছেন।

ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনী নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। ইহারা সামরিক শিক্ষা পাইবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষাদল গঠন করিয়াছেন। গ্রুপ দলের ৩৩০ জন শিক্ষা শেষ করিয়া নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় দলে ৬৫০ জন কাঁচড়াপাড়ার শিক্ষালাভ করিতেছে। দুই মাস শিক্ষালাভে যাইবে।

৭৫ জনকে লইয়া একটি সাঁওতাল প্লাটুন গঠিত হইবে।

বাংলাদেশে যাতে উন্নত ধরণের স্থল জল ও আকাশ বাহিনী গঠিত হয়, ওজ্জনা সরকারকে চেষ্টা করিতে হইবে। আজকের দিনে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এ বিষয়ে উদাসীন থাকার অর্থ ইহার আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করা। যেটুকু কার্য হইতেছে, আমরা তাহা দেশের পক্ষে যথেষ্ট মনে করি না।

৪। আমাদের ধাত লবণ দরকার

সমগ্র ভারতে বৎসবে ৬ কোটি ১২ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে ৫ কোটি ১৭ লক্ষ মণ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়, বাকী ২৫ লক্ষ মণ প্রধানত পাকিস্থান ও এডেন হইতে আসে। নীচে, উৎপাদনের স্থান ও পরিমাণ দেওয়া হইল।

স্থান	বাৎসরিক উৎপাদন
	১৯৪৭/৪৮
১। রাজপুতানা	
(ক) সম্বর হ্রদ	১ কোটি মণ
(খ) পাঁচভদ্রা	১৬ ”
(গ) দিঙ্গোয়াবা	১২ ”

স্থান

বাৎসরিক উৎপাদন

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কারখানার লবণ প্রস্তুত হয়।

১২৪৭।৪৮

১। বাংলা (মোগাস বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ)

৫০ হাজার মণ বৎসরে

২। বোম্বাই

(ক) থরগোদা

৩৮ „

(খ) বর্ণনা

৩৫ „

(গ) বোম্বাই

৫ „

৩। মালদ্বীপ

(ক) বোম্বাই

৩৬ „

(খ) পেমগুজর

২ „

(গ) মালদ্বীপ

৫৭ „

(ঘ) ভেদলমিয়ম

২ „

(ঙ) টিউটিকোরিন

৫৪ „

৪। দেশীয় রাজ্য সমূহ

(ক) জামনগর, পোরবন্দর,

লভনানা, ওয়া

৮১ „

৫। ত্রিবাঙ্কুর

২২ „

লাখ ৫৩১ „

২। উড়িষ্যা

(ক) হুয়া

৪২ লক্ষ মণ „

(খ) হুয়াদি

১৭ „ „ „

৩। পূর্ব গুজু ভারত

২৬ „ „ „

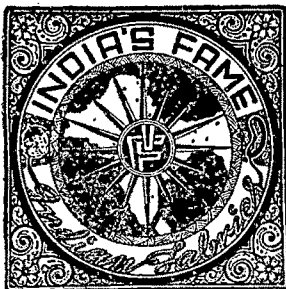
গোয়া

৫। পূজার ছুটি

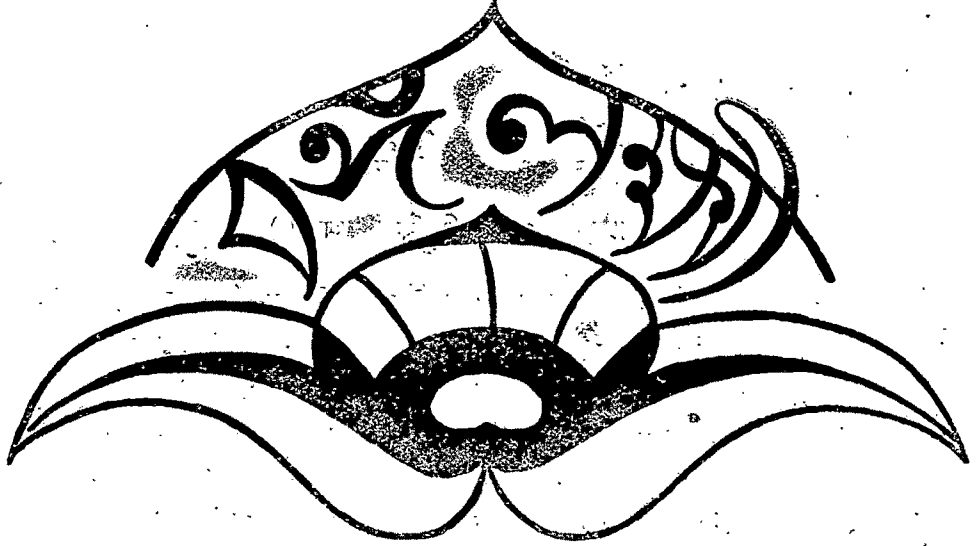
পূজা আসিতেছে। এই সময়ে অনেকে নানাদিবে ছুটি উপভোগ করিতে যাইবেন। বঙ্গলক্ষ্মীগণকে আমরা একটা অত্যাশঙ্কিত করিব। তাঁহারা এই ছুটির মধ্যে একটি বালক বা বালিকাকে অক্ষর পরিচয় করাইবেন, এই সংকল্প লইয়া যান। এমন সময় আসিয়াছে, যখন দেশে একটি নিরক্ষর বালক বা বালিকা থাকিবার কথা নয়। কিন্তু এ বিষয়ে অনেকের চেষ্টার প্রয়োজন। শিক্ষাই সকল প্রকার উন্নতির বনিয়াদ। সেই বনিয়াদ গঠনে কাহারো না ব্রতী হইবেন? ৮৯৪৮

মহিলা প্রতিষ্ঠান—আমরা বাংলা দেশের মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলির বিষয় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ ছাপিতে চাই।

তাঁহারা সম্পাদিকার নামে প্রবন্ধ পাঠাইলে স্তুখী হইবে।



Indian Fabrics
CLASSIC SILK & COTTONS
• BHOWANIPUR • CALCUTTA •



২৩শ বর্ষ

কার্তিক—১৩৫৫

১২শ সংখ্যা

চিরজন্মভূমি

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

হে পৃথিবী! নাহি কি বোমার মত কিছু,
শুধু কি দুঃখের পথে যাত্রা পিছু পিছু!
শুধু কি ভাদিয়া ফেলা শুধু বিপর্যয়,
অনর্থের পথে শুধু শক্তি অপচয়?
সত্তোর আলোক তুমি জ্বালো নাই কত
স্নেহতানের রাজ্যে একি শয়তান প্রভু?
শুধু কি পাপের বোঝা তোমার সংগ্রহ,
পরম আশ্রয় তুমি নহ কি বিগ্রহ?
নহ কি সৃষ্টির তুমি শ্রেষ্ঠ অবদান
দুর্লোকের দুর্লোকের সংযোগের স্থান?
ভেঁড়ের জঠরে রয়ে চেতনার বিন্দু
বক্ষে তব শোভে শত জীবনের ইন্দু।
পাপের প্রলয়ে তুমি চির পুণ্য সেতু
জন্ম-মৃত্যু সংগঠনে বৈচিত্র্যের হেতু।
অন্ন তুমি, প্রাণ তুমি, মাতৃস্নেহ তুমি,
সর্ব মানবের তুমি চির ভগ্নভূমি।

সূফী মরমিয়াবাদ

ডক্টর রমা চৌধুরী, এম-এ, ডি ফিল্ (অক্সন্)

ইসলামীয় দর্শন ও ধর্মাস্তিত্ব সূফী দর্শন ও ধর্ম জগতের ইতিহাসে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ মতবাদরূপে সম্মান লাভ করেছে। সূফী ভক্ত ও সাধকগণের অসুস্থত পন্থা অনেককেই ধর্মজীবনে বহু সাহায্য করেছে। সূফীদের মতে, ঈশ্বরলাভই মানবের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য, অত্যা কোন জাগতিক বস্তুর প্রতি স্পৃহা তার থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়। ঈদৃশ ঈশ্বরলাভ বা মোক্ষের ছ'টি দিক—“ফানা” বা জীবের জীবন্ত বা ক্ষুদ্র ‘আমিরের’ বিনাশ, এবং “বাকী” বা জীবের ঈশ্বর লাভ। এ সম্বন্ধে অবশ্য বহু মতভেদ আছে, কিন্তু সাধারণভাবে সূফীদের মতে এই হ’ল মোক্ষ বা ঈশ্বর লাভের প্রকৃত অর্থ। এখানে প্রশ্ন হল এই—এইরূপ ঈশ্বরলাভ হবে কি উপায়ে? সূফীরা মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ একটি বিশেষ মার্গের প্রণয়ন করেছেন। এই মার্গ জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ ও কর্মমার্গের এক অপূর্ণ সামঞ্জস্য। সূফীরা বলেন যে, ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হ’তে হ’লে প্রথমতঃ আমাদের ঈশ্বরের আদেশশাস্ত্রমতে পুণ্যকর্ম অবহিত হ’তে হবে; এবং পাখিব বিষয় থেকে মন ফিরিয়ে এনে, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্মেই সেই মনকে অগিত করতে হ’বে, ও দিব্যাত্ম এক মনপ্রাণে তার পূজা ও ধ্যানই আত্মনিয়োগ কর্তব্য হবে। এরূপে কর্ম ও ভক্তির সহায়তায় হ’বে আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ, এবং এই জ্ঞানই হ’ল মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ।

এখানে প্রশ্ন হ’ল—এই “জ্ঞানের” প্রকৃত স্বরূপ কি? জ্ঞান বলতে আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়জ বা বিচারবুদ্ধিমূলক জ্ঞানই বুঝি। যেমন, আমাদের সম্মুখে একটি গোলাপ আছে—আমরা চক্ষু দ্বারা তার রূপ বা বর্ণ প্রত্যক্ষ করি, নাসিকা দ্বারা তার সুগন্ধ আভ্যাস করি, ত্বক দ্বারা তার পেলবতা অনুভব করি। এইভাবে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের এই গোলাপটির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়

যে ‘এই গোলাপটি রক্তবর্ণ, সুগন্ধি ও কোমল’। ঈশ্বরজ্ঞান যে এরূপ ইন্দ্রিয়জ নয়, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু বুদ্ধিবিচারবাদী তাত্ত্বিকগণ বলেন যে, ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াতীত হলেও বুদ্ধিবিচারাতীত নয়। বিচারবুদ্ধি দ্বারা আমরা বহু অপ্রত্যক্ষ, অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারি। যথা, প্রত্যক্ষ ধূমজ্ঞান থেকে আমরা অনায়াসেই অপ্রত্যক্ষ অগ্নি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি। এই একই ভাবে আমরা প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে অপ্রত্যক্ষ জগৎকর্তার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে পারি। অতএব এঁদের মতে, আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান সাধারণ অনুমান বা বিচারবুদ্ধিমূলক জ্ঞান মাত্র।

কিন্তু সূফীগণ সকলেই একবাক্যে এই মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, যেমন ইন্দ্রিয়মূলক প্রত্যক্ষ দ্বারা, তেমনি সাধারণ বিচারমূলক অনুমান দ্বারাও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হ’তে পারে না। সেজন্য সূফী সাধকগণ সকলেই সাধারণ বিচারবুদ্ধি শক্তির তুচ্ছতা ও সীমাবদ্ধতার বিষয় বারংবার নির্দেশ করেছেন। বিখ্যাত মায়াবাদী সূফী সাবিস্তুরি বলেছেন যে, সাধারণ চিন্তাশক্তির সাহায্যে ঈশ্বরলাভ অসম্ভব। এই শক্তির দ্বারা আমরা কেবল পাখিব, সসীম ও মর বস্তু সম্বন্ধেই ধারণা করতে পারি। কিন্তু বুদ্ধির দৌড় ঐ পন্থায়—আরো অগ্রসর হয়ে বিশ্ব অতিক্রম করে বিশ্বাতীতে, সসীম থেকে অসীমে, মর থেকে অমরে পৌঁছাবার শক্তি তার একেবারেই নেই। সেজন্য ঈশ্বরের একত্ব ও মানবের ঈশ্বরময়ত্ব উপলব্ধি বিষয়ে বুদ্ধি সম্পূর্ণ অপারগ। অনুমান দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষদৃষ্ট বা জ্ঞাত সত্য থেকে অপ্রত্যক্ষ বা অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হতে পারি সত্য; কিন্তু সাধারণ পাখিব জীবনে অনুমান প্রমাণ বলে পরিগণিত হ’লেও, অপাখিব আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুমান সম্পূর্ণ মূলাহীন। কারণ, প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বর বিষয়ে অনুভব অসম্ভব। এখানে প্রত্যক্ষদৃষ্ট জ্ঞাত সত্য বা পাখিব জগৎ অপ্রত্যক্ষ অজ্ঞাত সত্য বা ঈশ্বর

থেকে নিম্নস্তরভুক্ত। কিন্তু নিম্নে থেকে উচ্চ, অল্প থেকে অধিক উপনীত হওয়া অসম্ভব। সাধারণ ক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট জ্ঞাত সত্য (যথা, ধূম) এবং অপ্রত্যক্ষ অজ্ঞাত সত্য (যথা, অগ্নি) উভয়েই একস্তরগত, উভয়েই পাখিব, সসীম অনিত্য বস্তু। কিন্তু পাখিব, সসীম, অনিত্য জগৎ থেকে অপাখিব অসীম, নিত্য ঈশ্বরে উপনীত হওয়া অনুমানের শক্তির অতীত। সাবিস্তারির মতে, বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরোপলব্ধির বার্থ প্রচেষ্টা ক্ষণে প্রদীপালোকের সাহায্যে প্রভাতসূর্য্য দর্শনের প্রচেষ্টার মতই হাস্যকর। সেজন্যই, বিচারবুদ্ধিগর্ভিত দার্শনিক ও তাকিকগণ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরকে জানবার চেষ্টা করে নানারূপ ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়েছেন। যথা, তাঁরা জগৎকে নিত্য ও স্বতন্ত্র, এবং ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ জগৎবহির্ভূত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ঈশ্বরোপলব্ধি বিষয়ে বুদ্ধি আমাদের সাহায্য করা ত দূরে থাক, উপরন্তু ক্ষতিই করে। সাধারণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভেদবিষয়ক প্রত্যক্ষদৃষ্ট এক বস্তুকে আমরা অপরাপর বস্তু থেকে ভিন্নরূপেই দর্শন করি; এক বস্তু ‘ধূম’ থেকে, অপর এক ভিন্ন বস্তু ‘অগ্নির’ অনুমান করি। সুতরাং, ঈশ্বর ও জগতের অভিন্নত্ব জান সাধারণ প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা লাভ করা যায় না। সাবিস্তারি বলেন “দার্শনিকের চক্ষুর কেবল দ্বৈতদর্শনই করতে পারে—তিনি ঈশ্বরের একত্ব দর্শনে অক্ষম।” দার্শনিক বা নৈয়ায়িক ঈশ্বর ও জগৎকে দুই বিভিন্ন তত্ত্ব বলে মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ে অভিন্ন। অতএব, বুদ্ধি ঈশ্বরোপলব্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম। বুদ্ধি দ্বারা আমরা কেবল ঈশ্বর সৃষ্ট জগৎ ও ঈশ্বরের করুণার বিষয়েই চিন্তা করতে পারি, ঈশ্বরের স্বরূপের বিষয়ে নয়।

বিখ্যাত সুফী ক্রমীর মতেও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে মানবের প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান হতে পারে না। প্রথমতঃ, বুদ্ধি দ্বারা আমরা কেবল দেশকালবদ্ধ, সসীম পাখিব বস্তুর বিষয়েই জানতে পারি; কিন্তু ঈশ্বর দেশকালাতীত, অসীম, অপাখিব। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিলব্ধজ্ঞান আপেক্ষিক অর্থাৎ, তুলনামূলক ও প্রভেদমূলক। কোনো এক বস্তুকে জানতে হলে তাকে অজ্ঞাত বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে, তাঁদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও প্রভেদ উপলব্ধি করে, তাৎপর্যই আমরা

তাকে একটা বিশেষ বস্তু বলে জানি। যথা, আলোককে আমরা অন্ধকার ভিন্ন রূপেই জানি। কিন্তু ঈশ্বর সর্বব্যাপী—তাঁর বাহিরে কিছুই নেই যার সঙ্গে তাঁর তুলনা বা যা থেকে তাঁর প্রভেদ করা যেতে পারে তৃতীয়তঃ, বুদ্ধি স্বয়ং ঈশ্বরসৃষ্ট বলে সে স্রষ্টা ঈশ্বরকে জানতে অক্ষম। কার্য কারণ থেকে নিম্নস্তরগত, স্বল্পশক্তি স্বল্পগরিমাণ। কিন্তু নিম্ন উচ্চকে, অল্প অধিককে জানবে কি করে? চতুর্থতঃ বুদ্ধিজ্ঞাত জ্ঞেয়রূপ ভেদমূলক—ঈশ্বরে অভেদত্ব বিষয়ে ধারণামাত্র করতে পারে না। সাবিস্তারি গ্রন্থ ক্রমীও বলেছেন “বুদ্ধির চক্ষুর বক্রতা তাকে দ্বৈতদর্শনে বাধ্য করে।” এই সকল কারণে, বুদ্ধির সাহায্যে সাক্ষা ঈশ্বরোপলব্ধি সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাধারণ বিচারবুদ্ধি এম কি শাস্ত্রপাঠ দ্বারাও আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে জানতে পারলে তাহা প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান বা ঈশ্বরোপলব্ধি নয়। যেমন, “গো” “লা”, “প”—এই তিনটি বর্ণদ্বারা গোলাপের সৌন্দর্য সুগন্ধ ও স্বকোমলতা সহজে উপলব্ধি অসম্ভব, তেমনি কেবল শুধু পুস্তক বা অনুমানলব্ধ জ্ঞান দ্বারাও ঈশ্বরে স্বরূপাভাব অসম্ভব।

কিন্তু মানবের জ্ঞানলাভের উপায় ত কেবল এই তিনটিই—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্রাদিপাঠ। যদি এ সকলে কোনোটিতেই ঈশ্বরজ্ঞানলাভ না হয়, তাহলে ত ঈশ্বরোপলব্ধি ও তার ফল মোক্ষ আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব—এ স্বীকার করা ব্যতীত আর উপায় কি? সুফী সাধকগণ কিন্তু একথা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে মান বিচারবুদ্ধি ব্যতীতই ঈশ্বর বিষয়ক সাক্ষাৎ জ্ঞান, উপলব্ধি বা অনুভূতি লাভে ধন্য হয়। সুফীগণ বলেন যে, মানব ঈদৃশ ঈশ্বরোপলব্ধি মস্তিষ্কপ্রসূত ও বিচারমূলক নয়, হৃদয় প্রসূত ও আবেগবহুল। মানবহৃদয় ঈশ্বরের দর্পণস্বরূপ কর্ম ও ভক্তি দ্বারা এই দর্পণের সব অশুদ্ধতা ও মল নিঃশেষে বিদূরিত করলে, সেই নিঃশল দর্পণে ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই প্রতিফলনকে “ঈশ্বরদর্শন” নামে অভিহিত করা হয়। ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্ত হৃদয় ঈদৃশ ঈশ্বরিক আলোকে উদ্ভাসিত হলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন। ইহাই হ’ প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান এবং ইহাই হল মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ

বিচারবুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান থেকে এইরূপ ঈশ্বরদত্ত জ্ঞানের প্রভেদ নির্দেশ করবার জন্য সূক্ষীগণ ইহাকে “উন্মাদনা” এবং বিচারবুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানকে “স্থিরতা” নামে অভিহিত করেন। “উন্মাদনা” কালে সাধারণ বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, এবং সেজন্যই হৃদয় ঈশ্বর থেকে সাক্ষাৎ ভাবে আলোক লাভ করবার সুযোগ পায়। সাবিস্তারি বলেছেন যে, অন্ধকারবিহারী বাহুড় যেমন স্বর্ঘ্যের আলোক সহ্য করতে পারে না, তেমনি পাণ্ডিত্যগাহক বিচার বুদ্ধিও এই অপূর্ণ ঐশ্বরিক আলোকের সন্মুখে অন্ধতা প্রাপ্ত হয়—“এই আলোকে বুদ্ধি আপাদমস্তক দগ্ধ হয়ে যায়।” সুতরাং বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হলেই ঈশ্বরোপলব্ধির উদয় হয়, তার পূর্বে নয়। স্বীয় তুচ্ছতা ও শক্তিহীনতা উপলব্ধি করাই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ কার্য। “স্থিরতা” বা সাধারণ জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রভেদসূচক এবং আবেগহীন-জ্ঞাতা বাহির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জ্ঞেয়কে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা স্থির ভাবে জানে। “উন্মাদনা” বা সাক্ষাৎ উপলব্ধি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একতাসূচক ও আবেগবহুল—জ্ঞেয় জ্ঞাতার উপর প্রতিফলিত হয়ে তার সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে এবং তার মনে প্রগাঢ় প্রেম ও ভাবোন্মাদনার সৃষ্টি করছে।

বিখ্যাত সূক্ষী জীলীর মতে, এই ঐশ্বরিক আলোক চতুর্বিধ। ঈশ্বরমিলনকারী ভক্ত ক্রমান্বয়ে এষ্ট আলোক লাভ করে ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলিত হন; (১) কার্য্যালোক বা ঐশ্বরিক কার্যাবলীবিষয়ক আলোক। ঈদৃশ আলোক প্রাপ্ত ভক্ত উপলব্ধি করেন যে ঈশ্বরই একমাত্র কণ্ঠকর্তা। সেজন্য তিনি স্বীয় স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ভাবে পরির্জন করে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারেই পরিচালিত হন। (২) নামালোক বা ঐশ্বরিক নাম বিষয়ক আলোক। ভক্ত ঈশ্বরের নাম বিশেষ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করলে, তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং কেহ ঈশ্বরকে সেই নামে আহ্বান করলে তাকেই তাকে উত্তর দেন, কারণ ঈশ্বরের নামই তাঁর নাম হয়ে যায়। ভক্ত আরো উচ্চতরে আরোহণ করলে কেহ তাকে আহ্বান করলে স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর হয়ে উত্তর দেন। ভক্ত উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হলে, ঈশ্বর ক্রমান্বয়ে তাঁর নিকট স্বীয় ক্রমোচ্চ নামসমূহ ব্যক্ত করেন। পরিশেষে

ঈশ্বরের সমগ্র নামই ভক্তের নাম হয়। (৩) গুণালোক বা ঐশ্বরিক গুণাবলীবিষয়ক আলোক। প্রাণ জ্ঞান, সংকল্প, বল, শ্রবণ, বাক্য ও চর্শন—ঈশ্বরের এই গাতটি প্রধান গুণ ভক্তের নিকট প্রকাশিত হয়, এবং সেই অনুসারে তাঁর বিভিন্ন প্রকারের উপলব্ধি হয়। যথা, ‘প্রাণ’ গুণ প্রকাশিত হলে একমাত্র ঈশ্বরই যে সকল প্রাণীর প্রাণ, এই তত্ত্ব ভক্ত সাক্ষাৎ অনুভব করেন, ইত্যাদি। (৪) সত্তালোক বা ঐশ্বরিক স্বরূপ বিষয়ক আলোক। ইহা ঈশ্বরের নিঃশব্দ, নির্কির্শেষ, নামহীন শুদ্ধ স্বরূপ বা সত্তা-মাত্রের অভিব্যক্তি। ইহাই সর্বোচ্চ আলোক। ঈদৃশ আলোক প্রাপ্ত ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদত্ব প্রাপ্ত হয়ে জীবমুক্ত বা “পূর্ণ মানব” হন। এই পূর্ণমানবেই হয় পরমাত্মার সমগ্র স্বরূপের পূর্ণ প্রতিফলন। পরমেশ্বরের পূর্ণ প্রতিচ্ছবিরূপে ঈদৃশ পূর্ণ মানব সমগ্র পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্বরূপ ও সকলসামুদ্রনশ্রেষ্ঠ হন। কিন্তু জীলীর মতে, এরূপ অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি কণ্ঠস্থ্যই মাত্র—ভাবারূঢ় সমাধি অবস্থাতেই কেবল ঈদৃশ অভিরোপণকি হয়, অন্য সময়ে নয়।

উপরি উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই স্পষ্ট প্রতীতি হবে যে, সূক্ষী মতবাদে ঈশ্বরের স্বরূপ, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বালোচনার অভাব না থাকলেও ইহা প্রকৃত পক্ষে বিচারবুদ্ধিমূলক মতবাদ নয়, অতীন্দ্রিয়বাদ (Mysticism)। সাধারণ ভাবে অল্প কথায় “অতীন্দ্রিয়বাদের” মূল তত্ত্ব এই যে, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা লোকোত্তর চ মতত্ব ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। তাহলে কি উপায়ে তাঁকে জানা যাবে? এ সম্বন্ধে দুটি মত আছে। (১) প্রথম মতানুসারে, ঈশ্বরোপলব্ধি বুদ্ধি প্রসূত না হলেও জ্ঞানমূলক (intellectual)। বুদ্ধিশক্তি (Reason) ব্যতীত, মানবের অপর একটি উচ্চতর শক্তি আছে যাকে প্রজ্ঞাশক্তি (Intuition) নামে অভিহিত করা যায়। এই প্রজ্ঞাশক্তি সাধ্যমতই অপার্থিব, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। কিন্তু বুদ্ধি ভিন্ন হ’লেও প্রজ্ঞা বুদ্ধি বিরোধী নয়, বুদ্ধিনিরোধকারীও নয়, উপরন্তু বুদ্ধিরই চরমোৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠ অবস্থা মাত্র। (২) দ্বিতীয় মতানুসারে ঈশ্বরোপলব্ধি বুদ্ধিমূলক ত নয়ই, এমন কি জ্ঞান মূলকও নয়—সম্পূর্ণ আবেগমূলক (emotional)। ইহা হৃদয়

দ্বারা অমুভূতি, মস্তিষ্ক দ্বারা উপলব্ধি নয়; এবং ঈদৃশ হৃদয়জ অমুভূতি বুদ্ধিজ্ঞ জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলেই, হৃদয় ঐশ্বরিক আলোকে আলোকিত হয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ অনুভব করে। অতএব ‘ঈশ্বরকে সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না’—এই বিষয়েই কেবল উক্ত দুই প্রকার অতীন্দ্রিয়বাদ একমত। কিন্তু ‘কি প্রকারে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়’—বুদ্ধির চরমোৎকর্ষ প্রজ্ঞা দ্বারা বা বুদ্ধিবিরোধী ভাবোন্মানদন

দ্বারা—এই বিষয়ে উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমত। সেজন্য উভয় মতবাদকেই কেবল “অতীন্দ্রিয়বাদ” নামে অভিহিত না করে জ্ঞানমূলক অতীন্দ্রিয়বাদকে “প্রজ্ঞাবাদ” এবং আবেগমূলক অতীন্দ্রিয়বাদকে “মরমিয়াবাদ” বললে সুবিধা হয়।

বেদান্ত মতবাদও অতীন্দ্রিয়বাদ, কিন্তু, ইহা “প্রজ্ঞাবাদ”। সূফী অতীন্দ্রিয়বাদ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে “মরমিয়াবাদ”। এই দিক থেকে, শঙ্কর রামানুজ নিম্নার্কে প্রপঞ্চিত বেদান্ত মতবাদ থেকে সূফী মতবাদের পার্থক্য অনেক।

প্রগতির পথে

(বন্দীবীরের কাহিনী)

শ্রীরথীন্দ্রমোহন চৌধুরী

কান্দীরের মনোরম উপত্যকায় এক অসমসাহসী দুর্ধর্ষ যুবক—নাম তার লছমন সিং—হাতে তীর ধম্বক নিয়ে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। তার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে যে কত হিংস্র বাঘ, ভালুক, বুনা শূয়ার, হরিণ প্রাণ হাড়িরেছে তার ইয়ত্তা নেই। যৌবনের উন্নততার মাঝে এমনি করেই সে লাভ করত এক অভাবনীয় আনন্দের অল্পপম আশ্বাদন। এভাবেই তার জীবন ছুটে চলেছিল বার্কিঙ্কোর পানে।

একদিন অপরাহ্নে গোধূলির রক্তিম ছায়া তুষারধবল গিরিশৃঙ্গে প্রতিফলিত হ’য়ে চারিদিক রাঙিয়ে তুলেছে। অমন অপক্লপ বিকেলবেলায় লছমনও ঘরে বসে থাকাতে পারল না, হাতে তীর ধম্বক নিয়ে সে বেরিয়ে এলো শিকারের সন্ধানে। অনেকক্ষণ ঘোড়াঘুরর পর সে দেখতে পেলো এক হরিণী একটি ঝোপের আড়ালে বসে বিশ্রাম করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার নিঃশব্দবাণে নিরীহ হরিণী প্রাণ হারাল। তাকে কাঁধে ফেলে লছমন বাড়ীর দিকে রওনা হ’ল কিন্তু সে যেন

কেমনতর একটা অশান্তির ভাব বোধ করতে লাগল। সে ভেবে দেখল, তার এই জিহাংগ প্রবৃত্তি তাকে পিশাচ করে তুলেছে; তার নয়ন খুলে গেল, জ্বলন্ত বিকশিত হ’ল অমৃতপ্ত লছমন সন্ন্যাসী হয়ে সেই হতে এসে আশ্রয় নিল গোদাবরীবিধৌত দক্ষিণাপথে।

লছমনের ধর্মজীবন স্বক্ক হলে তার নাম হলো মাধো দাস—সে তখন একজন পরম রামভক্ত। একদিন মাধোদাস নদীতটে তার ইষ্টদেবতার সাধনার তন্ময় হয়ে বসে রয়েছেন, এমন সময় একজন স্বর্দর্শন বীরপুরুষ সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কে আর কেনই বা অমন পেশীবহুল দৃঢ় শরীর নিয়ে এভাবে দিন কাটাচ্ছ?” মাধোদাস আঁধি যুগল নিম্নলিখিত করেই সহজ স্বরে ধীরে ধীরে বিনীতভাবে উত্তর দিলেন “প্রভু, আমি আপনার বান্দা।”

আগন্তকের মুখমণ্ডলে কোন বিষ্ময়ের আভাস মূর্ত্ত হয়ে উঠল না। তিনি পূর্বের মত গভীর ভাবেই আবার প্রশ্ন করলেন—“সত্যি যুবক, তুমি যদি আমার শিষ্য গ্রহণ

করে থাক, তবে আমার সকল সাধন করতে মৃত্যুকে
তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারবে কি ?”

মাথা নেড়ে মাথো দাস সম্মতি জানিয়ে বললেন, “হাঁ
আমি পারব ?”

তখন সেই বীরপুরুষ বললেন—“বান্দা, আমি শিখগুরু
গোবিন্দ সিংহ। শত্রুতাড়িত হয়ে দেশে দেশে লুকিয়ে ঘুরে
বেড়াচ্ছি। উঠ, অস্ত্র লও দেশের সেবার দায়িত্ব গ্রহণ কর।”

তখন সম্রাসী মাধোদাস কৃপান হাতে শিখজাতির
সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলেন দেশকে মুক্ত করতে।

ইহার কিছুকাল পড়ে শুণ্ডবাতকের হস্তে গুরু গোবিন্দ
প্রাণ দেন। বান্দার নেতৃত্বে তখন গুরুজীর প্রেরণা পুষ্ট
শিখজাতি শিরহিন্দ আক্রমণ করল, গুরুজীর পুত্রহত্যাকারীর
প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। রাজ্যের শাসনকর্তা নবজাগ্রত
শিখদের হাতে মারা গেল—তার রাজ্য তাদের পদানত হল।
বিজয়গৌরবদৃষ্ট শিখবাহিনীর অগ্রগতি আরম্ভ হল।
ক্রমে বাদশাহের ক্ষমতা ধ্বংস করে বান্দা অধিকার করলেন
উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ।

অবশেষে সম্রাট ফারুকশিয়াহের আমলে বাদশাহী
সৈন্য লাহোরের শালাবারের নিকট শিখদের আক্রমণ করল।
এই আকস্মিক আক্রমণে শিখগণ বিভ্রান্ত হল না। কিন্তু
ব্যর্থ হয়ে গেল তাদের মরণ পণ সংগ্রাম। বান্দা আবার
বিপুল বিক্রমে গুরুদাসপুরগড়ে মোগল সেনার সম্মুখীন
হলেন। তাদের অসি রক্তাকারে রণস্থল কল্লিত হয়ে উঠল।
বাদশাহী বাহিনী প্রমাদ গণল। কিন্তু মুষ্টিমেয় অল্পচর নিয়ে
বান্দা আর পেরে উঠলেন না। বিধ্বস্ত মোগল সেনার কাছে
তার সেবার হার হল। এইই তার জীবনের প্রথম ও শেষ
পরাজয়। তুরাণী সেনাধ্যক্ষ তাকে শৃঙ্খলিত করে
বিজয়নামসে চারিদিক মুখরিত করে দিল্লী অভিমুখে
রওনা হ'ল।

আরম্ভ হল তাদের হৃদশী। টেনে হিঁচড়ে লাহোর এনে
বর্ষের মোগলগণ কতশত বন্দীকে হত্যা করে রাভী নদীতে
ফেলে দিল। তাদের রক্তে নদীতে রুধির স্রোত ছুটে চলল।
এই নৃশংস অত্যাচারেও শিখগণ বিচলিত হ'ল না। তারা
জানে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ না দিলে আত্মার মুক্তি নাই,
মরণ আলিঙ্গনে যে ভয় পায় সে মহাপাতক, জাতির কলঙ্ক।
রাজধানীতে এসে হাতীতে চড়িয়ে মুখে কালি মেখে বান্দাকে

যোরাণ হল। তারপর কারাগ্রাচীরের অন্তরালে আরম্ভ হ'ল
তার মৃত্যু যাতনার ধীর দহন।

তারপর দিল্লীর রাজপ্রাসাদে বান্দার বিচার সভা বসল।
রাজপোষাক পরিহিত বন্দী বান্দা যখন রক্ত উষ্ণীয় মাথায়
দিয়ে দাঁড়াল তখন অসভ্য মোগলেরা তার সম্মুখ দিয়ে
মৃত শিখদের মাথা বর্শা ফলকে গেথে নিয়ে যেতে লাগল।
বান্দা অনিমেষ নয়নে তাদের দেখে ভাবল—ওরাই ছিল
তার বৃকের বল। স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে ওদেরই তিনি গড়ে
তুলেছিলেন মাতৃভূমির স্বাধীন সৈনিক রূপে; তাই ওরা
মৃত্যু ভয়কেও গ্রাহ্য করে নি। বান্দার পিছনে উদাত
প্রেরণ হস্তে জল্লাদ কাজীর আদেশের প্রতীক্ষা করছিল
অধীর আগ্রহে। বান্দা ভাবল গুরুজীর আদেশ পালনে
আমি দ্বিধা করিনি, ওরাও আপদে বিপদে আমার সাথী
ছিল। তাই ওরাও ধন্য, আমিও ধন্য।

এর পরও অত্যাচারী মোগল বাদশাহের নৃশংসতা
দর্শনের স্পৃহা কমল না। তারা বান্দাব কোলে এনে দিল
বান্দার এক শিশু ছেলেকে, আর তার হাতে দেওয়াইল এক
শানিত ছুরিকা। কাগী আদেশ দিল—যহন্তে তোমার
ছেলেকে বধ করতে হবে। বান্দা সম্মত ছেলেকে কোলে
তুলে নিয়ে তার মুখচুম্বন করল। আজ স্বাধীনতা সংগ্রামের
অগ্রনৈতার চরম পরীক্ষা হবে। তাই বান্দার হাত কেঁপে
উঠল না, তার নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল না। একবার
শুধু পুত্রকে বলল—

“হে পুত্র নাহি কোন ভয়, কহ গুরুজীর জয়।” শিশু
তেজোদৃষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল—“গুরুজীর জয়, নাহি কোন
ভয়।” আর সঙ্গে সঙ্গে তার ছুরিকাঘাতে দেহখানি চির
দিনের জন্য স্পন্দনগীন হয়ে গেল। স্বাধীনতার বেদীমূলে
শিশু সৈন্যকের আত্মাহুতি ভগবানের চির অভিপ্রেত,
সেজন্য বান্দা শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল না, সে স্থির
হয়ে দরবার কক্ষে দাঁড়িয়ে বসে।

তারপর ঘাতক দগ্ধ সাঁড়ানী হস্তে এগিয়ে এল। তার
দেহের মাংস টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে তাকে বধ করা হল।
বীরকেশরী বান্দা সর্বভয়ভঞ্জন অলখ নিরঞ্জনকে স্মরণ
করে নীরবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করল।

বান্দার আত্মবলি ব্যর্থ হবার নয়। শিখেরা বুঝল
মুক্তিপথে মৃত্যুকে সাথী না করলে স্বাধীনতা রক্ষা করা
যাবে না। স্বাধীন জাতি হিসেবে জাতীয় সত্তা বজায় রাখতে
হলে বাধাবিঘ্নকে পদদলিত করতেই হবে। প্রতিটি শিখের
হৃদয়ে সেদিন হ'ল সত্যিকারের দেশপ্রেমের নব উন্মেষ।
স্বয়ং জাতীয় চেতনা চিহ্ন জাগ্রত রাখতে হলে সকলকেই
নিতে হবে মহামন্ত্রে দীক্ষা। সেদিন হতে নূতন উদ্যমে
আরম্ভ হল তাদের জয়যাত্রা।

পুরীধামে রথযাত্রা

শ্রীসরলাবালা পাল

আগে অনেকবার পুরী বেড়ানো হয়েছে, কিন্তু সেখানকার জগদ্বিখ্যাত রথযাত্রা উৎসব দেখার সুযোগ এর আগে কখনও ঘটেনি। এবার আমার মেয়ে সুধীরা আমার সেই সাধ মিটিয়েছে।

আমার মেয়ে সুধীরা বয়স—বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধিবাসিনী। আমি ছিলাম কল্কাতায়। মেয়ে বোলপুর থেকে কল্কাতায় এসে আমাদের সঙ্গে নিয়ে সোজা পুরী পৌঁছলো।

বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানীর চেষ্টায় রূপনারায়ণ, বৈতরণী, ব্রাহ্মণী, মহানদী, কাটজুড়ি প্রভৃতি প্রশস্ত নদীগুলির উপর নির্মিত বিরাট সেতুর উপর দিয়ে রেল চলেছে। তাই আজ পুরী, ভূনেশ্বর, যাজপুর, বৈতরণী, সাক্ষীগোপাল, সিংহাচলম্, এবং আরও দক্ষিণে মাজরা, শ্রীবঙ্গম, কাঞ্চি রামেশ্বরম, কল্যাণ কুমারী প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি দর্শন এত সহজ। বলতে গেলে জগন্নাথই বি, এন, রেল কোম্পানীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। জগন্নাথক্ষেত্র এক মহাতীর্থ। এখানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যাত্রীর ভীড় লেগেই আছে।

আজকাল কি কল্কাতা কি বাইরে, কোনও জায়গায় বাসস্থান সংগ্রহ করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরীতে আজকাল বাসস্থান সংগ্রহ করা মহা দায়। সেই দায় থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল, পুরী বসন্তকুমারী বিধবাপ্রশ্রম ও তৎসংলগ্ন স্বর্গদ্বার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপা শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায়। গরমের দিনে স্কুল একমাস কাল ছুটি থাকে। তিনি আমাদেরকে স্কুলের একদিককার চুইখানি কামরায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমরা ট্রেন থেকে সোজা গৌরবাউসাহি মহল্লায় বিধবাপ্রশ্রমের সংলগ্ন স্কুল বাড়ীর সেই ঘরে গিয়ে জায়গা নিলুম। স্কুলের মস্তবড় কম্পাউণ্ড, চারিদিকে খোলা হাওয়া, বেশ চমৎকার জায়গা। ঘরের কাছেই টিউব ওয়েল, প্রভৃতি। কোন বিষয়েই অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

এখন রথের কথা কিছু বলি। জগন্নাথের সবই বিরাট। মন্দির বিরাট বিগ্রহ বিরাট, ভোগের ব্যবস্থা ও ব্যাপার বিরাট। আবার প্রধান উৎসব এই রথযাত্রাও বিরাট। প্রতি বৎসর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জন্ত তিনখানি নতুন রথ প্রস্তুত হয়। জগন্নাথের রথে ১৬টি চাকা, বলরামের রথে ১৪টি, এবং সুভদ্রার রথে ১২টি চাকা। রথগুলি যেমন বিরাট, তার চাকাগুলিও তেমনি প্রকাণ্ড। প্রতি বৎসর এই তিনখানি রথের নির্মাণ ও সাজ সজ্জার কত যে পরিশ্রম করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই।

রথের আগের দিন সন্ধ্যার পূর্বেই তিনখানা রথকে তাদের নির্মাণ স্থান হতে টেনে এনে মন্দিরে সিংহদ্বারের সামনে এক সারিতে দাঁড় করান হয়। বিরাট রথ তিন খানার বিচিত্র সাজসজ্জা ও কারুকার্য দেখে মন চঞ্চল হয়ে উঠে।

রথের দিন ভোর থেকেই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথারোহণ দর্শনের জন্ত মন্দির, মন্দিরের সিংদরজা, বড় রাস্তা, দোকান বাড়ীর ছাদ প্রভৃতিতে লোকের ভিড় জমে যায়। সাধারণতঃ বেলা ১১.১২টার মধ্যেই রথারোহণ পূর্ব শেষ হবার কথা, কিন্তু এবারে সেটা শেষ হতে বেলা ৩টা, ৪টা হয়ে গেল। তারপর পুরীর রাজা সুসজ্জিত হুন্দের সোনার গিলটিকরা মালুঘের স্বল্পবাহিত সাবেকি চণ্ডের পাকী চড়ে নিজের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। পাকীর আগে আগে কতকগুলি হাতী চলেছে। শোভাযাত্রায় মন্দির ও পুলিশের অনেক লোকজন।

রাজা সাহের পাকী থেকে নেমে প্রথমে বলরামের রথে উঠলেন। সেখানে ঝাঁট দেওয়া, চন্দন ছিটা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি শেষ হলে তিনি সেখান থেকে নেমে এলেন জগন্নাথের রথের উপর। এদ্বিরূপ অনুষ্ঠানাদি শেষ হলে আবার নেমে এসে সুভদ্রার রথে চড়ে ঐ রকম ক্রিয়াদি শেষ করে নেমে এসে নিজের পাকী চড়ে আবার

শোভাযাত্রা করে রাজবাড়ীতে ফিরে গেলেন। রাজা সাহেবের হাতের ঝাঁটা গাছটির কাঠিগুলি তামার, তাঁটা ও হাতলটি সোনার তৈয়ারী।

তারপর ক্রমে তিন রথে ৪টি করে কাঠের ঘোড়া বাঁধা হল। নারিকেল কাঠের সিঁড়িগুলি খুলে ফেলা হল। আর যা কিছু বাকী সব সেয়ে ফেলে বেলা ৪টা ৫টায় রথের তান আরম্ভ হলো; অবশ্য টানের পূর্বেই তিনখানা রথে খুব মোটা প্রকাণ্ড লম্বা ৪খানা করে দড়ি লাগানো হলো। সরকারী পুলিশের দল প্রত্যেক রথকে দড়ি দিয়ে ধিরে রাখলো। তিনখানি রথের সঙ্গে সঙ্গে চার্জের রইলেন ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও, এবং পুলিশ সুপার।

রথের উপর দাঁড়ানো লোকেরা কঁাসর ঘণ্টা বাজানো শুরু করলো, প্রথমে বলরামের রথে। তাদের ইঙ্গিত পেতেই যাত্রীরা বিপুল আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে রথটানা শুরু করলো। প্রথম রথখানি বেশ খানিক দূরে চলে গেলে স্তম্ভার রথ টানা শুরু হল। সেখানা কিছুটা ব্যবধানে গেলে সর্বশেষে জগন্নাথের রথটানা শুরু হলো। এই রথেই সবচেয়ে বেশী ভীড়। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র একযোগে নগ্নপদে রথটানা। সে দৃশ্য এক অতুলপূর্ণ বিস্ময়কর ব্যাপার। সামোর চূড়ান্ত

আদর্শ এই দৃশ্যে পরিমুগ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত “জয় জগন্নাথ” ধ্বনি রোমাঞ্চ এনে দেয় শরীরে।

এ বছর বিলম্বে রথ টানা শুরু হয়েছিল বলে, ৩খানি রথ পথের মধ্যেই এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। কারণ সন্ধ্যার পর টানা নিষেধ। পরদিন আবার বেলা ২টা ২৪টায় টানা আরম্ভ হয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই রথ গুণ্ডিচা বাড়ী পৌঁছে গেল। এর আগের বছরও নাকি এ রকম গোলমাল হয়েছিলো।

দশমীর দিন উল্টা রথ বা পুনর্ধাত্রা। সরকারী ব্যবস্থায় সেদিন সন্ধ্যার পূর্বেই রথ তিনখানা মন্দিরের সিংদরজায় এসে পৌঁছেছিল।

রথের দিন থেকে পুনর্ধাত্রার দিন পর্যন্ত মন্দির থেকে গুণ্ডিচা বাড়ী অবধি লোকের স্রোত চলতে থাকে। এসব ব্যাপার দেখে আমার মনে বেশ আনন্দ হয়েছে। ধাঁরা কখনও পুরীর রথ দেখেননি তাঁরা এসে দেখলে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পাবেন। উল্টা রথের ৫৬ দিন পর, ভীড় অনেকটা কমে গেলে আমরা একদিন এক্সপ্রেস গাড়ীতে কলকাতা গিয়ে সেখান থেকে, ই, আই, আরের গাড়ীতে আবার বোলপুর শান্তিনিকেতনে এসে হাজির।

শ্রীমা

শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

আজ আমি যার কথা বলবো, তিনি লীলাবতীর মত বিদ্রুপী ছিলেন না, রাণী দুর্গাবতীর মত যুদ্ধে অংশগ্রহণনাও করেননি। কিন্তু তাঁর ভগবৎপ্রেম আত্মত্যাগ ও চরিত্রের মাধুর্য এই দেশের মেয়েদের মধ্যে তাঁকে একটি বিশিষ্ট আসন দিয়েছে।

সারদা দেবী “শ্রীমা” নামে পরবর্তী জীবনে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। আমরা তাঁকে “শ্রীমা” বলেই বলবো, কারণ এই একটি ক্ষুদ্র কথায় তাঁর স্নেহ, সেবা-পরায়ণতা ও পবিত্রতা যেমন পরিস্ফুট হোয়েছে তেমন আর কোন নামেই হয়তো হতো না। বস্তুতঃ তিনি সকলের কাছেই মাতৃরূপা ছিলেন। ইং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর শ্রীমা বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মার নাম শ্রীমতী। রামচন্দ্র সামান্য-বস্ত্রার গৃহস্থ ছিলেন, কয়েক বিঘা জমির ধান ও ক্রিয়া কর্ত্তে পৌরোহিত্য করে তিনি যা পেতেন তাহাতেই তাঁর কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ হতো। শ্রীমার আরো চারটি ভাই ছিলো। বাপ মায়ের সর্বপ্রথম সন্তান হিসাবে ভাইগুলিকে দেখা শোনা করা ছাড়াও তাঁকে সংসারের কাজ কর্ত্তে মাকে সাহায্য করতে হতো। এমন কি বর্ষার সময় জলে দাঁড়িয়ে গরুর ঘাসও তাঁকে কাটতে হতো। বাল্যকাল হতেই ঠাকুর দেবতায় তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিলো। এবং এই ভক্তি পরবর্তী জীবনের ঘটনার জন্য অনেক পরিমাণে তাঁকে প্রস্তুত করেছিলো।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পাঁচ বৎসর ছয় মাস বয়সে, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত শ্রীমার বিবাহ হয়। তখনকার দিনে হিন্দু সমাজে এই বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া কোনও অভাবনীয় ঘটনা নয়। যদিও রামকৃষ্ণ দেবের বয়স তখন তেইশ বৎসরেরও বেশী। বিবাহের অন্ত্যস্তান খুব সামান্য ভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল, কারণ হৃৎকেন্দ্রেই অবস্থা সচ্ছন্দ ছিল

না। বস্তুতঃ এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বৈরাগ্য ও বিষয়ে অনাসক্তি দেখেই তাঁর মা চন্দ্রা দেবী খুব অল্পকালের মধ্যেই বিবাহের আয়োজন করেন।

বিবাহের পর ১৮৫২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্রীমার বাপের বাড়ীতেই বেশী দিন কাটে। এর মধ্যে রামকৃষ্ণ দেব ২৪ বার কামার পুকুরে এসেছিলেন, জয়রাম বাটীতেও ২১ বার গিয়েছিলেন। কিন্তু সামান্য কয়েক দিনের বেশী শ্রীমার সঙ্গে তিনি থাকেননি। শ্রীমার যখন ১৪ বৎসর বয়স সেই সময় কামারপুকুরে শ্রীমার সঙ্গে তিনি মাস তিনেক ছিলেন। তখনই রামকৃষ্ণদেব তাঁকে ঈশ্বর ও ধর্ম জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দানে ব্রতী হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ দেবের ভগবৎ প্রেম ও মনের পবিত্রতা তাঁর বালিকা মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এর পরে প্রায় চার বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, বাপের বাড়ীতেই তাঁর দিন কাটছিলো। এই সময় রামকৃষ্ণ দেবের বৈরাগ্য ও ভাববিহ্বল অবস্থা এমন আকার ধারণ করেছিল যে সাধারণ লোক তাঁকে পাগল ছাড়া আর কিছু মনে কোরতো না। এই অখ্যাতি হৃদ্র পল্লী গ্রাম জয়রাম বাটীতেও পৌঁছেছিলো। শ্রীমার আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের লোক তাঁকে ককণার ঢেঁকে দেখতে লাগলো। এই অবস্থা শ্রীমার বেশী দিন সহ হোল না, কারণ তিনি ভালো কোয়েই জানতেন তাঁর স্বামী কী। অবশেষে গঙ্গাস্নান করার ছলে কতগুলি গ্রামের লোকের সঙ্গে ১৮ বৎসর বয়সে তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। এর পর রামকৃষ্ণদেব যতদিন বেঁচে ছিলেন, তত দিন তাঁর ও তাঁর ভক্তদের সেবায় তিনি আত্ম নয়োগ করলেন। এই সেবায় কোন দৈহিক কামনার স্থান ছিলো না, কারণ শুনেছি শ্রীমার দক্ষিণেশ্বর আসার কিছুদিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী রূপে তাঁকে দেখার আসনে বসিয়ে মাতৃভাবে ষোড়শোপচারে পূজা করেন। রামকৃষ্ণ দেবের কাছে তিনি ছিলেন মহামায়ার অংশ জগজ্জননীর প্রতাক।

সাধারণ জীলোকের পক্ষে এইরূপ অবস্থা সহজে মেনে নেওয়া খুবই কঠিন হোতো সন্দেহ নেই, কিন্তু ভগবান যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহধর্মিনী রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সাধারণ জীলোকের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না।

রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে এবং তাঁর নির্দেশমত শ্রীমাও গভীর ধর্মজীবন আরম্ভ করলেন। এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধা স্বাশুড়ীর সেবা ও রামকৃষ্ণদেব ও তাঁর শিষ্যদের জন্য ২ বেলা রান্না ও আহাৰ্য্য প্রস্তুত করার ভারও তাঁর উপর এসে পড়লো। এই সময় তাঁর দৈনন্দিন কাজ ছিলো রাত তিনটার সময় উঠে গঙ্গান্নান করে নহবৎথানায় তাঁর নির্দিষ্ট ঘরখানিতে বসে পূজা জপাদি সেয়ে নিয়ে গৃহস্থালীর কাজ ও স্বাশুড়ীর প্রাতঃকালীন সেবা শেষ করে রান্না আরম্ভ করা। বেলা দশটার আগে তাঁর মল খাবারের সময় হয়ে উঠতো না, তাও তিনি খেতেন একটু ফল আর মিছরীর সরবৎ। তারপর খুব যত্ন সহকারে রামকৃষ্ণ দেবের আহাৰ্য্য প্রস্তুত করে তিনি স্বামীর ঘরে তাঁকে খাওয়াতে যেতেন। শুধু দুবেলা আহাৰ্য্যের সময় ব্যতীত স্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হোতো না; কারণ, আর সব সময়েই রামকৃষ্ণ দেবের ঘরে লোক থাকতো। রামকৃষ্ণ দেবের আহাৰ্য্যের পর স্বাশুড়ী ও অন্যান্য অতিথিদের খাইয়ে তাঁর খেতে অনেকটা বেলা হয়ে যেত। খাবার পর একটু বিশ্রাম করে আবার তাঁকে রাজির জন্য আহারাদির ব্যবস্থা করতে হোতো। শুধু সন্ধ্যারতির সময় তিনি পূজাদি করবার কিছু সময় করে নিতেন। এই রকম ভাবেই ১৪ বৎসর কাটলো। এর মধ্যে খালি ২৩ বার তিনি জয়রামবাটিতে কিছু দিনের জন্য গিয়েছিলেন, এবং সেখানে একবার তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু স্বপ্নাধ্য ঔষধ লাভ করে তিনি আরোগ্য হন।

তারপর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলেন। গ্রামপুরুরের বাড়ীতে রামকৃষ্ণ দেবকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হোলো, প্রথমে শ্রীমাকে স্থানান্তরের জন্যে সেখানে আনা হয়নি, পরে রামকৃষ্ণ দেবের অল্পমতিক্রমে শ্রীমা সেখানে গিয়ে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে তাঁর স্থান করে নিলেন। কাশী-পুরের বাগান বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে আবার যখন স্থানান্তরিত

করা হোলো শ্রীমাও তাঁর সঙ্গে গেলেন। কিন্তু শ্রীমাও শিষ্যদের অক্লান্ত সেবা ও যত্ন সত্ত্বেও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসান ঘটল। শ্রীমাও খুব কাতর হোয়ে পড়লেন, কিন্তু কথিত আছে রামকৃষ্ণ দেব একাধিকবার এই সময়ে তাঁকে দেখা দিয়ে তাঁর শোক নিবারণ করেন। এমন কি শ্রীমাকে তাঁর হাতের বালাও খুলতে দেননি।

রামকৃষ্ণ দেবের দেহরক্ষার পর শ্রীমা কিছুদিন তীর্থ পর্যটন করেন। এরপর আর্থিক অবস্থা তাঁর এত অসচ্ছল হয়েছিল যে খাবারের জন্য তাঁকে মাটি খুঁড়ে মূলা সংগ্রহ কোরতে হোতো; কিন্তু কখনও কারুর কাছে এরজন্য তিনি নালাশ জানাননি। অবশেষে তাঁর এই দুর্দশার কথা জানতে পেরে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন ভক্ত শ্রীমার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন এবং মাসিক কিছু অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিলো। রামকৃষ্ণের মত শ্রীমারও ভাব সমাধি হতে লাগলো। কিন্তু এর পরেও তাঁর সর্ব কনিষ্ট ভ্রাতার মৃত্যুতে তাঁর ভ্রাতার সংসারের ভার তাঁর উপর এসে পড়ে। রাধু নামে মৃত ভ্রাতার একমাত্র কন্যাকে শ্রীমাই লালন পালন করেন। কারণ তাঁর ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী এই শোকে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই সব সাংসারিক গোলযোগ ও অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন কখনও ব্যাহত হয়নি। শেষজীবন তিনি জয়রাম বাটিতে অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময় অনেক লোক তাঁর কাছে মন্ত্র নিতে আসতো। রামকৃষ্ণদেব যে কয়টা মন্ত্র তাঁকে দিয়েছিলেন, তিনি ব্যক্তি বিশেষে সেই সব মন্ত্রের দীক্ষা দিতেন। তাঁর সামান্য অর্থ থেকে এই সব অভ্যাগতদের আহাৰ্য্যের ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হোতো। রামকৃষ্ণদেবের কোন কোন ভক্ত ২১ দিন জয়রামবাটিতে থেকে যখন চলে আসতেন, তখন শ্রীমা বাহিরে থেকে ছল ছল চোখে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতেন। জীবনে শেষ কয়েক বৎসর এইরূপ ভাবে অতিবাহিত করে ১৯২০ সালের ২৩ শে জুলাই প্রায় ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। শ্রীমার জীবন ঘটনাবলি নয়, কিন্তু নীরব আত্মত্যাগ ও পবিত্রতার যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন জগতের ইতিহাসে সেরূপ খুবই বিরল। এইরূপ সহধর্মিনী লাভ না করলে রামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক জীবন যে অনেক পরিমাণে বিপর্যস্ত হোতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং সেকথা স্বীকার করেছেন।

চম্বার বীর রাণী

—জাষ্টিস্ জি, ডি, খোসলা।

পূর্ব পঞ্জাবের সীমান্তদেশে চম্বা নামে একটি ছোট দেশীয় রাজ্য। কাশ্মীরের বর্তমান দিনের ঘটনাবলী চম্বাকে অনেকটা প্রসিক্ত করে তুলেছে। শতাধিক মাইল জুড়ে এই দুই রাজ্যের একই সীমারেখা এবং বর্তমান দিনে চম্বা রাজ্যের সেনা কাশ্মীরে স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করছে।

এই রাজ্যের রাজধানী চম্বা ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত এবং সাগরবক্ষ থেকে মাত্র ৩০০০ মাইল উঁচু। এখানকার আবহাওয়া মৃদু এবং স্বাস্থ্যকর। প্রকৃতি অক্লপণ হাতে দান করে চম্বাকে সুন্দর করেছেন। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর এবং লোকে বলে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দরী এদেশের মেয়েরা।

ঐতিহাসিক এবং কল্পনাশ্রিয় (রমন্তাসপ্রিয়) মানুষের কাছে চম্বার আর একটি আকর্ষণ আছে। তাদের কাছে চম্বা তার প্রথম রাণী নেনা দেবীর চোখের জল এবং দুঃখের প্রতীক। নেনা দেবী তাঁর দেশের লোককে ভালবেসে তাদের জন্ত তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

ইতিহাসে জানা যায় প্রায় হাজার বছর আগে রাজা সাহিল বর্ম্মা চম্বা সহরটির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দশটি বীর ও যোদ্ধা ছেলে ছিল। তারপর তাঁর একটি ফুলের মত কোমল এবং পবিত্র মেয়ে জন্মায়। তার নাম রাখা হয় চম্পাবতী। মেয়েটি বড় হয়ে উঠলো। তখন তার রূপ এবং সাহসের খ্যাতি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো। চম্পাবতী তাঁর বাপের গৰ্ভ অভিযানে সঙ্গী হতেন এবং ভ্রাতৃদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন।

যেদিন সাহিল বর্ম্মা স্থানীয় রাজাদের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধের পর ইরাবতী উপত্যকায় প্রবেশ করলেন, সেদিন চম্পা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিতার পাশে উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতস্বতী নদীর ধারে সবুজ উপত্যকার সৌন্দর্য্য দেখে চম্পাবতী জায়গাটিকে ভালবেসে ফেললেন এবং তাঁর পিতাকে তাঁদের রাজধানী সেখানে স্থির করে আনার জন্ত অনুরোধ করলেন। রাজা সম্মত হলেন এবং তাঁর লোকদের সেই উপত্যকার মালিক ব্রাহ্মণদের

সঙ্গে কথা বলতে পাঠালেন। ব্রাহ্মণদের সরানো সহজ হলো না। তারাও দুর্দান্ত ছিল। তাঁরা রাজার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল এবং তাদের সন্তের বিনিময়ে বহু অস্ত্র ও অসঙ্গত দাবী করতে লাগলো। রাজগুরু চরপতনাথ শেষ পর্যন্ত মধ্যস্থতা করে এই সমস্তার সমাধান করলেন। ব্রাহ্মণরা অসন্তুষ্ট চিত্তে নানা প্রতিবাদ জানিয়ে শেষ পর্যন্ত জায়গা ছেড়ে ছিল এবং বহু মহামূল্য উপহার নিয়ে রাজপ্রদত্ত অস্ত্র একটি ভাল জায়গায় গিয়ে বসবাস শুরু করলো।

রাজার কন্যার নামানুসারে রাজধানীর নাম চম্পা রাখা হলো এবং প্রাসাদ ও অস্ত্রাগার গৃহ নির্মাণ তখনই শুরু হলো। জল সরবরাহ কিন্তু একটি বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। ইরাবতী নদী সহরের জমি থেকে প্রায় একশ ফিটের নীচে প্রবাহিত ছিল, তাই মেয়েদের বড় বড় কলসী নিয়ে নদীর এই খাড়া পাড় ভেঙ্গে উঠতে খুবই কষ্ট হতো। রাজা তখন তাঁর অহুচরদের কাছাকাছি কোন জলের উৎস আছে কিনা, অনুসন্ধান পাঠালেন। রাজধানীর উপরে চার হাজার ফিট উঁচু শা-মহাধর পর্ব্বতের মধ্যে তারা সর্বোত্তম উৎসের সন্ধান পেলো। তার বিরাট জল প্রবাহ চম্বার পেছনের উপত্যকায় এসে পড়েছে। রাজার পূর্ব্ববিশারদরা জানালেন যে একটি খাল কেটে উৎসের জল সহরে আনা খুবই সহজ হবে। উৎসের জল ধরবার ও রাখার জন্ত বড় বড় দীঘি ও পুকুরিণী কাটান হলো। যখন সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলো, তখন পূর্ব্ববিশারদরা উৎসের মুখে গেলেন, খালের সঙ্গে তার যোগসাধন করার জন্ত। তাহলেই রাজার প্রজারা দরজার গোড়ায় বসে জল সরবরাহ পেতে পারবে।

কিন্তু এইবারে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটলো। রাজার তৈরী খালের মধ্যে উৎসের জলধারাকে কিছুতেই আনা গেলো না। খালের মুখ যেই খুলে দেওয়া হলো, অমনি কি এক আশ্চর্য্য শক্তির প্রভাবে আদি উৎসের জলপ্রবাহ কয়েক ফিট

দূরে সরে গেলো এবং আগেকার মতই নীচের উপত্যকার দিকে বইতে লগেলো। বারবার উৎসকে পুরাতন খাতে আনবার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু কোন কাজ হলো না। যতবারই জলধারাকে খালের মধ্যে আনার চেষ্টা করা হলো, ততবারই তা সরে যেতে লাগলো।

পূর্তি বিশারদরা নিরুপায় হয়ে পড়লেন। রাজাও হতাশ হয়ে গেলেন; রাণী ও রাজপুত্রেরা মর্শাহত, কিন্তু কোন উপায়ই খুঁজে পাওয়া গেল না। একটা অজানিত ভয় প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং ক্রমেই রাজার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের ভাব তাদের মধ্যে জেগে উঠলো। তারা এই অভিশপ্ত জায়গায় আসার জন্ত এবং ব্রাহ্মণদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্ত রাজাকে দোষ দিতে লাগল—ব্রাহ্মণদের অধিকার কেড়ে নেওয়া পাপ। বৃদ্ধ দরজার অন্তরালে এই ধরণের অভিযোগপূর্ণ কথা শোনা গেলো এবং সুন্দরী চম্পাবতী সঙ্কেত ও নানা কথা কানাকানি হতে লাগলো।

জানি না এই সব হিংসাত্মক কথা বা অসত্য জনরব রাজার কানে পৌছল কিনা, কিন্তু এটা সত্য যে প্রতিদিনই রাজার হুর্ভাবনা ও মনোকষ্ট বেড়ে যেতে লাগলো। একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুগকর তাঁর নিশ্চিত খালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং সরোতা উৎসের জল খালের মধ্য দিয়ে প্রাসাদের দ্বারে এসে পড়েছে, এবং সেই জলে পুষ্করিণীগুলি ভরে উঠেছে। চরপতনাথ রাজাকে বলেন যে দেবতারাই তাঁর প্রচেষ্টার জন্ত তাঁকে পুরস্কৃত করবেন কিন্তু তার আগে পুরস্কারের যোগ্য মূল্য চান। রাজাকে তাঁর পুত্র অথবা তেমনি কোন অতি প্রিয় জনকে দেবতার কাছে উৎসর্গ করতে হবে। এর চেয়ে অল্প কোন ছোট দানে তাঁরা তৃপ্ত হবেন না।

সাহিল বর্মা তাঁর মনের সব কথা রাণীকে খুলে বলে, তাঁর ভালবাসার মধ্যে শান্তি পেতে চাইলেন। রাণী তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রজাদের জন্ত নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চাইলেন। রাজা তখন অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁর দিকে ফিরে চাইলেন এবং একথা মনের সোনেও স্থান দিতে চাইলেন না। তখন রাণী জোর করে বললেন, “নাথ, আমি ভালবাসা ও ভক্তির সঙ্গে

ভগবানের কাছে ও তোমার কাছে আমার ধর্ম পালন করছি। আমি তোমাকে দশটি পুত্র সম্ভান দিয়েছি এবং তাদের বীর যোদ্ধারূপে বড় করে তুলেছি। আমার নিজের আত্মার চেয়েও তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু এই মায়াজালের মধ্যে আমার দেহ শাস্ত হয়ে উঠেছে এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গি শান্তি কামনা করছে। তোমার এবং আমার পুত্রের স্থানে আমাকে যেতে দাও, গুরুদেব বলেছেন আমার মৃত্যু হলেই এই অভিশাপ দূর হবে।”

সাহিল বর্মা নীরব হয়ে রইলেন। তিনি অন্তরে তাঁর পত্নীপ্রেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধলেন। রাণী তাঁর কাছে আবেদন করতে লাগলেন ও তাঁকে বোঝাতে লাগলেন। তিনি রাজাকে জান্নালার ধারে নিয়ে গিয়ে দেখালেন জলের জন্ত নদীর ধারের দীর্ঘ, কষ্টকর পথ বেয়ে পিঁপড়ের সারির মত স্ত্রী ও পুরুষের সারির কালো রেখা চলেছে।

রাণী বললেন, “দেখো, এক ফোঁটা জলের জন্ত মানুষ কত কষ্ট করছে। তুমি ইচ্ছে করলেই আগামীকাল সরোতা উৎসের জলের ধারা তোমার প্রাসাদের দুয়ারে এসে পৌছবে। প্রজারা তখন তোমাকে ও তোমার পুত্র যুগকরকে কত আশীর্বাদ করবে।”

সাহিল বর্মা শিশুর মত ক্রন্দন করছিলেন; কিন্তু তাঁর কাঁধের উপর থেকে একটা গুরুভার যেন নেমে গেল, তিনি অশ্রুধোত মুখ তুলে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর দিকে তাকালেন; দেখলেন তাঁর দশটি পুত্রের মাতা আত্মবলিদানের আনন্দে মহিমাষিত হয়ে উঠেছেন, রাজা নিজের ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। তিনি অশ্রুট স্বরে যা বললেন তা প্রায় শোনা গেলনা।

“ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।”

রাণীর এই সঙ্কল্পের কথা দ্রুতগতিতে সহরে ছড়িয়ে পড়লো এবং প্রজাদের মধ্যে একটা গভীর শোকের ছায়া ঘনিয়ে এল। কঠিন হৃদয় এক মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং গভ বারো মাসের জমাকরা মানুষের মনের সব তিক্তভাব দূর হয়ে গেলো। চম্পা বাসীরা জল আসার সম্ভাবনায় আনন্দিত হলো। কিন্তু তারা তাদের রাণীকে জলের চেয়েও বেশী ভালবাসতো; কিন্তু তারা একথাও জানতো যে রাণী একবার যে সঙ্কল্প করেছেন, কোন কিছুই তাঁকে সে সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

রাণী সমস্ত রাজি উপবাস করে প্রার্থনার কাটালেন এবং স্বর্ঘ্যোদয়ের একঘণ্টা আগে তাঁর বিবাহের বেশ পরিধান করলেন। প্রাসাদের এদিকে ওদিকে আলো জ্বল উঠতে লাগলো এবং রাণীর মহল থেকে মন্ত্রপাঠ শোনা যেতে লাগলো, পুরোহিতেরা প্রভাত বন্দনা গাইতে আরম্ভ করলো।

শীঘ্রই একদল মাতৃঘ প্রাসাদের দ্বার দিয়ে বের হয়ে শা—মহাধরের দিকে যাত্রা করলো, নেনাদেবী অনবগুপ্তিত মন্তকে সযার আগে চললেন, তাঁর পেছনে তাঁর চারজন সহচরী একটানা সুরে মন্ত্রপাঠ করতে করতে অতুসরণ করলেন।

পাহাড়ের অন্ধক পথ উঠে রাণী খেমে গিছন ফিরে চাইলেন। তিনি দেখতে পেলেন দূরে পাহাড়ের চূড়া যেন আরও আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি অলক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার নীরবে উঠতে লাগলেন। তিনি এত ক্ষতবেগে চলতে লাগলেন যে তাঁর সহচরীরা অতিকষ্টে তাঁকে অনুসরণ করতে পারছিল।

যখন উৎসের মুখের কাছে তাঁরা এসে পৌছলেন, তখন দেখতে পেলেন রাজার সৈন্তেরা তাদের রাণীর জন্য একটি সমাধি রচনা করে রেখেছে এবং তাঁর শেষ আশ্রয়দানের জন্ত সব ব্যবস্থাই প্রস্তুত আছে। তিনি সেই গহ্বরের দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং হাত জোড় করে জীবনের কাছে শেষবারের মত তাঁর অর্থা নিবেদন করলেন এবং চরপতনা

তাঁর শরীরে শান্তি বারি ছড়িয়ে দিলেন। এক মুহূর্তের জন্য রাণীর মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো, তারপরই তাঁর শরীর নিশ্চন্দ্র খেত পাথরের মূর্তির মত মনে হলো; সৈন্তেরা তখন রাণীর সমাধি মাটি দিয়ে ভরিয়ে দিলে।

যেই দেবতাদের মূল্যদান হলো তখনি অভিশাপ দ্বর হয়ে গেলো এবং চম্পাবাসীরা যে অস্তুত ঘটনা দেখবে বলে মনে করেছিল তা তারা দেখতে পেলো। পাহাড়ের উপরে রাণীর সমাধির ধারে খানিকটা মাটি ভিক্ষে উঠলো এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফোটা ফোটা জল বেয়ে রাজার তৈরী খালের মধ্যে পড়তে লাগলো। ছবটার মধ্যেই ক্ষীণ জলধারা প্রাসাদের পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগলো এবং সন্ধ্যার মধ্যেই উৎসের জলধারা খাল এবং পুষ্করিণীগুলি ভরে ফেললো।

অতীত এক হাজার বছর ধরে রাণীর জীবনের বিনিময়ে ক্রীত জলধারা চম্বার ভূমি মিটিয়েছে। রাণীর আত্মোৎসর্গের স্মরণে প্রতি বছর চৈত্রমাসে চম্বা সহরে “সুজি মেলা” নামে একটি মেলা হয়। লোকেরা রাণীর পুণ্য কথা গান করে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বসন্তের ফুল উৎসর্গ করে। চম্বার যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করলে সে সুজি-মেলায় কথা বলবে এবং সে আরও বলবে যে কোন কারণেই এমন কি রাজপরিবারে মৃত্যু হলেও সুজিমেলায় উৎসব কখন বন্ধ থাকে না।

(বোম্বাইয়ের India পত্রিকা হইতে শ্রীআরতি দত্ত কর্তৃক অনূদিত)।

ভারতের কর্তব্য

শ্রীমৎ স্বামী ধর্মানন্দ ভাবসাগর

সাম্প্রদায়িকতার তীব্র বিষ জাতি-সমূহের মধ্যে স্বকৌশলে প্রবেশ করাইয়া দিয়া যেমন দেশের মধ্যে মারারি কাটাকাটি লুণ্ঠন ধ্বংস ও হিংসাদেব প্রভৃতি দ্বারা জাতি সমূহকে ধ্বংস সাধন করিবার উপায় বিধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে—প্রাদেশিকতার তীব্র বিষও তেমনি ভারতের জনগণের মনে কৌশলে প্রবেশ করাইয়া দিয়া জাতিকে ধ্বংস করিবার আর একটি প্রশস্ত পথ নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ভারতে যদি প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক থাকিত তবে ইহার প্রতিকারের একটি উপায় বিধানও নিশ্চয়ই হইত। এখন দেখিতেছি যে প্রকৃত রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও ভারতে কাহারও নাই। নহিলে ইচ্ছা করিয়া ক্রমাগত এত ভুল কি কখন রাজনীতিবিদগণ করিতে পারেন? আমাদের ভারতীয় রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ যে কিরূপ ভুল পথে চলিয়াছেন তাহা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির রাজনৈতিকগণ এমন কি সমুদয় বৃটিশ রাজনৈতিকগণ পর্যন্ত বেশ বুঝিতে পারিয়া ভাগের প্রথমাবস্থাতেই বেশ একটু রহস্যজনক ভাষায় ভারতের রাজনীতি জ্ঞানকে বিক্রপ করিয়াছেন। যথা, “এতদ্বারা ভারতের রাজনীতি জ্ঞানের জয় ঘোষণা করিতেছে” অর্থাৎ প্রকারান্তরে এক প্রকার রাজনৈতিক মূর্থতাই বলা হইয়াছে। তখনই ইহার স্মরণীয় তাৎপর্য্য ভারতের রাজনৈতিক পণ্ডিতগণকে একটু বুঝিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম। বিলাতের ডেইলী হেরাল্ড নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক মিঃ পামো দত্ত এবং রাশিয়ার প্রভাঙ্গা সম্পাদকও ইহা বুঝাইবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জুর্ভাগ্যক্রমে উহা সমস্তই বিফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাক তখন একবার বাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মাছুষ ভুল করে কতবার? চিরকাল ভুল করিলে তার প্রতিফলও পাইতে হয়। জাতীয় গবর্নমেন্টের কার্যকলাপ দৃষ্টে এখন জনগণের মনে তাঁহাদেয় সম্বন্ধে বেশ একটু সন্দেহের উদয় হইয়াছে, হইবারই কথা। তাই বলি

এখনও সময় থাকিতে ভুল সংশোধনের একটু চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যিক। অজ্ঞান ভুলের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখানে আমি কেবল একটা বিশেষ ভুলের কথাই মাত্র বলিব। বৃটিশ গবর্নমেন্ট তাহার রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে ভারত শাসন পদ্ধতিতে নানাপ্রকার অপকৌশল প্রয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু এখন তো আর সে বৃটিশ নাই; তবে আর সেই চিরচরিত তেপূরণ বস্তাপচা পুতিগন্ধ ময় অনিষ্টকারী রদ্বি জিনিষগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার আবশ্যক কি? যাহাতে দেশের অনিষ্ট হয় তাহা এখন অতি শীঘ্র ত্যাগ করাই কর্তব্য। ভারতের কোন কোন প্রদেশের সম্পূর্ণাংশ এবং কোন কোন প্রদেশের অধিকাংশ ছেদন করিয়া ভারতকে বিকলাঙ্গ ত' করা হইয়াছেই অধিকন্তু দুইটা প্রধান জাতির মধ্যে প্রবল গৃহ বিবাদের প্রশস্ত পথও নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রদেশে প্রদেশে যেমন স্বার্থপরতা ও মনোমালিন্য দেখা দিয়াছে তাহাতে এখন আর প্রদেশ বিভাগ রাখা কোনও মতেই সঙ্গত নহে। ছিন্নাবশিষ্ট ভারত এখন কেবল ভারত নামেই অভিহিত হউক। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ইউ পি, সি পি, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রাদেশিক নামগুলি ত্যাগ করা হউক। তবে এই সমগ্র ভারত শাসনের স্ববিধার্থে ইহাকে উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত, পশ্চিম ভারত ও মধ্য ভারত নামে পাঁচটা ভাগে বিভক্ত করিয়া পাঁচটা মন্ত্রী সভার নেতৃত্বে ইহার শাসন কার্য পরিচালিত করা হউক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা যেমন আছে তেমনি থাক। আর যেহেতু গবর্নরের পোষ্টগুলি এখন রাখিবার কোন আবশ্যকতাই নাই, সুতরাং উহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়াই হউক। তারপর সমস্ত দেশের জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দিয়া ৪ বর্গ মাইল হইতে ৫ বর্গ মাইল পর্যন্ত স্থান লইয়া একটা মৌজা স্থির করিয়া সমস্ত দেশে যতগুলি মৌজা হয় উহার প্রত্যেকটিতে মৌজাদার নামে একজন করিয়া প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাহার অধীনে অন্যান্য কর্মচারী

ও পাইকসমূহ নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাদের কার্য সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। বর্তমানে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, এডুকেশন বোর্ড প্রভৃতি যতগুলি বোর্ড নামক প্রতিষ্ঠান আছে তাহা সমস্তই উঠাইয়া দিতে হইবে। কারণ পুরা স্বায়ত্ত শাসন লাভের পর আর কিঞ্চিৎ স্বায়ত্ত শাসন ভিদ্ধার কোন মূল্যই নাই। বরং উহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত মর্যাদা হানিকর ও অনিষ্টজনক। সুতরাং এই গুলির পরিবর্তে এই জাতীয় গভর্নমেন্টের কার্য বিভাগগুলির সহিত আর একটি বিভাগ জুড়িয়া দিতে হইবে, তাহার নাম হইবে “ইমপ্রুভমেন্ট।” তারপর সর্বপ্রকার ট্যাক্স হইতে দেশবাসী জনগণকে মুক্তি দিতে হইবে। কেবল মাত্র ইমপ্রুভমেন্ট ট্যাক্স আদায় হইবে। এই ট্যাক্স অবশ্য আয়ের তারতম্যানুসারেই কম বেশী হইবে। ইহা ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যাদির উপর যেমন ট্যাক্স চলিতেছে তেমন চলিবে। জমির ভাল মন্দে তারতম্যানুসারে জমির খাজনা কম বেশী করিয়া ধার্য করিতে হইবে। সেস্ ও রিভালুয়েশন নামক বস্তুগুলি বিলোপ করিতে হইবে। মোজা বিভাগ প্রথায় দেশের শাসন সংরক্ষণের উপায় বিধান করিলে মামুলী থানা পুলিশ রাখিবার কোন আবশ্যকই নাই। মোজাদার দারোগার কাজ করিবে এবং অন্যান্য কর্মচারী তার সহকারীর কাজ করিবে আর পাইকগণ পুলিশের কাজ করিবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক মোজায় “সেচ্ছাসেবক” নামে কতকগুলি অতি সচ্চরিত্র লোক উপযুক্ত প্রণালীতে সুশিক্ষিত করিয়া দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সাহায্যের জন্য গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকারে বর্তমান ভারত প্রাদেশিকতা মুক্ত হইয়া এক অখণ্ড দেশে পরিণত হইয়া জগতে একটি আদর্শ রাজ্য স্থাপিত করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষণে কেহ কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন তাহা হইলে রাষ্ট্রের কাজ কর্ম চলিবার জন্য কোন ভাষা গ্রহণ করা হইবে? ইহার মীমাংসা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে করিতে হইবে। ভাষা সম্বন্ধে সর্বসাধারণকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দিতে হইবে। অর্থাৎ কেরকটি সমৃদ্ধ সম্পন্ন নির্দিষ্ট ভাষার মধ্যে যাহার যে ভাষা ইচ্ছা শিক্ষা করিয়া রাজ কার্য করিতে পারিবে। এখানে একটি প্রশ্ন আসিতে পারে এই যে কোন ভাষার লোক কতজন গ্রহণ করা

হইবে? ইহার মীমাংসা নিম্নোক্ত প্রণালীতে করিতে হইবে। ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত যাহারা শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারাই কোন ভাষায় কতজন? আই, এ পর্যন্ত যাহারা শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারাই কোন ভাষায় কতজন? আই, এস-সি, পর্যন্ত যাহারা শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারাই কোন ভাষায় কতজন? বি, এ, পর্যন্ত যাহারা শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারাই কোন কোন ভাষায় কতজন? বি, এস-সি, পর্যন্ত যাহারা শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারাই কোন ভাষায় কতজন? ইত্যাদি পদ্ধতিতে শিক্ষিত জনগণের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া তারপর সংখ্যানুপাতে তাহাদিগকে রাজকার্যে নিযুক্ত করা হইবে। উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণকে আন্তর্জাতিক ইংরেজীভাষা বাধ্যতামূলকভাবেই শিক্ষা করিতে হইবে। বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরাজী ভাষাকে ত্যাগ করা কখনই কর্তব্য নহে। ইংরাজী ভাষা জানা থাকিলে পৃথিবীর অসংখ্য দেশে প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম করার সুবিধা হইবে। ইহা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভাষা যত শিক্ষা করা যায় ততই ভাল। এখানে ভাষাগত বিভেদ দূর করিবার একটা প্রাথমিক কৌশল ভারতবাসীকে তথা ভারতের জাতীয় গভর্নমেন্টকে গ্রহণ করিতে বলি। ভারতের সমস্ত ভাষা, বিশেষতঃ উচ্চ-স্তরের ভাষা এক প্রকার হরপেই লেখা কর্তব্য। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যে সংস্কৃত হরপ বা দেবনাগরী হরপেই লেখা সমূহ চলিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু উক্ত হরপগুলি লেখার মধ্যে অনেক কিছু জটিলতা আছে। সে সম্বন্ধে পরে প্রয়োজন হইলে বিচার করা যাইবে। এক্ষণে সর্বপ্রকার অবস্থা দৃষ্টে বাঙ্গালা হরপকেই খুব সহজ ও সরল বলিয়া ধারণা হয়। সুতরাং এই হরপকেই ভারতের সমস্ত ভাষার হরপ বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। আমি নিজে বাঙ্গালী বলিয়া এই কথা বলিতেছি ইহা যদি কেহ মনে করিয়া বলেন তবে তিনি আশার প্রতি খোর অবিচারমূলক কাজ করিয়া বসিবেন। কারণ আমিও প্রথমে বেহেতু সংস্কৃত ভাষাই ভারতের প্রায় সকল ভাষার মূল এবং সংস্কৃত ভাষার হরপ দেব নাগরী সেই-হেতু সংস্কৃত বা দেবনাগরী হরপকেই এই কার্যে প্রয়োগ করিতে উৎসুক হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে বাঙ্গালা হরপের সহজ সরল আকৃতি সমূহ আমার

মতকে বিধা বিভক্ত করে। তখন আমি পাশাপাশি এই দুই প্রকার হরণ স্থাপন করিয়া বিচার করিতে থাকি। এই প্রকারে আমার ভ্রান্তি অপনোদিত হয়। এবং বাদলা হরণকেই এই কার্যে প্রয়োগ করা সঙ্গত মনে করি। সুতরাং আশাকরি ভারতের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ আমার এই প্রস্তাব সহৃদয়তার সহিত বিচার করিয়া গ্রহণ করিবেন। আর যদি কেহ কোন নূতন হরণ, বাহা খুব সহজ সরল ও সুদৃশ্য, আবিষ্কার করিতে পারেন তবে তাহাও গ্রহণ করা চলিতে পারে। অবশেষে আর একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করি। উহা এই, কয়েকটি মৌজা লইয়া একটি সদর ও কয়েকটি সদর লইয়া

একটি মহকুমা গঠিত করিতে হইবে। বর্তমান জেলাগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে। এই প্রকারে শাসন সংরক্ষণ প্রণালীকে খুব সহজ সরল করিয়া লইতে হইবে। এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করিবার ইচ্ছা থাকিল। এখানে শুধু এই কথাটা বলিয়া রাখি যে আমাদের দেশের জন সাধারণ যেমন দরিদ্র তাহাতে এই দেশের মন্ত্রীমণ্ডলী হইতে সমস্ত কর্মচারীগণকেই তেমনি অল্প বেতন গ্রহণ করিয়া দরিদ্রের মতই বাস করিতে হইবে। তাহা হইলে জন সাধারণ তাহাদের লোকজনকে শুভাঙ্ক্ষায়াই বলিয়া মনে করিবার জায় সম্ভব কারণ খুঁজিয়া পাইবে। ইতি—

শ্রীমতঃ পুণ্ডরীকাক্ষ

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

ক্ষণতরে মুখ ফিরালে অন্ধকার,
চির জনমের সাক্ষী শরণ

সুহৃদ হে আমার।

তুমি প্রীত রও, রহি যেন তব প্রিয়,
ভুলিলে শান্তি তুমি নিজ হাতে দিও,

যেন ঘাইনাকো কখনো তোমার

স্নেহ দৃষ্টির বার।

২

বিশ্ব বিমুখ তুমি মুখ ফিরাইলে

স্থলে জলে বিশ্ব, বিশ্বের বীজাঙ্ঘ

ছড়ায় মন্দানিলে।

তোমার দৃষ্টি পরশ যাহাতে নাই
রিক্ত ব্যর্থ জীর্ণ স্নগ্য তাই।

কোথা সাফল্য কোথা লাভণ্য ?

কুৎসিত চারিধার।

৩

বন্ধু বৈরী, ফুল কণ্টক হয়।

মধুও তিক্ত বিজয় মাল্যে

সর্প জড়ায়ে রয়।

তুমি যেই হাস ভুবন হাসিতে থাকে,

আত্মীয়তা ও উৎসব সদা ডাকে

নিম্নকও আনে পঙ্ক ছাড়িয়া—

পঙ্কজ ভারে ভার।

পথের ধূলায়

ক্রীতীতিময়ী কর

পরদিন চিন্ময়ের প্রভাত হইল ট্রেনে। একটা বেক্সি হাতলের উপর পা তুলিয়া দিয়া শুক হইয়া শুইয়া শুইয়া সে ভাবিতে লাগিল, এই যে একটা আকস্মিক ঘটনা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া গেল, কতদূর অনন্তোপায় হইয়া সে তাহার সহিত জড়িত হইয়াছে। নিজে সে ইহার জন্ত কতখানি দায়ী।

স্নেহময়ী মায়ের মনে দারুণ আঘাত, গ্রামের লোকের নিন্দা, বন্ধুদের কাছে লজ্জা, এবং নিজের জীবন পথের এমন অভাবনীয় পরিবর্তনের চিন্তা তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া—একটা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে লাগিল।

পূর্ণ গতিতে ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু চিন্ময়ের মনে হইতেছে যেন তাহার গন্তব্য স্থান কলিকাতা নয়, সে যেন কোন অজানিত অপরিচিত এক মায়াপুরীতে পথভ্রষ্ট লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; আর হাতছানি দিয়া ভাকিতে ডাকিতে তাহার আগে আগে ছুটিয়া চলিয়াছে যেন কোন অপরিচিত সমস্তাসঙ্কুল জীবন।

চিন্ময় ভাবিতে লাগিল আজ যে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার পথের বাঁক ফিরিয়া গেল, ইহার জন্ত তাহাকে কতখানি হারাইতে হইবে? যৌবনের প্রারম্ভ হইতে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার সেই প্রবল বাসনা, জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের মুক্তি সাধনায় অস্ত্রায় অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সেই একান্ত আগ্রহ, আর কি সে নিজের মধ্যে তেমন অটল করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে? অদূর ভবিষ্যতে—তাহাকে অন্ন বস্ত্র ও গৃহস্থালীর সংস্থানের জন্ত দাসত্বের নিকট হস্ত আত্ম বিক্রম করিতে হইবে?

এজন্ত সে প্রস্তুত ছিল না। কোন আয়োজনই ত সে করে নাই ইহার জন্ত? তবে তাহার চির দিনের

দেবতার পূজায় ব্যাঘাত ঘটাইয়া নবগত এ অতিথির সম্মান সে কি করিয়া করিবে? চিন্ময়ের মন বার বার অস্থির ও উন্মনা হইয়া উঠিতে লাগিল।

...কিন্তু উপায়ই বা কি? অলকা যে কঠিন শৃঙ্খল তাহার পায়ে পরাইয়া দিয়াছে। সে শৃঙ্খল কেমন করিয়া সে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়ত সহজ কিন্তু তাহার জীবনের ভার কে বহিবে? আজ যে অলকা শত স্নেহবন্ধন, আজন্মের গৃহ, লোকনিন্দা, সমস্তই ভুচ্ছ করিয়াছে, শুধু তাহারই সঙ্গিনী হইবার জন্ত, কেমন করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিবে নিদারুণ আত্মহত্যার গভীর গহ্বরে? তাহার সেই মর্ম্মস্তন অশ্রুজলের প্রাহ তাহার সেই অভিষাপদগ্ধ শেষ দীর্ঘনিঃশ্বাসের আশ্রণ আমরণ চিন্ময়ের আত্মাকে কি ঘিরিয়া রহিবে না? অন্তরের দরবারে জবাবদিহি ত তাহাকেই করিতে হইবে।

চঞ্চল হইয়া সে উঠিয়া বসিল। জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল নবরূপ প্রভা চারিদিকের গাছপালা মাঠ পথের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাখীর কণ্ঠে নূতন স্বর। সবুজ বনের ঝোপে ঝোপে ফুটিয়াছে নূতন বুনো ফুল। রেল লাইনের ধারে পুকুর ঘটে গ্রামের এক নূতন বধু ঘোমটা তুলিয়া চাহিয়া আছে।

চিন্ময়ের চিন্তে ধ্বনিয়া উঠিল এক নূতন স্বরের রেশ। অবসাদের মেঘ ঠেলিয়া ফুটিয়া উঠিল উৎসাহের ক্ষীণ আলো রেখা। তাহার মনে হইল, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ত সে হইবে। কিন্তু সত্য ভ্রষ্ট হইবে কি? সত্য কি এমন কোন নির্দিষ্ট নিয়মের শৃঙ্খল দিয়া বাঁধা? অলকার মত এমন একটা নারাজীবন নীন সমাজের পায়ে বলি দেওয়া হইতে রক্ষা করিতে গিয়া তাহাকে সর্ব্বশ্রম ত্যাগের চাপ হস্ত ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু একটা সাফল্যময় সত্য পালনের আত্ম প্রসাদ কি আসিবে না?

ষতীশের সহিত পরের ট্রেনেই হয়ত অলকা

আসিতেছে। চিন্ময়ের মানস চক্ষুতে ভাসিয়া উঠিল তাহার পদ প্রান্তে গুলু হ'খানি অসহায় বাহুলতা। নব বর্ষার নীল মেঘের মত বিজুরির বালক মিশান হুইট জল ভরা চক্ষু।

ব্যথার ভারে চিন্ময়ের মন টন টন করিয়া ওঠে। সেই সঙ্গে বুঝি লাগে কোন্ সোনার তুলির সন্মোহনী স্পর্শ। আত্ম অল্পশাসিত হৃদয়ের চির বৃহত্তম শত বসন্ত আজ কি জাগিয়া উঠিতে চাহে? অলকা,—কে জানিত, সেই চির পরিচিত অলকা! এতদিন, তাহারই পূজার উপচার রূপে আপনাকে প্রস্তুত পদ্মের মত ফুটাইয়া রাখিয়াছিল? রহস্যময় এই সংসার, অপূর্ব দুর্জয়ের এই মানব চিত্তলোক! চিন্ময় সহসা আজ নিজের মনের কাছে এক নূতন প্রশ্ন করিয়া বসিল। এতদিন একা অলকাই কি শুধু তাহাকে ভাল বাসিয়া আসিয়াছে? সে কি বাসে নাই?

পূব আকাশের প্রভাতী রক্তরাগ, ট্রেনের গতিতে পরিবর্তনশীল বনানীর বিচিত্র ভঙ্গি, ঝোপ ঝাপের মাথায় মাথায় অরুণোজ্জ্বল স্বর্ণলতার দোলন সবই চিন্ময়ের মনে কবির ভাষায় গাহিতে লাগিল—

ওরে সাবধানী পথিক!

বায়ের পথ ভুলে মর ফিরে!

চিন্ময়ের জীবনের নূতন ঘটনা শুনিয়া সেদিন সমস্ত মেসখানা যেরূপ অস্বাভাবিক ধমধমে ভাব ধারণ করিল কিছু দিন পূর্বে পুলিশের হানাতেও বোধ হয় সেরূপ হয় নাই। কেহ গুম হইয়া চূপ করিয়া রহিল। কেহ ইংরাজীতে মন্তব্য করিল, ‘অত্যন্ত অল্পচিত অশোভন ব্যাপার।’ কেহ মনে মনে চিন্ময়ের সহিত জন্মের মত বন্ধুত্ব ত্যাগ করিল। কেহ বলিল—ঠিকই হয়েছে। পুরুষের মতই কাজ। সর্বনাশা সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে এমনি তেজী হওয়াই তো মরকার। সম্ভার অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল চিন্ময়। সতীশদা কাছে আসিয়া গায়ে হাত রাখিয়া কহিলেন—ভাইতো হে ভায়া, শেষকালে একটা রোমান্সের দ্বায়েই পড়ে গেলে? কিন্তু অত ঘাবড়াছো কেন? বীর সেই যে, যে কোন অবস্থায় শক্ত বোঝা মাথায় তুলে নিতে পারে।

কর্তব্যে কোন ক্রটি রহিল না। পরদিন সতীশদা সকলকে ডাকিয়া একত্র করিলেন। অনেক আলোচনা করিয়া স্থির

করা হইল, কেহ সাঁতরাগাছি হইতে তাহার মাকে আনিয়া, কেহ ভবানীপুর হইতে তাহার মামাতো বোনকে আনিয়া, কেহ কালীঘাট হইতে তাহার কাকার পুরোহিতকে ডাকিয়া আনিয়া বৈশাখের প্রথমমুহূর্তে চিন্ময় ও অলকার শুভ বিবাহ করা হইয়া দিবে। মেসের নিকটে একটা বাড়ী খালি ছিল, সেই খানাই ভাড়া লওয়া স্থির হইল।

বিবাহ হইল চিন্ময়ের নূতন ভাড়াটিয়া বাড়িতেই। সতীশের বড়দি এখানেই আসিলেন। চিন্ময়ের বন্ধুদের মা মাদীরাও আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিলেন। আড়ম্বর কিছুই হইল না। কিন্তু বন্ধু ও আগন্তুকদের আন্তরিক সহযোগিতা ও আনন্দ কলরবে সে অভাব পূর্ণ হইয়া গেল।

বিবাহের সময় সামান্য একটা কারণে সকলকে কেমন যেন একটু বিমর্ষ করিয়া ফেলিল। চির সঞ্চিত অলকা যেন কেমন ভীত সন্ত্রস্ত আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। শুভ-দৃষ্টির সময় অনেক সাধাসাধিতেও ভালো করিয়া চাহিতে পারিল না। তা ছাড়া মালা বদল করিবার সময় তাহার হাতটা এমন কাঁপিয়া গেল যে চিন্ময়ের গলায় পরাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে মালাটা কেমন করিয়া ছিড়িয়া খসিয়া পড়িয়া গেল। অলক্ষণের ভয়ে বড়দি বিচলিত হইলেন। সতীশদা চোঁচাইয়া কহিলেন, এসব হয়েছে কি? দোকানির ফেলা জিনিষ, আগে থেকে দেখে শুনে ঠিক করে রাখা হয়নি?

পাশে যাঁহারা ছিল ভাড়াভাড়া মালাটা আবার জুড়িয়া বাঁধিয়া দিল। দ্বিতীয় বারে মালা বদল সম্পূর্ণ হইল। মেয়েদের মধ্যে কেহ বলিল, এত বড় সেরানা মেয়ে এমন কেন? যেন কিছু জানে না বোঝে না। বড়দি কহিলেন, বাপ মা ছেড়ে একা নতুন বিদেশে এসেছে। বাছা ঘাবড়ে গেছে। তা হবে না? শুনলুম যে রাগারাগির বিয়ে। একজন তরুণী মাথায় অল্প ঘোমটা। টানিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল, তা কেন হবে? চেনা লোকে লজ্জা বেশী হয়। তাতেই ও-রকম হচ্ছে। নইলে ওকি আবার ঘাবড়াবার মেয়ে!

গ্রীষ্মের ছোট রাত্রি খাওয়া দাওয়ার গোলমাল মিটিতেই প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বাসর ঘরের নিভৃত অবসর মিলিল খুব অল্পই। তাহারই এক ফাঁকে চিন্ময় অলকাকে কহিল, বস্ত্রপূর যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিলুম, কি পুরস্কার দেব বলো?

—তবে আর কি? বেশ তো আছে। ওই পত্রিকাটা এবার তোমার নামে লিখে দেবো। ওটা তো আমরাই পরিচালনা করি।

—হঁ। যা বেশ আছে সে আমিই জানি।

অভিমানে অলকা আবার মুখ ভারী করিল।

—তা পাশের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে একটু আলোপ টালোপ করে নিলেই তো পারো।

—সেও হ'য়ে গেছে। অনেক বউ আছে। ওরা কেবল জিজ্ঞাসা করে আমাদের বিয়ে কি করে হ'ল? আর তুমি আমাকে কি বলো। আমি ব'সে-ব'সে কি উত্তর দেবো?

—ওই হলদে বাড়ীটায় কে থাকে জানো?

—হ্যাঁ জানি। একজন আশ্রমের সম্পাদিকা থাকেন।

ওঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগে। অনেক মেয়েরা ওঁর কাছে যায় দেখি।

—বেশ ত ওঁর কাছে গিয়ে ভাবটা ব'ক'রে নাও না। তুমি ত আর ও বিষয়ে ওস্তাদ কম নয়।

—গিয়েছিলাম একদিন। আবার যাবো। কিন্তু আমি কি শুধু বসে বই কাগজ পড়তে আর—পাড়ার লোকের সঙ্গে ভাব করতে এখানে এসেছি না কি?

অলকার অভিমানহত মুখের দিকে চাহিয়া চিন্ময় কহিল, পরীক্ষা আজই তো শেষ হয়েছে। তাই ত একটু সময় পেয়েছি। ও বাড়ীতে আমার সব কিছু রয়েছে। টেনে হিঁচড়ে এনে কি লাভ? সেইজন্তেই পড়াশুনা ওখানে বসেই করতুম। কিন্তু অলি, তুমি এমন আশু চলেতে পার, তা' ত জানতুম না। বিয়ে হ'লে মানুষ এমনই হয় না কি? আগে তোমার আসার লাড়ী পেলে আমাদের সমস্ত বাড়ীটা যে কথা বলে উঠত।

—হয় কি না হয়, সে ত' দেখতেই পেলো। কিন্তু এবার বল, তুমি ও রকম চুপ করে মুখ কালো করে কি ভাবছিলে? আমি অতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, তবু তুমি জানতে পারলে না। পরীক্ষা ত' হয়ে গেছে, তবে অত ভাবনা কিসের?

চিন্ময়ের মুখে আবার গাঙ্গুরীষের ছায়া পড়িল। একটু ইতস্তত করিয়া সে কহিল, না ভাবনা আর কিসের? তা

ছাড়া মানুষের মনের ভাবার কথা কি সব সময় অন্তরে বলা যায়?

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া অলকা কহিল, কেন বলা যায় না? এমন তোমার কি ভাবনা আছে যা আর কাউকে বলা যায় না? আমাকে ত বলা যায় নিশ্চয়ই, যা ভাবছিলে, তাই বলতে হবে।

—সব তাতেই কি তোমার জবরদস্তি অলকা?

—তা জবরদস্তির অধিকার ত আমার আছে। এতদিন পরে আজ একটু সময় হল, তা মুখে একটু হাসি নেই, যেন মৃত্যু একটা কিছু হয়েছে। এতে আমার মনে কত লেগেছে জানো?

চিন্ময় যতই এড়াইতে চায়, অলকা ততই জিদ করে।

—বলো, কি ভাবছিলে, ব'লবে না? নিরুপায় হইয়া শেষে সে বলিল, “কি আর ভাবব, অলি। সে তোমার শোনবার মত কথা নয়। এই আসছে ১৭ই মে আমার জন্ম কয়েক বছর একটা মামলার দিন পড়েছে তাই একটু ভাবছিলাম।

—১৭ই মে, মামলার দিন?

—হ্যাঁ।

অলকা তাহার স্বচ্ছ দৃষ্টি চিন্ময়ের মুখের দিকে মেলিয়া দিয়া কহিল, কি মামলা, কোন বছরের?

—আমাদের মেসে বীরা সব থাকেন, তাঁদেরই।

—কি হয়েছে আমায় বল না।

—ওসব শোনে না। তুমি শুনে কি করবে?

—কি আবার করবো, এমনি শুনেইছে করে? কোন স্বদেশী মামলা বুঝি?

“স্বদেশী মামলা” কথাটার ধরনে চিন্ময়ের হাসি পাইল, বলিল—ঐ রকম।

—আমাকে বলতেই হবে। কাগজেও ঐ রকম মামলা মোকদ্দমার কথা কত যে পড়ছিলাম।

অলকা কিঞ্চিৎ গভীর হইল, কহিল, দেশে থাকতেও কত অশান্তি হাদ্দামার কথা শুনতুম। মা বলতেন, আগে চোর ডাকাতিদেরই জেল হতো; এখন তাদের চেয়ে ভদ্রলোকের ছেলেরাই বেশী হয়। বাবা বলেন, ভদ্রবেশী ছুট বদমাইসে দেশটা ভরে গেছে, লুণ্ঠ হওয়া দরকার।

—তোমার কি ভয় করছে নাকি?

—ভয়? না। বরং ভালই লাগছে। ওই সব খবরই তো বেশী ক'রে পড়ি।

—অশান্তি হাদ্দের কথা শুনে ভয় না লেগে ভালো লাগছে, তার মানে?

—মানে আর কি? সবাই বলে আমার একটু ভয় কম। আমার ভয় বেশী থাকলে তোমার সঙ্গে আজ বিয়ে হ'তে পারতো?

চিন্ময় বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, অদম্য কোতুলক তাহার চক্ষু হইতে ফাটিয়া বাহির হইতেছে। কহিল,—বটে? কিন্তু শুনে শেষে ভাল যদি তোমার না লাগে?

—তবু শুনবো। তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি বলছি, ঐ সব বই কাগজ পড়ার পর থেকে ক'দিন ধরে শুধু এই কথাই আমার মনের ভিতর ঘুরছে যে, আমাদের দেশের লোকের কপালে খাওয়া পরার অভাব, অচিকিৎসায় মরা, সমাজের স্বার্থপর নিয়মকানুন সবার উপর এমন নিষ্ঠুর শাসন ব্যবস্থা—

চিন্ময়ের বিজ্ঞপূর্ণ ভ্রুভঙ্গি ও মুহূ হাসি দেখিয়া অলকা খামিয়া গেল। কহিল,—অমন হাসলে যে!

—হাসছি তোমার বক্তৃতা শুনে। বুদ্ধিটা তো বেশ পাکیয়েছ দেখছি।

—না না, হাসির কথা নয়। সত্যি আমার মনে হয়েছে, এত দুঃখ, এত সমস্যা থাকতে, আমাদের দেশের মানুষগুলো কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত মনে খায় দায় আর ঘুমোয়।

চিন্ময় একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু মুহূর্ত পরে হাসি টানিয়া কহিল,—তুমি ছিলে না ব'লে। এবার তুমি বুঝতে শিখেছ; আর ভাবনা কি?

—ওসব ঠাট্টা তামাসা ক'রে আসল কথা চাপা দিলে চলবে না। তোমাদের মামলার কথা বলতেই হবে। না হ'লে ছাড়বোই না।

—তা জানি।

চিন্ময়ের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া অলকা অসম্ভব রকম চমকিয়া উঠিল। তাহার গা খরখর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভীত বিবর্ণ মুখে সে কহিল, এর মধ্যে তুমিও আছে দেখছি। এক কথা ত আমায় বলনি।

এক মুহূর্তে সে ধারণা করিয়া ফেলিল, বিবাহের পর হইতে চিন্ময়ের ভিতর যে অস্বাভাবিক গাভীরা সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, সে শুধু তাহার পরীক্ষার পড়ার জন্তই নয়।

চিন্ময় অলকাকে ধরিয়া ফেলিল। স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, বলতে একদিন চেয়েছিলাম, তুমিই শুনতে চাও নি। কিন্তু তুমি ও রকম কাঁদছো কেন? এই যে বললে ভয় পাবে না। শোন অলি, আমি ওর মধ্যে ছিলাম সত্যি। কিন্তু এখন আমি আর নেই বলা যায়।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অলকা কহিল, সে আর কেমন ক'রে হয়?

—আমি আর ওসব হাদ্দের মধ্যে যাবো না স্থির করেছি।

—যাবো না মনে করলেই কি ক'রে নিষ্কৃতি পাবে? যেয়ে তো আছেই।

ধীরে ধীরে চিন্ময় কহিল, ওরা একটা সর্ভ লিখে দিতে বলে, তাহলে আর কোন হাদ্দামাই থাকে না।

—সর্ভ? কি সর্ভ?

—অত কথা শুনে তোমার কি হবে?

—বলোই না, শুনি।

—এই কোন বৈপ্রবিক, বা রাজনৈতিক ব্যাপারের ভিতর এখনও আর থাকবো না, এই সর্ভ।

—এই সর্ভ! অলকা খানিক নির্ঝাক হইয়া চাহিয়া রহিল, মুখে কোন কথা আসিতে চাহে না, তবু সে ধীরে ধীরে কহিল, তা তুমি কি মনে করেছ?

—মনে করেছি লিখে দেবো।

আবার খানিক স্থির হইয়া খান্দিয়া অলকা কহিল, আর জুঁরা।

—জুঁরা তা' করবেন না।

—কেউ যা করবেন না তুমি তা করবে কেন?

—ওদের সঙ্গে সমান তালে চলা আর আমার হ'ল না। তা ছাড়া ভেবে দেখলুম ও পথ যখন ছেড়েই দেবো, তখন করবো না বলাতে ক্ষতিই বা কি?

অলকা চিন্ময়ের নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া গেল। দৃঢ়তার সঙ্গে কহিল, ছেড়ে দেওয়া না দেওয়া সে তো

অনেকক্ষণ অলকা কোন কথা কহিতে পারিল না। তাহার চক্ষু আনন্দাশ্রুভারে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। কিয়ৎকাল পরে ধীরে ধীরে কহিল, এর পুরস্কার দেবার মত কিছু কি আমার আছে? খুঁজে পেতে সংগ্রহ করবো, তবে তো?

—ও, তবে বাকি থেকে গেল কিন্তু।.....

—নিশ্চয়ই।

উভয়ের মুহূ হাসি যখন নিশীথ শেষের স্তিমিত প্রদীপালোকের সহিত মিলাইয়া গেল, ভোরের পাখীও তখন ডাকিয়া উঠিয়াছে।

১০

বিবাহের গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে। পুত্রের অস্থখের সংবাদ পাইয়া বড়দি আর দেবী করিতে পারেন নাই। সতীশ তাহার কর্তব্য শেষ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে কানপুর। অত্র জীলোকেরা একে একে সকলেই ফিরিয়া গিয়াছেন। কেবল যিনি সাতরাগাছির মা, তিনি তাহার নিজের পুরানো দাদী ও রাধুনী রাধুরমাকে গৃহস্থালীর সমস্ত বলিয়া কহিয়া সকলের শেষে বিদায় লইয়াছেন। যাইবার সময় অলকাকে আদর করিয়া মুখে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিয়াছেন, দিন কতক থাক বউমা, তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব। অলকা আনন্দের সঙ্গে তাহাতে সম্মতি দিয়াছে।

এই রাধুরমা সাতরাগাছির সংসারে বহুকাল কাটািয়াছে। একেবারে পাকা লোক। তাহার সাহায্যে অলকা ক্রমে সংসার গুছাইতে আরম্ভ করিল। চিম্মর ল'কাইনাল পরীক্ষার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশ সময় সে মেসেই কাটািয়া দেয়। অলকা মনের মত করিয়া সংসার গুছায়। ফেরিওয়াল ডাকিয়া ডাকিয়া দরজার জড় করে। টিনের কোটা, কাচ ও চিনেমাটির নানাবিধ পাঞ্জে ভাড়ার ঘরের নূতন কেনা কাঠের সেলফগুলি ভরিয়া উঠিয়াছে। বুড়ি, চেঙ্গারী, বাঁটি, কুরুণী কিছুই বাদ যায় নাই। অলকা বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাহিয়া থাকে।

ফুলকাটা সূজনী পাতিয়া বালিশে সূচীকাণ্ড করা ওয়াড় পরাইয়া পরিপাটি করিয়া চিম্মরের শয্যা রচনা করিতে করিতে অলকা বিহ্বল হইয়া পড়ে। দক্ষিণ সমীপে ঘরের মধ্যে

ছুটিয়া আসে। অলকার মাথার চুল ও গায়ের কাপড় অসম্মত করিয়া দেয়। সহসা ছেলেবেলায় রূপকথার বইয়ে পড়া রাজকন্যার কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। নিজের দিকে বার বার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়।

ঘরের অসবাবপত্র সাজানো লইয়া এক একবার রাধুর মা সঙ্গে মাঝে মাঝে মতান্তর হয়। 'ও টিপসটা, রাধুর মা, ওরকম খাটের পাশের দিকে রাখলে কেন?—অভ্যুযোগ করিয়া অলকা বলে।—একটু শিয়রের দিকে সরিয়ে দাও, ওখানে তোমার বাবুর রাজে খাবার জল থাকবে যে। আলনাটা ওরকম জানালা ঘেঁসে রাখলে কেন? হাওয়া আটকালে তোমার বাবুর ঘুমোবার কষ্ট হবে না? ও জুতো ক্রসটা তোমার কাজ নয়, রাধুরমা, ও আমিই করবো। মুচকি হাসিয়া রাধুর মা বলে, অনেক সংসারে পাকানো হাত আজ তোমার কাছে হার মানলো মা, নাও, তোমার কাজ তুমিই করো।

রাধুর মার হাত হইতে জুতা জোড়াটা টানিয়া লইয়া অলকা নিজেই কালী লাগাইতে বসে। আত্ম সমর্পণের পরিপূর্ণতায় তাহার মন যেন সমাহিত হইয়া পড়ে, বাহু চৈতন্য হারাইয়া যায়।

প্রভাতে সন্ধ্যায় আকাশের গায়ে মেঘে মেঘে রং লাগে। সহসা অলকা ছুটিয়া গিয়া কর্মনিরতা রাধুর গাকে বলে, "দেখ রাধুর মা, আমার মনে হয় বলকাতা সুরটা কি সুন্দর। খুব ছোটবেলা মায়ের সঙ্গে একবার ঝংপুর গিয়েছিলুম, ভাল মনে পড়ে না। তারপর আর কখনও গ্রামের বাঁরই হইনি। হাসিয়া রাধুর মা বলে, তা আর হবে না? কত পয়সা চলে চলে তবে না সুর বাজার তৈরী!

এক একবার অলকার মনে হয়, এমন সৃষ্টিছাড়া বিবাহ তাহার অদৃষ্টে যে ছিল, কে একথা জানিত? মে মায়ের কত আদরের সন্তান। এই ঘটনায় মায়ের মনে না জানি কত আঘাতই লাগিয়াছে। বাবার নিকট, পাড়ার পাঁচ জনের নিকট ইহা লইয়া না জানি কত গল্পনাই তাহাকে সহিতে হইবে। মনে মনে বলে—মা তুমি আমার বিয়ের ভাবনা ভাবিয়া শুকাইয়া মরিবার ভাগীই ছিলে, এমন দিনে তোমার চিরকলাগম্বয় হাতের স্পর্শে তোমার অমৃতমাখা আশীষ না লইয়াই আমার নূতন জীবনের যাত্রা শুরু হইল।

চোখের কোণে অশ্রু গড়াইয়া আসে। কিন্তু বুকের তলায় কিসের মুহূ স্পন্দন আসিয়া বাধা দেয়। সকল দুঃখের কুরাণা ভেদ করিয়া জীবনের প্রভাত বেলায় এই যে রাঙা সূর্য্য দেখা দিয়াছে পৃথিবী খুঁজিয়া কি তাহার তুলনা মেলে? যে অগাধ্য মোভাগ্য সে আশাতীতরূপে লাভ করিয়াছে তাহার অনুভূতি সফেন কল্লোলে অলকার মনের প্রবাহে কুল ছাপাইয়া উঠিতে চায়। যে বিশাল হৃদয়ের বলিষ্ঠ আশ্রয়ে সে কুলায় রচনা করিয়াছে, ছনিয়া তাহার নিকট কতটুকু! ভাবিতে ভাবিতে অলকা আত্মহারা হইয়া পড়ে।

সেদিন পূর্ণিমা তিথি। সন্ধ্যা হইতে না হইতে চাঁদ উঠিয়া শেঠেদের বাড়ীর চিলে ছাদের ওপাশ হইতে উকি বুঁকি দিতে লাগিল। রাধুর মা আজ সকাল সকাল অলকার চুল বাঁধিয়া দিয়াছে। গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সে চিন্ময়ের অপেক্ষা করিয়া আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

চিন্ময়ের আজ পরীক্ষা শেষ হইবার কথা। সে কিন্তু এখনও আসিল না; মন চঞ্চল অধৈর্য্য হইয়া ওঠে। থানিক পরে রান্না ঘরে গিয়া অলকা রাধুর মার সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল। কিন্তু মন পড়িয়া আছে, বাহিরের দরজার দিকে, কথা তাই অসম্বদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে রাধুর মার হাত হইতে বেলনি লইয়া লুচি বেলিতে বসিল; কিন্তু ছ'চার থানা বেলিয়া ফেলিয়া রাখিয়া আবার উঠিয়া আসিল।

চাঁদ তখন চিলে ছাদ ছাড়াইয়াছে। অলকা জানালা খুলি ভাল করিয়া খুলিয়া দিল।

চিন্ময়ের সঙ্গ অলকা এক রকম পায়না বলিলেই চলে। সকালে উঠিয়া সে মেসে চলিয়া যায়। সারাদিন পড়াশুনা কাজ কর্ত্তে বাহিরে বাহিরেই কাটে। অনেক রাত্রে বাসায় আসিয়া ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। তাহার নিঃসঙ্গ মন থাকিয়া থাকিয়া অভূষ্ণিতে গুমরাইয়া ওঠে। বিবাহের পর হইতেই কেমন যেন একটা ভাবান্তর সে চিন্ময়ের ভিতর লক্ষ্য করে। বুঝিতে পারে না সে কি? কিন্তু তাহার পরীক্ষার কথা ভাবিয়া সে কিছু প্রকাশ করে না।

ছাদের দিককার জানালাটা খুলিয়া দিতে সহসা দেখে চিন্ময় কখন যেন আসিয়া ছাদের একধারে চুপ করিয়া বসিয়া

আছে। অলকার মন আনন্দে ছলিয়া উঠিল; কিন্তু চিন্ময় অত গন্তীর কেন? কি সব যেন ভাবিতেছে। বাড়ীর কেহ জানে না, এমন নিঃশব্দে সে আসিলই বা কখন? কি হইল তাহার? অলকা ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু চিন্ময়ের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া অলকা তাহার গায়ে হাত রাখিয়া কহিল,—কখন এলে?

চিন্ময় ফিরিল। আশ্চর্য্য জবাব দিল, এই একটু আগে। অলকার মন ভারী হইয়া উঠিল। এই উত্তর? কহিল, তোমার কি অসুখ টসুখ করেছে নাকি?

—কৈ না।

—পরীক্ষা শেষ হ'ল?

—হ্যাঁ হয়েছে।

অলকা তাহার কাছ ঘেসিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল,—তবু ভালো। এক বারটি দেখা পাবার ঘো নেই। একা একা কি করে আমার দিন কাটে-বলোত! বাড়ীতে থাকলে বুঝি পড়া হয় না? অলকা মুখ ভারী করিয়া রহিল।

গাভীঘোর ভিতরেও চিন্ময়ের একটু রসিকতা দেখা দিল, হাসি টানিয়া কহিল,—নীতি শাস্ত্রে তাই ভো বলে।

—কি বলে? বিষে ক'রে নতুন বোয়ের ছায়া মাড়াতে নেই? বেশ তাই। কিছু বলবো না।

—না, না, তা কেন? জাননা, আমার কি রকম পড়া আর কাজের চাপ পড়েছিল। কিন্তু তুমি একা একা থাকো বলে এত যে বই পত্রিকা এনে দিলাম, সে কি হল? পড়া হয়ে গেছে? এখনে ত কেউ বাধা দেবারও নেই। বন্ধবারও নেই।

পড়ার কথায় অলকা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, সে সব পড়া হয়ে গেছে। এতদিন ঐ নিয়েই তো কেটেছে।

—কেমন লাগলো?

—খুব ভালো। ‘মাটির দাবী’ বই খানা এত ভাল লেগেছে! আর ওই ‘নব যাত্রা’ পত্রিকা। দিনে রাত্রে যেন সেই সব কথার স্বপ্ন দেখছি।

তোমার নিজের ইচ্ছে। কিন্তু ও রকম কথা দিয়ে নিজের স্বাধীনতা নষ্ট করবে?

উদ্বীপনায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পুনরায় কহিল, তুমি না বলতে—শির দেগা পর সার নহি দেগা। এই মন্ত্র যেদিন সবাই নিতে পারবে, সেইদিন আসবে আমাদের দেশের মুক্তি। আর তুমি নিজে এমন একটা নীচ প্রস্তাবে রাজি হ'চ্ছ? আশ্চর্য্য কথা?

গম্ভীর হইয়া চিন্ময় কহিল, সে কথা আর কেন তোল অলকা। যে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে তা গেছে। তুমি কি বুঝবে, সঙ্কল্প ত্যাগের দুঃখ কি?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাগুলি একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই চিন্ময়ের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে লোক চলাচলের গোলমাল শোনা যাইতেছে। ফেরিওয়ালার বেল ফুলের মালা হাঁকিয়া চলিয়াছে। দূরে এক বাড়ীর ছাদে বসিয়া কে একজন বাঁশী বাজাইতেছিল, জ্যোৎস্নার তরঙ্গ বাহিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল তাহারই মৃদু মৃদু স্বরের রেশ।

কথাটা এভাবে অলকা কখনও ভাবে নাই। আহত স্বরে সে কহিল, ও, তুমি বিয়ে করেছো তাই ওকথা বলছো। কেন বিয়ে করলে বুঝি দেশের কাজ করতে পারে না, ইচ্ছে যদি থাকে।

চিন্ময় অলকার কথা শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, বড্ড যে গুলিয়ে ফেললে অলকা! তা কেন পারবে না। কিন্তু জানানাতো এ কি পথ? তোমার ওই মানের জন্তে প্রাণ বলি দেওয়ার মত লোক কম। দিতে চাইলেও সীমার থাকায় বার বার ফিরিয়ে নিয়ে আসে বিবাহিতকে। কারণ তখন আত্মা বৈষ্ণট। ঠিক নিজের হাতে থাকে না?

—তার মানে একটু সোজা ক'রে বলো।

—মানে এই আমি যেমন আজ হ'য়ে গেছি। আমার কি আজ আর সাধ্য আছে যে, যে অলকা সমস্ত কিছু ত্যাগ ক'রে আমাকে আশ্রয় করেছে, তাকে পথের ভিখারিণী ক'রে দিয়ে আমি যাবো বিগ্রব-আন্দোলনে জড়িয়ে থেকে

কান্নাবরণ করতে? ও পথে চলা আমার নাই বা হলো। আমার সার্থকতা আমি এর ভিতর থেকেই খুঁজে নিতে পারবো। চিন্ময় আবার অলকাকে সম্মুখে কাঁছে টানিয়া আনিল।

অলকা নীরব। মুখের পাংশুবর্ণ। চোখের ভিতর অব্যক্ত বেদনার ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে। পরণের বাসন্তী রংএর শাড়ীতে, খোঁপায় গোঁজা চাপা ফুলে অফুরন্ত জ্যোৎস্নার ধারা লুটোপুটি খাইয়া পড়িতেছে, আর তাহারই মধ্যে যেন একখানি বিষাদ প্রতিমা স্থির নেত্রে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে।

ক্ষণকাল নীরবে কাটিবার পর চিন্ময় ডাকিল,—অলকা!

—কি বলো?

—রাগ করলে নাকি?

—না, এ কি রাগের কথা?

—তুমি মনে ক'রো না, আমি আমার অবস্থার জন্য খুব দুঃখিত। আমি চাই যে পথে চলবো, তাকে অকৃত্রিম ভাবে ধরে চলবো। নিজের মনকে ঠকিয়ে পরকে বুঝ দিয়ে নয়। এই কথাটাই তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম।

—ভালই করেছে। বুঝিয়ে দেওয়াই তো মরকার।

—কিন্তু তুমি অমন মুখ ভারী ক'রে রইলে যে! কথা বলছো না।

—এমনি। আমার কোন কথা আসছে না।

—না; তা হয় না। ঐজন্মেই তোমাকে কিছু ব'লতে চাই নি। তুমি কেন জিদ করলে? আজকে আমার প্রথম ছুটির দিন। দেখছো কেমন মিষ্টি জ্যোৎস্না। এর মধ্যে তোমার অন্ধকার মুখ দেখা যে দুর্ভাগ্যের কথা, অলি।

—সে তো আমারই ভাগ্যের দোষ। কেবল নিজের কথাটাই ভাবছো?

—লক্ষ্মীটি, আর ওসব কথা তুলো না। ভাল কথা অলকা! আমার যে পুরস্কার পাবার কথা ছিল, সে কি হ'ল?

—সে তো আমি আজও খুঁজে পাইনি। যেদিন পারো সেদিন তো দেবো।

ধারাগিরি শ্রীপারমিতা নাগ

শ্রীচরণেবু.

মা, বাবার কাছ থেকে আমাদের ধারাগিরি ভ্রমণের বিবরণ শুনেছ কিনা জানি না, তাই লিখছি। আমরা সেদিন ভোর চারটের সময় উঠে সবাই মিলে বেড়াতে যাবার জন্ত ভোড়জোড় আরম্ভ করলাম। ছটার মধ্যেই চারটে গরুর গাড়ী এসে হাজির হল। আমরা লোক ছিলাম এ বাড়ীর এগারজন, ম-বাবুর বাড়ীর পাঁচজন এবং ম-বাবুর ভাগ্নী মাসী। বেরোবার সময় একটা গাড়ীতে উঠলাম মেয়েরা পাঁচজন, দ্বিতীয় একটা গাড়ীতে গ-মাসী, টুবলু আর ম-বাবুর নাতনী পিকো, তৃতীয় গাড়ীতে রা-কাকী, ম-বাবুর স্ত্রী, আর তাঁর নাতী জয়, আর সব শেষে খোলা একটা গরুর গাড়ীতে স-মাসী, অ-বাবু, বাবা। চারটে মাত্র গরুর গাড়ীতে এত মানুষ সবাই উঠতে গেলে একটু ঠাসাঠাসি হয়, তাই বাবলু, ম-বাবুর ছেলে ভাতা আর দুজন চাকর হেঁটেই চলে।

বেরোবার সময় শুনলাম যে ধারাগিরি এখান থেকে পাঁচমাইল দূরে এবং তিন ঘণ্টার পথ। রাস্তা খুব ভাল, রাস্তার ধারার দাবার সব পাবো। চলতে শুরু করলাম সবাই।

টেশনের কাছে এসে রেল লাইন পার হলাম। আবার পথ চলা আরম্ভ হল। প্রথমে কি রকম সুন্দর গ্রাম সব দেখলাম! সাতটা মায়েরা কি সুন্দর করে ঘর নিকিয়েছে! ঘরগুলি সব ইণ্ডিয়ান রেড রঙের, তার শেষে কালো পাড়ের ধারি। লালটার উপর হলদে আর খয়েরি রঙের ফুল তোলা। কি সুন্দর রং মেলায় ওরা! কিছুদূর সেই গ্রামের পথ দিয়ে গিয়ে তারপর এলাম এক পদ্মদীঘির ধারে। পথটায় সেখানে একটু কাদা তাই আমরা গাড়ী থেকে অনেকই নেমে পড়লাম। কাছে গিয়ে দেখলাম পদ্মবনে কি লাল (magenta) আর সাদা রঙের ফুলের ভাড়া, জল প্রায় দেখাই যায় না। ম—দিদের চাকর আর বাবলু অনেক ফুল তুলে দিল আমাদের। কখন এমন বিনা পরসায় পদ্ম নিয়ে খেলা করিনি। কি—কে ওয়া চুলে গলায় কানে হাতে ফুল দিয়ে

সাজিয়ে দিল; আমিও চুলে magenta রঙের ফুল দিলাম। আমার শাড়ীটার সঙ্গে একেবারে মিলে গিয়েছিল। খানিক পরে পদ্মবন ছাড়িয়ে এসে চুকলাম শাল আর জাম বনের মধ্যে। সেখানে গাছগুলি আগের চেয়ে একটু গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে ঘন ঘন নয়। আবার উঠে পড়লাম গাড়ীতে। সেই সঙ্গে চলল একে একে নানা গানের পালা। নিজের মনে গান গেয়ে চলেছি সকলে, হঠাৎ সামনে চেয়ে দেখি, বিরাট পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গেছে। এখানে এসেই সবাই ঘড়ির দিকে তাকাল। আমরা ভাটার বেরিয়ে ছিলাম, তাকিয়ে দেখা গেল দশটা বাজতে পনের মিনিট। সবাই মিলে তখন আমরা গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, এই নাকি ধারা গিরি? সে হেসে বলল, 'না বাবু এ ধারা গিরি নয়। ইয়ার চেয়ে টুকু দূর হবেক।' আমরা সবাই আবার শুছিয়ে বসলাম, আরও আধ ঘণ্টাটাক চলতে হবে তার মানে। দূর থেকে যে নীল পাহাড়গুলি আমরা রোজ দেখি ক্রমে ক্রমে সেগুলি কাছে এগিয়ে এলো; সেখানের গাছগুলি দেখা গেল, কোথাও গাছ, কোথাও হাফা রং। আম গাছের ডালে ডালে অর্কি ড ফুলের ভাঁড়। দূরে দূরে বলরাম চুড়া আর বরাস পিপুল গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা নীচে থেকে দেখছিলাম; মনে হচ্ছিল সবুজ মকমলের উপর বেগুনফুল আর হলদে বুটী তোলা কার্পেট। ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম আমরা পাহাড়ের উপরে উঠছি; ঘন ঘন চারিদিকে; যাব দিগ্বে সিঁথির মত সবু একটা বালি ভরা পথ। এককণ আসছিলাম ঘন বনের মধ্যে দিয়ে, এবার হঠাৎ দেখি পাহাড়ের গায়ে সমতল খালি জমি। সেখানে দূরে দূরে ছ একটা বুনো লেবু গাছ, আর বাকিটা সবুজ ঘাসে ভর্তি। ঠিক মনে হয় কারুর সাধের লন (lawn)। এমন সমতল জমি এ এ অঞ্চলে কখনই দেখিনি।

উঠতে লাগলাম পাহাড়ে; কোথাও মাঠ কোথাও আম বন কোথাও ধানের ক্ষেতও হয়েছে দেখলাম।

আধ ঘণ্টা যে হাতে ছিল তাও শেষ হয়ে গেল, আবার

সবাই প্রশ্ন করে, ‘কতদূর? এবার গাড়োয়ান যতীন বলল, ‘এখনও বহু দূর বটে আইজ্ঞা, ঐ যে দূরে দেখাচ্ছে গেরাম, উন্নীর পর আরও তিনটি গেরাম পার হইতে হবে বটে, তারপর ঢের বন, সেই ঠিনে কিছু দূর যাতে হবেক।’ আমাদের তো মাথা ঘ হাত! এই নাকি তিন ঘণ্টার পথ?

বাঁবা প্রশ্ন করলেন—‘এখানে বাঘ বার হয় নাকি?’ গাড়োয়ান বাবার দিকে সাব্বনার চক্ষে তাকিয়ে বলল—‘বাঘ কেনে বাইরাইবে আইজ্ঞা, ভাজুক, হাতী, বাঘ, বড় সাপ সব রকমি বাইরায়।’ অগত্যা আমরা গান কিছুক্ষণের জন্য খামিয়ে দিলাম। তবু গহনতম অরণ্যে বাবার ইচ্ছা কারুরি কয়লনা।

একে একে এমনি দুটো পাহাড় পার হলাম। তার পর দেখলাম সামনে পথে অনেক পাথর। গাড়ী বড় ঝাঁকড়ানি দিচ্ছিল, তাই নেমে পড়লাম। আমরা ঢালু পথে হাঁটতে লাগলাম। কিছু দূর গিয়েই গুলি জলের কল কল শব্দ। তাকিয়ে দেখলাম, বেশ চওড়া একটা ঝরণা। হৃদয়ের গাছ গুলি নেমে এসেছে জলের উপর, ঠিক মনে হয় আফ্রিকার জঙ্গল। কেউ কেউ গাড়ীতে চড়েই জল পার হলেন। জলে নেমেই গরুর কান অবধি জল উঠে গেল, গাড়ীর পিছন দিকটাও জলে নেমে গেল। কাজেই আমরা একে একে গাড়োয়ানদের হাত ধরে জলে নামলাম। বত বাজি তত জল আরও বেড়ে যায়। শেষে সাঁওতালনীদের মত শাড়ী উচু করে চললাম। একটা গাড়ী বহু কষ্টে জল পার হল, তার পর গ—মাসীদের গাড়ী জলে নামল। আমাদের ভয় হচ্ছিল সঙ্গে বন্দুক না নিয়ে এতো গভীর বনে কি যাওয়া উচিত? গ—মাসীর গাড়ী জলে নামতেই বুঝলাম আমরা একেবারে অসহীন নই; সঙ্গে চলেছেন একদল, তাঁদের বন্দুক আছে। গ—মাসির গাড়ী গভীর জলে নামতেই বনের ধার থেকে দিদির ক্লাশের অরমত দেখতে একটি ছেলে ক্যামেরা নিয়ে ধেয়ে এলো। তার ছবি নিশ্চয় খুব ভাল হবে—গ—মাসী এবং গরুর গাড়ী এক গলা জলে। আমরা তাকিয়ে দেখলাম ক্যামেরা ওয়ানাটি একলা নয়, সঙ্গে তাঁর আরও দশ এগারটি ছেলে, প্রায় প্রত্যেকরই

বন্দুক আছে। তারা বাবার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

আবার চললাম আমরা। কিছু দূর গিয়ে দেখি আর একটা ছোট ঝরণা; তারপর আরম্ভ হয়েছে রীতিমত

পাহাড়। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা তৈরী হয়েছে; একদিকে মস্ত মস্ত পাহাড়; তার গায়ে নানা রং এর ফুল ফুটেছে পাথরের বুক চিরে। আর একদিকে বিরাট খাদ; তার শেষে অন্ধকার, কত যে গভীর তা বোঝা যায়না।

সেখান দিয়ে গরুর গাড়ী খুব আস্তে চলল। আমরা কিছু হাঁটতে লাগলাম। এই রকম পথ দিয়ে মাইল খানেক হাঁটার পর খানিকটা সমতল ভূমি। সেখানে কোথাও কোথাও স্থল পদ্মের মত হলদে ফুল ফুটে আছে। ম—দি’দের ছোট কাঁকা বললেন, তুলোর গাছ। সমতল ভূমিতে নেমে পিছন ফিরে দেখলাম দু সারি বিরাট পাহাড় পার হয়েছি। কি চমৎকার সবুজ! ঐ একই সবুজের দেয় এতো বকমারি কখনো দেখিনি! কি উচু আর শান্ত পাহাড় গুলি! দেখলে একটুও মনে হয়না এর মধ্যে কোন হিংস্র জন্তু আছে। প্রাণের কোনও সাড়া সেখানে নেই, স্থির হয়ে আছে সব গাছ পালা সেখানকার। একটানা লম্বা সারিবান্দা নয় পাহাড় গুলি; এক-একটা মন্দিরের মত আলাদা আলাদা দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটা পাহাড়ের শেষে একটা করে সমতল জমি আবার আর একদিকে মাথা তুলে উঠেছে আর একটা পাহাড়।

এখানে এসে একটা গ্রাম পেলাম, চাষ হচ্ছে সেখানে। এতক্ষণে প্রায় বারোটা বেজে গেছে।

একজন লোক চাষের জমিতে কাজ করছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমরা “ধারাগিরি আর কতদূর?” সে বলল,—ঐ তো হুথা, আধ মাইল, বুঝলাম ওদের হুথা মানে অন্তত আরও দু মাইল। এবার সেই বন্দুকধারীর দশ গান ধরল। রাস্তায় বড় কাদা ছিল, তাই শুনলাম ওরা গাইছে, ‘কাদার শেষ কোথা, কি আছে সেখা। আরও মাইল খানেক হেঁটে গিয়ে এলাম এক বনের মধ্যে, সেখানে খানিকটা খালি জমি। গাড়োয়ানরা বলল, এখান এসেছি ধারাগিরি। হিসেব করে দেখা গেল অন্তত মাইল দশ বারো আমাদের বাড়ী থেকে। তখন সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।

আমরা এতক্ষণ হাঁটছিলামই। তবে বড়রা কেউ কেউ গাড়ীতে ছিলেন। এবার চালকরা বলল, আর গাড়ী যাবেক না। আমরা একে একে খাবার দাবার ক্যামেরা

সতরঞ্জী সব নামাতে লাগলাম। সবাই কিছু না কিছু একটা হাতে মাথায় নিয়ে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টাতে উঠতে লাগলাম। বাবা দেখি এরি মধ্যে সেই বন্ধুধারীদের সঙ্গে প্রায় সভা জমিয়েছেন। তারা বলল, কোনও ভয় নেই, আমরা এখানে অনেক বার এসেছি। খুব পথ চিনি আমরা। অন্ধের মত তাদের পিছু পিছু চললাম। হঠাৎ শুনি তাদের মধ্যে একজন বলছে, আচ্ছা গাইড যা হোক। কোথায় যে গেল? তারপর শুরু হোল নানা সুরে ডাক। পাহাড়ের গায়ে সে ডাক মিলিয়ে গেল। কেউ সাড়া দিল না। অনেকবার ডাকের পর হঠাৎ শুনলাম দূরে কে যেন ডাকছে। তবে সে ডাক এতই ক্ষীণ যে তা শুনে পথ ঠিক করা অসম্ভব। কাজেই আমরা চললাম বনের মধ্যে দিয়ে। কি গভীর বন! গাছে গাছে লতায় লতায় জড়িয়ে গেছে, বড় গাছের তলায় আবার ছোট ছোট নানা গাছ, মাটিতে পা দিলে পচা ঘাস আর পাতার মধ্যে অবেকখানি ডুবে যেতে হয়। গাইড হারিয়ে যাওয়াতে অন্তদের কি হচ্ছিল জানি না, আমার মনের মধ্যে ত বেশ একটু ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল।

পাহাড়ে বেশ কিছু দূর উঠবার পর শুনলাম “এ পথটা ভুল, অন্য পথ দিয়ে যেতে হবে। একটা পায়ে চলা পথ ছিল সেটা বার করা প্রয়োজন।” নেমে পড়লাম পাহাড় থেকে, কিছু খুঁজে একটা পথ পেলাম অবশেষে। সেটা ধরে উঠতে লাগলাম; খানিক পরে দেখলাম একটা শীর্ণ জলের ধারা। জল দেখে সেখানেই খাবারের সরঞ্জাম নামিয়ে রাখা হোল, শুনলাম এই জলই নাকি কোথায় গিয়ে মহা এক জলপ্রপাতে পরিণত হয়েছে। অসম্ভব বেশী পাথর এখানে। পথটা খুব অন্ধার আর পাথরগুলি অসম্ভব রকম পিছল। সবাই বকতে লাগলেন, ‘আর যেওনা’ বলে। তবু শেষ অবধি স-মামা, ছোট কাকা আর বাবা ছাড়া সবাই রওনা হলাম উর্দ্ধ পথে falls (জলপ্রপাত) দেখতে। পাঁচ ছয় গজ করে যাই আর এক একজন করে আছাড় খায়। কেমন যেন অদ্ভুত এখানটা। হৃদিকে খুব উঁচু পাহাড় উঠেছে, পাশাপাশি প্রায় দেখাই যায় না, কাজেই অসম্ভব অন্ধকার। পাথরগুলি ত শেওলায় ভর্তি।

চলেছি তো চলেছিই পাথরের উপর দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সেই বন্ধুধারীর দল একটা পাথরের উপর বসে নানারকম ছবি তুলছে, আর তাদের ভৃত্যটি বনে গুলি করে কতগুলি ছোট ঘুঘুকে রান্নার যোগ্য করবার চেষ্টা করছে। সেই ছেলেগুলি বলল—‘ত্রি দেখুন ধারাগিরি।’ এগিয়ে গিয়ে একটা বাকের পর দেখলাম, চল্লিশ পঞ্চাশ ফিট উপর থেকে বেশ তোড়ে জল পড়ছে আর সেই জলটা একটা পুকুরের মত জায়গায় জমা হচ্ছে। তার থেকেই এই শীর্ণ বরগার উৎপত্তি। জলপ্রপাত এমন কিছু বড় নয়, তবে আর সব-দৃশ্য চমৎকার।

ফিরে চললাম আবার সবাই আছাড় খেতে খেতে। গ-মাসীর সব চেয়ে বেশী লেগেছিল। ফিরতি পথে জলের বাকের এসে দেখি ইতি-মধ্যে খাবার দাবার সাজিয়ে সবাই অন্য একটা ভাল পরিষ্কার সমতল জমির উপর বসেছেন। চা হচ্ছে, খিচুড়ি চড়েছে।

পেঁড়া বোঁদে লুচি এবং চা খাওয়া হ’ল। তারপর শুকন কাঠ কুড়িয়ে এনে রান্না। তাড়াতাড়ি করে রান্না শেষ করলাম। গাড়োয়ানরা একটা বিবাক্ত সাপও মেরে নিয়ে দেখিয়ে গেলো।

একজন সাঁওতাল কিছু দূরের গ্রাম থেকে এসেছিল কাঠ কাটতে। তার কথায় বুঝলাম আমরা যে স্থানটি পছন্দ করে বসেছি সেটি খুব ভাল নয়। কাল সেখানে নাকি এক নর খাদক বেরিয়েছিলেন এবং বড় বড় ভাল্লুকের চারটের পর নিত্য আনাগোনা। বকাবকি চেষ্টামেচি করে আমরা চারটে বাজতে পনেরো মিনিটের সময় গাড়ীতে উঠে বসলাম। আসবার সময় বাবলু তাতা এবং দুজন ভৃত্য হেঁটে এসেছিল সারা পথ। এবার তাদের ধমক দিয়ে কিছু পয়েই গাড়ীতে তোলা হোল। ফেরার পথে আমরা একটা দীর্ঘতর পথ দিয়ে এলাম। সেটা নাকি নিরাপদ কিছু। ভালই এসেছিলাম, খালি ঝাঁকড়ানিতে দুদিন গায়ে ব্যথা ছিল আর কিছু দূরে ছোটো মস্ত নেকড়ে পিছনে তাড়া করেছিল। এ খবরটা বাবাকে ট্রেনে যাবার তাড়ার ছোট কাকা দেননি।

আমাদের আসর

পরিচালিকা—শ্রীবেলা দে

খুঁটিনাটী

শকুন্তলা।

১। কুটনো কুটতে গিয়ে বা অন্য কোন কারণে তো হাত পা কেটে যেয়ে কাপড়ে রক্তের দাগ লাগে গেল। সেই দাগ তোলার উপায় কি? যদি তি কাপড়ে দাগ লাগে, তাহলে খানিকটা জলে পাঁচ, ত ছিটে ছুন মিশিয়ে সেই জলে এক ঘণ্টা ঐ জায়গাটা জ্বিয়ে রাখুন। পরে সাবান দিয়ে ধুয়ে দিলে ঐ দাগ উঠে যাবে।

মোটো কাপড়ে, বিছানার চাদরে বা কসলে রক্তের দাগ লাগলে ঐ দাগ লাগা জায়গায় কাইয়ের মত করে চর্চ (দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, দাম বেশী নয়) মিশিয়ে ঘণ্টা খানেক রেখে দেবেন। তারপর ষ্টার্চের এই প্রলেপ শুকিয়ে গেলে কড়া ব্রাশ ঘসে নিলেই দাগ উঠে যাবে।

২। কাপড় চোপড়ে চা বা কোকার দাগ লাগলে ঐ জলে স্পঞ্জ ডুবিয়ে সেই জায়গাটা স্পঞ্জ দিয়ে ঘসে এরপর কেচে নিলে দাগ উঠে যাবে। কফির দাগ লাগলে গরম জল বা গ্লিসারিন ঘসে দিয়ে পরে ঈষৎ এ ইঞ্জি চালাবেন। দাগ সম্পূর্ণ উঠে যাবে।

৬। বর্ষাকালে কাপড়ে মোষে ধরে। ঐ দাগ তোলা সহজ। ঐ মোষে ধরা জায়গায় খুব মিহি খড়ির ডা ছড়িয়ে দেবেন। ঘণ্টা খানেক বাদে সাবান জলে ধুয়ে নিলে দাগ উঠে যাবে।

৪। ডিমের দাগ লাগলে প্রথমে ঠাণ্ডা জলে কেচে সাবান মাখিয়ে গরম জলে কেচে দেবেন।

০৫। ফলের দাগ লাগলে সেই দাগের উপর ষ্টার্চের গুঁড়ো মাখিয়ে ব্রাশ করবেন। পরে সাধারণভাবে জলে কেচে নেবেন। ষ্টার্চের গুঁড়ো না থাকলে লেবুর রসে ১ ছিটে ছুন মিশিয়ে আন্তে ২ ঘসে নেবেন। কিম্বা তুলায় করে গ্লিসারিন ঢেলে দাগের উপর ঘসে মাখিয়ে নেবেন।— এক ঘণ্টা পরে গরম জলে ধুয়ে নিলে ঐ দাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

৬। যদি তেল কালির বা গ্রীজের দাগ লাগে তাহলে ঠাণ্ডা জলে গুঁড়ো বোরাক্স মিশিয়ে সেই জলে কেচে নিলেই দাগ উঠে যাবে।

ঘরের কুখ্য

টোটকা টুটকি ওষুধের কথা :—

শকুন্তলা।

১। হজমের জন্তু—কিছু ঘোয়ান বেশ করে ধুয়ে বেঁটে তার দিকি পরিমাণ বীট ছুন অথবা সৈন্ধব ছুন মিশিয়ে একটা পাথর বাটীতে পাতি লেবুর সঙ্গে এই গুলি মেখে বোদে শুখিয়ে নিন; তাহলেই একটা পরীক্ষিত হজমের ওষুধ তৈরী হবে। খাবার পর খেলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাবে।

২। মোমাছি, বোলতা বা বিছা কামড়ালে তৎক্ষণাত্ ভাপিণ তেল লাগিয়ে দিলে যন্ত্রণা কমে যাবে।

৩। কেটে গেলে বা খেঁতো হলে অথবা ছড়ে গেলে ক্যাষ্টর অয়েল বা রেডির তেলে আকড়া-ভিজিয়ে ঐ আকড়াটা গুড়িয়ে তার ছাই দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

৪। খান্নাচি হলে এক আউন্স জলে ১০ গ্রাম

তুতে মিশিয়ে সেই জল লাগালে খামাচি ভাল হয়ে
বায় তবে হয় তো একটু জালা করবে মাত্র।

৫। **চুলকোনা** হলে চাল মুগরার তেলে কর্পূর
মিশিয়ে বা খেত চন্দন ঘসে কর্পূর মিশিয়ে তিন চার
দিন লাগালে চুলকোনা ভাল হবে।

৬। **দাদ হলে**—তুলসী পাতা ঘসে দিলে বেশ
উপকার পাওয়া যায়, অথবা কাগজী বা পাতি লেবুর
রসে তুলসী পাতা পিশে দাদে লাগালে ও উপকার হয়।

রান্নাঘর—

শকুন্তলা।

মাংসের আমলেট—

কিছুটা মাংসের কিমা প্রস্তুত করে রাখুন এবং এই
কিমা এমন করে জলে সিদ্ধ করে নিন যেন একটুও
জল না থাকে। কিমা সিদ্ধ হয়ে গেলে বেশ করে ঝেঁটে
নেবেন। এই বাটার সঙ্গে কয়েকটা কাঁচা ডিম ভেঙ্গে
দিন, একটু, আদা ও পেঁয়াজের রস, কিছু মরিচের গুঁড়ো,
আন্দাজ মত ছুন মিশিয়ে ফ্রাই প্যানে অল্প ঘি দিয়ে
এই গোলা আমলেটের মত ভেজে নিন, তাহলেই
মাংসের আমলেট হবে।

“জেরাটি চেঁড়স”

শৈল মিত্র।

উপকরণ—আবসের কচি চেঁড়স, ধনে, জিরে, মরিচ
মৌরী, আদা, কাঁচালঙ্কা, হিঙ, ছুন, (চিনি)

প্রণালী—কচি চেঁড়সগুলির লম্বাদিকের একধার কেটে
নিন। ঐ ওপরের সব মশলাগুলি পরিমাণ মতো
শুকনো কড়াতে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে
গুঁড়িয়ে ফেলুন। হিঙটাকে ভেজে গুঁড়িয়ে ফেলে
খুব সামান্য হিঙ দেবেন। আদা ও কাঁচালঙ্কা
করে কুচিয়ে নিন। পরিমাণ মতো ছুন দেবেন।
জিনিষ এক সঙ্গে মিশিয়ে নিন। মিষ্টি খারা ভালবা
তারা সামান্য চিনি দেবেন। ঐ চেঁড়সের কাটা
মশলাগুলি পুরে তৈরি করে নেবেন। তারপর কড়া
সামান্য ঘি, কিংবা তেল দিন। ঘি দিলেই ভাল
তারপর মশলা চেঁড়সগুলি দিন। কড়ার মাপে এ
কলাইয়ের ডিস্ ঢাকা দিন। এটি খুব মুহূর্তে
হয়। ভাপে যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন নাবিয়ে ফেলুন
এটি খুব মুখ-রোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য।

মহিলা সমাচার

ক্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ।

নারী কলা সঙ্ঘ দিল্লী

নূতন দিল্লী বারখাস্তাতে, পুরাণ দিল্লীর টিমারপুর ও
দরিয়াগঞ্জে ক্রীমতী স্বরমা বসু মেয়েদের জন্ম নাচ, গান
ও ছবি আঁকার শিক্ষাকেন্দ্র নারীকলাসঙ্ঘ স্থাপন
করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানে কলা বিদ্যালয়গণ জাগাইবার
জন্য অল্প বেতনে (মাসিক ৩/- মাত্র) নাচ, গান, বাজনা
ও ছবি আঁকা শিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই প্রতিষ্ঠানে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের কলা
শিখিবার অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। অনেক অবাক
এই বাদ্গালীর কলা বিদ্যালয়ে বাংলা গান
ও রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছেন। এ
বাদ্গালীরাই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তিকাবা
এই রূপ শিক্ষা আয়তন প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাদ্গালীর
ও প্রভাব বিস্তার লাভ করিবে।

৩য় ও 'স্বরশ্রী' পরীক্ষা

“সঙ্গীত সম্মিলনী” কয়েক বৎসর ‘গীতশ্রী’ ও ‘স্বরশ্রী’ পত্রিকা গ্রহণ ও উপাধি বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। এন বর্ষে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষক ছিলেন বরখা, কুমার বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ও দানী। এই উপাধি দিন দিন জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। এন বর্ষে—‘গীতশ্রীতে’ সর্ব শ্রেষ্ঠ হইয়া শ্রীমতী হেনা গিরিজাশঙ্কর স্থতি পদক (খেয়াল) এবং ‘স্বরশ্রীতে’ চৌধুরাণী পদক (আলাপ) শ্রীমতী বাসন্তী সেন পাইলেন।

হেনা বর্মান, প্রতিমা রায়, মমতা মিত্র, কল্যাণী গুহ, তন্মা ভৌমিক, অর্চনা বাগচী, কণিকা বসু, কৃষ্ণা হাদার, খেলনা বানার্জী—‘গীতশ্রী’ হইলেন।

সম্প্রাপ্তসেন, নীরা বিশ্বাস, শক্তিধারা মুখার্জি, বাসন্তী গুপ্ত, বেলা দাসগুপ্ত, অরুণা ভট্টাচার্য, লীলা লতিকা, মঞ্জুলা ঘোষ—‘স্বরশ্রী’ উপাধি পাইয়াছেন।

কলেজীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের দ্বাদশ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ইনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ঠিত হইয়াছিল। ২২টা কলেজের প্রায় ২৫টা ছাত্রী টি ছাত্র যোগদান করেন।

আন্তাত্য কলেজের শ্রীমতী গয়ত্রী বসু ও কলিকাতা বিদ্যালয়ের শ্রীমতী রেখা পণ্ডিত সর্বাধিক বিষয়ে হওয়ার জ্ঞ জুরস্কার পাইয়াছেন।

আলা নারী পদার্থ বিজ্ঞানবিদ কুমারী বিভা চৌধুরীর মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণা

কুমারী বিভা চৌধুরী এম, এস, সি, ম্যাঞ্চেস্টার বিদ্যালয়ে মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic rays) ংর্কে বিগত ৩ বৎসর ধাবং গবেষণা কার্য চালাইতেছেন।

৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ বিজ্ঞানে এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি বসু ইনষ্টিটিউটে কিছুদিন গবেষণার কাজ করেন।

নে অধ্যাপক ব্র্যাকেট এর অধীনে ৩০ জন পদার্থ বিদ গবেষণা কার্য করিতেছেন। তন্মধ্যে কুমারী চৌধুরী ব্যতীত ডাঃ মিত্র (ঢাকা), দুইজন

মিশরের, একজন আমেরিকার, একজন চীনের এবং একজন জেকোমোভাকিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানবিদ আছেন।

কুমারী বিভা চৌধুরী বলেন যে এ যুগে বিজ্ঞান বিশেষ করিয়া পদার্থ বিজ্ঞানের অল্পশীলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নারীদের আনবিক শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান না জন্মিলে ইহার ব্যবহার কি করিয়া তাঁহারা জানিবেন? ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে যে কয়েকজন পদার্থ বিজ্ঞানবিদ আছেন এক হাতের আঙ্গুলে তাহা গণনা করা যায়। নারীরা রসায়ন শাস্ত্রের দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়েন। পদার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞ অল্প শাস্ত্রের উচ্চতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ এই কারণেই এদিকে পা বাড়ান না এবং এই জ্ঞই নারীরা পদার্থ বিজ্ঞানকে ভয় করিয়া থাকেন। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কুমারী চৌধুরী থিসিস পেশ করিবেন এবং তিনি পি, এইচ, ডি পাইবেন বলিয়া আশা করা যায়। তৎপর তিনি কলিকাতা আসিয়া গবেষণার কাজ করিবেন।

শিশু মঙ্গল বিষয়ে ভারতীয়দের আমেরিকায়

শিক্ষালাভ

বর্তমানে জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত চৌদ্দজন বিদেশী নরনারী যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর প্রাক্তন চিকিৎসক ডাক্তার স্বশীলা নাথার এবং আরও তিনজন ভারতীয় নরনারী আছেন। ডাক্তার স্বশীলা নাথার এখন মেরীল্যান্ড ষ্টেটে প্রস্থতি এবং শিশুমঙ্গল বিষয়ে পূর্ববেক্ষণ কার্য করিতেছেন।

ভারতীয় সমাজ-সেবিকার বৃটেনে শিক্ষালাভ

মেয়েদের ক্লাব কি ভাবে পরিচালিত হয় এবং অপরাধ প্রবণ শিশুদের কি ভাবে সংশোধন করিতে হয় এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভের জ্ঞ কুমারী ডি, তারাপোরয়লা ৪ মাসের জ্ঞ বৃটেনে গিয়াছেন। ইনি বোম্বাই টাটা ইনষ্টিটিউট অব সোশাল সায়েন্সের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইউ, এন, সোশাল এফেয়ারস্ ফেলোশিপ প্রাপ্ত দশজন বৃত্তিধারীর মধ্যে ইনি অত্যন্তম। বৃটিশ কাউন্সিল্ তাঁহার ট্রেনিং এর সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

সাধারণ শ্রমিক থেকে ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি

গত ৬ই সেপ্টেম্বর মারগেট-এ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হয়ে গিয়েছে। কুমারী ফ্লোরেন্স হানকক সতনেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ইতিহাসের ৮০ বছরের মধ্যে কুমারী হানককই দ্বিতীয় মহিলা যিনি এই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। এ দিনটি কুমারী হানককএর জীবনের একটি স্মরণীয় দিন, কারণ, ৩০ বছর আগে ঠিক এই দিনে তিনি এক ছুথের কারখানার চাকুরী ছেড়ে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে যোগ দেন।

আমেরিকায় মহিলা বৈজ্ঞানিক কর্মী সংখ্যা

যুদ্ধের সময় আমেরিকায় পূর্ণবয়স্ক পুরুষরা সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করায় সেখানকার অফিস, কারখানা প্রভৃতিতে কর্মীর অভাব দেখা দেয়। সেই সময় বহু নারী জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ঐ সমস্ত জায়গায় কাজ করিতে আরম্ভ করেন। তখন হইতেই ওখানে নারীদের জন্য বহু রকমের স্বযোগ দেওয়া হইতেছে। আজকাল তাই মেয়েরা অনেক বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম করিবার স্বযোগ পাইতেছেন। বিশেষতঃ যে সব মেয়েরা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন তাঁহারা এদিকে অনেক বেশী স্বযোগ পান।

মার্কিন নারীদের মধ্যে যাহারা এইরূপ জীবিকা বাছিয়া লন চিকিৎসকের সংখ্যাই তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী। তারপর রসায়ন। মার্কিন নারী রসায়নবিদের সংখ্যা আমেরিকার মোট রসায়নবিদদের শতকরা পাঁচ ছয় ভাগ।

নারী গণিতজ্ঞের সংখ্যাও আমেরিকায় খুব কম নয়। বিভিন্ন মার্কিন শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারী গণনা বিভাগে মহিলা কর্মীর সংখ্যা আজকাল খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৪৪ সালে আমেরিকায় বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত মহিলা গণিতজ্ঞের সংখ্যা ছিল শতকরা ১২ হইতে ১৪ জন।

অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়েও মহিলা কর্মীদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

—মার্কিন

মার্কিন মহিলা নৃতত্ত্ববিদের মৃত্যু

নিউইয়র্ক,—গত ১৭ই সেপ্টেম্বর কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপিকা ডাক্তার বৃথ বেনেডিক্ট পরলোক গমন করিয়াছেন।

ডাঃ বেনেডিক্ট জাতিসাম্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া এবং এ সম্বন্ধে “Race of Mankind” অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন জাতি” বলিয়া একখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন।

ডাঃ বেনেডিক্টের মতে, বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি কোন পার্থক্য নাই। সংস্কৃতির মূল কথাই বৃষ্টিবার করা উচিত—ইহার খোলস লইয়া বিচার করিতে বা মাহুষ ভুলই করে।

গত যুদ্ধের সময় ডাঃ বেনেডিক্ট অফিস অফ ইনফরমেশনের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর বৎসর পূর্বে তিনি অফিস অফ নেভাল রিসার্চের সংস্কৃতি গবেষণা বিভাগের ভার লইয়াছিলেন।

—মার্কিন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১,৮৬,৮৫,০০০ স্ত্রীলোক

সম্রাতি ওয়াশিংটন হইতে মার্কিন সেনসাস বুরো করিয়াছেন যে এই বৎসর জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যা ১,৮৬,৮৫,০০০ হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালের মাসের পর ইহাই বৃহত্তম স্ত্রী-কর্মীর সংখ্যা।

জুন মাসের মোট কর্মী সংখ্যা হইয়াছিল ৭৯,০০০। এই হিসাবে স্ত্রী-কর্মীর সংখ্যা হইয়াছিল ২৯.২ ভাগ।

মার্কিন

সাময়িকী

শতাব্দী সর্দারজী

১৯৪৭ সালের ১৪তম বৎসরে উপনীত হইলেন, এই মুহূর্তে দেশের নবনারীদের সহিত আমরাও এই পুরুষ-ক আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার সংগ্রামে তাঁহার দান অতুলনীয়। স্বল্পভাষী নবনৈতর কঠোর ব্যক্তিত্বের নিকট বিদেশী রাজ-শক্তি অধিকবার পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাঁহার নূতন ও বিশ্বয়কর পরিচয় আমরা পাইয়াছি। রাজ্য সমূহের স্বল্প ব্যবস্থাপনায়। ইংরেজ ভারতকে শুধু ন ও পাকিস্থান রাষ্ট্ররূপেই দ্বিধা বিভক্ত করিয়া যায়। ষায়ে ছয় শত দেশীয় রাজ্য দ্বারা ভারতের মানচিত্রকে কবিতা গিয়াছে, বাহাতে বিচ্ছিন্ন ধর্মী সকল হইয়া অথও ও শক্তিশালী নব্যভারত জন্ম না দিতে কিন্তু সর্দারজী সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যকেই গণতন্ত্রকে মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত উদ্ধৃত হায়দরাবাদ এই কঠোর নর নিকট হার মানিতে বাধ্য হইয়াছে। কাশ্মীরের ও তিনি আয়ত্রে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। কঠোর প্রচেষ্টায় ভারতের যে নূতন মানচিত্র হইতে বাইতেছে, বিশ্ব তাহা কল্পনা করিতে ই। সর্দারজী শতাব্দী হইয়া দুর্দল ভারতকে মহা-লী জাতিরূপে পরিণত করিয়া বাহাতে বাইতে ন, সেই প্রার্থনাই আমরা জানাইতেছি।

সরকারী ব্যবস্থায় গলদ

স্বাধীনতার জন্ত বাহারা জীবন দিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষায় জন্ত বহুবিধ প্রচেষ্টাই চলিতেছে ; এই প্রচেষ্টা সাধু সন্দেহ নাই ; কিন্তু বাহারা স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত একদিন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন এবং বর্তমানে অনাহার প্রভৃতি বহুবিধ ক্লেশ সহ করিতেছেন তাঁহাদের বিষয়ে স্বাধীন সরকার যেন উদাসীন ; অবশ্য বড় বড় কর্তাদের কথা বাদ। মধ্যবিত্তদের মধ্যে বাহারা সমস্ত বাধা বিপত্তি ও দৈন্তকে অবহেলা করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজে রক্ত তিল তিল করিয়া দান করিয়াছেন তাঁহাদের ভুলিয়া গেলে আমাদের অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু আমাদের দেশ সেই অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে কার্পণ্য করিতেছে না বলিয়া মনে হইতেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে বহুবিধ সমস্যা রহিয়াছে এবং উহাদের সম্যকরূপে সমাধান সম্ভব হইতে পারিতেছে না। তার অগ্রতম কারণ সরকারী কাজে নৈতিক দৃষ্টি বড় ঘান। ইংরেজ আমলে বাহারা তদানীন্তন বিদেশী আমলাতন্ত্র সরকারকে বজায় রাখিতে দুর্নীতি দ্বারা দেশের তরুণ প্রাণের উপর দিয়া প্লাবন বহাইতে কুঠী বোধ করে নাই, দেশকে ও সমাজকে করিয়াছ শোষণ, তাহাদের হাতেই অনেকটা আজও রহিয়াছে দেশের মানদণ্ড। ইহাতে আর বাহাই হোক, দেশের নৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হইবে সে আশা করা অসম্ভব। দুর্নীতি দুর্নীতি বলিয়া সর্বত্রই একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা দমন করিবার যে প্রয়াস দেখা যায় তাহাতে দুর্নীতি দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়িয়া যায়। ইহারও মূলে

রহিয়াছে নৈতিক ভিত্তির ধ্বংস। দেশকে আসন্ন বিপর্দায়
হইতে রক্ষা করিতে হইলে প্রয়োজন নৈতিক চরিত্র বলে
বলীয়ান দেশপ্রেমিকদের উপর কতকটা নির্ভর করা। ইহাতে
তাহাদের প্রতিও কর্তব্য পালন করা হইবে এবং দেশের
মঙ্গল সাধিত হইবে। দুর্নীতি দমন করিয়া দেশে শান্তি পুনঃ
প্রতিষ্ঠিত করিতে স্বাধীন সরকারের দৃষ্টি উন্নত চরিত্রসম্পন্ন
বেকার দেশপ্রেমিকদের প্রতি আকৃষ্ট করা যাইতেছে।

বাস্ত-ত্যাগী

বাস্ত-ত্যাগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে—ইহাতে

বাংলা ও ভারত সরকার যে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন,
সহজেই অল্পমেয়। তাহাদের চাপে রেশনিং ব্যবস্থা
হইতে চলিয়াছে—কিন্তু যাহাদের ভার এত, তাহাদের
ও দুর্দশা যে কত অপরিমীম তাহা ধরণার বাহিরে।
কারণে যে চৌদ্দপুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া
বাস্তত্যাগী হয় নাই, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।
সরকার ইহঁদের জন্ত সাধ্যাতীত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে
এবং ভারত সরকারও তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন—
প্রচেষ্টা সফল হউক এবং ভাগ্য-বিড়ম্বিত বাস্ত-ত্যাগী
স্বব্যবস্থা হউক এই প্রার্থনাই করা যাইতেছে।

সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য প্রদেশপাল ডাঃ শ্রীকৈলাশনাথ কার্টিক সরোজ
নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির “পৃষ্ঠপোষক” হইতে সম্মত হইয়া সমিতিতে সম্মানিত
ও উৎসাহিত করিয়াছেন।

নিবেদন

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির আজীবন ও সাধারণ সভ্য এবং বঙ্গলক্ষ্মীর গ্রাহক
গ্রাহিকাগণ বাহারা কলিকাতায় থাকেন তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে যে
তাঁহারা যেন অন্তর্গত করিয়া তাঁহাদের ঠিকানার আঞ্চলিক নম্বর (P.O. Area Number)
আমাদের অফিসে জানাইয়া বাধিত করিবেন। ঠিকানার সহিত আঞ্চলিক নম্বর না লিখিলে
‘বঙ্গলক্ষ্মী’ ও চিঠি পত্রাদি পাইতে অথবা বিলম্ব ও অনেক সময় গোলনাল হয়।